রবীন্দ্র যুগে মাতৃভাষায়

উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের উদ্দেশে

কারবারের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

কারবারের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

সেক্রেটারীর কার্যপ্রণালী ও অফিস সংগঠন সহ

সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত, পুনর্বিন্যস্ত ও
পরিমার্জিত অষ্টম সংস্করণ

*Written according to the syllabuses of
Three-year Commerce Degree Pass and Honours Courses
of the Universities of Calcutta, Burdwan & North Bengal*

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

BUSINESS ORGANISATION AND MANAGEMENT

Including Secretarial Practice

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক
বি. কম. পাঠক্রমের জন্য অনুমোদিত

সন্তোষকুমার মিত্র এম. এ. [কম্]

প্রধান অধ্যাপক, বাণিজ্যিক বিষয়, চারুচন্দ্র কলেজ [সান্ধ্য], কলিকাতা
বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন এবং নিরীক্ষা শাস্ত্র-এর অন্যতম গ্রন্থকার।

অনিলকুমার বসাক এম. এ.

প্রধান অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ [সান্ধ্য], কলিকাতা
বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন, নিরীক্ষা শাস্ত্র, ভারতের অর্থনীতির পরিচয় এবং
অর্থবিদ্যা : ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত বিশ্লেষণ-এর অন্যতম গ্রন্থকার।

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড :: কলিকাতা ৭০০০০৯
অফিস: ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন :: কলিকাতা ৭০০০০৯

বিষয়-সূচী

প্রথম খণ্ড : ভূমিকা
INTRODUCTORY

দ্বিতীয় খণ্ড : বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগের মালিকানার রূপ
OWNERSHIP FORMS OF BUSINESS ORGANISATION IN THE PRIVATE & PUBLIC SECTORS

তৃতীয় খণ্ড : কোম্পানীর বিভিন্ন দিক
DIFFERENT ASPECTS OF JOINT STOCK COMPANY

চতুর্থ খণ্ড : কোম্পানী সেক্রেটারীর কার্যপ্রণালী ও অফিস সংগঠন
SECRETARIAL PRACTICE & OFFICE ORGANISATION

পঞ্চম খণ্ড : কারবারের জোট
BUSINESS COMBINATIONS

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ ব্যবস্থাপনার দিগন্ত
HARIZON OF MANAGEMENT

সপ্তম খণ্ড ঃ বিক্রয় ব্যবস্থা
MARKETING

অষ্টম খণ্ড ঃ কারবারের অর্থসংস্থান
BUSINESS FINANCE

নবম খণ্ড : বীমা
INSURANCE

দশম খণ্ড : কারবারের সহায়ক সংস্থাসমূহ
AGENCIES IN AID OF BUSINESS

পরিশিষ্ট

প্রথম খণ্ড ভূমিকা
INTRODUCTORY

অধ্যায়

১

আধুনিক সমাজে কারবারী কার্যকলাপ
BUSINESS ACTIVITIES IN MODERN SOCIETIES

কারবার : সংজ্ঞার্থ, উপাদান ও বৈশিষ্ট্য
BUSINESS : DEFINITION, ELEMENTS & FEATURES

সংজ্ঞার্থ : কর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রতিদিনের জীবন আবর্তিত হচ্ছে। তার নানান কর্মের মধ্যে কতকগুলির উদ্দেশ্য হল তার অভাব দূর করা বা অভাবের তৃপ্তি সাধন করা। এই কর্মগুলিকে বলে অর্থনৈতিক কর্ম। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মগুলির একটি অংশ হল কারবারী কাজকর্ম বা এককথায়, কারবার।

সুতরাং কারবার হল মানুষের একধরনের অর্থনৈতিক কর্ম। কিন্তু কোন ধরনের বা কোন জাতীয় অর্থনৈতিক কর্ম ? হ্যানী[১] বলেছেন : "দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় অথবা বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে সম্পদ উৎপাদন কিংবা সংগ্রহ করার জন্য মানুষ যে-সব কাজকর্ম করে থাকে তাকে কারবার বলা যেতে পারে।"

উপাদান ও বৈশিষ্ট্য : কারবারী কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কারবারের নিম্নলিখিত উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই :—

(১) কারবার হল মানুষের একধরনের অর্থনৈতিক কর্ম।

(২) বিক্রেতা দ্রব্যসামগ্রীগুলি কিংবা সেবাকর্ম নিজেই উৎপাদন করে থাকুক অথবা অন্য কোনও উৎপাদনকারীর নিকট থেকে তা কিনেই এনে থাকুক, সে-সবের বারংবার অর্থাৎ নিয়মিত ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ই[২] হল কারবারের সর্বপ্রধান লক্ষণ, উপাদান বা বৈশিষ্ট্য।

(৩) মুনাফা উপার্জনই হল কারবারী কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য বা অন্যতম প্রধান উপাদান ও বৈশিষ্ট্য। হ্যানীর কথায়, "লাভের উদ্দেশ্যেই কারবারীরা সর্বদা ক্রয়-বিক্রয়ে অংশ গ্রহণ করে থাকে।"

(৪) ক্রয়-বিক্রয় মারফৎ ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের পারস্পরিক উপকার লাভ[৩] হল কারবারের অন্যতম উপাদান ও বৈশিষ্ট্য। বিক্রেতা নির্দিষ্ট দামে দ্রব্য বা সেবাকর্মটি বিক্রয় দ্বারা যেমন নিজে মুনাফা উপার্জন করে থাকে, তেমনি ওই দ্রব্য বা সেবাকর্মটি ক্রয়ের দ্বারা ক্রেতারও অভাব দূর বা অভাবের তৃপ্তি সাধিত হওয়া চাই। তা সম্ভব হয় দ্রব্য বা সেবাকর্মটি ক্রয় থেকে ক্রেতার উপযোগ (আকারগত[৪], কিংবা কালগত[৫], অথবা স্থানগত[৬], কিংবা সেবাগত[৭]) প্রাপ্তি থেকে।

(৫) কারবারের ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়বস্তুই হল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের লেনদেন[৮]। অর্থাৎ তা ক্ষুদ্র আলপিন থেকে দালান কোঠা, জমিজমা, গাড়ি, জাহাজ পর্যন্ত বস্তুগত সামগ্রী হতে পারে আবার আলো, জ্বালানী গ্যাস, মেরামতী কার্য ইত্যাদির মত সেবা-কর্মও হতে পারে। তা জামা-কাপড়, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি মানুষের ভোগ্যপণ্য[৯] হতে পারে আবার কলকারখানার বা কৃষি প্রভৃতিব জন্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বা পুঁজিদ্রব্যও[১০] হতে পারে।

1. Haney, L. H., Business Organisation and Combination. p. 3.
2. Exchange. 3. Mutual benefit. 4. Form utility. 5. Time utility.
6. Place utility. 7. Service utility. 8. Dealings in goods and services.
9. Consumer goods. 10. Capital goods.

(৬) মুনাকা হল কারবারীর আয়। এই আয় উপার্জনের জন্যই কারবারীরা কারবারে লিপ্ত হয়। কিন্তু কারবারীর এই আয় বা মুনাফার কোনও স্থিরতা বা নিশ্চয়তা নাই[11]। তা অনিশ্চিত। মুনাফা বেশি হতে পারে, কম হতে পারে, আবার একেবারে নাও হতে পারে কিংবা লোকসানও হতে পারে। এই হল কারবারীর ঝুঁকি[12]। এই অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি হল কারবারের অন্যতম উপাদান ও বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষিপ্তসার: কারবারী কার্যকলাপের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলির কথা মনে রেখে এবার সংক্ষেপে এই বলে কারবারের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে যে, **কারবার হল মানুষের অভাব তৃপ্তির মারফৎ মুনাফা উপার্জন ও সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিক্রেতা কর্তৃক উৎপন্ন অথবা অন্যকোন উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রীত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের নিয়মিত বিক্রয়।** অতএব, কারবার বলতে, মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে ক্রেতাদের কাছে তা বিক্রয়ের যাবতীয় কার্যাবলীই বোঝায়।

কারবারের শ্রেণী বিভাগ (CLASSIFICATION OF BUSINESS)

কারবার, অর্থাৎ যাবতীয় কারবারী কার্যকলাপকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—**১. শিল্প**[13] এবং **২. বাণিজ্য**[14]।

১. শিল্প শব্দটির দ্বারা দ্রব্য-উৎপাদনের কার্যকলাপকে বোঝায়। শিল্পগুলি তিন শ্রেণীর: **১. প্রাথমিক কার্যাবলী:** যথা কৃষি, মৎস্য শিকার, পশুপালন, হাঁসমুরগী পালন, মৌমাছি পালন প্রভৃতি। **২. নিষ্কাশন শিল্প**[15], **জ্বালানী ও নানা কাঁচামাল সংগ্রহ:** কয়লা, লৌহ, খনিজ তৈল ইত্যাদি দ্রব্য উত্তোলনকারী শিল্প এর অন্তর্গত। **৩. উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প**[16], **নির্মাণ ও পূর্ত কার্য**[17]: যথা, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি শিল্প;

১·১নং রেখাচিত্র
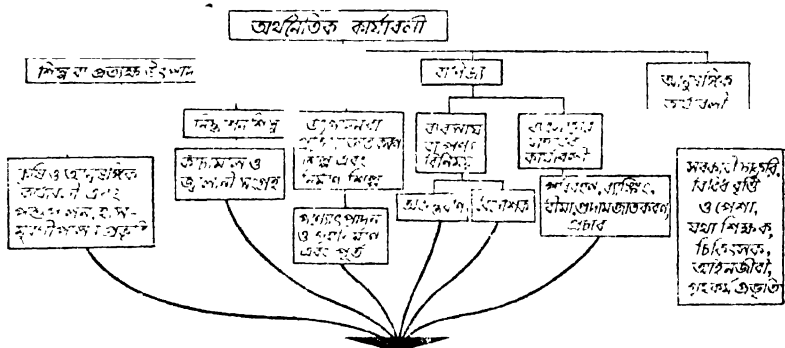
২. **বাণিজ্য** বলতে, বন্টন অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় এবং তার আনষঙ্গিক সকল বলীকে বোঝায়। এদের আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—১. কাঁচামাল ও তৈয়ারী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় কার্য—যাকে **ব্যবসায়**[18] বলা যায়। ব্যবসায় আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা, অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়[19] এবং বৈদেশিক ব্যবসায়[20] [১·১ নং রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য।] ২. ক্রয়-বিক্রয় ও তার যাবতীয় সহায়ক কার্যকলাপকে বাণিজ্য বলে। ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করার জন্য যে আনুষঙ্গিক ও সহায়ক ব্যবস্থা[21] রয়েছে যেমন পরিবহণ, ব্যাঙ্কিং,

11. Uncertainty. 12. Risk. 13. Industry. 14. Commerce.
15. Extractive. 16. Manufacturing or Processing.
17. Constructive or Assembling Industries. 18. Trade.
19. Internal or Home trade. 20. Foreign trade.
21. Activitives auxiliary to trade.

গুদাম জাত করিবার ব্যবস্থা, বীমা, প্রচার ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংকীর্ণ অর্থে এদের বাণিজ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু **ব্যাপক অর্থে, বাণিজ্য বলতে, শিল্প বা উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলী বাদে, ক্রয়-বিক্রয় ও তার আনুষঙ্গিক সকল কার্যাবলীকেই বোঝায়।**

কারবারের কার্যাবলী (FUNCTIONS OF BUSINESS)

সকল প্রকার কারবারেরই উদ্দেশ্য হল সমাজের মানুষের অভাব দূর করার জন্য তাদের বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের যোগান দেওয়া। এর পথে তিন প্রকার বাধা দেখা দেয়। যথা, সময়গত বাধা[22], স্থানগত বাধা[23] ও ব্যক্তিগত বাধা। এই বাধাগুলি অতিক্রম করাই কারবারের কাজ।

এক ঋতুতে যা উৎপন্ন হয়, অন্য ঋতুতে তা পাওয়া যায় না। এই হল **সময়গত বাধা।** সুতরাং দ্রব্যটি মজুদ করে ঐ মজুদ থেকে সারা বৎসর তা যোগান দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে সময়গত বাধা অতিক্রম করা যায়। একে সময়গত উপযোগ[24] সৃষ্টি বলে।

আবার এক স্থানে যে দ্রব্যটি উৎপন্ন হয় বা পাওয়া যায় অন্য স্থানে তা পাওয়া যায় না বা উৎপন্ন হয় না। **এই হল স্থানগত বাধা।** এক স্থানে উৎপন্ন কোন দ্রব্য অন্যান্য স্থানে সরবরাহ করতে হলে পরিবহণের দ্বারা তা স্থানান্তর করতে হয়। এইরূপে স্থানগত বাধা অতিক্রম করা যায়। একে স্থানগত উপযোগ[25] সৃষ্টি বলে।

বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা উৎপাদিত হয়। তারা সকলে পরস্পরের এত নিকটবর্তী নয় যে সরাসরি পরস্পরের দ্রব্য বিনিময় দ্বারা পরস্পরের অভাব দূর করতে পারে। **এই হল ব্যক্তিগত বাধা**[26]। কারবারের কাজ হল উৎপাদকগণের নিকট থেকে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করে চাহিদাকারিগণের কাছে তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা; এইরূপে ব্যক্তিগত বাধা অতিক্রম করা হয়।

অতএব, কারবারের প্রকৃত কাজ হল, সমাজের অধিবাসিগণের অভাবতৃপ্তির উদ্দেশ্যে সময়গত, স্থানগত ও ব্যক্তিগত বাধাসমূহ দূর করে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দেওয়া।

কারবারের চালিকা-শক্তি (BUSINESS MOTIVATION)

নিছক লাভের জন্য, কিংবা নিছক জনসেবার উদ্দেশ্যে চালিত হয়ে কেউ কারবার স্থাপন করেছে কিংবা পরিচালনা করছে একথা বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। কারবারী কার্যকলাপে কারবারীরা যে মূলগত চালিকা-শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় তা হল মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্য। কারবারীদের চিন্তায় ও কর্মে মুনাফা উপার্জনের কথাই সর্বাগ্রে স্থান পায়।

কিন্তু মুনাফাই প্রধান চালিকা-শক্তি হলেও, তা কারবারের একমাত্র চালিকা শক্তি নাও হতে পারে। কারবারে সাফল্য লাভের আনন্দ, প্রচেষ্টার সার্থকতা, সাফল্য লাভের মধ্য দিয়ে কারবারী জগতে নেতৃত্ব লাভ, প্রতিপত্তি লাভ, সামাজিক মর্যাদা লাভ প্রভৃতি উদ্দেশ্যও কারবারীদের চালিকা-শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। তবে, এ সকল উদ্দেশ্য সত্ত্বেও, অর্থনীতির ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে মুনাফার প্রবৃত্তিই সর্বপ্রধান এবং মূলগত চালিকা-শক্তি।

কারবারের উদ্দেশ্য (OBJECTIVES OF BUSINESS)

কারবারের মুখ্য[27] এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য হল দেশ, সমাজ বা ভোগকারীদের ব্যবহারের উপযোগী, অভাব তৃপ্তির উপযুক্ত উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সরবরাহ করা। একমাত্র এরই প্রতিদানে কারবারী মুনাফার আশা করতে পারে। আরউইক বলেছেন, আহার যে অর্থে জীবন ধারণের উদ্দেশ্য নয়, সে অর্থে মুনাফাও কারবারের উদ্দেশ্য হতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য যেমন ন্যূনতম পরিমাণে আহার্য প্রয়োজন, তেমনি কারবারের টিকে

---

22. Time hindrance. 23. Place hindrance. 24. Time utility.
25. Place utility. 26. Personal hindrance. 27. Primary objective.

থাকার জন্যও ন্যূনতম পরিমাণ মুনাফা চাই। কিন্তু সেটা তার অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না।

কারবারের মুখ্য উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করতে হলে কিছু গৌণ উদ্দেশ্যও[২৮] পূর্ণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত দামে ভোগকারীদের ব্যবহারের উপযোগী উপযুক্ত মানের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে, শ্রমিককর্মীদের ন্যায্য মজুরি, কাজের সন্তোষজনক পরিবেশ, এবং কর্মসংস্থানের স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। এগুলি হল শ্রমসংক্রান্ত উদ্দেশ্য। এটি গৌণ উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম। তেমনি আবার এজন্য চাই কারবারের উৎপাদনশীল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পুঁজিলগ্নীর উপর ন্যূনতম আয়ের ব্যবস্থা। এটি হল পুঁজি সংক্রান্ত গৌণ উদ্দেশ্য। তেমনি এজন্য চাই উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনার বিকাশ, উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি। এগুলিও গৌণ উদ্দেশ্যের অন্তর্গত।

কারবারের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক
INDIVIDUAL & SOCIAL ASPECTS OF BUSINESS

উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিচারে কারবারের দুটি দিক[২৯] দেখা যায়। একটি হল কারবারের ব্যক্তিগত দিক[৩০], অর্থাৎ কারবারীর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও ফলাফলের দিক। দ্বিতীয়টি হল কারবারের সামাজিক দিক[৩১], অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ও ফলাফলের দিক।

কারবারের ব্যক্তিগত দিক ঃ ১. কারবার হল কারবারীর জীবিকা উপার্জনের, তার কর্মসংস্থান ও আয়ের উপায়। কারবারের মুনাফা হল কারবারীর আয়। মুনাফা উপার্জনই হল কারবারীর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

২. মুনাফা বৃদ্ধিতে কারবারীর আয়, সঞ্চয় ও সমৃদ্ধি বাড়ে। ৩. সুতরাং কারবারের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কারবারী তার মুনাফা থেকে সঞ্চয় করে তা কারবারেই লগ্নী করে কারবার বাড়াতে চেষ্টা করে।

৪. কারবারের উন্নতির সাথে সাথে কারবারীর নিজের ব্যক্তিগত বিত্তসম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে সমাজে ও দেশে তার মান, মর্যাদা, সম্ভ্রম প্রতিপত্তি সবই বাড়ে।

৫. সকল কারবারের সাথে বিপুল অর্থ ও বিত্ত সম্পত্তির মালিকানার দরুন কারবারী শুধু সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিই নয়, দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়।

কারবারের সামাজিক দিক ঃ ১. কারবারের প্রথম কাজ হল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের যোগান দিয়ে জীবনযাত্রাকে সহজ স্বচ্ছন্দ ও আরামপ্রদ করে তোলা। এক কথায় সমাজের ভোগ ব্যবহারের প্রয়োজন মেটানো। ২. কারবারী কার্যকলাপের দ্বারা দেশে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির মারফৎ উৎপাদন, জাতীয় আয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দেশবাসীর জীবন যাত্রার মান বাড়ে।

৩. উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ হ্রাসের জন্য কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বদা নানাপ্রকার গবেষণার কাজে অর্থ ব্যয় করে ও উৎসাহ দেয়। ফলে দেশে নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয় এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রগতি ও কারিগরী উন্নতি ঘটে।

৪. কারবারের উন্নতি ও বিস্তারের দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য মারফৎ অন্যান্য দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার দ্বারা দেশগুলি পরস্পরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতিতে সাহায্য করে।

28. Secondary objectives. 29. Two aspects of Business.
30. Individual aspect. 31. Social aspect.

৫. অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাথে সাথে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার মারফৎ আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কারবারের ব্যক্তিগত ও সামাজিক, এই দুই দিকের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত স্বার্থে মুনাফা উপার্জনই কারবারীর প্রধান উদ্দেশ্য হলেও কারবারের সামাজিক দিকটির গুরুত্বও কম নয়। সামাজিক দিকটিকে অবহেলা করে শুধু ব্যক্তিগত দিকটি লক্ষ্য করে কারবার পরিচালনা করা হলে তা সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না। ব্যক্তিগত ও সামাজিক, এই দুটি দিক বা উদ্দেশ্যের মধ্যে কারবারীরা যতটা পরিমাণে সামঞ্জস্য করতে পারবেন কারবারের সাফল্যও তত বেশি এবং স্থায়ী হবে।

কারবারের সামাজিক দায়িত্ব (SOCIAL RESPONSIBILITIES OF BUSINESS)

কারবারের মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা উপার্জন। মুনাফা উপার্জনের প্রবৃত্তিই কারবার গঠনে ও পরিচালনার প্রেরণা শক্তি। মুনাফা না হলে কারবারের ঝুঁকি কেউ বহন করে না।

কিন্তু যাদের সাহায্যে এবং যাদের সেবা করে কারবার এই মুনাফা ও আয় উপার্জন করে তাদের প্রতি কারবারের অবশ্যই দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব হল কারবারের সামাজিক দায়িত্ব। সমাজের প্রতি এই দায়িত্ব পালন বর্তমান কালে কারবারের অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য করা হয়। এর গুরুত্ব বর্তমানে এত বেশী যে, শুধু মুনাফা নয়, কতটা পরিমাণে তার দ্বারা সামাজিক দায়িত্ব পালিত হয়েছে ও হচ্ছে তা তার সাফল্যের মাপকাঠি রূপে গণ্য করা হয়।

কারবারের এই সামাজিক দায়িত্বকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে:

১. **ব্যবহারকারী বা খরিদ্দারদের প্রতি দায়িত্ব**[৩২]: খরিদ্দারদের ন্যায্য দামে ভাল বা খাঁটি জিনিস উপযুক্ত সময়ে ও স্থানে সরবরাহ করা হল কারবারের সর্বপ্রধান সামাজিক দায়িত্ব। খরিদ্দার সন্তুষ্ট হলেই তবে কারবারের দিন দিন উন্নতি ঘটতে পারে।

২. **শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্ব**[৩৩]: শ্রমিক কর্মচারীদের সাহায্যেই কারবারের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপন্ন ও সরবরাহ করা হয়, কারবারটি পরিচালিত হয়। এজন্য তাদের ন্যায্য ও উপযুক্ত মজুরি ও বেতন ইত্যাদি, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সন্তোষজনক শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, আইনস্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, কাজের নিরাপত্তা ও উন্নতির ব্যবস্থা, এবং দ্রুত বিরোধ মীমাংসার বন্দোবস্ত প্রভৃতি প্রয়োজন। এর ফলে কারবারের কাজে শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছ থেকে সুনিশ্চিতভাবে সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হয়। কারবারের সাফল্যের পক্ষে তা অপরিহার্য।

৩. **বিনিয়োগকারীদের প্রতি দায়িত্ব**[৩৪]: কারবার স্থাপন ও পরিচালনার পুঁজি না হলে চলে না। সে কারণে কারবারের পুঁজি যিনি বা যাঁরা যোগান অর্থাৎ মালিক বা শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিও কারবারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কম নয়। উন্নতশীল কারবারের পক্ষে পুঁজির পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। একাজে বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা পেতে হলে ও তাঁদের আকৃষ্ট করতে হলে, বিনিয়োজিত পুঁজির উপর মুনাফা বা লভ্যাংশ ও সুদ হিসাবে ন্যায্য প্রতিদান দেওয়া দরকার।

৪. **সরকারের প্রতি দায়িত্ব***: শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অর্থসংস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করে সরকার বা রাষ্ট্র দেশে কারবার স্থাপন, পরিচালনা ও শ্রীবৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করে ও বজায় রাখে। সুতরাং প্রতিদানে কারবারেরও সরকারের বা রাষ্ট্রের প্রতি অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হল সরকারের প্রাপ্য কর, শুল্ক এবং অন্যান্য দেয় যথাসময়ে ও সঠিকভাবে পরিশোধ করা। *

---

32. Responsibilities to customers.
33. Responsibilities to the employees.
34. Responsibilities to the Investors. *Responsibilities to the Govt.

৫. **সমগ্র সমাজের প্রতি দায়িত্ব**:** উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজকর্মের দ্বারা নতুন নতুন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের সম্প্রসারণ, প্রতিযোগিতা অক্ষুণ্ণ রাখা ও একচেটিয়া কাজকর্ম পরিহার করা এবং কলকারখানার ধোঁয়া ও পরিত্যক্ত জঞ্জাল ও দূষিত পদার্থে যাতে স্থানীয় ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত ও বিনষ্ট না হয়, জনস্বাস্থ্যহানি ও প্রাণহানির কারণ না ঘটায়, বিকট শব্দে মানুষের অসুবিধা ও বিপদ সৃষ্টি না করে, অস্বাস্থ্যকর বস্তীজীবন যাপনে শ্রমিক-কর্মীরা বাধ্য না হয়, উৎপন্ন দ্রব্যে ভেজাল মেশানো না হয় এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতির প্রসারে যাতে কারবারের মুনাফার একাংশ ব্যয় হয় এবং কারবারটি যাতে জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয় তার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি হল সমগ্র সমাজের প্রতি কারবারের দায়িত্বের অন্তর্গত।

সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র: সরকারী ও সমবায় কারবারী সংস্থা এবং বেসরকারী কারবারী সংস্থা, সকল সংস্থারই সামাজিক দিক ও দায়িত্ব একই। জনকল্যাণই সরকারী কারবারের মূল উদ্দেশ্য তবে মুনাফার দিক অর্থাৎ নিজস্ব দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সরকারী ও সমবায় কারবারী সংস্থাগুলি আদৌ মুনাফার প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত না-ও হতে পারে। কিন্তু বেসরকারী কারবারী সংস্থা-গুলির পক্ষে এই দিকটি বর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। তবে, মুনাফার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলা সরকারী ও সমবায় সংস্থাগুলির পক্ষে বাঞ্ছনীয় কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। সরকারী সংস্থার লোকসান হলে তা রাজকোষ থেকে ভরতুকী দিয়ে পূরণ করা হয়। কিন্তু এভাবে দিনের পর দিন চলে না। সুতরাং সরকারী এবং সমবায় সংস্থাগুলিকে অর্থনৈতিক সংস্থ রূপে টিকে থাকতে হলে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করতে হলে ও স্বনির্ভর হতে হলে, তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ এবং ভবিষ্যত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখতে হলে কেবল উৎপাদন খরচের সমান দামে পণ্য বিক্রয় না করে, একটি যুক্তিসঙ্গত ন্যূনতম মুনাফা উপার্জনের নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ওই ন্যূনতম মুনাফা তার কাজের সার্থকতার মানদণ্ড রূপেও ব্যবহৃত হতে পারে।

কারবারী সংস্থাসমূহের কয়েকটি সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য
SOME BASIC COMMON FEATURES OF BUSINESS ENTERPRISES

কারবারের আয়তন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় যাই হোক না কেন, শিল্পে বাণিজ্য অথবা ব্যবসায়, যে ক্ষেত্রেই তা লিপ্ত থাকুক না কেন এবং সেগুলি ব্যক্তিগত অথবা রাষ্ট্রীয়, যে জাতীয় মালিকানা ও পরিচালনারই অন্তর্গত হোক না কেন, সকল কারবারেই কতক-গুলি সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। নিচে এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

১. **উদ্যোক্তা**[35]**:** যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা প্রথম কারবার স্থাপনে অগ্রণী হয় তাকে বা তাদের উদ্যোক্তা বলে। উদ্যোক্তা ছাড়া কারবারের সূত্রপাত হয় না। যে কোন ক্ষেত্রে, যে কোন ধরনের কারবার শুরু করতে গেলে প্রথমেই কাহাকেও তার উদ্যোগ নিতে হয়। এতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষই উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে এসেছে। কিন্তু আধুনিক কালে অনেক দেশে রাষ্ট্রকেই ক্রমশঃ বেশি পরিমাণে উদ্যোক্তার ভূমিকা পালনে অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ থাকে।

২. **সংগঠন**[36]**:** কারবারের কাজগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে বিভাগ ও উপবিভাগে

**Responsibilities to the society as a whole. 35. Entrepreneur. 36. Organisation.

আলাদা করে সংযোজনের দ্বারা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা হল সংগঠন। এর কাজ হল ঘড়ির মেন স্প্রিং-এর মত। কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ হল বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ ও তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপন করা[37] এবং প্রয়োজনীয় অনুপাতে তাদের নিয়োগ করে দ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন করা ও তা যোগান দেওয়া। এজন্য ভূমি, পুঁজি ও শ্রম এই সকল উপাদানগুলির সংগ্রহ এবং সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা একাজ সম্ভব হয় তাহাই সংগঠন। কারবারের প্রকৃতি অনুযায়ী সংগঠনের আকৃতি ও প্রকৃতির পার্থক্য ঘটে। কিন্তু উপযুক্ত সংগঠন ছাড়া কোন কারবারই চলে না।

৩. **অর্থসংস্থান**[38] **:** সকল কারবারেই পুঁজি প্রয়োজন। কারবারের বিষয় ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার প্রয়োজনীয় পুঁজির পরিমাণ স্থির হয়। ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক কারবারে প্রধানত চলতি পুঁজির[39] প্রয়োজনই বেশি। শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী[40] এবং চলতি[41] উভয় প্রকার পুঁজিরই প্রয়োজন। তবে ভারী ও মৌলিক শিল্পে অধিক পরিমাণে স্থায়ী পুঁজি লাগে।

৪. **পূর্বানুমান**[42] **:** ভবিষ্যতে চাহিদা কিরূপ হতে পারে আগে হতেই তা যথাসম্ভব অনুমান করে কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্তমানে কাজ করতে হয়। একেই পূর্বানুমান বলে। এই পূর্বানুমানই কারবারের ভিত্তি। অত্যন্ত ক্ষুদ্র দোকানদারও পরের দিনের বিক্রয়ের জন্য আগের দিন দ্রব্য মজুদ করে রাখে। পাইকারী কারবারীরা সারা মাস অথবা বৎসর ধরে বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য সংগ্রহ ও মজুদ করে। কারবারের সাফল্য বহুলাংশে পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করে।

৫. **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা**[43] **:** ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমানের উপর নির্ভর করে কারবারগুলিকে বর্তমানে কাজ করতে হয় বলে, তা হতে তাদের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার উৎপত্তি হয়। ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কে যে পূর্বানুমান বা পূর্বে আন্দাজ করা হয়েছিল তার সাথে বাস্তবে প্রকৃত চাহিদার বৈষম্যের দরুন সকল কারবারেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ধনতন্ত্রে তীব্র কারবারী প্রতিযোগিতার ফলে এই ঝুঁকি খুবই বেশি হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন ও বন্টনের রাষ্ট্রায়ত্ত কর্মকলাপ কেন্দ্রীয় অর্থনীতির পরিকল্পনায় পরিচালিত হয় বলে সেখানে ঝুঁকি থাকে না। মিশ্র অর্থনীতিতে অর্থ-নীতিক পরিকল্পনা প্রচলিত হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত কারবারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারবার বজায় থাকায় ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা থেকে যায়।

৬. **উদ্বৃত্ত সৃষ্টি**[44] **:** কারবারের উদ্দেশ্যই হল মুনাফা অর্জন করা। কারবারী ব্যয়ের তুলনায় আয়ের নীট উদ্বৃত্তই[45] কারবারের মুনাফা। সুতরাং সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানেরই মূল লক্ষ্য হল উদ্বৃত্ত সৃষ্টি। যে প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত আয় যত বেশি, তার সাফল্য তত অধিক।

কারবারী ও বাণিজ্যিক ঝুঁকি (BUSINESS & COMMERCIAL RISKS)

কারবারের প্রধান ঝুঁকি হল তিনটি। যথাঃ **১. ব্যবসায়িক বা চাহিদা পরিবর্তনের ঝুঁকি :** ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে যে পণ্যসামগ্রী মজুত করে রাখে তার চাহিদার ওঠা নামা ঘটাতে পারে। মন্দা দেখা দিলে, খরিদ্দারদের রুচি ও পছন্দ বদলে গেলে চাহিদা কমে যায়। সাধারণত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও খাদ্যদ্রব্যের চাহিদার তুলনায় আরাম-দায়ক ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদার ওঠানামা বেশি হয়। চাহিদার এই ওঠানামা অনিশ্চিত এবং এই ঝুঁকি ব্যবসায়ীরা সর্বদাই বহন করে থাকে।

২. দাম পরিবর্তনের ঝুঁকি : চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তনের দরুন মজুত

---

37. Co-ordination of Factors. 38. Finance.
39. Floating or Circulating. 40. Fixed. 41. Circulating.
42. Forecasting. 43. Risk and uncertainty.
44. Surplus creation. 45. Net surplus.

পণ্যের বাজার দাম সর্বদাই ওঠানামা করে। দাম বাড়লে মুনাফা বাড়ে, দাম কমে গেলে লোকসানও হতে পারে। সাধারণত তৈরী পণ্য অপেক্ষা কাঁচামালের দামের ওঠানামা বেশি হয়।

৩. **সম্পত্তির ক্ষতির ঝুঁকি :** নানা কারণে পাওনা টাকা আদায় করা না গেলে, কিংবা অগ্নিকান্ড, ঝড়বৃষ্টি, নৌকা বা জাহাজডুবি ইত্যাদি আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন, অথবা চুরি ডাকাতি, দাঙ্গাহাঙ্গামা ইত্যাদি কারণে কারবারের সম্পত্তি হানির আশঙ্কা বা ঝুঁকি থাকে।

এই তিনটি প্রধান ঝুঁকি ছাড়া, আরও কয়েক প্রকারের ঝুঁকি দেখা যায়। যেমন. **টাকার বিনিময় হারের ওঠানামা ঝুঁকি।** আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ে এই ঝুঁকি থাকে দেশের টাকার বিনিময় হার কমে গেলে আমদানিকারীদের লোকসান। কারণ দেশী টাকায় বিদেশী জিনিসের দাম তখন বেশি পড়ে। আর রপ্তানিকারীদের তখন লাভ। কারণ তারা যদি বিদেশী টাকায় রপ্তানি সামগ্রী দাম পায় তাহলে সে টাকা ভাঙিয়ে তারা আগের থেকে দেশী টাকা বেশি পাবে। আর দেশের টাকার বিনিময় হার বেড়ে গেলে তখন রপ্তানিকারীদের লোকসান এবং আমদানিকারীদের লাভ হয়।

এছাড়া **আর যে সব ঝুঁকি** আছে তা হল, পণ্য আনার বা পাঠানোর সময় পথে নষ্ট হওয়ার দরুন, কোন আকস্মিক কারণে সাময়িকভাবে বেচাকেনা বন্ধ থাকলেও স্থায়ী খরচগুলির দরুন, অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার দরুন, এবং পণ্যের দাম, চালান, বেচাকেনা প্রভৃতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ জারীর দরুন লাভ কম হতে বা লোকসানও হতে পারে।

আধুনিক কারবারে সাফল্যের প্রয়োজনীয় বিষয়
MODERN BUSINESS : REQUISITIES FOR SUCCESS

বর্তমান জটিল দুনিয়ায় কারবারী সংস্থার পক্ষে সাফল্য অর্জন করা দিন দিনই কঠিন হয়ে পড়ছে। অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ও সযত্ন প্রচেষ্টার উপর আধুনিক কারবারের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে।

১. সর্বাগ্রে কারবারী প্রতিষ্ঠানটির **সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত লক্ষ্য**[৪৬] নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষ্যের কোনটি মুখ্য এবং কোনটি গৌণ, কোনটি আশু এবং কোনটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য তা-ও আগে স্থির হওয়া প্রয়োজন। সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের উপর কারবারের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে।

২. লক্ষ্য নির্ধারণের পর তা কিভাবে পূর্ণ করা হবে সে সম্পর্কে, সংস্থাটির কাজের **উপযুক্ত পরিকল্পনা**[৪৭] তৈরি করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে, কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে তা আগে থাকতেই ভেবে নিয়ে তার সমাধানের জন্য কর্মসূচী রচনা করাই এর মূল কথা। সুতরাং কারবারের সাফল্যের জন্য পরিকল্পনাটি বাস্তব-সম্মত ও সুচিন্তিত হওয়া চাই।

৩. লক্ষ্যলাভ ও পরিকল্পনা রূপায়ণের উপযুক্ত **কর্মদক্ষ সংগঠন**[৪৮] গড়ে তোলা না হলে সাফল্য করায়ত্ত হবে না। সংগঠনের রূপ ও আকারটি নির্ভর করে লক্ষ্য এবং পরিকল্পনার উপর।

৪. কারখানার **উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও সঠিক বিন্যাস এবং উপযুক্ত আয়তন**[৪৯] বিশিষ্ট অর্থাৎ উৎপাদনের মাত্রা সঠিকভাবে নির্ধারিত না হলে সাফল্য লাভ কঠিন হয়ে পড়বে।

৫. **উপযুক্ত অর্থসংস্থানের**[৫০] ব্যবস্থাও সাফল্যের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

---

46. Determination of objectives. 47. Proper Planning.
48. Efficient Organisation. 49. Proper Location, Layout and size.
50. Adequate Financing.

স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদী স্থির ও চলতি, নানারূপ পুঁজির প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না হলে কারবার কখনও সফল হতে পারে না।

৬. **সুদক্ষ বিক্রয় বা বন্টন ব্যবস্থা**[51] কারবারের সাফল্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। তা না হলে অচিরেই অবিক্রীত পণ্যের মজুদ বেড়ে গিয়ে উৎপাদনের চাকা অচল করে দিয়ে কারবারের সমূহ সংকট ডেকে আনতে পারে। এজন্য, ধারাবাহিক, সঠিক ও যথোপযুক্তভাবে দ্রব্য ও সেবাকর্ম বিক্রয়ের সুদক্ষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৭. **সন্তোষজনক শ্রমিক-কর্মী সম্পর্কের**[52] গুরুত্বও কারবারের সাফল্যের পক্ষে কম নয়। পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অনুযায়ী উৎপাদনের ও বিক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি পূর্ণ করতে হলে কারবারের সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা চাই। এজন্য শ্রমিক-কর্মীদের যেমন সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন তাদের সাথে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার।

৮. বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, পরিবর্তন ও তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে কারবারী সাফল্যের ক্ষেত্রে **গবেষণার গুরুত্ব**[53] অসীম। উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে গবেষণা, উপকরণ সম্পর্কে গবেষণা, উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা, বাজার সম্পর্কে গবেষণা প্রভৃতির সাহায্য ছাড়া কারবার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিরন্তর পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ ও সাফল্য অর্জন করা।

৯. **সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও গতিশীল নেতৃত্ব**[54] ছাড়া উপরোক্ত কোনও বিষয়গুলিই সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয়। নির্ধারিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী, এবং তা পূর্ণ করতে হলে, সুদক্ষ নেতৃত্ব, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সংযোজন ও সমন্বয় ব্যবস্থা প্রয়োজন। কারবারের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। সুতরাং ব্যবস্থাপক-নেতৃত্বের উপযুক্ত দক্ষতা ও গতিশীলতা ছাড়া কারবারী-প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্য অর্জন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কারবারের অর্থ সংস্থান (BUSINESS FINANCE)

কারবারের প্রয়োজনীয় পুঁজি প্রয়োজনের মেয়াদ হিসাবে সাধারণত তিন রকমের—স্বল্প মেয়াদী, মাঝারি মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী। ব্যবসা বাণিজ্যে স্বল্প মেয়াদী পুঁজি বেশি লাগে, শিল্পে বেশি লাগে দীর্ঘ ও মাঝারী মেয়াদের পুঁজি। কারবারের মালিক বা মালিকরা পুঁজি সরবরাহ করলেও তাতে প্রয়োজন মেটে না বলে কারবারী সংস্থাগুলিতে সর্বদাই ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। অতীত মুনাফাও কারবারের পুঁজির অন্যতম উৎস।

স্বল্পমেয়াদী ঋণের উল্লেখযোগ্য উৎস হল জনসাধারণ ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে মেয়াদী আমানত গ্রহণ, দেশীয় ব্যাঙ্কার ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে পুঁজি ও ঋণের উৎস হল মালিকদের নিজেদের পুঁজি সরবরাহ, জনসাধারণের কাছে থেকে ঋণ এবং ধারে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও তৈরী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়। দীর্ঘমেয়াদী শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ, অতীত মুনাফা লগ্নী করা, বাণিজ্যির ব্যাঙ্ক ও দেশীয় ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে ঋণ, বীমা কোম্পানী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ।

সফল উদ্যোক্তার গুণাবলী (QUALITIES OF A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR)

কারবারী নেতার (তিনি ক্ষুদ্র একমালিকী কারবারের মালিকই হোন অথবা বৃহৎ কোনও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা-কর্তাই হোন) সাফল্যের জন্য যে সব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা হল ঃ

---

51. Efficient marketing. 52. Satisfactory personnel-relationship.
53. Research facilities.
54. Efficient management and dynamic leadership.

১. খানিকটা আদর্শবাদ[55] : যদিও সম্পূর্ণ আদর্শবাদীরা কখনও কারবারী হতে পারে না, তাহলেও কারবারী হতে হলে খানিক পরিমাণে আদর্শবাদ থাকা দরকার। এদেশে স্বদেশী আন্দোলন একসময়ে অনেক কারবারীকে আদর্শে জাগিয়েছিল।

২. দূরদৃষ্টি[56] : বাজারের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে দূরদৃষ্টি না থাকলে কারবারে আদৌ সাফল্য অর্জন করা যায় না।

৩. উদ্যোগ[57] : নতুন বিষয় চিন্তা করা, নতুন কাজে হাত দেওয়া, তৎপরতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, এসব হল উদ্যোগের লক্ষণ। উদ্যোগী না হলে কারবারের সুযোগ নষ্ট হয়।

৪. সাহস ও দৃঢ়তা[58]: প্রাথমিক কিংবা সাময়িক বিপর্যয়ে ও প্রতিকূল অবস্থার মুখে বিচলিত না হয়ে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ এবং পুরণো, বহুব্যবহৃত পথে বিচরণের চেষ্টা না করে নতুন পথে চলার দুঃসাহসী মনোভাব কারবারীর সফল্যের অন্যতম উপাদান।

৫. কারবারী নৈতিকতা[59]: যে কোন উপায়ে, এমনকি অসদুপায়েও অর্থোপার্জনের দুর্নীতি ও মনোভাব শেষ পর্যন্ত কারবারে সাফল্যের পরিবর্তে বিপর্যয়ই ডেকে আনে। লেনদেনে সততা, উৎপন্ন সামগ্রীর উৎকর্ষ ও দামের যথার্থতা সম্পর্কে খরিদ্দারের আস্থা ও ঋণদাতাদের বিশ্বস্ততা কারবারের স্থায়ী সাফল্যের উপাদান।

৬. সতর্কতা, তথ্যসংগ্রহে ও অবস্থা বিশ্লেষণে আগ্রহ[60]: কারবারী সাফল্যের অন্যতম উপাদান।

৭. ব্যক্তিগত গুণাবলী[61]: যথা—সময়ানুবর্তিতা, উপস্থিতবুদ্ধি, ধৈর্য, সহানুভূতি, ঐকান্তিকতা, সৌজন্যমূলক আয়ের ব্যবহার প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণাবলীও কারবারীকে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত স্বাস্থ্যও তার আরেকটি সহায়।

উদ্যোক্তার কার্যাবলী (FUNCTIONS OF AN ENTREPRENEUR)

উদ্যোক্তা : যে কোনও কারবারে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে, সে সবের উপযুক্ত সমন্বয় ঘটাতে ও ব্যবহার করতে হয়। উপকরণগুলির সংগ্রহ, সমন্বয় ঘটানো এবং প্রয়োগ বা ব্যবহারের কাজটিই হল সংগঠন বা সংগঠনের কাজ। এটি কারবারের একটি অপরিহার্য উপাদান। যিনি বা যারা এই কাজটি সম্পাদন করেন, তাঁকে বা তাঁরাই হলেন কারবারের সংগঠক বা উদ্যোক্তা। কারবারী জগতে উদ্যোক্তার গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্যোক্তার কার্যাবলী : ১. খরিদ্দারদের চাহিদা লক্ষ্য করে কোথায় কোন্ জিনিসটির কি পরিমাণে উৎপাদন বা সরবরাহের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেজন্য কোথায় কারবারটি স্থাপন করা হলে তা লাভজনক হবে তা অনুধাবন করা হল উদ্যোক্তার প্রথম কাজ।

২. ভাবী কারবারের সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে তার প্ল্যান বা খসড়া তৈরি করে আগ্রহী ব্যক্তিদের তাতে আকৃষ্ট করা হল তার দ্বিতীয় কাজ।

৩. এর পরের কাজ হল প্রয়োজনীয় পুঁজি ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করে মনোনীত স্থানে কারবারটি স্থাপন করা।

৪. এর পর তার কাজ হল কারবার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও উপযুক্ত পরিমাণে শ্রমের বিভাগ চালু করা।

৫. এই সাথে তার আরেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল উৎপাদন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি বা কর্মপন্থাগুলি স্থির করা। এজন্য কোন্ জাতীয় পণ্য, কখন, কতটা পরিমাণে উৎপাদন করা ও যোগান দেওয়া হবে তাঁকে সে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

55. Idealism. 56. Foresight. 57. Initiative.
58. Courage and Firmness. 59. Business Morality.
60. Vigilance, aptitude for collection of information and analysis.
61. Personal Qualities.

৬. উপরোক্ত নীতিগুলি স্থির করার পর তা কাজে কি ভাবে পরিণত করা হবে তা স্থির করা এবং তা ঠিকমত কাজে পরিণত হচ্ছে কি তা তদারকও তাঁকেই করতে হয়।

৭. এর পরের কাজ হল পণ্যটির বাজার সংগঠিত করা ও বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা।

৮. এবার পণ্য বিক্রয়লব্ধ টাকা থেকে তাকে ভাড়া ও খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য পাওনা, পুঁজির সুদ ইত্যাদি অন্যান্য উপাদানের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিতে হয়। তারপর যদি কিছু অবশিষ্ট বা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সেটুকু হল সংগঠক বা উদ্যোক্তা হিসাবে তাঁর প্রাপ্য পারিশ্রমিক বা মুনাফা।

৯. সর্বোপরি কারবারের ঝুঁকি পরিপূর্ণ ভাবে তাঁকেই নিতে হয়। কোন মুনাফা না হলে লোকসানের বোঝা তাঁর উপরেই চাপে।

বর্তমানে, উদ্যোক্তার এই সকল কাজের অনেকগুলিই পদস্থ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত হলেও, কারবারের ঝুঁকি কিন্তু মালিক বা উদ্যোক্তা ছাড়া আর কেউ বহন করে না।

কারবারের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

BUSINESS ORGANISATION & MANAGEMENT

সংগঠন (ORGANISATION)

'সংগঠন' শব্দটির অর্থ[62]**ঃ** কারবারী প্রতিষ্ঠানের বহুধাবিভক্ত কর্মপ্রচেষ্টাগুলি যাতে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যটি সাধনের জন্য একই লক্ষ্যে ধাবিত হতে পারে সেজন্য পরস্পরের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সেগুলিকে একসূত্রে গাঁথতে হয়। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী বিভক্ত ও একত্রিত করার এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার নামই হল সংগঠন। সুতরাং সংগঠন হল একটি প্রক্রিয়া—এমন একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সাথে সংযোজিত এবং সম্মিলিত হয়ে, পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক হয়ে, প্রতিষ্ঠানটিকে কর্মক্ষম, প্রাণচঞ্চল ও গতিশীল করে তোলে। নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে যায়। তার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলে।

সংগঠন হল কাজের এবং কাজের উপযুক্ত সুবিধাগুলির যুক্তিসংগত বন্দোবস্ত। ফেয়ল বলেছেনঃ একটি কারবার সংগঠিত করার অর্থ হল তার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় —কাঁচামাল হাতিয়ার, পুঁজি ও কর্মী—সবকিছুর ব্যবস্থা করা। এর মধ্যে, কর্মী বা লোকবল অর্থাৎ মানবিক উপকরণের ব্যবস্থা এবং তাদের কর্তব্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করাই বর্তমানে সংগঠন-কর্মের মূলবস্তু বলে গণ্য করা হয়।

সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া[63]**ঃ** সংগঠন হল একটা যন্ত্র। সংগঠন গড়ে তোলার মানে হল এই যন্ত্রটাকে কাজে নিযুক্ত করা। কিন্তু যন্ত্র হলেও এটা অনেকটা যেন অর্কেস্ট্রা অর্থাৎ বিচিত্র বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের একটা সমন্বয়-এর মতো। তাতে প্রতিটি পৃথক বাদ্যযন্ত্রের নিজস্ব এবং সুশৃংখল ভূমিকা এমনভাবে নির্দিষ্ট থাকে যে, তা পরস্পরের সুরের সাথে মিলে মিশে একটা সুনির্দিষ্ট মূল সুরের জন্ম দেয়। তাই সংগঠন গড়ে তুলতে হলে পর পর যে পদক্ষেপগুলি প্রয়োজন হয় তা হলঃ

১. উদ্দেশ্য স্থির করা[64]**ঃ** প্রথমেই, সংগঠনটি কি উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হবে, অর্থাৎ কারবারের উদ্দেশ্য কি হবে তা স্থির করতে হয়। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য এবং কোন্‌টি গৌণ, কোন্‌টি আশু বা স্বল্প মেয়াদী এবং কোন্‌টি দীর্ঘ মেয়াদী তাও স্থির করে নিতে হয়।

62. Meaning of Organisation
63. Process and principles of organisation.
64. Determination of objectives.

২. কার্যাবলী স্থির করা[65]**ঃ** কারবারের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি অনুযায়ী তার সমগ্র কার্যাবলী স্থির করতে হয় এবং তার মধ্যে কোনটি প্রধান ও কোনটি সহায়ক তা-ও স্থির করতে হয়। যেমন একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান হলে, তার প্রধান কাজগুলি হবে—উৎপাদন. (কাঁচামাল ও উপকরণ) ক্রয়, বিক্রয়, অর্থসংস্থান, শ্রমিক-কর্মী নিয়োগ, বরখাস্ত প্রভৃতি। আবার এই প্রধান কাজগুলি সম্পাদনের জন্য অন্যান্য যে-সব কাজ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হল হিসাব রাখা, গুদাম রাখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া, কারখানার যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কারিগরী কাজকর্ম (ইঞ্জিনীয়ারিং) ইত্যাদি।

৩. কাজের ভাগ করা[66]**ঃ** পরবর্তী ধাপ হল, কাজের এবং কাজের ধরনের ও উদ্দেশ্যের মিল অনুযায়ী একই প্রকারের প্রধান কাজগুলিকে ধনবল ও জনবল অনুসারে একত্রিত করা ও এইভাবে পৃথক পৃথক কাজের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করা। একই বিভাগের সহায়ক কাজগুলিকে আবার ওই বিভাগের এক-একটি সেকশন বা অংশে পরিণত করতে হয়। এইভাবে সংগঠনের মধ্যে প্রধান কাজগুলির জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও সহায়ক কাজগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেকশন প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এর ফলে সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে কাজের নানান স্তর বা পর্যায় সৃষ্টি হয়। এর নাম বিভাগীয়-করণ[67]।

৪. প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য নির্দেশ করা[68]**ঃ** এর পরের কাজ হল প্রতিটি বিভাগ ও সেকশনের অন্তর্গত উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা অনুসারে সমস্ত ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম স্থির করা। ফলে, কাজটা যে সম্পাদিত হবে তার সুনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়, কাজের গতিবেগ বাড়ে এবং প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ সংগঠনে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৫. ভারার্পণ করা[69]**ঃ** ভারার্পণ কথাটার অর্থ হল কর্তব্যপালনের উপযুক্ত কর্তৃত্ব অর্থাৎ, কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ। সমগ্র সংগঠনটির বা প্রতিষ্ঠানটির কার্যনির্বাহের সম্পূর্ণ ভার থাকে তার মুখ্য কার্যনির্বাহকের উপর। উপর তলা থেকে নিচ পর্যন্ত সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের, বিভাগের এবং সেকশনের সমগ্র কর্মীবাহিনীর সাহায্যে মুখ্য কার্যনির্বাহক সে কর্তব্য পালন করে থাকেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মুখ্য কার্যনির্বাহক কর্তব্যটি নানা অংশে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বা কার্যনির্বাহকদের উপর ন্যস্ত হয়। বিভাগীয় প্রধানের কর্তব্যটি আবার বিভক্ত হয়ে যায় সেকশনগুলির ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মীদের মধ্যে, ইত্যাদি। উপর থেকে কর্তব্য ও কর্তৃত্বের এই ভারার্পণের ফলে, যিনি ভারার্পণ করলেন অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে, যাঁকে ভারার্পণ করা হল তিনি, অর্থাৎ অধস্তন কর্মী তাঁর কাজের জন্য দায়ী হন। ফলে সমগ্র সংগঠনটি দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে ওঠে।

সংগঠনের কয়েকটি মূল নীতি[70] **ঃ** সংগঠনের সাফল্য অর্জনের জন্য যে সব মূলনীতির ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তুলতে ও পরিচালনা করতে হয় তার কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. উদ্দেশ্যের ঐক্য[71] **ঃ** প্রত্যেক সংগঠনের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগ, সেকশন এবং কর্মীদের ব্যক্তিগত স্তরেও কাজের আপন আপন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। কিন্তু সে-সব উদ্দেশ্য পরম্পরাকে এক সূত্রে গেঁথে, পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্যের অনুসারী করে তোলা চাই। তবেই সংগঠনটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

২. কাজের বিভাগ[72] **ঃ** সংগঠনের উদ্দেশ্য যাতে কার্যকর ও সুনিশ্চিতভাবে সিদ্ধ

65. Determination of activities. 66. Grouping of activities.
67. Departmentalisation.
68. Allocation of duties to individuals. 69. Delegation of authority.
70. Principles of organisation. 71. Principle of unity of objective.
72. Principle of division of work.

হয়, সেজন্য বিশেষায়ণের[৭৩] ভিত্তিতে সংগঠনের যাবতীয় কাজকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে হবে ও পরস্পর সুশৃঙ্খলভাবে তা বিন্যাস করতে হবে।

৩. **তদারকীর পরিধি[৭৪]ঃ** কাজের ধরন অনুযায়ী একজন ঊর্ধ্বতন কর্মীর পক্ষে কার্যকর ও সুদক্ষভাবে যতজন অধস্তন কর্মীর কাজ তদারক করা সম্ভব সে অনুযায়ী এক একটি বিভাগের কাজের পরিধি স্থির করা প্রয়োজন।

৪. **উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কর্তৃত্বের শৃঙ্খল[৭৫]ঃ** সংগঠনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতিটি অধস্তন কর্মীকে একটি পরম্পরা কর্তৃত্বের একটি আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খলে বেঁধে দিতে হয়। প্রতিটি অধস্তন কর্মীকে জানতে হবে তাঁর অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে, এবং তাঁর নিজের কর্তৃত্ব ক্ষমতার বা এক্তিয়ারের বাইরে, সংগঠনের পলিসিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কার কাছে যেতে হবে।

৫. **কর্তৃত্বের ঐক্য[৭৬]ঃ** প্রতিষ্ঠানের এক একটি ক্ষেত্রে নিযুক্ত অধস্তন কর্মীদের একটি মাত্র অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থাকা উচিত। তাঁরা শুধু তাঁরই নির্দেশ পালন করবেন। তা না হলে, অর্থাৎ এক একটি বিভাগে একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থাকলে তাদের পরস্পরের নির্দেশের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিতে পারে এবং কর্মীদেরও দায়িত্ব স্থির করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৬. **কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সমতা[৭৭]ঃ** ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দেখতে হবে যে অধস্তন কর্মীদের মধ্যে যেন তাদের দায়িত্বের সমানুপাতে কর্তৃত্বও বণ্টন করা হয়। তা না হলে, উপযুক্ত কর্তৃত্বের অভাবে দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়বে কিংবা দায়িত্বের তুলনায় বেশি কর্তৃত্বক্ষমতা দিলে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

৭. **ধারাবাহিকতা[৭৮]ঃ** পরিবর্তনশীল কারবারী জগতের নানা পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব ও কাজের ধারাবাহিকতা যাতে বজায় থাকে সেজন্য ভাবী ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপনা কর্মীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য পুনর্নির্ধারণ, পরিকল্পনার ও কর্মসূচির প্রয়োজনীয় রদবদল, সাংগঠনিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৮. **ভারসাম্য[৭৯] ঃ** কার্যকরভাবে সংগঠনের কাজগুলি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভাগ করে দিতে গিয়ে, কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ[৮০] ও বিকেন্দ্রীকরণ[৮১] এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যথাসম্ভব ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত এবং বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী প্রয়োজনের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা প্রয়োজন। এজন্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা[৮২] ও বাস্তব বিচার চাই।

৯. **দক্ষতা ও ব্যয়সংকোচ[৮৩] ঃ** সামগ্রিক বিচারে সংগঠনের কাঠামোটি সুদক্ষ এবং ব্যয়সংকোচশীল হওয়াও চাই। তা না হলে তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

সংগঠনের গুরুত্ব বা তাৎপর্য[৮৪] ঃ সংগঠনের গুরুত্ব বা তাৎপর্য অশেষ। সংগঠন কোনও প্রাণহীন কাঠামো মাত্র নয়। মানুষ নিয়ে গঠিত সজীব ও সক্রিয় যন্ত্রটির সাহায্যে কারবারের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কারবারের নানাবিধ কার্যাবলী পরিচালনা, সংযোজন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

ক. সংগঠনের মধ্য দিয়েই কারবারের লোকবল ও ধনবলের সম্যক ব্যবহার সম্ভব

73. Specialisation. 74. Principle of spone of supervision.
75. Principle of scalar chain of Authority or chain of command.
76. Principle of Unity of Command.
77. Principle of Parity of Authority and Responsibility.
78. Principle of Continuity. 79. Principle of Balance.
80. Centralisation. 81. Decentralisation.
82. Analytical study. 83. Principle of Efficiency and Economy.
84. Importance or significance of organisation.

হয়[৮৫] এবং কারবারের জনশক্তির সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা কার্যকর হয়ে ওঠে। ফলে ন্যূনতম প্রচেষ্টায় সর্বাধিক ফল লাভ ঘটে। কারণ, প্রতিটি কর্মীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হয়; কাজ ও যোগ্যতা বিচারে ঠিক কাজে ঠিক ব্যক্তির নিয়োগের দ্বারা বিশেষায়ণের সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণ করা হয়; ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে কর্মীদের সংযোগ স্থাপনের দ্বারা সময় ও শ্রমের অপচয় ও অব্যবহার দূর করা হয়; এবং কর্মীদের ও বিভাগগুলির পরস্পরের কাজের সংযোজনা ও সমন্বয় সাধনের দ্বারা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কাজে সময় ও শ্রম সংক্ষেপ করতে সক্ষম হন।

খ. সংগঠনই কারবারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং বৈচিত্র্যকরণ[৮৬] সম্ভব করে তোলে এবং বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করে। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কর্তব্য, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও দায়িত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা সাংগঠনিক কাঠামোটি নিয়োগকর্তা বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে যে কার্যকর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে তার মধ্য দিয়ে একদিকে উপর থেকে নিচে ধাপে ধাপে আদেশ, নির্দেশ ও সিদ্ধান্তগুলি পৌঁছায় এবং অন্যদিকে নিচ থেকে উপরে কাজের বিবরণ, অভিযোগ এবং অসুবিধাগুলির খবর পৌঁছায়। এই দো-তরফা আদানপ্রদান ব্যবস্থা[৮৭] সংগঠনকে জীবন্ত, সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলে।

গ. সংগঠনই সুনির্দিষ্ট কর্তব্যের পরিধির মধ্যে কর্মীদের স্বাধীন সৃজনশীল ভাবনা ও উদ্যোগের সুযোগ[৮৮] সৃষ্টি করে এবং কর্মীদের আপন আপন কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করে তোলে।

ঘ. উপযুক্ত সংগঠনই প্রযুক্তি বিদ্যাগত অর্থাৎ কারিগরী উন্নতিগুলির কাম্য ব্যবহার[৮৯] সম্ভব করে তোলে।

ব্যবস্থাপনা (MANAGEMENT)

'ব্যবস্থাপনা' শব্দটির অর্থ ঃ কারবারের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করাই হল ব্যবস্থাপনা। এটি একটি ধারণা মাত্র। কারবারী প্রতিষ্ঠান অথবা যে কোনও সংস্থার নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্য তার যাবতীয় কাজ মানুষ অর্থাৎ তার কর্মীদের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যটি যাতে সুনিশ্চিত-ভাবে সাধিত হতে পারে সেজন্য, কর্মীদের কর্মপ্রচেষ্টার অর্থাৎ মানবিক প্রচেষ্টাগুলির নির্দেশনা[৯০], পরিচালনা[৯১] ও নিয়ন্ত্রণ[৯২] এবং সে কর্মপ্রচেষ্টাগুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন দ্বারা তা ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যে বুদ্ধি-কৌশল বা কার্যাবলীর[৯৩] দ্বারা তা সম্ভব হয় ব্যবস্থাপনা হল তাই। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপনা হল সেই বুদ্ধি-কৌশল সমৃদ্ধ কর্ম বা কার্যাবলী যার দ্বারা কারবারের বা যে কোনও সংস্থার নির্ধারিত লক্ষ্য সাধনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনে নিযুক্ত কর্মীদের কর্মপ্রচেষ্টাগুলিকে পরি-চালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সংবদ্ধ[৯৪] করা হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণাটা হল আসলে একটা নির্দিষ্ট ক্রিয়াগত ধারণা[৯৫]। অতএব একথাও বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হল এমন একটি কার্য প্রক্রিয়া[৯৬] যার দ্বারা একটি সংস্থা বা সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ (কার্যনির্বাহকগণ[৯৭] বা ব্যবস্থাপকগণ[৯৮]) অন্যান্য ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টার মারফৎ সংস্থার কাজগুলি করিয়ে নেন।

ব্যবস্থাপনার কাজঃ ব্যবস্থাপনার জটিল কাজগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা কঠিন হলেও, তা সংক্ষেপে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,—(১) সংগঠনের কর্মসূচীর

---

85. Proper use of manpower and resources.
86. Growth, expansion and diversification.
87. Two way communication.
88. Provides opportunities for independent creative thinking and initiative.
89. Optimum use of technological developments. 90. Guidance.
91. Direction. 92. Control. 93. Skill. 94. Integrated.
95. Concept. 96. Process. 97. Executives, 98. Managers.

পরিকল্পনা রচনা করা[99]; (২) কর্মসূচীটি রূপায়ণের জন্য কাজগুলি সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা[100]; (৩) কর্মীদের কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালনা করা[101]; এবং (৪) তা নিয়ন্ত্রণ করা[102]। কারবারী, সামাজিক, ধর্মীয় কিংবা অন্য যে কোনও সংস্থাই হোক না কেন, আকারে তা ছোট বা বড় যাই হোক, এবং আইনগত দিক দিয়ে তার মালিকানার রূপটি একমালিকী কারবার কিংবা যৌথমূলধনী কোম্পানি প্রভৃতি যাই হোক এবং তা সরকারী কিংবা বেসরকারী যে ধরনের সংস্থাই হোক না কেন, ব্যবস্থাপনার এই কাজগুলি সর্বত্রই একরূপ। কর্তব্যভার অনুযায়ী ব্যবস্থাপনারও একাধিক স্তর বিভাগ থাকে। সাধারণত, প্রথম দুটি কাজের ভার থাকে ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপকদের উপর, বাকিগুলির ভার থাকে নিচের স্তরের ব্যবস্থাপকদের উপর।

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বা তাৎপর্য : ১. যে কোনও কারবারী প্রতিষ্ঠানের উপাদান হ'ল এই সাতটি : উপকরণ, যন্ত্রপাতি-হাতিয়ার, মানুষ, অর্থ, কাজের পদ্ধতি, বাজার ও ব্যবস্থাপনা। এই সাতটি উপাদানের মধ্যে ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। ব্যবস্থাপনাই যে কোনও কারবারে কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ, অন্যান্য উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার থাকে ব্যবস্থাপনার উপরেই। এ কারণে কারবারের সাফল্য অসাফল্যের দায় শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার উপরেই পড়ে।

২. গোটা সংগঠন বা সংস্থাটিকে যদি মানব দেহ বলে কল্পনা করা হয়, তাহলে ব্যবস্থাপনাকে তার মস্তিষ্ক বলে গণ্য করতে হয়। মস্তিষ্ক বাদ দিলে যেমন বাকি দেহটা শুধু হাড়-মাংসের একটা জড় পিণ্ডে পরিণত হয়, ব্যবস্থাপনাহীন সংস্থাও সেরূপ। ব্যবস্থাপনাই কারবারী সংস্থাটিকে সজীব ও সক্রিয় করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার সাথে সংস্থার কার্যাবলীর সকল দিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক : সংগঠন অর্থাৎ সংগঠন গড়ে তোলা হল ব্যবস্থাপনার চারটি মুখ্য কাজের একটি। সুতরাং, ব্যবস্থাপনার অর্থ সংগঠনের তুলনায় বেশি ব্যাপক। কারবারী সংস্থার দৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করার ভার থাকে ব্যবস্থাপনার উপর। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাদের উপর থাকে তাদের সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থেকেই সাংগঠনিক কাঠামোটি[103] রূপ নেয়। অতএব এদিক থেকে বিচার করলে, সাংগঠনিক কাঠামোটি হল আসলে সংস্থার ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন পদের বা ঐসব পদে নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা কর্মীদের কর্তব্য, ক্ষমতা ও দায়ের এবং সাংগঠনিক কর্মের ক্ষমতাভার অর্পণ বা ভারার্পণ মারফৎ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমষ্টি। অর্থাৎ প্রকৃত-পক্ষে সংগঠনের কাঠামোটি হল ব্যবস্থাপনা কর্মীদের কাঠামো মাত্র।

কিন্তু কাজ হিসাবে, সংগঠন গড়ে তোলার কাজটি ব্যবস্থাপনার সকল কাজের মধ্যে সর্বপ্রধান। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত না হলে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজগুলির শক্তি লোপ পায়। এজন্য ব্যবস্থাপনাকে একটা গোটা দেহ, পরিকল্পনাকে তার মস্তিষ্ক, সংগঠনকে তার স্নায়ুমণ্ডলী[104], পরিচালনাকে তার শ্বাসযন্ত্র এবং নিয়ন্ত্রণকে তার মনের সাথে তুলনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা হল একটি বর্গ* আর সংগঠন হল তার একটি প্রজাতি।**

প্রশাসন (ADMINISTRATION)

'প্রশাসন' শব্দটির অর্থ : অলিভার সেলডনের মতে, প্রশাসনের কাজ হল সংগঠনের কর্মনীতি বা পলিসি স্থির করা, আর্থিক সংস্থান, উৎপাদন ও বন্টন বা বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সংযোজনার ব্যবস্থা করা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর চৌহদ্দি স্থির করা। ফ্লোরেন্স, টীড, স্প্রিগেল, ল্যানস্‌বার্গ প্রমুখও এই মত পোষণ করেন। এ'দের মতে, প্রশাসনের কাজ হল মূলতঃ সংগঠনের কর্মনীতি নির্ধারণ করা অর্থাৎ পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক এই দু'টি কাজ সম্পাদন করা।

---

99. Planning. 100. Organisation. 101. Direction. 102. Control.
103. Organisation structure. 104. Nerve system.
* Genus. ** Species.

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাঃ তাঁদের আরও অভিমত হল, প্রশাসন যে কর্মনীতি নির্ধারণ করে, ব্যবস্থাপনার কাজ হল তা বাস্তবে রূপদান করা, কাজে পরিণত করা। অর্থাৎ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, এই দুটি কাজ হল ব্যবস্থাপনার। কিন্তু বর্তমানে, এই পুরাতন অভিমত, অর্থাৎ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য করাকে অনেকেই সমর্থন করেন না। ফেয়লের অভিমত এই যে, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানা অর্থ-হীন ও বিভ্রান্তিকর। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা রচনা, সংগঠন গড়ে তোলা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা, এই চারিটিই হল ব্যবস্থাপনার কাজ। অর্থাৎ প্রশাসন ব্যবস্থাপনা থেকে আলাদা কিছু নয়। তবে, সাধারণত দেখা যায়, কারবারী সংস্থাগুলিতে যে কাজগুলিকে ব্যবস্থাপনা বলে গণ্য করা হয়, সরকারী ও অ-কারবারী সংস্থাগুলিতে সেই কাজগুলিকেই প্রশাসন বলে গণ্য করা হয়। কারবারী সংস্থায় এই কাজগুলি যারা করেন তাঁদের বলা হয় "ব্যবস্থাপক", আর সরকারী ও অ-কারবারী সংস্থায় এই কাজগুলি যাঁদের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাঁদের বলা হয় "প্রশাসক"।

নিয়ন্ত্রণ (CONTROL)

'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটির অর্থঃ নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রণ কার্য হল ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত অন্যতম কাজ। 'নিয়ন্ত্রণ' বলতে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা বোঝায় যার দ্বারা সংগঠনটির কাজ যেন পরিকল্পনা অর্থাৎ নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী চলে ও নির্ধারিত লক্ষ্যটি যেন পূর্ণ হয় তা সুনিশ্চিত করা হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত কাজ হিসাবে নিয়ন্ত্রণের কাজটি পরিকল্পনার কাজের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বা তাৎপর্যঃ ১. ফেয়ল বলেছেন, যে কোনও সংস্থায় নিয়ন্ত্রণের কাজ হল গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে, যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে-অনুযায়ী এবং নির্ধারিত নীতিগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে সবকিছু ঠিকমত চলেছে কিনা তা যাচাই করে দেখা। এর উদ্দেশ্য হল ভুলত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি ধরা এবং তার প্রতিকার করা ও ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা। এজন্য নিয়ন্ত্রণ হল ভবিষ্যতমুখী কাজ।

২. সুতরাং সংগঠনের কাজটি যে গুণগত মানের এবং নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্য থাকে নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তা সুনিশ্চিত হয়। অতএব নিয়ন্ত্রণকে ব্যবস্থাপনার সারবস্তুও বলা যায়। ব্রেচ্-এর মতে, নিয়ন্ত্রণ একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়াও বটে। ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত অন্যান্য কাজ যেমন চলতে থাকবে তেমনি সাথে সাথে তা যথার্থভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা এবং না হলে কেন হচ্ছে না সর্বক্ষণ তা অনু-সন্ধান ও তার প্রতিকারের ও পুনরাবৃত্তি বন্ধের ব্যবস্থা করাই নিয়ন্ত্রণের কাজ। সুতরাং নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বা তাৎপর্য সর্মাধক।

সংযোজনা (CO-ORDINATION)

'সংযোজনা' শব্দটির অর্থঃ যে কোনও সংস্থায় একই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধনের জন্য পরিচালিত একদল কর্মীর বিভিন্ন কাজ কর্মগুলিকে একসূত্রে গাঁথা[105], তাদের প্রচেষ্টা ও কাজগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা বা সেগুলিকে সংমিশ্রিত করার নামই হল সংযোজনা। এই হ'ল সম্মিলিত লক্ষ্য লাভের জন্য কাজের ঐক্য স্থাপনের[106] উদ্দেশ্যে কর্মীদলের দল-গত প্রচেষ্টার সুশৃংখল ব্যবস্থা। সাধারণত, সংযোজনা বা সংযোজনার কাজকে ব্যবস্থানার অন্তর্গত অন্যতম কাজ বলে গণ্য করা হলেও, বর্তমানে কিন্তু এ কাজটিকে ব্যবস্থাপনার সারবস্তু[107] বলে গণ্য করা হয়।

সংযোজনার গুরুত্ব বা তাৎপর্যঃ ১. সংযোজনার ধারণাটি হল ব্যবস্থাপনা কর্মে একটি সর্বাত্মক ধারণা[108]। এ হ'ল, পরিকল্পনা, সংগঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সম্মিলিত ফল। নির্দিষ্ট লক্ষ্যলাভে কর্মীদের যে মোট পরিমাণ ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়, একমাত্র সংযোজনার মারফতই ব্যবস্থাপনার পক্ষে তার চেয়ে বেশি ফললাভ সম্ভব হয়ে ওঠে।

২. সংযোজনা আর সহযোগিতা এক জিনিস নয়। সহযোগিতা হল কোনও একটি

---

105. Integrate. 106. Unity of action. 107. Essence. 108. Overall concept.

কাজে একাধিক ব্যক্তির শুধু সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ। আর সংযোজনা হল সঠিক সময়ে, সঠিক পরিচালনায় সুচিন্তিত কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের মারফৎ প্রয়োজনীয় পরিমাণে কর্মীদলের দলগত কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োগ। এই ধরনের সংমিশ্রিত এবং সুসংবদ্ধ দলগত প্রচেষ্টা "টিম-ওয়ার্কে" পরিণত হয়ে সৃজনশীল শক্তিরূপে কাজ করে।

৩. সংযোজনা এমন একটি কাজ যা সংস্থার ভিতরে ও বাইরে যাবতীয় কাজ ও প্রচেষ্টার সাথেই মেশানো যায়। সংস্থার ভিতরে ব্যক্তিগত, সেকশনগত, বিভাগগত কাজগুলি একই উদ্দেশ্য লাভের জন্য যেমন সংযোজিত করতে হয়, তেমনি সংস্থার বাইরেও প্রতি-যোগীদের, কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহকারীদের এবং খরিদ্দারদের কাজের সাথে, সরকারের নানা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার সাথে, কারিগরী অগ্রগতির সাথে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অবস্থার সাথে, ভোগকারী, কর্মীবৃন্দ এবং মালিকপক্ষের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের সাথে নিজের কাজের সামঞ্জস্যবিধান অর্থাৎ সংযোজনা করে সংস্থাকে চলতে হয়। এই কারণে, বলা যায়, ব্যবস্থাপনা কর্মের মূল লক্ষ্যই হল সংস্থার কাজেকর্মে ভিতরে ও বাহিরে সংযোজনা করা।

ভারার্পণ (DELEGATION)

'ভারার্পণ' শব্দটির অর্থ ঃ কারবারী সংস্থার কার্যনির্বাহী ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্বভার মুখ্য কার্যনির্বাহকের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু মুখ্য কার্যনির্বাহক মাত্র একজন ব্যক্তি। তাঁর পক্ষে এককভাবে সংস্থার সকল কর্মীর কাজের তদারক করা অসম্ভব। এই কারণে সংস্থার বিভিন্ন রকম কাজের বিশ্লেষণ করে, তা ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের হাতে দিতে হয়। বিভাগের কাজ আবার বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করা হয়। এর সাথে মুখ্য কার্য-নির্বাহকের কার্যনির্বাহী ক্ষমতার, কর্তব্যের ও দায়িত্বের অংশ বিভাগীয় ব্যবস্থাপক বা বিভাগীয় ম্যানেজারদের মধ্যে বণ্টিত হয়; আবার বিভাগীয় কার্যনির্বাহকের কার্যনির্বাহী ক্ষমতার অংশ কর্তব্য ও দায়িত্ব সেকশনের ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহক বা সেকশন-প্রধানদের উপর অর্পিত হয়। এইভাবে, সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহক কর্তৃক তাঁর কার্যনির্বাহী ক্ষমতার কর্তব্যের ও দায়িত্বের অংশ তাঁর অধীন পদাধিকারীদের উপর ন্যস্ত করাকে ভারার্পণ বলে। তবে এই ভারার্পণ সত্ত্বেও, মুখ্য কার্যনির্বাহক তাঁর নিজের কর্তব্যের অংশটুকু সম্পাদনের জন্য এবং অধীনস্থ পদাধিকারীরা যাতে সন্তোষজনকভাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাঁদের কাজের হিসাব-নিকাশ চাওয়ার জন্য কার্যনির্বাহী ক্ষমতার কিছুটা নিজের হাতে সংরক্ষিত রাখেন। অধস্তন কর্মীদের কাজের হিসাব-নিকাশ চাওয়ার এই ক্ষমতা কিন্তু উপর থেকে নিচে বণ্টিত হয় না। সংগঠন-কাঠামোতে এই ক্ষমতা সর্বদাই ঊর্ধ্বগামী হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রতি স্তরে নিম্নতর পদাধিকারীরা ঊর্ধ্বতর পদাধিকারীর কাছে দায়ী থাকে। কৈফিয়ত বা হিসাবনিকাশ দাবি করার এই ক্ষমতার দরুনই মুখ্য কার্যনির্বাহক সমগ্র সংগঠনটির যাবতীয় কাজকর্মের উপর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।

ভারার্পণের গুরুত্ব বা তাৎপর্য ঃ ১. কারবারী সংস্থার সংগঠন গড়ে তুলতে গেলে যেমন তার কাজগুলি কতকগুলি কার্যনির্বাহী পদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হয়, তেমনি আবার ঐ কার্যনির্বাহী পদগুলি পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনেও সংবদ্ধ করতে হয়। ভারার্পণ হল সিমেন্টের মতো, আনুষ্ঠানিক সংগঠনটি গেঁথে তোলার অপরিহার্য মশলা।

২. ভারার্পণ ব্যবস্থার ফলেই ব্যবস্থাপকরা নিজেদের কাজের বোঝা অন্যের উপর অর্পণ করে ব্যবস্থাপনার উচ্চতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দিতে পারেন।

কারবারের পঠন-পাঠন (STUDY OF BUSINESS)

যন্ত্রশিল্পভিত্তিক বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার আগে সমাজে কারবার বলতে প্রধান বেচাকেনার সরল ও সচ্ছল বাণিজ্যিক কর্যকলাপই বোঝাত।

কিন্তু আধুনিক কালে যন্ত্রশিল্পভিত্তিক বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার, বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেসবের সফল বাণিজ্যিক প্রয়োগ, সরকারী

নানা বিধিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ—এসকল মিলে কারবারকে যেমন ব্যাপক তেমন জটিল করে তুলেছে এবং শিক্ষার বিস্তার এর গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে তুলেছে। আজ সমাজের একটা বড়ো অংশ জীবিকার জন্য কারবারের উপর নির্ভরশীল। এই কারণে বর্তমানকালে কারবার পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন-গবেষণার আনুষ্ঠানিক বিষয়বস্তুতেও পরিণত হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান জটিলতার দরুন আজ আর কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে কারবারে সাফল্যের আশা করা যায় না। সে কারণেই আনুষ্ঠানিক অধ্যয়নের বিষয়রূপে কারবারের গুরুত্ব বেড়েছে। তা না হলে কারবারের সামগ্রিক চরিত্র এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে কারবারী কার্যকলাপের ঘনিষ্ঠ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সামগ্রিক উপলব্ধি জন্মায় না এবং আধুনিক কারবারের প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানও বাকি থেকে যায়। তাতে জীবিকারূপে কারবারে সাফল্য অর্জন কঠিন হয়। তবে, কারবার একটি ব্যবহারিক বিষয় বলে, শুধু তত্ত্বগত নয়, হাতে কলমে কাজ শেখাও[109] কারবার সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক পঠন-পাঠনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য করা উচিত।

কারবারের সাথে অন্যান্য বিদ্যার সম্পর্ক: বিদ্যা হিসাবে কারবারের সাথে অর্থবিদ্যার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কারণ সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ ব্যবহার সংক্রান্ত মানুষের যাবতীয় কার্যাবলী অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। আর কারবারের বিষয়বস্তু হল সম্পদ অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বিনিময়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত মানুষের কার্যাবলী। অর্থবিদ্যার গণ্ডী অনেক বড়ো, তুলনায় কারবারের গণ্ডী অনেক সংকীর্ণ। কিন্তু সংকীর্ণ হলেও, তার গভীরতা অনেক। অর্থনীতির মত কারবার তত্ত্ব-সর্বস্ব নয়। কারবারের কাজ মূলত বাস্তবজীবনকে নিয়ে। মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সেবাকর্মের সরবরাহ করার জন্য মানুষের জীবনের অতি বাস্তব দিক নিয়েই কারবারের কাজ। এজন্য অনেকের মতে কারবার হ'ল সমাজবিজ্ঞানের একটি অতি গভীর, অতি কার্যকারিতাসম্পন্ন এবং বাস্তব-কঠোর শাখা।

আধুনিক কারবারের কার্যকলাপ তার ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষের দ্বারাই পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনাই কারবারের সবচেয়ে সক্রিয় উপাদান। এই কারণে অনেকে মনে করেন, কারবার অধ্যয়ন করতে হলে, তার ব্যবস্থাপনার দিকটিই বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতে হয়।

কারবার অধ্যয়ন করতে গেলে যেমন অর্থনৈতিক বিধিগুলি জানার জন্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিবেশটি বোঝার জন্য অর্থনীতি পড়তে হয়, তেমনি খরিদ্দারবর্গ বা ভোগকারীরা এবং শ্রমিক-কর্মচারী প্রভৃতিরা সমাজবদ্ধ মানুষের আলাদা আলাদা গোষ্ঠীরূপে কিরূপ আচার আচরণ করে থাকে তা বোঝার জন্য সমাজবিজ্ঞান থেকে মানুষের গোষ্ঠীগত আচার-আচরণ[110] জানতে হয়। খরিদ্দারবর্গ এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য মনস্তত্ত্ব বিদ্যার[111] সাহায্য নিতে হয়। রাজনৈতিক পরিবেশটি বোঝার জন্য কারবারে রাষ্ট্রনীতিবিদ্যার সাহায্যও লাগে। এ সকল আচরণমূলক বিজ্ঞান ছাড়া কারবারে প্রয়োজন হয় হিসাবরক্ষণ[112] বিদ্যার এবং পরিসংখ্যান তত্ত্বেরও[113]।

109. Practical Training. 110. Group Behaviour. 111. Psychology.
112. Accountancy. 113. Statistics.

২

অর্থনীতিক ব্যবস্থা এবং কারবারের আয়তন
ECONOMIC SYSTEM AND SIZE OF BUSINESS

অর্থনীতিক ব্যবস্থাঃ দেশে দেশে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি কারবারী কার্য-কলাপগুলি কতকগুলি সুনির্দিষ্ট আইনগত ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা রীতিনীতির দ্বারা রচিত একটি বিশেষ পরিবেশের বা কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত ও সে-সবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই পরিবেশ বা কাঠামোটিই এক কথায় অর্থনীতিক ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

বর্তমান যুগে পৃথিবীতে মূলতঃ দুই প্রকারের অর্থনীতিক ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। যথা,—ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। এছাড়া মিশ্র অর্থনীতি নামে আরেক প্রকারের অর্থ-নীতিক ব্যবস্থা দেখা যায়। এটি প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্রেরই একটি সংশোধিত রূপ, তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ কোন ব্যবস্থা নয়।

ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলঃ (১) এই ব্যবস্থায় জমি, খনি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদনের উপায়গুলির সকলই ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তা ভোগদখলের অধিকার আইনের দ্বারা স্বীকার করা হয়। (২) এই ব্যবস্থায় যে কোন ব্যক্তির ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনার অবাধ অধিকার রাষ্ট্র মেনে নেয়। একে বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা বলে। বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর রাষ্ট্রের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা অন্যায় বলে গণ্য করা হয়। (৩) কেবলমাত্র বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকল অর্থনীতিক ও কারবারী কার্যকলাপ পরিচালিত হয় এবং মুনাফা উপার্জনই তাদের সর্বপ্রধান লক্ষ্য বলে ও ন্যায়সঙ্গত বলে গণ্য করা হয়। (৪) মূল্যব্যবস্থা, বাজার, পণ্যবন্টন, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির উপর কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলঃ (১) যাবতীয় উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ করে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়। (২) সুনির্দিষ্ট অর্থনীতিক পরিকল্পনা অনুসারে উপকরণসমূহের বিলি-বন্টন, দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বন্টন ঘটে। (৩) মূল্যব্যবস্থা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। (৪) সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য বিলোপ করে, 'প্রত্যেকে তার সাধ্যমত পরিশ্রম করবে এবং প্রত্যেকে তার পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক পাবে'—এই নীতি অনুসারে আয় বন্টন করা হয়।

মিশ্র অর্থনীতি (MIXED ECONOMY)

ব্যক্তিগত মালিকানায় কারবারী কার্যকলাপের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কারবার ও কারবারী কার্যকলাপের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-নীতি বলা হয়। এটি মূলতঃ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি নূতন রূপ। এই ব্যবস্থায় কতকগুলি অর্থনীতিক কাজকর্মের ভার বাজার বা মূল্যব্যবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হয় আর বাকি কতকগুলি অর্থনীতিক কাজকর্ম সরকারী নীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং প্রয়োজনীয় স্থলে সরকারের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এজন্য সরকারী আইন দ্বারা উৎপাদন, বিনিয়োগ, ভোগ ইত্যাদি কার্যাবলী যেমন নিয়ন্ত্রিত হয় তেমনি প্রয়োজনবোধে নানারূপ ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প সরকার কর্তৃক পরিচালিত হতে পারে। বর্তমানে এরূপ অনেক দেশেই অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাহায্যে মিশ্র অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে।

মিশ্র অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইঃ (১) উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুরুষানুক্রমে ভোগদখলের অধিকার এতে বজায় থাকে। তবে সরকার কর্তৃক তা খানিকটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। (২) ব্যবসা বাণিজ্যে ও শিল্পে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যোগের স্বাধীনতা এতে বজায় থাকলেও তা সরকারী আইন দ্বারা কমবেশি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। (৩) মূল্য বা বাজার ব্যবস্থা এতে বজায় থাকে, তবে তা আংশিকভাবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। (৪) ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে সরকারের প্রবেশ ও সরকারী কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে পারে এবং প্রয়োজন-বোধে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের কোন কোন ক্ষেত্র সরকারের জন্য সংরক্ষিত হতে পারে। **ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের যে ক্ষেত্র সরকার বা রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত থাকে তাকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বা পাবলিক সেক্টর বলে। আর ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের যে অংশে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থাকে তাকে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র বা প্রাইভেট সেক্টর বলে।**

ভারতের মিশ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা (THE MIXED ECONOMIC SYSTEM IN INDIA)

বৈশিষ্ট্যসমূহঃ ১. সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সহাবস্থানঃ ভারতের শিল্পক্ষেত্র সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারী এই দুই অংশে বিভক্ত এবং ১৯৫১ সালের শিল্প (নিয়ন্ত্রণ) আইন, এবং ১৯৭০ সালের লাইসেন্সিং পলিসী দ্বারা ১৯৫৬ সালের শিল্প-নীতি সংক্রান্ত ঘোষণাটি সংশোধিত হয়েছে এবং তাদের অন্তর্গত শিল্পসমূহের নিম্নরূপ পুনর্বিন্যাস ঘটেছে।

ক. ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অনুসারে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রভৃতি ১৭টি শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে সকল নূতন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত হবে। তবে বর্তমানে যে সকল ব্যক্তিগত মালিকানায় কারবার রয়েছে, রাষ্ট্র তাদের সম্প্রসারণের অনুমতি দিতে পারে।

খ. অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ মিশ্রিত ধাতু, পরিবহণ প্রভৃতি ১২টি শিল্পে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে রাষ্ট্র এবং বেসরকারী উদ্যোগ, উভয়েরই অধিকার থাকবে। রাষ্ট্র ক্রমেই অধিক পরিমাণে এই সকল শিল্পে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেও বেসরকারী সংস্থা-সমূহকেও এক্ষেত্রে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহ দেওয়া হবে। অতি সম্প্রতি এবিষয়েও কিছু পরিবর্তন করে বেসরকারী ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন লৌহ ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

গ. এই দুই শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় শিল্পের ও সম্প্রসারণের সকল ভার বেসরকারী উদ্যোগের উপরই ন্যস্ত থাকবে। এই সকল বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ করবে, উপযুক্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দেবে এবং সংরক্ষণ নীতির আবশ্যকীয় পরিবর্তন ও অন্যান্যভাবে সহায়তা করবে এবং শিল্পক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে চেষ্টা করবে।

উপরোক্ত যে তিনটি শ্রেণীতে শিল্পগুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে তা অপরিবর্তনীয় নয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্বার্থে বা অন্যান্য গুরুতর কারণে প্রয়োজন মনে করলে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র কর্তৃক নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে পারে।

২. বেসরকারী ক্ষেত্রের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণঃ বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত সম্প্রসারণের জন্য ভারত সরকার ১৯৫১ সালে একটি শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন পাশ করেন। ১৯৫২ সাল থেকে তা চালু হয় ও ১৯৫৩ সালে তা সংশোধিত হয় ও ৪৫টি শিল্পে তা প্রয়োগ করা হয়। এর দ্বারা বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম তদন্ত এবং প্রয়োজনবোধে তাদের পরিচালনাভার গ্রহণের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি পুঁজি নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সরকারের নিকট থেকে লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা হয়েছে। এবং শিল্পগুলির সাধারণ ও বিশেষ সমস্যা ও লাইসেন্স গ্রহণ সমস্যা ইত্যাদি বিবেচনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা পরিষদ, লাইসেন্স মঞ্জুরীর জন্য একটি লাইসেন্সিং কমিটি ও গুরুত্বপূর্ণ

শিল্পগুলির জন্য একটি করে উন্নয়ন পরিষদ স্থাপনের ভার সরকারকে দেওয়া হয়েছে ও এইগুলি সরকারের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে।

এর পর ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকার যে নতুন লাইসেন্সিং পলিসি গ্রহণ করেছেন তাতে,—(১) লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে কোর সেক্টর, মিড্‌ল সেক্টর, হেভী ইনভেস্টমেন্ট সেক্টর ও রিজার্ভ সেক্টর, এই চার প্রকার ভাগে শিল্পগুলিকে ভাগ করা হয়েছে।

(২) কোর সেক্টরে আছে বুনিয়াদী, গুরুত্বপূর্ণ (স্ট্রাটেজিক) ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ (ক্রিটিক্যাল) শিল্পগুলি। এদের ক্ষেত্রে অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে লাইসেন্স মঞ্জুরীর বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে এবং নতুন স্থাপিত কোন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দিতে হলে তা সরকারী ও বেসরকারী যুক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জয়েন্ট সেক্টর ইউনিট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) মিড্‌ল সেক্টরে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত পুঁজি নিয়ে গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলির কোন লাইসেন্স লাগবে না। যে সব নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে গঠিত হবে তাদের লাইসেন্স নিতে হবে, কিন্তু এই শ্রেণীর পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স নেবার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (যেমন এরা যদি দত্ত কমিটি কর্তৃক ঘোষিত ২০টি বড় শিল্পগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়, এদের যদি ১০ লক্ষ টাকা অথবা মোট পুঁজির ১০ শতাংশের বেশি মূল্যের দ্রব্য আমদানির জন্য বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন না হয়, এবং এরা যদি মনপলি অ্যাক্ট দ্বারা নির্দিষ্ট প্রাধান্য বিস্তারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান না হয়)।

(৪) ৫ কোটি টাকার বেশি পুঁজি নিয়ে গঠিত সকল প্রস্তাবিত নতুন প্রতিষ্ঠান হেভী ইনভেস্টমেন্ট সেক্টরের অন্তর্গত বলে গণ্য হবে। এদের জন্য কঠোরভাবে লাইসেন্স ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় স্থলে এদের বেলায়ও সরকারী ও বেসরকারী যুক্ত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে উৎসাহ দিতে হবে।

(৫) বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির জন্য সংরক্ষণ করা হবে। এটা হ'ল রিজার্ভ সেক্টর।

৩. সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পিত বিনিয়োগের অনুপাতঃ বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যক্রমে গৃহীত ব্যবস্থার দ্বারা সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সম্পর্কে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, বেসরকারী ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের জন্য নানাবিধ উৎসাহ প্রদান করা হলেও, বর্তমান সরকারী নীতি হ'ল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অধিকতর বিস্তৃতি। এইজন্য প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে যেখানে বিনিয়োগের অনুপাত ছিল ৫০ : ৫০, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা ৫৬ : ৪৪-এ পরিণত হয়, আবার তৃতীয় পরিকল্পনায় এ সম্পর্কে বরাদ্দের অনুপাত মোটামুটি ৫৯ : ৪১।

৪. প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থাঃ দেশের মধ্যে আয়ের বন্টনে বৈষম্য দূর করার জন্য কর-ব্যবস্থাকে অধিকতর প্রগতিশীল করার কথা বলা হয়েছে। এবং এজন্য কিছু কিছু নতুন কর প্রবর্তিত হয়েছে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাঃ রাষ্ট্রীয় বীমা মারফত অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, নারী শ্রমিকগণের মাতৃত্ব ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় সবেতন ছুটি, অর্থ সাহায্য, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে নিরাপত্তা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৬. একচেটিয়া কারবার ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণঃ একচেটিয়া কারবার ও সংকোচন মূলক কারবারী কার্যকলাপ আইন অনুসারে ২০ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি বিশিষ্ট ও আধিপত্যকারী কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভারত সরকারের নিকট রেজিষ্ট্রি করা বাধ্যতা-মূলক অন্যথায় দন্ডনীয় করা হয়েছে।

ভারতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র : সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা
PUBLIC & PRIVATE SECTORS IN INDIA : NEED FOR THE PUBLIC SECTOR

পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরঃ ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে আজকাল বেসরকারী বা ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ের পাশাপাশি সরকারী মালিকানায়ও কমবেশি

নানারূপ শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় স্থাপিত ও পরিচালিত হচ্ছে। ফলে, দেশের সমগ্র শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায় ক্ষেত্রটি প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি হল **প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র।** দেশের সমস্ত বেসরকারী মালিকানার ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এর অন্তর্গত। অপরটি হল **পাবলিক সেক্টর** অথবা **সরকারী বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র।** দেশের ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্পে অবস্থিত যাবতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এর অন্তর্গত। ভারতে স্বাধীনতা লাভের আগে রেলপথ ও ডাক ও তার বিভাগ ছাড়া সরকারী উদ্যোগ আর বিশেষ ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সাল থেকে সরকারের নীতির ফলে দেশে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় মোট ১১,৫৯১ কোটি টাকা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় এজন্য ১৩,৬৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। দেশের অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করাই ভারত সরকারের বর্তমান নীতি।

পাবলিক সেক্টরের প্রয়োজনীয়তাঃ ভারতে নানা কারণে পাবলিক সেক্টর বা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রটির সম্প্রসারণের প্রয়োজন আছে। বর্তমানে দেশের লক্ষ্য হল যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে সর্বাধিক অর্থনীতিক উন্নয়ন লাভ করা এবং তা এরূপ ভাবে সম্পাদন করা যাতে দেশবাসীর দারিদ্র্য ও প্রবল ধনবৈষম্য দূর হয়ে সকলের আয়, কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মানের সবিশেষ উন্নতি সম্ভব হয়।

কেবলমাত্র বেসরকারী উদ্যোগ বা প্রাইভেট সেক্টরের উপর নির্ভর করলে এটা সম্ভব হবে না। কারণ, ক. এজন্য যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে তা দেশীয় পুঁজিপতিদের সাধ্যের বাইরে। খ. তারা বেশি মুনাফার শিল্প ছাড়া অন্যত্র আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং যে সব ক্ষেত্রে অনেক বেশি পুঁজি লাগে অথচ মুনাফা কম সে সকল বুনিয়াদী শিল্প, রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ, সড়ক উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নতির জন্য তাদের উপর নির্ভর করা যায় না। গ. ব্যাংক, বীমা, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার কারবার একচেটিয়া গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়ে তারা নিজেদের সংকীর্ণ মুনাফার স্বার্থে এই সকল ক্ষেত্রে উন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঘ. শিল্পে একচেটিয়া গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়ে চড়া মুনাফার জন্য উৎপাদন ও নিয়োগ কমায় ও দর বাড়ায়। কম দরে কাঁচামাল বেচতে চাষীদের বাধ্য করে। দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ভোগকারীদের শোষণ করে ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষতি করে। ঙ. এতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও মালিকগণের সমৃদ্ধি দ্রুত বাড়লেও, দেশের ব্যাপক জনসাধারণের কর্মসংস্থান, আয় ও জীবনযাত্রার মান বিশেষ বাড়ে না এবং ধনবৈষম্য আরও তীব্র হয়। গরীব আরও গরীব এবং ধনী আরও ধনী হয়। চ. কেবলমাত্র প্রাইভেট সেক্টরের উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসরণ করা যায় না। কারণ ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্যোগ হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরোধী।

এই সকল কারণে, দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়ন, ধনবৈষম্য হ্রাস, জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য কেবল প্রাইভেট সেক্টরের উপর নির্ভর করা যায় না এবং এজন্য পাবলিক সেক্টর একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমত মূল বুনিয়াদী ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-গুলির প্রতিষ্ঠা পাবলিক সেক্টরের দ্বারাই সম্ভব। ২. ব্যাংক, বীমা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও শিল্পে অবস্থিত একচেটিয়া গোষ্ঠীর জাতীয়করণ দ্বারা ঐ কারবারগুলি পাবলিক সেক্টরে আনা হলে তাতে একচেটিয়া পুঁজির বাধা দূর হয়ে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলির উন্নতির পথ খুলে যাবে। ৩. পাবলিক সেক্টরের বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল মুনাফা প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না, তারা দেশের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয়। সুতরাং এতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি

হতে পারে তেমনি উৎপাদনবৃদ্ধি ও বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি ঘটে বাজার দর কমতে পারে। এরা দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপদান করে। ৪. এদের যে আয় হয় তা দেশের সকলের আয় এবং তা পুনরায় বিনিয়োগ করে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরানো শিল্পগুলির প্রসার ঘটতে পারে। ৫. এদের উন্নতিতে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর পকেট বোঝাই হয় না। এদের উদ্বৃত্ত আয় সরকারের কোষাগারে জমা পড়ে এবং তা দিয়ে সরকার দরিদ্র ও অনুন্নতদের উন্নতির জন্য নানারূপ কল্যাণকার্য করতে পারে। ৬. এদের প্রসারে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের ভিত্তি সুনিশ্চিত হয়।

সুতরাং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ধনবৈষম্য দূর করা এবং সর্বসাধারণের আয়, কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি—এই দুইটি মূল লক্ষ্য লাভের জন্য ভারতে পাবলিক সেক্টরের প্রসার অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন
SIZE OF THE BUSINESS UNIT

কারবারের আয়তন বললে ঠিক কি বোঝায় সে সম্পর্কে খানিক পরিমাণে অস্পষ্টতা দেখা যায়। 'কারবারের আয়তন' কথাটির দ্বারা 'প্ল্যান' বা কারখানার আয়তন বোঝায়, কিংবা 'ফারম' বা কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন বোঝায় অথবা 'ইন্ডাস্ট্রি' বা সমগ্র শিল্পের আয়তন বোঝায় তা অনেক সময় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

'প্ল্যান' বা কারবারী প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত যন্ত্রপাতি ও একদল লোককে বোঝায়।

'ফারম্' বা কারবারী প্রতিষ্ঠান বলতে এক বা একাধিক কারখানার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ যার উপর ন্যস্ত থাকে সেই সংগঠনকে বোঝায়। যখন একটি মাত্র কারখানা একটি মাত্র কারবারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও পরিচালনার অধীন থাকে তখন কারখানা ও কারবারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না, উভয়েই এক হয়ে পড়ে।

'ইন্ডাস্ট্রি' ঃ একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত সকল কারবারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে একটি শিল্প গঠিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কতকগুলি চটকল বা কাপড়ের কল বা মিল এক-একটি কারবারী প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকতে পারে। কিন্তু দেশের যাবতীয় চট ও পাটজাত দ্রব্য এবং সুতা ও সুতীবস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে দেশের পাটকল বা সুতীবস্ত্র উৎপাদন শিল্প গঠিত হয়।

কারবারের বা প্রতিষ্ঠানের আয়তনের আলোচনার সময় সাধারণত কারখানা বা শিল্পের আয়তনের পরিবর্তে কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তনকেই বোঝান হয় এবং তার কথাই আলোচিত হয়।

কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারণকারী বিষয়
FACTORS THAT DETERMINE THE SIZE OF A FIRM

কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড়, মাঝারি অথবা ছোট কোন্ জাতীয় হবে, তা ঠিক উদ্যোক্তা বা মালিকের ইচ্ছামত স্থির হয় না। বিভিন্ন অর্থনীতিক ও অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। নিচে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা গেল।

১. চাহিদার পরিমাণ এবং প্রকৃতি ঃ দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং প্রকৃতি অনেকাংশে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারণ করে থাকে। চাহিদা স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ বলে গ্রাম্য দোকানদার বা ব্যবসায়ীর কারবার এবং গ্রাম্য তাঁতী প্রভৃতি উৎপাদনকারীর প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রাকার হয়। আবার যে সকল দ্রব্যের চাহিদা দেশের সর্বত্র বিস্তৃত অথবা যাদের আন্তর্জাতিক চাহিদা রয়েছে তাদের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বড় হয়ে থাকে। পরিবর্তনশীল রুচি ও পছন্দের দ্রব্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি কখনও বড় হয় না।

২. পুঁজি ঃ কারবারের পুঁজি হল আয়তন নির্ধারণকারী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুঁজির অভাবে কারবার সম্প্রসারিত হতে পারে না। আবার ধীরে ধীরে সঞ্চিত

মুনাফার দ্বারা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বড় আকার ধারণ করে। একমালিকী ও অংশীদারী কারবার ছোট এবং যৌথ মূলধনী কারবার সাধারণত বড় হয়।

যেসব দ্রব্যের উৎপাদনে সামান্য যন্ত্রপাতি ও প্রধানত শ্রমশক্তি ও কাঁচামাল বেশি লাগে, সে জাতীয় শিল্পে (অর্থাৎ যেখানে আবর্তন পুঁজি বেশি ও স্থায়ী পুঁজি অল্প লাগে) সাধারণত কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছোট হয়। যেমন, দেশীয় চুরুট, বিড়ি প্রভৃতি শিল্প। আর যে সকল দ্রব্য উৎপাদনে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে স্থায়ী পুঁজি লাগে, যে সকল ক্ষেত্রে স্থির খরচ প্রথম দিকে অত্যন্ত বেশি লাগে, সেক্ষেত্রে বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান ছাড়া ক্ষুদ্রাকার প্রতিষ্ঠানের কোন সুযোগ থাকে না। যেমন, রেলপথ পরিবহণ বা লৌহ-ইস্পাত বা রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্প।

৩. উৎপাদনের বিধিঃ যে সকল শিল্পে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি বেশি প্রচলিত, সেখানে বেশি উৎপাদন হলে গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ বাড়ে বলে অল্প পরিমাণে উৎপাদন করাই ভাল। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্ষুদ্রাকার হয়। আবার যে সকল শিল্পে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মের প্রাধান্য রয়েছে সেক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে উৎপাদন করলে খরচ কম বলে কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিও সাধারণত বড় হয়ে থাকে।

৪. সংগঠকের যোগ্যতা ও পরিচালনার দক্ষতাঃ কারবারের আয়তন অনেকাংশে আবার উদ্যোক্তার দক্ষতার উপরও নির্ভর করে। সুদক্ষ পরিচালকের অধীনে ক্ষুদ্র কারবার সহজেই বৃহদাকার কারবারে পরিণত হয়ে সাফল্য অর্জন করে। অযোগ্য হস্তে এর বিপরীত ঘটে।

৫. ঝুঁকিঃ যে সকল কারবারে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি সেখানে ক্ষুদ্রাকার কারবার চলে না, কারণ তার পক্ষে বেশি ঝুঁকি বহন করা সম্ভবপর হয় না। কারবার বৃহদাকার হলে নানাপ্রকার ঝুঁকিসংকোচ সম্ভব হয় বলে এই সকল ক্ষেত্রে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করে।

৬. দ্রব্যের প্রকৃতিঃ যে সকল দ্রব্য পচনশীল, খরিদ্দারগণের নিকট টাট্‌কা অবস্থায় যার যোগান দিতে হয়, যেমন দুধ, মিষ্টান্ন, পাউরুটি, কেক প্রভৃতি নানা প্রকারের খাদ্য-দ্রব্য, সে সকল দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি খুব বড় আকারের হতে পারে না। কারণ বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বেশি পরিমাণে উৎপাদন করলে তার সবটা বিক্রয় না হলে কারবারের সমূহ লোকসান ঘটবে। তবে অনেক সময় কেন্দ্রীয় ভাবে উৎপাদন না করে অসংখ্য শাখা বিপণি মারফত বিক্রয়ের দ্বারা এরা আংশিকভাবে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করতে চেষ্টা করে।

৭. পরিবহণ খরচঃ অনেক সময় দূরবর্তী স্থান হতে কাঁচামাল সংগ্রহের বা দূরবর্তী বাজারে পণ্য প্রেরণের পরিবহণ খরচ অত্যধিক হলে বৃহদাকারের পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকার কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করাই লাভজনক। যেমন, চিনির কল বৃহদায়তনে স্থাপন করলে উৎপাদন খরচ অনেক কমে কিন্তু যদি আখের উৎপাদন বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত থাকে ও তা কারখানায় আনার খরচ বেশি হয়, তবে যে কোন একটি আখ উৎপাদনকারী অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে, স্থানীয় আখের সীমাবদ্ধ যোগানের উপর নির্ভরশীল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট চিনির কল স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয় হতে পারে। একই কারণে চা বাগিচাগুলিও খুব বড় আকারের হতে পারে না।

৮. বিভিন্ন সরকারী আইনঃ দেশের কর ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইনের দ্বারাও কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন, কোথাও যদি এরূপ আইন জারি হয় যে, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বীজাণুশোধিত না করে কেউ বেচতে পারবে না, তা হলে ছোটখাট দুগ্ধ বিক্রেতাদের কারবারের পরিবর্তে বৃহদায়তন কারবার স্থাপিত হবে। কারণ অধিক পরিমাণে পুঁজি নিয়ে বড় আকারে গঠিত কারবার ছাড়া কারও পক্ষে বীজাণুশোধনের জন্য বহুমূল্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভব নয়। তেমনি দেশের মধ্যে কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন বা মুনাফার উপর অত্যধিক প্রগতিশীল হারে কর বসালে, এড়ানোর জন্য বৃহদাকারের পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকার কারবারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়বে।

কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তনের পরিমাপক
MEASURES OF THE SIZE OF BUSINESS UNITS

কারবারের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন আয়তনের প্রতিষ্ঠানকে কর্মরত দেখি এদের কোনটি বৃহদায়তনবিশিষ্ট, কোনটি মাঝারি বা নাতিবৃহৎ আবার কোনটি ক্ষুদ্রায়তন সম্পন্ন। কোনটির আয়তন কিরূপ তা জানতে হলে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পরিমাপক বা মাপকাঠির দ্বারা এদের আয়তন পরিমাপ করতে হয়।

সকল মাপকাঠি আবার সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ মাপকাঠিটি ব্যবহার করতে হবে তা নির্ভর করে শিল্পের প্রকৃতি অথবা উৎপাদিত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যের উপর।

শিল্পের প্রকৃতি এবং উহার উৎপন্ন দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যে কোন বিশেষ কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিমাপ করার জন্য যে সকল মাপকাঠি বা পরিমাপক হতে ক্ষেত্রানুযায়ী উপযুক্ত এক বা একাধিক পরিমাপক বাছাই করতে হয়, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

১. পুঁজি বিনিয়োগঃ কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিমাপ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তার পুঁজির পরিমাণের হিসাব করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পুঁজির এত বেশি তারতম্য হয় এবং তা সংস্থানের পদ্ধতি এত বেশি বিভিন্ন যে, আদায়ীকৃত অথবা বিনিয়োজিত পুঁজির সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া গেলেও শুধুমাত্র তা দিয়ে সঠিকভাবে কারবারের আয়তন পরিমাপ করা যায় না।

২. যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ক্ষমতাঃ বস্ত্রশিল্প, চটকল, কাগজ, রাসায়নিক পদার্থ, জাহাজ নির্মাণ, লৌহ-ইস্পাত অথবা কাঁচা শিল্পের মত অনেক ক্ষেত্রে, যেখানে শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যগুলির মধ্যে তারতম্য দেখা যায়, সেখানে কোন প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি বসান হয়েছে এবং তার উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির আয়তন পরিমাপ করা হয়। বস্ত্রশিল্পে তাঁত ও মাকুর পরিমাণ ও তার উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা মোটামুটি সঠিকভাবে যে কোন প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিমাপ করা সম্ভবপর। এইভাবে যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন ক্ষমতা কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিমাপের নির্ভরযোগ্য পরিমাপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৩. উৎপাদনের পরিমাপঃ যে সকল শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের মান একই প্রকারের বা দ্রব্যগুলি একজাতীয় হয়, সেখানে কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের মোট পরিমাণ দ্বারা তাদের আয়তনের সঠিক পরিমাপ করা যায়। চিনি, সিমেন্ট বা কয়লা শিল্প এর দৃষ্টান্ত।

৪. উৎপাদিত সামগ্রীর মোট মূল্যঃ অনেক সময় আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের মোট মূল্যের দ্বারাও আয়তনের পরিমাপ করা হয়।

৫. শ্রমিক সংখ্যাঃ একই কারিগরি উন্নতির স্তরে অবস্থিত এবং একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিমাপের ক্ষেত্রে, তাদের অধীন শ্রমিক-সংখ্যা একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাপক বলে গণ্য হয়। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠানের কারিগরি অবস্থা একরূপ নয় অথবা, যারা বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত, সেক্ষেত্রে শ্রমিকসংখ্যা দ্বারা আয়তনের নির্ভুল পরিমাপ পাওয়া যায় না।

৬. ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণঃ অনেক সময় একই দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিমাপ করার জন্য তাদের ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ, পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৭. ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণঃ প্রতিষ্ঠানটিতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ বা অন্যান্য শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তার দ্বারাও তার আয়তন পরিমাপ করা চলে।

কারবারী প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন (THE OPTIMUM SIZE OF A FIRM)

যে কোনও শিল্পে এবং যে কোনও উৎপাদন পদ্ধতির অধীনে কারবার স্থাপন করতে গেলে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে কারখানা ও যন্ত্রপাতির এমন একটি নিম্নতম মাত্রা আছে যার

কমে কারবার শুরু করা কারিগরি দিক দিয়ে অসম্ভব এবং আর্থিক দিক দিয়ে অলাভজনক। কারবারের এই আয়তনকে নিম্নতম কারিগরি আয়তন[1] বা অর্থনীতিক আয়তন[2] বলে অনেক কারবারই এই নিম্নতম আকারে স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু মুনাফা বৃদ্ধির তাগিদে ধীরে ধীরে আয়তন সম্প্রসারিত হয়। নিম্নতম আয়তন থেকে সম্প্রসারণের দরুন কারবারের আয়তন যতই বৃদ্ধি পায় মুনাফাও ততই বাড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্প্রসারণ ঘটতে ঘটতে এমন একটা অবস্থা দেখা দেয় যে, তারপর সম্প্রসারণ ঘটলে আর মুনাফা বাড়ে না। কারবারের ঐ আয়তনকে **কাম্য আয়তন**[3] এবং ঐ আয়তন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে **কাম্য প্রতিষ্ঠান**[4] বলে।

অধ্যাপিকা রবিনসনের মতে কাম্য প্রতিষ্ঠান বলতে সেই আয়তনের প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যা বর্তমান কারিগরি অবস্থা ও সাংগঠনিক দক্ষতার দ্বারা দীর্ঘকালীন সময়ের যাবতীয় খরচ-খরচা মিটিয়ে, নিম্নতম গড় খরচে দ্রব্য উৎপাদন করছে। এই হল সঠিক আয়তন-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ কারবারী প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু, প্রতিষ্ঠানের এই কাম্য আয়তন অপরিবর্তনীয় নয়, বরং সর্বদা পরিবর্তনশীল। যদি কারিগরি অবস্থা, যন্ত্রকৌশল সংক্রান্ত জ্ঞান, সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নত হয় তবে, কাম্য আয়তন আগের চেয়ে বড় হবে। সুতরাং কাম্য আয়তনটি একটি চূড়ান্ত কিছু নয়, বরং আপেক্ষিক।

প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তা হল, কারিগরি শক্তি[5] ব্যবস্থাপনা শক্তি[6], আর্থিক শক্তি[7], বিপণন শক্তি[8] এবং ঝুঁকি[9]।

এদের প্রত্যেকটির অবস্থা অনুযায়ী কারবারের এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন কাম্য আয়তন আছে। যেমন, কাম্য কারিগরি আয়তন[10], কাম্য ব্যবস্থাপনা আয়তন[11], কাম্য আর্থিক আয়তন[12], কাম্য বিপণন আয়তন[13] এবং ঝুঁকিবহনক্ষম কাম্য আয়তন[14]।

১. কাম্য কারিগরি আয়তন: প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর যন্ত্রপাতি ও কারিগরি পদ্ধতির ব্যবহারের সাথে উন্নত ধরনের শ্রমবিভাগ অনুসৃত হতে থাকে। এর দরুন বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমন্বয়-সাধনের ফলে বিভিন্ন ভাবে ব্যয়সংকোচ ঘটে। নানাপ্রকারের ছাঁট ও পরিত্যক্ত টুকরা ও অপচিত দ্রব্য থেকে বিভিন্ন উপদ্রব্য তৈরী হয় ও তা বিক্রয় করে প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়ে। এইরূপে প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি কারণে ব্যয়সংকোচ বাড়তে বাড়তে একসময়ে কারবারের আয়তন এমন হয় যে, তখন সর্বাধিক কারিগরি ব্যয়সংকোচ ঘটে। কারবারী প্রতিষ্ঠানের ঐ আয়তনকে কাম্য কারিগরি আয়তন বলে।

২. কাম্য ব্যবস্থাপনা আয়তন: ব্যবস্থাপনার দিক দিয়েও প্রতিষ্ঠানের একটি কাম্য আয়তন আছে। প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনারও উন্নতি ঘটে। সুদক্ষ পরিচালকের দক্ষতা পরিপূর্ণ প্রয়োগের পক্ষে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠান অনুপযুক্ত, বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানে প্রতিভার পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব। এ ছাড়া বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার উচ্চবেতনে নিযুক্ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণের উপর অর্পণ করা সম্ভব হওয়ায়, সকল বিভাগের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ে। এজন্য কারবারের আয়তনের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যয়সংকোচ বাড়তে থাকে এবং একসময়ে তা সর্বাধিক হয়ে পড়ে। কারবারের আয়তন যতটা সম্প্রসারিত হলে ব্যবস্থাপনার দরুন ব্যয়সংকোচ সর্বাধিক হয় সে-আয়তনকে কাম্য ব্যবস্থাপনা আয়তন বলে।

৩. কাম্য আর্থিক আয়তন: প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহে প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার উপরও তার উৎপাদন খরচ অনেকাংশে নির্ভর করে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্রায়তন

1. Minimum Technical size. 2. Economic size. 3. Optimum size.
4. Optimum firm. 5. Technical Forces. 6. Managerial ability.
7. Financial Forces. 8. Marketing Forces. 9. Forces of risk.
10. Technical Optimum size. 11. Managerial optimum size.
12. Financial Optimum size. 13. Optimum marketing unit.
14. Optimum survival unit.

প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সহজ শর্তে অধিকতর পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহে সমর্থ হয়। এইরূপে কারবারের আয়তন যতই বাড়ে ততই পুঁজি সংগ্রহের ব্যয় হ্রাস পেতে থাকে। এক্ষেত্রে আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা নাই।

৪. **কাম্য-বিপণন আয়তন**ঃ ক্রয় এবং বিক্রয়, কারবারী প্রতিষ্ঠানে মোট ব্যয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সেই কারণে প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন ও শিল্পের কাঠামোর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের আয়তন যতই বড় হয় ততই তার ক্রয় ও বিক্রয়ের খরচ হ্রাস পেতে থাকে। কারণ একসঙ্গে বেশী পরিমাণে কাঁচা মাল প্রভৃতি ক্রয়ের ফলে তা সুবিধাজনক দরের সুযোগ পায়। একসঙ্গে বেশী পরিমাণে কাঁচামাল আনতে ও তৈরী পণ্য বাজারে পাঠাতে হয় বলে পরিবহণ খরচ কমে। বিশেষজ্ঞ-গণের তত্ত্বাবধানে ক্রয়-বিক্রয় পরিচালিত হয়। বিক্রয়কর্মচারী এবং বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় হ্রাস পায়। এই সকল কারণে আয়তনের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কারবারী প্রতিষ্ঠানের ক্রয়বিক্রয় বা বাণিজ্যিক ব্যয়সংকোচ ক্রমেই বাড়তে থাকে। এমন কি প্রতিষ্ঠানটি যখন কারিগরি অথবা ব্যবস্থাপনার কাম্য আয়তন ছাড়িয়ে গেছে, তখনও হয়ত বাণিজ্যিক বা বিপণন ব্যয়সংকোচ বাড়তে থাকে।

৫. **ঝুঁকিবহনক্ষম বা কাম্য উদ্বর্তন আয়তন**ঃ বাজারে পণ্যের চাহিদা অব্যাহত থাকলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আয়তনের ক্রমাগত সম্প্রসারণের দ্বারা কারিগরি বা ব্যবস্থাপনার কাম্য আয়তনে পৌঁছাতে কোন বাধা থাকে না। কিন্তু বাস্তব বাজারে চাহিদা সর্বদাই পরিবর্তন-শীল। ফলে ব্যবসায়ে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সকল প্রতিষ্ঠানই বর্তমানে যে পণ্য উৎপাদন করছে তাহা ভবিষ্যতে বিক্রয় হবে। সুতরাং সকলেই যথাসম্ভব ভবিষ্যৎ চাহিদা আন্দাজ করে সে অনুযায়ী কতটা উৎপাদন করা হবে তা স্থির করে। কিন্তু ইতিমধ্যে চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে তৈরী পণ্য বিক্রয়ে সংকট দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে কারবার সাফল্য সংকটাপন্ন হতে পারে। এই অবস্থায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন এবং স্বল্পতর দক্ষতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, শুধুমাত্র একজাতীয় পণ্য উৎপাদনে সক্ষম বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের পরিবর্তে, একাধিক দ্রব্য উৎপাদনের সক্ষম অপেক্ষাকৃত সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত হলে, বাজারে পরিবর্তনের সাথে দ্রুত নিজের সামঞ্জস্য সাধন করে টিকে থাকতে পারে। সুতরাং পরিবর্তনশীল চাহিদার বাজারে ঝুঁকি বহনের উপযোগী বা টিকে থাকার উপযুক্ত কারবারের কাম্য আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোটই হয়ে থাকে।

যে কোন প্রতিষ্ঠান কতটা পরিমাণে কাম্য আয়তন লাভ করেছে সেটা তার কারবারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এটা খুবই সম্ভবপর যে এক বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি যখন কাম্য আয়তনে পরিণত হয়েছে তখনও হয়ত অন্যান্য বিষয়ে তা কাম্য আয়তনে পৌঁছায় নাই। যেমন, সাধারণত ব্যবস্থাপনার কাম্য আয়তন, কারিগরি কাম্য আয়তন অপেক্ষা ছোট হয়ে থাকে। সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য সাধনের উপর প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত কাম্য আয়তন নির্ভর করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, যে পরিমাণ উৎপাদন করা হলে প্রতিষ্ঠানটির মোট ব্যয়সংকোচ ও মোট ব্যয়বৃদ্ধির চূড়ান্ত পারস্পারিক ভারসাম্য উপস্থিত হয় তাই কাম্য উদ্বর্তন আয়তন নির্দিষ্ট করে দেয়।

তবে কাম্য আয়তনের আলোচনায় একথা মনে রাখা উচিত যে, বাস্তবে কাম্য আয়তন-বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কারণ, এটা একটা ধারণা মাত্র।

তবে তা সত্ত্বেও, কাম্য আয়তনের আলোচনার গুরুত্ব এই যে, এ থেকে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই নিজ নিজ গড় উৎপাদন খরচা কমানোর যে প্রবণতা রয়েছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাম্য আয়তনে উপনীত হওয়া সম্ভব না হলেও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই সর্বদা তার উৎপাদন ব্যয় যথাসম্ভব কমানোর জন্য আগ্রহশীল থাকে।

বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা
COMPARATIVE ECONOMIES AND DISECONOMIES OF LARGE, MEDIUM AND SMALL SCALE OPERATIONS

বৃহদায়তনে উৎপাদনের বিশেষ সুবিধাঃ উৎপাদনে নিযুক্ত সকল আয়তনের প্রতিষ্ঠানই

তার সংগঠনের দ্বারা কতকগুলি সুবিধা কমবেশি পরিমাণে ভোগ করে। এই সব সুবিধা ভোগের দরুন উৎপাদন ব্যয় কমে। এই সুবিধাগুলিতে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সুবিধা[15] বলে। কারবারের আয়তন যতই সম্প্রসারিত হয় ততই এই সব সুবিধা বাড়ে। অতএব ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি এই অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ বা সুবিধা বেশী পরিমাণে ভোগ করে। অভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

১. কারিগরি সুবিধা[16] **:** কারবারের আয়তন বৃদ্ধির ফলে উন্নত যন্ত্রপাতি ও শ্রম-বিভাগের দ্বারা উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস ও পরিমাণ এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা যায়। বড় প্রতিষ্ঠানগুলি মূল দ্রব্যের সাথে নানা প্রকার উপদ্রব্য প্রস্তুত করে আয় বৃদ্ধি করতে পারে। মূল দ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি তৈরীর কাজ নিজেই গ্রহণ করে উৎপাদন ব্যয় কমাতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা, বিভিন্ন উপকরণ ও শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার, যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার, উৎপাদনে নির্দিষ্ট মান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সম্ভব হয়।

২. ব্যবস্থাপনার সুবিধা[17] **:** উচ্চ বেতনে সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মচারীদের উপর বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থাপনাভার বন্টন করে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বৃদ্ধি করা সহজেই সম্ভবপর।

কাজ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করে, বিভিন্ন প্রকারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভাগগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, দায়িত্ব বিভাগ, বিজ্ঞানসম্মতরূপে হিসাব রক্ষা ও উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব[18] প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কর্ম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও অপচয় হ্রাস করতে পারে।

৩. আর্থিক সুবিধা[19] **:** ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পুঁজি সংগ্রহের সুবিধা অনেক বেশী। বেশী পরিচিত হওয়ার দরুন তাদের শেয়ার কিংবা ডিবেঞ্চার সহজে বিক্রয় হয় এবং প্রভূত সম্পত্তি থাকায় তারা সহজ শর্তে ব্যাংক প্রভৃতি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। আবার মুনাফার পরিমাণ বেশী হওয়ায় তার একাংশ দ্বারা কারবারের সম্প্রসারণ ঘটাতেও সমর্থ হয়। সংগৃহীত পুঁজি বিভিন্ন কার্যে যথাযথভাবে বিনিয়োগ করা, অপেক্ষাকৃত বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই বেশী সম্ভবপর।

৪. ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা[20] **:** একসঙ্গে বেশী পরিমাণে ক্রয় ও বিক্রয়ের দরুন বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অল্পদরে কাঁচামাল খরিদ, অল্প ভাড়ায় পরিবহণ ব্যবস্থা, বিক্রয়-কর্মচারী এবং বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি সুবিধা অনেক বেশী পরিমাণে ভোগ করে।

৫. ঝুঁকি হ্রাস[21] **:** চাহিদার পরিবর্তনের সম্ভাবনার দরুন কারবারের যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তা বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশী পরিমাণে কমাতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন বাজারে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে তার একবাজারের লোকসান অন্য বাজারের মুনাফা থেকে পূরণ করতে পারে। আবার একসঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে তারা একটির লোকসান অপরটির দ্বারা পূরণ করতে পারে।

বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের সুবিধা : অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচের ক্ষেত্রে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা ভোগ করলেও, সব বিষয়েই যে তাদের সুবিধা বেশী তা মনে করা কঠিন নয়। কারণ, তা সত্য হলে, বর্তমানে কোথাও ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যেত না।

বাস্তবিকপক্ষে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি ত্রুটি এবং কতকগুলি বিষয়ে তাদের

---

15. Internal Economies.
16. Technical Economies.
17. Managerial Economies.
18. Cost Accounting.
19. Financial Economies.
20. Marketing Economies.
21. Reduction of risks.

অক্ষমতার দরুন, কতকগুলি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠান বেশী উপযোগী বলে গণ্য হয়।

১. প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন হলে তা বাজারের পরিবর্তনের সাথে দ্রুত সামঞ্জস্য করে নিতে পারে না। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের প্রতিষ্ঠান তা পারে। সুতরাং যে সকল ক্ষেত্রে বাজারের অবস্থা অত্যন্ত পরিবর্তনীয় সেখানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানই বেশী সুবিধাজনক।

২. প্রতিষ্ঠানের আয়তন অতিকায় হলে বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা হ্রাস পেতে থাকে। তা ছাড়া বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত হয়। তারা যত্নসহকারে সর্বদা নিজ দায়িত্ব পালন করে না। তাদের ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তিতে বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেশী হয়ে পড়ে। এবং তা ছাড়া প্রায়শই সেখানে শ্রমিক অসন্তোষ লেগে থাকে। কিন্তু মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানে ও বিশেষত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। মালিকরা অধিকাংশ স্থলেই নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধানকার্য পরিচালনা করে বলে যেমন একদিকে শ্রমিক গোলযোগ ঘটার অবকাশ কম থাকে, তেমনি পরিচালনায় শৈথিল্যও কম দেখা যায়।

৩. যে সব দ্রব্যের চাহিদা সীমাবদ্ধ, তা উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্রাকার প্রতিষ্ঠানই প্রশস্ত।

৪. যে সকল ক্ষেত্রে ক্রেতাদের মনস্তুষ্টি ও কারিগরের শিল্প-নৈপুণ্যের উপর কারবারের সাফল্য নির্ভর করে সেক্ষেত্রে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

৫. যে সকল দ্রব্য পচনশীল, যাদের ক্রেতারা বিভিন্ন অঞ্চলে বা স্থানে বিক্ষিপ্ত, সে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার প্রতিষ্ঠানই সাফল্য অর্জনে বেশী সক্ষম হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ লণ্ড্রী, রেস্তেরাঁ বা মনিহারী দোকানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

পরিশেষে, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিদ্যার উন্নতির ফলে ক্রমেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে।

ভারতের কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়তন এবং সাংগঠনিক ধাঁচ
SIZE & PATTERNS OF BUSINESS UNITS IN INDIA

ভারতের বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসায় এবং বাণিজ্যে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র ইত্যাদি সকল ধরনের আয়তনই রয়েছে।

ভারতের অধিকাংশ কারবারী প্রতিষ্ঠানই আয়তনে ক্ষুদ্রাকার। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ অর্থনীতিক কার্যকলাপ, দ্রব্যের উৎপাদন হতে আরম্ভ করে ক্রয়-বিক্রয়, তৈল নিষ্কাশন, গুড় প্রস্তুত, কুটির শিল্পের উৎপাদন, খুচরা কারবার ইত্যাদির অধিকাংশই ক্ষুদ্রায়তন-বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। শহরাঞ্চলেও খুচরা এবং পাইকারী কারবারগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

১. আধুনিক সমাজে কারবার সংক্রান্ত কার্যকলাপ

1. What are the basic features common to all business enterprises? [C. U. 1964, 1968, '70, '73]
[সকল প্রকার কারবারী উদ্যোগের সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্টগুলি কি?] উঃ ৮-৯ পৃঃ
2. Discuss the social and individual aspects of modern business. [C. U. 1971]
[আধুনিক কারবারের সামাজিক ও ব্যক্তিগত দিকগুলি আলোচনা কর।] উঃ ৬-৭ পৃঃ
3. At present it is said that business has got "social responsibility". Explain its real significance. [C. U. 1969]
[বর্তমানে ইহা বলা হয় যে কারবারের "সামাজিক দায়িত্ব" আছে। একথার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।] উঃ ৭-৮ পৃঃ

4. Discuss the nature and implications of social responsibilities of a business. [C. U. B. Com. 1972]
[কারবারের সামাজিক দায়িত্বের প্রকৃতি ও তাৎপর্য আলোচনা কর।] উঃ ৭-৮ পৃঃ
5. What is meant by 'Organisation' and 'Co-ordination'? Explain their significance to a business concern. [C. U. 1970]
['সংগঠন' ও 'সংযোজন' বলতে কি বুঝায়? কারবারী সংস্থার পক্ষে উহাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।] উঃ ১৩, ১৫-১৬, ১৮-১৯ পৃঃ
6. Discuss the significance of 'Administration' and 'Delegation' in business management. [C. U. 1971]
[কারবার পরিচালনায় 'প্রশাসন' ও 'দায়িত্ব অর্পণ'-এর তাৎপর্য আলোচনা কর।]
উঃ ১৭-১৮, ১৯-২০ পৃঃ
7. What is meant by 'Management' and 'Control'? Discuss their significance in business. [C. U. 1972]
['ব্যবস্থাপনা' ও 'নিয়ন্ত্রণ' বলতে কি বোঝায়? কারবারে উহাদের তাৎপর্য কি তাহা আলোচনা কর।] উঃ ১৬-১৭, ১৮ পৃঃ
8. Explain the importance of 'Organisation' and 'Co-ordination' in business. [C. U. 1973]
[কারবারে 'সংগঠন' ও 'সংযোজন'-এর গুরুত্ব কি তা ব্যাখ্যা কর।]
উঃ ১৫-১৬, ১৮-১৯ পৃঃ
9. Distinguish between organisation and management. Explain the basic principles of business organisation. [C. U. Hons. 1970]
[সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। কারবারী সংগঠনের বুনিয়াদী নীতিগুলি ব্যাখ্যা কর।] উঃ ১৩, ১৪-১৫, ১৬-১৭ পৃঃ
10. "Each of the managerial functions is an exercise in co-ordination". Elucidate the statement. [C. U. Hons. 1973]
['ব্যবস্থাপনার কাজগুলির প্রত্যেকটি হল সংযোজনের প্রচেষ্টা।'—এই বিবৃতিটি ব্যাখ্যা কর।] উঃ ১৬-১৭ পৃঃ

২. অর্থনীতিক ব্যবস্থা এবং কারবারের আয়তন

1. Explain the characteristics of 'Mixed Economy' as in operation in India at present. Give your views about expanding role of the public sector in the Indian Industrial field. [C. U. 1972]
[ভারতে বর্তমানে যে 'মিশ্র অর্থনীতি' রয়েছে তার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। ভারতের শিল্পক্ষেত্রে পাবলিক সেকটরের সম্প্রসারণশীল ভূমিকা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।]
উঃ ২২-২৪ পৃঃ
2. What do you understand by public sector and private sector? Which one would you advocate in India? Give reasons. [C. U. 1968]
[সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র বলতে তুমি কি বুঝ? ভারতে উহাদের কোন্‌টি তুমি সমর্থন কর? তাহার কারণ দেখাও।] উঃ ২৪-২৫ পৃঃ
3. Mention the factors that determine the size of business units. Discuss the economic justification for small scale industries.
[C. U. 1972]
[কারবারী সংস্থার আয়তন যে সকল বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় তা উল্লেখ কর। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির অস্তিত্বের সমর্থনে অর্থনৈতিক যুক্তিগুলি আলোচনা কর।]
উঃ ২৫-২৭, ৩১ পৃঃ

খণ্ড ৩ বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগের মালিকানার রূপ
OWNERSHIP FORMS OF BUSINESS ORGANISATION IN THE PRIVATE & PUBLIC SECTORS

অধ্যায়

৩

বেসরকারী ও সমবায় উদ্যোগ

THE PRIVATE & CO-OPERATIVE ENTERPRISES

বেসরকারী উদ্যোগের মালিকানার রূপ
OWNERSHIP FORMS OF PRIVATE ENTERPRISE

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প জগতে বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের কা... [illegible] তিন অথবা চারপ্রকার মালিকানা-রূপ দেখতে পাই। যথা, একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার এবং ভারতে হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের পারিবারিক কারবার ও যৌথমূলধনী কারবার বা কোম্পানি। এছাড়া আরেকপ্রকার মালিকানা-রূপ বিশিষ্ট কারবারী সংগঠনও আছে। তা হল সমবায় সমিতি। মূলগত বিচারে সমবায় সংগঠনও বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের অন্তর্গত।

১. একমালিকী কারবার
1. SOLE PROPRIETORSHIP BUSINESS

সংজ্ঞা : একজন মাত্র ব্যক্তির মালিকানা ও পরিচালনাধীন যে ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়, তা একমালিকী কারবার নামে পরিচিত। এই জাতীয় কারবার ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে স্থাপিত ও তার নিজের সঞ্চয় বা ঋণের দ্বারা সংগৃহীত পুঁজির সাহায্যে পরিচালিত হয়। এটি কারবারী প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনতম রূপ। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের কারবারী সংগঠনের মধ্যে আজ পর্যন্ত একমালিকী কারবারের সংখ্যাই সর্বাধিক।

বৈশিষ্ট্য : ১. এর গঠনের কোন নির্দিষ্ট নিয়মকানুন নেই বলে যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় ইচ্ছানুসারে এ ধরনের কারবার গঠন করতে পারে।

২. পুঁজির সমস্তটাই মালিক সরবরাহ করে। এই পুঁজি তার নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ বা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মহাজন অথবা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ করে সংগৃহীত হতে পারে।

৩. মালিক ক্রয়বিক্রয়, উৎপাদন, ব্যবসায় সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারবারের সমস্ত নীতি নির্ধারণ কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ[1] করে।

৪. নির্ধারিত নীতি অনুসারে কারবারের ব্যবস্থাপনার[2] দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মালিকের উপর থাকে। মালিক স্বয়ং সকল কাজকর্ম তদারক করলেও তাকে সাহায্য করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়। কারবারের আয়তন বাড়লে, ব্যবস্থাপনার আংশিক দায়িত্ব কর্মচারিগণের উপর ন্যস্ত হয়ে থাকে।

৫. কারবারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব[3] মালিককেই বহন করতে হয়। কর্মচারীদের বেতন, কর-বাবদ সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাওনা ও মহাজনের দেনা মেটানোর দায়িত্ব মালিকের। কারবারের সমগ্র লোকসানের ভারও তাকেই বহন করতে হয়। এককথায়, একমালিকী কারবারের মালিক স্বয়ং ব্যবসায়ের সমগ্র ঝুঁকি বহন করে।

1. Administration and Control. 2. Management. 3. Liability.

৬. কারবারের লোকসানের সমগ্র দায়িত্ব যেমন মালিককে বহন করতে হয় তেমনি মুনাফার[4] সমস্তটুকুই সে এককভাবে ভোগ করে।

৭. আইনের দৃষ্টিতে এই জাতীয় কারবারের কোন পৃথক্ সত্তা[5] নেই। মালিক ও কারবার অভিন্ন। এইজন্য মামলা-মোকদ্দমার বেলায় মালিকের নামই ব্যবহার করতে হয়।

সুবিধা : ১. একমালিকী কারবার সহজেই গঠন করা যায়। এ বিষয়ে আইনগত কোন আনুষ্ঠানিকতা নেই বলে সে জন্য সময় নষ্ট হয় না।

২. মালিক নিজেই প্রত্যক্ষভাবে কারবার পরিচালিত করে বলে, তার যত্ন ও চেষ্টায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত সামগ্রীর উৎকর্ষ বাড়ে, উৎপাদনের অপচয় দূর হয়ে খরচ কমে ও খরিদ্দারদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

৩. মালিক নিজেই কারবারের নীতি নির্ধারণ করে বলে ব্যবসায়ের পরিবর্তন ঘটলে অবস্থানুযায়ী নূতন নীতি গ্রহণে দেরী হয় না। এজন্য একমালিকী কারবার ব্যবসায় জগতের পরিবর্তনের সাথে নিজেকে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

৪. কারবারের পরিচালক হিসাবে খরিদ্দারদের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় মালিক সহজেই বাজারের চাহিদার এবং খরিদ্দারদের রুচি ও পছন্দের গতি প্রকৃতি ও পরিবর্তনের সকল সংবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে।

৫. কঠোর পরিশ্রমের ফল হিসাবে মুনাফার সমস্তটাই মালিক ভোগ করতে পারে বলে এই জাতীয় কারবার ব্যবসায়ের উদ্যোক্তাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে।

৬. এই জাতীয় কারবারের দায় সীমাবদ্ধ নয় বলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কারবারের মালিককে ঋণদাতারা ধার দিতে ইতস্তত করে না। এজন্য এর সম্প্রসারণের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয় না।

৭. মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকায় একমালিকী কারবারে মালিক-কর্মচারী বিরোধের সম্ভাবনা কম থাকে।

৮. কারবারের গোপনীয়তা রক্ষা তার সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য। একমালিকী কারবারে এটা যতটা সম্ভব, অন্য কোন প্রকার কারবারে ততটা সম্ভব নয়।

৯. এই প্রকার কারবারের দায় সীমাহীন বলে, মালিক সাফল্যের জন্য কঠিন পরিশ্রম করে।

১০. কোম্পানির মত এর লাভক্ষতির হিসাব ও ব্যালান্স শীট প্রকাশ করতে হয় না। এর ফলে মালিক কারবারের মুনাফা গোপন রাখতে পারে। সুতরাং মুনাফার পরিমাণ প্রকাশিত না হওয়ায় এর দিকে প্রতিযোগীরা আকৃষ্ট হয় না।

অসুবিধা : ১. মালিক যত ধনীই হোক না কেন তার পুঁজি সংগ্রহ করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই কারণে কারবারের সম্প্রসারণ বাধা পায়। বৃহদায়তনে উৎপাদনের প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে একমালিকী কারবার অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

২. ব্যক্তিবিশেষ যত প্রতিভাশালীই হোক না কেন, তার কর্মক্ষমতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। এজন্য কারবারের ক্রমশ আয়তন বৃদ্ধি ঘটলে শেষ পর্যন্ত মালিকের পক্ষে কারবারের সকল বিষয় ও বিভাগগুলি সমান দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না ও কারবারের সকল দিকে নজর দেওয়া কঠিন হয়।

৩. কারবারের দেনার জন্য মালিকের সীমাহীন দায়িত্ব এই জাতীয় কারবারের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

৪. একটি মাত্র ব্যক্তির প্রতিভা, উদ্যোগ ও পরিশ্রমের দ্বারা এই জাতীয় কারবারের সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে। ফলে তার মৃত্যুর পর অথবা শারীরিক অক্ষমতার দরুন, অপেক্ষাকৃত স্বল্প যোগ্যতাশালী উত্তরাধিকারীর হস্তে কারবারের দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

4. Distribution of Profit. 5. Entity.

৫. মালিকের আকস্মিক মৃত্যু, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, কোন কারণে তার অনুপস্থিতি অথবা মালিক দেউলিয়া হলে, কারবার উঠে যায় বলে এই জাতীয় কারবার সাধারণত স্বল্পস্থায়ী।

৬. সাধারণত একমালিকী কারবার আয়তনে ছোট হয় বলে বৃহদায়তনে ক্রয় বিক্রয় ও উৎপাদনের ব্যয়সংকোচের সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

একমালিকী কারবারের টিকে থাকার কারণ
CAUSES OF SURVIVAL OF ONE-MAN BUSINESS

একমালিকী কারবারের নানারূপ অসুবিধা আছে। এতে পর্যাপ্ত পুঁজি, দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার একত্র সমাবেশ প্রায়শ ঘটে না; পুঁজি সংগ্রহের ক্ষমতা এর সীমাবদ্ধ; কারবারের দেনার জন্য মালিকের সীমাহীন দায় এর প্রধান অন্তরায়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃহদায়তনে ক্রয় বিক্রয় ও উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধা হতে এ বঞ্চিত; মালিকের মৃত্যু বা অনুরূপ কারণে এ স্বল্পস্থায়ী হয়; এবং অযোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতে পড়ে এর অবনতি ঘটে।

কিন্তু এসব অসুবিধা সত্ত্বেও পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত নানা প্রকারের কারবারী সংগঠনের মধ্যে একমালিকী কারবারের সংখ্যাই সর্বাধিক এবং সর্বাধুনিক বৃহদাকার কারবারী সংগঠনগুলির নানাবিধ সুবিধা সত্ত্বেও, তাদের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে এটি এখনও টিকে আছে। তার কারণগুলি এইঃ

১. স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা উপার্জনের অদম্য স্পৃহা অনেককে একমালিকী কারবার পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে।

২. অনেক পণ্যের চাহিদা স্থানীয় বাজারে সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং তা বেশী পরিমাণে উৎপাদন বা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না বলে সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার একমালিকী কারবারই বেশী সুবিধাজনক।

৩. অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ক্ষুদ্র গ্রামীণ ও কুটির শিল্পে, বেশী পুঁজি লাগে না। এরকম ক্ষেত্রে একমালিকী কারবারই প্রকৃষ্ট।

৪. অনেক দ্রব্যের চাহিদা সারা বৎসর থাকে না (যেমন আইসক্রীম, সরবৎ এবং ছাতা), কিংবা তাদের ক্রেতার রুচি ও পছন্দ সর্বদা পরিবর্তনশীল (গহনা ও তৈয়ারী জামা)। অনেক ক্ষেত্রে আবার ক্রেতারা বহু বিক্ষিপ্ত (খাবার দোকান ও সেলুন)। অনেক ক্ষেত্রে আবার ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কারবারের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য (খবরের কাগজ ফিরি করা)। এসকল ক্ষেত্রে অন্য যে কোন ধরনের কারবারী সংগঠন অপেক্ষা একমালিকী কারবার বেশী উপযোগী।

৫. যে সকল ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়, পরিবর্তনশীল বাজারের সাথে অবিলম্বে সামঞ্জস্য ঘটাতে[6] হয়, কারবারী গোপনতা বজায় রাখা যে সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য, সে সব ক্ষেত্রে একমালিকী কারবারই প্রকৃষ্ট।

২. অংশীদারী কারবার
2. PARTNERSHIP

ভূমিকা: একক মালিকের সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও ঝুঁকি বহন ক্ষমতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল একমালিকী কারবার যতই সাফল্য অর্জন করুক না কেন, তার সম্প্রসারণের একটা সীমা আছে। একক মালিকের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের বেশি তা অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং সাফল্যের সমতালে কারবার সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিলে, অথবা ঝুঁকি বহনক্ষম, বৃহত্তর আকারের অধিকতর দক্ষতাসম্পন্ন কারবার স্থাপনের প্রয়োজন হলে, বেশি পুঁজি সংস্থান, কারবারের পরিচালনায় শ্রমবিভাগ এবং ঝুঁকি বন্টনের ব্যবস্থা করতে হয়। অংশীদারী কারবার এই প্রচেষ্টার ফল।

সংজ্ঞাঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে

---

6. Adjustment.

যে কারবার স্থাপন করে তা অংশীদারী কারবার নামে [illegible] অংশীদারদের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি বন্টনের অনুপাত নির্দিষ্ট হয়। কারবারের অংশীদারেরা সকলেই মালিক হিসাবে কারবারের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। তবে বাস্তবে অল্প কয়েকজনই এতে প্রধান অংশ নিয়ে থাকে। অংশীদারদের ন্যূনতম সংখ্যা ২ এবং সর্বাধিক সংখ্যা বিভিন্ন দেশে আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। যেমন, ভারতে আইনের দ্বারা ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী ব্যবসায়ে নিযুক্ত অংশীদারী কারবারের সভ্যদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ১০ ও অন্যান্য জাতীয় অংশীদারী কারবারের ২০ নির্দিষ্ট হয়েছে।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় অংশীদারী কারবারের আইনের ৪ ধারায় অংশীদারী কারবারের এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

"The Partnership is the relation which subsists between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them on behalf of all of them...."

অর্থাৎ

'সকলের দ্বারা অথবা যে কোন একজনের দ্বারা সকলের পক্ষে পরিচালিত কারবারের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের জন্য চুক্তিবন্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক নিহিত থাকে তাহাই অংশীদারী......'

যে সকল ব্যক্তি মিলিত হয়ে এই কারবার স্থাপন করে তাদের 'অংশীদার'[7] ও তাদের সংগঠনকে 'অংশীদারী কারবার'[8] বলে।

অংশীদারীর মূল উপাদান (ESSENTIAL ELEMENTS OF PARTNERSHIP)

ভারতের অংশীদারী আইনের ৪ ধারায় অংশীদারী কারবার সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে অংশীদারীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকা অত্যাবশ্যক :

১. একটি কারবার থাকা প্রয়োজন।

২. সাধারণ অংশীদারী কারবারে একের অধিক এবং বিশজনের অনধিক ব্যক্তি থাকা আবশ্যক। কিন্তু ব্যাঙ্কিং বা অর্থলগ্নীর কারবারে ব্যক্তির সংখ্যা দশজনের অনধিক হওয়া আবশ্যক।

৩. অংশীদারী কারবারগঠনকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে মুনাফা অর্জন ও উহার বন্টন সম্পর্কে চুক্তিবন্ধ সম্পর্ক থাকা আবশ্যক।

৪. মুনাফা অর্জন করাই কারবারটির উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক।

৫. সকল অংশীদারগণই কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন অথবা, তাঁদের মধ্যে যে কেউ অন্যান্য অংশীদারগণের প্রতিনিধিরূপে সকলের পক্ষে কারবার পরিচালনা করবেন।

উপরোক্ত কারণগুলির যে কোন একটির অভাব ঘটলে কারবারটি অংশীদারী রূপে গণ্য হবে না। উদাহরণস্বরূপ একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের এজমালী কারবারের কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ ধরনের কারবারের মুনাফা মালিকগণের মধ্যে বন্টিত হলেও তা অংশীদারী কারবার বলে গণ্য করা যায় না। কারণ একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের কারবার কোন চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট হয় না, জন্মগত অধিকার বলে কারবারের মালিকেরা মুনাফা ভোগ করে থাকে। কিংবা, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে কোন জমিজমা ক্রয় করে উৎপাদিত শস্য নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিলে, তাকেও অংশীদারী কারবার বলা যায় না। কারণ, এক্ষেত্রে কোন 'কারবার'-এর অস্তিত্ব নাই।

বৈশিষ্ট্য: ১. দুই বা ততোধিক ব্যক্তি (ভারতীয় অংশীদারী কারবারের আইনানুযায়ী ব্যাঙ্কিং বা মহাজনী কারবারে সর্বাধিক দশ ও অন্যান্য কারবারে সর্বাধিক বিশ জন) নিজেদের মধ্যে মৌখিক বা লিখিত চুক্তি দ্বারা অংশীদারী কারবার গঠন করতে পারে। তবে চুক্তির উদ্দেশ্য বৈধ ও চুক্তিতে অংশগ্রহণকারিগণ আইনানুযায়ী চুক্তি করিবার উপযুক্ত হওয়া চাই। এ ছাড়া এই জাতীয় কারবার স্থাপনের উপর আর কোন বিধিনিষেধ নাই। অংশীদারী চুক্তির নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয়।

---

7. Partner. 8. Firm.

২. পুঁজি কারবারের অংশীদারেরাই যোগান। তবে তাদের সকলকেই যে সমপরিমাণ পুঁজি দিতে হবে, এমন কোন কথা নাই। বিভিন্ন অংশীদারেরা কম-বেশি পরিমাণের পুঁজি সরবরাহ করতে পারে; এমন কি কেউ পুঁজি সরবরাহ না করেও অংশীদার হতে পারে।

৩. আপাততঃ অংশীদারী কারবারের নিয়ন্ত্রণের ও পরিচালনার ভার যৌথভাবে সকল অংশীদারের উপর ন্যস্ত থাকলেও, বাস্তবে ভারপ্রাপ্ত অংশীদার বা অংশীদারগণই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৪. কারবারের ব্যবস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণের অধিকার সকল অংশীদারেরই আছে বটে, তবে কার্যত তারা এই ভার তাদের মধ্যে এক বা একাধিক অংশীদারের উপর ন্যস্ত করতে পারে।

৫. ভারতের অংশীদারী কারবারের আইনানুযায়ী কারবারের যাবতীয় দায়-দেনার জন্য সকল অংশীদারগণ যৌথভাবে এবং প্রত্যেক অংশীদারই একক বা পৃথকভাবে দায়ী থাকে। অর্থাৎ কোনও কারবারে লোকসান হলে অংশীদারগণকে লাভলোকসানের বখরা সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী ঐ লোকসানের ভার নিজেদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে একজন মাত্র অংশীদার ছাড়া অন্য কোন অংশীদারেরই এমন কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই যা থেকে তা মিটানো যায়, তখন ঐ বিত্তশালী অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেই কারবারের যাবতীয় দেনা মেটাতে হবে।

আইনত অংশীদারী কারবারের সাধারণ কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে কোন অংশীদারকেই অন্যান্য সকল অংশীদারের সাধারণ প্রতিনিধি[9] বলে গণ্য করা হয়। এই কারণে কোন অংশীদার সদ্বিশ্বাসে কারবারের স্বার্থে এবং কারবারের নামে কারবার সংক্রান্ত কোন কাজ করলে, সে জন্য অন্যান্য সকল অংশীদারকেই দায়বদ্ধ করতে পারে।

৬. অংশীদারী কারবারে সাধারণত মুনাফা বন্টন সম্পর্কে চুক্তি থাকে এবং ঐ চুক্তি অনুযায়ী কারবারের লাভ লোকসান অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। সেখানে বখরা সম্পর্কে কোনও চুক্তি থাকে না, তথায় ভারতীয় অংশীদারী আইন অনুযায়ী সকল অংশীদারই সমান অনুপাতে লাভ-ক্ষতির অংশ ভোগ করে।

৭. আইনের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবারের পৃথক কোন সত্তা নাই। এ হল কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র। এর তাৎপর্য এই যে, যে কোন আইন সংক্রান্ত বিষয়ে যেমন, মামলা-মকদ্দমার ক্ষেত্রে বা কোন চুক্তিতে সকল অংশীদারের নাম স্বাক্ষর ও ব্যবহার করতে হয়, কারবারের নাম গ্রাহ্য হয় না।

অংশীদারের শ্রেণীবিভাগ ঃ অংশীদারী কারবারের নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর অংশীদার দেখা যায় ঃ

১. কারবারের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের **সক্রিয় বা উদ্যোগী অংশীদার**[10] বলে।

২. কারবারের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে যাঁরা শুধু পুঁজি যোগান দিয়ে মুনাফার বখরা ভোগ করেন তাঁদের **নিষ্ক্রিয় বা অনুদ্যোগী অংশীদার**[11] বলে।

৩. অনেক সময় কোন কোন অংশীদার কারবার থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর পুঁজিকে ঋণ হিসাবে কারবারে রেখে দেন। আর মুনাফার কোন বখরা পান না, তবে কারবারের মুনাফার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি অনুযায়ী তাঁদের প্রাপ্য সুদের হারে তারতম্য ঘটে। এ'রা **আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার**[12] বলে পরিচিত। **প্রকৃতপক্ষে এ'রা অংশীদার নয়, কারবারের ঋণদাতা মাত্র।**

৪. অনেক সময় কোন ব্যক্তি কোন অংশীদারী কারবার বিশেষের অংশীদার না হয়েও নিজের কথাবার্তা, ব্যবহার ও হাবভাবের দ্বারা কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট নিজেকে ঐ

---

9. General Agent.
10. Active Partner.
11. Sleeping or Dormant Partner.
12. Quasi Partner.

কারবারের অংশীদার বলে বিশ্বাস জন্মিয়ে কোন চুক্তি বা ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যসম্পাদন করলে, তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার[13] বলে। এই জাতীয় ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কারবারের অংশীদার নয় বলে তাঁর কাজের দ্বারা অংশীদারী কারবারকে কোনপ্রকারে দায়বদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে তৃতীয় পক্ষের নিকট তাঁর কাজের জন্য দায়বদ্ধ হন।

এ ছাড়া দায়-দায়িত্ব অনুযায়ী অংশীদারদের আরও দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এটা অবশ্য ইংলণ্ডে যে 'পরিমিত' অংশীদারী কারবার[14] রয়েছে, তার ক্ষেত্রেই খাটে। ভারতে এই জাতীয় কারবার প্রচলিত নাই।

'পরিমিত' অংশীদারী কারবারে দুই প্রকারের অংশীদার থাকে। যথা :

১. **সাধারণ অংশীদার[15]** : তিনি কারবারের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন এবং কারবারের দেনার জন্য তাঁর দায় সীমাহীন হয়।

২. **দায়সীমাবদ্ধ বা পরিমিত অংশীদার[16]** : আইনত এই জাতীয় অংশীদার কারবারের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন না এবং তাঁর নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ দ্বারা কারবারের দেনার জন্য তাঁর দায় সীমিত হয়।

অংশীদারীর চুক্তিপত্র বা সংবিতপত্র
PARTNERSHIP DEED OF AGREEMENT OR ARTICLES OF PARTNERSHIP

নিজেদের মধ্যে কারবারের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, কাজকর্মের পদ্ধতি, লাভলোকসানের বখরা, স্বার্থ ও অধিকার সম্পর্কে চুক্তি দ্বারা অংশীদারেরা অংশীদারী কারবার স্থাপন করে। পরবর্তী কালে প্রয়োজন হলে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা ঐ চুক্তি সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায়।

চুক্তি সম্পাদনকালে, তা প্রভাবিত করতে পারে এমন সকল বিষয়ে ভাবী অংশীদারদের ব্যক্তিগত ঘটনাবলী ও তথ্যাদি প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। কারণ পারস্পরিক চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস[17]-ই অংশীদারীর চুক্তির ভিত্তি।

অংশীদারীর চুক্তি মৌখিক কিংবা লিখিত, দুই প্রকারেরই হতে পারে। আবার লিখিত চুক্তিও দুই প্রকারের হতে পারে। যথা,—ক. শুধুমাত্র লিখিত ও খ. লিখিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত।

অংশীদারীর চুক্তি লিখিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ শুধুমাত্র মৌখিক চুক্তি থাকলে, পরে অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসানের বখরা, স্বার্থ ও অধিকার সম্পর্কে বিবাদ বা মতপার্থক্য ঘটলে তার মীমাংসা করা কঠিন হয়। এইজন্য মৌখিক চুক্তির পরিবর্তে সর্বদাই লিখিত চুক্তি বাঞ্ছনীয়। আবার চুক্তি লিখিত থাকলেও যদি রেজিস্ট্রিকৃত না হয়, তবে স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে কোন অংশীদারের পক্ষে আইনের সাহায্য সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করার অসুবিধা ঘটে। এই কারণে সর্বদাই লিখিত ও রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারী কারবার স্থাপন করা উচিত।

বৈধ সকল বিষয়ই অংশীদারীর চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। চুক্তির বিষয়বস্তু বা ধারাগুলি সম্পর্কে আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অংশীদারগণ নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ও কারবারের সাফল্যের জন্য চুক্তির ধারাগুলি স্থির করে থাকেন। সাধারণত নিম্নলিখিত ধারাগুলি অংশীদারীর চুক্তিনামাতে বিধিবদ্ধ থাকে।

১. অংশীদারগণের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য পরিচয়। ২. কারবারের নাম। ৩. কারবারের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু। ৪. কারবারের মেয়াদ ও স্থায়িত্ব। ৫. পুঁজির পরিমাণ ও সংস্থান—অংশীদারগণের কে কত পুঁজি নিয়োগ করবেন, তার পরিমাণ। ৬. অংশীদারগণের মধ্যে লাভ-লোকসান বন্টনের অনুপাত। ৭. পরিচালন-ব্যবস্থা—কোন্ কোন্ অংশীদার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন বা সকলেই অংশগ্রহণ করবেন কি না। ৮. হিসাব-নিকাশ প্রণালী ও হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা[18]। ৯. অংশীদারগণের মধ্যে কে বা কারা ব্যাঙ্কের আমানতের উপর চেক দস্তখতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন। ১০. অংশীদারদের

13. Partner by holding out. 14. Limited Partnership.
15. General Partner. 16. Limited Partner.
17. 'utmost good faith' or 'uberrimae fidei'. 18. Audit.

মধ্যে কেউ বেতন পাবেন কিনা এবং পেলে তার পরিমাণ। ১১. পুঁজির উপর অংশীদারগণ সুদ পাবেন কিনা এবং পেলে, সুদের হার কত হবে। ১২. অংশীদারগণ কারবার থেকে অগ্রিম টাকা[19] তুলতে পারবেন কিনা এবং পারলে তার পরিমাণ কত এবং তার উপর কোন সুদ ধার্য হবে কিনা, হলে তার হার। ১৩. কোন অংশীদারকে বহিষ্কার ও নূতন অংশীদার গ্রহণের নিয়ম। ১৪. কোন অংশীদারের অবসরগ্রহণ বা মৃত্যু ঘটলে অবলম্বনীয় ব্যবস্থা। ১৫. অংশীদারগণের মধ্যে বিবাদ ঘটলে মীমাংসার জন্য সালিসী[20] নিয়োগের ব্যবস্থা। ১৬. কোন অংশীদারের অবসর গ্রহণ বা মৃত্যু ঘটলে তার স্বত্ব-স্বামিত্ব মিটিয়ে দেবার জন্য কারবারের প্রতিষ্ঠাধিকারের মূল্য নিরূপণের[21] পদ্ধতি। ১৭. কারবার বিলোপের[22] বিধিব্যবস্থা।

অংশীদারগণের অধিকার ঃ কারবারের অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্যগুলি অংশীদারীর চুক্তি দ্বারা স্থির হয়ে থাকে এবং তা সাধারণত অংশীদারীর চুক্তিপত্রে লিখিত থাকে। এই অধিকার ও কর্তব্যগুলি অবশ্য আইনসম্মত হওয়া চাই। তবে, যদি এই সকল অধিকার ও কর্তব্য চুক্তিতে লিখিত না থাকে, তখন সাধারণভাবে, অংশীদারী কারবারের আইন অনুযায়ী অংশীদারগণের নিম্নরূপ অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

অধিকার ঃ ১. প্রত্যেক অংশীদারেরই কারবারের ব্যবস্থাপনা ও দৈনন্দিন কার্যে[23] অংশ গ্রহণের অথবা প্রয়োজন হলে কোন বিশেষ অংশীদার বা অংশীদারগণকে পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের অধিকার আছে।

২. সকল অংশীদারেরই কারবারের নীতি নির্ধারণের আলোচনায় অংশগ্রহণের ও মতামত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। সাধারণ বিষয়সমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের দ্বারাই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও নূতন অংশীদার গ্রহণ, কোন অংশীদারকে বহিষ্কার, কারবারের চুক্তিপত্রের রদবদল এবং কারবারের বিষয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

৩. কারবারের কাগজপত্র, দলিলাদি ও হিসাবপত্র দেখার, পরীক্ষা করার ও প্রয়োজন হলে ঐগুলির প্রতিলিপি নেবার অধিকার সকল অংশীদারেরই আছে।

৪. সকল অংশীদারেরই কারবারের লাভ ও সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার আছে। এ বিষয়ে চুক্তিতে কোন উল্লেখ না থাকলে সকলেই সমানুপাতে তা ভোগ করবে। অনুরূপভাবে কারবারের লোকসানও সকলের মধ্যে সমানুপাতে বন্টন করা হবে।

৫. সদ্বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কারবারের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে কোন কোন অংশীদার যদি কারবারের জন্য কোন খরচ করেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে কারবার থেকে তাঁর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকবে।

৬. কারবারের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নূতন কার্যক্রম গ্রহণ এবং মেয়াদ উত্তরণের পরেও কারবার পরিচালনের ক্ষেত্রে সকল অংশীদারের নিরবচ্ছিন্ন অধিকার বজায়[24] থাকবে।

৭. কোন অংশীদার চুক্তি অনুযায়ী পুঁজি বাবদ নিয়োজিত অর্থের অতিরিক্ত কারবারে প্রদান করলে, তার উপর শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ পাওয়ার অধিকার থাকবে।

৮. বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজন অনুভব করলে যে কোন অংশীদার কারবার প্রসমাপনের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন এবং ঐ ক্ষেত্রে কারবারের দায়াতিরিক্ত সম্পত্তি চুক্তিমত অথবা চুক্তিতে উল্লিখিত না থাকলে অংশীদারগণের মধ্যে সমানুপাতে বন্টন করা হবে।

অংশীদারগণের কর্তব্য ঃ ১. প্রত্যেক অংশীদারকেই কারবারের কার্যে সততা, যত্ন ও অধ্যবসায় প্রয়োগ করতে হবে।

২. কারবারের কার্যকলাপ অংশীদারদের সাধারণ ও সর্বাধিক স্বার্থ ও সুবিধার অনুকূলে পরিচালনা করতে হবে।

৩. 'পারস্পরিক চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস' অংশীদারীর চুক্তির ভিত্তি বলে, অংশীদারদের পরস্পরের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত হতে হবে।

19. Drawing. 20. Arbitration. 21. Valuation of goodwill.
22. Dissolution. 23. Management and conduct. 24. Continuity.

৪. কারবারের সাধারণ দৈনন্দিন কার্যে, সকল অংশীদারকেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

৫. কোন অংশীদারই কারবারের কার্যকলাপ নিজ স্বার্থসাধনের অভিপ্রায়ে ব্যবহার করতে পারবেন না। কারবারের মালপত্র বেচাকেনা করতে গিয়ে কোন অংশীদারই নিজের জন্য দস্তুরি[25] বা মুনাফা অর্জন করতে পারবেন না।

৬. কোন অংশীদারই কারবারের কোন সম্পত্তি নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা, মুনাফা ও আয় অর্জনের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না। কারবারের সম্পত্তি কেবলমাত্র কারবারের কাজেই ব্যবহার করতে হবে।

৭. কারবারের সকল প্রকারের কাজের জন্য সকল অংশীদার যৌথভাবে ও প্রত্যেক অংশীদার পৃথক্ ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

অংশীদারগণের দায়ঃ কারবারের সকল প্রকার দেনার জন্য অংশীদারগণ সকলেই যৌথ ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এই কারণে কারবারের দেনা বা চুক্তির জন্য যে কোন একজন অংশীদার অথবা সকল অংশীদারের নামেই মামলা দায়ের করা যায়। কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন কারবারে পরবর্তীকালে অংশীদার হিসাবে যোগদান করলে, চুক্তি ছাড়া আগের দেনার জন্য তিনি দায়ী হবেন না।

প্রত্যেক অংশীদারই, অন্যান্য অংশীদারের সাধারণ প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হয় বলে, যে কোন অংশীদারের কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের দ্বারা সকল অংশীদারই দায়বদ্ধ হন।

অংশীদারী কারবার থেকে অবসর গ্রহণের পর, অবসরপ্রাপ্ত অংশীদারের আর কারবারের দেনার জন্য কোন দায় থাকে না। এইজন্য সাধারণত কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ কালে কারবার সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট উক্ত মর্মে নোটিস জারী করা হয়। তা ছাড়া তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ মহাজন রাজী থাকলে অংশীদার থাকাকালীন কারবারের দেনার দায় থেকেও অবসরগ্রহণকারী অংশীদার রেহাই পেতে পারেন।

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশনঃ অংশীদারী কারবার নিবন্ধন করা আইনত বাধ্যতামূলক নয়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রেজিস্ট্রেশন দ্বারা অংশীদারী সৃষ্টি হয় না। অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তিদ্বারাই তা সৃষ্টি হয়। তবে, রেজিস্ট্রেশন দ্বারা অংশীদারী কারবারের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধকের[26] নিকট ৩ টাকা ফী সহ নিম্নলিখিত বিষয়ে বিবৃতি সম্বলিত নিবন্ধনের আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়ঃ

১. প্রতিষ্ঠানের নাম।
২. কর্মস্থল অথবা প্রধান কর্মস্থল।
৩. অন্যান্য যে সকল স্থানে প্রতিষ্ঠানের কারবার রয়েছে।
৪. প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক অংশীদারের যোগদানের তারিখ।
৫. অংশীদারগণের পূর্ণ নাম ও স্থায়ী ঠিকানা।
৬. কারবারের মেয়াদ।

এই বিবৃতিটি সকল অংশীদার কর্তৃক অথবা তাদের দ্বারা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক। ফী সহ এই বিবৃতি প্রাপ্তির পর তৎসম্পর্কে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে তিনি অংশীদারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবন্ধন বহিতে তা লিপিবদ্ধ করেন। এর দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন ঘটল বলে গণ্য করা হয়।

পরবর্তীকালে ঐ দাখিলকৃত বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে পরিবর্তন ঘটলে তা নিবন্ধককে জানাতে হয় এবং তদনুযায়ী তিনি নিন্ধন বহিতে তা লিপিবদ্ধ করে থাকেন।

প্রয়োজনীয় ফী প্রদান করে যে কোন ব্যক্তি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধকের অফিসে অবস্থিত অংশীদারীর নিবন্ধন বহি দেখতে এবং তার প্রতিলিপি নিতে পারে।

---

25. Commission. 26. Registrar of Firms.

নিবন্ধন না করার ফলাফল : অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন না করলে নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলি দেখা দেয় :

১. অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন না হলে কোন অংশীদার তাঁর অধিকার এবং অংশীদারী চুক্তি আইনত বলবৎ করার জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানটির বা তার কোন অংশীদারের বিরুদ্ধে আদালতে মকদ্দমা দায়ের করতে পারেন না।

২. কোন অ-রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী প্রতিষ্ঠান কোন চুক্তির বলে প্রাপ্ত অধিকার বলবৎ করার জন্য তৃতীয়পক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে না।

৩. কোন অ-রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী প্রতিষ্ঠান মকদ্দমায় বাদী পক্ষের নিকট প্রাপ্য অর্থের জন্য পাল্টা দাবি[২৭] উপস্থিত করতে পারে না।

কিন্তু, কোন দেউলিয়া অংশীদারের দায় মেটাবার জন্য নিযুক্ত সরকারী স্বত্বনিয়োগী[২৮] বা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত রিসিভারের ক্ষেত্রে ঐ ধারা প্রয়োজ্য হবে না।

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ৬৯ ধারার নিম্নোক্ত ব্যতিক্রমগুলি আইন-সিদ্ধ :

ক. কোন অ-রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ঐ প্রতিষ্ঠানের বিলোপ-সাধন এবং হিসাব চেয়ে মামলা দায়ের করতে পারেন।

খ. অ-রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন ঘটলে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য অংশীদারগণ মামলা দায়ের করতে পারেন।

গ. কোন অঞ্চলে[২৯] রাজ্য সরকার অংশীদারী আইনের ৫৬ ধারা অনুসারে, অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের প্রয়োজন নাই বলে ঘোষণা করলে, অ-রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কোন মকদ্দমা দায়ের করবার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না।

ঘ. ছোট আদালতের[৩০] এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রে, অ-রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী প্রতিষ্ঠান তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকা পর্যন্ত দাবির মামলা দায়ের করতে পারে [অংশীদারী আইনের ৬৯ ধারা]।

কারবারের মেয়াদ : কারবারের মেয়াদ সম্পর্কে তিন প্রকারের অংশীদারী কারবার দেখা যায়। প্রথমত, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে অংশীদারী কারবার স্থাপিত হতে পারে। এই জাতীয় কারবারকে '**নির্দিষ্ট মেয়াদের অংশীদারী কারবার**'[৩১] বলে। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট কার্য সাধনের জন্যও একটি অংশীদারী কারবার স্থাপিত হতে পারে। তাকে '**বিশেষ অংশীদারী কারবার**'[৩২] বলে। তৃতীয়ত, কারবারের কার্যকাল সম্পর্কে কোন উল্লেখ থাকে না, এমন অংশীদারী কারবারও থাকতে পারে। এই জাতীয় কারবারকে '**ঐচ্ছিক অংশীদারী কারবার**'[৩৩] বলে।

সাধারণত প্রথমোক্ত ধরনের কারবারের নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ও দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর কারবারে অভীষ্ট কার্য সম্পাদনের পর প্রসমাপন ঘটে। কিন্তু কখনও কখনও ঐগুলি তারপরও চালু থাকতে পারে এবং ঐ সময়ে অংশীদারদের স্বার্থ ও নিরবচ্ছিন্ন অধিকার বজায় থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর কারবারের স্থায়িত্ব অংশীদারদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

অংশীদারীর প্রসমাপন (DISSOLUTION OF PARTNERSHIP)

ভারতের অংশীদারী কারবারের আইনে অংশীদারীর প্রসমাপন[৩৪] এবং অংশীদারী কারবারের প্রসমাপন[৩৫], এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদি কোন অংশীদারী চুক্তিতে একথার উল্লেখ থাকে যে কোন অংশীদারের মৃত্যু, মস্তিষ্কবিকৃতি, দেউলিয়া হওয়া, বহিষ্কার অথবা অবসরগ্রহণের দ্বারা কারবারের অবসান ঘটবে না, একই নামে কারবারটি চালু থাকবে, সে ক্ষেত্রে অংশীদারীর বিলোপসাধন ঘটলেও অংশীদারী কারবারটির বিলোপ-সাধন ঘটে না। সেরূপ, পুরাতন অংশীদারী চুক্তির রদবদল, যেমন নূতন অংশীদার গ্রহণ এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অংশীদারী কারবার গঠিত হয়ে থাকলে, তার মেয়াদ পার হওয়ার

27. Set off. 28. Official Assignee. 29. Areas. 30. Small causes Court.
31. Partnership for a fixed period. 32. Particular partnership.
33. Partnership at will. 34. Dissolution of Partnership.
35. Dissolution or Liquidation of a firm.

পরেও কারবার চলতে থাকলে, তাতে পুরোতন অংশীদারীর অবসান ঘটে, কিন্তু অংশীদারী কারবারের বিলোপ ঘটে না। কিন্তু **অংশীদারী কারবারের প্রসমাপন বললে, সকল অংশীদারগণের মধ্যে অংশীদারী সম্বন্ধের বিলোপসাধন ও কারবারের অবসান উভয়ই বুঝায়।**

অংশীদারী কারবারের প্রসমাপন (DISSOLUTION OF FIRM)

নিম্নলিখিত বিভিন্নভাবে অংশীদারী কারবারের প্রসমাপন ঘটতে পারেঃ

১. অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে প্রসমাপন—সকল অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে অথবা তাদের মধ্যে চুক্তির দ্বারা কারবারের বিলোপসাধন ঘটতে পারে।

২. কোন আকস্মিক অথবা পূর্বনির্দিষ্ট ঘটনার ফলে প্রসমাপন—

ক. যদি কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কারবার স্থাপিত হয়ে থাকে তবে তা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তার বিলোপ ঘটে।

খ. যদি কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য কারবার স্থাপিত হয়ে থাকে তবে তা সম্পন্ন হওয়ার পর কারবার বিলুপ্ত হয়।

গ. কোন অংশীদারের মৃত্যু অথবা তাকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হলে অংশীদারী কারবারের বিলোপ ঘটে।

৩. বাধ্যতামূলক প্রসমাপন—

ক. সকল অথবা একজন ছাড়া অপর সকল অংশীদার দেউলিয়া হলে বাধ্যতামূলক ভাবে কারবারের বিলোপ ঘটে।

খ. যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে যার দরুন কারবারের ব্যবসায় অবৈধ হয়ে পড়ে, তার ফলেও বাধ্যতামূলকভাবে কারবার বিলুপ্ত হয়। তবে যদি এমন হয় যে, কোন অংশীদারী কারবার নানাবিধ যে সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, ঐগুলির মধ্যে একটি বা কয়েকটি অবৈধ হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু সবগুলি অবৈধ হয় নি, তা হলে, যে ব্যবসায়গুলি বৈধ রয়েছে সে বিষয়ে কারবারটি অবৈধ হবে না এবং তার বিলোপ ঘটবে না।

৪. 'ঐচ্ছিক অংশীদারী' কারবারের বেলায় যে কোন অংশীদার নোটিস দ্বারা অন্যান্য অংশীদারদের তার কারবার বিলোপ করার অভিপ্রায় জানালে, কারবারের প্রসমাপন ঘটে।

৫. আদালতের নির্দেশে প্রসমাপন—কোন অংশীদার কারবারের বিলোপসাধনের জন্য মামলা দায়ের করলে, আদালত নিম্নলিখিত কারণে কারবার বিলোপের নির্দেশ দিতে পারে—

ক. কোন অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি হলে;

খ. কোন অংশীদার স্থায়িভাবে অংশীদারের কর্তব্য সাধনে অক্ষম হলে;

গ. কোন অংশীদার যে কোন অপরাধের দরুন দন্ডপ্রাপ্ত হলে;

ঘ. কোন অংশীদার অংশীদারীর চুক্তি লঙ্ঘন করে অন্যান্য অংশীদারগণের পক্ষে কারবার পরিচালনা অসম্ভব করে তুললে;

ঙ. কোন অংশীদার তৃতীয় পক্ষের নিকট, কারবারে তার যে স্বার্থ রয়েছে তা হস্তান্তরিত করলে কিংবা তার কোন ঋণের জন্য কারবারে তার যে স্বার্থ ও অংশ আছে তা আদালত কর্তৃক আটক হলে;

চ. আদালত যদি মনে করে যে, লোকসান ছাড়া ঐ কারবার চলতে পারবে না তা হলে; এবং

ছ. আদালত যদি মনে করে যে, ঐ কারবার বিলোপ করাই ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারপূর্ণ[৩৬] কাজ হবে।

পরিমিত অংশীদারী কারবার (LIMITED PARTNERSHIP)

সাধারণ অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের সীমাহীন দায়ের দরুন যে অসুবিধা দেখা দেয় তা দূর করার জন্য ইংলন্ডে ১৯০৭ সালে একটি আইনের দ্বারা এক নূতন ধরনের অংশীদারী কারবার চালু হয়। ঐ আইন 'পরিমিত অংশীদারী' কারবার আইন এবং ঐ কারবার 'পরিমিত অংশীদারী' কারবার নামে পরিচিত। ভারতে 'পরিমিত অংশীদারী' কারবার নেই।

36. Just and equitable.

পরিমিত অংশীদারী কারবারের বৈশিষ্ট্যঃ ১. এর সর্বাধিক সদস্যসংখ্যা ২০ এবং সদস্যদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী থাকে। কারবারের দেনার জন্য কিছু সংখ্যক অংশীদারের দায়ের পরিমাণ তাদের প্রদেয় পুঁজি দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় বলে তারা 'পরিমিত অংশীদার' নামে পরিচিত। অপর শ্রেণীর অংশীদারকে 'সাধারণ' অংশীদার বলে। প্রত্যেক 'পরিমিত অংশীদারী' কারবারে অন্ততপক্ষে একজন সাধারণ অংশীদার থাকবে, যার দায় সীমাহীন।

২. এই কারবারে নিবন্ধন আইনত বাধ্যতামূলক। তা না হলে কারবারটিকে সাধারণ অংশীদারী কারবার[37] বলে গণ্য করা হবে এবং সকল অংশীদারই 'সাধারণ অংশীদার' বলে গণ্য হবে।

৩. 'পরিমিত' অংশীদারগণের কারবারের কাজে যোগদানের অধিকার নাই বা তারা কারবারের 'সাধারণ প্রতিনিধি'[38] বলে গণ্য হয় না। কিন্তু যদি কোন 'পরিমিত' অংশীদার কারবারের কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করে তবে তার কাজে অংশ গ্রহণকালীন কারবারের দেনার জন্য তাকে সম্পূর্ণ দায়ী থাকতে হবে।

৪. 'পরিমিত' অংশীদার, কারবারের অংশীদার থাকাকালীন তার পুঁজির কোন অংশ তুলতে পারবে না।

৫. 'পরিমিত' অংশীদার কারবার থেকে কোন অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। যদি এইরূপ অগ্রিম নেওয়া হয় তবে সে কারবারের দেনার জন্য অগ্রিমের সম পরিমাণ দায়ী থাকবে।

৬. 'সাধারণ' অংশীদার বা অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে 'পরিমিত' অংশীদার স্বত্ব-নিয়োগী[39] নিয়োগ করতে পারে।

৭. নূতন অংশীদার গ্রহণের জন্য 'পরিমিত' অংশীদারগণের সম্মতি প্রয়োজন হয় না।

৮. 'পরিমিত' অংশীদারের মৃত্যু বা দেউলিয়া হওয়ার জন্য অংশীদারী কারবারের বিলোপ ঘটে না, বা কোন 'পরিমিত' অংশীদার কারবারের বিলোপের জন্য নোটিস জারি করতে পারে না।

'পরিমিত' অংশীদারের সুবিধাঃ ১. তার দায় সীমাবদ্ধ থাকায় তাকে অল্প ঝুঁকি নিতে হয় বলে 'পরিমিত' অংশীদারী কারবার বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়। ২. 'পরিমিত' অংশীদারের দায় বৃদ্ধি না করে তাকে মুনাফা ভোগে সাহায্য করে।

'পরিমিত' অংশীদারের অসুবিধাঃ ১. মালিক হওয়া সত্ত্বেও 'পরিমিত' অংশীদারগণ কারবার পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ২. পুঁজির কোন অংশ বা অগ্রিম বাবদ কোন অর্থ সে কারবার থেকে তুলতে অক্ষম। ৩. নোটিস জারি করে সে কারবারের বিলোপসাধন করতে পারে না।

সাধারণ অংশীদারের সুবিধাঃ ১. কারবার সম্প্রসারণের জন্য 'পরিমিত' অংশীদার গ্রহণ করে সহজেই পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

২. প্রয়োজন হলে নূতন অংশীদার গ্রহণ করা সহজে সম্ভব; কারণ এ ব্যাপারে 'পরিমিত' অংশীদারগণের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

৩. সাধারণত 'পরিমিত' অংশীদারী কারবারে 'সাধারণ' অংশীদার মুষ্টিমেয় থাকায় এবং কারবারের কার্য পরিচালনায় 'পরিমিত' অংশীদারের অংশ গ্রহণের অধিকার না থাকায় মুষ্টিমেয় 'সাধারণ' অংশীদারদের পক্ষে দ্রুত কারবারের পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ সম্ভব হয়।

৪. 'পরিমিত' অংশীদারগণ কারবার থেকে পুঁজির অংশ বা কোন অগ্রিম অর্থ তুলতে পারে না বলে কারবারের পুঁজির হঠাৎ পরিবর্তনজনিত অসুবিধা সৃষ্টি হয় না।

৫. পরিমিত অংশীদারের মৃত্যু বা মস্তিষ্ক বিকৃতি বা দেউলিয়া হওয়ার ফলে অংশীদারী স্বত্বের বিলোপ ঘটে না বলে স্থায়িত্ব বেশী।

সাধারণ অংশীদারের অসুবিধাঃ ১. এই কারবারের নিবন্ধন আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ায়, দ্রুত কারবার গঠনের পথে এটি একটি অন্তরায়।

২. কারবারের নিবন্ধনের দরুন গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না। কারণ নিবন্ধকের

---

37. General Partnership. 38. General Agent. 39. Assignee.

[illegible] [illegible] কারবারের বিবরণী থেকে যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য নিতে পারে ও কারবারের বিভিন্ন বিষয় জানতে পারে।

নাবালক অংশীদার (MINOR AS PARTNER

অংশীদারী কারবার মূলত চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নাবালক আইনত চুক্তি করতে অনুপযুক্ত বা অক্ষম[৪০]। সেজন্য কোন নাবালক অংশীদারী কারবারের অংশীদার হতে পারে না। তবে অংশীদার না হলেও অন্যান্য সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে কোন নাবালক চলতি অংশীদারী কারবারে গৃহীত হয়ে কারবারের সুবিধাগুলি ভোগ করার সুযোগ লাভ করতে পারে।

কারবারের দেনার জন্য অন্যান্য সকল অংশীদারের দায় সীমাহীন হলেও নাবালকের দায় সীমাবদ্ধ। কারবারে তার অংশ ও মুনাফা, দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনষ্ট হয় না। কিংবা দেনার দায়ে অন্যান্য অংশীদারগণকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হলেও নাবালককে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা যায় না।

সাবালক হওয়ার পর সে অংশীদারী কারবারের সাথে তার সংস্রব ছিন্ন করতে পারে; অথবা অংশীদার হিসেবে কারবারে যোগ দিতে পারে। সাবালকত্ব লাভের ছয় মাসের মধ্যে প্রকাশ্য ঘোষণা[৪১] দ্বারা তাকে এই সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। যদি এ সম্পর্কে তার কোনরূপ ঘোষণা প্রকাশিত না হয়, তবে আইনত সে কারবারের অংশীদার বলে গণ্য হবে।

কারবারে অংশীদার হিসাবে যোগ দিলে, নাবালক থাকা কালে যে তারিখ থেকে কারবারের সংগে তার সংস্রব স্থাপিত হয়েছিল, সেদিন হতে কারবারের যাবতীয় দেনা ও কার্যকলাপের দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে।

অংশীদারী কারবারের সুবিধাঃ ১. কোন আইনগত আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা[৪২] নাই বলে, সহজেই ও দ্রুত অংশীদারী কারবার গঠন করা যায়।

২. একাধিক অংশীদার নিয়ে এটি গঠিত হয় বলে, একমালিকী কারবারের তুলনায় অংশীদারী কারবার বেশি পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে। ফলে অংশীদারী কারবারের সাহায্যে বৃহদায়তন উৎপাদন সংগঠন করা যায়।

৩. একাধিক অংশীদার থাকায় ও অংশীদারগণ যৌথ ও ব্যক্তিগত ভাবে সীমাহীন দায় বহন করে বলে অংশীদারী কারবার, একমালিকী কারবারের তুলনায় বাজার হতে বেশী ঋণ সংগ্রহ করতে পারে।

৪. বিভিন্ন অংশীদার শিক্ষাদীক্ষা অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কারবারের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন ও তার ফলে কারবারের পরিচালনার সামগ্রিক দক্ষতা বাড়ে।

৫. অংশীদারগণের দায় সীমাহীন হওয়ায় তারা অত্যন্ত সাবধানে সযত্নে কারবারের কার্য পরিচালনা করে। ফলে কারবারের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়।

৬. পরিচালনা কার্যে সকল অংশীদারেরই অংশ গ্রহণের অধিকার থাকায় ও ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে অংশীদারী কারবারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার স্বাধীনতা থাকায়, এই কারবারের অংশীদারগণের স্বার্থ ও ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভয়ে ভীত হওয়ার কারণ থাকে না।

৭. অংশীদারী কারবারে প্রয়োজনমত নূতন অংশীদার গ্রহণ করে পরিচালনার দক্ষতা ও সংগঠনের আয়তন বৃদ্ধি এবং পুঁজির সম্প্রসারণ এবং অবস্থানুযায়ী সহজে ব্যবসায়ের কার্যকলাপের পরিবর্তন করা বহুলাংশে সহজ।

অংশীদারী কারবারের অসুবিধাঃ ১. অংশীদারগণের সীমাহীন যৌথ ও ব্যক্তিগত দায়ের জন্য অংশীদারী কারবার ব্যবসায়ের উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করে।

২. প্রত্যেক অংশীদার কারবার সংক্রান্ত তার কাজের দ্বারা অপর অংশীদারগণকে দায়বদ্ধ করে বলে, অনেকে এই ঝুঁকির মধ্যে যেতে চায় না।

---

40. Incompetent. 41. Public Notice. 42. Legal Formalities.

৩. সকল অংশীদারই কারবারের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে বটে কিন্তু সকলেরই যোগ্যতার মান সমান নয়। তাই অনেক সময়ে 'অনেক সন্ন্যাসী'তে গাজন নষ্ট হয়।

৪. অংশীদারদের মধ্যে মতানৈক্য, যে কোন অংশীদারের মৃত্যু, মস্তিষ্ক বিকার, দেউলিয়া প্রভৃতি কারণে যে কোন সময়ে অংশীদারী কারবারের অবসান ঘটতে পারে। এইরূপে অনেক সময়ে প্রতিষ্ঠিত কারবার হঠাৎ বিনষ্ট হয়।

৫. একমাত্র সর্বসম্মতিক্রমে ছাড়া আর কোনরূপে কোন অংশীদারের কারবারের অংশ ও স্বার্থ হস্তান্তরিত করা যায় না। সেজন্য অনেক বিনিয়োগেচ্ছু ব্যক্তি অংশীদারী কারবারে পুঁজি নিয়োগ করতে ইতস্তত করে।

৬. সকল অংশীদারের মতামত নিয়ে কারবার চালাতে হয় বলে অংশীদারী কারবার একমালিকী কারবারের মত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

৭. একমালিকী কারবার অপেক্ষা বেশী পুঁজি তুলতে পারলেও, অংশীদারী কারবারের পক্ষে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করা কঠিন।

●

৩. একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবার
3. JOINT HINDU FAMILY BUSINESS

একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবার বলতে এমন এক ধরনের কারবার বোঝায় যা উত্তরাধিকার বলে কোন একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের একান্নভুক্ত শরিকগণের যুক্ত বা এজমালী মালিকানার অধীন এবং যা ঐ শরিকগণের মধ্যে বাঁটোয়ারা করা হয় নি। এই জাতীয় কারবার সম্পূর্ণভাবে হিন্দু বিধির দ্বারা শাসিত। অংশীদারী আইন বা অপর কোন আইন এর উপর প্রযোজ্য নয়।

হিন্দুবিধি দুই প্রকারের, দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা। দায়ভাগ বিধি কেবল আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত। আর ভারতের অন্যত্র সকল অঞ্চলে মিতাক্ষরা বিধি চালু রয়েছে।

সাধারণত মিতাক্ষরা বিধির অধীনেই একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবারের উদ্ভব হয়ে থাকে।

মিতাক্ষরা নিয়মে, যাদের মধ্যে পারস্পরিক শরিকানার স্বার্থ আছে শুধু এরূপ ব্যক্তিদের নিয়েই একান্নবর্তী হিন্দু পরিবার গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাশ হওয়ার আগে, পুত্রসন্তানের ধারায়[৪৩] পর পর তিন পুরুষ পর্যন্ত, জন্মমুহূর্ত হতে, পৈতৃক সম্পত্তিতে এরূপ শরিকানা স্বার্থ[৪৪] জন্মে বলে গণ্য করা হত। ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাশ হওয়ার পর থেকে, কোন পুরুষ শরিকের মৃত্যুর পর তার শরিকানার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার কোন নারী আত্মীয়েরও অংশ[৪৫] থাকবে বলে স্থির হয়েছে। এমন কি ঐ নারী-আত্মীয়দের মারফত উক্ত মৃত পুরুষ শরিকের কোন পুরুষ আত্মীয় পর্যন্ত ঐ মৃত পুরুষ শরিকের শরিকানার অংশ লাভ করতে পারে। **এইরূপে জন্মাধিকার বলে[৪৬] মিতাক্ষরা বিধি-শাসিত একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবারের শরিকানা বা সদস্য পদ সৃষ্ট হয় ও এইরূপ শরিকগণকে নিয়ে কারবারটি গঠিত হয়।**

দায়ভাগ নিয়মে সম্পত্তির অর্জনকারীই সম্পত্তির নিরংকুশ মালিক বলে বিবেচিত হয়। পিতা যদি কোন কারবার প্রতিষ্ঠা করেন, তবে তাঁর জীবিতকালে তিনিই একক মালিক থাকেন, সম্পত্তির ও কারবারের শরিকানা আর কেহ পায় না। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রেরা (বর্তমানে কন্যারাও) মালিকানা পায় অথবা, ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর জীবিতকালে সম্পত্তির মালিকানা অপর কেহকে দান করে যেতে পারেন।

দায়ভাগ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হিন্দু পরিবারের পিতা যদি তাঁর পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে কারবারের শরিক বলে গ্রহণ করেন, তবে ঐ কারবার একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবার বলে গণ্য হতে পারে।

বৈশিষ্ট্যঃ ১. একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবার পিতা ও পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ

43. Male line of succession.
44. Coparency interest.
45. Share.
46. By birth or status.

সদস্যের দ্বারা পরিচালিত হয় ও তাকে 'কর্তা' বা কর্মাধ্যক্ষ বা ম্যানেজার বলে। তিনি কারবার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আয়ব্যয়ের তদারক করেন।

২. তিনিই কারবারের নীতি নির্ধারণ করেন এবং অন্যান্য শরিকগণ কারবারের পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের অংশ গ্রহণের অধিকার দাবি করতে বা কর্তা কর্তৃক নির্ধারিত নীতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না।

৩. শরিকগণ অসন্তুষ্ট হলে শুধুমাত্র কারবারের সম্পত্তি বণ্টনের জন্য মামলা দায়ের করতে পারে।

৪. কারবারের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা কর্তার আছে এবং সেজন্য শরিকগণ কারবারে তাঁদের নিজ নিজ শরিকানা বা অংশের[৪৭] পরিমাণ পর্যন্ত দায়ী থাকে।

৫. কারবারের পরিচালক হওয়ায় কারবার বন্ধক দেওয়া, বিক্রয় করা ও এমন কি কারবার তুলে দেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত কর্তার আছে বলে স্বীকৃত হয়।

৬. তিনি কারবার সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে সহি, ঋণ আদায়, আপস-রফা ইত্যাদি একক-ভাবেই করতে পারেন, কিন্তু কারবারের প্রাপ্য পাওনা মকুব করতে পারেন না।

সুবিধাঃ ১. পারিবারিক কারবারের কাজে পরিবারের যে শরিক যেরূপ অংশই গ্রহণ করুক, প্রত্যেকেই কারবার থেকে একটি ন্যূনতম পরিমাণ আয় লাভের সুযোগ পায়।

২. পরিবারের শরিক বা সদস্যগণের মধ্যে তাদের যোগ্যতা অনুসারে কারবারের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলির ভার বন্টন করা যায়।

৩. শিশুকাল থেকেই পরিবারের সকলে পারিবারিক কাজে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

৪. পরিবারের অসুস্থ, অক্ষম, শিশু ও বিধবাগণের ভরণপোষণের ভার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর অর্পিত হয়।

৫. পরিবারের সকলেই একে অপরের জন্য আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতার শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।

অসুবিধাঃ ১. পারিবারিক কারবার থেকে মাসিক বাঁধা-ধরা আয়ের ব্যবস্থা থাকায়, পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে আলস্য জন্মায়।

২. কাজ অনুযায়ী শরিকগণের যথাযথ পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা না থাকায় পরিশ্রমী শরিকগণের কাজের দ্বারা অলস শরিকগণ লাভবান হয়। সুতরাং পরিশ্রমী শরিকগণ নিরুৎসাহিত হয়।

৩. তুচ্ছ কারণে প্রায়ই পরিবারের মধ্যে কলহবিবাদ ঘটে, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যেতে পারে ও একান্নবর্তী কারবারের অবসান ঘটতে পারে।

৪. পরিবারের 'কর্তা' পরিবার ও পরিবারের প্রধান বলে গণ্য হন। তাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের প্রবল প্রতাপে পরিবারের তরুণ সদস্যদের ব্যক্তিত্ব, উদ্যোগ ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় না। অপর দিকে তাঁর উপর সকলের নির্ভরতা সৃষ্টি হয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ এক নিষ্ক্রিয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

৪. কোম্পানী বা যৌথমূলধনী কারবার
4. COMPANY

ভূমিকাঃ একমালিকী, অংশীদারী ও পারিবারিক, এই সব পুরাতন কারবারী সংগঠনগুলির প্রধান অসুবিধা এই যে, প্রথমত, এদের পক্ষে আধুনিক বৃহদায়তন কারবারের উপযোগী বেশী পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। অল্প পরিমাণ পুঁজি নিয়ে কারবার চালাতে গেলে আকার ছোট এবং মুনাফা কম হয়। দ্বিতীয়ত, মালিক অথবা মালিকগণ নিজেরাই এই প্রকার কারবার পরিচালনা করে বটে, কিন্তু তাদের নিজেদের হয়ত কারবার পরিচালনার দক্ষতা বিশেষ থাকে না, আবার কারবার ছোট হওয়ায় ভাল বেতনে সুদক্ষ ব্যবস্থাপক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে না এবং উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত করা যায় না। তৃতীয়ত, এই সকল কারবারে কারবারের

47. Share interest.

দেনার জন্য মালিক বা মালিকগণের দায় সীমাহীন বলে অনেকেই এই জাতীয় কারবার স্থাপনে আগ্রহী হয় না। এই তিনটি প্রধান অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে আধুনিক কালে যৌথমূলধনী কারবার বা সংক্ষেপে 'কোম্পানী' নামে এক নূতন ধরনের কারবারী সংগঠন প্রবর্তিত হয়েছে।

এর পুঁজিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে ঐগুলির এক একটি অংশকে 'শেয়ার' বলা হয়। বহু ব্যক্তি এর পুঁজিতে তাদের ইচ্ছামত পরিমাণে অংশ প্রদান করতে পারে। পুঁজিতে যে যেমন অংশ প্রদান করে তাকে সেই মত এক একটি 'অংশপত্র' বা 'শেয়ার সার্টিফিকেট' প্রদান করা হয়। সুতরাং বহুসংখ্যক ব্যক্তির নিকট থেকে পুঁজির কমবেশী অংশ সংগ্রহ করে এই যৌথমূলধনী কারবার এক বিপুল পরিমাণ পুঁজিতহবিল গঠন করতে পারে এবং তার সাহায্যে এক বিরাট আকারের কারবার স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারে। তা ছাড়া, একমালিকী বা অংশীদারী কারবারের মত শেয়ারহোল্ডার বা কোম্পানীর মালিকগণের নিজেদের এই কারবার চালাতে হয় না। এজন্য কোম্পানী থেকে উপযুক্ত বেতনে সুদক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়। সর্বোপরি, কোম্পানীর দেনার জন্য এর মালিক, অর্থাৎ শেয়ারহোল্ডারগণের দায়, তারা কোম্পানীর পুঁজির যে পরিমাণ অংশ অর্থাৎ, শেয়ার কিনেছে তার মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। যদি তারা ঐ শেয়ারগুলির পূর্ণ-মূল্য প্রদান করে থাকে তবে, কোম্পানীর দেনার জন্য তাদের আর কোন ব্যক্তিগত দায় থাকে না; ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেজন্য বিনষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। শেয়ারহোল্ডারগণ বৎসর শেষে কোম্পানীর মুনাফার অংশ ভোগের অধিকার লাভ করে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে তাদের নিজ নিজ কাজকর্মে আত্মনিয়োগের অবকাশ পায়। এই প্রকার নূতন কারবারী সংগঠন প্রবর্তিত হওয়ায়, আধুনিক কালে বৃহদায়তন শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা সম্ভব হয়েছে।

সংজ্ঞা: খ্যাতনামা বিচারপতি লিন্ড্লের কথায়, "একটি কোম্পানী হল একটি স্বেচ্ছা-মূলক সমিতি অথবা বহুব্যক্তির সংগঠন যারা অর্থ বা আর্থিক সম্পদ প্রদান করে একটি যৌথ তহবিল সৃষ্টি করে এবং তা কোন ব্যবসায় বা কারবারে নিয়োগ করে এবং তা থেকে উৎপন্ন মুনাফা অথবা ক্ষতির অংশভাগ নেয়। এই যৌথ তহবিলটি টাকার অঙ্কে প্রকাশিত হয় এবং তাই হল কোম্পানীর পুঁজি। যে সকল ব্যক্তি তা প্রদান করে অথবা, সেটি যাদের মালিকানার অধীন, তারা কোম্পানীর সদস্য। প্রত্যেক সদস্য পুঁজির যে অনুপাতের মালিক, তাই তার শেয়ার। শেয়ারগুলি নির্দিষ্ট মূল্যের এবং কোম্পানীর সমগ্র পুঁজি কতকগুলি সমসংখ্যক শেয়ারে বিভক্ত হয়। কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় শেয়ার হস্তান্তরের অধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে বটে, তবে, সাধারণত শেয়ারগুলি হস্তান্তরযোগ্য" ("A company is a voluntary association or an organisation of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it in some trade or business and who share the profit or loss arising therefrom. The common stock so contributed is denoted in money and is the capital of the company. The persons who contribute it or to whom it belongs are members of the company. The proportion of capital to which each member is entitled to his share. The shares are of fixed value and the whole capital of the company is divided into equal number of shares. The shares are generally transferable although under certain circumstances the right to transfer may be restricted.")।

১৯৫৬ সালের ভারতের কোম্পানী আইনের ৫৬৬ ধারাতেও যৌথমূলধনী কারবার বা কোম্পানীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে:

"একটি যৌথমূলধনী কোম্পানী বলতে এমন একটি কোম্পানী বোঝায়, যার নির্দিষ্ট

সংখ্যক শেয়ারে বিভক্ত অথবা হস্তান্তরযোগ্য স্টকরূপে ধৃত অথবা আংশিক একরূপে ও আংশিক অন্যরূপে বিভক্ত ও ধৃত, একটি স্থায়ী ও নির্দিষ্ট পরিমাণে আদায়ীকৃত অথবা অনুমোদিত, শেয়ার পুঁজি আছে এবং যা অপর কেউ নয়, ঐ সকল শেয়ার অথবা স্টকের মালিকগণকে তার সদস্যরূপে গণ্য করার নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত" ('..a joint stock company means a company having a permanent paid-up or nominal share capital of fixed amount divided into shares, also of fixed amount or held and transferable as stock or divided and held partly in one way and partly in the other, and formed on the principle of having for its members the holders of those shares or that stock and no other persons.') শেয়ারহোল্ডারগণের সীমাবদ্ধ দায়ের নীতি সহ এরূপ কোম্পানী এই আইনের অধীনে নিবন্ধভুক্ত হলে তাকে শেয়ারের দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়ের কোম্পানী বলে গণ্য করা যায়।

বৈশিষ্ট্যঃ ১. সদস্যদের স্বেচ্ছামূলক মিলনের ভিত্তিতে এটি গঠিত হয়, তবে এর প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেজন্য একে রাষ্ট্র বা আইনের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলে।

২. সদস্যগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে এর পুঁজি সংগৃহীত হয়।

৩. সদস্য বা শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের উপর এর নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত থাকে। এজন্য এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বলে দাবি করা হয়।

৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি কাজে পরিণত করার দায়িত্ব ও কারবারের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনাভার প্রধান পরিচালক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের উপর থাকে।

৫. সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতানুযায়ী কার্যনির্বাহ হয় বলে, এই কারবারের কাজে বাধ্যতামূলক ঐক্যের নীতি[48] অনুসৃত হয়।

৬. ক্রীত শেয়ারের নির্ধারিত মূল্যের[49] দ্বারা শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে।

৭. প্রদত্ত পুঁজির অনুপাতে শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে মুনাফার বণ্টন করা হয়।

৮. আইনের চোখে, এটি শেয়ারহোল্ডারগণ থেকে পৃথক অস্তিত্বসম্পন্ন কৃত্রিম ব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং শেয়ারহোল্ডারদের পরিবর্তনে, মৃত্যুতে অথবা অপারগতায় এর অবসান ঘটে না। অতএব এটি চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন[50]। এটি যৌথমূলধনী কারবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৯. আইনত স্বীকৃত স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে গণ্য হওয়ায় কোম্পানি তার নিজস্ব সীল মোহরের[51] দ্বারা পরিচিত হয়।

১০. এর সাধারণ সদস্যগণ কারবারের দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তা প্রধানত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় বলে এই কারবারে মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।

১১. এর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য বলে সর্বদাই তার হস্তান্তরের দ্বারা স্বত্বাধিকারীর পরিবর্তন ঘটে। এজন্য বলা হয় যে যৌথমূলধনী কারবারের মালিকানা সর্বদা পরিবর্তনশীল।

১২. এটি প্রত্যেক দেশেই কোম্পানি আইনের চৌহদ্দির মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে থাকে।

যৌথমূলধনী কারবারের শ্রেণীবিভাগ ঃ ১. চার্টার্ড কোম্পানী[52] ঃ যৌথমূলধনী কারবার গঠনের প্রথম যুগে, এ সম্পর্কে স্বভাবতই কোন নির্দিষ্ট আইন না থাকায়, ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের মারফত রাজা বা রানীর নিকট আবেদনক্রমে বিশেষ সনদ বা লিখিত অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে, তা গঠন করতে হত। চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া

48. Compulsory unity of action. 49. Face value.
50. Perpetual succession. 51. Common seal. 52. Chartered Company.

অ্যান্ড চায়না, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইত্যাদি এই জাতীয় যৌথমূলধনী কারবারের দৃষ্টান্ত। ভারতে এই জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান নাই।

২. স্ট্যাটুটরী কোম্পানী[53]: অনেক সময় কোনরূপ গুরুত্বসম্পন্ন অর্থনীতিক কার্য সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র এবং বিশেষ আইনের দ্বারা যৌথমূলধনী কারবার স্থাপন করা হয়। এদের স্ট্যাটুটরী কোম্পানী বা করপোরেশন অথবা সংবিধিবদ্ধ যৌথ মূলধনী কারবার বলা হয়। কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী, কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও বর্তমান স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।

৩. রেজিস্টার্ড কোম্পানী বা নিবন্ধভুক্ত যৌথমূলধনী কারবার[54]: ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনানুযায়ী যৌথমূলধনী কারবারের নিবন্ধকের[55] দ্বারা নিবন্ধভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে রেজিস্টার্ড কোম্পানী বা নিবন্ধভুক্ত যৌথমূলধনী কারবার বলা হয়। ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১১ ধারামতে কোন কারবারে ২০ জনের (ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে ১০) বেশী সদস্য হলে সেটির নিবন্ধভুক্তি বাধ্যতামূলক। তা না হলে বেআইনী বলে গণ্য করা হবে।
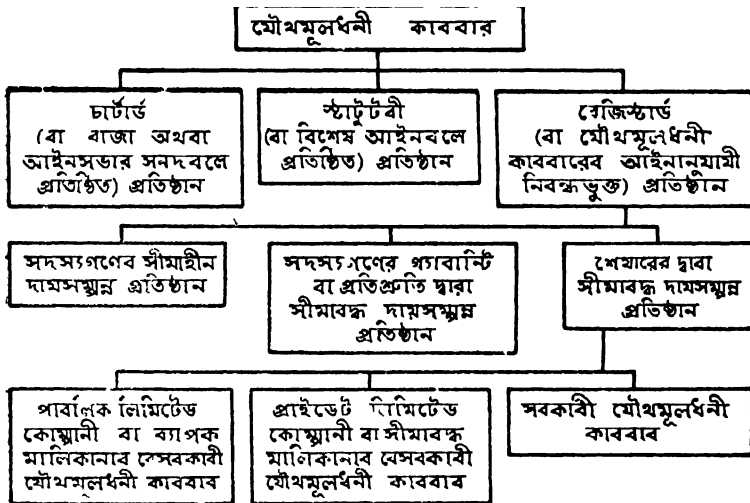
নিবন্ধভুক্ত যৌথমূলধনী কারবার বা রেজিস্টার্ড কোম্পানী তিন প্রকারের হতে পারে:

ক. সীমাহীন দায়সম্পন্ন যৌথমূলধনী কারবার[56]: সাধারণত যৌথমূলধনী কারবারে সদস্যগণের দায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু সদস্যগণের সীমাহীন দায়সম্পন্ন কারবারও গঠন করা যায়। তবে বর্তমানে এই জাতীয় কারবার নাই বললেই চলে।

খ. সদস্যগণের প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন যৌথমূলধনী কারবার[57]: এই জাতীয় কারবারের প্রত্যেক সদস্য কারবারের ঋণের নির্দিষ্ট অংশ পরিশোধের দায় বহন করে এবং মেমোর‍্যান্ডামে তা উল্লিখিত থাকে। ক্লাব, বণিকসভা, সমাজসেবা সমিতি প্রভৃতি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

গ. শেয়ারের দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন যৌথমূলধনী কারবার[58]: অধিকাংশ যৌথমূলধনী কারবারে ঋণের জন্য সদস্যগণের দায় তাদের ক্রীত শেয়ারের মূল্যের দ্বারা সীমা-

53. Statutory Company
54. Registered Company.
55. Registrar of Joint Stock Companies.
56. Unlimited Liability Company
57. Company limited by guarantee.
58. Company limited by shares.

বন্ধ হয়। এই ধরনের যৌথমূলধনী কারবারকে শেয়ারের দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন যৌথমূলধনী কারবার বা কোম্পানী বলে। এই জাতীয় যৌথমূলধনী কারবারের প্রচলন বেশী।

শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন যৌথমূলধনী কারবারের শ্রেণীবিভাগ
CLASSIFICATION OF COMPANIES LIMITED BY SHARES

ব্যবসায়ে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে শেয়ারের দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন যৌথমূলধনী কারবার গঠন করা হয়। কিন্তু শেয়ার বিক্রয় করতে গিয়ে দুই রকম পন্থা অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রথমত, জনসাধারণের সকল শ্রেণীর নিকট শেয়ার ক্রয়ের আবেদন করে যে কোন ব্যক্তির নিকট শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়। এই পন্থায় যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তাদের বহুসংখ্যক শেয়ারহোল্ডার থাকে এবং এজন্য ঐগুলিকে ব্যাপক মালিকানার যৌথমূলধনী কারবার[59] বলা হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তাদের পরিচিত ব্যক্তি বা তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি অল্পকয়েকজন ব্যক্তির কাছে শেয়ার বিক্রয় করে, স্বল্পসংখ্যক শেয়ারহোল্ডার নিয়েও মূলধনী কারবার গঠন করা যায়। এদের মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলে এদের সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূলধনী কারবার[60] বলে।

১. **সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূলধনী কারবার[61]**: যে যৌথমূলধনী কারবার বা কোম্পানী তার আর্টিকল্‌স বা পরিমেল নিয়মাবলীর দ্বারা,—ক. তার বর্তমান বা প্রাক্তন কর্মচারী বাদে, তার সদস্য সংখ্যা ৫০ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে; খ. তার শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কেনার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করা নিষিদ্ধ করে; এবং গ. তার শেয়ার হস্তান্তরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে,—তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী বলে ভারতের কোম্পানী আইনে গণ্য করা হয়েছে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীকে এই সমস্ত শর্তগুলিই একযোগে পালন করতে হয়। এগুলির কোন একটিও অন্যথা হলে তা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়। তা ছাড়া, কোম্পানী আইনে আরও বলা হয়েছে যে. কোন প্রাইভেট কোম্পানীর আদায়ীকৃত পুঁজির ২৫% বা তার বেশী অন্য কোন কোম্পানী ধারণ করলে তা আর প্রাইভেট কোম্পানীরূপে গণ্য হবে না। তবে অন্য কোম্পানী তার আদায়ীকৃত পুঁজির যে অংশ ধারণ করছে তা যদি কখনও ২৫%-এর কম হয় তখন ঐ কোম্পানীকে পুনরায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে গণ্য করা হবে। তবে, যে প্রাইভেট কোম্পানীর আদায়ীকৃত পুঁজির সমস্তই অপর একটি মাত্র কোম্পানী অথবা অপর কোন এক বা একাধিক বিদেশী কোম্পানী ধারণ করছে তার ক্ষেত্রে শেষোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। প্রাইভেট কোম্পানীর ন্যূনতম সদস্যসংখ্যা ২ জন এবং সর্বাধিক সদস্যসংখ্যা অনধিক ৫০। [পরিশিষ্টে ১৯৭৪ সালের সংশোধিত কোম্পানী আইন দ্রষ্টব্য।]

২. **ব্যাপক মালিকানার যৌথমূলধনী কারবার[62]**: এর ন্যূনতম সভ্যসংখ্যা সাত এবং সর্বাধিক সভ্যসংখ্যা অ-নির্দিষ্ট। তবে, তা সাধারণত শেয়ারের সংখ্যাদ্বারা সীমিত। এর শেয়ার সহজেই হস্তান্তরযোগ্য এবং এর বিক্রয়ের জন্য বিবরণ পত্রের দ্বারা জনসাধারণের নিকট আবেদন করতে হয়। নিবন্ধভুক্তির পরে বিবরণ পত্র প্রচার করে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা পুঁজির ন্যূনতম অংশ সংগৃহীত হলে, বিবরণ পত্র প্রচারের তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে শেয়ারের আবেদনকারিগণের মধ্যে শেয়ার বন্টনকার্য সম্পন্ন করতে হয়। অতঃপর এই মর্মে কোম্পানীসমূহের নিবন্ধকের[63] কাছে আবেদন করে কারবারের কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র[64] নিতে হয়। তবেই কারবার শুরু করা হয়। শুধু নিবন্ধভুক্ত হলেই চলে না।

৩. **সরকারী যৌথমূলধনী কারবার[65]**: ১৯৩৫ সালের ভারতের কোম্পানী আইনের

59. Widely owned Company or Public Limited Company.
60. Closely owned Company or Private Limited Company.
61. Private Limited Company. 62. Public Limited Company.
63. Registrar. 64. Certificate of Commencement.
65. Government Company.

৬১৭ ধারায় সরকারী যৌথমূলধনী কারবার নামে নূতন এক শ্রেণীর যৌথমূলধনী কারবার গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কোম্পানীতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের অন্তত ৫১ শতাংশ শেয়ার থাকবে তাই সরকারী যৌথমূলধনী কারবার বলে গণ্য হবে।

প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর আইনগত পার্থক্যের তুলনা
PRIVATE AND PUBLIC LIMITED COMPANIES : LEGAL POSITIONS COMPARED

প্রাইভেট কোম্পানী	পাবলিক কোম্পানী
১. এর ন্যূনতম সভ্যসংখ্যা দুই এবং সর্বাধিক সভ্যসংখ্যা পঞ্চাশ (বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মচারিগণ বাদে)।	১. এর ন্যূনতম সভ্যসংখ্যা সাত ও সর্বাধিক সভ্যসংখ্যা অনির্দিষ্ট, তবে তা কোম্পানীর শেয়ারের সংখ্যার বেশী হতে পারে না।
২. ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে এর নামের শেষে 'প্রাইভেট লিমিটেড' শব্দগুলি যোগ করতে হয়।	২. এর নামের শেষে শুধু 'লিমিটেড' শব্দটি যোগ করতে হয়।
৩. এর বেলায় শেয়ার বিক্রয়ের আবেদন করার জন্য কোন প্রসপেক্টাস বা বিবরণপত্র বা তার বিকল্প বিবৃতি[66] প্রকাশ করা যায় না বা তা কোম্পানী-সমূহের নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয় না।	৩. এর ক্ষেত্রে প্রসপেক্টাস বা বিবরণ পত্র বা তার বিকল্প বিবরণ প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক এবং তা প্রকাশের পূর্বে নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়।
৪. এর ন্যূনতম পরিচালক বা ডিরেক্টরের সংখ্যা দুই।	৪. এর ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা তিন।
৫. পরিচালকদের উপর, তারা কয়টি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার থাকতে পারে, কতদিন পর্যন্ত কেউ ম্যানেজিং ডিরেক্টার থাকতে পারে, ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা সর্বক্ষণের ডিরেক্টর নিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সংগ্রহ, পরিচালকগণের পারিশ্রমিকের সীমা, পরিচালকগণকে ঋণ প্রদান, ২০টির বেশী কোম্পানীতে পরিচালকপদ গ্রহণ না করা ইত্যাদি সম্পর্কে পাবলিক লিমিটেড ও কোম্পানীতে যে সকল বিধিনিষেধ ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, তা প্রাইভেট কোম্পানীতে প্রযোজ্য নয়।	৫. এর পরিচালকগণের উপর, তারা কয়টি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিযুক্ত হতে পারে, ম্যানেজিং ডিরেক্টারের মেয়াদ কাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা সর্বক্ষণের ডিরেক্টার নিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সংগ্রহ, পরিচালকগণের পারিশ্রমিকের সীমা, পরিচালকগণকে ঋণ প্রদান, ২০টির অধিক কোম্পানীতে কারও পরিচালক পদ গ্রহণ না করা ইত্যাদি সম্পর্কে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর উপর বর্তমান কোম্পানী আইনে কতকগুলি বিধি নিষেধ ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।
৬. প্রাইভেট কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট হতে নিবন্ধনপত্র[67] পেলেই ব্যবসায় শুরু করতে পারে। ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ ও নিবন্ধকের নিকট হতে কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র[68] পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।	৬. নিবন্ধকের নিকট হতে নিবন্ধন পত্র পাওয়ার পরে ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ করতে পারলে এবং অতঃপর নিবন্ধকের নিকট হতে কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র লাভ করলে তবেই এ ব্যবসায় শুরু করতে পারে।
৭. এর শেয়ারগুলি অবাধ হস্তান্তর-যোগ্য নয়।	৭. এর শেয়ারগুলি অবাধ হস্তান্তর-যোগ্য।

66. Prospectus or Statement in lieu of Prospectus.
67. Certificate of Incorporation. 68. Certificate of commencement.

প্রাইভেট কোম্পানী	পাবলিক কোম্পানী
৮. এর বেলায় 'স্ট্যাটুটরী মিটিং' করতে এবং স্ট্যাটুটরী রিপোর্ট নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয় না।	৮. এর ক্ষেত্রে কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র লাভের পর স্ট্যাটুটরী মিটিং করা এবং নিবন্ধকের নিকট স্ট্যাটুটরী রিপোর্ট দাখিল করা বাধ্যতামূলক।
৯. প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক সংখ্যা বাড়াতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হয় না।	৯. পাবলিক কোম্পানীর পরিচালক সংখ্যার যে কোন পরিবর্তন ঘটলে সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি আবশ্যক।
১০. প্রাইভেট কোম্পানীর সভা করার জন্য নির্দিষ্ট গণপূর্তি সংখ্যা[৬৯] হল ২ জন।	১০. পাবলিক কোম্পানীর গণপূর্তি সংখ্যা হল ৫ জন।
১১. প্রাইভেট কোম্পানী ভোটাধিকারের তারতম্য বিশিষ্ট শেয়ার বিলি করতে সক্ষম।	১১. পাবলিক কোম্পানী ভোটাধিকারের তারতম্য বিশিষ্ট শেয়ার বিলি করতে পারে না।
১২. প্রাইভেট কোম্পানীর ব্যবস্থাপকগণ শেয়ার হস্তান্তর করতে অস্বীকৃত হলে সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করা যায় না।	১২. পাবলিক কোম্পানীর ব্যবস্থাপকগণ শেয়ার হস্তান্তরে অস্বীকৃত হলে তার প্রতিবিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করা যায়।
১৩. প্রাইভেট কোম্পানীকে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার বা ডিবেঞ্চার হোল্ডারের নিকট তার ব্যালান্স শীট পাঠাতে হয় না। শুধু নিরীক্ষকের রিপোর্ট সহ, নিরীক্ষক দ্বারা প্রত্যায়িত ব্যালান্স শীটের তিনটি প্রতিলিপি নিবন্ধকের নিকট পাঠালেই চলে।	১৩. নিবন্ধকের নিকট নিয়মমত দাখিল করা ছাড়াও, ব্যালান্স শীটের একটি প্রতিলিপি প্রত্যেক শেয়ার বা ডিবেঞ্চার হোল্ডারের নিকট পাঠান পাবলিক কোম্পানীর পক্ষে বাধ্যতামূলক।
১৪. যে কোন বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কোম্পানী, বা কোন অংশীদারী কারবারকেও প্রাইভেট কোম্পানীর ম্যানেজার নিয়োগ করা যায়।	১৪. কোন ব্যক্তি ছাড়া অপর কাউকে পাবলিক কোম্পানীর ম্যানেজার নিয়োগ করা যায় না।
১৫. এর নিজের অথবা এর ধারক কোম্পানীর[৭০] শেয়ার কিনতে ইচ্ছুক এরূপ কাউকে এই উদ্দেশ্যে প্রাইভেট কোম্পানী ঋণ দিতে পারে বা ঐরূপ ঋণের জন্য জামিন হতে পারে।	১৫. পাবলিক কোম্পানী এরূপ কোন ঋণ দিতে বা তার জামিন হতে পারে না।
১৬. প্রাইভেট কোম্পানী আইনত তার সদস্যগণের কোন সূচী[৭১] রাখতে বাধ্য নয়।	১৬. এটা পাবলিক কোম্পানীর পক্ষে আবশ্যক।
১৭. প্রাইভেট কোম্পানীর সদস্যগণের সভায় ৭ জন বা তার কম উপস্থিত থাকলে একজন এবং ৭ জনের বেশী উপস্থিত থাকলে ২ জনেই ভোট দাবি করতে পারে।	১৭. পাবলিক কোম্পানীর সদস্যগণের সভায় অন্তত ৫ জন সদস্যকে ভোটদাবি করতে হয়।

যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধাঃ ১. যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজিঃ এর শেয়ারের মূল্য অতি অল্প এবং তাও সাধারণত কিস্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় ধনী ছাড়া অল্পবিত্ত

69. Quorum. 70. Holding Company. 71. Index.

শ্রেণীর ব্যক্তিগণও এর শেয়ার কিনতে পারে। এইজন্য সহজেই এ বহুল পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহে সমর্থ হয়।

২. সীমাবন্ধ দায় ঃ এর সদস্যগণের দায় সীমাবন্ধ হওয়ায় বিনিয়োগের ঝুঁকি কম বলে বিনিয়োগকারিগণ এতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ পায়। এই কারণেও এর সংগৃহীত পুঁজির পরিমাণ বাড়ে।

৩. শেয়ার হস্তান্তর ঃ এর, বিশেষত ব্যাপকমালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের, শেয়ার অবাধে হস্তান্তর করা যায় বলে এবং সকল দেশেই এই জন্য শেয়ার বাজার থাকায় বিনিয়োগে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিনা দ্বিধায় এর শেয়ার ক্রয় করে। এই সুবিধা এর অধিক পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহের আর একটি কারণ।

৪. সাধারণের আস্থা ঃ এটি আইন কর্তৃক সৃষ্ট সংগঠন এবং আইনগত কতকগুলি বিষয়ে এর বাধ্যবাধকতা থাকায়, এই জাতীয় কারবার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এটাও পুঁজিবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

৫. বিনিয়োগকারীর আকর্ষণ ঃ সাধারণত ব্যবসায়-বাণিজ্যে বহুদর্শী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালকমণ্ডলীর পরিচালনায় এর সাফল্যের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয় বলে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনভিজ্ঞ সাধারণ সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারিগণও এতে নির্ভয়ে অর্থ বিনিয়োগ করে।

৬. বৃহদায়তন কারবারের ব্যয়সংকোচ ঃ যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি থাকায় এর পক্ষে উৎকৃষ্ট মূল্যবান যন্ত্রপাতি, সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ, উন্নত শ্রমবিভাগ, বহুসংখ্যক শ্রমিক, বৃহদায়তনে কাঁচামাল ক্রয়, বৃহৎ সংগঠন, বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিক্রয়ের দ্বারা বৃহদায়তনে উৎপাদনের যাবতীয় ব্যয়সংকোচের সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হয় বলে এর আয় ও সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী।

৭. ঝুঁকি সংকোচ ঃ বৃহৎ বিনিয়োগকারিগণ বহু সংখ্যক যৌথমূলধনী কারবারের মধ্যে তাদের মোট বিনিয়োগ বন্টন করে বিনিয়োগের মোট ঝুঁকি কমাতে সমর্থ হয়।

৮. আইনত স্বীকৃত স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা ও চিরন্তন অস্তিত্ব ঃ সদস্যগণ থেকে একে আইনত পৃথক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করার দরুন, এর সদস্য ও পরিচালকগণের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের পরিবর্তনের ফলে কারবারের ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা অল্প। এবং এর আইন-স্বীকৃত কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার মৃত্যু নাই বলে ইহা সুদীর্ঘকাল ব্যাপী ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকতে পারে। ফলে কারবার দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় একদিকে এ অতীতের শিক্ষা কাজে ব্যবহার করার সুযোগ পায় এবং অপরদিকে এর ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সম্প্রসারণের সুযোগ সম্ভাবনা অপরিমেয় হয়ে থাকে।

৯. প্রতিভা ও পুঁজির সমন্বয় ঃ অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি পুঁজির অভাবে কারবার গঠন করতে পারে না। কিন্তু যৌথমূলধনী ব্যবস্থায় যাদের প্রতিভা আছে অথচ পুঁজি নাই এবং যাদের পুঁজি আছে অথচ প্রতিভা নাই তাদের উভয়ের মিলনে প্রতিভা ও পুঁজির যোগাযোগে, বিরাট সাফল্যজনক কারবার গড়ে ওঠে।

১০. সঞ্চয়ে উৎসাহ ঃ এতে অর্থ বিনিয়োগ করে সহজেই আয় বৃদ্ধি করা যায় বলে যৌথমূলধনী কারবার দেশবাসীকে সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান করে।

১১. সুদক্ষ পরিচালনা ঃ এর পরিচালকমণ্ডলী পরিবর্তনীয় বলে, পুরাতন পরিচালকগণকে পরিবর্তন করে আরও অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিকে পরিচালক সমিতিতে গ্রহণ করা যায়। প্রয়োজন হলে নূতন কর্মকুশলী ব্যক্তিকে গ্রহণ করে পরিচালকমণ্ডলীতে নূতন রক্ত আমদানি করা সম্ভব। এইভাবে এর পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ থাকে।

১২. ঝুঁকির শ্রেণীবিভাগ ঃ অধিকাংশ যৌথমূলধনী কারবারেই বিভিন্নশ্রেণীর ঝুঁকিসংবলিত শেয়ার থাকে। তার কোনটিতে লভ্যাংশ সুনির্দিষ্ট অতএব ঝুঁকি অল্প। আবার কোনটিতে ঝুঁকি বেশী, কিন্তু তাতে লভ্যাংশের স্থিরতা নাই। ইচ্ছামত বিভিন্ন-শ্রেণীর বিনিয়োগকারীরা, যে যেমন ঝুঁকি পছন্দ করে, সেরূপ শেয়ার কিনতে পারে।

যৌথমূলধনী কারবারের অসুবিধা: ১. অনেক সময় বিনিয়োগকারিগণ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসাধু বা অযোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা স্থাপিত যৌথমূলধনী কারবারে অর্থবিনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. অনেক ক্ষেত্রেই, আপাতদৃষ্ট গণতান্ত্রিক পরিচালক কাঠামো সত্ত্বেও, এদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।

৩. এতে মালিকানা ও পরিচালনার বিচ্ছেদের দরুন, বেতনভুক্ উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের হাতেই কারবারের প্রকৃত ভার থাকে। সুতরাং এটি একমালিকী বা অংশীদারী কারবারের মত সযত্নে পরিচালিত হয় না এবং প্রায়ই শ্রমিক সংক্রান্ত বিরোধ লেগে থাকে।

৪. এর পরিচালনা ভার যে সকল বেতনভুক্ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত তাদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব জেগে ওঠে। ফলে তারা জটিল ও অসুবিধাজনক বিষয়ে উদ্যোগ নিতে চায় না।

৫. বেতনভুক কর্মচারিগণের উপর দায়িত্ব দিয়ে কার্যপরিচালনার দরুন তাদের শৈথিল্যের ফলে কারবারের নানা বিভাগে অপচয় ও অপব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৬. পরিচালকমণ্ডলী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কর্মচারী নিয়োগ করতে গিয়ে যোগ্যতা অপেক্ষা স্বজনপোষণের দিকেই বেশি লক্ষ্য রাখে বলে কারবারের ব্যয়বহুল্য ও দক্ষতা হানি ঘটে। ভারতে এটা বিশেষভাবেই বর্তমান।

৭. যে সকল ব্যবসায়ের সাফল্য ক্রেতার সাথে মালিকের ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের উপর নির্ভর করে এবং যে সকল ব্যবসায়ের ক্রেতাদের চাহিদা সর্বদা পরিবর্তনশীল তাদের পক্ষে যৌথমূলধনী কারবার অনুপযোগী।

ভারতে যৌথমূলধনী কারবারের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
GROWTH OF COMPANIES IN INDIA

যৌথমূলধনী প্রথা ভারতের নিজস্ব নয়। আধুনিক যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মতই এটি পাশ্চাত্য থেকে আমদানি। ১৮৬০ সালে ভারতে প্রথম যৌথমূলধনী আইন পাস করে সীমাবদ্ধ দায়ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তার পর ১৯১৩ সালে একটি সুসংবদ্ধ যৌথমূলধনী কারবারের আইন পাস করা হয়। ঐ আইনটির সবিশেষ পরিবর্তন করে পুনরায় ১৯৫৬ সালে আরও সুসংবদ্ধ একটি আইন পাস করা হয়েছে। এই আইনে ভারতের যৌথমূলধনী কারবারকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিগত শতাব্দীতে যৌথমূলধনী কারবারের আইন পাস হলেও যৌথমূলধনী কারবারের প্রকৃত অগ্রগতি শুরু হয় বর্তমান শতকের প্রথম থেকে। ১৯০১ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ভারতে যৌথমূলধনী কারবারের সংখ্যা ১৩০৮টি বৃদ্ধি পায়: তাদের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ৪০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। ১৯১৪-১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ কালে বিশেষ কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু যুদ্ধবসানের পর থেকে ১৯১৯-২৪ সালে দ্রুত যৌথমূলধনী কারবারের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী কালের চড়তির বাজার। এই সময়ে ৪৫৩৪টি নূতন কারবার স্থাপিত হয়। তাদের মোট আদায়ীকৃত পুঁজি ছিল ২৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। এই সময়ে কোম্পানীর সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ ও আদায়ীকৃত মূলধন শতকরা ৪৬ ভাগ ও মোট মূলধন শতকরা ৮২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

১৯২৫ থেকে ১৯৩৩ সালে পুনরায় ধীর গতিতে এর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৯-৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত মন্দার বাজারে এর অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ১৯৩৫-১৯৩৯ সালের মধ্যে বহু কোম্পানী বিলুপ্ত হয়। ১৯৪২ সাল থেকে পুনরায় এর অগ্রগতি দেখা যায়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর প্রথম কয়েক বৎসর দেশ বিভাগ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, শ্রমিক গোলযোগ ও সরকারী নীতির অনিশ্চয়তার দরুন আবার এর অগ্রগতির অভাব দেখা যায়। পরে শিল্প সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি ১৯৪৮ সালে ঘোষিত হওয়ার পর ও তার পরে ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন কর্তৃক নূতন নীতি গ্রহণের পরে আবার এর অগ্রগতি ঘটতে

থাকে। অবশেষে বর্তমানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু থেকে এর নূতন যুগ আরম্ভ হয়েছে। নিচে বর্তমান তথ্য দেওয়া গেলঃ

ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর সংখ্যা ও মূলধন (১৯৭২ সালে):

সংখ্যা			আদায়ীকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)		
প্রাইভেট কোং	পাবলিক কোং	মোট	প্রাইভেট কোং	পাবলিক কোং	মোট
২৫,৮৯০	৬,৬৮৫	৩২,৫৭৫	২,৪৬১·১	১,৯৪৫·৯	৪,৪০৭

খ. সমবায় উদ্যোগের ক্ষেত্র
B. CO-OPERATIVE SECTOR
সমবায় সংগঠন
CO-OPERATIVE FORM OF BUSINESS ORGANISATION

ভূমিকাঃ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থায় দরিদ্র শ্রমিক, কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদক এবং ক্রেতাদের অর্থাৎ এককথায় জনসাধারণের অধিকাংশের উপর যে অর্থনীতিক শোষণের চাপ পড়ে এবং ধীরে ধীরে তাদের অর্থনীতিক দুর্দশা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেতে থাকে তার বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে একটি শক্তিশালী আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। এই আন্দোলন সমবায় আন্দোলন নামে পরিচিত। এর মূল উদ্দেশ্য যৌথ প্রচেষ্টায় অর্থনীতিক উন্নতির জন্য জনসাধারণের দরিদ্রতর শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন স্থাপন করে দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করা।

সমবায়ের তাৎপর্য[72]: সমবায় সম্বন্ধে একদা নিযুক্ত বিখ্যাত ম্যাকলাগান কমিটির কথায়—'সংক্ষেপে সমবায়ের তত্ত্বটি এই যে, বিচ্ছিন্ন এবং বিত্তহীন একক ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মিলিত হয়ে এবং নৈতিক উন্নতি ও পারস্পরিক সহায়তার দ্বারা বৈষয়িক সুবিধাভোগে বিত্তবান ব্যক্তিগণের সমকক্ষ হতে পারে এবং ফলে তার নিজস্ব গুণাবলী ও সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশসাধনে সফল হতে পারে। নিজেদের শক্তির ঐক্যের দ্বারা বৈষয়িক অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয় ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। এবং এই দুইটির পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে এই আশা পোষণ করা হয় যে, উন্নততর জীবনযাত্রার মান বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ অধিকতর সাফল্যজনক ব্যবসায়, উৎকৃষ্টতর কৃষি এবং উচ্চতর জীবনযাপন, তা কার্যকরভাবে লাভ করা সম্ভব হবে।"

অর্থাৎ **এককথায় বৈষয়িক মঙ্গললাভ ও উন্নততর এবং সুখী জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সমাজের বিত্তহীন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ পারস্পরিক প্রচেষ্টার দ্বারা অর্থনীতিক কার্যাবলীর সংগঠন ও পরিচালনাকে সমবায় সংগঠন ও কার্যকলাপ বলা যায়।**

সমবায়ের মূলনীতিসমূহ[73]: ১. **ঐচ্ছিক সম্মেলন[74]:** সম্মিলিত উদ্যমের ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার সুবিধা লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সমবায় সমিতি গঠন করে ও তাতে যোগদান করে, আবার যখনই তারা প্রয়োজন মনে করে তখন তারা স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ করতে পারে।

২. **সেবার উদ্দেশ্য[75]:** যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে ও বিনালাভে জনসাধারণ ও সভ্যগণের সর্বোত্তম সেবা করাই সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য।

৩. **সাম্য ও গণতন্ত্র[76]:** সমবায়ের সদস্যগণ যে যত শেয়ারের মালিকই হোক

72. Meaning and significance of Co-operation.
73. Basic Principles of Co-operation.
74. Voluntary Association.
75. Motto of service.
76. Equality and Democracy.

না কেন, প্রত্যেকের ভোট থাকে মাত্র একটি। সুতরাং শেয়ারের মালিকানা কমবেশী হওয়া সত্ত্বেও সমিতির সদস্যগণ সকলেই সমান অধিকার ভোগ করে। সমবায়ের পরিচালক সমিতি[77] সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত হয় এবং সাধারণত সমিতিগুলি স্থানীয় সদস্যগণের দ্বারা গঠিত হয় বলে সকলেই এই নির্বাচনে যোগ দিতে পারে। তা ছাড়া কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণ যেমন যত শেয়ার, তত ভোট ও এমনকি কোম্পানীর সভায় অনুপস্থিত থেকেও অপর ব্যক্তির দ্বারা নিজের ভোট দিতে পারে, সমবায় সমিতিতে এরূপ কোন ব্যবস্থা না থাকায়, সমিতির সভায় সদস্যগণ সকলেই যোগদান করে ও সমান অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ ও ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং সমবায় সংস্থা পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে চালিত হয়।

৪. **উদ্বৃত্তের বণ্টন**[78]**ঃ** অন্যান্য কারবারের মত সমবায়েও খরচ বাদে আয়ের যে উদ্বৃত্ত থাকে তা তার মুনাফা। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিগত মালিকানার কারবারের মত ঐ মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য নয়, অথবা তা যে সদস্যগণের মধ্যে তাদের শেয়ারের অনুপাতে বণ্টন করতে হবে এমনও নয়। সাধারণত ঐ মুনাফা থেকে সদস্যগণের সাধারণ মঙ্গলদায়ক কোন উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হয়।

৫. **নগদ লেনদেন**[79]**ঃ** ঋণদান সমিতির ন্যায় কোন অপরিহার্য ক্ষেত্র ছাড়া সমবায় সমিতির লেনদেনগুলি সাধারণত নগদে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৬. **সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত সদস্যপদ**[80]**ঃ** সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও সেবাই সমবায়ের উদ্দেশ্য বলে, বিশেষ বিশেষ অপরিহার্য ক্ষেত্র ছাড়া, সাধারণভাবে, যারাই সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টার সহিত একমত ও যাদের গ্রহণ করলে সমিতির কোনও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নাই এরূপ সকল ব্যক্তিগণের জন্যই সমিতির সদস্যপদ খোলা রাখা আবশ্যক।

সমবায়ের সুযোগ সম্ভাবনা[81]**ঃ** আধুনিককালে সমবায়কে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প বলে আর মনে করা হয় না বটে, তবে এর সাহায্যে সীমাবদ্ধভাবে হলেও দরিদ্র শ্রেণীর জনসাধারণের আংশিক মঙ্গলের সম্ভাবনাকে কেউই অস্বীকার করে না।

প্রথমত, সমবায়ের উপযোগিতা শুধু অর্থনীতিক লাভের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; সমবায় সমিতির সদস্যগণ পারস্পরিক আস্থা, সততা ও স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিক্ষা পায় ও তার দ্বারা তাদের নৈতিক উন্নতি ঘটে। অতএব সমবায়ের শিক্ষামূলক মূল্য কম নয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থনীতিক কার্যক্ষেত্রের সকল বিভাগেই, যথা উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও বিনিময়—সকল ক্ষেত্রেই সমবায় নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। সুতরাং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এতে উপকৃত হতে পারে।

তৃতীয়ত, এ কৃষি, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ উপযোগী। এইজন্য অনুন্নত দেশগুলিতে এর বিশেষ প্রয়োজন আছে।

চতুর্থত, এর মাধ্যমে জনসাধারণের নানাপ্রকার অর্থনীতিক কার্যকলাপ সংগঠিত হলেও তার ফলে ধনীমালিক শ্রেণী ও মধ্যস্থ কারবারী শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং এই সকল সামাজিক পরগাছা দূর করে এ সমাজকে অংশত অনাবশ্যক ভারমুক্ত করতে পারে।

এই সকল কারণে ইউরোপের বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে, বিশেষত ডেনমার্ক, সুইডেন, ইটালী, ইংলণ্ড এবং কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সমবায় আন্দোলন বিস্তারলাভ করেছে। ভারতেও বর্তমানে এর প্রসার লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই সমবায় আন্দোলন সর্বাধিক সুযোগ পেয়ে বিস্তার লাভ করেছে ও সার্থক হয়েছে।

77. Managing Committee. 78. Distribution of Surplus.
79. Cash Transaction. 80. Open Membership.
81. Scope of Co-operation.

বৈশিষ্ট্যঃ ১. গঠনঃ একই সাধারণ স্বার্থ[82] সাধনের উদ্দেশ্যে, স্বেচ্ছায়[83] কয়েক ব্যক্তি সম্মিলিত হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে।

২. পুঁজিঃ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের মত এর পুঁজি কতকগুলি স্বল্প মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত থাকে। ঐ শেয়ারগুলি বিক্রয় করে এর পুঁজি সংগৃহীত হয়। এই শেয়ার ক্রয় করিয়া সমিতির সদস্য হওয়া যায়। একজন সদস্য যতগুলি ইচ্ছা শেয়ার ক্রয় করতে পারে।

৩. পরিচালনাঃ ক্রীত শেয়ারের সংখ্যা যাই হোক, প্রত্যেক সদস্যের মাত্র একটি করে ভোট প্রদানের অধিকার থাকে। সদস্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক একটি পরিচালকপর্ষৎ নির্বাচিত হয়। তার একজন সভাপতি বা চেয়ারম্যান এবং একজন সম্পাদক বা কর্মসচিব থাকে। অন্যান্য সভ্যদের পরিচালক বা ডিরেক্টর বলা হয়। সমিতির পরিচালনাভার এই পরিচালক-পর্ষদের উপর ন্যস্ত থকে।

৪. নিয়ন্ত্রণঃ যদিও দৈনন্দিন কার্যের ভার প্রধানত সভাপতি ও সম্পাদকের উপর ন্যস্ত থাকে, তথাপি প্রতি বৎসর নূতন পরিচালকপর্ষৎ নির্বাচন করা হয় এবং প্রত্যেক সদস্যের শেয়ারের মালিকানা নির্বিশেষে মাত্র একটি করিয়া ভোট থাকে বলে বস্তুতপক্ষে সাধারণ সকল সদস্যই সমিতির সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৫. দায়দায়িত্বঃ সদস্যগণের সীমাবদ্ধ ও সীমাহীন দুই প্রকারের দায়সম্পন্ন সমবায় সমিতিই গঠন করা যায়।

৬. মুনাফাবণ্টনঃ সমবায় সমিতি মূলত মুনাফা শিকারী প্রতিষ্ঠান নয়। তবে কারবারে উদ্বৃত্ত আয় হলে তার একাংশ থেকে সদস্যগণের প্রদত্ত মূলধনের উপর সুদ হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। সমবায় বিক্রয় সমিতি[84] বা ভোগকারী অথবা ক্রেতা সমবায় সমিতির[85] বেলায় সদস্যগণ কর্তৃক ক্রয়ের অনুপাতে তাদের মধ্যে মুনাফার অংশ বণ্টন করা হয়। উদ্বৃত্ত আয়ের অপরাপর অংশ থেকে সমিতির শক্তি বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি ও সদস্যগণের মঙ্গলের জন্য নানা প্রকার হিতকর কার্য, যথা—বিদ্যালয় স্থাপন, সাহায্য প্রদান, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হয়।

৭. সত্তাঃ যৌথমূলধনী কারবারের মতই সমবায় সমিতিরও সদস্যগণ থেকে পৃথক স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে বলে আইনত গণ্য করা হয়।

কিরূপে সমবায় সমিতি গঠন করতে হয়
HOW CO-OPERATIVE SOCIETIES ARE FORMED

সমবায় সমিতি গঠনে যাঁরা ইচ্ছুক তাদের কর্তব্য হল প্রথমে ১০ জন অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে ৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির স্বাক্ষরিত, সমবায় সমিতি নিবন্ধনের একটি আবেদন পত্র সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা। এই আবেদন পত্রে প্রস্তাবিত সমিতির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্যস্থান, সদস্যগণের দায়, সমিতির নাম, পুঁজি ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ থাকবে। এই আবেদন পত্রের সাথে দুই প্রস্থ সমিতির প্রস্তাবিত উপবিধি-গুলিও[86] দাখিল করতে হবে।

সমিতির উপবিধিগুলির দ্বারা তার অভ্যন্তরীণ কাজকর্মাদি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কই ঐ উপবিধিগুলি প্রণীত হয়ঃ সদস্যপদ গ্রহণের শর্তাবলী, সদস্যগণের শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদের নাম, ঠিকানা, সদস্যগণের অধিকার, দায় ও কর্তব্যসমূহ; সভা আহবান ও পরিচালনা করিবার প্রণালী; কর্মকর্তাগণের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি; সমিতির উদ্বৃত্ত বা মুনাফা বিনিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশ ইত্যাদি।

সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধকের নিকট মুদ্রিত উপবিধি থাকে। সমিতির প্রবর্তক-গণ তা গ্রহণ করতে পারেন, অথবা তাঁরা নিজেরা স্বতন্ত্র উপবিধি প্রণয়ন করতে পারেন।

82. Common Interest.
83. Voluntarily.
84. Co-operative Sale societies.
85. Consumer's Co-operative.
86. Bye Laws.

আবেদনকারিগণের প্রার্থনামত সমিতিটি ১৯১২ সালের ভারতীয় সমবায় সমিতি আইনের অধীনে নিবন্ধভুক্ত হতে পারে অথবা রাজ্য সমবায় আইনের অধীনে নিবন্ধভুক্ত হতে পারে।

আবেদনপত্র ও উপবিধিগুলি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধক সমিতির নাম নিবন্ধভুক্ত করেন ও আবেদনকারিগণকে সমিতির নিবন্ধন পত্র[87] পাঠিয়ে দেন এবং তৎসহ নিজস্ব সীলমোহরাঙ্কিত করে দাখিলীকৃত উপবিধির একপ্রস্থও ফেরত দেন। এইরূপে অনুমোদন লাভ করে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে সমবায় সমিতিটি জন্ম লাভ করে। সদস্যগণের দায় সীমাবদ্ধ রাখার ইচ্ছা থাকলে, সমিতির নামের শেষ অংশে লিমিটেড শব্দটি জুড়তে হয়।

বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি: উদ্দেশ্য ও কর্মধারার পর্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি দেখা যায়। যথা—১. উৎপাদক সমবায় সমিতি; ২. ক্রেতা সমবায় সমিতি; ৩. বিক্রয় সমবায় সমিতি; ৪. ক্রয় সমবায় সমিতি; ৫. ঋণদানকারী সমবায় সমিতি; ৬. সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি; ৭. সমবায় বীমা সমিতি, প্রভৃতি।

১. উৎপাদক সমবায় সমিতি[88]: গরিব কৃষক, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগর প্রভৃতি শ্রেণীর উৎপাদনকারিগণ সংঘবদ্ধ হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে নিজেরাই উৎপাদন-উপায়ের অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির মালিক হয়ে নিজেদের স্বার্থে উৎপাদন পরিচালনা করতে পারে। এই জাতীয় সমবায় সমিতিগুলিকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে। এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বা কর্মীরা নিজেরাই মালিক বলে কারবারের সম্পূর্ণ সুফল নিজেরাই ভোগ করতে পারে। এ ছাড়া কোনরূপ মধ্যস্থ কারবারীর সহায়তা ছাড়াই তারা সরাসরি ক্রেতাদের নিকট পণ্য বিক্রয় করে। ইহাতে আয়ও বাড়ে। সুতরাং এই জাতীয় সমবায় সমিতি গঠনের ফলে প্রকৃত উৎপাদনকারিগণের উৎসাহ ও উদাম বৃদ্ধি পায়, এবং তাদের নিজস্ব আয় ও মোট উৎপাদনও বাড়ে। কৃষি-সমবায় সমিতি, হস্তচালিত তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি, দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।

২. ক্রেতা সমবায় সমিতি বা সমবায় ভাণ্ডার[89]: এই ধরনের সমিতি এমন একটি কারবারী সংগঠন যা ক্রেতারা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিজেদের চেষ্টায় সংগ্রহ ও নিজেদের মধ্যে বন্টন বা সরবরাহের জন্য স্বেচ্ছায় গঠন করে থাকে। সাধারণ ভোগকারিগণ যখন খুচরা ব্যবসায়িগণের অসাধুজনক ও অন্যায়মূলক কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হয় ও নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহের ভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই সমবায় ভাণ্ডারের সূত্রপাত ঘটে। এই কাজে ক্রেতারা এই ধারণা দ্বারাই চালিত হয় যে, যা একের চেষ্টায় সম্ভব হয় নি তা বহুর যুক্তপ্রচেষ্টায় সফল হতে পারে।

খুচরা দোকানদারের নিকট থেকে দৈনন্দিন গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী না কিনে ভোগকারী খুচরা খরিদ্দাররা নিজেরা মিলিত হয়ে সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করে তার নিকট থেকে ঐ সব দ্রব্যাদি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সমবায় সমিতির শেয়ার কিনে তারাই পুঁজির যোগান দেয় এবং তার পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক সমিতি নির্বাচন করে। সমবায় ভাণ্ডার পাইকারী দরে উৎপাদক ও পাইকারী ব্যবসায়িগণের নিকট থেকে দ্রব্যসামগ্রী কিনে যথাসম্ভব কম ও ন্যায়সঙ্গত খুচরা দরে তা সদস্যগণের কাছে বিক্রয় করে। প্রয়োজন মনে করলে এবং সদস্যগণ সম্মত থাকলে যারা সদস্য নয়, এরূপ ভোগকারী খুচরা খরিদ্দারের কাছেও ঐসকল দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে পারে। ক্রয়-বিক্রয় যথাসম্ভব নগদেই চলে এবং বৎসর শেষে খরচ বাদে যা উদ্বৃত্ত থাকে তা থেকে সঞ্চয়

87. Certificate of Registration. 88. Producers' Co-operative Society.
89. Consumers' Co-operative Society.

তহবিলে প্রয়োজনীয় পরিমাণে অর্থ স্থানান্তরের পর উদ্বৃত্তের বাকি অংশ সদস্যগণের মধ্যে তাদের কেনাকাটার পরিমাণের অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

বর্তমানে আবার অনেক সময়ে একই অঞ্চলে অবস্থিত সমবায় ভাণ্ডারগুলিকে একত্রিত হয়ে একটি বড় সমবায় পাইকারী সমিতি গঠন করে বৃহদায়তনে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে ও কোন কোন স্থলে সমিতি নিজেই কোন কোন দ্রব্য উৎপাদন করে সমিতির পণ্যচিহ্ন ও ছাপ সহকারে সদস্য-সমবায় ভাণ্ডারগুলির মারফত বা সাধারণ সদস্য খুচরা-ভোগকারিগণের মধ্যে বিক্রয় করতে দেখা যায়। এইরূপ নানাভাবে সদস্যগণকে সেবা করাই সমবায় ভাণ্ডারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সুবিধা: ১. সমবায় ভাণ্ডার সদস্যরা কম ও ন্যায়সঙ্গত দরে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের সুবিধা পায়।

২. ফলে তারা সীমবন্ধ আয়ের দ্বারা অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি ক্রয় ও ভোগ করতে পারে, অথবা তাদের আয়ের একাংশ সঞ্চয় করতে পারে।

৩. অধিক ভোগের দ্বারা অথবা অধিক সঞ্চয় ও তার লাভজনক বিনিয়োগ দ্বারা সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ও আর্থিক নিরাপত্তা ঘটে।

৪. সমিতির কার্য পরিচালনায় যোগ দিয়ে সদস্যগণ সুদক্ষভাবে দ্রব্যাদি ক্রয়, হিসাব রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যেমন শিক্ষা লাভ করে, তেমনি ব্যবসায় ও দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে।

৫. সমবায় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের একচেটিয়া কারবার, মুনাফাখোরী ও মজুতদারী প্রভৃতি কারবারী কদাচার খানিক পরিমাণে দমন করতে বা সীমাবদ্ধ রাখতে পারে।

৬. সমবায় ভাণ্ডার কম দামে উৎকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রয় করে থাকে। এর ফলে ভোগ-কারিরা নির্দিষ্ট মানের খাঁটি দ্রব্য পাওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করে।

৭. সমবায় ভাণ্ডার গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হয় বলে দেশবাসিগণের মধ্যে এর দ্বারা গণতন্ত্রের নীতি ও পদ্ধতি প্রচারিত হয়।

ভারতে বর্তমানে সমবায় ভাণ্ডারের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা: দেশে যখন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর স্বাভাবিক বা কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় তখনই সমবায় ভাণ্ডারেরও প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ উপস্থিত হয়। কারণ এইরূপ সময়েই অসাধু ব্যবসায়ীমহল গোপন মজুদকরা, মুনাফাখোরী কালো বাজারী প্রভৃতি কদাচার দ্বারা দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য ক্রমাগত বাড়াতে থাকে। এই সময়ে সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনের আন্দোলন জনপ্রিয় করে তুললে ও জনসাধারণকে সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনে উৎসাহ দিলে, ব্যাপকভাবে সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনের দ্বারা একদিকে যেমন দুষ্প্রাপ্য ও স্বল্পলভ্য দ্রব্যসামগ্রীর সুষ্ঠু বণ্টন ঘটতে পারে, তেমনি অপর দিকে ন্যায্যমূল্যে সমবায় ভাণ্ডার মারফত বিক্রয় দ্বারা মূল্য-রেখার স্থিরতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই দুইটি সুবিধার সাথে আরও যে দুটি সুবিধা লাভ করা যায় তা হল, কারবারী কদাচার দমন ও দ্রব্যসামগ্রীর ভেজাল প্রতিরোধ করা। সমবায় ভাণ্ডারের এই সকল সুবিধার জন্যই পরিকল্পনাকালে সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনে জনসাধারণকে উৎসাহ দানের নীতি পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করেছেন ও সরকার তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে সমবায় ভাণ্ডারের অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নি। এজন্য, কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতার অভাব, সদস্যদের আনুগত্যের অভাব, বাকী পাওনা আদায়ে অক্ষমতা, যোগ্য কর্মীর অভাব, অবিবেচনা-মূলক ক্রয় প্রভৃতি কারণগুলিই প্রধানত দায়ী। সুতরাং ভারতে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলনকে সফল করতে হলে ও তার সুফল পেতে হলে অবিলম্বে এই সকল ত্রুটিগুলি দূর করতে হবে।

সারা দেশে এখন ৫০ হাজারের বেশি অধিবাসী বিশিষ্ট শহর নগরগুলিতে ভোগকারী সমবায় সমিতি আছে। ১৯৭০-এর জুন মাসের শেষে দেশে মোট ১৩,৫৬২টি

প্রাথমিক ভোগকারী সমবায় সমিতি ৩৮৩টি পাইকারী সমবায় ভাণ্ডার এবং ১৭টি রাজ্য ভোগকারী সমবায় ফেডারেশন ছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে তাদের মোট খুচরা বিক্রয়ের পরিমাণ হয়েছিল ২৫০ কোটি টাকা।

৩. **বিক্রয় সমবায় সমিতিঃ** কৃষক, গ্রাম্য কুটিরশিল্পের কারিগর প্রভৃতি গরিব উৎপাদনকারিগণ এককভাবে পণ্য বিক্রয় করতে গিয়ে যাতায়াতের চড়া ভাড়া, পণ্য ধরে রাখার অক্ষমতা, গুদামের অভাব প্রভৃতি অসুবিধা ভোগ করে এবং অপেক্ষাকৃত কম দরে পণ্য বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয় ও মহাজনের কবলে গিয়া পড়ে। এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্য তারা স্বতন্ত্রভাবে পণ্য উৎপাদন করলেও যৌথভাবে বিক্রয় করার জন্য বিক্রয় সমবায় সমিতি গঠন করতে পারে।

৪. **ক্রয় সমবায় সমিতিঃ** কৃষক ও গ্রাম্য কুটিরশিল্পিগণ তাদের প্রয়োজনীয় লাঙল ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বীজ, সার, বলদ প্রভৃতি নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন বিবিধ দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অল্পদামে সংগ্রহ করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে ক্রয় সমবায় সমিতি গঠন করতে পারে। এতে তারা বৃহদায়তনে ক্রয়ের সকল সুবিধা ভোগ করে ও ধুরন্ধর গ্রাম্য ব্যবসায়ীদের কবল থেকে মুক্তি পায়।

৫. **ঋণদানকারী সমবায় সমিতি ও সমবায় ব্যাংকঃ** গরিব কৃষক গ্রাম্য কুটিরশিল্পী, শহরের শ্রমিক ও কর্মচারীবর্গ ও স্বল্পবিত্ত ব্যক্তিগণ প্রয়োজনমত সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুবিধা লাভ করার জন্য ঋণদানকারী সমবায় সমিতি গঠন করতে পারে। সদস্যগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করে পুঁজি সংগ্রহ করা হয় এবং যে কোনও ব্যক্তির নিকট থেকে আমানত জমা গ্রহণ দ্বারা তা বাড়ান হয়। এ ছাড়া সরকারের নিকট থেকেও ঋণ নিয়ে সমিতির ঋণযোগ্য অর্থের পরিমাণ বাড়ান যায়।

এই সমিতিগুলিকে প্রাথমিক সমিতি বলে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে আবার কয়েকটি ঋণদানকারী সমিতি মিলে একটি সমবায় ব্যাংক গঠন করতে পারে। এই ব্যাংকগুলি থেকে সমবায় ও অন্যান্য সমিতিগুলিকে ঋণ দেওয়া হয়।

৬. **সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিঃ** গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের গৃহ-সমস্যা দূর করার জন্য সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতিগুলি শেয়ার-বিক্রয়লব্ধ পুঁজি ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট থেকে আমানত জমা গ্রহণ করে থাকে এবং ঐ অর্থ থেকে জমি ক্রয় ও বাড়ি তৈয়ারীর জন্য সদস্যগণকে ঋণ দেয়। এদের কারবার অনেকটা সমবায় ব্যাংকের মত হলেও পার্থক্য এই যে, এর অর্থ জমি বা বাড়ির মত স্থাবর সম্পত্তিতে লগ্নী করা হয়। ঋণ বাবদ জমি ও বাড়ি এর নিকট বন্ধক থাকে। ঋণের অর্থ অল্পসুদ সহ সহজ কিস্তিতে ফেরত দিতে হয়। অনেক সময় এই সমিতি নিজেই সদস্যদের গৃহ নির্মাণ করে দেয়। ঋণ পরিশোধ হলে পর সম্পত্তি দায়মুক্ত অবস্থায় মালিককে ফেরত দেওয়া হয়। বর্তমানে এদেশে বড় বড় শহরে এধরনের অনেক সমিতি দেখা যায়।

৭. **সমবায় বীমা সমিতিঃ** অন্যান্য কারবারের মত জীবন ও অন্যান্য বীমা ব্যবসায়ও সমবায় সমিতি মারফত সংগঠিত করা হয়। পলিসিহোল্ডার বা বীমাকারিগণই সমিতির মালিক হয় এবং কারবারের লাভের অংশ তাদের মধ্যে লভ্যাংশ আকারে বণ্টন করা হয় অথবা ঐ বাবদ 'প্রিমিয়াম' কমিয়ে দেওয়া হয়। কৃষকগণের মধ্যে সমবায় গো-বীমা, শস্য বীমা সমিতি প্রভৃতি গঠন করে তাদের যথেষ্ট উপকার করা যায়।

৮. **বহু উদ্দেশ্যসাধক বা সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতিঃ** সাধারণত, এক একটি উদ্দেশ্যে এক একটি সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এদের এক উদ্দেশ্যসাধক সমিতি বলা যায়। একাধিক উদ্দেশ্য নিয়েও সমবায় সমিতি গঠন করা যায়। এই সমিতিগুলিকে বহু উদ্দেশ্যসাধক বা সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি বলে। ১৯৩৭ সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। তার দশ বৎসর পর সমবায় পরিকল্পনা কমিটি এই জাতীয় সমিতি গঠনের সুপারিশ করেন। তার পর থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই জাতীয় সমিতি ব্যাপকভাবে গঠিত হতে থাকে। পুরাতন

এক উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলিকে সংস্কার করে বা নতুন ভাবে বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতি স্থাপন করা হয়ে থাকে। এরা একাধারে ঋণদান করে, বীজ ও সার ক্রয় করে সরবরাহ করে, ফসল বিক্রয় করে, সদস্যদের বিভিন্ন পার্শ্বজীবিকার ব্যবস্থা করে এবং তাদের যৌথ সম্পত্তির তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সংগঠন

DIFFERENT CLASSES OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

১. **প্রাথমিক সমিতিঃ** সমবায় সংগঠনকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। যথা—সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে প্রাথমিক সমিতিগুলি। এরা ঋণদান সমিতি বা অ-ঋণদান সমিতি হতে পারে এবং স্থান অনুসারে গ্রাম্য অথবা নগর সমিতি হতে পারে।

২. **সেন্ট্রাল ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সমিতি ঃ** পাঁচ থেকে আট মাইলের মধ্যে অবস্থানকারী কতকগুলি প্রাথমিক সমিতি একত্রিত হয়ে তাদের একটি কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপন করতে পারে। ঋণদান সমিতির বেলায় এইভাবে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক গঠিত হয়। অ-ঋণদান সমিতিগুলির বেলায় এইরূপে বিভিন্ন প্রাথমিক সমবায় সমিতির মধ্যে সংযোগসাধনকারী একটি কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অনেক সময় প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলি কর্তৃক গৃহীত ঋণ সম্বন্ধে জামীন থাকার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় গ্যারাণ্টি ইউনিয়ন গঠিত হয়।

৩. **অ্যাপেক্স সোসাইটি বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমিতিঃ** তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তরে থাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমিতি। ঋণদান সমিতিগুলির ক্ষেত্রে প্রতি রাজ্যের বা অঞ্চলের জন্য একটি করে রাজ্য বা আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক গঠিত হয়ে থাকে। অ-ঋণদান সমিতি, যেমন—উৎপাদক ও ক্রয়-বিক্রয় সমিতির ক্ষেত্রে রাজ্য সমিতি গঠিত হয়ে তার দ্বারা রাজ্য ভিত্তিতে প্রাথমিক সমিতিগুলির সহায়তা ও তদারকীর কাজ চলতে পারে।

সমবায় সমিতির সুবিধা ঃ ১. এর মাধ্যমে কৃষক ও কুটির শিল্পের কারিগরগণ সংঘবদ্ধ হয়ে উৎপাদন পরিচালনা করলে, বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ, অবৈতনিক সেবা ও জনসাধারণের সহানুভূতির দরুন বিজ্ঞাপন ব্যয় হ্রাস প্রভৃতি সুবিধা সকল ভোগ করে বলে উৎপাদন ব্যয় কমাতে সমর্থ হয়।

২. মধ্যস্থ কারবারীর সাহায্য ছাড়াই উৎপাদনকারী সমবায় সমিতিগুলি ক্রেতার নিকট সরাসরি পণ্য বিক্রয় করে বলে বেশি দামে পণ্য বিক্রয় করতে পারে। এজন্য উৎপাদনকারীদের আয় বৃদ্ধি হয়।

৩. একদিকে উৎপাদন ব্যয় কমে ও অপরদিকে বিক্রয়লব্ধ আয় বাড়ে বলে উৎপাদনকারীরা উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহ পায়।

৪. ক্রেতারা মধ্যস্থ কারবারী মারফত না গিয়ে সমবায় ভাণ্ডার মারফত অথবা সরাসরিভাবে উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির নিকট থেকে কিনতে পারায় অপেক্ষাকৃত অল্প দরে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা ভোগ করে। সুতরাং তাদের ব্যয়সংকোচ হয়।

৫. সাধারণত সমবায় সমিতির নিকট থেকে কম দামে পণ্য পাওয়া যায়, ক্রেতাদের মধ্যে এই বহুল প্রচলিত ধারণার দরুন সমবায় সমিতিগুলির বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে।

৬. এদের মারফত পণ্যের উৎপাদন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সংগঠিত হলে, সাধারণ মানুষও এদের সদস্য হিসাবে পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত বিবিধ অর্থনীতিক কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে।

৭. দরিদ্র কৃষিজীবী ও কুটিরশিল্পী জনসাধারণের বড়ো অংশের অর্থনীতিক উন্নতি সাধন সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে সহজেই সম্ভব। তাদের জীবনযাত্রার স্তরও উন্নীত করা যায়।

৮. সমবায় সমিতির মারফত কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক আয় বৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় আয়ের অধিকতর সমবণ্টন লাভ করা যায়।

৯. সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদের মধ্যে সততা পারস্পরিক বিশ্বাস, স্বার্থত্যাগ ও সহযোগিতা প্রভৃতি সদ্গুণের শিক্ষা দিয়ে তাদের নৈতিক উন্নতি সাধন করে থাকে।

১০. সমবায় পদ্ধতির মূলনীতি হল আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বায়ত্তশাসন : সমিতির সকল কাজ সদস্যগণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে আত্মচেতনা ও বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। সমিতির কাজে তারা সমান গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে। এই সকল কারণে তাদের মধ্যে সুনাগরিকের গুণাবলী, যথা— দায়িত্ব বোধ, অধিকার জ্ঞান ইত্যাদি জেগে উঠে দেশের মধ্যে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

১১. এদের ব্যয় অল্প এবং পুঁজি কম লাগে বলে এদের দ্বারা অল্প অর্থ-বিনিয়োগে, কৃষিভিত্তিক, ক্ষুদ্রায়তন কুটিরশিল্পের পুনর্গঠন এবং সম্প্রসারণের সাথে অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থান সম্ভব হওয়ায় ভারতের মত দরিদ্র অনুন্নত দেশের শিল্পোন্নয়নে সমবায় পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে।

অসুবিধা : ১. সমবায় সমিতিগুলির প্রধান অসুবিধা হল, পুঁজির স্বল্পতা। দরিদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিদের সংগঠন বলে পুঁজির অভাবে এদের কার্যাবলী বিস্তার লাভ করতে পারে না। এ জন্য বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা এর ভিত্তিতে সংগঠন করা যায় না।

২. আর্থিক সামর্থ্য কম হওয়ায় এর সাহায্যে সকল প্রকার ব্যবসায় ও শিল্পের পরিচালনা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ চাহিদার পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন কার্যই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়।

৩. এই সমিতিগুলি সাধারণত ক্ষুদ্রাকার ও তাদের সামর্থ্য অল্প এবং তাদের মুনাফা সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টনলাভের নীতি অনুসরণ করে বলে কর্মদক্ষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগী ব্যক্তিদের পক্ষে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা সমবায়ে আকৃষ্ট না হওয়ায়, তাদের অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার সুবিধা হতে সমিতিগুলি বঞ্চিত হয়।

৪. সমবায় সমিতির সুনামের দরুন বিক্রয়ের খানিক পরিমাণ নিশ্চয়তা থাকায়, পরিচালক ও কর্মীদের মধ্যে ধীরে ধীরে কর্মশৈথিল্য দেখা দেয়।

৫. আর্থিক সামর্থ্য অল্প থাকায় এরা উচ্চবেতনে অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে না।

৬. যে সকল পণ্যের চাহিদা সর্বদা পরিবর্তনশীল ও যাদের ক্ষেত্রে উৎপাদন-কারীব ব্যক্তিগত কর্মনৈপুণ্যই বিক্রয়ের প্রধান সহায়ক, সেখানে সমবায় পদ্ধতি অনুপ-যোগী।

৭. সমবায়ের সাফল্যের জন্য স্বার্থত্যাগ. সেবার মনোবৃত্তি. পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা এবং সদস্যদের মধ্যে ঐক্য প্রভৃতি যে সকল গুণাবলী অপরিহার্য তা কর্মক্ষেত্রে খুব অল্পই দেখা যায়। এর ফলে সমবায় সমিতিগুলি প্রায়ই সভ্যদের মধ্যে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা ইত্যাদি দোষের জন্য কলহক্ষেত্রে পরিণত হয়।

৮. অধিকাংশ সদস্যদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার দরুন প্রায়ই এই সমিতিগুলি কুচক্রী ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ও তাদের স্বার্থসাধনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভারতের সমবায় আন্দোলনের চরিত্র

CHARACTER OF THE CO-OPERATIVE MOVEMENT IN INDIA

ভারতের সমবায় সমিতিগুলির অধিকাংশই ঋণদানকারী সমিতি, উৎপাদনকারী বা বহু-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমিতি নয়। ঋণদানকারী সমিতিগুলিকে আবার তিন স্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, কৃষি ও অ-কৃষি, প্রাথমিক ঋণদান সমিতি। দ্বিতীয়ত জেলা বা মহকুমা স্তরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও তৃতীয়ত, রাজ্যস্তরে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান রাজ্য ব্যাংক। এরা স্বল্প ও মাঝারী মেয়াদের ঋণ সরবরাহ করে থাকে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সাধারণত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সরবরাহ করে। তবে ভারতে এদের সংখ্যা বেশী নয়।

বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা সমবায়ের এই দুর্বলতা দূর করবার চেষ্টা চলেছে। ঋণদান কার্যের পাশাপাশি ক্রয়, বিক্রয় উৎপাদন, কৃষিকার্য,

গুদামজাতকরণ প্রভৃতি বহুবিধ কার্যে সমবায় প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করা হচ্ছে এবং এই-রূপে সমবায়ের নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করা হচ্ছে। ভারত সরকারের বর্তমান নীতি হচ্ছে ধীরে ধীরে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের পাশাপাশি সারাদেশে একটি বিশাল সমবায় ক্ষেত্র গড়ে তোলা। **১৯৫৮** সালের নাগপুর-কংগ্রেস সম্মেলনে ভারতে কৃষিকার্যের ভবিষ্যৎ ছক হিসাবে সমবায় কৃষির প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে একে উৎসাহ দানের নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন। এইরূপে সমবায়ের দুর্বলতাগুলি যথা—শিক্ষার অভাব, অর্থের অভাব প্রভৃতি দূর করে একে শক্তিশালী করার চেষ্টা চলেছে।

আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : ভারতের কৃষি সংস্কার কার্য, গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পুনর্গঠন ও গ্রাম্য জনসাধারণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমবায়ের বিশেষ উপযোগিতার কথা মনে রাখলে, সমবায় আন্দোলনের যে বিরাট ও উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই পথেই ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ও দেশের অর্থনীতির উন্নতির সংগে সংগে অর্থনীতিক বৈষম্য কার্যকরীভাবে হ্রাস পেতে পারে। সমবায় আন্দোলনের উন্নতির একটি চিত্র নিচে দেওয়া গেল।

	১৯৫১-৫২	১৯৭০—৭১
সমিতির সংখ্যা	১,৮৫,৬৩০	৩২০,০০০
প্রাথমিক সমিতির সদস্যসংখ্যা	১,৩৭,৯১,৬৮৭	৫,৯০,৬৪০০০
শেয়ার পুঁজি (কোটি টাকায়)	৪৯·০৮	৮৫০·৭২
কার্যকর পুঁজি (,,)	৩০৬·৩	৬,৮০৯·৫৯

৪

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

THE PUBLIC OR STATE ENTERPRISE

রাষ্ট্রীয় কারবার স্থাপনার উদ্দেশ্য (PURPOSES OF STATE ENTERPRISES)

শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ আইনের দ্বারা ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারবারগুলির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয় বলে আধুনিককালে সকল দেশেই নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ও ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কারবার স্থাপিত হতে দেখা যায় ঃ—

১. **মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ঃ** মুদ্রার যোগান ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থের মূল্য স্থির রাখার জন্য অধিকাংশ দেশেই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কও এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হচ্ছে।

২. **একচেটিয়া কারবার ঃ** বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের একচেটিয়া কারবার দেখা দিলে বা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার প্রতিকারের জন্য ঐ কারবারের জাতীয়করণ করে সরকারী মালিকানায় একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩. **দেশরক্ষা শিল্প ঃ** বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার শক্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য দেশরক্ষা শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়ে থাকে।

৪. **গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ ও ক্ষতিকারক ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ঃ** আফিং-এর মত ক্ষতিকারক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার যাতে বেশী না হয় বা পেনিসিলিনের মত গুরুত্বপূর্ণ ভেষজের যাতে নির্দিষ্টমান অনুযায়ী উৎপাদন ঘটে ও তাতে মুনাফাবাজী হতে না পারে সেজন্য এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে দেখা যায়।

৫. **বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলপথ, ডাক এবং তার ও জল সরবরাহ প্রভৃতি জনসাধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্প ঃ** এই সকল অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের জাতীয় গুরুত্ব থাকায় এদের ভার বেসরকারী অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপরই ন্যস্ত করা উচিত বলে বিভিন্ন দেশে এদের রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

৬. **অনুন্নত বা অর্ধোন্নত দেশের শিল্পায়ন ঃ** আধুনিককালে ভারতসমেত অনেক অনুন্নত দেশেই দ্রুত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের উদ্যোগের উপর নির্ভর করা হচ্ছে। ফলে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এই সকল দেশের শিল্পে ঋণের অভাব দূর করার জন্যও সরকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে।

৭. **কর্মসংস্থান ঃ** বাণিজ্য চক্র জনিত বেকার সমস্যা দূর করার জন্য কীন্‌স্‌ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের দ্বারা বিনিয়োগ করে তাতে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

৮. **পণ্যবিশেষের মূল্য স্থিতিকরণের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান ঃ** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট স্তরে বজায় রাখার জন্য সরকারী কৃষি বিভাগ থেকে অতিরিক্ত ফসল কিনে নেবার ব্যবস্থা আছে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজের দ্বারা পণ্যবিশেষের দাম নির্দিষ্ট স্তরে ধরে রেখে উৎপাদনকারীদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা যায়।

৯. বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান : অন্যান্য দেশের সাথে সুবিধাজনক দরে আমদানী-রপ্তানী পরিচালনা করার জন্য ভারতের মত সরকারী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানও[1] স্থাপিত হতে পারে।

১০. জাতীয় স্বার্থে শিল্পবিশেষের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ : এ ছাড়াও আধুনিককালে অনেক দেশেই বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে অনাচার, দুর্নীতি ও অপচয় বৃদ্ধি পেলে জনসাধারণের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য তার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ঘটতে পারে। ভারতে জীবনবীমার জাতীয়করণ এর একটি দৃষ্টান্ত।

রাষ্ট্রীয় কারবারের বিভিন্ন রূপ : রাষ্ট্রীয় কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে। এদের ধরন-ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার পদ্ধতি বিভিন্ন। রাষ্ট্রীয় কারবারের সাংগঠনিক রূপ মূলত তিন প্রকারের। যথা,—

১. সরকারী বিভাগীয় সংগঠন।

২. আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত স্ট্যাটুটরি বা বিধিবদ্ধ করপোরেশন।

৩. সরকারী যৌথমূলধনী কোম্পানী।
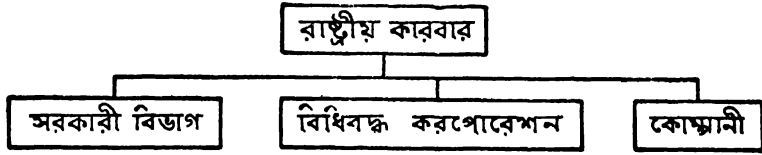
সরকারী বিভাগীয় সংগঠন (GOVERNMENT DEPARTMENTAL ORGANISATION)

বৈশিষ্ট্য : সরকারী বিভাগ বা দপ্তরের অধীন, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীতে কারবার চালনা রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রাচীনতম রূপ। ১. এই ব্যবস্থায় পরিচালিত কারবারটি এবং সরকারের মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না। সরকার বা রাষ্ট্রের সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামোর অঙ্গ হিসাবে কারবারটি গণ্য করা হয়। ২. সরকারের কোষাগার থেকে এর ব্যয় নির্বাহ এবং যাবতীয় আয় সরকারী কোষাগারেই জমা করা হয়। ৩. সাধারণত যে সকল ক্ষেত্রে সরকারী কোষাগারের আয় লাভ করাই প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে এজাতীয় সংগঠন স্থাপিত হয়। ৪. এদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকে।

দৃষ্টান্ত : ভারতে পোস্ট অফিস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, লবণ উৎপাদন, রেল পরিবহণ, চিত্তরঞ্জনে রেল কারখানা এবং পেরাম্বুরে অখণ্ড রেল কামরা (integral coach) নির্মাণের কারখানা, অল ইণ্ডিয়া রেডিও প্রভৃতি এই জাতীয় সংগঠন। ভারতের দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদনের কারখানাগুলিও এই প্রকার ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫টি।

গুণ : এইরূপ সংগঠনের সুবিধা তিনটি—১. এতে সরকারের সর্বাধিক পরিমাণ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত হয়। ২. এইরূপ ব্যবস্থায় সর্বাধিক পরিমাণ গোপনীয়তা রক্ষিত হতে পারে। ৩. এর দোষত্রুটির জন্য রাজ্যের আইন সভায় বা পার্লামেন্টে সহজেই প্রশ্ন ও সমালোচনা করা যায়। কারণ সরকার এদের জন্য বিধান সভা বা সংসদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকে।

ত্রুটি : ১. প্রত্যক্ষ সরকারী বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী দপ্তরের চিরা-চরিত গয়ংগচ্ছ নীতিতে এরা চালিত হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যে এদের কাজে অহেতুক দেরী হয়। ২. ঘন ঘন বিভাগীয় মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের পরি-বর্তনে এদের কাজ ও নীতিতে ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে। তাতে কারবারের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। ৩. কার্যরত সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারিরা কাজে রুটিনমাফিক কাজের অতিরিক্ত কোন উদ্যোগ ও তৎপরতা দেখায় না। কোন গাফিলতী ও ত্রুটির জন্য

1. State Trading Corporations.

দায়ী ব্যক্তিদের খুজে বের করা কঠিন হয়। ৪. বাজারে উৎপাদিত পণ্যের বা সরবরাহ-কৃত সেবার চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে তদনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম, নীতি ও কার্য-পদ্ধতির সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের নেই। ৫. নৈর্ব্যক্তিক সরকারী দপ্তর বলে বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা, পছন্দ, রুচি প্রভৃতির প্রতি এদের কোন লক্ষ্য থাকে না। ৬. সরকারী দপ্তর হওয়ায় এরা আয় অনুযায়ী ব্যয়ের নীতিতে পরিচালিত হয় না। বরং অধিকাংশ স্থলেই আয়াতিরিক্ত ব্যয় হয় এবং কারবারে লোকসান হয়। ৭. দৈনন্দিন কাজে অবিরত সরকারী হস্তক্ষেপ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আর একটি ত্রুটি।

মন্তব্য ঃ এই ধরনের সরকারী কারবারী সংগঠনের গুণ অপেক্ষা দোষ বেশী বলে বিশেষত, শিল্পবাণিজ্যের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে এই প্রকার সংগঠন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় করপোরেশন (STATUTORY CORPORATION)

বৈশিষ্ট্য ঃ সরকারী দপ্তর দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রীয় কারবারের ত্রুটির জন্য সম্প্রসারণশীল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনের অধিকতর উপযুক্ত একপ্রকার নতুন সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে। এরা 'পাবলিক করপোরেশন' বা বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় করপোরেশন নামে পরিচিত। ইংলন্ডের রাষ্ট্রীয় কারবারগুলি এই প্রকারের। ভারতেও এই প্রকার কারবার গঠিত হয়েছে। এদের বৈশিষ্ট্যগুলি এই—১. এরা পার্লামেন্টের বা আইন সভার বিশেষ আইনের দ্বারা গঠিত হয়। ২. ঐ আইনের দ্বারা এদের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, কার্যক্ষেত্র ও পরিধি নির্দিষ্ট হয়। ৩. এদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সরকার মনোনীত একটি পরিচালক পর্ষতের উপর ন্যস্ত হয়। ৪. আর্থিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এদের স্বাতন্ত্র্য থাকে। ৫. এদের স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হয়।

দৃষ্টান্ত ঃ ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন, জীবনবীমা করপোরেশন, দামোদর ভ্যালী করপোরেশন, এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশন প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০টি। এছাড়া রাজ্য-সরকারগুলির অধীনেও এরূপ সংস্থা প্রায় সমস্ত রাজ্যেই রয়েছে।

গুণ ঃ ১. সরকারী দপ্তরের লালফিতার দৌরাত্ম্য এতে অল্প। ২. বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মত এদের পরিচালনা নীতি বাজারের অবস্থা অনুযায়ী সহজ পরিবর্তনযোগ্য হতে পারে ৩. দৈনন্দিন কাজে প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটে না। ৪. আইন সভায় বা পার্লামেন্টে এদের কার্যাবলীর দোষত্রুটির সমালোচনা দ্বারা তা দূর করা যায়।

ত্রুটি ঃ ১. এরা যে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেগুলির সংশোধন না করা পর্যন্ত এদের কার্যাবলী ও সাংগঠনিক কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় না। এবং তা সম্পাদনেও দেরী হয়। সুতরাং বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মত এদের সহজ পরিবর্তনশীলতা দেখা যায় না। ২. এদের কাজে সংশিলষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের হস্তক্ষেপ যে না ঘটে তা নয়। জীবনবীমা করপোরেশনের লগ্নীকার্যে সংশিলষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের হস্তক্ষেপের ঘটনা ('মুন্দ্রা ঘটনা') এ সম্পর্কে স্মরণীয়। ৩. শ্রমিক কর্মচারিগণের তরফ থেকে এই অভিযোগ করা হয় যে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় সরকার বলেছেন যে, এরা বেশী পরিমাণে শ্রমিককর্মচারী স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতা থেকে বিপরীত ঘটনাই দেখা যায়। ৪. এর ব্যবস্থাপনার ভার এপর্যন্ত প্রধানত উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারিদের উপরই ন্যস্ত হয়েছে। তাদের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

মন্তব্য ঃ সরকারী ক্ষমতায় সজ্জিত অথচ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পরিবর্তন যোগ্যতাসম্পন্ন এই প্রকার রাষ্ট্রীয় করপোরেশনকে অনেকেই রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনার জন্য আদর্শ সংগঠন বলে মনে করেন। কিন্তু শ্রীগোরওয়ালার মতে দ্রব্যসামগ্রী

উৎপাদন ও লাভক্ষতির বাণিজ্যিক নীতি যে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয় সেখানে এই প্রকার প্রতিষ্ঠান অনুপযুক্ত। অবশ্য বর্তমানে এই সকল করপোরেশনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা-বিশেষজ্ঞ ভারতীয় কর্মচারীর অভাবই এদের কার্যদক্ষতার অভাবের প্রধান কারণ। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি উৎপাদন, পরিবহণ, সংসরণ লৌহ-ইস্পাত এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রিদপ্তরগুলির অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেণ্ট সার্ভিস' নামে একটি পৃথক্ সরকারী কর্মচারী শ্রেণী সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সরকারী যৌথ মূলধনী কারবার (GOVERNMENT COMPANY)

বৈশিষ্ট্য : ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যে সর্বাধুনিক সাংগঠনিক রূপ প্রবর্তিত হচ্ছে তা হল সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ও ব্যাপক মালিকানার যৌথমূলধনী কারবার (অর্থাৎ প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী) ভারতের কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠিত হয়ে থাকে। ঐ আইনের ৬১৭ ধারায় সরকারী মালিকানায় যৌথমূলধনী কারবার গঠনের ব্যবস্থা আছে। ১. এই-গুলি প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীরূপে গঠিত হয়। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার. কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকার, কেবল এক বা একাধিক রাজ্যসরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার ও জনসাধারণ বা বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ এদের শেয়ারের মালিক হতে পারে। তবে মোট শেয়ারের ৫১% সরকারের হাতে থাকবে। এরূপ অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে বিদেশী পুঁজিও অংশগ্রহণ করেছে। ২. এদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার সাধারণ যৌথমূলধনী কারবারের ন্যায় একটি পরিচালক পর্ষতের উপরে ন্যস্ত থাকে। তবে এরূপ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই একটি বাদে অন্য সকল শেয়ার রাষ্ট্রপতির নামে খরিদ করা হয় বলে এদের শেয়ারহোল্ডারগণের বাৎসরিক সভা ডাকা হয় না এবং কার্যত সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিরাই পরিচালক নিযুক্ত হয়।

দৃষ্টান্ত : বর্তমানে অধিকাংশ নূতন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই এইজাতীয়। সিন্ধ্রি ফারটিলাইজারস্ অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রাইভেট লিঃ, হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড প্রাইভেট লিমিটেড. স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। এরূপ সরকারী যৌথ মূলধনী কোম্পানীর মোট সংখ্যা বর্তমানে ৩৮১টি ও তাদের মোট আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ২,৯৯৮ কোটি টাকা।

গুণ : ১. এরা প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলে অন্যান্য ধরনের সরকারী কারবার অপেক্ষা এদের কর্মদক্ষতা বেশী। ২. যৌথমূলধনী কোম্পানীর আকারে গঠিত হয় বলে সরকার থেকে এদের সাংগঠনিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। ৩. কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয় বলে ওই আইনের চৌহদ্দির মধ্যে এদের ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। ৪. করপোরেশনের আকারে গঠিত সরকারী কারবারের মত এদের হিসাবপত্র ইত্যাদি পার্লামেন্ট বা আইনসভায় পেশ করা বাধ্যতামূলক নয়। ফলে সরকারের পক্ষে কিছুটা পার্লামেন্ট বা আইনসভার সমালোচনা এড়ানো সম্ভব হয়। ৫. বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে এরা অতিরিক্ত পুঁজি যোগাড় করতে পারে।

ত্রুটি : ১. সরকারী প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর রূপ বিভ্রান্তিকর। কারণ দেখতে যৌথমূলধনী কারবার হলেও প্রকৃতিতে এরা সরকারের একক মালিকানার কারবার ছাড়া আর কিছুই নয়। ২. অনেকে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশবাসী ও পার্লামেন্টের নিকট জবাবদিহি এড়াবার জন্যই সরকার এরূপ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর আকারে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে। ৩. এদের পরিচালক পর্ষতে যে সব সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হয় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা থাকে না; অনেকক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্পের

অনেককে এ অভাব পূরণের জন্য পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয় বটে, তবে তাতে সামগ্রিকভাবে পরিচালনায় সংহতি ঘটে না।

মন্তব্য : শ্রীগোরওয়ালার মতে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যক্তিগত বিবেচনা যে সকল রাষ্ট্রীয় কারবারে প্রধান, সেখানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর আকারে গঠিত প্রতিষ্ঠানই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পার্লামেণ্টের এস্টিমেট কমিটি[2] কিংবা ইকাফে[3] সম্মেলন এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তবে প্রথম পরিকল্পনাকালে কমিশন ও ভারত সরকার এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। ফলে এই প্রকার রাষ্ট্রীয় কারবারই এখন বেশি সংখ্যায় স্থাপিত হচ্ছে।

উপসংহার : ভারত সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করায় একদিকে যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির উপযুক্ত সাংগঠনিক রূপ, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, কার্যদক্ষতা প্রভৃতির সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় কারবারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্তশাসন, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা, উপযুক্তভাবে হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা, পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের নিকট তাদের কার্যবিবরণী পেশ, তাদের জন্য মন্ত্রিগণের দায়িত্ব এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি নীতি গৃহীত হওয়া আবশ্যক। এই মূলনীতি-গুলির মাপকাঠিতে বিচার করলে উপরোক্ত তিন প্রকার রাষ্ট্রীয় কারবারের সংগঠনের মধ্যে পাবলিক করপোরেশনের আকারে গঠিত রাষ্ট্রীয় কারবারগুলিই সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। কারণ উপরোক্ত মূলনীতিগুলির অধিকাংশই তাতে অনুসৃত হয়।

রাষ্ট্রীয় কারবারের গুণাবলী : ১. ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে সম্পদ ও আয়েব বণ্টনে বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় কাব-বারের দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা পবিচালিত হলে জাতীয় আয়ের বণ্টন-বৈষম্য দূর হয়ে অধিকতর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

২. খনি, অবণ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ব্যবহার বেসরকারী কাববারের দ্বারা পরিচালিত হলে, তারা মুনাফাবৃদ্ধির জন্য ঐ সব সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহাব কবে দ্রুত বিনাশ ঘটায়। এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কাববার প্রতিষ্ঠা করা হলে জাতির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সম্পদের সযত্ন ব্যবহাব সম্ভব হতে পারে।

৩. ব্যক্তিগত উদ্যোগেব কারবারগুলি শুধুমাত্র মুনাফার দ্বারা পরিচালিত হয় বলে জনসাধারণেব প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন ঘটে না এবং উৎপাদনের উপাদানগুলিব বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যথাযথ বণ্টন ঘটে না। রাষ্ট্রীয় কারবার দ্বারা এই দুইটিরই প্রতিকার সম্ভব।

৪. জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ যে সকল শিল্প ও সেবা কার্য রয়েছে, যথা, পানীয় জল সরববাহ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ বাবস্থা, গ্যাস সরববাহ, মূল্যবান ঔষধ উৎপাদন প্রভৃতি, সেই সব ক্ষেত্রে বেসরকারী কারবারেব উপর নির্ভর কবা বিপজ্জনক। কারণ তারা মুনাফার লালসায় ভেজাল দিতে এবং নিকৃষ্ট জাতীয় পণ্য উৎপাদন করতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে সবকারী কারবার স্থাপন দ্বারা নির্দিষ্ট মানের পণ্য উৎপাদনের নির্ভর-যোগ্য ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যায়।

৫. শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে বেসরকারী একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হলে তারা শ্রমিকদের অল্প মজুরিতে কাজ করতে, কাঁচামালের উৎপাদকগণকে স্বল্পমূল্যে তা বিক্রয় করতে ও ক্রেতাদের অত্যধিক দরে পণ্য খরিদ করতে বাধ্য করে। রাষ্ট্রীয় এক-চেটিয়া কারবার জাতীয় স্বার্থে পরিচালিত হয় বলে কাঁচামালের দর, শ্রমিকদের মজুরী ও পণ্যের দর সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত নীতি অনুসরণ করতে পারে।

---

2. Eastimates Committee.
3. ECAFE or United Nations Economic Commission for Asia and the Far East.

৬. দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি উৎপাদনকারী শিল্পগুলি বেসরকারী কারবারের উপর ছেড়ে দিলে মুনাফার লোভে তারা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষতি করতে পারে। এজন্য দেশরক্ষা শিল্পগুলি সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ঐগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা প্রয়োজন।

৭. রাষ্ট্রীয় কারবারের অধীনে শিল্পগুলি পরিচালিত হলে, জাতীয় স্বার্থের সেবায় উচ্চতর প্রেরণা দ্বারা কর্মীরা উদ্বুদ্ধ হয় ও তার ফলে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় নানাদিকে ব্যয়সংকোচ ঘটে। উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের ফলে অল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয় করা যায়।

৮. অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজির অভাবে শিল্পসমূহ গড়ে উঠতে পারে না। এই অবস্থায় একমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কারবার স্থাপন করে পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা দেশের শিল্পায়ন সম্ভব হতে পারে।

৯. অনেক শিল্পে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, মুনাফা অত্যন্ত অল্প এবং বিরাট ঝুঁকি বহন করতে হয়। এদের বেলায় সাধারণতঃ বেসরকারী শিল্পপতিরা আকৃষ্ট হয় না। ফলে তাদের প্রতিষ্ঠা ও উপযুক্ত উন্নতি ঘটে না। এই সকল ক্ষেত্রে একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব।

১০. অনেক সময় কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উৎপাদন কমিয়ে অথবা গোপন মজুদ করে উৎপাদনকারীরা ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা চড়াদামে বিক্রয় করে। রাষ্ট্রীয় ব্যবসা প্রবর্তনের দ্বারা এর প্রতিকার করা যায়।

১১. রাষ্ট্রীয় কারবারের দ্বারা সরকারের যথেষ্ট পরিমাণে আয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এরূপে সরকারের আয় বৃদ্ধি ঘটলে জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত কর চাপাতে হয় না। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত কারবার জনসাধারণ এবং রাষ্ট্র উভয়ের দিকেই সুবিধাজনক।

১২. তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি বিজ্ঞাপন প্রভৃতির জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এটা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের অধীনে প্রতিযোগিতার অপচয় দূর করে, বিভিন্ন প্রকার শিল্পের ভারসাম্য-বিশিষ্ট ও বিভিন্ন অঞ্চলের যথাযথ শিল্পায়ন ঘটতে পারে।

১৩. বেসরকারী উদ্যোগের ভিত্তিতে স্থাপিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা ঘন ঘন বাণিজ্যচক্র[4] জনিত সংকটে পড়ে। তখন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির একের পর এক বন্ধ হতে থাকে ও দেশের বেকার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। জনসাধারণের জীবনে দারিদ্র ও অনাহারের অভিশাপ দেখা যায়।

এর পরিবর্তে রাষ্ট্রায়ত্ত কারবার প্রতিষ্ঠা করে মন্দার বাজারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দ্বারা বেকার সমস্যা কমান যায় ও সমগ্র অর্থনীতিক কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয় কারবারের দ্বারা পরিচালনা করা হলে বাণিজ্যচক্রের অবসান ঘটান যায়। এই জন্যই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই অভিশাপ থেকে মুক্ত।

ত্রুটি ঃ ইতিপূর্বে রাষ্ট্রীয় কারবার বা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রশ্নে তুমুল বাদবিসংবাদের সৃষ্টি হত এবং রাষ্ট্রীয় কারবারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করে তার অবাঞ্ছনীয়তা প্রমাণের চেষ্টা হত। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রীয় কারবার বাঞ্ছনীয় কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়েছে। এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যোগের কারবার শুধুমাত্র মুনাফার উদগ্র লালসায় পরিচালিত হয়। এর দরুন তারা নিজেদের স্বার্থ সাধনে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। অতএব নিজ সংকীর্ণ স্বার্থের সহিত বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ও কল্যাণের সামঞ্জস্য সাধনে অক্ষমতার দরুন বেসরকারী উদ্যোগের স্থলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ভিত্তিতে অর্থ-নীতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করা—সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি স্থাপন করা প্রয়োজন।

তবে **রাষ্ট্রায়ত্ত কারবার পরিচালনের সাফল্য নিম্নোক্ত কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—**১. রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনায় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হয়। এই পরিকল্পনা অতি সতর্কভাবে দূরদৃষ্টির সহিত প্রণয়ন করতে হয়। ২.

4. Trade Cycle.

রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনার ভার যাদের উপর ন্যস্ত থাকবে, তাদের রাষ্ট্রীয় কারবারের উপযোগী নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা অবশ্য প্রয়োজন। পুরাতন, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন যুগের উপযোগী প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সাফল্যের আশা দুরাশা মাত্র। ৩. রাষ্ট্রীয় কারবারের সকল কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও জাতীয় স্বার্থবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা দরকার এবং উপরস্থ কর্মচারীদেরও তাদের সাথে উপযুক্ত সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। অন্যথায় সকল শ্রেণীর কর্মীদের নিকট থেকে অকুণ্ঠিত সহযোগিতার অভাবে কারবারের সাফল্য বিপন্ন হতে বাধ্য। ৪. ব্যাপক জনসমর্থন ও সহযোগিতা লাভের জন্য এই সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেরও ন্যায়সঙ্গত মজুরী ও মূল্য-নীতি অনুসরণ করা অবশ্যই দরকার। ৫. এই সকল কারবার পরিচালনার উপযুক্ত এক-দল কর্মীও সুশিক্ষিত করে তুলতে হয় এবং সুশিক্ষিত কর্মীদের বেশ কিছুদিন ধরে নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও তা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া উচিত। কর্মীদের ঘন ঘন বদলী করা হলে কাজে বিঘ্ন ঘটবারই সম্ভাবনা।

ভারতে রাষ্ট্রীয় কারবার (STATE ENTERPRISES IN INDIA)

ভারতে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় কারবারই রয়েছে। তবে দ্বিতীয় পরি-কল্পনাকাল থেকে যৌথমূলধনী কারবাররূপে সংগঠিত রাষ্ট্রীয় কারবারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৭৩ সালের শেষে রাষ্ট্রীয় যৌথমূলধনী কারবারের সংখ্যা ছিল ৩৮১টি। এদের শেয়ার-পুঁজির ৫১ শতাংশ অথবা ততোধিক কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্যসরকারের হাতে রয়েছে।

১৯৫১-৭৩ সালের মধ্যে এই সকল রাষ্ট্রীয় যৌথমূলধনী কারবারের সংখ্যা ১০ গুণের বেশী ও এদের আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ প্রায় ১১৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে: নীচে বিস্তৃত তথ্য দেওয়া হল।

রাষ্ট্রীয় যৌথমূলধনী কারবারের সংখ্যা ও আদায়ীকৃত পুঁজি

বৎসর		সংখ্যা	আদায়ীকৃত পুঁজি (কোটি টাকায়)
১৯৫১	...	৩৬	২৬·৩
১৯৫৬	...	৬১	৬৬·০
১৯৬১	...	১৪২	৫৪৬·৪
১৯৭৩	...	৩৮১	২,৯৯৮·৪

বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় কারবারের সংখ্যা বিচারে দেখা যায় যে, উড়িষ্যা রাজ্যে সর্বাধিক সংখ্যক সরকারী কোম্পানী অবস্থিত। তার পরেই দিল্লী। তার পর মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ। পশ্চিমবঙ্গে অল্পসংখ্যক সরকারী কোম্পানী অবস্থিত।

মালিকানার দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতের সরকারী যৌথ-মূলধনী কারবারগুলিতে ৬ প্রকারের মালিকানা রয়েছে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন কোম্পানী। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের যুক্ত মালিকানাধীন কোম্পানী। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার এবং বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের যুক্ত মালিকানাধীন কোম্পানী। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের যুক্ত মালিকানা-ধীন কোম্পানী। পঞ্চমত, রাজ্যসরকারের মালিকানাধীন কোম্পানী। ষষ্ঠত, রাজ্য-সরকার ও বেসরকারী স্বার্থের যুক্ত মালিকানাধীন কোম্পানী।

সরকারী কারবারী সংস্থার বিবিধ রূপের তুলনা

	সরকারী বিভাগীয় সংস্থা	পাবলিক করপোরেশন রূপে স্থাপিত সংস্থা	সরকারী কোম্পানী রূপে স্থাপিত সংস্থা
১. স্থাপিত হয়	মন্ত্রী দপ্তর দ্বারা।	সংসদের বিশেষ আইন দ্বারা।	মন্ত্রী দপ্তর দ্বারা, এবং বেসরকারী শেয়ার হোল্ডারদের অংশগ্রহণ সহ বা ব্যতীত।
২. আইনগত অবস্থা	সরকারের অঙ্গ। পৃথক অস্তিত্ব নেই।	আইনের চোখে নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।	নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিশিষ্ট।
৩. পুঁজি	সরকারী বাজেট থেকে বরাদ্দ হয়।	সম্পূর্ণ পুঁজি সরকার দেয়।	বেসবকাবী ব্যক্তি ও কারবারীরা পুঁজির একাংশ সরবরাহ করতে পারে।
৪. ব্যবস্থাপনা	সংশিলষ্ট মন্ত্রীদপ্তরের অফিসারদের দ্বারা এই দায়িত্ব পালিত হয়।	সরকার নিযুক্ত পরিচালক পর্ষদ এই দায়িত্ব পালন করে।	পরিচালক পর্ষদ এই দায়িত্ব বহন করে। তবে তাতে বেসরকারী ব্যক্তি থাকতে পারে।
৫. নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ব	সবকাবের (সংশিলষ্ট মন্ত্রী-দপ্তর ও মন্ত্রী)।	সংসদের।	সরকারের (সংশিলষ্ট মন্ত্রীদপ্তর)
৬. কর্মীবৃন্দ ও নিয়োগের শর্তাবলী	সরকারী কর্মী, সবকাবী কর্মী সংক্রান্ত বিধিব দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত।	সবকাবী কর্মী নয়, চুক্তির শর্তা-বলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	সবকারী কর্মী নয়, চুক্তির শর্তাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৭. অর্থসংস্থান ব্যবস্থা	বাজেট ববাদ্দ। ঋণ করার ক্ষমতা নেই।	নিজস্ব অর্থ সংস্থান ব্যবস্থা, ঋণ করার ক্ষমতা আছে।	নিজস্ব অর্থ সংস্থান ব্যবস্থা, ঋণ করার ক্ষমতা আছে।
৮. স্বায়ত্তশাসনের অধিকার	নেই।	বেশ খানিকটা আছে। সবকার দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।	সরকারী হস্ত-ক্ষেপ থেকে কিছুটা মুক্ত।
৯. কর্মনীতির নমনীয়তা	নেই বললেই হয়।	বিশেষ পরিমাণেই আছে।	যথেষ্ট পরিমাণে আছে।
১০. উপযুক্ত ক্ষেত্র	প্রতিরক্ষা এবং অত্যাবশ্যক জনসেবা সংস্থা।	শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা।	শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা, বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে বেসরকারী দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা-দের অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হয়।

৫

বিভিন্ন কারবারী সংগঠনের তুলনা ও উপযোগী ক্ষেত্র

A COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENT FORMS OF BUSINESS ORGANISATION AND SUITABLE FIELDS

বেসরকারী বনাম সরকারী বা রাষ্ট্রীয় কারবার
PRIVATE ENTERPRISE Vs. STATE ENTERPRISE

বেসরকারী কারবার	সরকারী কারবার
১. **উদ্দেশ্য :** বেসরকারী কারবার একমাত্র মালিকের মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে গঠন ও পরিচালনা করা হয়। সুতরাং এর দ্বারা প্রধানত ব্যক্তিগত স্বার্থই সিদ্ধ হয়।	১. সরকারী কারবার শুধুমাত্র মুনাফা উপার্জনের অর্থকরী উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় না। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সেবা এবং কল্যাণসাধন তার প্রধান উদ্দেশ্য।
২. **প্রণোদনা :** বেসরকারী কারবারের উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণের কর্মোৎসাহের পশ্চাতে আর্থিক লাভের আশাই মৌলিক প্রণোদনা হিসাবে কাজ করে।	২. রাষ্ট্রীয় কারবারের কর্মোদ্যমের পশ্চাতে জনকল্যাণ এবং দেশসেবার আগ্রহই মৌলিক প্রণোদনা রূপে কাজ করে।
৩. **প্রকৃতি :** সকল প্রকার শিল্প ব্যবসায়েই বেসরকারী কারবার স্থাপিত হয়ে থাকে; তবে, যে সকল ক্ষেত্রে অল্প-বিনিয়োগের দ্বারা অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব, সেখানে এর আকর্ষণ বেশী। এইগুলি সাধারণত হাল্কা ধরনের শিল্প এবং বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যেই হয়ে থাকে।	৩. ধনতান্ত্রিক জগতের দেশগুলিতে সাধারণত জাতীয় নিরাপত্তা, জনসাধারণের সামগ্রিক স্বার্থ ও প্রয়োজন এবং জাতীয় কল্যাণের সহিত জড়িত শিল্প এবং ব্যবসায়, সরকারী কারবার স্থাপনের অগ্রগণ্য ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হয়।
৪. **পুঁজি :** বেসরকারী কারবাবের পুঁজি মানুষের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে এবং ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট থেকে ঋণ করে সংগৃহীত হয়। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিত্তশালী বলে সেখানে বেসরকারী কারবারে কোটি কোটি টাকা সংগৃহীত ও বিনিয়োজিত হয়। কিন্তু ভারতের মত দরিদ্র দেশে বেসরকারী ব্যবসায়ে পুঁজির যথেষ্ট অভাব দেখা যায়।	৪. সরকারী কারবারের পুঁজির বা অধিকাংশ সরকার সরবরাহ করে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের দ্বারা, কর বসিয়ে এবং ঘাটতি বাজেটের দ্বারা সরকারী কারবারের পুঁজি সংগৃহীত হয। নানা প্রকারে সরকারী কারবারের পুঁজি সংগ্রহ করা যায় বলে, যে সকল ক্ষেত্রে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন সেখানে সরকারী কারবার স্থাপন সুবিধাজনক।
৫. **আয়তন :** বেসরকারী কারবার যৌথমূলধনী ভিত্তিতে স্থাপন করে তা দ্বারা বৃহদায়তন কারবার সংগঠিত করা যায়।	৫. সরকারী কারবারে পুঁজির অসুবিধা কম বলে এর দ্বারা আরও বড় বড় আকারে কারবার সংগঠিত করা সম্ভব।

বেসরকারী কারবার	সরকারী কারবার
৬. **ব্যবস্থাপনার দক্ষতা :** মুনাফার জন্যই কারবার পরিচালিত হয় বলে বেসরকারী কারবারে আয়ব্যয়ের উপর মালিকের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি থাকে। সর্বদাই তারা অপচয় ও অপব্যয় দূর করে কারবারের আয় বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে অবিশ্রামভাবে তারা কারবারের সকল ক্ষেত্রে ও সকল কর্মীদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করে। সুতরাং বেসরকারী কারবারের ব্যবস্থাপনদক্ষতা অত্যন্ত বেশী হয়ে থাকে বলে দাবি করা হয়।	৬. সরকারী কারবারের কর্মিগণ নিজেদের বাঁধাধরা নিয়মের সরকারী কর্মচারী বলে মনে করে এবং তার ফলে প্রতিষ্ঠানের অপচয় ও অপব্যয় দূর করার জন্য যত্ন নেয় না। এর ফলে সরকারী কারবারে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা হ্রাস পায়।
৭. **ফলাফল :** বেসরকারী কারবারের অধীনে দেশের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য সংগঠিত জাতীয় বন্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। দেশের বিভিন্ন শিল্পে ও ব্যবসায়ে বৃহৎ একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হয় এবং সামগ্রিক জাতীয় কল্যাণের হানি ঘটে।	৭. সরকারী কারবারের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে আয়ের বন্টনে বৈষম্য হ্রাস. শিল্প ও ব্যবসায়ে বেসরকারী একচেটিয়া মালিকানার অবসান ও জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্ভব হয়।

একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবারের সাথে অংশীদারী কারবারের তুলনা
JOINT HINDU FAMILY AND PARTNERSHIP BUSINESS COMPARED

গঠন : অংশীদারী কারবার চুক্তিদ্বারা সৃষ্ট হয়। কিন্তু একান্নবর্তী হিন্দু-পারিবারিক কারবার আইনস্বীকৃত হিন্দু বিধির দ্বারা সৃষ্ট হয়।

পরিচালনা : অংশীদারী কারবারে সকল অংশীদারেরই পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার আছে এবং তারা ইচ্ছা করলে তাদের মধ্য থেকে কেহকে কারবারের পরিচালনার ভার দিতে পারে। কিন্তু একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবার পরিবারের প্রবীণতম ব্যক্তিই পরিচালনা করেন।

নাবালক : মুনাফার অংশ ভোগ করার সুযোগ পেলেও নাবালক কখনই অংশীদারী কারবারের অংশীদার বা সদস্য হতে পারে না। কিন্তু একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবারে নাবালককে শরিক বলে গণ্য করা হয়।

পুরুষ ও নারী : নারী ও পুরুষ উভয়েই অংশীদারী কারবারের অংশীদার হতে পারে। কিন্তু মিতাক্ষরা বিধি অনুযায়ী একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবারে নারীরা কখনই শরিক হতে পারে না, তবে দায়ভাগ বিধি অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শুধু স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেই, নারীরা শরিক বলে গণ্য হয়।

নিবন্ধন : কতকগুলি বিষয়ে সুবিধা গ্রহণের জন্য, অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন প্রয়োজন হয়। কিন্তু একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবারের নিবন্ধন আবশ্যিক নয়।

দায় : অংশীদারী কারবারের অংশীদাররা যৌথ ও ব্যক্তিগত ভাবে সীমাহীন দায় বহন করে। কিন্তু একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক শরিকগণের দায় তাদের নিজ নিজ শরিকানা বা অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

দায়বদ্ধকরণ : অংশীদারী কারবারের যে কোন অংশীদার কারবার সংক্রান্ত তার কার্যকলাপের দ্বারা অন্যান্য অংশীদারকে দায়বদ্ধ করতে পারেন। কিন্তু হিন্দু একান্নবর্তী কারবারের ক্ষেত্রে একমাত্র 'কর্তা'ই কারবারের পরিচালনা করেন বলে তাঁর কাজের দ্বারা অন্যান্য শরিকগণকে দায়বদ্ধ করেন।

বন্টন : অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের লাভ-লোকসানের অংশ চুক্তিদ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং চুক্তির পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অংশের কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের কারবারে (বিশেষত মিতাক্ষরা বিধি-

[illegible] শরিকগণের লাভ-লোকসানের হিসাব বা অংশ কখনই সুনির্দিষ্ট নয়। পরিবারের নতুন শিশুর জন্মের দ্বারা বর্তমান শরিকগণের অংশ হ্রাস পায় ও পুরাতন শরিকের মৃত্যুর ফলে জীবিত শরিকগণের অংশ বৃদ্ধি পায়।

আইনের নিয়ন্ত্রণ : ভারতে অংশীদারী কারবার ভারতীয় অংশীদারী কারবারের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু হিন্দু একান্নবর্তী পারিবারিক কারবার হিন্দু আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

প্রসমাপন : কোন অংশীদারের মৃত্যুর ফলে অংশীদারী কারবারের বিলোপ ঘটে। অথবা যে কোন অংশীদার, কারবার বিলোপের জন্য অন্যান্য অংশীদারগণের উপর নোটিস জারি করতে পারেন। কিন্তু একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবারে, কোন শরিকের মৃত্যুর ফলে কারবারের অবসান ঘটে না বা কোন শরিক কারবারে বিলোপ-সাধনের জন্য নোটিস জারিও করতে পারে না, শুধুমাত্র নিজ অংশ বাঁটোয়ারার দাবি করতে পারে।

একমালিকী বনাম অংশীদারী কারবার
SOLE PROPRIETORSHIP Vs. PARTNERSHIP

১. **গঠন :** একমালিকী এবং সাধারণ অংশীদারী কারবার, উভয়ই গঠন করার জন্য কোন আইন-সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ও আনুষ্ঠানিক জটিলতা নাই।

২. **পুঁজি :** একমালিকী কারবার অপেক্ষা অংশীদারী কারবার নিঃসন্দেহে অধিক পুঁজি ও ঋণ সংগ্রহে সমর্থ। কারণ তাতে একাধিক মালিকের সামর্থ্য ও সম্পদ একত্রিত হয়।

৩. **ব্যবস্থাপনার দক্ষতা :** কারবারের দৈনন্দিন কাজে মালিকের ব্যক্তিগত অংশ-গ্রহণ ও তত্ত্বাবধানের ফলে বিভিন্ন বিভাগে অপচয় নিবারণ, ক্রেতার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, মালিকের দৃষ্টান্তে কর্মচারীদের কর্মে উৎসাহ প্রভৃতি কারণে পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ উভয় জাতীয় কারবারেই রয়েছে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে অংশীদারী কারবারে, অংশীদারগণ নিজেদের মধ্যে যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভা-গের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের দরুন, তথায় পরিচালনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতার সমন্বয়ে কারবারের দক্ষতা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে, একমালিকী কারবারে তা সম্ভব নয়। অতএব কারবারের সাফল্যের সুনিশ্চয়তা একমালিকী কারবারের তুলনায় অংশীদারী কারবারে অধিক পরিমাণে বর্তমান।

৪. **শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক :** উভয় জাতীয় কারবারেই দৈনন্দিন কার্যে মালিকের অংশগ্রহণ ঘটে বলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের সহিত মালিক বা মালিকগণের হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠার অবকাশ থাকে। এজন্য শ্রমসংক্রান্ত বিরোধ ঘটে কারবারের ক্ষতির সম্ভাবনা অল্প হয়।

৫. **পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা :** ব্যবসায় জগতের নানান পবি-বর্তনের সাথে কারবারের দ্রুত সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা কিন্তু অংশীদারী কাব-বারের তুলনায় একমালিকী কারবারে অধিক। কারবারের নীতি পরিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি একমালিকী কারবারের মালিক নিজেই গ্রহণ কবে। পাঁচজন অংশী-দারেব সম্মতির জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় না।

৬. **সম্প্রসারণ ক্ষমতা :** পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কারবারের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তার জন্য অধিক পুঁজি এবং পবিচালনার অধিক দক্ষতা অপবিহার্য। এই ক্ষেত্রে অংশীদারী কারবারের যোগ্যতা একমালিকী কারবার অপেক্ষা অধিক।

৭. **স্থায়িত্ব :** কারবারের স্থায়িত্ব বিবেচনা করলে দেখা যায় যে অংশীদারী কার-বার অপেক্ষা একমালিকী কারবার অধিককাল স্থায়ী হতে পারে। অংশীদারী কার-বার কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে চুক্তির দ্বারা গঠিত হয় এবং যে কোন মুহূর্তে অংশীদার-গণের মধ্যে মতানৈক্যের দরুন বা তাদেব মধ্যে কারও মৃত্যু, দেউলিয়া হওয়া, অপারগতা প্রভৃতির জন্য তার অবসান ঘটতে পারে।

৮. দায় : কারবারের দেনার জন্য উভয় ক্ষেত্রেই মালিক বা মালিকগণের অসীম হীন দায় বহন করতে হয়। এই অসুবিধা উভয়েরই রয়েছে।

অংশীদারী বনাম যৌথমূলধনী কারবার বা কোম্পানী

PARTNERSHIP Vs. COMPANY

১. গঠন : যৌথমূলধনী কারবার অপেক্ষা অংশীদারী কারবার গঠন করা সহজ। কারণ দ্বিতীয়টিতে কোন প্রকার আইনগত আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রথমটির ক্ষেত্রে আইননির্দিষ্ট জটিল পদ্ধতি অনুসরণ শুধু বাধ্যতামূলকই নয়, ব্যয়সাপেক্ষও বটে।

২. পুঁজি : অংশীদারী কারবার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে পুঁজি ও ঋণসংগ্রহের ক্ষমতার জন্য যৌথমূলধনী কারবার প্রসিদ্ধ। কারণ তার সদস্যসংখ্যা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট নহে এবং প্রয়োজন হলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিনিয়োগ-কারীর উপযুক্ত বিভিন্ন ধরনের অথচ স্বল্প মূল্যের শেয়ার ও ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে তা অধিক পুঁজি ও ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও এদের সম্পত্তি অধিক বলে ঋণ দিয়ে থাকে।

৩. ব্যবস্থাপনার দক্ষতা : যৌথমূলধনী কারবারের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অংশীদারী কারবার অপেক্ষা অনেক বেশী এবং তার প্রধান কারণ বৃহদায়তন উৎপাদন। তাতে যোগ্যতাসম্পন্ন সংগঠক ও সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ উচ্চপদস্থ কর্মচারীমণ্ডলীর সাথে বৃহৎ পুঁজির সমন্বয়ে বিশাল আয়তনের কারবার গড়ে ওঠে। এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক শ্রমবিভাগ, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতির সহায়তায় উৎপাদনের নানা প্রকার ব্যয়সংকোচ সম্ভব হওয়ায় কারবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা-দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪. শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক : কিন্তু যৌথমূলধনী কারবারে পরিচালনা ও মালিকানার বিচ্ছেদ ঘটে। যারা প্রকৃত মালিক তারা কারবারের দৈনন্দিন পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে প্রধানত উচ্চপদস্থ বেতনভুক্ত কর্মচারীদের উপর। স্বভাবতই তারা মালিকদেরও যত্ন নিয়ে কারবার পরিচালনা করে না। এবং নিম্নপদস্থ কর্মীদের সাথেও তারা পদগৌরবে খারাপ ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং এতে প্রায়ই শ্রমিকগণের মধ্যে নানা প্রকার অসন্তোষ দেখা দেয় ও তার দরুন শ্রমিক বিরোধ উপস্থিত হয়। এর ফলে কারবার নিরুপদ্রবে চলতে পারে না।

৫. পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা : যৌথমূলধনী কারবার আয়তনে বৃহদাকার হওয়ায় ও তার নীতি কয়েকজন পরিচালক নিয়ে গঠিত পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকায়, সহসা এর পক্ষে প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন সাধন করে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে কারবারের সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা থাকে না। এক্ষেত্রে, অংশীদারী কারবারের সুবিধা অধিক। পরিমেলবন্ধের[1] দ্বারা কারবারের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট থাকায় যৌথমূলধনী কারবারের পক্ষে পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

৬. সম্প্রসারণ : আর্থিক সামর্থ্য অনেক বেশী থাকায় যৌথমূলধনী কারবার প্রয়োজনানুযায়ী যে পরিমাণে কারবার সম্প্রসারণে সমর্থ, অংশীদারী কারবার বা অপর কোন বেসরকারী মালিকানার কারবারের পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

৭. স্থায়িত্বের দিক দিয়াও যৌথমূলধনী কারবারের সাথে অন্য কোন ধরনের কারবারের তুলনা চলে না। তার পৃথক আইনস্বীকৃত স্বতন্ত্র সত্তা থাকায়, কারবারের সদস্য পরিবর্তন বা কোন সদস্যের মৃত্যু অথবা অপারগতা তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। আইনের দৃষ্টিতে তার কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা চিরস্থায়ী। অংশীদারী কারবারের ন্যায় তার গঠন সদস্যগণের স্বেচ্ছাসম্মতির উপর নির্ভর করে কিন্তু তাদের ইচ্ছার দ্বারা তার অবসান ঘটে না।

৮. দায় : যৌথমূলধনী কারবারের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা এই যে, কারবারের দেনার জন্য সদস্যগণের দায় ক্রীত শেয়ারের মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং এতে কারবারের দেনার জন্য সর্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকায়, এর প্রতি বিনিয়োগ-কারীদের আকর্ষণ সর্বাধিক।

---

1. Memorandum of Association.

[illegible] পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
PRIVATE LIMITED Vs. PUBLIC LIMITED COMPANIES

১. গঠন : উভয়েরই গঠনে কোম্পানী আইন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় এবং উক্ত আইনের দ্বারাই এরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; তবে ভারতের কোম্পানী আইনের সর্বশেষ সংশোধন অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী নিম্নোক্ত কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে।

ক. কারবারের নিবন্ধনের অব্যবহিত পরেই এ কার্যারম্ভ করতে পারে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ন্যায় "কার্যারম্ভ পত্রের" জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। স্ট্যাটুটরী সভা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধও এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ন্যায় এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম শেয়ার বিক্রয়ের[2] বাধ্যবাধকতা নাই।

গ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ন্যায় একে বিবরণ পত্র অথবা তার বিকল্প বিবরণ দাখিল করতে হয় না।

ঘ. ন্যূনতম ২ জন মাত্র সদস্য নিয়েই কারবার গঠন করা যায়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ন্যায় ৭ জন দরকার হয় না।

ঙ. এতে মাত্র ২ জন ডিরেক্টার বা পরিচালক হলেই চলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর মত ৩ জন পরিচালকের প্রয়োজন হয় না।

চ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর মত এর প্রত্যেক পরিচালক নিয়োগের জন্য পৃথক প্রস্তাবের প্রয়োজন হয় না অথবা কেউ পরিচালক নির্বাচিত হলে তার নিকট থেকে সম্মতি পত্র আদায় ও দাখিল করার প্রয়োজন হয় না।

এই সকল সুবিধার দরুন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী গঠন করা সহজ।

২. পুঁজি : পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর পক্ষে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করা ও ঐ সকল শেয়ারের সহজ হস্তান্তর সম্ভব হওয়ায়, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর তুলনায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী অনেক অধিক পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে।

৩. ব্যবস্থাপনার দক্ষতা : প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর সদস্যসংখ্যা অল্প হওয়ায় সদস্যগণের সকলেরই কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। এইজন্য এতে পরিচালনা ও মালিকানার বিচ্ছেদ ঘটে না। এর ফলে সদস্যগণ প্রত্যক্ষ স্বার্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কারবারের কার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে এটা সম্ভব নয়। এইরূপে অংশীদারী কারবারের পরিচালনার কিছু সুবিধা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে বজায় রাখা হয়েছে।

৪. শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক : সাধারণত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর মালিকগণ স্বয়ং দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে বলে এবং কারবারের আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়ায়, শ্রমিক ও কর্মচারীদের সাথে মালিকগণের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে ও উহার ফলে শ্রমবিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস পেতে পারে।

৫. পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা : অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের পরিচালকমণ্ডলী ও কারবার হওয়ায়, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে কারবারের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে।

৬. সম্প্রসারণ : কারবারের সম্প্রসারণের সুবিধা ও সম্ভাবনা কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতেই অধিক। কারণ এর সদস্যসংখ্যা অনেক বেশী।

৭. স্থায়িত্ব : উভয় প্রকার কারবারের স্থায়িত্ব একরূপ, কারণ উভয়েরই আইন-স্বীকৃত নিরবচ্ছিন্ন পৃথক ব্যক্তিসত্তা থাকে।

৮. দায় : উভয় ক্ষেত্রেই শেয়ারহোল্ডারগণের দায় ক্রীত শেয়ারের মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

উপসংহারে বলা চলে যে, ত্রুটি সত্ত্বেও অংশীদারী ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী

---
2. Minimum Subscription.

এই দুই প্রকার কারবারের সুবিধাগুলি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে সন্নিবেশিত হয়ে একে বিশেষ সুবিধাজনক কারবারী সংগঠনে পরিণত করেছে।

সমবায় বনাম কোম্পানী (CO-OPERATIVE SOCIETIES Vs. COMPANIES)

১. উদ্দেশ্য : সমবায় সমিতি কেবল মুনাফা উপার্জনের লক্ষ্য নিয়ে *গঠিত হয় না; সদস্যদের মঙ্গল ও বৃহত্তর সেবার উদ্দেশ্যও এর থাকে। কিন্তু লিমিটেড কোম্পানী* প্রধানত মালিকদের জন্য মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়।

২. গঠন : সমবায় সমিতি সমবায় আইন দ্বারা ও লিমিটেড কোম্পানীগুলি ভারতীয় কোম্পানী আইনের দ্বারা গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু লিমিটেড কোম্পানী অপেক্ষা সমবায় সমিতি গঠন সহজ।

৩. পুঁজি : সাধারণত অপেক্ষাকৃত অল্প আয়ের মানুষকে নিয়ে সমবায় সমিতি গঠিত হয় বলে এর পুঁজি অত্যন্ত অল্প হয়। তুলনায় যৌথমূলধনী কারবার অনেক বেশী পুঁজি সংগ্রহে সমর্থ।

৪. কারবারের আয়তন : পুঁজির অভাবে সমবায় সমিতির পক্ষে বৃহদায়তন কারবার গঠন করা এবং তার দ্বারা শ্রমবিভাগের নানা প্রকার সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যৌথমূলধনী কারবারের পক্ষে তা সম্ভব।

৫. ব্যবস্থাপনার দক্ষতা : সমবায় সমিতির সামর্থ্য অল্প, কারবারের আয়তন ক্ষুদ্র ও লাভের পরিমাণ সামান্য হওয়ায়, তাতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দক্ষ ব্যবস্থাপকগণ আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব এতে লক্ষ্য করা যায়। তুলনায় যৌথমূলধনী কারবারে অনেক বেশী পরিমাণে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ভোগ করা সম্ভব।

৬. শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক : এক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম; সদস্যগণই কারবারের কর্মী বলে শ্রমিক-মালিক বিবাদ ঘটার কোন সুযোগ থাকে না, অথচ যৌথমূলধনী কারবারগুলি এর দ্বারা বিব্রত হয়ে থাকে।

৭. পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা : প্রধানত আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে, সমবায় সমিতিগুলির কার্যকলাপ এত সীমাবদ্ধ থাকে যে, তার পক্ষে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের সম্ভাবনা থাকলেও সুযোগ খুব অল্পই ভোগ করে। তার তুলনায় যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধা এক্ষেত্রে বেশী।

৮. সম্প্রসারণ : মূলত আর্থিক কারণে সমবায় সমিতির সম্প্রসারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। তুলনায় যৌথমূলধনী কারবাবের সম্প্রসারণের ক্ষমতা অনেক বেশী।

৯. স্থায়িত্ব : যৌথমূলধনী কারবারের মতই সমবায় সমিতিরও আইনস্বীকৃত নিরবচ্ছিন্ন স্থায়িত্বসম্পন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। সুতরাং উভয়ই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

১০. দায় : যৌথমূলধনী কারবাবের সদস্যগণের দায় সীমাবদ্ধ। সমবায় সমিতিগুলি দুই প্রকারের হতে পারে। একপ্রকারের সমিতির সভ্যদের দায় সীমাহীন হয়ে থাকে। অপর শ্রেণীর সমিতির সভ্যদের দায় সীমাবদ্ধ হয়।

১১. সদস্যদের অধিকার : সমবায় সমিতির সদস্যদের যার যত শেয়ারই থাকুক না কেন, প্রত্যেকেরই ভোট একটি মাত্র। সুতরাং সমবায়ের সদস্যদের অধিকার সমান। কিন্তু লিমিটেড কোম্পানীতে যার যত শেয়ার তার তত ভোট। অতএব লিমিটেড কোম্পানী অপেক্ষা সমবায় সমিতি বেশী গণতান্ত্রিক।

১২. শেয়ারের মূল্য ফেরৎ : সমবায় সমিতির কোন সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে সে সমিতিকে তার শেয়ার ফেরৎ দিয়ে শেয়ারের মূল্য ফেরৎ নিতে পারে কিন্তু অন্য কারও কাছে শেয়ার বেচিতে পারে না। লিমিটেড কোম্পানী কিন্তু কখনও শেয়ারের মূল্য ফেরৎ দেয় না। কোন শেয়ারহোল্ডার ইচ্ছা করলে অপরের নিকট তার শেয়ার বিক্রয় করে দিয়ে কোম্পানী ত্যাগ করতে পারে।

১৩. ব্যয়সংকোচ : সমবায় সমিতির অধিকাংশ কাজই সদস্যারা বিনা পারিশ্রমিকে সম্পাদন করে। লিমিটেড কোম্পানীর তুলনায় তাই এর খরচ অনেক কম।

১৪. বিশেষ সুবিধা ঃ কর, স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। লিমিটেড কোম্পানী এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

বিভিন্ন প্রকার কারবারী সংগঠনের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ

FIELDS OF BUSINESS SUITABLE FOR DIFFERENT FORMS OF BUSINESS ORGANISATION

১. একমালিকী কারবারের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ ঃ যে সব পণ্যের চাহিদা মোটামুটি-ভাবে স্থানীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, তাদের ব্যবসায়ে সাধারণত অল্প পরিমাণে পুঁজি বিনি-য়োগের প্রয়োজন হয়। যে কারবারে মালিকের ব্যক্তিগত তদারকী আবশ্যক, ক্রেতাদের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যে সকল ব্যবসায়ের সাফল্যের ভিত্তি, যে সকল ক্ষেত্রে পণ্যের চাহিদা নিয়ত পরিবর্তনশীল, তথায় কারবারের আয়তন ক্ষুদ্র এবং তা একমালিকী সংগঠনের পক্ষে প্রশস্ত। এর দৃষ্টান্ত পণ্য ফেরী করার ব্যবসায়, মনিহারী দোকান, দর্জি দোকান, পানের দোকান, ব্যবসায় প্রভৃতি এধরনের কারবার। খুচরা বিক্রয়ের কারবারই এই জাতীয় সংগঠনের পক্ষে উপযুক্ত হলেও কৃষিকার্য এবং খনিজ পদার্থ উত্তোলনের মত উৎপাদন কার্যেও দেখতে পাওয়া যায়।

২. অংশীদারী কারবারের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ ঃ একমালিকী কারবারের উপযোগী সকল ক্ষেত্রেই অংশীদারী কারবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে বিশেষত, যে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পুঁজির পরিমাণ অধিক, ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিকে অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, কারবারের ঝুঁকি বেশি ও সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয় সেখানে এটা বিশেষ উপযোগী। এজন্য পাইকারী ব্যবসায়ে, আমদানি-রপ্তানি কারবারে এবং ক্ষুদ্র শিল্পেও এই জাতীয় সংগঠন বেশি দেখা যায়। মাঝারি ও ছোটখাট ঠিকাদারি কারবারে অংশীদারী কারবারের আধিক্য দেখা যায়।

৩. যৌথমূলধনী কারবারের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ ঃ যৌথমূলধনী কারবারের ক্ষেত্র, একমালিকী কারবার ও অংশীদারী কারবার থেকে বিশেষভাবেই পৃথক। এর প্রধান ক্ষেত্র হল উৎপাদন। ভোগ্যপণ্য এবং উৎপাদকের দ্রব্য এই দুই জাতীয় শিল্পেই আধুনিক বহুমূল্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও বহুসংখ্যক কর্মী নিয়ে সংগঠিত বৃহদাকার কারবার প্রয়োজন। তাতে যেমন অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, তেমনি উৎপাদনের পরিমাণ এবং কারবারের ঝুঁকিও খুব বেশি। এইরূপ ক্ষেত্রের পক্ষে একমাত্র যৌথমূলধনী কারবারের সংগঠনই উপযুক্ত। এইজন্য দেশের যাবতীয় শিল্পের অধিকাংশই যৌথমূলধনী কারবারের দ্বারাই পরিচালিত হতে দেখা যায়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্র ছাড়া যে পাইকারী ব্যবসায়ে কিংবা অন্যান্য প্রকারের ব্যবসায় ক্ষেত্রে এটা বিরল, তা নয়। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস, অধিক পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহ ইত্যাদি সুবিধা ভোগের জন্য এই ধরনের কোম্পানী গঠিত হয়ে থাকে।

৪. সমবায় সমিতির উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ ঃ সমবায় সমিতির বিশেষ উপযুক্ত ক্ষেত্র হল দরিদ্র, উৎপাদক ও ভোগকারী শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়। গ্রামীণ অর্থনীতি ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তেমনি শ্রমজীবী এবং মধ্য ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণের মধ্যে এর কার্যক্ষেত্র প্রশস্ত। দরিদ্র উৎপাদকগণকে সহজে ও সুলভে ঋণের যোগান দেওয়া, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যথা, কর্ষণ, জলসেচ, কাঁচামাল খরিদ, কুটিরশিল্প ও কৃষিজাত পণ্যের বিপণন, গ্রামাঞ্চলে পরি-বহণ, গুদামঘর স্থাপন ইত্যাদি বহুপ্রকার কার্য গ্রামবাসী এবং কৃষকদের দ্বারা সংগঠিত করে তাদের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টায় সমবায় পদ্ধতি সবিশেষ কার্যকর।

৫. রাষ্ট্রীয় কারবারের উপযুক্ত ক্ষেত্র ঃ রাষ্ট্রীয় কারবারের সাথে অন্যান্য যাবতীয় কারবারী সংগঠনের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। বস্তুত যে সকল ক্ষেত্রে কোন শিল্প বা অর্থনীতিক কার্যকলাপ দেশরক্ষার সাথে জড়িত; যে সকল অর্থনীতিক কার্যকলা-পের অসাধারণ জাতীয় গুরুত্ব রয়েছে (যথা—মুদ্রাপ্রচলন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-সংক্রান্ত কার্যকলাপ); যে সকল দ্রব্যসামগ্রী মানুষের পক্ষে অধিক ব্যবহারে ক্ষতিকারক হতে

পারে (গাঁজা, আফিং প্রভৃতি); যে সকল দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান এবং জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ (বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ, ইউরেনিয়াম, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি দ্রব্য); যে সকল শিল্পে, ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন অথচ মুনাফার হার অত্যন্ত অল্প (ভারী ও মূলশিল্প); রাস্তাঘাট তৈয়ারী, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বৃহদায়তন সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনের মত যে সকল ক্ষেত্রে অপরিমিত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়; যে সকল ক্ষেত্রে শিল্প বা ব্যবসায় জাতীয় জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিধায় বেসরকারী উদ্যোগের অনিশ্চিত পরিচালনার উপর নির্ভর করা যায় না[৩]; যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ক্রেতাগণ ও কাঁচামালের উৎপাদনকারিগণ শোষিত হচ্ছে—সে সকল ক্ষেত্রই রাষ্ট্রীয় কারবারের পক্ষে প্রশস্ত বলে আধুনিক কালে সকলে বিবেচনা করে থাকেন।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

৩. বেসরকারী ও সমবায় উদ্যোগ

(ক) একমালিকী কারবার

1. The sole proprietorship form of business enterprise still services in India in a large measure. What are the reasons? [C. U. 1964]
[ভারতে এখনও একক মালিকানার কারবার সবিশেষ পরিমাণেই টিঁকিয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ কি?]
উঃ ৩৭ পৃঃ
2. What is a Sole Proprietorship business? Discuss its advantages and disadvantages. [C. U. 1970]
[একক মালিকানার কারবার কাহাকে বলে? ইহার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।]
উঃ ৩৫-৩৭ পৃঃ

(খ) অংশীদারী কারবার

1. In drawing up the 'Partnership Deed' of a firm, what special points are to be borne in mind and why? [C. U. 1964]
[অংশীদারীর 'সংবিতপত্র' রচনার সময় কোন্ কোন্ বিশেষ বিষয় মনে রাখিতে হয় এবং কেন?]
উঃ ৪০-৪১ পৃঃ
2. What are the usual terms and conditions included in a Partnership Agreement'? State their importance in regulating the relations between partners. [C. U. Hons. 1965]
['অংশীদারীর চুক্তিপত্র' রচনা করিতে গিয়া উহার মধ্যে সাধারণত কোন্ কোন্ শর্তাবলী রাখিতে হয়? অংশীদারগণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিবার বিষয়ে উহাদের গুরুত্ব উল্লেখ কর।]
উঃ ৪০-৪১ পৃঃ
3. What are the rights, obligations and liabilities of partners in a partnership business? [C.U. Hons. 1967]
[অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের অধিকার, দায় ও বাধ্যবাধকতাগুলি কি কি?]
উঃ ৪১-৪২ পৃঃ
4. Discuss the main clauses of Partnership Deed. [C. U. 1969]
[অংশীদারীর চুক্তিপত্রের প্রধান প্রধান দফাগুলি আলোচনা কর।] উঃ ৪০-৪১ পৃঃ

(গ) যৌথমূলধনী কারবার বা কোম্পানী

1. What do you mean by Private Limited Companies? What are its Comparative privileges and exemption over Public Limited Companies under the Companies' Act. [B. U. 1965]
[প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কাহাকে বলে? কোম্পানী আইনে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর তুলনায় ইহাকে কি বিশেষ সুবিধা ও ছাড় দেওয়া হইয়াছে?]
উঃ ৫২-৫৪ পৃঃ

---

3. Public Utilities.

(ঘ) সমবায় সমিতি

1. Discuss the scope of promoting retail trade in India through the co-operative movement. [B. U. 1963]
[ভারতে সমবায় আন্দোলনের মারফত খুচরা ব্যবসায় সম্প্রসারণের সুযোগ সম্ভাবনা আলোচনা কর।] উঃ ৬০-৬২ পৃঃ

2. Discuss the role of Consumers' Co-operative Stores in the present day economy of India.
[ভারতের বর্তমান অর্থনীতিতে ভোগকারী সমবায় ভাণ্ডারের ভূমিকা আলোচনা কর।]
উঃ ৬০-৬২ পৃঃ

3. Explain a Co-operative organisation and show its similarity with or differences from a Company. [C. U. 1970]
[একটি সমবায় সংগঠন কিরূপ তা ব্যাখ্যা কর এবং কোম্পানীর সাথে এর মিল ও পার্থক্য দেখাও।] উঃ ৫৭, ৭৯-৮০ পৃঃ

৪. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

1. We often hear about 'Public' and 'Private' sectors in India. What do they really mean and why the division is needed ? [C. U. 1965]
[ভারতে আমরা প্রায়ই 'রাষ্ট্রীয়' এবং 'বেসরকারী বা ব্যক্তিগত' উদ্যোগের কথা শুনিতে পাই। উহাদের প্রকৃত অর্থ কী এবং এরূপ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা কী?]
উঃ ২৩-২৫ পৃঃ

2. Discuss the reasons for the recent tendency on the part of the Government to organise state industrial undertakings as Limited Companies ? [C. U. 1965]
[রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে লিমিটেড কোম্পানী-রূপে গঠন করিবার জন্য সম্প্রতিকালে সরকারের যে ঝোঁক দেখা যাইতেছে উহার কারণগুলি আলোচনা কর।] উঃ ৬৯-৭০ পৃঃ

3. Elucidate the features of the principal forms of State business enterprise in India. [C. U. 1974]
[ভারতে বিভিন্ন প্রকার সরকারী উদ্যোগের (কারবারী) গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।] উঃ ৭৩ পৃঃ

৫. বিবিধ প্রকার কারবারী সংগঠনের তুলনা

1. Do you think from the points of view of method of formation, liability, supply of capital, management and control, a private limited company is better than a public limited company ? Give reasons for your answer. [C. U. 1963]
[গঠন পদ্ধতি, দায়, পুঁজির যোগান, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের দিক হইতে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হইতে ভাল? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।] উঃ ৭৮-৭৯ পৃঃ

2. Why Private Limited Companies are still popular in India as compared to Partnership and Public Limited Company ?
[C. U. Hons. 1964]
[অংশীদারী কারবার এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর তুলনায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ভারতে এখনও জনপ্রিয় কেন?] উঃ ৭৭-৭৯ পৃঃ

3. What advantages Partnership firms have over Public Limited Companies? Discuss fully. [C. U. 1968]
[পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর তুলনায় অংশীদারী কারবারের সুবিধাগুলি কি কি?]
উঃ ৭৭ পৃঃ

4. Explain in what respects a 'Partnership' business has got some advantages as well as disadvantages over 'Public Limited Companies. [C. U. Hons. 1968]
['পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীগুলির' তুলনায় কি কি বিষয়ে 'অংশীদারী কারবারের' সুবিধা ও অসুবিধা আছে তাহা ব্যাখ্যা কর।] উঃ ৭৭ পৃঃ

5. Do you think that sole proprietorship business is better than a partnership from the organisational point of view ? Give reasons for your answer. [C. U. 1966]
[সাংগঠনিক দিক হইতে একক মালিকানার কারবার কি অংশীদারী কারবার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? যুক্তি সহ উত্তর দাও।] উঃ ৭৬-৭৭ পৃঃ

তৃতীয় খণ্ড কোম্পানীর বিভিন্ন দিক
DIFFERENT ASPECTS C

অধ্যায়

৬

কোম্পানীর প্রবর্তন ও কার্যপদ্ধতি
PROMOTION AND FUNCTIONING OF JOINT STOCK COMPANY

কোম্পানী প্রবর্তনের পদ্ধতি
PROMOTIONAL STEPS IN ORGANISATION

প্রবর্তন (PROMOTION)

কোন একটি নূতন কারবারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে উদ্যোক্তার বা উদ্যোক্তাদের চিন্তা বা পরিকল্পনাকে রূপ দান করার কাজকে 'প্রবর্তন' বলা হয়। এই কাজের অঙ্গ :

১. কোন নূতন কারবারী সুযোগের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করা।

২. ভাবী কারবারের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি, যথা, যথেষ্ট সংখ্যক সহযোগী উদ্যোক্তা ও শেয়ারহোল্ডার, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা-কর্মী ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা।

৩. কারবারের প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের বন্দোবস্ত করা।

কারবার প্রবর্তন বলতে—ক. নূতন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা বোঝাতে পারে ; অথবা,

খ. পুরাতন কোনও প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ বোঝাতে পারে ; অথবা,

গ. পুরাতন একাধিক প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তি বোঝাতে পারে।

প্রবর্তন নামক কাজের দ্বারা এই তিনটির যেটিই ঘটুক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য একই এবং তা হল প্রবর্তকদের প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন করার জন্য বর্তমান কোন কারবারী সুযোগের পরিপূর্ণ ব্যবহার।

তবে, নতুন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভের আগে তার সম্ভাব্য সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সম্পর্কে প্রবর্তকদের সযত্ন বিবেচনা ও অনুসন্ধান করে যথাসম্ভব তার সাফল্য সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হওয়া উচিত।

যে কোন প্রচলিত একমালিকানার অথবা অংশীদারী কারবার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রাইভেট অথবা পাবলিক কোম্পানীর কারবারে রূপান্তরিত হতে পারে। কিংবা প্রথমেই কয়েকজন ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ে ইচ্ছুক কয়েক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে একটি প্রাইভেট অথবা পাবলিক কোম্পানীর কারবার প্রবর্তন করতে পারে।

প্রবর্তক (PROMOTER)

ধনতান্ত্রিক জগতের গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় ব্যবসায় ও শিল্পগুলি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই সব পাবলিক কোম্পানীর প্রবর্তনে যারা উদ্যোগ গ্রহণ করে তারা বর্তমান অর্থনীতিক ব্যবস্থায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। নতুন নতুন যৌথমূলধনী কারবার স্থাপনে এই সকল উদ্যোগীদের এক কথায় 'প্রবর্তক' বলা হয়। যে কোন ব্যক্তিবিশেষ, ব্যক্তিসমষ্টি বা এমন কি প্রতিষ্ঠানও[1] যৌথমূলধনী কারবার প্রবর্তনে উদ্যোগী হতে পারে। সুতরাং 'প্রবর্তক' বললে, যে কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি অথবা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাতে পারে।

প্রবর্তকগণই প্রকৃতপক্ষে যৌথমূলধনী কারবার সৃষ্টি করে থাকে। যে কোনও শিল্প বা ব্যবসায়ে, লাভজনক কারবারের সম্ভাবনা অনুভব করে তারা ব্যবসায়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে এবং তার পর যৌথমূলধনী কারবার গঠনের নিয়মকানুন পালন

1. Firm or Association.

করে কারবার গঠন করে। গঠনের প্রাথমিক ব্যয়[2] তারাই বহন করে। বহুক্ষেত্রে, কারবার আরম্ভ করার সময় তারাই অধিকাংশ মূলধন সরবরাহ করে। শেয়ার বিক্রয় করে কারবারের মূলধন সংগ্রহের কাজ এদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। কখনও আবার চুক্তিদ্বারা এরা কারবারের কাছে নিজেদের কোন ব্যবসায় বা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে। সেক্ষেত্রে ঐ ক্রয়বিক্রয়ের শর্ত সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে হয়। কারবারের সাথে এদের সম্পর্ক হল বিশ্বাসের[3] সম্পর্ক। সুতরাং এদের পক্ষে কারবার গঠন-সংক্রান্ত কাজের দ্বারা গোপন মুনাফা অর্জন বেআইনী বলে গণ্য হয়।

যৌথমূলধনী কারবার গঠনে যথেষ্ট বিচক্ষণতা এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কারণ কারবারের গঠনের উপর এর ভবিষ্যৎ সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। এজন্য সাধারণত সমাজে এক শ্রেণীর ব্যক্তির উৎপত্তি হয়েছে, যারা এ বিষয়ে পারদর্শী এবং বিশেষজ্ঞ। তারাই যৌথমূলধনী কারবারের প্রবর্তকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই সব প্রবর্তক-গণকে মোটামুটিভাবে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। যথা—**ক. পেশাদারী প্রবর্তক**[4]—পাশ্চাত্য দেশসমূহে একশ্রেণীর প্রবর্তক দেখা যায়, যারা অনবরত বিভিন্ন প্রকারের যৌথমূলধনী কারবার গঠন করে থাকে এবং কারবারের প্রতিষ্ঠা ও কার্যারম্ভের পর আর তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে না। কারবারের উদ্যোক্তা হিসাবে কারবার গঠন করাই এদের একমাত্র জীবিকা বা পেশা। এরাই হল পেশাদারী প্রবর্তক। **খ. সাময়িক প্রবর্তক**[5]—অনেক সময় আবার কোন ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি মধ্যে মধ্যে নূতন যৌথমূলধনী কারবার গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে নূতন কারবারের প্রবর্তক হিসাবে তার কাজ নিতান্তই সাময়িক এবং অপ্রধান। তার প্রধান কাজ শিল্প বা ব্যবসায় পরিচালনা। এরাই সাময়িক প্রবর্তক। **গ. প্রবর্তক**[6]—অনেক ক্ষেত্রে আবার কোন নূতন দ্রব্যের আবিষ্কারক অথবা কোন ব্যবসায়ী কিংবা উৎপাদক, নিজেই উদ্যোগ নিয়ে যৌথমূলধনী কারবার স্থাপন করে এবং পরে তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করে। এদের সাধারণ প্রবর্তক বলে গণ্য করা যায়।

ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সিগুলি অতীতে অনেক যৌথমূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠায় পেশাদারী প্রবর্তকের ভূমিকা পালন করেছে। তবে বর্তমানে অধিকাংশ প্রবর্তকই হল উল্লিখিত তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত।

কোম্পানীর গঠন প্রণালী
FORMATION OF A COMPANY

কোম্পানী প্রবর্তকের কার্যাবলী : কোম্পানী গঠন প্রণালী
FUNCTIONS OF A COMPANY PROMOTER : FORMATION PROCEDURE

যৌথমূলধনী কারবার বা কোম্পানী গঠন করতে হলে প্রবর্তককে যে সব প্রণালী অনুসরণ ও কার্যাবলী সম্পাদন[7] করতে হয় তা হলঃ

প্রথম ধাপঃ প্রাথমিক কাজঃ ১. কারবারটির সম্ভাবনা উদ্ভাবন[8]ঃ কোন্ বিষয়ে একটি নূতন কারবার স্থাপিত হলে তা সফল হতে পারে—সর্বপ্রথম প্রবর্তক বা প্রবর্তকদের মনে এই চিন্তা জাগা দরকার। এই চিন্তা জাগলে তখন এর বাস্তব সম্ভাবনা কতটা, সাফল্য ও ঝুঁকির সম্ভাবনা কিরূপ, প্রয়োজনীয় পুঁজি ও অন্যান্য উপকরণাদি সংগ্রহের সম্ভাবনা কতখানি ইত্যাদি বিষয়গুলি তাদের বিবেচনা করতে হয়। এই সকল বিষয়ে সম্ভাব্য সাফল্য সম্বন্ধে কিছুটা সুনিশ্চিত হলে, বা বিশ্বাস জন্মালে পর প্রবর্তকরা পরবর্তী পদক্ষেপে অগ্রসর হন।

২. অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা[9]ঃ প্রাথমিক বিবেচনায় সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা গেলে, প্রবর্তক সম্ভাব্য উৎপাদন খরচ কি পড়বে, বাজারে পণ্যটির চাহিদা কতটা,

2. Preliminary Expenses. 3. Fiduciary. 4. Professional Promoter.
5. Occasional Promoter. 6. Promoter.
7. Functions performed by the promoter. 8. Discovery of idea.
9. Investigation and Financial Planning.

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম, শক্তি, পরিবহণ, কাঁচামালের যোগান প্রভৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে সে সম্পর্কে আশান্বিত হলে, তাঁরা সম্ভাব্য কারবারটির একটি বাস্তবানুগ খসড়া পরিকল্পনা রচনা করেন। তাতে সম্ভাব্য খরচ, প্রয়োজনীয় পুঁজি, প্রয়োজনীয় শ্রমিক-কর্মচারী, কারবারের নির্দিষ্ট আনুমানিক কার্যাবলী, মোট বিক্রয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ, সম্ভাব্য মুনাফা, প্রয়োজনীয় পুঁজি কোন্ কোন্ প্রকারের শেয়ার দ্বারা কতটা সংগ্রহ করতে চান, শেয়ার ছাড়াও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা হবে কিনা, শেয়ারের মূল্য কত হবে, কটা কিস্তিতে তা সংগ্রহ করা হবে, কিভাবে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রয় করা হবে কোম্পানীটির সাংগঠনিক কাঠামো কিরকম হবে, কোথায় তা স্থাপিত হবে ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকে।

৩. প্রয়োজনীয় সংখ্যক উদ্যোক্তা বা প্রবর্তক সংগ্রহ[১০] : এবার যিনি বা যাঁরা প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করে উপরোক্ত কাজগুলি সম্পাদন করেছেন, তিনি বা তাঁরা সম্ভাব্য কারবারটির পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করে ঐ বিষয়ে তাদের আগ্রহী করে তুলতে চেষ্টা করেন এবং তাদের মধ্য থেকে কোম্পানীর নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রবর্তক (পাবলিক কোম্পানী হলে ৭ জন এবং প্রাইভেট কোম্পানী হলে অন্তত ২ জন) বা নিবন্ধনের আবেদন পত্র স্বাক্ষরকারী সংগ্রহ করেন।

৪. প্রস্তাবিত কোম্পানীর মেমোরান্ডাম ও আর্টিক্‌ল্‌স্ এবং অন্যান্য দলিল প্রণয়ন[১১] : নিবন্ধনের জন্য প্রথমেই আইনানুযায়ী যে দুইটি দলিল প্রণয়ন করতে হয় তার একটি হল পরিমেল বন্ধ বা মেমোরান্ডাম অব এ্যাসোসিয়েশন ও অপরটি হল পরিমেল নিয়মাবলী বা আর্টিক্‌ল্‌স্ অব এ্যাসোসিয়েশন। কোম্পানী আইনের ৩৩(১) ধারামতে এই দুইটি দলিল প্রণয়ন করা দরকার। প্রথম দলিলটির দ্বারা প্রস্তাবিত কোম্পানীর ক্ষমতার সীমা এবং তৃতীয় পক্ষের সাথে তার সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় দলিলটির দ্বারা তার অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী নির্দিষ্ট হয়। এ ছাড়া শেয়ার বিক্রয়ের বিবরণ-পত্র বা প্রসপেকটাস অথবা তার বিকল্প বিবরণ এবং কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চুক্তিপত্র ইত্যাদি দলিলগুলিও রচনা করতে হয়।

দ্বিতীয় ধাপ : কোম্পানীর নিবন্ধন : ১. নিবন্ধন কথাটির অর্থ হল আইনের কাছে স্বীকৃতি লাভ। অর্থাৎ কোম্পানীটির আইন-স্বীকৃত পৃথক সত্তার জন্ম। ভারতের কোম্পানী আইনে এ বিষয়ে যে নির্দেশ রয়েছে তা হল এই যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কোম্পানী-নিবন্ধকের কাছে প্রস্তাবিত কোম্পানীটির নিবন্ধন করাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের কোম্পানী-নিবন্ধকের কাছে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হলে অন্ততঃ ৭ জনকে, আর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হলে অন্ততঃ ২ জনকে নিম্নলিখিত দলিলগুলি দাখিল করতে হবে :

১. মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েশন বা পরিমেল বন্ধ।
২. আর্টিক্‌ল্‌স্ অব এসোসিয়েশন বা পরিমেল নিয়মাবলী।
৩. নিবন্ধনের জন্য কোম্পানী আইনে যেসব অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের নির্দেশ রয়েছে তা পালন করা হয়েছে—এই মর্মে কোম্পানীর উকিল, এটর্নী, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, সেক্রেটারী বা অন্য কোনও দায়িত্বশীল কর্মচারীর বিবৃতি।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হলে আরও যে দুটি দলিল দাখিল করতে হয় তা হল :

৪. প্রস্তাবিত ডিরেকটার বা পরিচালকরা যে পরিচালকরূপে কাজ করতে ইচ্ছুক সে মর্মে তাদের লিখিত সম্মতি। অবশ্য, পরিচালকরূপে নিয়োগের ৩০ দিনের মধ্যেও তাঁরা এই সম্মতি দাখিল করতে পারেন।

10. Assembling.
11. Preparation of the Memorandum & Articles of Association etc.

৫. **প্রস্তাবিত পরিচালকরা যদি যথেষ্ট পরিমাণ শেয়ার কিনবেন বলে মেমোরান্ডামে সই না দিয়ে থাকেন, তাহলে, তাঁরা ন্যূনতম যোগ্যতাসূচক শেয়ার কিনবেন—এই মর্মে তাঁদের লিখিত সম্মতি।**

৬. এছাড়া, উপরোক্ত দলিলগুলির সাথে প্রস্তাবিত কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসের ঠিকানা জানিয়ে একটি লিখিত নোটিশও দাখিল করা যেতে পারে। কিংবা নিবন্ধনের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যেও এই নোটিশ দাখিল করা যেতে পারে।

২. **নিবন্ধন ফী :** দলিল পিছু ৫ টাকা করে দাখিল করার ফী এবং মেমোরান্ডাম ও আর্টিকল্‌সের উপর প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প ডিউটি ও তৎসহ প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন ফী জমা দিতে হবে। প্রস্তাবিত অনুমোদিত পুঁজি অথবা কোম্পানীর সদস্য বা শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন ফী ধার্য করা আছে।

৩. **নিবন্ধন পত্র :** উপরোক্ত দলিলগুলি ও নিবন্ধন ফী জমা পেলে, তা যাচাই করে দেখে সন্তুষ্ট হলে, নিবন্ধক আবেদনকারিদের প্রস্তাবিত কোম্পানীর নিবন্ধনপত্র প্রদান করেন। এই নিবন্ধনপত্র প্রদানের সাথে সাথে কোম্পানী আইনসিদ্ধভাবে জন্মগ্রহণ করে ও আইন স্বীকৃত সত্তা লাভ করে। এটিই হল কোম্পানীটির অস্তিত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ পত্র।

নিবন্ধন পত্র পাওয়ার পরই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী তার কাজকর্ম আরম্ভ করতে পারে।

কিন্তু পাবলিক কোম্পানী তা পারে না। কাজ আরম্ভ করার আগে তাকে আরও একটি প্রত্যয়ন পত্র বা সারটিফিকেট সংগ্রহ করতে হয়। সেটি হল কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র বা সারটিফিকেট অব কমেন্সমেন্ট।

তৃতীয় ধাপ : পুঁজিসংগ্রহ ও শেয়ার বিলি : (১) নিবন্ধনপত্র সংগ্রহের পর পরিচালক পর্ষদের প্রথম সভা[১২] ডাকতে হয়, এবং ঐ সভায় কোম্পানীটি প্রবর্তন করার জন্য যে সব কাজ ও চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়।

(২) এর পর জনসাধারণকে কোম্পানীর শেয়ার কেনার জন্য আবেদন করতে আহ্বান জানিয়ে কোম্পানীর পক্ষ একটি বিবরণ পত্র কিংবা তার বিকল্প বিবৃতি[১৩] রচনা করে এবং তার প্রতিলিপি নিবন্ধকের কাছে দাখিল করে, জনসাধারণের কাছে তা প্রচার করতে হয়।

(৩) জনসাধারণের কাছ থেকে শেয়ার কেনার আবেদনপত্র ও তার সাথে শেয়ার-আবেদন-অর্থ পেলে কোনও তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কে কোম্পানীর নামে আমানতি হিসাব খুলে ঐ অর্থ জমা দিতে হয়। কমপক্ষে কতগুলি শেয়ার বিক্রয় হওয়া চাই তা বিবরণ পত্র কিংবা তার বিকল্প বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। অন্ততঃ ঐ পরিমাণ শেয়ার কেনার আবেদনপত্র এবং সেই সাথে আবেদন-অর্থ (যা ঐ শেয়ারের মূল্যের অন্ততঃ ৫ শতাংশ হওয়া চাই) জমা পড়লে তবে ঐ আবেদনকারিদের মধ্যে শেয়ার বিলিবণ্টন বা আবণ্টনের[১৪] কাজ শুরু করতে হয়। শেয়ার আবণ্টনের কাজ শেষ হওয়ার ১ মাসের মধ্যে, এই মর্মে নিবন্ধকের কাছে একটি বিবৃতি দাখিল করতে হয় যে, শেয়ার আবণ্টনের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।

চতুর্থ ধাপ : কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র : (১) এর পর কোম্পানীর যে কোনও একজন ডিরেকটার কিংবা কোম্পানীর সেক্রেটারীকে নিবন্ধকের কাছে এই মর্মে একটি বিবৃতি দাখিল করতে হয় যে,—

(১) বিবরণে উল্লেখমত ন্যূনতম আদায়ী অর্থ কোম্পানী সম্পূর্ণ নগদ টাকায় সংগ্রহ করেছে।

12. First meeting of the Board.
13. Prospectus or Statement in lieu of Prospectus.
14. Share allotment.

(২) ডিরেকটাররা অন্যান্যদের মত একই অনুপাতে তাঁদের কেনা শেয়ার বাবদ আবেদন-অর্থ জমা দিয়েছেন। এবং

(৩) কোনও অনুমোদিত শেয়ার বাজারে ঐ কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের অনুমতির জন্য আবেদন করতে কিংবা সে অনুমতি লাভে ব্যর্থ হলে সেজন্য শেয়ার বা ডিবেঞ্চার আবেদনকারিদের অর্থ ফেরত দিতে হবে না।

এই বিবৃতি পেলে নিবন্ধক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র দেন। এই অনুমতিপত্র পেলে তবেই পাবলিক কোম্পানী তার কাজকর্ম শুরু করতে পারে।

এই চারটি ধাপ নিচে সংক্ষেপে একটি ছকে সাজিয়ে দেখান হল ঃ

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী গঠনের পদ্ধতি

বিভিন্ন পর্যায়	আইনগত কর্তব্যসমূহ	অনুধাবনীয়
প্রথম ধাপ ঃ প্রাথমিক প্রবর্তনমূলক কার্যাদি	১. কারবারটির সম্ভাবনা উদ্ভাবন ২. অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা রচনা ৩. প্রয়োজনীয় সংখ্যক উদ্যোক্তা সংগ্রহ ৪. মেমোরান্ডাম, আর্টিকল্স্ ও অন্যান্য দলিল রচনা	এই পর্যায়ে কোম্পানীর আইনত অস্তিত্ব সৃষ্টি হয় না।
দ্বিতীয় ধাপ ঃ নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যাদি	১. নিবন্ধনের জন্য— ক. মেমোরান্ডাম খ. আর্টিক্‌ল্স্ গ. পরিচালক হতে সম্মত ব্যক্তিগণের তালিকা, ঘ. প্রস্তাবিত পরিচালকগণের পরিচালকরূপে কাজ করার সম্মতি পত্র, ঙ. নিবন্ধভুক্ত কার্যালয়ের ঠিকানা, চ. নিবন্ধভুক্তির জন্য আইনত পালনীয় সকল সর্তগুলি পালিত হয়েছে এই মর্মে আইন নির্দিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে বিবৃতি প্রভৃতি—ও ২. উপযুক্ত নিবন্ধন ফী সহ নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা। ৩. নিবন্ধক কর্তৃক নিবন্ধনপত্র প্রদান।	এই পর্যায়ে এই সকল দলিলগুলি যথাযথ প্রণয়ন পূর্বক নিবন্ধকের নিকট দাখিল করার পরে, নিবন্ধক সন্তুষ্ট হয়ে নিবন্ধনপত্র প্রদান করলে, কোম্পানী আইনত জন্মলাভ করে। কিন্তু তাহা হলেও, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী তখনই কারবার আরম্ভ করতে পারে না প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কিন্তু পারে।
তৃতীয় ধাপ ঃ পুঁজি সংগ্রহ ও শেয়ার বিলি	১. পরিচালকপর্ষদের প্রথম সভা আহ্বান। ২. প্রাথমিক চুক্তিগুলি অনুমোদন। ৩. বিবরণপত্র বা তার বিকল্পবিবৃতি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা।	এই পর্যায়ে কোম্পানীকে শেয়ার বিক্রয় করে অর্থসংগ্রহের কাজে ও তৎসংক্রান্ত আইন-

বিভিন্ন পর্যায়		
	৪. বিবরণপত্র বা তার বিকল্প বিবৃতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার। ৫. শেয়ার ক্রয়ের আবেদন পত্র গ্রহণ। ৬. শেয়ার আবন্টন। ৭. শেয়ার হোল্ডারগণের তালিকা প্রণয়ন। ৮. ব্যাঙ্কার নিয়োগ। ৯. শেয়ার সার্টিফিকেট বিলি। ১০. স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন—	গত আনুষ্ঠানিকতা পালনে ব্যস্ত থাকতে হয়। এখনও কোম্পানী কাজ আরম্ভ করতে পারে না।
চতুর্থ ধাপ : কারবারের কার্যারম্ভ	১. নিবন্ধকের নিকট নিম্নোক্ত মর্মে বিবৃতি দাখিল করা। ক. বিবরণপত্রে উল্লিখিত ন্যূনতম শেয়ার বিক্রয়লব্ধ যে আদায় হয়েছে। খ. কোন অনুমোদিত শেয়ার বাজারে কোম্পানী তার শেয়ারগুলির তালিকাভুক্তি করতে অক্ষম হলে কোম্পানী শেয়ার বা ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণকে অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য দায়ী হবে না। ২. নিবন্ধক কর্তৃক কোম্পানীর কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রদান।	এই পর্যায়ে ন্যূনতম শেয়ার বিক্রয়লব্ধ আদায় ও তৎসংক্রান্ত সর্বশেষ আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট থেকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র নিয়ে কারবার আরম্ভ করতে হয়।

কোম্পানীর মুখ্য দলিল ও শব্দসমূহ
PRINCIPAL DOCUMENTS AND TERMS

১. মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েশন অথবা পরিমেল বন্ধ
1. MEMORANDUM OF ASSOCIATION

মেমোরান্ডাম অব এ্যাসোসিয়েশন যৌথমূলধনী কারবারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ হল কোম্পানীর সনদ এবং এর ভিত্তিতেই কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি কোম্পানীর ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে। কোম্পানী কখনই ঐ সীমা অতিক্রম করতে পারে না। শেয়ারহোল্ডারগণ, ঋণদাতাগণ এবং অন্যান্য যারাই এর সাথে কারবারে লিপ্ত হয়, তাদের সকলকেই এর কার্যাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করাই মেমোরান্ডামের উদ্দেশ্য। মেমোরান্ডামের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি হল:

১. নাম[15]**:** কোম্পানীর নাম এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হলে নামের শেষে 'লিমিটেড' শব্দটি এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হলে 'প্রাইভেট লিমিটেড' শব্দ দুটি যোগ করতে হয়।

15. Name Clause.

কোম্পানীর নামকরণ করতে গিয়ে চল্‌তি কোন কোম্পানীর নাম অথবা তার অনুরূপ কোন নাম ব্যবহার করা চলবে না এবং কোন প্রস্তাবিত নামকে ভারত সরকার অবাঞ্ছিত মনে করলে তাও বর্জন করতে হবে।

২. অবস্থান[16]: নোটিশ পাঠাবার সুবিধার জন্য মেমোরান্ডামে কোম্পানীর ঠিকানা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাতে শুধুমাত্র কোন্ রাজ্যে তা অবস্থিত তা উল্লেখ করাই যথেষ্ট এবং সুবিধাজনক। শহরের নাম দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এর সুবিধা এই যে, রাজ্যের উল্লেখ থাকলে, তার অন্তর্গত এক শহর থেকে অন্য শহরে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় বা হেড অফিস স্থানান্তরিত হলে পুনরায় অনুমতির দরকার হয় না। শুধু একরাজ্য থেকে অপর রাজ্যে প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করা হলে অনুমতি নেবার প্রয়োজন হবে।

৩. উদ্দেশ্য[17]: মেমোরান্ডামের একটি ধারাতে কোন্ কোন্ জাতীয় শিল্প বা ব্যবসায়ে কোম্পানী আত্মনিয়োগ করবে অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য কী, তার বর্ণনা থাকে। এই ধারাকে "উদ্দেশ্য ধারা" বলে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি হল যে, শুধুমাত্র বর্তমানে যে সকল কার্য আরম্ভ করা হবে তাই নয়, সুদূর ভবিষ্যতেও প্রয়োজন মনে করলে কোম্পানী যে সকল সম্ভাব্য কার্য পরিচালনা করতে পারে, তাও লিপিবদ্ধ করা হয়। এরূপ ব্যাপকভাবে কোম্পানীর উদ্দেশ্য বর্ণনার কারণ এই যে, মেমোরান্ডামের উদ্দেশ্য পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা অতি কঠিন। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হলে, যে যে রাজ্যে তার কার্যাবলী বিস্তৃত হবে বা হতে পারে, তাদের নামও এখানে উল্লেখ করতে হয়।

১৯৬৫ সালে ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের যে সংশোধনী পাশ হয়েছে তার দ্বারা মেমোরান্ডামের উদ্দেশ্য ধারাতে একটি সংযোজন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৫ সালের এই সংশোধনী বলবৎ হওয়ার পরে গঠিত কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে,—ক. নিবন্ধনের সময় যে প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোম্পানী গঠিত হয়েছে তা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি; এবং খ. এ ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্য থাকলে তাও বর্ণনা করতে হবে।

৪. দায়[18]: কোম্পানীর দেনার জন্য শেয়ারহোল্ডারগণের আর্থিক দায় কেনা শেয়ারের মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে, একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়।

৫. পুঁজি[19]: প্রস্তাবিত পুঁজি এবং তা কতগুলি শেয়ারে বিভক্ত হবে, তা উল্লেখ করতে হয়।

৬. সম্মতি[20]: . মেমোরান্ডামের শেষ অংশে এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত একটি ঘোষণা নিবদ্ধ থাকে যে, উল্লিখিত নাম ঠিকানাযুক্ত ব্যক্তিগণ, নির্দেশিত শেয়ার খরিদ করতে সম্মত হয়ে মেমোরান্ডামেব বর্ণনামত কোম্পানী গঠনে ইচ্ছুক[21]।

মেমোরান্ডামের সংশোধন[22]: নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রী হওয়ার পর কোম্পানীর আইনের নির্দিষ্ট বিধিসম্মত পন্থা ছাড়া মেমোরান্ডাম-এর কোন সংশোধন করা যায় না। তার বিভিন্ন ধারা সংশোধনের জন্য কোম্পানী আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। যথা,—

১. নাম পরিবর্তন: এ জন্য বিশেষ প্রস্তাব পাস করে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিতে হয়। তবে, তারপর নিবন্ধক নূতন করে নিবন্ধন পত্র না দেওয়া পর্যন্ত ঐ সংশোধন কার্যকর হয় না।

---

16. Situation Clause. 17. Object Clause. 18. Liability Clause.
19. Capital Clause. 20. Subscription or Association Clause.
21. "We the several persons whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this Memorandum of Association, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set opposite our respective names."
22. Alteration of Memorandum.

২. এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর এবং উদ্দেশ্যের সংশোধন ঃ নিম্নলিখিত কারণে উপরোক্ত বিষয়ে পরিবর্তন এবং সংশোধন করতে হলে বিশেষ প্রস্তাব পাস করে আদালতের কাছে দরখাস্ত করে অনুমতি নিতে হয় এবং কোম্পানীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এ সম্পর্কে নোটিস দ্বারা জানাতে হয় ঃ

ক. আরও ব্যয়সংকোচ এবং কারবারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হলে;

খ. নূতন অথবা উন্নততর উপায়ে কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য;

গ. স্থানীয় কার্যক্ষেত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হলে;

ঘ. এমন কোন নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করার জন্য যা কোম্পানীর বর্তমান ব্যবসায়ের সাথে লাভজনকভাবে যুক্ত করা চলে;

ঙ. মেমোরান্ডামে উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্য সংকুচিত অথবা পরিত্যাগ করার জন্য;

চ. কোম্পানীর যাবতীয় কারবার, অথবা কারবারের অংশবিশেষ অথবা একাধিক কারবারের কোন একটি বিক্রয় কিংবা হস্তান্তর করতে হলে; অথবা,

ছ. অন্য কোন কোম্পানী বা কারবারের সাথে সংযুক্ত বা একত্রীভূত (amalgamation) হওয়ার জন্য।

সংশোধনের বা পরিবর্তনের আবেদন শুধুমাত্র উপরোক্ত সাতটি বিষয়ের মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছে এবং তা শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও তাতে ঋণদাতাগণের স্বার্থ ও কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হবে না, আদালত এ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে তবেই অনুমতি দিতে পারে। কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রারকে (নিবন্ধক) এ সম্পর্কে আদালতের কাছে পরামর্শ পেশ বা প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ দিতে হবে। আদালতের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে, আদালতের রায়ের নকল সহ সংশোধিত মেমোরান্ডামের মুদ্রিত প্রতিলিপি রেজিস্ট্রারের কাছে দাখিল করতে হবে। তার পর রেজিস্ট্রার সংশোধিত মেমোরান্ডামের নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রি করার পর নূতন নিবন্ধন পত্র দেবেন এবং ঐ সংশোধিত মেমোরান্ডামই এরপর কোম্পানীর মেমোরান্ডাম বলে গণ্য হবে।

এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানীর স্থানান্তরের জন্য, যে রাজ্যে তা স্থানান্তরিত হল সেখানকার রেজিস্ট্রারের (নিবন্ধক) কাছে ঐ সব দলিল দাখিল করতে হবে।

৩. পুঁজির পরিবর্তন ঃ আর্টিকল্স অব এসোসিয়েশন বা পরিমেল নিয়মাবলীতে পুঁজির পরিবর্তন সম্বন্ধে বিধান থাকলে, কোম্পানীর সাধারণ সভাতে সাধারণ প্রস্তাব গ্রহণ করে পুঁজি সম্পর্কে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা চলে ঃ

ক. নূতন শেয়ার বিলি করে পুঁজি বৃদ্ধি।

খ. বর্তমান পুঁজির পুনর্বিন্যাস[২৩] করে বর্ধিত মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত করা।

গ. আদায়ীকৃত পুঁজি 'স্টক'এ পরিণত করা কিংবা 'স্টক'কে পুনরায় আদায়ীকৃত পুঁজিতে পরিণত করা।

ঘ. শেয়ারগুলিকে উপ-বিভক্ত করে[২৪] অল্প মূল্যের শেয়ারে পরিণত করা।

ঙ. পুঁজি পরিবর্তনের এই প্রস্তাব গ্রহণকালে, যে সকল শেয়ার বিক্রয় হয় নি অথবা যা ক্রয়ের জন্য কারও কাছ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি, ঐ সব শেয়ার বাতিল করা।

কিন্তু যদি 'আর্টিকল্সে' পুঁজি পরিবর্তনের কোন কথা না থাকে তা হলে, কোম্পানী আইনানুযায়ী বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করে পুঁজি পরিবর্তন করা যায়।

পুঁজি পরিবর্তনের নোটিশ একমাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের কাছে দাখিল করতে হবে এবং এরপর মেমোরান্ডামের সমস্ত প্রতিলিপিতে সংশোধিত পুঁজি উল্লেখ করতে হবে। পুঁজি বৃদ্ধি করা হলে প্রথমে পুরাতন শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের শেয়ারের

23. Consolidate. 24. Sub-divide.

আনুপাতিক হারে নূতন শেয়ার কেনার সুযোগ দিতে হবে। তারা না কিনলে, অন্য কোন সম্ভাব্য উত্তম পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. আর্টিকল্‌স্‌ অব এসোসিয়েশন
2. ARTICLES OF ASSOCIATION

কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী যে দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয় তা আর্টিকল্‌স্‌ অব এসোসিয়েশন বা পরিমেল নিয়মাবলী অথবা সংক্ষেপে 'আর্টিকল্‌স্‌' নামে পরিচিত। এই দলিলের দ্বারা পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিগণের ক্ষমতা নির্দেশ করা হয়। শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও তাদের অধিকার, কোম্পানীর ঋণ করার ক্ষমতা, সভা আহ্বান ও পরিচালনা, হিসাবরক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে কারবারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নিয়মকানুন এতে লিপিবদ্ধ থাকে।

মেমোরান্ডামের স্বাক্ষরকারীদেরই 'আর্টিকল্‌স্‌'-এ সই করতে হয় এবং মেমোরান্ডামের সাথে এটিও রেজিস্ট্রারের কাছে দাখিল করতে হয়। দলিল হিসাবে 'আর্টিকল্‌স্‌'-এর স্থান 'মেমোরান্ডামে'র নীচে এবং মেমোরান্ডাম-বহির্ভূত কোন বিষয় আর্টিকল্‌সে স্থান পেতে পারে না। কারণ মেমোরান্ডামই কোম্পানীর মুখ্য দলিল।

শেয়ারের মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়সংযুক্ত কোম্পানীর স্বতন্ত্রভাবে রচিত নিজস্ব আর্টিকল্‌স্‌ থাকতে পারে; তা না থাকলে তাকে ভারতের কোম্পানী আইনের ২৮ ধারা অনুসারে টেবল-এ অংশে প্রদর্শিত ৯টি ধারার সমস্ত অথবা ঐগুলির মধ্য থেকে নিজেদের প্রয়োজনমত ধারাগুলি নিজেদের আর্টিকল্‌স্‌ হিসাবে বেছে নিতে হবে।

আর্টিকল্‌সের সংশোধন[25] **:** আর্টিকল্‌সের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহজসাধ্য। এজন্য আদালতের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কোম্পানী আইনমতে, বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করে আর্টিকল্‌সের সংশোধন করতে হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন তা মেমোরান্ডামের ক্ষমতা-বহির্ভূত না হয়। কিন্তু যদি কোন সংশোধনের দ্বারা কোন বিষয়ে কোম্পানীর পূর্ব চুক্তি ভঙ্গ করা হয় অথবা তা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

আর্টিকল্‌সের সংশোধনের পর তার যাবতীয় প্রতিলিপিতে ঐ সকল সংশোধনগুলি উল্লেখ করতে হয়।

আর্টিকল্‌সের অন্তর্ভুক্ত বিষয়[26]**:**

১. মূলধনের বিভিন্ন প্রকার শেয়ারে শ্রেণীবিভাগ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার।

২. শেয়ারের টাকা কিস্তিতে আদায় করা হলে আবেদন[27], আবন্টন[28], তলব[29] ইত্যাদি বিভিন্ন কিস্তিতে দেয় অর্থের পরিমাণ।

৩. ন্যূনতম পুঁজির পরিমাণ।

৪. কিস্তির টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনাদায়ের দরুন শেয়ার বাজেয়াপ্ত করার নিয়ম ও বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনর্বিলির পদ্ধতি।

৫. শেয়ার হস্তান্তর সম্পর্কে নিয়ম এবং হস্তান্তরের ফি দিতে হলে তার পরিমাণ।

৬. শেয়ার আবন্টনের তারিখ থেকে তিনমাসের মধ্যে বিনা ফিতে শেয়ার সার্টিফিকেট বিলির পদ্ধতি।

৭. শেয়ারের পূর্বস্বত্ব[30] এবং তলবের নিয়মাবলী।

৮. শেয়ার বিক্রয়ের কমিশানের হার, আইনত তা যে দামে শেয়ার বিলি করা হয় তার শতকরা ৫ ভাগের বেশি হতে পারে না।

৯. পুঁজির পরিমাণ পরিবর্তনের নিয়মাবলী।

---

25. Amendment of the Articles. 26. Contents of the Articles.
27. Application. 28. Allotment. 29. Call. 30. Lein.

১০. ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।

১১. পরিচালকগণের নাম, ঠিকানা ও পেশা।

১২. পরিচালকগণের সংখ্যা এবং পারিশ্রমিক।

১৩. ম্যানেজার এবং সেক্রেটারী নিয়োগের নিয়ম।

১৪. কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা এবং অতিরিক্ত সাধারণ সভা[৩১] আহ্বান ও পরিচালনার নিয়মাবলী।

১৫. পরিচালক পর্ষদের[৩২] সভা আহ্বান ও পরিচালনার নিয়মাবলী।

১৬. সভায় ভোট গ্রহণের পদ্ধতি এবং সদস্যদের ভোটাধিকার।

১৭. লভ্যাংশ ঘোষণার পদ্ধতি।

১৮. লাভের অংশবিশেষকে মূলধনে পরিণত করার[৩৩] নিয়ম।

১৯. হিসাবরক্ষা ও পরীক্ষার নিয়মাবলী।

২০. কোম্পানীর শীলমোহর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা।

২১. কোম্পানীর বিলোপসাধনের[৩৪] পদ্ধতি।

মেমোরাণ্ডাম ও আর্টিক্ল্সের তুলনা

MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION COMPARED

কোম্পানীর আইনগত বুনিয়াদ

মেমোরাণ্ডাম অব এসোসিয়েশন	**আর্টিক্ল্স্-অব এসোসিয়েশন**
এটি লিখিত ও মুদ্রিত এবং যথাবিহিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত ও কোম্পানীর শীলমোহরাঙ্কিত এবং স্বাক্ষরকারিগণের স্বাক্ষরযুক্ত হবে।	এটি মুদ্রিত, যথাবিহিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত ও মেমোরাণ্ডামে স্বাক্ষরকারিগণের স্বাক্ষরযুক্ত হবে।
এটি কোম্পানীর সাথে বহির্জগতের সম্পর্ক নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।	**এটি কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ সম্পর্কসমূহ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।**
এর বিষয়বস্তু	**এর বিষয়বস্তু**

মেমোরাণ্ডাম — এর বিষয়বস্তু:

- কোম্পানীর নাম
- অবস্থান
- উদ্দেশ্য
- দায়
- পুঁজি
- তাতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ঠিকানাসহ তাদের সম্মতি

আর্টিক্ল্স্ — এর বিষয়বস্তু:

শেয়ার হোল্ডারগণের
- ক. বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার।
- খ. ভোটাধিকার।
- গ. সভাসমূহ
- ঘ. শেয়ারের তলব।
- ঙ. শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি।

পরিচালকগণের
- ক. সংখ্যা ও পারিশ্রমিক।
- খ. সভা
- গ. ক্ষমতা ও কর্তব্য।
- ঘ. যোগ্যতা ইত্যাদি।

অন্যান্য
- ক. ঋণ
- খ. হিসাব পত্র।
- গ. শেয়ার হস্তান্তর ইত্যাদি

31. Extraordinary general meeting.
32. Board of Directors.
33. Capitalisation of Profits.
34. Winding up.

আগের পৃষ্ঠার রেখাচিত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে, মেমোরাণ্ডাম ও আর্টিক্‌ল্‌স্‌, এই দু'টি দলিলই কোম্পানীর আইনগত বনিয়াদ। তাহলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

মেমোরাণ্ডাম ও আর্টিক্‌ল্‌স্‌-এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে, ইংলণ্ডের জজ লর্ড কেয়ার্নস এ্যাশবেরী রেলওয়ে ক্যারেজ এণ্ড আয়রন কোম্পানী বনাম রিচি মামলায় বলেছেন—"মেমোরাণ্ডাম হল এমন একটি ক্ষেত্র, কোম্পানীর কার্যাবলী যা অতিক্রম করতে পারে না ; ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে, শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের নিজেদের শাসনকার্য চালনার জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করে সেরূপ নিয়মাবলী রচনা করতে পারে।"[৩৫] এই কথা মনে রেখে কোম্পানীর মেমোরাণ্ডাম ও আর্টিক্‌ল্‌সের তুলনা করতে হবে।

মেমোরাণ্ডাম	আর্টিক্‌ল্‌স্‌
১. এটি হল কোম্পানীর সনদ। এতে কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা বর্ণিত থাকে। এর দ্বারা কোম্পানীর সাথে কোম্পানীবহির্ভূত বিভিন্ন পক্ষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।	১. এটি হল কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মকানুন বিশিষ্ট একটি দলিল। এর দ্বারা কোম্পানীর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন পক্ষের সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়।
২. এটি কোম্পানীর মুখ্য দলিল।	২. এটি কোম্পানীর গৌণ দলিল হিসাবে মেমোরাণ্ডামের অধীন।
৩. এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ ও তাতে আদালতের অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি আবশ্যক।	৩. এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা পরিবর্ধনে শুধুমাত্র বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণই যথেষ্ট। শুধু পরিচালক সংখ্যার পরিবর্তন, তাদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি আবশ্যক।
৪. এতে সাধারণভাবে উল্লেখ থাকে।	৪. এতে বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি বর্ণনা থাকে।
৫. প্রত্যেক কোম্পানীকে তার নিজস্ব মেমোরাণ্ডাম রচনা করতে হয়।	৫. কোন পাবলিক কোম্পানী তার নিজস্ব আর্টিক্‌ল্‌স্‌ রচনা করতে পারে অথবা তা না করে, কোম্পানী আইনের পরিশিষ্টে 'প্রদত্ত টেব্‌ল্‌-এ'তে প্রদত্ত আদর্শ আর্টিক্‌ল্‌স্‌-গুলি সমস্তই বা তা থেকে প্রয়োজনমত অদল বদল করে গ্রহণ করতে পারে।
৬. আর্টিক্‌ল্‌সে যার উল্লেখ নাই এমন বিষয় স্বভাবতঃই মেমোরাণ্ডামে থাকতে পারে।	৬. মেমোরাণ্ডাম বহির্ভূত বা তার বিরোধী কোন বিষয় আর্টিক্‌ল্‌সে স্থান পেতে পারে না।
৭. কোম্পানী মেমোরাণ্ডাম বহির্ভূত কোন কাজ করলে তা অসিদ্ধ হবে এবং তখন কোম্পানীর সকল সদস্য ঐক্যমত হয়ে অনুমোদন করলেও তা আইনসিদ্ধ করতে পারে না।	৭. কোম্পানী আর্টিক্‌ল্‌সের বহির্ভূত কোন কাজ করলে, তা যদি মেমোরাণ্ডাম বহির্ভূত না হয়, তবে আর্টিক্‌ল্‌সের সংশোধন দ্বারা সদস্যারা তা অনুমোদন ও আইনসিদ্ধ করতে পারে।

35. "The memorandum as it were, is the area beyond which the actions of the company cannot go ; inside the area, the shareholders may make such regulations for their own government as they think fit."

৩. নিবন্ধন পত্র

3. CERTIFICATE OF INCORPORATION

কোম্পানী আইন নির্দিষ্ট যাবতীয় নিয়মাবলী অনুসরণ ও শর্তাবলী পালন করে প্রবর্তকরা কোম্পানীর রেজিস্ট্রার বা নিবন্ধকের কাছে আবেদনপত্র দাখিল করার পর তিনি তা গ্রহণ করলে, কোম্পানীর নিবন্ধনের প্রমাণ হিসাবে যে দলিল বা অনুমোদন পত্র দেন তাই নিবন্ধন পত্র নামে পরিচিত। তা অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী জন্মলাভ করে এবং আইনস্বীকৃত সত্তা পায়। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী সেটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কারবার আরম্ভ করতে পারে, কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী তা পারে না। তবে, তখন বিবরণ পত্র বা প্রসপেক্টাসের দ্বারা জনসাধারণের কাছে শেয়ার ক্রয়ের আবেদন করতে পারে।

৪. বিবরণ পত্র বা প্রসপেক্টাস

4. PROSPECTUS

মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, নিবন্ধনের পর কোম্পানী তার উদ্দেশ্য এবং প্রস্তাবিত কারবার-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত যে দলিল মারফত জনসাধারণের কাছে তার শেয়ার বা ঋণপত্র (debenture) ক্রয়ের জন্য আবেদন করতে আহ্বান জানায় তাই প্রসপেক্টাস বা বিবরণ পত্র নামে পরিচিত।

এই দলিলটি পরিচালকবর্গের অথবা তাদের দ্বারা নিযুক্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের দ্বারা স্বাক্ষরিত ও তারিখযুক্ত হওয়া চাই। এটি প্রচারিত হওয়ার আগে নিবন্ধকের নিকট অবশ্যই তা দাখিল করতে হবে এবং প্রচারিত প্রসপেক্টাসে ঐ বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে। এই দলিলে কোম্পানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকা প্রয়োজন। এই বর্ণনায় কোন বিষয় সজ্ঞানে গোপন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এতে কোন ত্রুটি, বিকৃতি এবং সত্যগোপন ঘটলে তার জন্য স্বাক্ষরকারিরা দায়ী হবে।

সংবাদপত্রে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হলে তাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, এটি শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য জনসাধারণের নিকট আহ্বান নয়, শুধু প্রসপেক্টাসের জন্য আবেদন করার আহ্বান মাত্র।

প্রসপেক্টাসের সঙ্গে শেয়ার ক্রয়ের আবেদন করার জন্য একটি আবেদন পত্রের ফরম থাকে।

বিবরণ পত্রের উদ্দেশ্য[৩৬] : ১. নবগঠিত কোম্পানী সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা।

২. অভিজ্ঞ পরিচালক ও সুদক্ষ কর্মকর্তাগণের দ্বারা নবগঠিত কোম্পানীর সুনিশ্চিত সাফল্যে আস্থা সৃষ্টি করে সঞ্চয়কারিগণকে ঐ সংস্থায় বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. যে সকল শর্ত ও প্রলোভনের দ্বারা জনসাধারণকে শেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতি ক্রয় করতে আকর্ষণ করা হয়েছে তার প্রামাণ্য দলিল রক্ষা করা।

৪. প্রসপেক্টাসে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে পরিচালকগণের নিকট থেকে স্বীকৃতি আদায় করা।

বিষয়বস্তু[৩৭] : ১. মেমোরাণ্ডামের বিষয়বস্তু—উদ্দেশ্য, স্বাক্ষরকারিগণের নাম ঠিকানা ও পরিচয় এবং তাঁরা যে শেয়ার কিনেছেন তার সংখ্যা।

২. মোট শেয়ারের সংখ্যা ও শেয়ারের বিভিন্ন শ্রেণী।

৩. কোম্পানীর সম্পত্তি ও মুনাফায় শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ।

৪. মূলধনের পরিমাণ এবং শেয়ার ক্রয় বাবদ আবেদন, বিলি ও তলবের জন্য দেয় অর্থের পরিমাণ।

৫. শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের দায় কেউ নিয়ে থাকলে[৩৮] দায়গ্রাহক বা দায়গ্রাহকগণের[৩৯] নাম, ঠিকনা এবং তাদের সম্পত্তি যে ঐ দায় মেটানোর উপযুক্ত সে সম্পর্কে পরিচালকগণের বিবৃতি।

36. Objects of the Prospectus. 37. Contents of the Prospectus.
38. Underwritten. 39. Underwriter or underwriters.

৬. কোম্পানী গঠনের প্রাথমিক খরচ।

৭. পরিচালকগণের নাম, ঠিকানা ও পেশাগত পরিচয়।

৮. ম্যানেজিং ডিরেক্টার, প্রভৃতির নিয়োগ সম্বন্ধে চুক্তি হয়ে থাকলে তার বিবরণ এবং তাদের নাম, ঠিকানা, পেশা ও পারিশ্রমিক।

৯. শেয়ার আবণ্টন আরম্ভ করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পুঁজিসংগ্রহের পরিমাণ এবং শেয়ারের দরখাস্ত গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়।

১০. কোম্পানী গঠনের সময় কারও নিকট থেকে সম্পত্তি[40] কেনা হলে ঐ বিক্রেতা বা বিক্রেতাগণের[41] নাম, ঠিকানা ও পেশা এবং ক্রীত সম্পত্তির মূল্য ও সে বাবদ প্রদত্ত বা প্রদেয় নগদ অর্থ, শেয়ার বা ঋণপত্র।

১১. কোম্পানীর প্রবর্তনে সহায়তা করার জন্য প্রবর্তক ও পরিচালকগণকে দেয় অর্থের পরিমাণ বা অন্য কোন সুবিধা।

১২. প্রত্যেক শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণের ভোটপ্রদানের ক্ষমতা এবং অধিকার ও লভ্যাংশ।

১৩. কোম্পানী হিসাবপরীক্ষকগণের নাম ও ঠিকানা।

১৪. কারও সাথে কোম্পানীর কোন চুক্তি হয়ে থাকলে তার বিশদ বিবরণ।

৪ক. প্রসপেক্টাস বা বিবরণ পত্রের বিকল্প বিবরণ[42]: কোম্পানীর প্রবর্তকরা নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির নিকট শেয়ার বিক্রয় করে অথবা কোন দায়গ্রাহকের (underwriter) সাহায্যে শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে পুঁজি সংগ্রহের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হলে জনসাধারণের কাছে শেয়ার ক্রয়ের আবেদন করার প্রয়োজন হয় না। সে ক্ষেত্রে তারা প্রসপেক্টাস বা বিবরণ পত্রের পরিবর্তে বিকল্প বিবরণ প্রকাশ করতে পারে। এই বিকল্প বিবরণ পত্রে, প্রসপেক্টাসে প্রকাশিতব্য সকল বিষয়েরই উল্লেখ থাকে এবং এটি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়। নিবন্ধকের কাছে আগে দাখিল না করে শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় করা যায় না।

৫. কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র
5. CERTIFICATE OF COMMENCEMENT

ন্যূনতম পুঁজি সংগৃহীত হওয়ার পর কোম্পানীর যে কোন একজন পরিচালক, কর্মসচিব অথবা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

১. কোম্পানীর প্রসপেক্টাস অথবা প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণ দাখিল করা হয়েছে,

২. ন্যূনতম পুঁজি সংগৃহীত হয়েছে, এবং

৩. পরিচালকরা আর্টিকেলসে উল্লিখিত যোগ্যতাসূচক শেয়ার কিনেছেন এবং তার দাম দিয়েছেন,

ইত্যাদি মর্মে নির্দিষ্ট ফরমে লিখিত ঘোষণা নিবন্ধকের নিকট দাখিল করলে, তিনি কোম্পানীর কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রদান করে থাকেন। এই অনুমতিপত্র না পেলে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী তার কারবার শুরু করতে এবং ঋণ সংগ্রহ করার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না।

ন্যূনতম পুঁজি (MINIMUM SUBSCRIPTION)

কতকগুলি আইন নির্দিষ্ট বিষয়ে কোম্পানীর ব্যয় নির্বাহের জন্য শেয়ার বিলির (Issue) দ্বারা যে ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের কথা আদি পরিচালকগণ উল্লেখ করে থাকেন আর্টিকলস্ এবং প্রসপেক্টাসে তাকেই ন্যূনতম পুঁজি বলে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হলে পরিচালকগণ শেয়ার আবন্টন করতে পারে না। যে সকল উদ্দেশ্যের জন্য এই ন্যূনতম পুঁজি নির্দিষ্ট হয়, তা হল,—ক. কোন সম্পত্তি ক্রয় বাবদ মূল্য প্রদান বা উক্ত মূল্য প্রদানের জন্য ঋণ করা হলে তা পরিশোধ করা। খ. কোম্পানীর প্রাথমিক[43] ও গঠনসংক্রান্ত[44] ব্যয় নির্বাহ করা। গ. শেয়ার বিক্রয়ের

40. Assets.
41. Vendor or Vendors.
42. Statement in lieu of Prospectus.
43. Preliminary.
44. Formation.

জন্য দালাল[45] বা দায়গ্রাহকের[46] কমিশন প্রদান করা। ঘ. কার্যকর মূলধন[47] সংগ্রহ করা। ন্যূনতম পুঁজি বলতে সংগৃহীত নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝাবে না।

প্রসপেক্টাস প্রচারের ১৮০ দিনের মধ্যে ন্যূনতম পুঁজি সংগৃহীত না হলে শেয়ারের দরখাস্তকারিরা যে টাকা দিয়েছেন তা ফেরৎ দিতে হয়। ১০ দিনের মধ্যে ফেরৎ না দেওয়া হলে পরিচালকরা যৌথ এবং ব্যক্তিগতভাবে ১৯০তম দিবস থেকে শতকরা ৭ টাকা হারে সুদসহ তা পরিশোধের জন্যে দায়ী থাকেন।

পরিচালকগণের যোগ্যতাসূচক শেয়ার (QUALIFICATION SHARES)

আগে কোম্পানীর পরিচালকরূপে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা লাভের জন্য একটি ন্যূনতম সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করতে হত। এই ন্যূনতম সংখ্যা আর্টিক্‌ল্‌সে উল্লিখিত থাকত। কোম্পানীর স্বার্থের সাথে উপযুক্ত পরিমাণে জড়িত না থাকলে, কোন শেয়ারহোল্ডার পরিচালনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে না বলে মনে করে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে গৃহীত ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের একটি সংশোধনী দ্বারা এই বিধান তুলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে আর পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক কোন নির্দিষ্ট ন্যূনতম সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করতে হয় না এবং সেকারণে আর্টিক্‌ল্‌সেও তা উল্লেখ করার প্রশ্ন ওঠে না।

কোম্পানীর সভা
MEETINGS

কোম্পানীর যাবতীয় সভাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—১· পরিচালকগণের অর্থাৎ পরিচালক পর্ষদের সভা, এবং ২· শেয়ারহোল্ডারগণের সভা।

১· পরিচালকপর্ষদের সভাসমূহ[48]ঃ আর্টিক্‌ল্‌সের দ্বারা অপর কোন ব্যবস্থার অবর্তমানে পরিচালকগণ শুধুমাত্র তাঁদের সভা আহ্বান করে তার মাধ্যমেই তাঁদের যাবতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করবেন। অন্ততপক্ষে প্রতি তিন মাসে অবশ্যই একবার এবং প্রতি বৎসর অন্তত চারবার পরিচালকপর্ষদের সভা আহ্বান করতে হবে। নোটিস বা বিজ্ঞপ্তির দ্বারা এই সভা আহ্বান করতে হবে এবং ঐ বিজ্ঞপ্তি দেশে অবস্থিত পরিচালকপর্ষদের সকল সভ্যের কাছে পাঠিয়ে আহূত সভা সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যেককে জানাতে হবে। তা না হলে সভাটি আইনত অসিদ্ধ হবে।
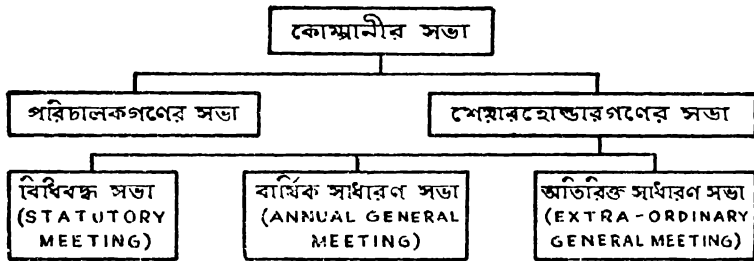
সভার অধিবেশন হলে সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে সভার কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যক সদস্য অথবা গণপূর্তি সংখ্যা[49] বর্তমান কিনা দেখতে হবে। তা না হলে সভার কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হবে না।

সভার অধিবেশনে সভার কার্যাবলী বিজ্ঞাপিত বিষয়সূচী[50] অনুযায়ী পরিচালিত হবে। সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের নীতি অনুযায়ী পরিচালকপর্ষদের কার্য পরিচালিত হয় না। আর্টিক্‌ল্‌সে ঐ নীতি গৃহীত না হয়ে থাকলে, সকল ক্ষেত্রে পরিচালকগণের ঐকামতের দ্বারা প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়।

---

45 Broker. 46. Underwriter. 47. Working Capital.
48. Meetings of Directors. 49. Quorum. 50. Agenda.

২. শেয়ারহোল্ডারগণের সভাসমূহ[51]: ক. বিধিবদ্ধ সভা[52]: শেয়ারের দ্বারা দায় সীমাবদ্ধ প্রত্যেক কোম্পানী কর্তৃক কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রাপ্তির অনূ্ন একমাস পরে ও ছয়মাসের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারগণের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করা বাধ্যতামূলক। এই সভার অধিবেশনের একুশ দিন আগে কোম্পানীর সেক্রেটারীকে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে অন্তত দুইজন পরিচালক কর্তৃক তাহা প্রত্যয়ন করাতে হয়। যে সকল কোম্পানীতে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ঐ দুইজন প্রত্যয়নকারী পরিচালকের একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবেন। এর পর ঐ বিবৃতির অন্তর্গত বিলিকৃত শেয়ার, শেয়ারের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং কোম্পানীর প্রাপ্ত ও ব্যয়িত অর্থ সম্পর্কে হিসাবের সত্যতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে কোম্পানীর নিরীক্ষকের নিকট থেকে একটি প্রত্যয়ন পত্র আদায় করতে হয়। তারপর এই বিবৃতির নকল শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বিলি করতে হয় এবং একটি প্রতিলিপি নিবন্ধকের কাছে দাখিল করতে হয়। এই বিবরণীটিকে বিধিবদ্ধ বিবরণী বলে।

বিধিবদ্ধ বিবরণী[53]: এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা বাধ্যতামূলক:

১. আবণ্টিত পূর্ণমূল্য ও আংশিকমূল্যে আদায়ীকৃত শেয়ারের সংখ্যা।

২. আবণ্টিত শেয়ারবাবদ লব্ধ মোট নগদ অর্থের পরিমাণ।

৩. রিপোর্ট প্রস্তুতের সাতদিন আগে পর্যন্ত পৃথক পৃথক শিরোনামায় কোম্পানীর আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব এবং অনুমিত প্রাথমিক খরচ।

৪. কোম্পানীর সেক্রেটারী, নিরীক্ষক ও পরিচালকগণের নাম, ঠিকানা ও পেশা।

৫. কোন চুক্তি অনুমোদন বা সংশোধনের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ সভায় উত্থাপনে ইচ্ছুক হলে, ঐ চুক্তির বা সংশোধনের বিশদ বিবরণ।

৬. কোন দায়গ্রাহকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি কোন কারণে সম্পূর্ণ পালিত না হলে তার কারণ এবং তা কতখানি পালিত হয়নি তার বিবরণ।

৭. ডিরেক্টর প্রভৃতির কাছে তলবী অর্থ পাওনা থাকলে তারও বিশদ বিবরণ।

৮. ডিরেক্টর প্রভৃতিকে শেয়ারবিক্রয় বাবদ কোন দস্তুরি দেওয়া হলে বা দেয় থাকলে তার বিশদ বিবরণ।

বিধিবদ্ধ সভায় উপস্থিত সভ্যগণ বিধিবদ্ধবিবরণীর অন্তর্গত কোম্পানীর গঠন প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করতে পারেন, কিন্তু আগে সে মর্মে নোটিশ না দেওয়া হলে এরূপ কোন বিষয়ে প্রস্তাব পাস করতে পারেন না।

বিধিবদ্ধ সভা ও বিধিবদ্ধ বিবরণী সম্পর্কে কোম্পানী আইনের বিধান অমান্য করার অপরাধে কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক বা অন্যান্য পদস্থ কর্মচারিগণ ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হতে পারেন।

খ. বার্ষিক সাধারণ সভা[54]: কোম্পানীর নিবন্ধনের পর ১৮ মাসের মধ্যে তার শেয়ারহোল্ডারগণের প্রথম সাধারণ সভা আহ্বান করা বাধ্যতামূলক। তার পরে নিয়মিতভাবে বিগত সাধারণ সভার ১৫ মাসের মধ্যে পরবর্তী সাধারণ সভা আহ্বান করতে হয়। কিন্তু তা প্রতি আর্থিক বৎসর[55] শুরু হওয়ার ৯ মাসের মধ্যে ডাকা উচিত। বার্ষিক সভা আহ্বানের জন্য ২১ দিন আগে শেয়ারহোল্ডারগণের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে হয়। এই বিজ্ঞপ্তির সাথে কোম্পানীর অবস্থা সম্পর্কে পরিচালকগণ কর্তৃক প্রস্তুত একটি বিবরণ প্রচার করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির সাথে প্রতিনিধি নিয়োগ পত্রের একটি ফরম্[56] পাঠান হয়। কেউ সভায় উপস্থিত হতে না পারলে ঐ ফরম্ পূরণ করে ফরমটি সহ তার প্রতিনিধি হিসাবে অপর কেহকে সভায় পাঠাতে পারে। ঐ ব্যক্তি ঐ ফরমের বলে প্রেরকের পক্ষে ভোট দান করতে পারে।

এই সভা আর্টিক্ল্স্-এ বর্ণিত নিম্নলিখিত মামুলী কার্যাবলী সম্পাদন করে

51. Shareholders' meeting.
52. Statutory meeting.
53. Statutory Report.
54. Annual General Meeting.
55. Financial Year.
56. Proxy form.

থাকেঃ ১. পরিচালকপর্ষৎ ও হিসাবপরীক্ষকগণ কর্তৃক পরিবেশিত রিপোর্ট আলোচনা ও গ্রহণ করা।

২. হিসাব আলোচনা করা।

৩. লভ্যাংশ মঞ্জুর করা।

৪. পরিচালকগণ ও হিসাবপরীক্ষকগণ নির্বাচন করা।

৫. হিসাবপরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা।

গ. অতিরিক্ত সাধারণ সভা[৫৭]ঃ . কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনের আগে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের প্রয়োজন দেখা দেয় তা হলে সেজন্য শেয়ারহোল্ডারগণের যে সভা আহ্বান করা হয় তা অতিরিক্ত সাধারণ সভা বলে পরিচিত। এই সভা পরিচালকগণ ডাকতে পারেন অথবা এই সভা আহ্বানের জন্য আদায়-কৃত পুঁজির এক দশাংশের অধিকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক পরিচালকপর্ষৎ বিধি-মত অনুরুদ্ধ বা অধিযাচিত[৫৮] হতে পারেন। পরিচালকপর্ষৎ এই সভা ডাকতে ব্যর্থ হলে, শেয়ারহোল্ডারগণ নিজেরাই সভাটি ডাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে ঐ সভার যাবতীয় ন্যায্য ব্যয় কোম্পানী বহন করবে। কোম্পানী অবশ্য তা পরিচালকপর্ষদের কাছে থেকে আদায় করতে পারে।

কোম্পানীর বহিসমূহ
BOOKS OF THE COMPANY

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী কোম্পানীগুলি যে সমস্ত খাতা ও বই রাখতে বাধ্য, তাদের বিধিবদ্ধ বহি[৫৯] বলে। এই সকল বহি অর্থাৎ খাতাপত্র দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—ক. কোম্পানী বহিসমূহ[৬০] এবং খ. আর্থিক হিসমূহ[৬১]

ক. কোম্পানী বহিসমূহঃ

১. শেয়ারহোল্ডারগণের রেজিস্টার বা তালিকা বহি[৬২]। ২. পরিচালকগণের রেজিস্টার বা তালিকাবহি[৬৩]। ৩. বন্ধক ও তমসুকের রেজিস্টার বা তালিকাবহি[৬৪]। ৪. চুক্তিসমূহের রেজিস্টার বা তালিকাবহি[৬৫]। ৫. পরিচালকগণের শেয়ারের রেজিস্টার বা তালিকাবহি[৬৬]। ৬. সভার কার্য-বিবরণী বহি[৬৭]। ৭. শেয়ার-হোল্ডারগণের বাৎসরিক তালিকাবহি[৬৮]। ৮. বিনিয়োগের রেজিস্টার বা তালিকা-বহি[৬৯]।

খ. আর্থিক বহিসমূহঃ

১. আয়-ব্যয়, ক্রয়-বিক্রয় এবং কোম্পানীর সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব বহিপত্র[৭০]।

২. ব্যালান্স সীট ও প্রফিট অ্যান্ড লসের আকারে প্রকাশিত কোম্পানীর হিসাব-পত্র[৭১]।

বিধিবদ্ধ বহি ব্যতীত কোম্পানীর আরও কতকগুলি হিসাব বহি থাকতে পারে। সেগুলিকে **'ঐচ্ছিক বহি'**[৭২] বলে। যথা,—

১. শেয়ার-আবেদন ও শেয়ার-বিলিকরণ বহি[৭৩]। ২. শেয়ার সার্টিফিকেট বহি[৭৪]। ৩. তলবী-বহি[৭৫]। ৪ শেয়ার হস্তান্তর বহি[৭৬]। ৫. লভ্যাংশের

57. Extraordinary General Meeting. 58. Requisition.
59. Statutory Books. 60. Company's Set. 61. Financial Set.
62. Register of Members. 63. Register of Directors.
64. Register of Mortgages & charges. 65. Register of Contracts.
66. Register of Directors' Shareholding. 67. Minute Book.
68. Annual List and Summary Book. 69. Register of Investment.
70. Books of Accounts relating to receipts, expenditures, all sales and purchases and assets and liabilities of the company.
71. Published accounts in the form of balance-sheet and profit and loss account. 72. Optional Books.
73. Application and Allotment Book. 74. Share Certificate Book.
75. Call Book. 76. Share Transfer Book.

হিসাব বহি[77]। ৬. ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের তালিকা বহি[78]। ৭. ডিবেঞ্চারের সুদ বহি[79]। ৮. কোম্পানীর সীলমোহর বহি[80]। ৯. সভার বিষয়সূচী বহি[81]। ১০. পরিচালকগণের উপস্থিতি বহি[82]। ১১. আদালত কর্তৃক প্রমাণিত উইলের নকল বহি[83]।

১৯৬৫ সালে গৃহীত ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের একটি সংশোধনীতে হিসাব বহির অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি নতুন উপধারা সংযোজিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, উৎপাদন, পরিবর্তন, নির্মাণ বা খনিজ উত্তোলন কার্যে নিযুক্ত কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ থাকলে, জিনিসপত্র ও শ্রমিকগণের ব্যবহার এবং উৎপাদন ব্যয়ের অন্যান্য দফা সম্পর্কে বিবরণ হিসাব বহির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

77. Dividend Book. 78. Register of Debenture Holders.
79. Debenture Interest Book. 80. Common Seal Book.
81. Agenda Book. 82. Directors' Attendance Book.
83. Register of Probates.

৭

কোম্পানীর অর্থসংস্থান
CORPORATE FINANCE

অর্থ সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা (NEED FOR FINANCE)

সাধারণত, যে কোনও কারবারে, বিশেষত শিল্প সংস্থায় যে সব কারণে অর্থের প্রয়োজন হয় তা হলঃ

১. কারখানার জমি কেনা বা লীজ্ নেওয়া এবং তাতে কারখানা, অফিস, গুদাম ইত্যাদি নির্মাণ করা।

২. যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম আসবাবপত্রাদি কেনা।

৩. কারবারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।

৪. কাঁচামাল কেনা ও কাঁচামালের যোগানদারগণকে দাদন দেওয়া।

৫. তৈয়ারী দ্রব্য মজুত করা।

৬. তৈয়ারী দ্রব্যাদি ধারে বিক্রয় করা।

৭. শ্রমিক-কর্মচারিগণের নিয়মিত মজুরি ও বেতন দেওয়া ও দৈনন্দিন ব্যয়ের সংস্থান করা।

৮. আকস্মিক প্রয়োজন।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্যে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা পরিমাণে যেমন বেশি, তেমনি তা কারবারে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এজন্য এদের স্থায়ী সম্পত্তি[১] ও এদের জন্য যে অর্থ লাগে তাকে স্থায়ী পুঁজি[২] বলে।

চতুর্থ থেকে অষ্টম পর্যন্ত উদ্দেশ্যে যে অর্থ খরচ করতে হয়, তা কারবার চালাতে গেলে বারংবার প্রয়োজন হয়। এইরূপ ব্যয়ের দ্বারা কারবারের চল্‌তি সম্পত্তি[৩] সৃষ্টি হয় ও স্বল্পকালের মধ্যেই আবার তা নগদ অর্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এজন্য যে অর্থ লাগে তাকে কারবারের চলতি পুঁজি[৪] বলে।

স্থির পুঁজির জন্য অর্থের সংস্থানকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থ সংস্থান[৫] ও চল্‌তি পুঁজির জন্য অর্থের সংস্থানকে স্বল্পমেয়াদী অর্থ সংস্থান[৬] বলে।

অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ (SOURCES OF FINANCE)

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীরূপে গঠিত কারবারের স্থির পুঁজি ও চল্‌তি পুঁজির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী অর্থের সংস্থান নিম্নলিখিত উৎসগুলি থেকে হয়ে থাকে ঃ

১. শেয়ার বিক্রয় দ্বারা আদায়ীকৃত শেয়ার পুঁজি[৭]।

২. ডিবেঞ্চার বিক্রয় দ্বারা লব্ধ ঋণ পুঁজি[৮]।

৩. জনসাধারণের নিকট থেকে পাওয়া স্থায়ী আমানত[৯]।

৪. ব্যাঙ্ক থেকে সংগৃহীত ঋণ।

৫. রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত নানারূপ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ।

৬. কারবারের মুনাফার বিনিয়োগ[১০]।

---

1. Fixed Assets. 2. Fixed or Block Capital. 3. Current Assets.
4. Working Capital. 5. Long term finance. 6. Short term Finance.
7. Share Capital. 8. Debenture Loan Capital.
9. Fixed Deposit. 10. Ploughing back of Profit.

১. শেয়ার বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত শেয়ার পুঁজি[11] ঃ নতুন কোম্পানীকে শেয়ার বিক্রয় করেই প্রাথমিক পুঁজির সংস্থান করতে হয়। নব-গঠিত কোম্পানীর ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র কিনে কেউ তাকে ঋণ দিতে চায় না। কারণ, তখনকার অবস্থায় কোম্পানীর জামিনযোগ্য সম্পত্তি বিশেষ কিছু থাকে না।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হলে তা জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে না, কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী প্রকাশ্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন করে তার শেয়ার বিক্রয় করে শেয়ার পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে।

শেয়ার বিক্রয় করে পুঁজি সংগ্রহের সুবিধা এই যে,—১. শেয়ার হল কোম্পানীর মালিকানার অংশ। যাঁরা কারবারী ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক, তারা এতে অর্থ বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়। ২. রিডিমেব্‌ল্‌ প্রেফারেন্স শেয়ার বাদে অন্য সকল প্রকার শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থই যতদিন কোম্পানী চালু থাকে ততদিন কোম্পানীতে খাটানো যায়। এটা হল কোম্পানীর স্থায়ী পুঁজি। ৩. শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা যে সম্পত্তি ক্রয় করা হয়, প্রয়োজন হলে তা জামিন রেখে কোম্পানী ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। ৪. ঋণ করলে কোম্পানীর দায় জন্মে। কিন্তু শেয়ার বিক্রয় দ্বারা কোম্পানীর দায় না জন্মে সম্পত্তি জন্মে। ৫. শেয়ারগুলি সাধারণত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হয় বলে ধনী গরিব সকলেই তা কিনে লাভজনকভাবে তাদের সঞ্চয় খাটাতে পারে। কোম্পানীও এক সঙ্গে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। ৬. বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি-সম্পন্ন শেয়ার বিক্রয় করে বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি বহনে ইচ্ছুক মানুষকে কোম্পানীতে টাকা খাটাতে আকৃষ্ট করা যায়।

২. ডিবেঞ্চার বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত ঋণ পুঁজি[12] ঃ কোম্পানী তার শেয়ার পুঁজি খাটিয়ে কারবারের প্রতিষ্ঠা লাভের ও সুনাম অর্জনের পর, কারবারের সম্প্রসারণের জন্য আরও অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বিক্রয় করতে পারে। সম্পূর্ণ নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তাধীনে ডিবেঞ্চার বিলি করা হয় এবং তার উপর প্রদেয় সুদ নির্দিষ্ট থাকে। কোম্পানীর মুনাফা হোক বা না হোক ডিবেঞ্চারের উপর সুদ অবশ্যপ্রদেয়। ডিবেঞ্চার সাধারণত দীর্ঘমেয়াদের জন্য বিলি করা হয় এবং তার দ্বারা কোম্পানী নিজের দায় বা দেনা সৃষ্টি করে। ডিবেঞ্চার বিলি করতে হলে কোম্পানীকে এর ভবিষ্যৎ আয়ের স্থিরতা[13] সম্বন্ধে সুনিশ্চিত এবং তার হাতে যথেষ্ট সম্পত্তি থাকা চাই।

এর সুবিধা এই যে,—১. যারা ডিবেঞ্চার কেনে তারা কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন কর্তৃত্বের অধিকারী হয় না। আগের মতই কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ কোম্পানীর প্রয়োজনীয় অর্থের সুনিশ্চিত সংস্থান হয়। ২. ঋণপত্রের উপর প্রদেয় সুদ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ থাকে বলে উন্নতিশীল কোম্পানীতে এর দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করলে, সাধারণ শেয়ারের উপর প্রদেয় লভ্যাংশের হার বাড়ান যায়। ৩ লগ্নীপত্র হিসাবে ডিবেঞ্চার প্রেফারেন্স শেয়ার থেকে ভাল। কারণ, উভয়েরই আয় সীমাবদ্ধ, অথচ ডিবেঞ্চার সাধারণত কোন সম্পত্তির জামিনে বিলি করা হয় (যেমন জামিনবদ্ধ ডিবেঞ্চার[14]), কিন্তু প্রেফারেন্স শেয়ার বিলির জন্য কোন সম্পত্তি জামিন রাখা হয় না। ৪ এই পদ্ধতিকে সর্বাপেক্ষা সুলভে ঋণ সংগ্রহের পন্থারূপে গণ্য করা হয়।

৩. আমানত গ্রহণ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ[15] ঃ অতীতে অনেক সময় ভারতের কোম্পানীগুলি তাদের ম্যানেজিং এজেন্টদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ দ্বারা[16] বা সরাসরি নির্দিষ্ট শর্তে জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ[17] করে অর্থের সংস্থান করেছে। দিয়াশলাই, কাগজ, চিনি প্রভৃতি শিল্পে প্রাইভেট ডিপজিট

11. Share Capital. 12. Debenture Capital. 13. Stability.
14. Secured Debenture. 15. Acceptance of Deposit.
16. Private Deposit. 17 Public Deposit.

দ্বারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সংগৃহীত হয়েছিল। বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিতে পাবলিক ডিপজিট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এই পদ্ধতিতে অর্থ সংস্থানের সুবিধা এই যে,—১. এর দ্বারা সুলভে অর্থসংস্থান করা যায়। ২. যারা আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি হিসাবে আমানত রাখে, তারা কোম্পানীর স্থায়িত্ব এবং উন্নতি সম্পর্কে আগ্রহী হয় বলেই আমানতী হিসাব খোলে। সুতরাং কোম্পানীর প্রতিকূল অবস্থা দূর না হওয়া পর্যন্ত তারা আমানতী অর্থ তুলে নেয় না। একারণে এই প্রকার প্রাইভেট ডিপজিট কোম্পানীগুলিকে বিপদে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কিন্তু এর অসুবিধা এই যে,—১. কোম্পানী সম্পর্কে আমানতকারিগণের মনে বিন্দুমাত্র আশংকা জন্মালে, তৎক্ষণাৎ তারা আমানত তুলে ফেলতে পারে। তাতে কোম্পানীর আকস্মিক বিপদ হতে পারে। এজন্য এরূপ আমানতী অর্থকে "সুদিনের বন্ধু"[১৮] বলা হয়েছে। ২. এইরূপে অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি প্রচলিত থাকায়, কোম্পানীগুলি নিজেদের আয়ত্তাধীন ও নির্ভরযোগ্য কোন অর্থসংস্থানের উৎস সৃষ্টিতে উৎসাহিত হয়নি। ৩. এই পদ্ধতি এ দেশে পুঁজির বাজারের উন্নয়নে বাধা দিয়েছে।

৪. **যৌথমূলধনী ব্যাংক থেকে অর্থসংগ্রহ**[১৯] : অন্যান্য দেশের মত ভারতের যৌথমূলধনী ব্যাংকগুলি শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত কোম্পানীগুলির শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনে তাদের স্থির পুঁজি না যোগালেও, তাদের স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়ে কম সাহায্য করে নি। বর্তমানে স্টেট ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকগুলি ক্রমেই এক্ষেত্রে বেশি অগ্রসর হচ্ছে।

৫. **রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ**[২০] : অন্যান্য দেশে শিল্পে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি সরবরাহকারী বিশেষ ধরনের অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশে শিল্পসমূহকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে স্থির পুঁজি সরবরাহ করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও উৎসাহে নানারূপ অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে। এ সম্পর্কে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন, স্টেট ফিনান্স করপোরেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন, ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এ ছাড়া স্টেট ব্যাংক ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং রিজার্ভ ব্যাংকও মাঝারি আয়তনের শিল্পগুলিকে নানা প্রকারে আর্থিক সাহায্য করছে। এরা কোম্পানীগুলিকে,— ১. সরাসরি কম বেশি ২৫ বৎসরকাল পর্যন্ত মেয়াদে ঋণ দেয়; ২. নিজেরা জামিনদার হয়ে অন্যত্র থেকে কোম্পানীগুলিকে ঋণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করে; ৩. কোম্পানীগুলির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কিনে শেয়ার ও ঋণ পুঁজি যোগায় ; ৪. কোম্পানীগুলির শেয়ার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করে থাকে। সম্প্রতিকালে এই সব প্রতিষ্ঠান শিল্পের অর্থসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬. **কারবারে মুনাফা বিনিয়োগ**[২১] : কোম্পানীর অর্জিত মুনাফার সবটা শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বণ্টন না করে তার একাংশ বা সমস্তই কারবারের সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। একে 'অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থান'[২২], 'স্বয়ং অর্থসংস্থান'[২৩] বা 'মুনাফার বিনিয়োগ'[২৪] বলে।

এতে **সুবিধা** এই যে,—১. এতে কারবারের আর্থিক সামর্থ্য যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তেমনি ঋণের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় না ও তৎসংক্রান্ত নানারূপ অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। ২. এতে যেমন কোম্পানীর কোন দায় সৃষ্টি হয় না, তেমনি যাদের নিকট থেকে ঋণসংগ্রহ করতে হত, সেরূপ ঋণদাতার সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে কোম্পানী রক্ষা পায়। ৩. এতে সহজেই সম্প্রসারণ সম্ভব বলে কোম্পানীর আয় এবং বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ বাড়ে।

---

18. Fair weather friend.
19. Joint Stock Banks.
20. Financial Institutions.
21. Ploughing Back of Profit.
22. Internal Financing.
23. Self-Financing.
24. Ploughing back of Profit.

কিন্তু এর অসুবিধা এই যে,—১. এতে কোম্পানী প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ করে ফেলতে পারে। একে 'অতি-পুঁজিকরণ'[২৫] বলে। এরফলে লভ্যাংশ হ্রাস পেতে পারে। ২. ক্রমাগত মুনাফা কারবারের বিনিয়োগ করা হতে থাকলে, যে সকল শেয়ার হোল্ডারগণ নিয়মিত লভ্যাংশের আশায় শেয়ার কিনেছে, তারা নিরাশ হবে। ৩. এতে অল্প সময়ের মধ্যে অতি বৃহদাকার একচেটিয়া শিল্প সাম্রাজ্যের জন্ম ঘটতে পারে।

ভারতে সম্প্রতিকালে অর্থসংস্থানের এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯৪৬-৫১ সালের মধ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পুঁজির ৬৬১/২ শতাংশ ও প্রথম পরিকল্পনাকালে ৮০ শতাংশ এই উৎস থেকে সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে ভারত সরকারের নীতিও হচ্ছে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে এই উৎসটি থেকে শিল্পসম্প্রসারণের পুঁজি সংগ্রহে উৎসাহ দেওয়া।

পুঁজির বিধিবদ্ধ শ্রেণীবিভাগ ঃ আইনের দিক থেকে কোম্পানীর বা যৌথকারবারের পুঁজিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়,—

১. **অনুমোদিত, নিবন্ধনকৃত অথবা অভিহিত পুঁজি**[২৬] ঃ নিবন্ধক কর্তৃক মেমোরাণ্ডামে উল্লিখিত যে পরিমাণ পুঁজি শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা সংগ্রহ করতে কোম্পানীকে অধিকার দেওয়া হয়, তাই উপরোক্ত বিভিন্ন নামে পরিচিত।

২. **নিয়োজ্য বা বিলিযোগ্য পুঁজি**[২৭] ঃ অনুমোদিত পুঁজির যে অংশ জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করার জন্য উপস্থিত করা হয় তাকে নিয়োজ্য অথবা বিলিযোগ্য পুঁজি বলা হয়।

৩. **প্রতিশ্রুত বা বিলিকৃত পুঁজি**[২৮] ঃ বিলিযোগ্য পুঁজির যে অংশ জনসাধারণ কিনবে বলে আবেদন করেছে তাই হল প্রতিশ্রুত অথবা বিলিকৃত পুঁজি।

৪. **তলবী পুঁজি**[২৯] ঃ বিলিকৃত পুঁজির যে অংশ প্রদানের জন্য শেয়ারের ক্রেতাগণের নিকট আহবান করা হয়, তাই তলবী পুঁজি। প্রতিশ্রুত অথবা বিলিকৃত পুঁজি এবং তলবী পুঁজির মধ্যে পার্থক্য থাকলে, তাকে অ-তলবী পুঁজি[৩০] বলে।

৫. **আদায়ীকৃত পুঁজি**[৩১] ঃ তলবী পুঁজিব যে অংশ প্রকৃতপক্ষে আদায় করা হয়েছে তাকে আদায়ীকৃত পুঁজি বলে।

৬. **সংরক্ষিত পুঁজি**[৩২] ঃ যদি কখনও অ-তলবী পুঁজির[৩৩] অংশ বিশেষ একমাত্র কোম্পানীর বিলোপসাধনের সময় ছাড়া আদায় করা হবে না, এই মর্মে বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, সেক্ষেত্রে অ-তলবী পুঁজির ঐ অংশকে সংরক্ষিত পুঁজি[৩৪] বলে। এবং তখন শেয়ারের ঐ অ-তলবী অংশের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণের দায়কে সংরক্ষিত দায়[৩৫] বলা হয়।

অনাদায়ী তলবী অর্থ এবং অগ্রিম তলবী অর্থ[৩৬] ঃ তলবী অর্থের যে অংশ শেয়ারহোল্ডাররা দেয় নি তা অনাদায়ী তলবী অর্থ এবং তলবী অর্থপ্রদানের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেয়ারহোল্ডাররা তা জমা দিলে তাকে অগ্রিম তলবী অর্থ বলা হয় ।

শেয়ার SHARES :

কোম্পানীর পুঁজিকে তার গুণিতক কতকগুলি সমপরিমাণ এককে ভাগ করে তার প্রত্যেকটিকে এক একটি শেয়ার বলা হয়।

প্রত্যেকটি শেয়ার, পুঁজির অংশ বলে তা কিনে শেয়ারহোল্ডার কোম্পানীর আংশিক মালিকানা লাভ করে এবং তার বলে কোম্পানীর লভ্যাংশের অধিকারী হয়। কোম্পানীর

25. Over-Capitalisation.
26. Authorised or Registered or Nominal Capital.
27. Issued Capital. 28. Subscribed Capital.
29. Called up Capital. 30. Uncalled Capital.
31. Paid up Capital. 32 Reserve Capital.
33. Uncalled Capital. 34. Reserve Capital. 35. Reserve Liability.
36. Calls in arrear or Calls unpaid and Calls paid in Advance.

।বলোপসাধন ঘটলে শেয়ারহোল্ডাররা তাদের প্রদত্ত পুঁজি ফেরত পাওয়ার অধিকারী হয়। শেয়ারগুলি আর্টিকল্‌সের নির্দেশমত হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি বলে গণ্য হয়।

শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ: ১৯৬৫ সালের ভারতের কোম্পানী আইনে বলা হয়েছে, ঐ আইনটি প্রচলিত হওয়ার পর তদনুযায়ী ভারতে লিমিটেড কোম্পানীগুলির শুধু প্রেফারেন্স শেয়ার ও ইকুইটি শেয়ার এই দুই প্রকার শেয়ার থাকবে।
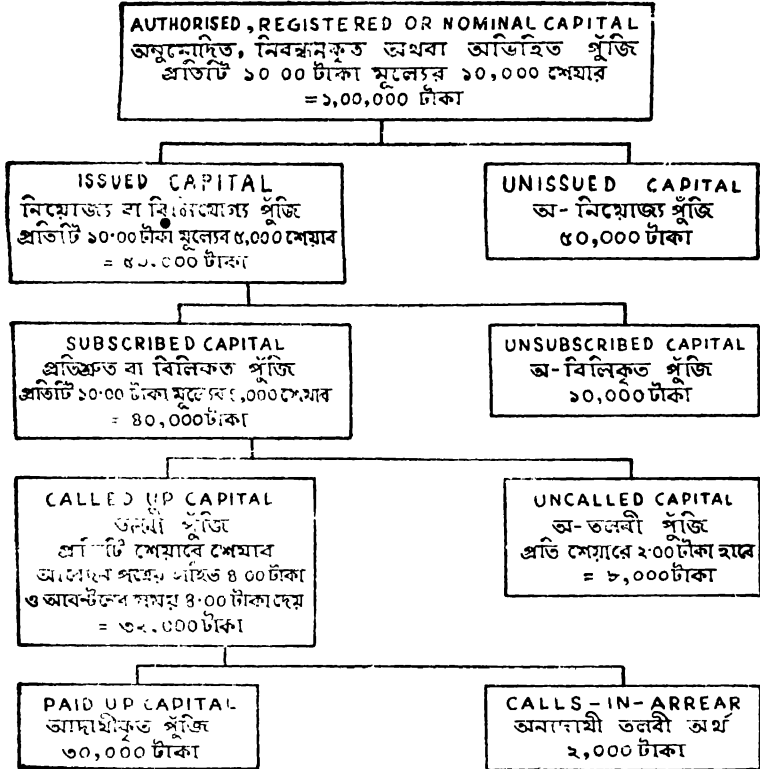
১. প্রেফারেন্স শেয়ার বা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার[৩৭] : কোম্পানী আইন অনুযায়ী পুঁজির যে অংশ লভ্যাংশ বণ্টনের সময় এবং কোম্পানী উঠে গেলে পুঁজি ফেরত পাওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার ভোগ করে তা প্রেফারেন্স শেয়ার নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর শেয়ারের লভ্যাংশের হার আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডার-দেরা মধ্যে আগে লভ্যাংশ বণ্টনের পর তবে অপরাপর শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। সাধারণত এই শ্রেণীর শেয়ারের দাম বেশি হয়।

প্রেফারেন্স শেয়ারগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

১. ক. সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার [৩৮] : কোন বৎসর কোম্পানীর লাভ না হলে এই জাতীয় শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ জমা থাকে এবং পরবর্তী বৎসরের মুনাফা থেকে অতীত এবং বর্তমান উভয় বৎসরের লভ্যাংশের দাবি মিটান হয়। এমনকি পর পর কয়েক বৎসর লাভ না হলেও যে বৎসর লাভ হবে, সে বৎসরের মুনাফা থেকে আগের সমস্ত বকেয়া লভ্যাংশ আগে মিটিয়ে দিতে হয়।

১. খ. অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার[৩৯] : এই জাতীয় শেয়ারহোল্ডাররা

37. Preference Shares. 38. Cumulative Preference Shares.
39. Non-Cumulative Preference Shares.

কেবলমাত্র চলতি বৎসরের মুনাফা থেকে লভ্যাংশ পাওয়ার অগ্রাধিকার ভোগ করে। মুনাফা না হলে তাদের লভ্যাংশ জমা থাকে না এবং পরবর্তী বৎসরের মুনাফা থেকে তা দেওয়া হয় না।

প্রেফারেন্স শেয়ারের আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগও করা হয়ঃ

১· গ· **পরিশোধ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার**[40]**ঃ** আর্টিক্‌ল্‌সে উল্লেখ থাকলে এই শ্রেণীর প্রেফারেন্স শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট সময়ের শেষে ফেরত দেওয়া হয়। ভারতের কোম্পানী আইনের ১০৫ ধারার 'বি' উপধারাতে এই জাতীয় শেয়ার বিক্রয়ের উপর শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

১· ঘ· **অপরিশোধ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার**[41]**ঃ** এ প্রকার প্রেফারেন্স শেয়ারের মূল্য কখনই ফেরত দেওয়া হয় না।

প্রেফারেন্স শেয়ারকে আরও এক প্রকার শ্রেণীবিভক্ত করা হয়ঃ

১. ঙ. **নির্দিষ্ট হারে অংশভাগী অগ্রাধিকার শেয়ার**[42]**ঃ** এই শ্রেণীর শেয়ারের মালিকরা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশের অতিরিক্ত মুনাফা পাওয়ার অধিকারী। আর্টিক্‌ল্‌সে উল্লিখিত ব্যবস্থামত অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের সাথে তারা মুনাফার বাকী অংশের সম্পূর্ণ অথবা সীমাবদ্ধ ভাগ পাওয়ার অধিকার লাভ করে।

১· চ· **অনির্দিষ্ট হারে অংশভাগী অগ্রাধিকার শেয়ার**[43]**ঃ** যে শ্রেণীর শেয়ারের মালিকরা পূর্বনির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করার সুবিধা পায় না, তা অনির্দিষ্ট হারে অংশভাগী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে পরিচিত।

প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকরা অন্যান্য শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারদের তুলনায় কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করলেও, কোম্পানীর সভায় তারা সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার ভোগ করে। সাধারণত ঐ সভায় শুধুমাত্র তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়েই তারা ভোট দিতে পারে। অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে তাদের ভোটাধিকার থাকে না। তবে, যদি পর পর দুই বৎসর তাদের লভ্যাংশ দেওয়া না হয়, তা হলে তারা অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের মত যাবতীয় বিষয়েই ভোট দিতে পারে।

ইকুইটি শেয়ার (EQUITY SHARES)

এই শ্রেণীর শেয়ারের মালিকরা প্রেফারেন্স শেয়ারের লভ্যাংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট মুনাফা থেকে লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকার ভোগ করে। তেমনি কোম্পানীর বিলোপ সাধনের পর প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকদের পুঁজি ফেরত দেওয়ার পর তাদের দাবি মেটান হয়। এদের লভ্যাংশের হার অনির্দিষ্ট। এইজন্য কোম্পানীর মুনাফা কম হলে এরা স্বল্পহারে লভ্যাংশ পায়। মুনাফা সামান্য হলে মোটেই কোন লভ্যাংশ পায় না। আবার মুনাফা বেশি হলে, নির্দিষ্ট হারে প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টনের পর এদের মধ্যে উচ্চহারে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়ে থাকে। সাধারণত কোম্পানীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশের হার বাড়ে ও তার ফলে এই শ্রেণীর শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকদের মত এদের মালিকদের ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ নয়।

বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার (DEFERRED SHARES)

কোম্পানীর মুনাফা থেকে অন্যান্য শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ বণ্টনের পর এই শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। তেমনি কোম্পানীর বিলোপ সাধিত হলে অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের দাবি মেটাবার পর এদের দাবি মেটান হয়। এই শ্রেণীর শেয়ার সাধারণত কোম্পানীর প্রবর্তক বা উদ্যোক্তাদের মধ্যে অথবা যারা কোম্পানীর কাছে তাদের কারবার বিক্রয় করে দেয়[44],

---

40. Redeemable Preference Shares.
41. Irredemable Preference Shares.
42. Participating Preference Share.
43. Non-participating Preference Share.
44. Vendors.

তাদের অথবা শেয়ারের দায়গ্রাহকদের দেওয়া হয়। এদের নামমাত্র মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়। মেমোরান্ডাম এবং আর্টিক্ল্‌সে নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী এদের বিলি করা হয় ও মুনাফাতে এবং কারবার বিলুপ্তির পর কারবারের সম্পত্তিতে এদের দাবি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এদের মালিকদের কোম্পানীর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়ার জন্যই এই জাতীয় শেয়ার বিলি করা হয়।

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে, ঐ আইন কার্যকর হওয়ার পরে গঠিত কোন পাবলিক কোম্পানী আর এই শ্রেণীর শেয়ার বিক্রয় করতে পারে না।

বোনাস শেয়ার (BONUS SHARES)

অনেক সময় কোম্পানীর সঞ্চিত তহবিলে[45] সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি হয়ে পড়লে, ঐ অতিরিক্ত সঞ্চয়কে কোম্পানীর পুঁজিতে পরিণত করে সে বাবদ পূর্ণমূল্যের নতুন শেয়ার পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিলি করা হয়। এইজন্য শেয়ার-হোল্ডারদের আর দাম দিতে হয় না। এই জাতীয় শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বলে। কখনও কখনও নির্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত দামে শেয়ার বিক্রয় করে যে অতিরিক্ত অর্থ[46] আদায় করা হয় তা থেকেও এই বোনাস শেয়ার বিলি করা হয়ে থাকে। তবে, যে ক্ষেত্রে অনুমোদিত মূলধনের সম্পূর্ণ ভাগই শেয়ার বিক্রয় করে সংগ্রহ করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে এরূপ বোনাস শেয়ার বিলি করতে গেলে, যেহেতু পুঁজির পরিমাণ অনুমোদিত পুঁজি অপেক্ষা বেশি হয়ে পড়ে, সেজন্য আগে পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আইন-অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের সম্মতি প্রয়োজন হয় এবং মেমোরান্ডাম সংশোধন করতে হয়। তবে, বিলিযোগ্য এবং বিলিকৃত পুঁজির পরিমাণ অনুমোদিত পুঁজি অপেক্ষা কম হলে, শুধু কোম্পানীর সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করেই বোনাস শেয়ার বিলি করা চলে। অনেক সময় আবার আদায়ীকৃত পুঁজি বিলিকৃত পুঁজি অপেক্ষা কম হলে, তা সঞ্চয় তহবিলের অতিরিক্ত অর্থের দ্বারা পূরণ করা হয় এবং পূর্ণ মূল্যের শেয়ারহোল্ডার-দের মধ্যে বিলি করা হয়। একে শুধুমাত্র বোনাস বলে।

স্টক (STOCK)

কোম্পানীর মোট পুঁজি সম্পূর্ণভাবে আদায় হলে তা 'স্টকে' পরিণত করা যায়। তখন তা যে কোন ক্ষুদ্র অংশে টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। অনেক সময় শেয়ারের পূর্ণমূল্য আদায় হলে শেয়ারপুঁজিকে[47] স্টক পুঁজিতে[48] পরিণত করা হয়। অবশ্য এ সম্পর্কে আর্টিক্‌লসে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা আবশ্যক। তেমনি আবার আর্টিক্ল্‌সে উল্লেখ থাকলে স্টক পুঁজিকে শেয়ার পুঁজিতে রূপান্তরিত করা হয়। তবে, এই সকল ক্ষেত্রে সর্বদাই রেজিস্টারকে নোটিস দ্বারা এক মাসের মধ্যে জানাতে হয়। এইরূপ পরিবর্তনের দ্বারা শেয়ার বা স্টকহোল্ডারদের স্বার্থ কোন-প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় না।

শেয়ারের বেলায় মোট পুঁজিকে কতকগুলি নিম্নতম, সমমূল্যের অবিভাজ্য এককে বিভক্ত করে ঐ অবিভাজ্য এককগুলিকে শেয়ার বলা হয়। কিন্তু স্টকের ক্ষেত্রে, মোট পুঁজিকে সমসংখ্যক কতকগুলি স্বল্প পরিমাণ নির্দিষ্ট টাকার এককে প্রকাশ করা হয়। যেমন শেয়ারের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ টাকার পুঁজি ১০,০০০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত করে তার প্রতিটির মূল্য ১০টাকা ধার্য করা যেতে পারে। কিন্তু স্টকের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ টাকার পুঁজি মোট আদায় হলে বা তার পূর্ণ মূল্য একবারে আদায়ের ব্যবস্থা হলে তাকে ৫, ১০, ২০ টাকা প্রভৃতির স্টকে বিভক্ত করা যায় এবং ঐ হিসাবেই তাদের লেনদেন চলে।

45. Reserve Fund.
46. Premium. 47. Share Capital. 48. Stock Capital.

স্টক ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য

শেয়ার	স্টক
১· শেয়ারের মূল্য আংশিক বা সম্পূর্ণ-রূপে প্রদত্ত হতে পারে[49]।	১· স্টকের মূল্য সম্পূর্ণরূপে আদায়ী-কৃত[50] হওয়া আবশ্যক।
২· শেয়ারগুলির নির্দিষ্ট ক্রমিক নম্বর থাকে।	২. স্টকের কোন নম্বর থাকে না।
৩· শেয়ারগুলি অবিভাজ্য বলে সর্বদাই পূর্ণ বা অভগ্ন অংশে[51] হস্তান্তর করা হয়।	৩· স্টকের ভগ্নাংশে হস্তান্তর ঘটতে পারে।
৪· শেয়ারের মূল্য সর্বদাই নির্দিষ্ট থাকে।	৪· স্টকের কোন নির্দিষ্ট মূল্য থাকে না।

পুঁজি সংগ্রহের অর্থাৎ শেয়ার বিলির শর্তাদি
TERMS OF ISSUE OF CAPITAL

কোম্পানীর আর্টিক্‌ল্‌সে শেয়ার বিলির যাবতীয় শর্তাদি লিপিবদ্ধ থাকে।

শেয়ারগুলি মুদ্রিত দামে, নির্ধারিত দামে[52], তার বেশি দামে[53] অথবা তার চেয়ে কিছু কম দামে[54] বিক্রয় হতে পারে। নির্ধারিত দামের নিচে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন কর্তৃক কোন বিধিনিষেধ আরোপিত নাই।

কোম্পানী আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট নিম্নলিখিত অবস্থাতে নির্ধারিত দামের কমে শেয়ার বিক্রয় করা চলেঃ

ক· কোম্পানীটি অন্ততঃ এক বৎসরের পুরাতন হওয়া আবশ্যক।

খ· ডিসকাউন্টের বা বাট্টার হার কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডাগণের সাধারণ সভায় পাস করিয়ে সে সম্পর্কে আদালতের অনুমতি নিতে হয়।

গ· কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া বাট্টার হার শতকরা ১০ টাকার বেশি হতে পারে না।

ঘ. আদালতের অনুমতি প্রাপ্তির দুইমাসের অথবা আদালতের অনুমতিপ্রাপ্ত বর্ধিত সময়ের[55] মধ্যে শেয়ার বিলি করতে হবে।

ঙ· যে শ্রেণীর শেয়ার ইতিপূর্বে বিক্রয় করা হয়েছে, শুধু সেই শ্রেণীর শেয়ারের ক্ষেত্রে বাট্টা দেওয়া যেতে পারে।

নির্ধারিত দামের অতিরিক্ত দামে শেয়ার বিক্রয় হলে তার দ্বারা যে অতিরিক্ত অর্থ বা প্রিমিয়াম পাওয়া যায়, কোম্পানী আইন মতে তা কোম্পানী গঠনের প্রাথমিক খরচ[56] নির্বাহ অথবা পূর্ণ আদায়ীকৃত মূল্যের শেয়ার[57] বিলি ছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

শেয়ার আবণ্টন (ALLOTMENT OF SHARES)

কোম্পানী যে বিবরণপত্র[58] বিলি করে তার সাথে শেয়ার কেনার আবেদনের একটি ফরম থাকে। যিনি শেয়ার কিনতে চান তিনি তা পূরণ করে তার সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার আবেদন অর্থ[59] কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা কোম্পানী কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন। এর পর কোম্পানীর শেয়ার কিনতে আবেদন করার শেষ তারিখ পার হওয়ার পর কোম্পানীর পরিচালকগণের একটি

---

49. Partly or fully paid up. 50. Fully paid up. 51. Whole number.
52. At face value or at par. 53. At a premium.
54. At a discount. 55. Extended time. 56 Preliminary Expenses.
57. Fully paid up shares. 58. Prospectus. 59. Application money.

সভা ডাকা হয়। ঐ সভায় পরিচালকরা আবেদনকারীদের আবেদন বিবেচনা করে তাদের মধ্যে শেয়ার বণ্টন করবেন। কোন আবেদন সম্পূর্ণ বা অংশত গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণ নাকচ করা পরিচালকগণের ইচ্ছাধীন। সে জন্য আবেদনকারিদের কাছে কোম্পানী কোন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়। পরিচালকগণের ঐ সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা আবেদনকারিগণের মধ্যে শেয়ার বণ্টন কাজটি সম্পাদিত হয়। এই হল শেয়ার আবণ্টন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কোম্পানীর বিবরণ পত্র ও আর্টিক্‌ল্‌সে যে ন্যূনতম সংখ্যক শেয়ার বিলির কথা উল্লিখিত হয়, তার চেয়ে কম সংখ্যক শেয়ারের আবেদন পত্র জমা পড়লে শেয়ার আবণ্টন করা যায় না। পরিচালকদের সভায় শেয়ার আবণ্টনের প্রস্তাব গ্রহণের পর কোম্পানীর সেক্রেটারী, যাদের মধ্যে শেয়ার বণ্টন করা হল তাদের কাছে একটি চিঠি দিয়ে এই সংবাদ জানান। এই চিঠিকে আবণ্টন পত্র[৬০] বলে। আর যারা বঞ্চিত হল তাদের কাছে অক্ষমতা জানিয়ে একটি চিঠি[৬১] পাঠান হয় ও তাঁরা যে 'শেয়ার' আবেদন অর্থ পাঠিয়েছিলেন তা ফেরৎ দেওয়া হয়।

শেয়ার আবণ্টনের উপর বিধি নিষেধ (RESTRICTION AS TO ALLOTMENT)

যথাসম্ভাবে গঠিত পরিচালকপর্ষদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে শেয়ার আবণ্টন করা হলে, তবেই শেয়ার আবণ্টন বৈধ হয়। শেয়ার আবণ্টন বিষয়ে ১৯৫৬ সালে কোম্পানী আইন দ্বারা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর উপর চারটি বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে শেয়ার আবণ্টন করার আগে দেখতে হবে যে—

১. বিবরণে পত্রে যে ন্যূনতম শেয়ার বিলির পরিমাণ ঘোষণা করা হয়েছে, ঐ পরিমাণ শেয়ারেব আবেদন পত্র এসেছে।

২. কোম্পানীর নিবন্ধকের নিকট কোম্পানীর বিবরণ পত্র অথবা তার বিকল্পে বিবরণ দাখিল করা হয়েছে।

৩. শেয়ারেব আবেদনকারীরা কমপক্ষে আবেদনকৃত শেয়ারগুলি লিখিত বা নামিক মূল্যের[৬২] পাঁচ শতাংশ শেযার আবেদন অর্থ হিসাবে নগদ জমা দিয়েছে।

৪. আবেদনকারীদের কাছ থেকে শেয়ার আবেদন পত্রের সাথে যে শেয়ার আবেদন অর্থ পাওয়া গেছে তার সমস্তই কোম্পানীর নির্দিষ্ট একটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে।

যদি আইন নির্দিষ্ট উপরোক্ত শর্তগুলি অমান্য করে শেয়ার আবণ্টন করা হয়, তবে ঐ আবণ্টন অনিয়মিত আবণ্টন[৬৩] বলে গণ্য হবে। এরূপ ক্ষেত্রে, কোম্পানীর বিধিবদ্ধ সভা[৬৪] অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দুই মাসের মধ্যে শেয়ার আবেদনকারী ইচ্ছা করলে ঐ শেয়ার আবণ্টন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। আর কোম্পানীর পরিচালকরা ইচ্ছা পূর্বক ঐ শর্তগুলি অমান্য করলে, তাঁরা, কোম্পানী এবং শেয়ার আবেদনকারীদের কোন ক্ষতি ঘটলে তা পূরণ করতে দায়ী থাকবেন। তবে ঐ আবণ্টনের তারিখ থেকে দুই বৎসরের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দাবি উপস্থিত করতে হবে।

শেয়ার সার্টিফিকেট (SHARE CERTIFICATE)

পরিচালকপর্ষৎ কর্তৃক শেয়ার আবণ্টনের[৬৫] এবং প্রাপকের[৬৬] নাম কারবারের অংশীদার হিসাবে নিবন্ধনের[৬৭] পর তিন মাসের মধ্যে নাম, ঠিকানা, পেশা ও ক্রমিক নম্বর সহ শেয়ারের সংখ্যা এবং প্রদত্ত অর্থ[৬৮] ইত্যাদি বিবরণ সহ একটি দলিল শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়। এই দলিলটি শেয়ার সার্টিফিকেট নামে পরিচিত।

এই সার্টিফিকেট কারবারের সাধারণ সীলমোহর[৬৯], উপযুক্ত স্ট্যাম্প, ও অন্তত

---

60. Letter of Allotment.
61. Letter of regret. 62. Nominal value. 63. Irregular allotment.
64. Statutory meeting. 65. Share allotment. 66. Allottee.
67. Registration. 68. Amount paid up. 69. Common seal.

এক জন পরিচালকের সইযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। উল্লিখিত ব্যক্তি কারবারের শেয়ার-হোল্ডার এবং তিনি বর্ণিত শেয়ার সম্পর্কে নিজ বুদ্ধি বিবেচনা মত কাজ করিবার অধিকারী, কোম্পানীর শেয়ার সার্টিফিকেট এই কথাই ঘোষণা করে।

শেয়ার বিক্রয়ের সময় বিক্রয়কারী হস্তান্তরের নির্দিষ্ট ফরম্[70] পূরণ ও স্বাক্ষর করে তৎসহ শেয়ার সার্টিফিকেট ক্রেতাকে দিয়ে দেয়।

শেয়ার সার্টিফিকেট হারিয়ে গেলে, তার নকল[71] পাওয়ার জন্য উক্ত শেয়ার-হোল্ডারকে একটি ক্ষতিপূরণ পত্র[72] সই করে ডিরেক্টারদের কাছে আবেদন পত্র দাখিল করতে হয়। ক্ষতিপূরণ পত্র সই দাখিল করার উদ্দেশ্য এই যে, মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের নকল বিতরণের জন্য কোম্পানী কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ঐ ক্ষতিপূরণ পত্রের বলে কোম্পানী ঐ শেয়ারহোল্ডারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

শেয়ার ওয়ারেন্ট (SHARE WARRANT)

পূর্ণমূল্যে আদায়ীকৃত শেয়ারের[73] ক্ষেত্রে অবশ্য 'আর্টিক্ল্সে' এ সম্পর্কে বিধান থাকলে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার ওয়ারেন্ট বিলি করা যায়। তা বিলি করতে হলে, কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা বই[74] থেকে শেয়ারহোল্ডারের নাম কেটে দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে একথা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য যে, শেয়ার সার্টিফিকেটের মালিককে কোম্পানীর সদস্য বলে গণ্য করা হয় কিন্তু 'আর্টিক্ল্সে' এ বিষয়ে উল্লেখ না থাকলে শেয়ার ওয়ারেন্টের মালিককে কোম্পানীর সভ্য বলে গণ্য করা হয় না। শেয়ার ওয়ারেন্ট কতকগুলি ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত শেয়ারের উল্লেখ সহ একটি দলিল বিশেষ এবং সেটা যার কাছে থাকে তাকেই ঐ শেয়ারগুলির মালিক বলে গণ্য করা হয় । স্টকের্ ক্ষেত্রেও তা বিলি করা যেতে পারে । এটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল[75] বলে গণ্য করা হয়।

শেয়ার ওয়ারেন্টের সাথে কতকগুলি কুপন সংযুক্ত থাকে। কোম্পানী ডিভিডেন্ট ঘোষণা করলে, ঐ কুপন দাখিল করে শেয়ার ওয়ারেন্টে উল্লিখিত শেয়ার অনুযায়ী প্রাপ্য লভ্যাংশ আদায় করতে হয় । একমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীগুলিই শেয়ার ওয়ারেন্ট বিলি করতে পারে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী এই অধিকার থেকে বঞ্চিত।

শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ (FORFEITURE OF SHARES)

ভারতীয় কোম্পানী আইনে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই বটে, 'আর্টিক্ল্স্ অব এসোসিয়েশন'-এর দ্বারা এ সম্পর্কে ক্ষমতা দেওয়া হলে, কোম্পানী তলবী অর্থ[76] অনাদায়ের দরুন শেয়ার বাজেয়াপ্ত করতে পারে; তবে এ ক্ষেত্রে "আর্টিক্ল্সে" উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী শেয়ার বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, অন্যথায় ঐ বাজেয়াপ্তকরণ বাতিল[77] হয়ে যায়। সাধারণত এ সকল ক্ষেত্রে পরিচালক পর্ষৎ সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারকে ১৪ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ জমা দেওয়ার জন্য আদেশ দেয়। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে টাকা জমা না পড়লে, পরিচালকপর্ষৎ প্রস্তাব গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি বাজেয়াপ্ত করে থাকে।

শেয়ারহোল্ডারগণের ভোটাধিকার (VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

কোম্পানী আইনে পাবলিক কোম্পানী বা কোনও পাবলিক কোম্পানীর অধীন প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারগণকেই কোম্পানীর সভায় উপস্থাপিত সকল প্রকার প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রেফারেন্স

---

70. Share Transfer Form. 71. Duplicate. 72. Indemnity Bond.
73. Fully paid up shares. 74. Shareholders' Register.
75. Negotiable Instrument. 76. Call money. 77. Void.

শেয়ারহোল্ডারগণ সাধারণত কেবলমাত্র দুইটি ক্ষেত্রে ভোটাধিকার ভোগ করে থাকে—ক. প্রত্যক্ষভাবে তাদের স্বার্থ প্রভাবিত করছে এরূপ কোনও প্রস্তাব উপস্থাপিত হলে, এবং খ. কোম্পানীর বিলোপসাধনকালে। তবে তাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ সম্পূর্ণ বা আংশিক বাকী[78] **পড়লে তারা সর্বপ্রকার প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই ভোটাধিকার ভোগ করে।**

ইকুইটি ও প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডাররা তাদের কেনা শেয়ারের দরুন প্রদত্ত অর্থের অনুপাতে ভোটাধিকার ভোগ করে। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন প্রচলিত হওয়ার পর প্রাইভেট কোম্পানী ছাড়া আর কোনও কোম্পানী অসমানুপাতিক[79] ভোটাধিকারযুক্ত কোন শেয়ার বিলি করতে পারে না। এবং এই আইনে অতিরিক্ত[80] ভোটাধিকারের ব্যবহারও আইনত দণ্ডনীয় করা হয়েছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার অবস্থা বিশেষে এ থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন।

ডিবেঞ্চার
DEBENTURES

ঋণসংগ্রহের ক্ষমতা ও পদ্ধতি : কোম্পানীর পুঁজি কম পড়লে ঋণের সাহায্য নিতে পারে। সাধারণত চলতি বা আবর্তিত পুঁজির অভাব হলেই নূতন শেয়ার বিক্রয়ের পরিবর্তে কোম্পানীগুলি ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বিক্রয় করে ঋণ সংগ্রহ করে। ডিবেঞ্চার বিক্রয় দ্বারা ঋণ সংগ্রহের প্রথা ও পদ্ধতি এবং কোম্পানীর এ সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা গেল।

১. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত কারবার[81] ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কোম্পানী আইনের দ্বারা ঋণ করার অনুক্ত ক্ষমতা[82] পায় নি।

২. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রাপ্তির পূর্বে ঋণ করতে পারে না। কিন্তু প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীগুলি নিবন্ধন পত্র প্রাপ্তির পরই ঋণ করতে পারে।

৩. ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি সম্বন্ধে আর্টিক্‌ল্‌সে বিস্তারিত নিয়মাবলী ও নির্দেশ দেওয়া থাকে। ঐ সকল নিয়ম অনুসারে ঋণ সংগ্রহ করতে হয়।

ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র : সাধারণত মাঝারি অথবা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হলেই কোম্পানীগুলি ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বিলি বা বিক্রয় করে ঋণ সংগ্রহ করে থাকে।

কোম্পানীর নাম ও সীলমোহরযুক্ত ঋণ পরিশোধ এবং প্রদেয় সুদ সম্পর্কে শর্তাবলী সহ যে দলিলে তার মালিকের নিকট থেকে গৃহীত ঋণের স্বীকৃতি থাকে তাই ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র নামে পরিচিত।

ডিবেঞ্চারের শ্রেণীবিভাগ

জামিন অনুযায়ী ডিবেঞ্চারকে নিম্নোক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১. **সাধারণ ডিবেঞ্চার**[83] **:** কোম্পানীর কোন বিশেষ সম্পত্তি জামিন হিসাবে না রেখে যে ডিবেঞ্চার বিলি করা হয়, তাকে সাধারণ ডিবেঞ্চার বলে। এর আসল ফেরত ও সুদ প্রদান সম্পর্কে নিশ্চয়তা নেই বলে এই শ্রেণীর ডিবেঞ্চার জনপ্রিয় নয়।

২. **বন্ধকী ডিবেঞ্চার**[84] **:** কোম্পানীর কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তি যেমন, যন্ত্রপাতি, বাড়ি বা জমি ইত্যাদি জামিন রেখে যে ডিবেঞ্চার বিলি করা হয়, তাকে বলে বন্ধকী ডিবেঞ্চার। এইরূপে নির্দিষ্ট সম্পত্তি জামিন রাখার তাৎপর্য এই যে, কোম্পানী উঠে গেলে, ঐ বিশেষ সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে সর্বাগ্রে এই শ্রেণীর ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের দাবি মেটাতে হয়। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে আসল ফেরত ও সুদ প্রদান সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকে বলে এগুলি বেশি জনপ্রিয়।

---

78. Arrear. 79. Disproportionate. 80. Excess.
81. Trading Company. 82. Implied Authority.
83. Naked or Ordinary Debenture. 84. Mortgage Debenture.

এই বন্ধকী সম্পত্তির উপর ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের দাবি দুই প্রকারের হতে পারে। প্রথমত জামিন হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করতে গেলে যে ক্ষেত্রে পরিচালকগণকে ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের অনুমতি নিতে হয়, সে ক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তির উপর ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের স্থিরদাবি[৮৫] আছে বলে গণ্য হয়। দ্বিতীয়ত, যে ক্ষেত্রে পরিচালকগণ ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের বিনানুমতিতে, কিন্তু কারবারের স্বার্থে, জামিন হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করতে পারে, সে ক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তির উপর ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের অ-স্থির দাবি[৮৬] রয়েছে বলে গণ্য হয়।

ঋণ পরিশোধের দিক থেকেও ডিবেঞ্চারের আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা চলে:

১. পরিশোধ্য ডিবেঞ্চার[৮৭]: যে ডিবেঞ্চারের দ্বারা সংগৃহীত ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা থাকে, তাকে পরিশোধ্য ডিবেঞ্চার বলে। ডিবেঞ্চারে বর্ণিত ব্যবস্থামত এই ঋণ পরিশোধ করা হয়। এবং তা পরিশোধের জন্য একটি সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করা যেতে পারে অথবা, নূতন ডিবেঞ্চার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ডিবেঞ্চার পরিশোধ করাও চলে।

২. অ-পরিশোধ্য ডিবেঞ্চার[৮৮]: আর এক শ্রেণীর ডিবেঞ্চার আছে যার টাকা, একমাত্র কোম্পানী উঠে না গেলে অথবা, সময়মত সুদ প্রদানে ব্যর্থ না হলে, কোম্পানী ফেরত দিতে বাধ্য নয়। একে অ-পরিশোধ্য ডিবেঞ্চার বলে।

আবার ডিবেঞ্চার রেজিস্ট্রিকৃত কি না, সে অনুযায়ীও তার আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

১. রেজিস্ট্রিকৃত ডিবেঞ্চার[৮৯]: যে শ্রেণীর ডিবেঞ্চারে কোম্পানী কর্তৃক ক্রমিক সংখ্যা বসান হয়, ডিবেঞ্চারের মধ্যে তার হোল্ডার বা মালিকের নাম লিখিত থাকে এবং কোম্পানী কর্তৃক হোল্ডারগণের তালিকা রাখা হয়, তাকে রেজিস্ট্রিকৃত ডিবেঞ্চার বলে। এই শ্রেণীর ডিবেঞ্চার হস্তান্তর করতে গেলে কোম্পানীকে জানাতে এবং হস্তান্তর দলিল[৯০] সম্পাদন করতে হয়। ঐ দলিল ও ডিবেঞ্চার কোম্পানীর নিকট জমা দিলে, ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের তালিকা সংশোধন করে কোম্পানী নূতন ডিবেঞ্চার প্রদান করে।

২. অ-রেজিস্ট্রিকৃত ডিবেঞ্চার[৯১]: যে শ্রেণীর ডিবেঞ্চারে কোন ক্রমিক সংখ্যা থাকে না ও যার হস্তান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক জটিলতা নাই, তাকে অ-রেজিস্ট্রিকৃত ডিবেঞ্চার বলে।

শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের তুলনা

ডিবেঞ্চার	শেয়ার
১. ডিবেঞ্চার কোম্পানীর ঋণ বলে গণ্য।	১. শেয়ার কোম্পানীর পুঁজির অংশ।
২. ডিবেঞ্চারহোল্ডার কোম্পানীর মহাজন।	২. শেয়ারহোল্ডার কোম্পানীর মালিক।
৩. ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণ সাধারণত কোম্পানীর পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না।	৩. শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকারী।
৪. কোম্পানীর লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন, ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণ তার অংশ ভোগ বা বহন করে না। তারা শুধু নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়ার অধিকারী।	৪. শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর মুনাফার অংশ ভোগের অধিকারী তেমনি লোকসানও তারাই বহন করে।

85. Fixed Charge. 86. Floating Charge. 87. Redeemable Debenture.
88. Irredeemable Debenture. 89. Registered Debenture.
90. Transfer Deed. 91. Un-Registered Debenture.

ডিবেঞ্চার	শেয়ার
৫. সাধারণত ডিবেঞ্চারগুলির অর্থ ফেরত দেওয়া হয়।	৫. রিডিমেবল বা পরিশোধ্য প্রেফারেন্স শেয়ার ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় শেয়ারের টাকা সাধারণত কোম্পানীর কার্যকালে ফেরত দেওয়া হয় না।
৬. কারবারের বিলুপ্তি সাধনের সময় ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের দাবি শেয়ারহোল্ডারগণের আগে পূরণ করা হয়।	৬. বিলুপ্তি সাধনের সময় কোম্পানীর সর্বপ্রকার ঋণ পরিশোধের পর শেয়ারহোল্ডারগণের দাবি বিবেচ্য।

পুঁজিবিন্যাস (CAPITAL GEARING)

ভাবী কোম্পানীর পুঁজির পরিমাণ স্থির করার পর, তাতে ইকুয়িটি শেয়ার পুঁজি, প্রেফারেন্স শেয়ার পুঁজি, ও ডিবেঞ্চার পুঁজি, এই তিনটির অনুপাত স্থির করতে হয়। এদের যথোপযুক্ত অনুপাত স্থির করা কঠিন। পুঁজির কাঠামোর তিনটি অংশের এই অনুপাতকে এককথায় পুঁজিবিন্যাস বলে। মোট পুঁজিতে অন্যান্য শ্রেণীর পুঁজির তুলনায় ইকুয়িটি শেয়ার-পুঁজির অনুপাত অল্প হলে তাকে উচ্চবিন্যস্ত পুঁজি[৯২] ও মোট পুঁজিতে অন্যান্য শ্রেণীর পুঁজির তুলনায় ইকুয়িটি শেয়ার পুঁজির অনুপাত বেশি হলে তাকে নিম্নবিন্যস্ত পুঁজি[৯৩] বলে॥ কোন কোম্পানীতে পুঁজি উচ্চবিন্যস্ত থাকলে সেখানে ইকুয়িটি শেয়ারহোল্ডারদের উচ্চতর হারে লভ্যাংশ পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকে। কারণ, তখন মোট মুনাফা থেকে সীমাবদ্ধ অংশ মাত্র প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার ও ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের মধ্যে বন্টনের পর বাকী সমস্তটাই ইকুয়িটি শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বন্টন করা হয়। এই প্রকার পুঁজিবিন্যাসে, ইকুয়িটি শেয়ার নিয়ে ব্যাপক ফট্‌কা কারবার চলার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতপক্ষে পুঁজি কাঠামোর অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে আদর্শ অনুপাত বলে কিছু নাই। আসল কথা হল এই যে, শিল্পটির বিশেষ প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানটির আয়তন, প্রয়োজনীয় পুঁজির পরিমাণ, সুদের হার, জামিনযোগ্য সম্পত্তি, বাজারের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি বিবেচনা করে ব্যবস্থাপকগণকে এরূপ অনুপাতে বিভিন্ন অংশগুলিকে বিভক্ত করতে হয় যেন, তার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ও যথাসম্ভব ব্যয়সংকোচের সাথে কোম্পানীর কারবার চালানো সম্ভব হতে পারে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, যখন কোম্পানীর মুনাফা সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা থাকে না অথবা, যখন মুনাফা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে তখন ইকুয়িটি শেয়ার বিলি করাই সংগত। অপরপক্ষে, যদি কোম্পানী দেখে যে, তার মুনাফা কমছে কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সুনিশ্চিত থাকে যে অন্তত তার গড়পড়তা মোটামুটি মুনাফা হবেই, তা হলে, প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করা সংগত হতে পারে। কিন্তু, যদি কোম্পানীর মুনাফা উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দরকার হয় এবং কোম্পানী যদি সুনিশ্চিত থাকে যে, বরাবর তার আয়ের স্থিরতা থাকবে, তা হলে অল্প খরচে ঋণ পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডিবেঞ্চার বিলি করাই উচিত হতে পারে।

তবে, আবার বাজারের তেজী অবস্থা থাকলে বিনিয়োগকারিরা ইকুয়িটি শেয়ারে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়, এবং কোম্পানীর উপর করভার বেশি থাকলে সেক্ষেত্রে শেয়ার অপেক্ষা ডিবেঞ্চার বিলি করাই সুবিধাজনক।

লভ্যাংশ (DIVIDEND)

শেয়ারক্রয়ের দ্বারা পুঁজি সরবরাহকারীদের মধ্যে কারবারের মুনাফার যে অংশ বন্টন করা হয় তাকে লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড বলে।

---

92. High-geared capital. 93. Low-geared capital.

হিসাব পরীক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করে কোম্পানীর মুনাফা অনুযায়ী পরিচালকপর্ষৎ লভ্যাংশের হার সম্বন্ধে শেয়ারহোল্ডারগণের সভায় সুপারিশ করেন। সভায় এ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট হয়। কোম্পানী আইনানুযায়ী লভ্যাংশ ঘোষণার তিনমাসের মধ্যে শেয়ারহোল্ডার অথবা তার নির্দেশমত ব্যক্তিকে প্রাপ্য লভ্যাংশ দিতে হয়।

অন্তবর্তী লভ্যাংশ (INTERIM DIVIDEND)

আর্টিক্‌ল্‌সে এ বিষয়ে নির্দেশ থাকলে, এবং পরিচালকপর্ষৎ যদি মনে করে যে চূড়ান্ত বাৎসরিক লভ্যাংশও একই হারে দেওয়া সম্ভব হবে, তা হলে তারা শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভার অনুমতি ছাড়াই, দুইটি এইরূপ সভার অন্তর্বর্তীকালে অতিরিক্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারে। একে অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ বলে।

লগ্নীপত্রাদি বিক্রয়
MARKETING OF SECURITIES

লগ্নীপত্র বিক্রয়ের বিবিধ পদ্ধতি (METHODS OF SELLING SECURITIES)

নিম্নোক্ত নানাবিধ উপায়ে কোনও কোম্পানী উহার লগ্নীপত্রসমূহ অর্থাৎ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করতে পারেঃ

১. বিবরণপত্র মারফত বিক্রয়[94]: সাধারণত পাবলিক কোম্পানীগুলি বিবরণপত্র মারফত জনসাধারণকে শেয়ার কিনতে আহ্বান জানায়। ভারতে প্রাইভেট কোম্পানীর পক্ষে এই পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হয় না কিন্তু পাবলিক কোম্পানীর পক্ষে এটা আবশ্যক। তবে, তারা বিবরণপত্র বিলির পরিবর্তে তার বিকল্প বিবৃতিও প্রকাশ করতে পারে। সাধারণত, কোম্পানীর পরিচালকবর্গ প্রবর্তকগণ প্রভৃতি নিজেরা, কোম্পানীর বিবরণপত্র বিলির আগেই কিছু শেয়ার গ্রহণ করে বাকি অংশ জনসাধারণের কাছে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করে।

এর সুবিধা এই যে, কোম্পানী সরাসরিভাবে জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হয় ও তাতে মধ্যবর্তী কোন দালালের দ্বারস্থ ও তার কাছে দায়বদ্ধ হতে হয় না। কিন্তু এর **অসুবিধা** এই যে, এতে যে পরিমাণ শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হয় তার সবই যে বিক্রয় হবে তার কোন নিশ্চয়তা থাকে না, এবং এমনকি ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেয়ার পর্যন্ত বিক্রয় না হতেও পারে। তা ছাড়া, এই পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয়ের খরচ বেশি পড়ে।

২. শেয়ার দালাল মারফত বিক্রয়[95]: সম্প্রতিকালে শেয়ার বেচাকেনায় পারদর্শী ও অভিজ্ঞ একদল বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে। এদের মধ্যে আছে ব্যক্তি এবং বীমা কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি। এরা শেয়ার বিক্রয়ের দালালরূপে কাজ করে ও সেজন্য কমিশন পায়। আজকাল অনেক পাবলিক কোম্পানীই এই প্রকার শেয়ার-দালালের মারফত শেয়ার বিক্রয় করা পছন্দ করে। কারণ, এর সুবিধা এই যে, শেয়ার বিক্রয়কারী কোম্পানী এদের কাছ থেকে অভিজ্ঞ পরামর্শ পায় এবং এই সব শেয়ার-দালালরা কোম্পানীর শেয়ার-বিক্রয় করার কার্যে তাদের সহায়-সম্পদ নিয়োগ করে সাহায্য করে। তা ছাড়া, এতে শেয়ার বিক্রয়ের খরচ কম পড়ে। কিন্তু এর অসুবিধা এই যে, এই পদ্ধতিতেও যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাবতীয় লগ্নীপত্র কিংবা ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শেয়ার বিক্রয় হয়ে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা থাকে না বা শেয়ার বিক্রয়কারী দালালরা ঐ মর্মে কোন গ্যারান্টী দেয় না। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে বেশি পরিমাণে লগ্নীপত্র বিক্রয়ের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত নয়।

94. Selling through Prospectus. 95. Selling through share-brokers.

৩. দায়গ্রাহক মারফত বিক্রয়[96]**ঃ** শেয়ারের দালাল, লগ্নীকারী প্রভৃতি কারবারী অথবা ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মত অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান অনেক সময় যৌথমূলধনী কারবারের প্রবর্তকগণের সাথে কোম্পানীর বিলিযোগ্য সিকিউরিটির সমগ্র অথবা অংশবিশেষ বিক্রয় এবং অবিক্রীত সিকিউরিটির খরিদের প্রতিশ্রুতি পালনে চুক্তিবদ্ধ হয়। এদের দায়গ্রাহক এবং এই চুক্তিকে দায়গ্রহণ চুক্তি[97] বলে। এই কাজের পরিবর্তে দায়গ্রাহকরা শেয়ারের মোট দামের অনধিক শতকরা ৫ ভাগ এবং ডিবেঞ্চার হলে, তার দামের অনধিক শতকরা ২½ ভাগ পর্যন্ত কমিশন হিসাবে কোম্পানীর নিকট থেকে পারিশ্রমিক পেতে পারে। কোম্পানীর আর্টিকল্সে এই জাতীয় পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা থাকা এবং কোম্পানীর বিবরণ পত্র বা প্রসপেক্টাসে তা উল্লেখ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। সিকিউরিটির কোন অংশ বিক্রয় করতে অক্ষম হলে দায়গ্রাহকরা নিজেরাই তা খরিদ করতে বাধ্য থাকে।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায়গ্রহণকার্য বহুল প্রচলিত এবং বড় বড় কোম্পানীগুলির অধিকাংশ সিকিউরিটিই দায়গ্রাহকগণের মারফত বিক্রয় হয়ে থাকে। দায়গ্রাহকরা সেখানে কোম্পানীর পুঁজি সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু ভারতে অল্প কিছুকাল আগেও তা প্রচলিত ছিল না বললেই হয়। তবে বর্তমানে দায়গ্রহণকার্য ভারতেও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।

ভারতে দায়গ্রাহকগণের মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানই রয়েছে। ভারতের শিল্প ঋণদান কর্পোরেশন[98] এবং রাজ্যশিল্প ঋণদান কর্পোরেশনসমূহ[99] সিকিউরিটি বিক্রয়ের দায়গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শিল্প ঋণদান ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন[100] দায়গ্রাহক হিসাবে উল্লেখযোগ্য'। এ ছাড়া অন্যান্য যে সকল কারবারী প্রতিষ্ঠান এই কার্যে নিযুক্ত, তাহাদের মধ্যে Siddon & Gouh, Mungirum Bangour & Co., Batliwala & Karnani ও Kothari & Sons উল্লেখযোগ্য।

সিকিউরিটি বিক্রয়ের দায়গ্রহণকার্যের গুরুত্ব ঃ পাশ্চাত্য দেশগুলির ব্যাপক শিল্পোন্নতির পশ্চাতে দায়গ্রাহকগণের আবেদন বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বস্তুতপক্ষে পুঁজির বাজারে[101] পুঁজির সংগ্রহ কার্যে বিশেষজ্ঞ হিসাবে এদের কাযর্কর সহযোগিতা ছাড়া বিরাট বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে সক্ষম হত কিনা সন্দেহ। সিকিউরিটি বিক্রয় করে বিশেষত নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলির পুঁজি সংগ্রহ কার্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারে উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদানকারী হিসাবে, এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী বলে গণ্য করা হয়।

ক· পুঁজি সংগ্রহের নিশ্চয়তা ঃ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তার কোন অংশ বিক্রি না হলে নিজেই তা কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়গ্রাহক কোম্পানীর প্রবর্তকদের সিকিউরিটি বিক্রয়ের ও তারদ্বারা পুঁজি সংগ্রহের নিশ্চয়তা দেয়।

খ· অযথা কালক্ষেপ পরিহার ঃ দায়গ্রাহকদের সাহায্যে শেয়ার প্রভৃতি বিক্রয় করতে গেলে, সাধারণত তাদের কাছ থেকে সেসনের দামের একাংশ প্রথমেই অগ্রিম বাবদ[102] এবং বকেয়া অর্থ একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। সুতরাং দায়গ্রাহকদের সাথে চুক্তিনামা সম্পাদনের পরই প্রবর্তকরা কোম্পানী চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিতে পারে। অর্থের জন্য অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করতে হয় না। কোম্পানীর কারবার চালু করতে দেরী হয় না।

গ· সমগ্র পুঁজি সংগ্রহ ঃ সমগ্র সিকিউরিটি বিক্রয় হোক বা না হোক, নির্দিষ্ট

96. Selling through Underwriter. 97. Underwriting Agreement.
98. Industrial Finance Corporation.
99. State Industrial Finance Corporation.
100. Industrial Credit & Investment Corporation.
101. Capital Market. 102. Advance.

সময়ের মধ্যে তাদের সম্পূর্ণ দাম পরিশোধের জন্য দায়গ্রাহকরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে বলে, এই পদ্ধতিতে যে পরিমাণ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়, তাদের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় হয়ে থাকে। এর ফলে প্রবর্তকরা কোম্পানীর কাজে তাদের পরিকল্পনামত অগ্রসর হতে পারে।

ঘ· পুঁজি সংগ্রহের কাজে অভিজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ পরামর্শ : দায়গ্রাহকরা পুঁজি সংগ্রহের কাজে বিশেষজ্ঞ। কতটা পরিমাণে, কোন কোন শ্রেণীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কি কি মূল্যে বিক্রয় করা উচিত, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে এরা কোম্পানীর প্রবর্তকদের যথেষ্ট উপকার করে এবং এ সম্পর্কে গুরুতর ভুলের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে।

ঙ. সহজে সিকিউরিটি বিক্রয়ঃ অভিজ্ঞতা ও সততায় খ্যাতিমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ দায়গ্রাহকের নামের সাথে সংযুক্ত থাকলে নূতন এবং অপরিচিত কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার মর্যাদা লাভ করে এবং বিনিয়োগকারিরা বিনা দ্বিধায় তা কিনে বলে অক্লেশে তা বিক্রি হয়ে যায়।

চ· স্থান ও কালানুযায়ী সিকিউরিটি বিক্রয়ঃ স্থান ও কাল সম্বন্ধে বিবেচনা না করে হঠাৎ একসঙ্গে বেশি পরিমাণে শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য কোন একটি মাত্র বাজারে বা অঞ্চলে উপস্থিত করলে, সেখানে আকস্মিক অস্থিরতা ও সিকিউরিটি মূল্যস্তরের অবাঞ্ছিত অবনতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু দায়গ্রাহকদের সাহায্য নিলে তাদের পরামর্শ মত একাধিক পুঁজির বাজারে বা অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে অবস্থানুযায়ী সিকিউরিটি বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় বলে এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

ছ. বিনিয়োগকারীর সুবিধাঃ কোন একটি নব প্রতিষ্ঠিত, অজ্ঞাত ও অখ্যাত কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার যখন সুবিখ্যাত দায়গ্রাহক কর্তৃক বাজারে বিক্রয় হয় তখন ঐ দায়গ্রাহকের সুনামই বিনিয়োগকারিদের ঐ সব সিকিউরিটিতে টাকা বিনিয়োগের নিরাপত্তার এবং লাভের প্রতিশ্রুতি দিযে থাকে। এইরূপে নিজ সুনামের দ্বারা দায়গ্রাহকগণ বিনিয়োগকারিদের আকৃষ্ট করে তাদের উদ্বৃত্ত অর্থবিনিয়োগের কাজে পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শকের কাজ করে।

৪· লগ্নীকারী মধ্যস্থ মারফত বিক্রয়[103]ঃ অনেক সময় দ্রুত শেয়ার বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোম্পানী তার সমস্ত শেয়ার কোনও সম্পদশালী দায়গ্রাহকের কাছে বা কয়েকজন দায়গ্রাহক নিয়ে গঠিত একটি সিন্ডিকেটের কাছে প্রথমে বিক্রয় করে দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে কোম্পানী কোন বিবরণপত্র প্রচার না করে তাতে যে সমস্ত বিবরণ দিতে হয় তা ঐ দায়গ্রাহক-সিন্ডিকেটের কাছে প্রকাশ করে। সিন্ডিকেট তখন কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার কিনে নেয় ও পরে সুবিধামত সাধারণ বিনিয়োগকারিগণের কাছে ধীরে ধীরে ঐ শেয়ার বিক্রি করে দেয়। এর সুবিধা এই যে, কোম্পানী অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তার বিলিয়োগ্য সমস্ত শেয়ার বিক্রয় করে শেয়ার-পুঁজি সংগ্রহ করে কারবার আরম্ভ করতে পারে এবং শেয়ার বিক্রয়ের সমস্ত ঝুঁকি দায়গ্রাহক-সিন্ডিকেট বহন করে।

৫· ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং প্রকাশ্য আবেদন মারফত বিক্রয়[104] ঃ অনেক সময় সহজে, কম খরচে ও অল্প সময়ে শেয়ার বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন কোন কোম্পানী তার বিলিযোগ্য শেয়ারের একাংশ (যথা ৫১%) ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারিগণের নিকট বিক্রয় করে বাকি অংশ (যথা ৪৯%) জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করার জন্য বিবরণপত্র মারফত আবেদন জানায়।

৬. বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণ মারফত বিক্রয়[105]ঃ বর্তমান কোম্পানী আইন অনুসারে, কোন কোম্পানী তার পুঁজি বাড়ানোর জন্য নূতন শেয়ার বিক্রয় করতে

---

103 Selling through financial Intermediaries.
104. Selling through private-cum-public Collaboration.
105. Selling through existing Shareholders.

চাইলে সর্বপ্রথমে তা বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের কিনতে অনুরোধ করবে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, তাদের পুরাতন শেয়ারের অনুপাতে[১০৬] নূতন শেয়ার বিলি করবে। এইরূপ শেয়ার কেনা না কেনা বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের ইচ্ছাধীন। যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে (সাধারণত ১৫ দিন) কোম্পানীর কাছে শেয়ারহোল্ডারকে তার সিদ্ধান্ত জানাতে হয়। তবে, শেয়ার-হোল্ডারদের কাছে নূতন শেয়ারগুলি বিক্রয় না করে আগে জনসাধারণের কাছে তা বিক্রি করা হোক এই মর্মে শেয়ারহোল্ডাররা যদি বিশেষ প্রস্তাব[১০৭] কিংবা সাধারণ প্রস্তাব[১০৮] পাশ করে ও তা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেন, তবে নূতন শেয়ার প্রথমেই জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করা যেতে পারে।

৭· **কর্মচারিগণের মারফত বিক্রয়**[১০৯] **:** শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের উন্নতি এবং কোম্পানীর কাজে শ্রমিক-কর্মচারীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কোম্পানী তার নূতন বিক্রয়-যোগ্য লগ্নীপত্রের একাংশ শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে বিক্রি করতে পারে এবং সেজন্য কোম্পানী তাদের কিছু অর্থ ঋণস্বরূপও অগ্রিম দিতে পারে।

106. *'Pro rata'.*
107. Special resolution.
108. Ordinary resolution.
109. Selling through Employees.

৮

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা
COMPANY MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানীর মালিক হলেও তাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের সত্তা থেকে কোম্পানীর সত্তা আলাদা বলে আইনত স্বীকৃতি—এই সব কারণে কোম্পানীর দৈনন্দিন কাজ পরিচালনায় অর্থাৎ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে তাদের অধিকার দেওয়া হয় নি। বার্ষিক সাধারণ সভায় বা বিশেষ বা অতিরিক্ত সাধারণ সভায় তারা মিলিত হয়ে কোম্পানীর কারবারের মূল নীতি স্থির বা অনুমোদন করতে পারে মাত্র। মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনাকে এই যে স্বতন্ত্র বা পৃথক করা হয় তা কোম্পানীর একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার থাকে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালক পর্ষদের উপর। সুতরাং বলা যায় যে, বস্তুতপক্ষে পরিচালক পর্ষৎই কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু পরিচালক পর্ষৎ কোম্পানীর কর্মপন্থা ও কর্মনীতি স্থির করলেও পরিচালকদের সকলে কোম্পানীর কাজে সর্বসময় দিতে পারে না বলে ঐ সকল কর্ম-পন্থা ও কর্মনীতিগুলি যে কাজে পরিণত হবে তারা তা সুনিশ্চিত করতে পারে না। অতএব পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্তগুলি যাতে যথাযথভাবে কাজে পরিণত হতে পারে, এবং ঐগুলি যাতে সকল পর্যায়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের জানিয়ে দেওয়া যায়, সেজন্য পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্তগুলি কাজে পরিণত করার দায়িত্ব দিয়ে পরিচালক সংসদের অধীনে ও কোম্পানীর অন্যান্য যাবতীয় কর্মচারিগণের শীর্ষে একটি মুখ্য কর্মনির্বাহক[1] পর্যায়ের কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন আছে। এইরূপে শেয়ারহোল্ডারদের সবিশেষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত হয়। পরিচালক সংসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের একটি অংশ মুখ্যকর্মনির্বাহক পর্যায়ের কর্মীর উপর ন্যস্ত হয় ও মুখ্যকর্ম নির্বাহকের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের উপর ন্যস্ত হয়। স্তর পর-ম্পরায় এই প্রকারে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব উপর থেকে সংগঠনের সকল পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র কাঠামোকে একটি সুসংহত সক্রিয় ও সচল সংগঠনে পরিণত করে। কোম্পানীর মালিকরা অর্থাৎ শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় ও পরি-চালনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে না। তার পরিবর্তে তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অর্থাৎ পরিচালকদের দ্বারা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার কাজ নির্বাহ হয়ে থাকে। এর ফলে কোম্পানীর মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা-পরি-চালনা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আপাতঃদৃষ্টিতে, এর ফলে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় গুরুতর অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে হলেও কার্যক্ষেত্রে পরি-চালক পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকায় ও তার কাজের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভার কাছে দায়ী থাকায় পরিচালক পর্ষদের মারফৎ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সাথে শেয়ারহোল্ডারদের অর্থাৎ কোম্পানীর মালিকদের যোগসূত্র বজায় থাকে বলে এই ত্রুটি খানিক পরিমাণে দূর হয়ে থাকে। এবং পরিচালক পর্ষদের অধীন একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পদস্থ কার্য-

1. Chief Executive.

নির্বাহক কর্মচারীমন্ডলী, এবং তাদের কার্যাবলীর যথাযথ সংযোজন, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা তা আরও অনেকটা পূরণ হয়ে থাকে।

কোম্পানীর মুখ্য কর্মনির্বাহক শ্রেণীর কর্মী নানা প্রকারের হতে পারে। ভারতীয় কোম্পানী আইনের (১৯৫৬) দ্বারা এই শ্রেণীর যে সকল কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা হল ঃ

১. ম্যানেজিং ডিরেক্টার, এবং

২. ম্যানেজার।

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী (FUNCTIONS OF MANAGEMENT)

ব্যবস্থাপক পরিচালক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টার অথবা ম্যানেজার—এদের মধ্যে যার উপরই পরিচালক পর্ষদের পক্ষ থেকে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার ভার অর্পিত হোক না কেন, তাকে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে সব কাজ করতে হয়, তা হল ঃ

১. **পরিচালক পর্ষদের মুখপাত্ররূপে পথপ্রদর্শন ও নির্দেশদান ঃ** পরিচালক পর্ষদের নীতিগুলি ব্যাখ্যা করে তদনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগগুলিকে নির্দেশ দেওয়া, এবং ঐ সকল নির্দেশগুলি কাজে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগীয় পরিকল্পনাগুলি অনুমোদন করা।

২. **বিভিন্ন বিভাগের কার্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ঃ** কোম্পানীর সমগ্র সংগঠনটির বিবিধ অংশ অর্থাৎ বিভাগগুলি যাতে পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে সমতালে সক্রিয় হয়ে ওঠে তা সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন ও সে উদ্দেশ্যে বিভাগীয় উপযুক্ত সুবিধা দান করা, সংগঠনের সকল স্তরের কর্মিগণের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কার্য ও কর্মপরিধি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা ও পদস্থ এবং অধীনস্থ কর্মিগণের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপযোগী উপায় অবলম্বন করা।

৩. **নেতৃত্ব দান ঃ** কোম্পানীর সামনে যে লক্ষ্য রয়েছে তা লাভের জন্য পরিচালক পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি কাজে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সকল স্তরের কর্মিগণের মধ্যে উৎসাহ, একাত্মবোধ[2] ও একত্রে কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি করা।

৪. **কার্যাবলীর সমীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ ঃ** যে সকল কাজ সম্পাদিত হচ্ছে তা যথাযথ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য বিভাগীয় প্রধানদের সাথে আলোচনা ও তাদের বিবরণী মারফত সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করা এবং তার দ্বারা সেগুলির অবিরাম সমীক্ষা[3], নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করা; পরিচালক পর্ষদের কাছে সম্পাদিত কার্যাবলীর সমীক্ষা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী সম্পর্কে বিবরণী পেশ করা; অধস্তন কার্যনির্বাহকগণকে কোম্পানীর অগ্রগতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা এবং অধস্তন কার্যনির্বাহকগণের মতামতগুলি পরিচালক পর্ষদের নিকট পেশ করা ও ব্যাখ্যা করা।

৫. **কর্মিগণের প্রশিক্ষণ ঃ** যাতে কখনও উপযুক্ত সুদক্ষ কর্মীর অভাব না হয় সেজন্য সর্বদাই অধস্তন পর্যায়ের কার্যনির্বাহকগণের ও অন্যান্য শ্রেণীর কর্মিগণের প্রশিক্ষণের[4] ব্যবস্থা করা।

৬. **জনসংযোগ ঃ** কোম্পানীর কর্মনীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সেগুলি সম্পাদনের পক্ষে প্রয়োজনানুযায়ী বিবিধ সরকারী দপ্তরসমূহ, বণিকসঙ্ঘসমূহ, শ্রমিকসঙ্ঘ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

নিচে পরিচালক পর্ষৎ ও বিভিন্ন প্রকারের মুখ্য কর্মনির্বাহক বা ব্যবস্থাপক শ্রেণীর কর্মী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা গেল।

পরিচালক পর্ষৎ (BOARD OF DIRECTOR)

কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহনের জন্য শেয়ারহোল্ডাররা বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে তাদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিচালক

2. Team spirit. 3. Review. 4. Training.

হিসাবে নির্বাচিন করে। নির্বাচিত পরিচালকদের নিয়ে পরিচালক পর্ষৎ গঠিত হয়। পরিচালক পর্ষৎ শেয়ারহোল্ডারদের তরফে কোম্পানীর পরিচালনার ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব বহন করে। পরিচালক নিয়োগের শর্তাবলী আর্টিক্ল্সের বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী দ্বারা নির্ধারিত হয়। পরিচালকদের কোম্পানীর প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয় এবং তাঁরা শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে কাজ নির্বাহ করে। কোম্পানী আইনানুযায়ী পাবলিক এবং প্রাইভেট কোম্পানীর ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা যথাক্রমে তিন ও দুই।

১· নিয়োগ ও অবসরগ্রহণ[5]ঃ শুধুমাত্র কোন ব্যক্তিকেই পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা যায়। কোম্পানীর প্রথম পরিচালকরা প্রবর্তকগণ কর্তৃক নিযুক্ত হয় অথবা, 'আর্টিক্ল্সে' পরিচালক হিসাবে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়। এক্ষেত্রে ঐ উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে পরিচালক হিসাবে কাজ করতে সম্মত, তা লিখিতভাবে নিবন্ধকের কাছে দাখিল করতে হয়। কিংবা এই পদ্ধতি অনুসৃত না হলে, যতদিন পর্যন্ত না শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় পরিচালকরা নির্বাচিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত যারা মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েশন-এ স্বাক্ষর করেছে, তাদের কোম্পানীর প্রথম পরিচালক বলে গণ্য করা হয়।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং তার অধীন[6] যাবতীয় কোম্পানীর ক্ষেত্রে 'আর্টিক্ল্সে' প্রতি বৎসর সমস্ত পরিচালকদের অবসরগ্রহণের কোন নিয়ম গৃহীত না হয়ে থাকলে, কোম্পানী আইনমতে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক পরিচালককে অবশ্যই প্রতি বৎসর অবসর গ্রহণ করতে হবে। পুরাতন পরিচালকদের অবসর গ্রহণের দরুন শূন্যপদ বাৎসরিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

যারা পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্যঃ ১· বিকৃত মস্তিষ্ক ২· দেউলিয়া ৩. দেউলিয়া বলে ঘোষিত হওয়ার জন্য যাদের আবেদন বিবেচনাধীন, ৪· গুরুতর নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে যারা ছয়মাসের দন্ড পেয়েছে। ৫· যাদের তলবী অর্থ অনাদায়ী রয়েছে এবং ৬· যারা আদালতের আদেশের দ্বারা অনুপযুক্ত বলে ঘোষিত হয়েছে—এরূপ ব্যক্তিরা পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলে কোম্পানী আইনে বলা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪র্থ এবং ৫ম ক্ষেত্রে আদালত অব্যাহতি দিতে পারে। এ ছাড়া কোন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ইচ্ছা করলে অযোগ্যতার আরও ক্ষেত্র নির্দেশ করতে পারে।

২· ক্ষমতাসমূহ[7]ঃ আর্টিক্ল্স অব এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালকগণের সমুদয় ক্ষমতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাদের ক্ষমতা কতখানি ব্যাপক অথবা সীমাবদ্ধ হবে তা আর্টিক্ল্সের উপর নির্ভর করে। আর্টিক্ল্সপ্রদত্ত ক্ষমতাবলী পরিচালকরা একমাত্র যৌথভাবে অর্থাৎ পরিচালকসভা আহ্বানের মাধ্যমেই ব্যবহার করতে পারে। একক বা পৃথক্‌ভাবে নয়। এ ছাড়া পরিচালকরা মেমোরান্ডামে বর্ণিত বিষয়সমূহের বিরোধী কোন কাজ করতে পারে না।

শেয়ারহোল্ডাররা তাদের সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব[8] গ্রহণ করে আর্টিক্ল্সের যে কোন ধারা বা উপধারার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারে। কিন্তু যে পর্যন্ত না তা সংশোধিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আর্টিক্ল্সপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিচালকগণ কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত, শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভা কোনরূপ পরিবর্তন করতে পারে না।

পরিচালকরা আইনবলে কোম্পানী-সংক্রান্ত বিষয়সমূহের নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি ভোগ করে থাকেঃ ১. তলবী অর্থ প্রদানের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের আহ্বান করা, ২. ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে ঋণ সংগ্রহ করা, ৩. ঋণ গ্রহণ করা, ৪. কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগ করা এবং ৫. ঋণ দান করা।

অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালকপর্ষৎ

5. Appointment and retirement 6 Subsidiary. 7 Powers.
8. Special resolution.

একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে একটি কমিটি বা ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে ঋণগ্রহণ, বিনিয়োগ ও ঋণদান সম্পর্কিত ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

৬· কোম্পানীর পক্ষ থেকে অপরের সাথে চুক্তি করা।

৩. **কার্যাবলী**[9]: পরিচালকমণ্ডলীর কার্যাবলী নিচে সংক্ষেপে বলা হল।

১· আইন বা কোম্পানীর 'আর্টিক্‌ল্‌স' অনুযায়ী কোম্পানীর খাতা, হিসাব-পত্র ও নথিপত্র রক্ষা করা ২· শেয়ারহোল্ডারগণের সভায় বিভিন্ন বিবরণী, বক্তব্য ও তথ্যাদি পেশ করা। ৩. শেয়ারহোল্ডারগণের সভা আহ্বান। ৪. মুনাফার বন্টন সহ কোম্পানীর পরিচালনা এবং নীতি নির্ধারণ করা। ৫· কোম্পানীর কর্মচারি-গণকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করা। ৬· দুইটি বার্ষিক সভার অন্তবর্তীকালে কোন পরিচালকের পদ শূন্য হলে তা পূরণের ব্যবস্থা করা। ৭· সাময়িকভাবে হিসাব-পরীক্ষকের পদ শূন্যে হলে তা পূরণ করার ব্যবস্থা করা।

৪· **কর্তব্য**[10]: কোম্পানীর পরিচালকদের কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব বহুবিধ। এই সকল কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব 'আর্টিক্‌ল্‌স'এর দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সাধারণভাবে কারবারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কোম্পানীর কার্যাবলীর প্রতি পরিচালক-গণকে নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টি দিতে হয় এবং সর্বদাই নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা যথাসম্ভব প্রয়োগ করে সততার সাথে কোম্পানীর কাজ পরিচালনা করতে হয়। পরিচালকগণের কর্তব্য ও দায়দায়িত্বের আলোচনায় সর্বাগ্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, কোম্পানীর সাথে তাদের সম্পর্ক দুরকমের। তারা একই সঙ্গে একদিকে কোম্পানীর যাবতীয় সম্পত্তির অছি এবং অপরদিকে কোম্পানীর যাবতীয় কাজে তৃতীয় পক্ষের নিকট কোম্পানীর প্রতিনিধি। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের দ্বারা পরিচালক-গণের নিম্নলিখিত কর্তব্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে: (১) কোন কোম্পানীর পরিচালক অন্য কোন কোম্পানীর পরিচালকের পদ গ্রহণ অথবা ত্যাগ করলে সেই সময় যে কোম্পানীতে তিনি পরিচালক নিযুক্ত রয়েছেন, তার কাছে ২০ দিনের মধ্যে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করবেন। তা না হলে শাস্তিস্বরূপ তাঁর ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে (৩০৫ ধারা)। (২) অন্য কোন কোম্পানীতে পরিচালকদের কোন শেয়ার থাকলে, তা নিজ কোম্পানীর কাছে (অর্থাৎ তাঁরা যে কোম্পানীর পরিচালক) অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে (৩০৮ ধারা)। (৩) কোম্পানীর কাছ থেকে, আইন নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি পারিশ্রমিক নিলে তা ফেরত দেওয়াও পরিচালকদের কর্তব্য। (৩০৯ ধারা, উপধারা ৫-এ)। (৪) পরিচালকপর্ষদের সভায় যোগদান করলে, উপস্থিত সভ্য হিসাবে কোম্পানীর বইয়ে সই করাও পরিচালকদের কর্তব্য (টেব্‌ল্‌-এ, ৭১ ধারা)। (৫) কোম্পানী আইনানুযায়ী যাতে কোম্পানীর বাৎসরিক সাধারণ সভা আহূত হয়, তার ব্যবস্থা করাও পরিচালকদের অন্যতম গুরুতর কর্তব্য। (৬) কোম্পানী আইনানুযায়ী যে সকল তথ্য ও দলিলপত্রাদি নিবন্ধকের কাছে দাখিল করতে হয় সে সব যথাযথ ও সঠিক বলে ঘোষণা করাও পরিচালকগণের অন্যতম কর্তব্য। (৭) কোম্পানীর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত অথবা সম্পাদিত কোন চুক্তিতে ঐ কাজের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ স্বার্থ থাকলে পরিচালক-মণ্ডলীর সভায় তার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করাও ঐ পরিচালকের অবশ্য কর্তব্য।

৫. **দায়সমূহ**[11]: (১) কোম্পানীর দেনার জন্য সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের ন্যায় পরিচালকগণের দায়ও তাদের কেনা শেয়ারের দামের দ্বারা সীমাবদ্ধ। (২) 'আর্টি-ক্‌ল্‌স্‌'-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিচালকরা কোম্পানীর পক্ষ থেকে যে সব চুক্তি সম্পাদন করেন, সে জন্য তাদের কোনরূপ ব্যক্তিগত দায়িত্ব বর্তায় না। কিন্তু ঐ ক্ষমতাবহির্ভূত কোন চুক্তি সম্পাদন করলে অথবা কোম্পানীর কাজে কোনরূপ অবহেলা দেখালে সে জন্য পরিচালকরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হয়। (৩) কোন চুক্তি সম্পর্কে যদি তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জামিন[12] হয়, তা হলে সে জন্য তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে

9. Functions. 10. Duties. 11. Liabilities. 12. Guarantor.

দায়ী হয়ে থাকে। (৪) কোম্পানীর সীলমোহর ছাড়া কোন বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে[১৩] তাঁরা সই করলে সে জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত দায় জন্মায়। (৫) মেমোরাণ্ডামে বর্ণিত উদ্দেশ্য ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্যে কোম্পানীর অর্থ ব্যবহার করা হলে সেজন্য পরিচালকরা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী বলে গণ্য হয়।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পরিচালকদের ব্যক্তিগত দায় জন্মায় :

(৬) পুঁজি থেকে লভ্যাংশ বন্টন, চলতি পুঁজির ক্ষতিপূরণ না করে লভ্যাংশ অনুমোদন, কোম্পানীর অর্থের অপব্যবহার, উপযুক্ত ক্ষমতা ছাড়া কোম্পানীর সম্পত্তি বিক্রয় এবং কোম্পানীর কাছে কোন পরিচালকের দেনা থাকলে তা মকুব করা। (৭) বিশ্বাসভঙ্গ অর্থাৎ গোপনে মুনাফা অর্জন, কোম্পানীর তহবিল তছরূপ, অথবা অগ্রিম তলবী অর্থ গ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার ও অসাধু কার্যকলাপ। (৮) ইচ্ছাকৃত ত্রুটি বা অবহেলা, অন্যায় আচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহার। (৯) সাধারণত পরিচালকদের মধ্যে একের অন্যায়ের বা ত্রুটির জন্য অপরে দায়ী হয় না। কিন্তু যদি কোন পরিচালক বরাবরই[১৪] অনুপস্থিত থাকে, তা হলে তার উপর এইরূপ দায়িত্ব বর্তায়। (১০) আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, আইনভঙ্গ, বিশ্বাসভঙ্গ ও জালিয়াতি, ভুয়া লভ্যাংশ প্রদান।

৬. পরিচালকদের উপর প্রযুক্ত বিধিনিষেধ[১৫] : কোম্পানী আইনে পরিচালকদের উপর নিম্নলিখিত বিধিনিষেধগুলি আরোপিত হয়েছে : (১) কেহই একসঙ্গে ২০-টির বেশি পাবলিক কোম্পানীর পরিচালক নিযুক্ত হতে পারে না। (২) কেন্দ্রীয় সরকারের বিনানুমতিতে কোন পরিচালকই কোম্পানী থেকে ঋণ নিতে অথবা কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত কোন ঋণের জামিনদার হতে পারে না। (৩) কোম্পানীর কোন প্রস্তাবিত চুক্তিতে কোন পরিচালকের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ স্বার্থ জড়িত থাকলে, পরিচালকপর্ষদের সভায় তার আলোচনাকালে ঐ পরিচালক কোন অংশ গ্রহণ করতে বা ভোট দিতে পারবে না। (৪) কোন পরিচালক তার কর্মভার অপর কারও উপর অর্পণ[১৬] করলে তা আইনত বাতিল[১৭] বলে গণ্য হবে। (৫) শেয়ারহোল্ডারদের সভায় বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা অনুমোদিত না হলে কোন পরিচালকই তার কোম্পানীতে কোন লাভজনক পদ[১৮] গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য, ১৯৬৫ সালে গৃহীত কোম্পানী আইনের সংশোধনীতে বলা হয়েছে কোম্পানীর বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা সম্মতি গ্রহণের আগে কোনও লাভজনক পদ গ্রহণ করে থাকলে, ঐরূপ পদ গ্রহণের পর অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাশ করেও কোম্পানীর সম্মতিগ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. পরিচালকের পদ থেকে বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ[১৯] : নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন পরিচালকের পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে : (১) পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার দুই মাসের মধ্যে যোগ্যতাসূচক শেয়ার না কিনলে। (২) মস্তিষ্কবিকৃতি অথবা দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে। (৩) কোন ভারতীয় আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে[২০] ছয়মাসের অধিককালের জন্য দণ্ডিত হলে। (৪) পরিচালকমণ্ডলীর বিনানুমতিতে, একাদিক্রমে তার তিনটি অথবা তিনমাস কালের যাবতীয় সভায় অনুপস্থিত থাকলে। (৫) কোম্পানী আইনের ২০৩ ধারা মতে আদালত কর্তৃক পরিচালক হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষিত হলে। (৬) কোম্পানীর কোন সম্পাদিত অথবা প্রস্তাবিত চুক্তিতে নিজ-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকলে তা প্রকাশ না করলে। (৭) তার দেয় তলবী অর্থ প্রদানের শেষ তারিখ হতে ছয়মাসের মধ্যে তা জমা না দিলে। (৮) কোম্পানীর সাধারণ সভায় ঐ পরিচালককে অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হলে।

৮. পরিচালকদের অপসারণ[২১] : শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভার দ্বারা পরি-

13. Bill of Exchange. 14. Habitually. 15. Restriction on Directors.
16. Assignment. 17. Void. 18. Office of Profit.
19. Vocation of Office by a Director. 20. Criminal offence.
21. Removal of Directors.

চালকরা নিযুক্ত হলেও কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই কোম্পানী আইনের ২৮৪ ধারা বলে তাদের অপসারণ করা যায়। এ জন্য একটি বিশেষ নোটিস[22] দিয়ে শেয়ার-হোল্ডারদের সভায় সাধারণ প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়। এই বিশেষ নোটিস সংশ্লিষ্ট পরিচালকের নিকট পাঠানো বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট পরিচালককে তার লিখিত উত্তর বা কৈফিয়ত প্রদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য ঐ কৈফিয়ত কোম্পানীর সভ্যদের কাছে পাঠাতে হয়।

কিন্তু কোম্পানী আইনের ৪০৮ ধারা বলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন পরিচালককে এইরূপে অপসারণ করা যায় না।

৯. **পরিচালকদের পারিশ্রমিক**[23] **:** পরিচালকদের মাসিক ভিত্তিতে কিংবা পরিচালকপর্ষদের সভায় উপস্থিতির ভিত্তিতে অথবা অংশত উভয়প্রকারে পারিশ্রমিক দেওয়া যায় এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা সর্বক্ষণের পরিচালককে[24] পারিশ্রমিক বাবদ মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া যেতে পারে। তবে, কোম্পানী আইনের ১৯৬০ সালের সংশোধনী মতে ম্যানেজিং ডিরেক্টার অথবা সর্বক্ষণের পরিচালক এই দুইয়ের একজন মাত্র থাকলে তাদের যে কেহর জন্য মুনাফার অনধিক ৫ শতাংশ এবং উভয়েই থাকলে সর্বমোট ১০ শতাংয পারিশ্রমিক বাবদ দেওয়া যেতে পারে। এর অতিরিক্ত দিতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন।

ঐ সংশোধনীতে আরও বলা হয়েছে যে, সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকদের পারিশ্রমিকের হার 'আর্টিক্‌ল্‌সে' উল্লেখ থাকলে, শেয়ারহোল্ডারদের সভায় বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা তা নির্ধারিত হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা ব্যবস্থাপক পরিচালক (MANAGING DIRECTOR)

১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২(২৬) ধারাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা ব্যবস্থাপক পরিচালকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, কোম্পানীর সাথে চুক্তির বলে অথবা, শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় বা পরিচালকপর্ষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা, অথবা মেমোরাণ্ডাম কিংবা আর্টিক্‌ল্‌সে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে যে পরিচালকের উপর কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার কোন ক্ষমতা[25] অর্পণ করা হয় তাকেই ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা ব্যবস্থাপক-পরিচালক বলা যায়। আইনে অবশ্য একথাও বলা হয়েছে যে, এরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিচালককে ম্যানেজিং ডিরেক্টার বলে অভিহিত করা বাধ্যতামূলক নয়।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য বলা বাহুল্য যে, পরিচালক ছাড়া অপর কাহাকেও ব্যবস্থাপক-পরিচালক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিয়োগ করা যায় না। তার কর্তব্য দুইপ্রকার। তিনি একদিকে কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক ও অপর দিকে কোম্পানীর ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক।

ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে যে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কিংবা সবিশেষ সামগ্রিক[26] দায়িত্ব বহন করতে হবে, এমন কথাও আইনে বলা হয় নি। বস্তুত তাঁর ক্ষমতার পরিমাণ নিয়োগের শর্তাবলীর দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোম্পানী আইনের ৩১৪ ধারা মতে, ম্যানেজিং ডিরেক্টার শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়াই কোম্পানীতে লাভজনক পদ গ্রহণ করতে পারে।

কোম্পানী আইনানুযায়ী একটানা পাঁচ বৎসর কালের বেশি সময়ের জন্য কাহাকেও ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিয়োগ করা যায় না। কিন্তু ঐ কার্যকাল শেষ হওয়ার পর তার পুনর্নিয়োগ সম্ভব। তবে ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিয়োগ, পুনর্নিয়োগ অথবা তার পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যথাবিহিত

22. Special notice. 23. Remuneration of Directors.
24. Wholetime Director. 25. 'Any powers of management.'
26. 'Whole or substantially whole'.

অনুমতি সংগ্রহ আবশ্যক। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউ এক সঙ্গে দুইটির বেশি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পদ গ্রহণ করতে পারে না।

পরিচালকপর্ষৎ কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কার্যক্রমসমূহ কাজে পরিণত করা এবং কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা করাই ম্যানেজিং ডিরেক্টারের প্রধান কাজ। অবশ্য কোম্পানীর ধরাবাঁধা নিয়মমাফিক পরিচালনার কার্যাদি[27] যথা, কোম্পানীর সীলমোহরাদি ব্যবহার, চেকবই হস্তান্তর করা, শেয়ার সার্টিফিকেট সই করা ইত্যাদি তাঁর কাজের অন্তর্গত নয়।

সর্বক্ষণের পরিচালক (WHOLETIME DIRECTOR)

কোম্পানীর 'সর্বক্ষণের পরিচালক' বলে কোন পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা আগে ছিল না। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনেই সর্বপ্রথম এইরূপ পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ঐ আইনে সর্বক্ষণের পরিচালকের কোন সংজ্ঞা বা তাঁর ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি।

তবে, বর্তমান কোম্পানী আইন থেকে দেখা যায় যে ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা ব্যবস্থাপক-পরিচালক এবং সর্বক্ষণের পরিচালক এই দুটি কথা একার্থবোধক নয় এবং প্রয়োজনবোধে একই কোম্পানীতে একসঙ্গে উভয়েরই নিয়োগ ঘটতে পারে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও সর্বক্ষণের পরিচালক, এই দুইয়ের প্রধান পার্থক্য এই যে, ম্যানেজিং ডিরেক্টার কোম্পানীর সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার যাবতীয় অথবা সবিশেষ দায়িত্ব বহন করেন না। কিন্তু আর্টিক্‌ল্‌সে ব্যবস্থা থাকলে, সর্বক্ষণের পরিচালক মূলত কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার যাবতীয় অথবা সবিশেষ দায়িত্ব-ভার বহন করতে পারে।

কোম্পানী আইনের ৩১৪ ধারাতে বলা হয়েছে যে, সর্বক্ষণের পরিচালক নিয়োগ করতে হলে শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভার অনুমতি প্রয়োজন। আর্টিক্‌ল্‌সের দ্বারা তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলীর সীমা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। সর্বক্ষণের পরিচালক নিয়োগের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিতে হয়।

ব্যবস্থাপক (MANAGER)

যিনি ম্যানেজিং এজেন্ট নন এরূপ যে ব্যক্তি পরিচালকমণ্ডলীর তদারক ও নিয়-ন্ত্রণসাপেক্ষ থেকে কোম্পানীর কার্যাবলীর যাবতীয় অথবা তার সবিশেষ অংশের ব্যবস্থাপনার ভার বহন করেন, ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে তাঁকেই কোম্পানীর ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক বলা হয়েছে। পরিচালকপর্ষৎ কোম্পানীর বহির্ভূত যে কোন ব্যক্তিকে চুক্তি দ্বারা অথবা যে কোন পরিচালককে উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা কোম্পানীর ম্যানেজারের পদে নিয়োগ করতে পারেন।

একটানা ৫ বৎসরের বেশিকালের জন্য ম্যানেজার নিয়োগ করা যায় না। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউ একসঙ্গে একটির বেশি কোম্পানীতে ম্যানেজার পদ গ্রহণ করতে পারেন না।

পরিচালকপর্ষদের নির্দেশমত কোম্পানীর ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপকের কাজ নির্ধারিত ও সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও ম্যানেজারের তুলনা

ম্যানেজিং ডিরেক্টার	ম্যানেজার
১· পরিচালক পর্ষদের সদস্য, অর্থাৎ পরিচালক ছাড়া অপর কেউ ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিযুক্ত হতে পারে না।	১· কোন পরিচালককে ম্যানেজার নিয়োগে কোন বাধা নাই, অপর কোন ব্যক্তিও ম্যানেজার নিযুক্ত হতে পারে।

27. Administrative functions of a routine nature.

ম্যানেজিং ডিরেক্টার	ম্যানেজার
২· ম্যানেজিং ডিরেক্টার চুক্তির দ্বারা নিযুক্ত হয়।	২· ম্যানেজারের নিয়োগ চুক্তির অধীন হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।
৩· ম্যানেজিং ডিরেক্টার-এর উপর কোম্পানীর সর্বশেষ ক্ষমতা অর্পিত হয়। কিন্তু কোম্পানীর রুটিন বাঁধা কার্যাবলী তার কাজের অন্তর্গত নয়।	৩· ম্যানেজার কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক অথবা সর্বশেষ সামগ্রিক দায়িত্ব বহন করেন।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা
MANAGING AGENCY SYSTEM

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে বঙ্গদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর, ভারতের পূর্বাঞ্চলে দ্রুত ইংরেজ বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারিত হতে থাকে। এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পরে ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলে বেসরকারী ইংরেজদের বসবাসের ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ অপসারিত হওয়ার পর, এদেশে ইংরেজ বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য আরও দ্রুত প্রসারিত হয়। সে সময়ে বঙ্গদেশে নানারূপ ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ইংলণ্ডে বহু নূতন কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় ও ইংলণ্ডেই তাদের মূলধন সংগৃহীত হয়। কিন্তু সুদূর ভারতের অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান প্রতিকূল আবহাওয়ায় ইংলন্ডের বণিকদের মধ্যে অতি অলপই এদেশে এসে থাকতে ইচ্ছুক হওয়ায়, এদেশে বসবাসকারী মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিকদের হাতে তারা তাদের ভারতে অবস্থিত কারবারের ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত অনেক ইংরেজ কর্মচারীও ভারতে থেকে গিয়ে এই সকল কারবারে যোগদান করে। পরে, ক্রমশ এদেশের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির দরুন এই সব ইংলন্ডে গঠিত কারবারের ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অথবা অংশীদারী কারবারগুলি ক্রমশ খনিজ, আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ, চা বাগিচা শিলপ, বস্ত্র, কাগজ ও পাট শিলপ ইত্যাদি নূতন নূতন কারবারের সম্ভাবনা অনুধাবন করে নিজেদের উদ্যোগে কারবার গঠন করতে থাকে এবং ইংলন্ডে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। এইরূপে ইংলন্ড থেকে ভারতে, বিশেষত বঙ্গদেশে পুঁজি রপ্তানি শুরু হয়। এই সব নবস্থাপিত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা সেই ভারতে বসবাসকারী ইংরেজ বণিকদের হাতেই কারবারগুলির ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ভার অর্পিত হয়। এবং তাদের নাম দেওয়া হয় ম্যানেজিং এজেন্ট। এইরূপে ভারতে বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার উৎপত্তি ঘটে। ম্যানেজিং এজেন্টরা ঐ সব প্রতিষ্ঠানে নিজেদের স্থায়ী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকালের চুক্তিতে আবদ্ধ হত। পরবর্তীকালে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্যও ইংরেজদের অনুকরণে ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সী কারবার গঠিত হয় এবং তাদের হাতে ঐ সব শিলেপর ব্যবস্থাপনার ভার অর্পিত হতে থাকে। যে বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সী কারবারগুলি প্রথমে বঙ্গদেশেই গঠিত হয়েছিল তা ধীরে ধীরে দক্ষিণে মাদ্রাজ অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয় এবং তারপর উত্তর ভারতের কানপুর প্রভৃতি স্থানে প্রসারিত হয়। এইরূপে ক্রমশ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিদেশী ও দেশী ম্যানেজিং এজেন্সী সংস্থা ছড়িয়ে পড়ে।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা তার প্রথম যুগে ভারতের শিলপ, বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, তার অর্থসংস্থান ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার দ্বারা এদেশে যন্ত্রশিলপ ও আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সূত্রপাত ও উন্নতিতে

উল্লেখযোগ্য সহায়তা করেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের অধিকাংশই, বিশেষত বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি, এদেশীদের কাছে তাদের শেয়ারগুলি বিক্রয় করে এদেশ থেকেই পুঁজি সংগ্রহ করে কারবার পরিচালনা করতে থাকে ও তাদের অধীনস্থ কোম্পানীগুলিকে স্থায়িভাবে নিজেদের করায়ত্ত রাখতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে নানাপ্রকার দুর্নীতি দেখা দেয় ও দেশবাসীর মধ্যে এজন্য এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

এই সকল কারণে ১৯৫৬ সালে একটি নূতন কোম্পানী আইন পাশ করে ম্যানেজিং এজেন্টগণের নিয়োগ, কার্যকাল, তাদের অধীন কোম্পানীর সংখ্যা, পারিশ্রমিক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে সেক্রেটারী এন্ড ট্রেজারার্স নিয়োগে ভারত সরকার উৎসাহ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেন।

অবশেষে, ১৯৬৯ সালের সংশোধিত কোম্পানী আইন অনুসারে ভারত সরকার ১৯৭০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা সম্পূর্ণ বিলোপ করেন। এর ফলে ভারতে শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটি পুরাতন যুগের অবসান ও একটি নূতন যুগের সূত্রপাত ঘটেছে।

ম্যানেজিং এজেন্টদের কার্যাবলী (FUNCTIONS OF MANAGING AGENTS)

ম্যানেজিং এজেন্সীর কার্যাবলীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. কোম্পানী গঠন বা প্রবর্তন। ২. অর্থসংস্থান। ৩. ব্যবস্থাপনা।

১. কোম্পানী প্রবর্তন[২৮]ঃ ম্যানেজিং এজেন্টরা নূতন নূতন কারবারের প্রবর্তন, কারবার গঠনের প্রাথমিক ব্যয় এবং কারবারের ব্যর্থতার সমগ্র দায় বহন করত। শুধু কারবার সফল হয়ে যখন মুনাফা অর্জন করত তখনই তারা তার অংশ লাভ করত। পেশাদার প্রবর্তকদের সাথে ম্যানেজিং এজেন্টদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। পেশাদার প্রবর্তকরা কারবার সংগঠনের পরই তাদের সাথে সংস্রব ছিন্ন করে। কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্টদের সাথে সম্পর্ক কোম্পানীর জীবনকাল পর্যন্ত চলত। সুতরাং ম্যানেজিং এজেন্টদের সাথে তাদের দ্বারা প্রবর্তিত কোম্পানীগুলির একটি স্থায়ী, ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক গড়ে উঠত।

২. অর্থসংস্থান[২৯]ঃ ম্যানেজিং এজেন্টরা তাদের ব্যবস্থাপনাধীন কোম্পানীগুলির অর্থসংস্থান বিষয়ে একটি মুখ্য স্থান গ্রহণ করত। তারা ঐ সব প্রতিষ্ঠানে নিজেরা ঋণ দিয়ে এবং তাদের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কিনে প্রত্যক্ষভাবে অর্থ সরবরাহ করত। তা ছাড়া ঐ সব কোম্পানীর শেয়ারের দায়গ্রাহক হিসাবে অন্যান্য সূত্র থেকে ঋণ সংগ্রহ করে সংগৃহীত ঋণের জামিনদার হয়ে এবং নিজেদের সুনামের দ্বারা তাদের খ্যাতি বর্ধন করে, পরোক্ষে তাদের অর্থসংস্থানে সাহায্য করত।

৩. ব্যবস্থাপনা[৩০]ঃ কারবারের প্রবর্তন ও অর্থসংস্থান ম্যানেজিং এজেন্টদের কাজের অন্তর্গত হলেও ব্যবস্থাপনাই তাদের মুখ্য কাজ ছিল। বস্তুত ব্যবস্থাপনার দক্ষতাই ছিল তাদের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ায় তাদের কারবারের উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন গড়ে তুলতে এবং অভিজ্ঞ পরিচালনার দ্বারা সহজেই ব্যবস্থাপনাধীন কোম্পানীগুলিকে সফল করতে সক্ষম হত। তা ছাড়া একাধিক প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবস্থাপনার অধীন থাকত বলে, তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একক-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৃহদায়তন উৎপাদন ও সংগঠনের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করত।

28. Promotion. 29. Financing. 30. Managerial Functions.

হিতকর কার্যাবলী[31] **:** **১.** নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তক হিসাবে ম্যানেজিং এজেন্টরা ভারতে যন্ত্রশিল্প ব্যবস্থার পত্তনের দ্বারা এদেশে যন্ত্রযুগের উদ্বোধনে সাহায্য করেছে।

২. পেশাদার প্রবর্তকদের হাতে যেরূপ অসংখ্য অসার্থক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, ম্যানেজিং এজেন্টদের হাতে সেরূপ ঘটে নি । কারণ, তারা সাধারণত নূতন কারবারের প্রবর্তন থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরে তার সাথে জড়িত থেকে তার সাফল্যের জন্য চেষ্টা করেছে।

৩. সফল কারবার সংগঠনের দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তারা নবপ্রবর্তিত যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে এদেশের রক্ষণশীল বিনিয়োগকারীদের সন্দেহ দূর করে তাদের মধ্যে বিনিয়োগের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে ও সঞ্চয়কারীদের উৎসাহ দিয়েছে।

৪. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, উভয়ভাবে নবপ্রবর্তিত কোম্পানীগুলিকে অর্থ-সংস্থানে সাহায্য করে তাদের পুঁজির অভাব দূর করেছে।

৫. ভারতের মত যে দেশে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব ছিল সেখানে ম্যানেজিং এজেন্টরা একসঙ্গে বিভিন্ন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার ভার নিয়ে ঐ সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেছে।

৬. তাদের অধীনে এক অদৃশ্য জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, বৃহদায়তন উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ পেয়ে লাভবান হত ও নিজেদের মধ্যে নিরর্থক প্রতিযোগিতা দূর করে সাফল্য সুনিশ্চিত করতে পারত।

৭. মুষ্টিমেয় ম্যানেজিং এজেন্টদের অধীনে বহু প্রতিষ্ঠান থাকায়, তাদের মধ্যে সহজেই সমস্বার্থের ভিত্তিতে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হত এবং ম্যানেজিং এজেন্টদের মধ্যে সহযোগিতার দ্বারা সমগ্র শিল্পটি উপকৃত হত। পাট ও চা শিল্প এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

৮. মন্দার বাজারে শক্তিশালী ম্যানেজিং এজেন্টদের আশ্রয়ে বহু ছোট ছোট কোম্পানী আত্মরক্ষায় সমর্থ হত ।

অহিতকর কার্যাবলী[32] **১.** আইনানুযায়ী চুক্তি দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্টদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট হলেও এবং তারা কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর অধীন হলেও, কার্যত তারা কোম্পানীর কাজে স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ ক্ষুন্ন ও পরিচালকমন্ডলীকে অকেজো করে দিত ।

২. ম্যানেজিং এজেন্টদের মধ্যে বিশেষত দেশীয় ম্যানেজিং এজেন্টদের শিল্প-সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্বল্প থাকায়, এবং নিজেদের লাভ-ক্ষতির দিকে বেশি দৃষ্টি থাকায় তাদের মধ্যে যারা প্রভূত আর্থিক শক্তিশালী, তারা অধীন প্রতিষ্ঠানের শিল্পগত স্বার্থ বিচার করে না চলে আশু আর্থিক লাভ-লোকসানের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় অধীন প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হত ।

৩. অনেক ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান একমালিকী কারবার হওয়ায় (বিশেষত দেশীয়) পরবর্তীকালে তারা অযোগ্য বংশধরদের হাতে পড়ে দক্ষতা হারাত । তার ফলে তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হত ।

৪. একসঙ্গে বহু কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করার দরুন ম্যানেজিং এজেন্ট কারও প্রতিই সুবিচার করে উঠতে পারত না ।

৫. যে সব ক্ষেত্রে অধীন কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার ম্যানেজিং এজেন্টরা প্রথমে নিজেরা কিনে পরে বেচে দিত, সে সকল ক্ষেত্রে বিক্রি করার পরে তারা ঐ সব

31. Services. 32. Disservices

শেয়ার নিয়ে শেয়ার বাজারে ফটকাবাজী করত। তাতে কোম্পানীর সুনামের যথেষ্ট ক্ষতি হত।

৬. ম্যানেজিং এজেন্টদের অধীন কোম্পানীগুলিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নিজেদের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অবাধে স্বজনপোষণের নীতি অনুসরণ করত। তার ফলে যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগের অভাবে কোম্পানীর কার্যদক্ষতা নষ্ট হত।

৭. দেশের ব্যাংক ও শিল্পব্যবস্থার মধ্যে একটি ফলপ্রদ পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে ওঠার পথে এরা বাধা দিয়েছে। ম্যানেজিং এজেন্টরা তাদের উভয়ের মাঝখানে থেকে ব্যাংকগুলির হাতে সংগৃহীত মোট সঞ্চয়কে একদিকে শিল্পের প্রয়োজনে নিযুক্ত হওয়ার পথে বাধা দিয়েছে ও অন্যদিকে শিল্পের সহায়তায় ব্যাংকব্যবস্থার সম্প্রসারণে বাধা দিয়েছে।

৮. তারা অধীন এক প্রতিষ্ঠানের অর্থসম্পদ নির্বিবাদে অপর প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করত। ফলে শক্তিশালী ও উন্নতিশীল একটি কোম্পানীর সম্পদ অপর একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করত। আবার অনেক ক্ষেত্রে উভয় প্রতিষ্ঠানই এর ফলে নষ্ট হত।

৯. তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মুনাফার জন্য বিভিন্ন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার অধিকার বেশি দামে অপরের কাছে বেচে দিয়ে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিত।

১০. ম্যানেজিং এজেন্টরা তাদের অধীন কোম্পানীর সাথে বিবিধ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি, কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ গোপন সংবাদ ব্যবহার, কোম্পানীগুলির তহবিলের অপব্যবহার, চুক্তি অবসানের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়, হিসাবের কারচুপি, নিজেদের ম্যানেজিং এজেন্সী কারবারকে যৌথমূলধনী কারবারে রূপান্তরিত করে তার শেয়ারগুলি অধীন কোম্পানীর কাছে বিক্রয় করে অর্থসংগ্রহ, অর্থাৎ অধীন কোম্পানীগুলির অর্থসংস্থান না করে তাদের দ্বারা নিজেদের অর্থসংস্থান, কোম্পানীগুলির কাছ থেকে চলতি হিসাবে বেশি পরিমাণে অগ্রিম গ্রহণ, ঋণ সংগ্রহ ও তার জামিনদার হিসাবে কাজ করার জন্য দস্তুরী আদায়, নীট মুনাফা ও মোট বিক্রয় উভয়ের ভিত্তিতেই পারিশ্রমিক আদায় এবং অফিসের রাহাখরচ বাবদ অর্থ আদায় ইত্যাদি অসংখ্যভাবে তারা অধীন কোম্পানীগুলিকে শোষণ করে অর্থ উপার্জন করত।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিলোপ : এর ফলে কি শিল্পোন্নতির ক্ষতি হবে?
ABOLITION OF THE MANAGING AGENCY SYSTEM : WILL IT HINDER INDUSTRIAL GROWTH?

ভারতে শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে অতীতে উল্লেখযোগ্য অবদান সত্ত্বেও, নানারূপ অনাচারের দরুন ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিরুদ্ধে বহুদিন থেকেই নানা অভিযোগ উঠেছিল। ঐ সব অনাচার দূর করে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথাকে ত্রুটিমুক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে নানারূপ বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল যে, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার মধ্য দিয়ে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশে প্রবল একচেটিয়া কারবার মাথা তুলছে। মহলানবিশ কমিটির রিপোর্টে ও অর্থনীতিক শক্তির কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে ডঃ আর. কে. হাজারীর রিপোর্টে কয়েকটি বিশেষ শিল্প ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলোপ করার সুপারিশ করা হয়। ১৯৬৫ সালে ডঃ আই. জি. প্যাটেলের নেতৃত্বে যে ম্যানেজিং এজেন্সী তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হয় তা চিনি, তুলাবস্ত্র এবং সিমেন্ট শিল্পে ধীরে ধীরে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করলেও এর সম্পূর্ণ বিলোপ সমর্থন করে নি। ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার সিমেন্ট, তুলাবস্ত্র, চটকল, কাগজ ও চিনি শিল্পে ৩ বৎসরের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

কিন্তু ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসেই ভারত সরকার এই প্রথার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে অনুসারে ১৯৬৯ সালের মে মাসে কোম্পানী আইন সংশোধিত হয় এবং ঐ আইন অনুসারে ১৯৭০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলোপ করা হয়।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবসানের ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিরূপে এখন রয়েছে পরিচালক পর্ষদের সাধারণ তত্ত্বাবধানের অধীন সর্বক্ষণের পরিচালকগণের দ্বারা (ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমেত) অথবা ম্যানেজারগণের দ্বারা ব্যবস্থাপনা।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবসান ঘটানোর ফলে দেশের শিল্পে ও বাণিজ্যে প্রভৃত অসুবিধা ঘটবে ও উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটবে বলে অনেকে আশংকা প্রকাশ করলেও, এই আশংকা অনেকটাই অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য অধিকাংশ দেশেই পরিচালকপর্ষদের অধীনে সর্বক্ষণের পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে এবং ভারতেও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে এবং ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে এটা প্রচলিত রয়েছে। তা ছাড়া, কোম্পানীগুলির অর্থ ও ঋণের সংস্থান, তাদের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের দায়গ্রহণকারী কারবার ইত্যাদিরও প্রসার দেশে বর্তমানে ঘটেছে বলে, এই সব ব্যবস্থার অভাব হেতু আগে যে অসুবিধা ছিল এখন তা দূর হয়েছে।

বরং ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার অবসানের ফলে কোম্পানীগুলির ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীকরণ দূর হয়ে এখন বিকেন্দ্রীকরণ ঘটার দরুন তাদের পরিচালকরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে বাধ্য হওয়ায় তাদের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়বে। সমগ্র শিল্প ক্ষেত্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণটি একটি সুপ্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টাটি চলতে থাকলে এতে অনেক নূতন ও তরুণ প্রতিভাবানের সুযোগের দরজা খুলে যাবে।

অতএব সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখলে মনে হয় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবসানের ফলে দেশে ভবিষ্যৎ শিল্প-উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটবে বলে আশংকা করার কোন কারণ নাই। সেহেতু ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিলোপ সাধনকে অভিনন্দন জানানই উচিত।

১৯৭৪ সালের সংশোধিত কোম্পানী আইনের কয়েকটি প্রধান ধারা

১. কোম্পানীর সেক্রেটারী বলতে কেবল নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বোঝাবে। অর্থাৎ কেবল নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই কোন কোম্পানীর সেক্রেটারী রূপে নিয়োগ করা যাবে। কোন ফার্ম অথবা বিধিবদ্ধ সংস্থাকে ("বডি করপোরেট") আর কোন কোম্পানীর সেক্রেটারী রূপে নিয়োগ করা যাবে না। (২ ধারা)

২. ১৯৫৬ সালের আইনের ১৭, ১৮, ১৯, ৭৩, ১৮৬, কোম্পানী ল' বোর্ডকে অনেক স্থলেই আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এতদিন যে সকল বিষয় কোম্পানী আইনে আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল তার অনেকগুলিই কোম্পানী ল' বোর্ড-এর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং বোর্ডের হাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদলতের কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। (৫ ধারা)

৩. যে প্রাইভেট কোম্পানীর মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ ("টারনওভার") ১ কোটি টাকার কম নয় কিংবা কোন পাবলিক কোম্পানীর ২৫ শতাংশ বা তার বেশি শেয়ার যদি কোন প্রাইভেট কোম্পানীর হাতে থাকে তাহলে, সেই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হবে। (৬ ধারা)

৪. কতকগুলি ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় ও হস্তান্তরের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। (১২ ধারা)

৫. কোম্পানীর সদস্যদের সাধারণ সভা ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন

কোম্পানী তার প্রাক্তন (১৯৬০ সালের আগস্ট মাসের পর যে কোন সময়ে কার্যরত) ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা সেক্রেটারীজ অ্যাণ্ড ট্রেজারার্সদের বা তাদের কোন সহযোগীকে সেক্রেটারী, কনসালট্যান্ট বা এ্যাডভাইসার রূপে নিয়োগ করতে পারবে না। যদি ১৯৭০ সালের ১৫ই আগস্টের আগে পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে বা ঐ তারিখের পরে এরূপ কাউকে সেক্রেটারী, কনসালট্যান্ট বা এ্যাডভাইসার বা এজাতীয় কোন পদে নিয়োগ করে থাকে তাহলে নিয়োগের শর্তাবলী কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবে এবং সেগুলি কোম্পানীটির স্বার্থের অনুকূল কি না তা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করে দেখবেন ও প্রয়োজন হলে ঐ শর্তাবলী কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধন করতে পারবেন।

৬. কোন কোম্পানী লভ্যাংশ ঘোষণা করার পর ঘোষণার তারিখের ৪২ দিনের মধ্যে কোন শেয়ারহোল্ডারের প্রাপ্য লভ্যাংশ ঐ তারিখের মধ্যে যদি পাঠানো না হয়ে থাকে তবে ঐ লভ্যাংশের টাকা কোন একটি শিডিউল্ড ব্যাংকে একটি আলাদা হিসাব খুলে তাতে জমা দিতে হবে। ঐ ব্যাংক এ্যাকাউন্টে তিন বছর ধরে এরূপ যে লভ্যাংশের টাকা জমা পড়ে থাকবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের জেনারেল রেভেনিউ এ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। যে শেয়ার লভ্যাংশের টাকা পাননি, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকার জন্য আবেদন করবেন।

৭. কোন নিরীক্ষক ব্যক্তিগতভাবে কিংবা কোন নিরীক্ষক ফারম (অডিট ফারম) কিংবা তার কোন অংশীদার এককভাবে কিংবা কোন নিরীক্ষক যদি একাধিক নিরীক্ষক ফারম-এর অংশীদার হন তাহলে ঐ সমস্ত নিরীক্ষক ফারম একত্রে, ২৫ লক্ষ টাকার কম আদায়ীকৃত পুঁজিবিশিষ্ট ২৫টি কোম্পানীর বেশি কোম্পানীতে কিংবা এমন ২০টি কোম্পানীর বেশি কোম্পানীতে নিরীক্ষক নিযুক্ত হতে পারবে না যাদের মধ্যে অনধিক দশটি কোম্পানীর আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি। (২৩ ধারা)

৮. কোন রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থসংস্থানকারী সংস্থা কিংবা কোন সরকারী কোম্পানী কিংবা কেন্দ্রীয় কিংবা কোন রাজ্যসরকার, অথবা কোন রাজ্য সরকার যার ৫১ শতাংশ শেয়ারের মালিক, কোন রাজ্য আইন কর্তৃক স্থাপিত এরূপ কোন অর্থসংস্থানকারী কিংবা অন্য কোন সংস্থা অথবা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কিংবা সাধারণ বীমা ব্যবসায়ী কোন রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কোম্পানী যার ২৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক এরূপ কোন কোম্পানীর নিরীক্ষক নিয়োগ অথবা পুনর্নিয়োগের জন্য কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাশ করতে হবে।

৯. ১৯৫৯ সালের কস্ট অ্যাণ্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্ট আইনে যাদের কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলা হয়েছে, কোম্পানী আইনে তাদেরই কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে নিয়োগের যোগ্যতা রয়েছে বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

১০. কস্ট অ্যাকাউন্টস-এর নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য এরূপ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট না পাওয়া গেলে, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নির্দিষ্ট কালের জন্য কস্ট অ্যাকাউন্টস নিরীক্ষার কাজে কোন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। (২৫ ধারা)

১১. যে সব কোম্পানীর আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি, তাদের পক্ষে একজন সারা সময়ী কোম্পানী সেক্রেটারী নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক। এরূপ পুঁজি বিশিষ্ট যে সব কোম্পানীতে মাত্র দু'জন ডিরেকটর আছে সেখানে তাদের কেউই কোম্পানীর সেক্রেটারি নিযুক্ত হতে পারবে না। ব্যক্তি ছাড়া কোন অংশীদারী ফারম অথবা কোম্পানী সেক্রেটারি নিযুক্ত হতে পারবে না। বর্তমানে যারা সেক্রেটারি নিযুক্ত রয়েছে তাদের ১৯৭৪ সালের সংশোধিত কোম্পানী আইন চালু হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে। কোন ব্যক্তি একটির বেশি কোম্পানীর সেক্রেটারী হতে পারবে না। (৩০ ধারা)

৬ যৌথমূলধনী কারবারের প্রবর্তন ও কার্যপদ্ধতি

1. What steps would you take to float on limited liability company from the inception to the commencement of business? [C. U. '56, '57; B. U. 1963]
[স্থাপনা থেকে কার্যারম্ভ পর্যন্ত, একটি সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট কোম্পানী প্রবর্তন করতে তুমি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ?] উঃ ৮৬-৯০ পৃঃ

2. What is the importance of a prospectus of a Public Limited Company? Discuss the main items which such a document should contain. [B. U. 1961]
[পার্বলিক লিমিটেড কোম্পানীর বিবরণ পত্র বা প্রসপেক্টাস-এর গুরুত্ব কী ? এরূপ দলিলের মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত সেরূপ প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা কর।] উঃ ৯৬-৯৭ পৃঃ

3. What are the differences between the Memorandum of Association and the Articles of Association of a Company? Mention the main clauses usually contained in the Memorandum of Association. [C. U. 1962]
[পরিমেল বন্ধ (মেমোরান্ডাম) এবং পরিমেল নিয়মাবলীর (আর্টিকল্‌স্‌) মধ্যে পার্থক্য কী ? সাধারণত পরিমেল বন্ধের (মেমোরান্ডাম) অন্তর্ভুক্ত থাকে এরূপ প্রধান প্রধান ধারাগুলি উল্লেখ কর।] উঃ ৯৪-৯৫, ৯০-৯১ পৃঃ

4. Discuss the main clauses in the Memorandum of Association of a Public Limited Company? Why is it called the charter of the rights of a Company. [C. U. 1965]
[পার্বলিক লিমিটেড কোম্পানীর পরিমেল বন্ধের (মেমোরান্ডাম) প্রধান প্রধান ধারাগুলি আলোচনা কর। এটাকে কোম্পানীর অধিকারের সনদ বলা হয় কেন?] উঃ ৯০-৯১ পৃঃ

5. What are the functions of Promoters of a Public Limited Company? [C. U. 1967]
[পার্বলিক লিমিটেড কোম্পানীর প্রবর্তকদের কাজ কী?] উঃ ৮৬-৮৯ পৃঃ

6. Discuss the main clauses of the Articles of Association of a Public Limited Company. Also state how it differs from the Memorandum of Association. [C. U. 1968]
[পার্বলিক লিমিটেড কোম্পানীর আর্টিকল্‌স্‌ বা পরিমেল নিয়মাবলীর প্রধান প্রধান ধারাগুলি আলোচনা কর। এর সাথে মেমোরান্ডাম বা পরিমেল বন্ধের পার্থক্যগুলিও আলোচনা কর।] উঃ ৯০-৯১ বা ৯৩-৯৪ এবং ৯৪-৯৫ পৃঃ

7. Enumerate the steps required to be taken by a new company for issue of shares to the public. [C. U. 1974]
[জনসাধারণের কাছে তার শেয়ার বিক্রি করার জন্য একটি নূতন কোম্পানীর পক্ষে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা বল] উঃ ৯৬-৯৭, ১০৯-১১ পৃঃ

৭ যৌথমূলধনী কারবারের অর্থসংস্থান

1. What are the ways in which a Public Limited Company may raise funds in India? Examine their merits and demerits. [C.U. 1965]
[ভারতে একটি পার্বলিক লিমিটেড কোম্পানী কি কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে? সেসবের সুবিধা অসুবিধাগুলি পরীক্ষা কর।] উঃ ১০২-৫ পৃঃ

2. Discuss the different classes of shares which a Public Limited Company may issue. Is it necessary to take prior consent of Government for issuing any shares? [C. U. 1967]
[পার্বলিক লিমিটেড কোম্পানী যে সকল বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার বিলি করতে পারে তা আলোচনা কর। যে কোন শেয়ার বিলি করার আগে কি সরকারের অনুমতি লওয়া আবশ্যক ?] উঃ ১০৫-৮, ১০৯-১০ পৃঃ

৪. Distinguish between owned capital and borrowed capital of a joint stock company. State the nature of securities which a company generally offers for raising loans. [C. U. 1972]
[কোম্পানীর নিজের পুঁজি ও ঋণপুঁজির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ঋণ নেবার জন্য কোম্পানী কি প্রকার জামিন দিয়ে থাকে।] উঃ ১১৩-১৪, ১১২-১৩ পৃঃ

৮ যৌথমূলধনী কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

1. Describe the various duties and responsibilities of a company director. [C. U. 1961, 1963]
[কোম্পানী পরিচালকের কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহের বর্ণনা কর।] উঃ ১১৯-২১ পৃঃ

2. The Board of Directors of many Public Limited Companies consist of Managing Director and Directors. What are their respective functions and responsibilities? [C. U. 1964]
[অনেক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক পরিচালক (ম্যানেজিং ডিরেক্টর) এবং পরিচালকগণকে নিয়ে পরিচালকপর্ষদ গঠিত হয়। তাদের কার্যাবলী ও দায়িত্বগুলি কি কি?] উঃ ১২২-২৩ পৃঃ

3. Explain the causes of separation between ownership and management in a widely owned Public Company. Does it appear as a serious problem of a Company management? [B. U. 1965]
[পাবলিক কোম্পানীতে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটা কি গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়ায়?] উঃ ১১৯-২০ পৃঃ

4. Do you think abolition of the Managing Agency system will hinder the growth of industries in India? Give reasons for your answer. [C. U. 1966]
[তুমি কি মনে কর যে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার অবলোপ ভারতে শিল্পের উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটাবে? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।] উঃ ১২৯-৩০ পৃঃ

5. Discuss the duties and responsibilities of Managing Directors of a Public Limited Company under Companies Act, 1956. [C. U. 1968]
[১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণের কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি আলোচনা কর।] উঃ ১২০, ১২৪-২৫ পৃঃ

৫. Enumerate the principal functions of Directors of a company. [C. U. 1973]
[কোম্পানীর ডিরেক্টারদের প্রধান কাজগুলি বর্ণনা কর।] উঃ ১২১ পৃঃ

চতুর্থ খণ্ড

কোম্পানী সেক্রেটারীর কার্যপ্রণালী ও অফিস সংগঠন
SECRETARIAL PRACTICE & OFFICE ORGANISATION

অধ্যায়

৭

কোম্পানী সেক্রেটারীর কার্যপ্রণালী*
SECRETARIAL PRACTICE

সেক্রেটারীর সংজ্ঞা (DEFINITION OF A SECRETARY)

ল্যাটিন ভাষায় 'Secretarius' শব্দের অর্থ হল, গোপনীয়তা রক্ষাকারী পদস্থ কর্মচারী। তা থেকে ইংরেজী 'Secretary' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এর দ্বারা রাজা ও প্রধান-রাজপুরুষদের অধীন গোপনীয় পত্রালাপের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বোঝাত। কিন্তু বর্তমানে এই শব্দটির অর্থের প্রসার ঘটেছে। অক্সফোর্ড অভিধানে 'সেক্রেটারী' শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'যার কাজ হল অন্যের হয়ে পত্রাদি লেখা; বিশেষত যাকে অপর কোন ব্যক্তি, সমিতি, বিধিবদ্ধ সংস্থা বা সাধারণ সংস্থার পক্ষ হয়ে পত্রাদি লিখতে, দলিলাদি সংরক্ষণ করতে ও অন্যান্য নানারূপে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত নিয়োগ করা হয়।'

আধুনিক কালে ছোটখাটো সাংস্কৃতিক সমিতি, ক্লাব, ক্রীড়াসঙ্ঘ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন কোম্পানী, পৌরনিগম সংস্থা ও সরকারী দপ্তর পর্যন্ত, সর্বত্র, কি সামাজিক, কি অর্থনীতিক, কি রাষ্ট্রনীতিক নানা রূপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই সেক্রেটারী বা কর্মসচিবের পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষত, আধুনিক বৃহদায়তন কারবারে ম্যানেজিং ডিরেক্টার প্রভৃতি কর্মকর্তাদের পক্ষে একাকী একই সঙ্গে খরিদ্দারবর্গ ও অধীন কর্মচারীবর্গের সাথে দৈনন্দিন ব্যক্তিগত সংযোগ রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ায় সেক্রেটারীর উপরই মধ্যস্থরূপে একদিকে কর্মকর্তা এবং অপর দিকে কর্মচারিগণ ও কোম্পানীর বাইরের ব্যক্তিদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার ভার পড়েছে।

বিভিন্ন প্রকারের সেক্রেটারী (TYPES OF SECRETARIES)

বর্তমানে নানা প্রকার সেক্রেটারীদের মধ্যে প্রধান কয়েক প্রকারের সেক্রেটারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে করা গেল :

ক. ব্যক্তিগত সেক্রেটারী বা একান্ত সচিব[1] : রাজনীতি, সামাজিক ও কারবারী ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তিরা সাধারণত কর্মব্যস্ততার জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন না বলে, ঐ সব বিষয়ে পত্রালাপ ও আনুষঙ্গিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য একান্ত সচিব নিয়োগ করেন।

বিভিন্ন প্রকারের সেক্রেটারিগণের মধ্যে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ সম্ভবত সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, বৈচিত্র্যময় এবং শ্রমসাধ্য।

প্রাইভেট সেক্রেটারীকে নিয়োগকর্তার স্বার্থের সাথে নিজের স্বার্থকে সর্বদাই এক করে দেখতে হবে এবং উৎসুক ও অনুগত কর্মী হতে হবে। তাঁর কাজের প্রকৃতি হল একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। নিয়োগকর্তার সম্পর্কে এমন অনেক গোপনীয় তথ্যাদি তিনি জানতে পারেন যা বাইরে প্রকাশ পেলে নিয়োগকর্তার সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। অতএব, একদিকে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করে চলতে হবে এবং অপরদিকে এরূপ সুকৌশলে সকলের সাথে প্রিয় ব্যবহার করতে হবে

---

* বিশেষভাবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য।

1. Private Secretary.

যেন, কেউ অসন্তুষ্ট না হয়। দায়িত্ব সুদক্ষভাবে পালনের জন্য তাঁকে সময়ানুবর্তী সুশৃংখল ও আনন্দচিত্ত হতে হবে। সর্বোপরি তাঁকে নিয়োগকর্তার চরিত্র, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, অভ্যাস, রুচি প্রভৃতি ভাল করে বুঝে নিতে হবে যেন আগে থেকেই তিনি নিয়োগকর্তার ইচ্ছা ও মনোভাব বুঝে প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদন করতে পারেন।

প্রয়োজনীয় গুণাবলী: উচ্চ পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও, প্রাইভেট সেক্রেটারীর আর যে সকল গুণ থাকা দরকার, তা হল—ক· কোন পেশা শিক্ষাদানকারী কলেজ থেকে সেক্রেটারীর কাজ সম্পর্কে শিক্ষা। খ· কারবারী ও অফিস কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা ও বাস্তব শিক্ষা। গ· হিসাবরক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান। ঘ. ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান। ঙ. নানারূপ কমিটি ও সভা সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান। চ· উত্তম সাধারণ জ্ঞান। এবং ছ. প্রয়োজনীয় স্থলে কোন বিদেশী ভাষা সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান। তা ছাড়া, উপস্থিত বুদ্ধি, ভালমন্দ বিচার, নির্ভরযোগ্যতা, শৃংখলা জ্ঞান, সতর্কতা ও তীক্ষ্ম অনুভূতি, অনুপাতজ্ঞান, দায়িত্ববোধ, বিশ্বস্ততা, উৎসাহ, উত্তম স্মরণশক্তি ও শ্রুতিমধুর স্বর প্রভৃতি গুণাবলী থাকা তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয়।

কর্তব্য: ১. রুটিন ধরনের অফিস সংক্রান্ত কার্যাবলী: নিয়োগকর্তার নিকট থেকে চিঠিপত্রের শ্রুতিলিখন নেওয়া ও তা টাইপ করে দেওয়া; প্রয়োজন হলে ডুপ্লিকেটর ও অন্যান্য শ্রম সংক্ষেপের যন্ত্রাদি ব্যবহার; বহিরাগত ও বহির্গামী ডাক গ্রহণ ও প্রেরণ, নথিবদ্ধকরণ ও অনুক্রমণী প্রণয়নসহ যাবতীয় দলিলপত্র সংরক্ষণ, হিসাব বই সহ অন্যান্য নানাবিধ তালিকা বই প্রভৃতি রাখা।

২· **রচনাসংক্রান্ত কার্যাবলী:** উপরোক্ত কর্তব্য পালনের জন্য তাঁকে রুটিন মাফিক পত্রালাপ রচনা, নিজের বা নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে নানারূপ বিবরণ, বিবৃতি রচনা, নিয়োগকর্তার বক্তৃতা রচনা ও নিয়োগকর্তার জন্য চিঠিপত্র, বিবরণ, স্মারকলিপি ইত্যাদির সারাংশ প্রস্তুত করা ও নিয়োগকর্তার বক্তৃতা, রচিত পুস্তক ইত্যাদি মুদ্রণের সময় সেগুলির প্রুফ সংশোধন করা।

৩· **অভ্যর্থনাকারীরূপে কর্তব্য:** তাঁর অন্যতম কর্তব্য হল নিয়োগকর্তার পক্ষে অভ্যাগত ও সাক্ষাৎপ্রার্থিগণকে অভ্যর্থনা করা, তাদের প্রশ্নের সম্ভবমত জবাব দেওয়া, নিয়োগকর্তার সাথে তাদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেওয়া, টেলিফোন ধরা ও টেলিফোন করা, নিয়োগকর্তার ডায়েরী, অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা ও তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

৪. **অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলী:** নিয়োগকর্তার ব্যাংকের হিসাব রাখা, তিনি যে সব নগদ টাকা ও চেক পাবেন তা নির্দেশমত ব্যাংকে পাঠান, তাঁর চেক ভাঙ্গিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তোলা, চেকে চাঁদা, কর্মচারীদের বেতন, মজুরি, কর, বিল প্রভৃতি মিটিয়ে দেওয়া, বীমার প্রিমিয়াম দেওয়া ও তা প্রদানের সময় সম্পর্কে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

৫· **পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য:** প্রাইভেট সেক্রেটারী আবাসিক হলে তাঁকে নিয়োগকর্তার অনেক পারিবারিক কর্মও সম্পাদন করতে হয়। যথা, তাঁর বাড়ীর কর্মচারী, ভৃত্য ও বেয়ারা, খানসামা প্রভৃতির বেতন ও মজুরি প্রদান, নিয়োগকর্তার ভ্রমণ সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করা, টিকিট কেনা, নিয়োগকর্তা বাড়ীতে বা হোটেলে ভোজ দিলে তার বন্দোবস্ত করা, নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ও উত্তর দেওয়া, নিয়োগকর্তার নির্দেশমত ব্যক্তিগণকে খৃষ্টমাস, জন্মদিন, নববর্ষ, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র পাঠান, শোকে সমবেদনামূলক পত্র পাঠানো।

৬· **সভা ও কমিটি সম্পর্কিত কর্তব্য:** নিয়োগকর্তা কোন সামাজিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হলে প্রাইভেট সেক্রেটারীকে নিম্নলিখিত কর্তব্যও পালন করতে হয়:

সভার আলোচ্য বিষয় তালিকাসহ সভা আহবানের নোটিস প্রস্তুত ও বিলি, সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করা, সভা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি প্রস্তুত রাখা, নিয়োগকর্তা সভাপতি হলে তাঁকে সভা চালনায় সাহায্য করা, সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি।

খ. সমিতি বা ক্লাবের সেক্রেটারী: সাংস্কৃতিক সমিতি, ক্রীড়া-সমিতি, ক্লাব, কারবারী সংঘ, বণিক সভা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠন তাদের কাজের সুবিধার জন্য সদস্যগণের মধ্য থেকে কেহকে অবৈতনিক সেক্রেটারী অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে বেতনভুক্ সেক্রেটারী নিয়োগ করতে পারে। অবৈতনিক সেক্রেটারী হলে সাধারণত আংশিক সময়ের ও বেতনভুক্ সেক্রেটারী হলে সারাসময়ী কর্মী হয়ে থাকে। সংগঠন অনুসারে তাঁর কাজের বিভিন্নতা থাকলেও, মোটামুটিভাবে তাঁকে তিনটি ভূমিকা পালন করতে হয়। একটি হল কার্যনির্বাহক কর্মচারী ও দ্বিতীয়টি হল প্রতিনিধি এবং তৃতীয়টি হল পরামর্শদাতা। কার্যনির্বাহক কর্মচারী[2] রূপে তার কাজ হল—১. সমিতির অন্যান্য নিম্নতর কর্মচারিগণের কার্যাবলী তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করা; ২. সমিতির আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে তার কার্যকলাপ চলেছে কিনা তা দেখা; ৩. সমিতির সভা, অনুষ্ঠান প্রভৃতি আহবান ও তৎসংক্রান্ত আয়োজন করা, হিসাবপত্র রাখা, নগদ টাকা রাখা, ব্যাংকের হিসাব রাখা, হিসাব নিরীক্ষা করান ইত্যাদি।

প্রতিনিধিরূপে তাঁর কাজ হল—১. সমিতির কার্যনির্বাহক সমিতির মুখপাত্ররূপে কাজ করা; ২. কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত কার্যকর করা, ৩. সমিতি সংক্রান্ত কাজে সরকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সাক্ষাৎকার, পত্রালাপ করা; ৪. সমিতির পক্ষ থেকে বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা।

পরামর্শদাতারূপে তাঁর কাজ হল—১. সমিতির সংবিধান ও নিয়মাবলী প্রণয়ন, সংশোধন করা; ২. সদস্যগণের কেউ সমিতির নিয়মভঙ্গ করলে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সমিতিকে পরামর্শ দান; ৩. আইনগত বিষয়ে পরামর্শ দান।

গ. সমবায় সমিতির সেক্রেটারী: বঙ্গীয় সমবায় সমিতির নিয়মে বলা হয়েছে যে, "ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সমেত ম্যানেজিং কমিটির নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে যে ব্যক্তি সমবায় সমিতির কার্যের ব্যবস্থাপনা করেন অথবা সেক্রেটারীর কার্য সম্পাদন করছেন এরূপ যে কোন ব্যক্তি, তাঁকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন এবং তাঁর কাজ কোন চাকরির চুক্তির অন্তর্গত হোক বা না হোক", তাঁকেই সেক্রেটারী বলা যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ম্যানেজিং কমিটির কোন সদস্য বা বাইরের কেউ বেতনভুক্ কর্মচারীরূপে সমবায় সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হতে পারেন।

সমবায় সমিতির সেক্রেটারীর প্রধান কাজ হল—১. সমবায় সমিতির নিয়মমাফিক অফিসের কাজকর্ম পরিচালনা করা। যথা, পত্রালাপ, দলিলপত্র ও হিসাবাদি রক্ষণ, হিসাব বই ও বিবিধ রেজিস্টারী রক্ষণ, নগদ টাকা গ্রহণ ও ব্যয়করণ, সমবায়ের নিবন্ধকের নিকট পেশ করার জন্য নানাবিধ বিবরণ, বিবৃতি প্রস্তুত করা।

২. সমিতির সভা আহবান করা ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা ও কাগজপত্র প্রস্তুত করা।

৩. ম্যানেজিং কমিটির মুখপাত্ররূপে সমিতির কর্মচারিবর্গ, সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, সরকার ও জনসাধারণের সাথে কার্যকলাপ চালানো।

৪. আইনগত ও অন্যান্য বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটিকে পরামর্শ দান।

৫. তাঁর উপর কোন তদন্তের ভার পড়লে তা সম্পাদন করা ও তৎসংক্রান্ত বিবরণ দেওয়া।

ঘ. কোন সাধারণী সংস্থার[3] সেক্রেটারী: পঞ্চায়েত, পৌরনিগম প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীরা এর অন্তর্গত। এই সব প্রতিষ্ঠানে সেক্রেটারীর পদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং আইনের দ্বারাই তা স্বীকৃত।

---

2. Executive Officer.   3. Public Body.

পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যাল আইনে এই কারণে সেক্রেটারী নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। এই প্রকারের সেক্রেটারীর প্রধান কাজ হল :

১. প্রধান কর্মনির্বাহক রূপে কাজ করা।
২. অফিসের সকল বিভাগের কার্যাবলীর সংযোজন ও তদারক করা।
৩. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার কর্মচারীবর্গের মধ্যে যোগাযোগ রাখা।
৪. সংস্থার বাজেট প্রস্তুত করা।
৫. সংস্থার সভা আহ্বান ও তার অধিবেশন সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করা।

কোম্পানীর সেক্রেটারী (COMPANY SECRETARY)

কোম্পানী আইন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং কোম্পানীর সেক্রেটারীর কাজে সুশিক্ষিত ও সবিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর যৌথমূলধনী কারবারের দপ্তর পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে তিনিই হলেন কোম্পানীর সেক্রেটারী।

তিনি কোম্পানীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের অন্যতম এবং তার সর্বক্ষণের কর্মী। পরিচালক সংসদের তিনিই হলেন মুখপাত্র। পরিচালক সংসদকে যদি কোম্পানীর মাথা বলে গণ্য করা যায় তবে সেক্রেটারী হলেন তার চোখ, কান ও হাত। কোম্পানী আইন, কোম্পানীর কারবার, ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনীতিক জগৎ সম্পর্কে তাঁর সুবিস্তৃত জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা, পরিচালকগণ ও কোম্পানীর বিধিব্যবস্থার সাথে নিজের সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা, কার্য-দক্ষতা, তীক্ষ্ম বুদ্ধি, বিচারশক্তি ইত্যাদি গুণাবলী সেক্রেটারীর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেজন্য উপযুক্ত ও সুযোগ্য সেক্রেটারীর নির্বাচনকার্য কোম্পানীগঠনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সাফল্য সেক্রেটারীর যোগ্যতার উপর সবিশেষ নির্ভরশীল।

সেক্রেটারীর কার্যাবলী: কোম্পানী নিবন্ধনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং ধরাবাঁধা[4], এই তিন পর্যায়ে সেক্রেটারীর কাজগুলিকে ভাগ করা যায়।

ক. নিবন্ধনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে : কোম্পানীগঠনের প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তক-গণের সভায় উপস্থিত থেকে সভার আলোচনা ও কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা; মেমোরান্ডাম, আর্টিক্‌ল্‌স্ ও প্রসপেক্টস প্রভৃতি কোম্পানীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলসমূহের খসড়া প্রণয়ন করা এবং নিবন্ধনের জন্য কোম্পানী আইনানুযায়ী যাবতীয় দলিলপত্র নিবন্ধকের নিকট দাখিলের ব্যবস্থা করা।

খ. নিবন্ধনের পরবর্তী পর্যায়ে: ১. মেমোরান্ডাম ও আর্টিক্‌ল্‌স্ এবং পরি-চালকমণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত বিধিসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। ২. নিবন্ধনের পর পরিচালকমণ্ডলীর প্রথম সভা আহ্বান করা এবং আর্টিক্‌ল্‌স্ দ্বারা ঐ সভার সভাপতি নিয়োগ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া না থাকলে তার সভাপতি নির্বাচন, কর্মসচিব, ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক বা একাউন্ট্যান্ট ও অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মচারীদের নিয়োগ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। ঐ সভাতেই ব্যাংকে হিসাব খোলা এবং চেক ও অন্যান্য দলিলপত্রাদিতে স্বাক্ষরকারী নিয়োগ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণে সাহায্য করা। ৩. প্রয়োজনবোধে পরিচালকমণ্ডলীর বিভিন্ন সাব-কমিটি, যথা, ফিনান্স সাব-কমিটি, ওয়ার্কস্ সাব-কমিটি প্রভৃতি নিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণে সাহায্য করা। ৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণের স্ট্যাটু-টরী সভা আহ্বান করা ও নিবন্ধকের নিকট স্ট্যাটুটরী রিপোর্ট দাখিলের ব্যবস্থা করা। ৫. যথাসম্ভব শীঘ্র কোম্পানীর কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র[5] সংগ্রহ করা। ৬. নিয়মমাফিক নির্দিষ্ট পরিচালকগণের উপস্থিতিতে নিজের প্রতি-স্বাক্ষর সহ

4. Rountine work. 5. Certificate of Incorporation.

কোম্পানীর দলিলাদি যথাযথরূপে সীলমোহরের ব্যবস্থা করা। ৭. কোম্পানীর আইন-নির্দিষ্ট হিসাবের বইগুলি[6] রাখার ব্যবস্থা করা।

গ. ধরাবাঁধা কার্যাবলী[7]: ১. কোম্পানীর সকলপ্রকার সভার আলোচ্য বিষয়সূচী[8] সহ বিজ্ঞপ্তি[9] প্রস্তুত ও প্রেরণ করা। ২. যাবতীয় সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা। ৩. কোম্পানীর পক্ষ থেকে কোন বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করা। ৪. শেয়ার ও ডিবেঞ্চারসমূহের আবেদন, বিলি, ও তলব সম্পর্কে তদারক করা। ৫. শেয়ার সার্টিফিকেট পাঠাবার ব্যবস্থা করা। ৬. লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা। ৭. আইনসম্মত শেয়ার হস্তান্তর অনুমোদন করা। ৮. কোম্পানীর স্ট্যাটুটরী ও অন্যান্য বইয়ে সকলপ্রকার লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা। ৯. বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনমত নিবন্ধকের নিকট বিবিধ বিবরণ ও হিসাব পত্রাদি দাখিল করা।

কর্মসচিবের দায়-দায়িত্ব[10]: কোম্পানীর বেতনভূক কর্মচারী হিসাবে, নিজস্ব দোষত্রুটির জন্য কর্মসচিব যে শুধু কোম্পানীর নিকট দায়ী তা নয়, আইনের সেবক হিসাবে তিনি এজন্য আইনের নিকটও দায়ী এবং কোম্পানীর আইননির্দিষ্ট যথাকর্তব্য পালন না করার জন্য তাঁকে পরিচালকগণের সাথে সমপরিমাণে দায়ী বলে গণ্য করা হয়।

কোম্পানীর সেক্রেটারীর কর্তব্যসমূহ: কোম্পানীর সেক্রেটারীর কর্তব্যগুলিকে নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়:

১. বিধিবদ্ধ কর্তব্য[11]: সেক্রেটারীকে কোম্পানীর পক্ষ থেকে নানা প্রকার আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। এদের বিধিবদ্ধ কর্তব্য বলে। যে সকল আইন থেকে এই সব বিধিবদ্ধ কর্তব্যের উৎপত্তি হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোম্পানী আইন, আয়কর আইন, ফিনান্স আইন, স্ট্যাম্প আইন, চুক্তি আইন, শিল্প বিরোধ আইন, কারখানা আইন, কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন ইত্যাদি। এই সকল আইনের নির্দেশ অনুযায়ী সেক্রেটারীকে নানা প্রকার বিবরণ, বিবৃতি ইত্যাদি সর্বদাই দাখিল করতে হয় ও কোম্পানীর নানা কাজে ঐ সকল আইনের নির্দেশগুলি পালনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

২. পরিচালকগণের প্রতি কর্তব্য[12]: পরিচালক পর্যদের সভাগুলিতে প্রয়োজনীয় নানা তথ্যাদি সরবরাহের জন্য সেক্রেটারীকে সর্বদাই উপস্থিত থাকতে হয়। প্রধান পরিচালকের নির্দেশমত পরিচালক পর্যদের সভা আহ্বান করা ও তার বিষয়সূচী প্রস্তুত ও তা সকল পরিচালকগণের নিকট সভার নোটিশের সাথে পাঠান তারই কর্তব্য। সভার কার্যবিবরণীও তাকে লিখতে ও সিদ্ধান্তগুলি তাকেই কাজে পরিণত করতে হয়। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র ও কোম্পানীর সীলমোহরাদি নিরাপদে রাখাও তার কর্তব্যের অন্তর্গত।

৩. শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি কর্তব্য[13]: কোম্পানীর মালিক হিসাবে শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি সেক্রেটারীর কর্তব্য হল তাদের স্বার্থ নিরাপদ করা ও তাদের সেবার জন্য কাজ করা। কোম্পানীর সভা ডাকা, সভার বিবরণ রাখা, শেয়ার আবণ্টনপত্র প্রস্তুত করা, তলবী অর্থপ্রদানের নোটিশ প্রস্তুত করা ও বিলি করা, শেয়ার হস্তান্তর লিপিবদ্ধ করা, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রস্তুত ও বিলি করা, লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি তার কর্তব্যের অন্তর্গত।

৪. জনসংযোগ সংক্রান্ত কর্তব্য[14]: কোম্পানীর গোপনীয় তথ্যের নিরাপত্তা বজায় রেখে সেক্রেটারীর কর্তব্য হল কোম্পানীর কার্যাবলীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আগ্রহান্বিত কোম্পানীর পাওনাদার, ব্যাঙ্কার, ডিবেঞ্চারহোল্ডার, সম্ভাব্য বিনিয়োগ-

---

6. Statutory Body. 7. Routine Functioning. 8. Agenda.
9. Notice. 10. Liabilities of the Secretaries.
11. Statutory Duties. 12. Duties in relation to Directors.
13. Duties in relation to Shareholders.
14. Duties regarding Public Relations.

কারী ও সংবাদপত্র ইত্যাদি জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোম্পানীর কার্যাবলী সম্পাদিত নানারূপ তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা করা। এর ফলে কোম্পানীর প্রতি জনসাধারণের অনুকূল মনোভাব গঠিত হতে পারে।

৫. অফিস সম্পর্কে সেক্রেটারীর কর্তব্য[15] : কোম্পানীর সাধারণ অফিসটি হল তার কারবারী সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র। এটি অপরাপর ক্রিয়াগত বিভাগগুলির কর্মের সংযোজন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। সেক্রেটারীর কাজ হল প্রধান কার্যালয়ের তদারক করা। অফিস সংক্রান্ত বহুবিধ কর্তব্য তাঁকে পালন করতে হয়। কারবারের প্রকৃতি ও ধরন অনুসারে বিভিন্ন কোম্পানীতে তার অফিস সংক্রান্ত কার্যাবলীর তারতম্য থাকলেও মোটামুটিভাবে সর্বত্রই তার প্রধান কার্যাবলী একরূপ। বড় বড় অফিসে যেখানে অনেকগুলি বিভাগ আছে, সেখানে তাঁর কর্তব্য হল ঐ সকল বিভাগের কার্যাবলীর তদারক করা। কিন্তু ছোট অফিসে সেক্রেটারীকে ছোটখাট কর্তব্য থেকে আরম্ভ করে বহুবিধ কর্তব্যই নিজ হাতে সম্পাদন করতে হয়। তার প্রধান কর্তব্যগুলি নিম্নরূপঃ ১. বহিরাগত ডাক গ্রহণ, বাছাই ও বণ্টন; ২. অধস্তন কর্মচারীর মধ্যে কার্যভার বণ্টন; ৩. রুটিনমাফিক ও রুটিনবহির্ভূত চিঠিপত্রাদি, প্রচারপত্র, বিজ্ঞপ্তি ও বিবরণাদি রচনা; ৪. শ্রুতিলিখন গ্রহণ ও বহির্গামী ডাকের জন্য চিঠিপত্রাদি টাইপ করা; ৫. বহির্গামী ডাক প্রেরণ; ৬. নথিবন্ধকরণ ও অনুক্রমণী প্রস্তুতকরণ; ৭. টেলিফোন ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাদি ব্যবহার; ৮. কর্মকর্তাদের জন্য কার্যসূচী প্রস্তুত ও তা সম্পাদনে সহায়তা করা; ৯. বিবিধ ব্যক্তিবর্গের ও অভ্যাগতদের সাথে সাক্ষাৎকার; ১০. সভা ও সম্মেলনের জন্য দলিলপত্রাদি প্রস্তুত করা, ১১. অফিসের জন্য নানাপ্রকার শ্রমসংক্ষেপ যন্ত্রাদি নির্বাচন, ক্রয়, ব্যবহার এবং উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ; ১২. অফিস কর্মচারী বাছাই ও তাদের দিয়ে কাজ করান; ১৩. কোম্পানীর সাথে তার কর্মচারীবর্গ ও বাইরের জনসাধারণ ও অন্যান্য সকলের সম্পর্ক, জনসংযোগ রক্ষা; ১৪. সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা, নোটিস বিলি ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া।

ডায়েরী এবং স্মরণ-সহায়িকা ব্যবহার
USE OF DIARY AND OTHER MEMORY AIDS

কর্মব্যস্ত নিয়োগকর্তাকে প্রতিদিনই বহুলোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়, বহু সভাসমিতিতে যেতে হয়, বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিতে হয়। এ সকল যাতে ঠিকমত সম্পাদিত হয় সেজন্য আগে থেকেই সেগুলির তারিখ, সময় ইত্যাদি স্থির করে রাখতে হয় এবং নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থানে তা সম্পাদন করতে হয়। এত অসংখ্য বিষয়ে কারও পক্ষে সম্পূর্ণ স্মরণ রাখা সম্ভব নয়। এজন্য সেক্রেটারীকে ডায়েরী রাখতে হয়। ডায়েরী ছাড়া আর যে সকল বস্তু তাকে স্মরণ রাখতে সাহায্য করে তা হল প্রাইভেট নোটবুক, ইনডেক্স কার্ড, পতাকা চিহ্ন[16] ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্মরণসহায়িকা হল তাঁর ডায়েরী।

প্রতিদিন সকালে উঠেই সেক্রেটারী দেখবেন সেদিনের কি কি পূর্বনির্ধারিত কর্তব্য তিনি ডায়েরীতে লিখে রেখেছেন। যখনই কোন বিষয়ে কারও সাথে নিয়োগকর্তার কোন সময়ে সাক্ষাৎকার স্থির হয়েছে, তখনই সেক্রেটারী তাঁর ডায়েরীতে ঐ সাক্ষাৎকার কার সাথে কোন্ তারিখে, কোন্ সময়ে কোথায় ঘটবে এবং কি বিষয়ে কথাবার্তা হবে, বা কোন্ সভায় বা সমিতিতে নিয়োগকর্তা যাবেন বলে কথা দিয়েছেন, সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি, কবে, কখন, কোন্ চেক সই করতে হবে, কোন্ চিঠিটি পাঠাতে হবে, বোর্ডের মিটিং কবে হবে, সেখানে কি করতে হবে ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় আগেই লিখে রেখেছেন। তারিখমত সেক্রেটারী সকালে প্রথমেই নিয়োগকর্তার ক্যালেন্ডারের তারিখ বদলে দিয়ে নিয়োগকর্তার ডায়েরীতে সেদিনকার কি কি সাক্ষাৎকার ও পূর্ব-

15. Duties regarding Office. 16. 'Flags'.

নির্ধারিত কর্তব্য আছে লিখে দেবেন এবং ঐগুলি যেন ঠিক ঠিক নির্ধারিত সময়মত সম্পন্ন হয় তা দেখবেন। এইভাবে সেক্রেটারী নানারূপ স্মরণসহায়িকার সাহায্যে নিয়োগকর্তাকে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করে থাকেন।

সেক্রেটারীর প্রয়োজনীয় তথ্যাদির উৎসসমূহ
REFERENCE SOURCES FOR THE SECRETARY

নিয়োগকর্তাকে প্রয়োজনমত যে কোন সময় নানা বিষয়ে তথ্যাদি সরবরাহ করা সেক্রেটারীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। স্বভাবতঃই কারও পক্ষেই এত বিষয়ে সঠিক তথ্য সর্বদা মনে রাখা সম্ভব নয়। এজন্য সেক্রেটারীকে হাতের কাছে ঐ সব তথ্যের উৎসগুলি মজুত রাখতে ও প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে হয়। এই উৎসগুলি চার প্রকার : ক. অভিধান, খ. ডিরেক্টরী, গ. গাইডবুক, এবং ঘ. সাধারণ তথ্যপুস্তক।

ক. অভিধান : বিবিধ শব্দের সঠিক বানান, উচ্চারণ ও অর্থ জানার জন্য তাঁকে প্রামাণ্য একাধিক অভিধানসমূহ কাছে রাখতে হয়।

খ. ডিরেক্টরী : নানারূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে টেলিফোন আলাপের সুবিধার জন্য টেলিফোন ডিরেক্টরী, শহরের পথঘাটের সন্ধানের জন্য স্ট্রীট ডিরেক্টরী ও পথঘাটের ম্যাপ, নানারূপ কারবারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা সংগ্রহের জন্য বিজনেস ডিরেক্টরী, বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনে সংবাদপত্র ও পত্রিকার ডিরেক্টরী ইত্যাদির ব্যবহার করতে হয়।

গ. গাইডবুক : ডাক ও তার বিভাগ সম্পর্কে, রেল, জাহাজ ও বিমান পরিবহণ ও দ্রব্যসামগ্রী পাঠানো ও আনানো সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পাওয়ার জন্য তাঁকে পোস্ট্যাল গাইডবুক, শিপিং গাইডবুক, সরকারী রেলওয়ে গাইডবুক, এয়ারওয়েজ গাইডবুক, রোডওয়েজ গাইডবুক ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

ঘ. সাধারণ তথ্যপুস্তক : এ ছাড়া নানাবিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জানার জন্য তাকে যে সকল হরেক রকমের সাধারণ তথ্যপুস্তক ব্যবহার করতে হয় তা হল—Who's Who, Year Book, Almanac, Stock Exchange Year Book ইত্যাদি।

কোম্পানীর দলিলপত্র রচনা ও মিনিটস্ লিপিবদ্ধকরণ
DRAFTING OF DOCUMENTS AND MINUTES

কোম্পানী গঠন ও পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে সেক্রেটারীকে যে সকল দলিলপত্র রচনায় অংশগ্রহণ করতে হয় তার নমুনা নিচে দেখান হল।

১. একটি কোম্পানীর মেমোরান্ডামের নমুনা : ....

শেয়ারের দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত একটি কোম্পানীর মেমোরান্ডাম-এর নমুনা

ভারত নৌপরিবহণ কোম্পানীর মেমোরাণ্ডম

১ম—এই কোম্পানীর নাম "ভারত নৌ-পরিবহণ কোম্পানী লিমিটেড।"
২য়—এই কোম্পানীর নিবন্ধভুক্ত অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত হবে।
৩য়—বিভিন্ন সময়ে কোম্পানী যে সকল স্থানে প্রয়োজন মনে করবে সেখানে নৌকায় বা জাহাজে যাত্রী ও পণ্য বহন এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাদি নির্বাহ করাই এর উদ্দেশ্য।
৪র্থ—এর সভ্যগণের দায় সীমাবদ্ধ।
৫ম—এর পুঁজি দশ লক্ষ টাকা, প্রতিটি একশত টাকা মূল্যের দশ হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

আমরা, নিম্নলিখিত নাম ও ঠিকানা উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যক্তিরা এই মেমোরান্ডা-মের অনুসরণে একটি কোম্পানীরূপে সংগঠিত হতে ইচ্ছুক এবং কোম্পানীর পুঁজি থেকে আমাদের প্রত্যেকের নামের পাশে উল্লেখ মত শেয়ার কিনতে সম্মত আছি।

স্বাক্ষরকারিগণের নাম, ঠিকানা, বর্ণনা ও পেশা	প্রত্যাক স্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা
১. শ্রীকমল শেঠ,—মহত্মা গান্ধী রোড়, কলিকাতা, ব্যবসায়ী	২০০
২. „ বিনয় দত্ত,—নং মণি পার্ক, কলিকাতা „	২০০
৩. „ মতিলাল মোটা—নং কুইন্স রোড, বোম্বে „	১০০
৪. „ হীরুভাই দেশাই—নং ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বে „	১০০
৫. „ এস. কে. গুহ,—কালিঘাট রোড, কলিকাতা „	১০০
৬. " রামলাল সেন,—নং বেলেলিয়াস রোড, হাওড়া "	৫০
৭. " বীরেন মুখার্জী,—নং রেনি পার্ক, কলিকাতা "	৫০
মোট	৮০০

৪ঠা মার্চ ১৯৬৪

সাক্ষী ঃ শ্রীঅবনী হালদার,—নং বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

২. বিধিবদ্ধ সভার বিজ্ঞপ্তি[17] ঃ

হিন্দুস্থান ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড

বিধিবদ্ধ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ১৬৫নং ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত কোম্পানীর বিধিবদ্ধ সভা ১৯৬৪ সালের ৩১শে আগস্ট, বেলা ৩ ঘটিকায় কোম্পানীব বিধিবদ্ধ কার্যালয়—৩৩১নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-কাতা-তে অনুষ্ঠিত হবে।

যথাযথরূপে প্রত্যায়িত এবং কোম্পানী আইনের ১৬৫নং ধারা অনুসারে যা দাখিল করতে হবে, সেই বিধিবদ্ধ বিবরণীর একটি নকল এই বিজ্ঞপ্তির সাথে পাঠান হল।

৩৩১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯।
১লা আগস্ট, ১৯৬৪

পরিচালকপর্ষদের
অনুমতানুসারে
প. ফ. ব.
সেক্রেটারী

৩. বিধিবদ্ধ বিবরণীর[18] নমুনা ঃ

হিন্দুস্থান ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড

পরিচালকগণের বিধিবদ্ধ বিবরণী

কোম্পানীর নাম—হিন্দুস্থান ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড।

যে কোম্পানীর বিধিবদ্ধ বিবরণী—হিন্দুস্থান ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড।

১৬৫ (৫) ধারা অনুযায়ী প্রত্যায়িত ও নথিভুক্ত।

দাখিলকারী—শ্রী.......................

বিধিবদ্ধ সভার তারিখ ও স্থান।......... ....

১৬৫ ধারা অনুযায়ী পরিচালকপর্ষৎ এই বিধিবদ্ধ বিবরণীটি শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট পেশ করছেন।

১. আবণ্টিত শেয়ারের সংখ্যা.........(এখানে মোট আবণ্টিত শেয়ার সংখ্যা, তার শ্রেণীবিভাগ, মুদ্রিত মূল্য, নগদের পরিবর্তে অন্যরূপে দাম নেওয়া বাবদ আবণ্টিত শেয়ার। প্রাপ্ত নগদ অর্থ প্রভৃতির উল্লেখ করতে হয়)।

17. Notice of the Statutory Meeting. 18. Statutory Report.

২. কোম্পানীর আয় ও ব্যয়.........(এখানে বিবরণী প্রস্তুতের ৭ দিনের মধ্যে কোম্পানীর প্রাপ্ত মোট আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার দিতে হয়)।

৩. বিবরণ পত্র বা তার বিকল্প বিবরণে প্রারম্ভিক খরচের যে হিসাব উল্লেখ করা হয়েছিল...............

৪. কোম্পানীর পরিচালকগণের, নিরীক্ষকগণের, ম্যানেজারের এবং সেক্রেটারীর নাম, ঠিকানা ও পেশার বিবরণ.........

৫. এই সভায় সংশোধন করতে হবে এরূপ কোন চুক্তির বিবরণ.........

৬. প্রত্যেকটি দায়গ্রহণের চুক্তি যে পরিমাণে পালন করা হয়েছে বা হয় নি।......

৭. পরিচালকগণ, বা ম্যানেজারের কাছে তলবী অর্থবাবদ বকেয়া পাওনা.........

৮. কোন পরিচালক বা ম্যানেজারের কাছে বিক্রয় করা বা তাদের কাছে বিলিকরা শেয়ারের উপর প্রদত্ত বা প্রদেয় কমিশন বা দালালির বিবরণ......

এতদ্দ্বারা আমরা উপরোক্ত বিবরণ সত্য বলে প্রত্যায়িত করছি।

ক. খ. গ.
পরিচালক
ঘ. ঙ. চ.
পরিচালক
তারিখ.........

এই বিবরণীতে কোম্পানীর আবণ্টিত শেয়ার ও তদ্দরুন প্রাপ্ত নগদ অর্থ এবং আয় ও ব্যয় সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা আমরা এতদ্দ্বারা সত্য বলে প্রত্যয়ন করছি।

ট. ঠ. ড.
নিরীক্ষক
তারিখ..........

৪. **পরিচালকপর্ষদের প্রথম সভার বিজ্ঞপ্তির নমুনা**[19] **:**

শ্যামসুন্দর রেয়ন মিল্‌স্‌ লিমিটেড

প্রাপক — শ্যামসুন্দর ভবন
শ্রী এস. কে. বসু — ১৯, শ্যামসুন্দর রোড,
(পরিচালক) — কলিকাতা ৪ঠা জুলাই, ১৯৬৪

প্রিয় মহাশয়,

আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানাচ্ছি যে, পরিচালক পর্ষদের প্রথম সভা কোম্পানীর নিবন্ধকৃত কার্যালয়ে আগামী ১২ই জুলাই, ১৯৬৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। তাতে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আপনার অবগতির জন্য ঐ সভায় মুদ্রিত বিষয়সূচীর একটি প্রতিলিপি এই পত্রের সাথে পাঠান হল।

আপনার বিশ্বস্ত
বি. দত্ত
সেক্রেটারী

৫. **কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির নমুনা**[20] **:**

বিচিত্রা কটন মিলস লিঃ

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ১৯৬৪ সালের ২৮শে আগস্ট, বেলা ১২টায় কলিকাতা, ৩৭নং নেতাজী সুভাষ রোড, সর্বোচ্চ তলস্থিত কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে নিচে বর্ণিত উদ্দেশ্যে বিচিত্রা কটন মিল্‌স্‌ লিঃ-এর একত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে :—

(১) বোর্ড-এর রিপোর্ট বিবেচনা ও উপযুক্ত বিবেচিত হলে তা সংশোধন সহ বা বিনা সংশোধনে গ্রহণ ও মঞ্জুর।

19. Specimen Notice of the First Board Meeting.
20. Specimen Notice of the Annual General Meeting.

(২) ১৯৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ব্যালান্সশীট এবং ১৯৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই বৎসরের মুনাফা ও ক্ষতির হিসাব বিবেচনা ও উপযুক্ত বিবেচিত হলে তা গ্রহণ ও মঞ্জুর।

(৩) এই সভায় অবসরগ্রহণকারী মিঃ এম. কে. দাসের স্থলে একজন ডিরেক্টর নির্বাচন, কিন্তু পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য বিধায় তিনি পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী।

(৪) এই সভায় অবসরগ্রহণকারী মিঃ এস. কে. দের স্থলে একজন ডিরেক্টর নির্বাচন, কিন্তু পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য বিধায় তিনি নির্বাচনপ্রার্থী।

(৫) এই সভায় অবসরগ্রহণকারী অতিরিক্ত ডিরেক্টর মিঃ বি. এম. দত্তর স্থলে একজন ডিরেক্টর নির্বাচন।

বিশেষ কার্য হিসাবে:

(৬) (ক) ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৮১ ধারানুসারে এই কোম্পানীর একজন অবসরগ্রহণকারী ডিরেক্টর, মিঃ অরুণকুমার সেনকে, যিনি ইতিপূর্বেই ৭৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন, বার্ষিক সাধারণ সভায় জনৈক অংশীদার কর্তৃক উপস্থাপনীয় নিম্নোক্ত প্রস্তাবানুসারে নিয়োগ করা। "সিদ্ধান্ত করা হল যে, এই কোম্পানীর একজন অবসরগ্রহণকারী ডিরেক্টর, অরুণকুমার সেন, যিনি ইতিপূর্বেই ৭৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন, ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৮১ ধারানুসারে এই কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হোন ও এতদ্বারা হলেন এবং এতদ্বারা ঘোষণা করা হল যে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৮০ ধারানুসারে নির্ধারিত বয়ঃসীমা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।"

(খ) ৯/১এ, দমদম রোড, কলিকাতা—ঠিকানাস্থিত মিঃ আর. পি. মিত্রকে, যিনি ইতিপূর্বেই ৭১ বৎসরে উপনীত হয়েছেন এবং যিনি নিযুক্ত হলে ডিরেক্টার হিসাবে কাজ করতে লিখিতভাবে তাঁর স্বীকৃতি কোম্পানীর নিকট পেশ করেছেন, বার্ষিক সাধারণ সভায় জনৈক অংশীদার কর্তৃক উপস্থাপনীয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব দ্বারা ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৮১ ধারানুসারে নিয়োগ করা। এর বিশেষ বিজ্ঞপ্তি কোম্পানী ইতিপূর্বেই পেয়েছেন।

"স্থির করা হল যে, ৯/১এ, দমদম রোড, কলিকাতা—ঠিকানাস্থিত মিঃ আর. পি. মিত্র, যিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশীদারগণ কর্তৃক নিযুক্ত হলে বিচিত্রা কটন মিলস্ লিঃ-এর একজন ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করতে লিখিতভাবে তাঁর সম্মতি কোম্পানীর কাছে পেশ করেছেন এবং তিনি ইতিপূর্বেই ৭১ বৎসরে উপনীত হয়েছেন, ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৮১ ধারানুসারে এই কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হোন এবং এতদ্বারা হলেন, এবং ঐ আইনের ২৮০ ধারানুসারে নির্ধারিত বয়ঃসীমা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।"

বিশেষ কার্য হিসাবে:

(৭) ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগ এবং/অথবা নিয়োগের অনুমোদন।

অনুরূপ অনুমোদনের জন্য জনৈক অংশীদার কর্তৃক উপস্থাপনীয় প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেছে যার মর্ম হল:

"স্থির করা হল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ১৯৬৪ সালের ১লা আগস্ট থেকে ৫ বৎসর সময়কালের জন্য মাসিক ২০০০ টাকা পারিশ্রমিকে কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর মিঃ এন. কে. রায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হোন।

বিশেষ কার্য হিসাবে:

(৮) সাধারণ প্রস্তাব হিসাবে উপস্থাপনীয় নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি বিবেচনা করা এবং উপযুক্ত বিবেচিত হলে সংশোধন সমেত বা বিনা সংশোধনে তা গ্রহণ করা।

"স্থির করা হল যে, কোম্পানীর মোট আদায়ীকৃত মূলধন এবং তার দায়মুক্ত সংরক্ষিত তহবিলের (অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত নয়) মোট পরিমাণের বেশি ঋণ গ্রহণ করতে বোর্ড অব ডিরেক্টর্সকে কোম্পানীর অনুমোদন দেওয়া হোক

ও এতদ্দ্বারা দেওয়া হচ্ছে এবং কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে সাধারণ ব্যবসায়ক্রমে লব্ধ বা লভ্য সাময়িক ঋণ ঐরূপ ঋণের বাইরে থাকবে কিন্তু উহা ৫০ লক্ষ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অতিক্রম করবে না।

(৯) হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

(১০) উপস্থাপিত হতে পারে এরূপ অন্য কোন কার্য নিষ্পন্ন।

কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর বই ১৯৬৪ সালের ৪ঠা আগস্ট থেকে ২৭শে আগস্ট (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩৭, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা—১
১৮ই জুলাই, ১৯৬৪

বোর্ডের অনুমত্যনুসারে
কে· এন· ঘোষ
সেক্রেটারী

ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি

১৯৬০ সালের কোম্পানীর সংশোধিত আইনের ১৭৩ ধারানুসারে।

দফা নং ৬(ক)—এই বার্ষিক সাধারণ সভায় একজন শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক উপস্থাপিতব্য উপরোক্ত প্রস্তাব দ্বারা ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৮১ ধারানুসারে মিঃ অরুণকুমার সেনকে (যিনি ৭৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন) নিয়োগ করা হবে, সেসম্পর্কে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেছে।

বোর্ডের বিবেচনায় কোম্পানীর ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ অরুণকুমার সেনের পুনর্নিয়োগ কোম্পানীর পক্ষে লাভজনক হবে।

দফা নং ৬ (খ)—এই সভায় একজন শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক উপরোক্ত প্রস্তাব দ্বারা ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৮১ ধারানুসারে কলিকাতা ৯/১এ, দমদম রোডস্থ শ্রী আর· পি· মিত্রকে নিয়োগ করা হবে, তৎসম্পর্কে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেছে। শ্রীমিত্র বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিযুক্ত হলে ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করার জন্য লিখিতভাবে সম্মতি দিয়েছেন এবং তিনি ইতিমধ্যে ৭১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন।

বোর্ডের বিবেচনায় কোম্পানীর ডিরেক্টর হিসাবে শ্রী আর. পি. মিত্রের নিয়োগ কোম্পানীর পক্ষে লাভজনক হবে।

দফা নং ৭—শ্রী এন· কে· রায়, (যাঁকে ১৯৬৩ সালের ১৫ই মে তারিখে ডিরেক্টর ইনচার্জ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগের সময় থেকে বিনা পারিশ্রমিকে কোম্পানীর জন্য সর্বক্ষণ কাজ করছেন।

তাঁকে যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান এবং তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে মাসিক ২০০০ টাকা পারিশ্রমিকে ১৯৬৪ সালের ১লা আগস্ট থেকে ৫ বৎসরের জন্য কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ সম্পর্কে বোর্ড এখন বিবেচনা করছে।

দফা নং ৮—১৯৬৩ সালের ২০শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সংশোধিত করার প্রয়োজন হওয়ায় দফা নং ৮ (খ)-এর অধীন এই প্রস্তাবটি বিশেষ কাজ হিসাবে প্রস্তাবিত হল।

বোর্ডের বিবেচনায় মিলের উন্নততর কাজের জন্য এটি প্রয়োজন।

সভায় যোগদান ও ভোটদানে অধিকারী কোন সদস্য তাঁর পরিবর্তে যোগদান ও ভোটদানের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন এবং ঐ প্রতিনিধির সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নাই।

৬· সভার বিবরণ লিপি বা মিনিটস্[21]:

কোম্পানীর সভার (ডিরেক্টরগণের এবং শেয়ারহোল্ডারগণের) কার্যধারার[22] এবং তাতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির লিপিবদ্ধ বিবরণীকে 'মিনিটস্' বা বিবরণ লিপি বলে এবং যে বইয়ে তা লিপিবদ্ধ হয় তাকে 'মিনিট বুক' বা বিবরণ লিপি বই বলে।

21. Minutes of Meetings. 22. Proceedings.

এটি কোম্পানীর পক্ষে প্রামাণ্য ও সরকারী দলিল স্বরূপ। এর উদ্দেশ্য হল কোম্পানীর সভায় যে কার্যধারা পরিচালিত হয় তার একটি সুস্পষ্ট, যথাসংক্ষিপ্ত ও সঠিক বিবরণ রক্ষা করা। আগে কোম্পানী কি কি বিষয়ের আলোচনা করেছে, কোন্ কোন্ কাজ সমাধা করেছে এবং কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তা এই মিনিট বুক থেকে জানা যায়। একটি সভার এই সব কার্যাবলীর বিবরণ লিপি পরবর্তী সভায় তার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত হলে, তা আদালত কর্তৃক স্বীকৃত প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। এই কারণে, কোম্পানীর পক্ষে মিনিট বইয়ের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

এ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, সভার মিনিট্‌স্ বা বিবরণ লিপি, সভায় যে যা বলে তার সবকিছুর সবিস্তার যথাযথ নকল বা প্রতিলিপি নয়। কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত কি কারণে গৃহীত হল, তাও মিনিট বইয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এটি শুধু যথাসংক্ষিপ্ত, তথ্যনিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট অর্থবোধক হওয়া আবশ্যক। সেজন্য মিনিট লিখতে গিয়ে শুধু যেটুকু প্রয়োজন তাই লিপিবদ্ধ করা ও অবান্তর বিষয় বাদ দেওয়া উচিত।

পরিচালকপর্ষদের (ডিরেক্টার বোর্ডের) একটি সভার মিনিট্‌স্ নমুনা

১৯৬৪ সালের ৩০শে মার্চ, সোমবার, বেলা ৪ ঘটিকায় কোম্পানীর নিবন্ধভুক্ত অফিসে পরিচালকমন্ডলীর সভার অধিবেশন ঘটে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ঃ

১· শ্রী................. সভাপতির আসনে) — পরিচালক বা
২· শ্রী................. — ডিরেক্টারগণ।
৩· শ্রী.................
৪· শ্রী................. — সেক্রেটারী বা কোম্পানীর
৫· শ্রী................. — কর্মসচিব।

মিনিটের ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	মিনিট্‌স্-এর বিবরণ
২৫	পূর্বের সভার মিনিট্‌স্	১৯৬৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার তারিখের পরিচালকমণ্ডলীর সভার মিনিট্‌স্ পাঠের পর তা সঠিক বলে অনুমোদিত ও সভার সভাপতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।
২৬	অর্থসম্বন্ধীয় উপসমিতির (ফিনান্স সাব-কমিটির) রিপোর্ট	অর্থসম্বন্ধীয় উপসমিতির সুপারিশগুলি সভায় পঠিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
২৭	রিজার্ভ ফান্ডের অর্থ বিনিয়োগ	সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কোম্পানীর রিজার্ভ ফান্ড থেকে ১ লক্ষ টাকা সরকারী ঋণপত্রে লগ্নী করা হোক।
২৮	**পরবর্তী সভা**	আগামী ২২শে এপ্রিল, বুধবার বেলা ২ টার সময় কোম্পানীর নিবন্ধভুক্ত অফিসে পরিচালকমণ্ডলীর পরবর্তী সভার অধিবেশন হবে। আর কোনও কাজ অবশিষ্ট না থাকায়, সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভার অধিবেশন সমাপ্ত হয়।
		কলিকাতা, ... / ....১৯৬৪ সভাপতি
		.... কর্মসচিব

৭. **বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী**[23]**:**

১৯৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ৩২নং নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত কোম্পানীর নিবন্ধভুক্ত কার্যালয়, শ্যামসুন্দর বিল্ডিংস, কলিকাতা ১-এ শ্রীশ্যামসুন্দর কটন মিল্‌স্ লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডারগণের দশম বার্ষিক সাধারণ সভার সভাবিবরণী।

সভায় নিম্নোক্তগণ উপস্থিত ছিলেন :

১. শ্রী..	সভাপতি	৮. শ্রী..............	ম্যানেজিং ডিরেক্টার
২. ,,	পরিচালকবর্গ	৯. ,, ...	কর্মসচিব
৩. ,,		১০.	নিরীক্ষক
৪. ,,		১১.	সলিসিটর
৫. ,,			
৬. ,,			

এবং ২০০ জন শেয়ারহোল্ডার, যাদের নামের তালিকা এই বিবরণীর শেষভাগে দেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	আলোচিত বিষয়ের শিরোনাম	বিবরণী
৮১০	নোটিশ	দশম বার্ষিক সাধারণ সভা আহবানের নোটিশ কর্মসচিব কর্তৃক সভায় পঠিত হয়।
৮১১	পরিচালকগণ কর্তৃক উপস্থাপিত কোম্পানীর কার্যাবলীর বিবরণী ও হিসাবপত্র	সভাপতির অনুরোধে, পরিচালকগণ কর্তৃক উপস্থাপিত ১৯৬৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর শেষ হয়েছে সে বৎসরে কোম্পানীর কার্যাবলীর বিবরণ, ব্যালান্সশীট লাভক্ষতির যে হিসাব মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে, তা সভায় পড়া হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।
৮১২	নিরীক্ষকগণের বিবরণ	সভাপতির অনুরোধে, ১৯৬৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখ যুক্ত কোম্পানীর নিরীক্ষকগণের বিবরণ, নিরীক্ষক কর্তৃক সভায় পড়া হয়।
৮১৩	সভাপতির বক্তৃতা	গত এক বৎসরে কোম্পানীর অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যবহুল বিবরণ সভাপতি বিবৃত করেন। তার মুদ্রিত প্রতিলিপি সভায় উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
৮১৪	পরিচালকগণের বিবরণ ও হিসাবপত্রাদি গ্রহণ	সভাপতি কর্তৃক উপস্থাপিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রী .... প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। এই সভায় উপস্থিত "১৯৬৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে সমস্ত বৎসরের কোম্পানীর কার্যাবলী সম্পর্কে পরি-

23. Minutes of the Annual General Meeting.

ক্রমিক সংখ্যা	আলোচিত বিষয়ের শিরোনাম	বিবরণী
		চালকগণের বিবরণ, এবং তৎসংক্রান্ত নিরীক্ষিত লাভক্ষতির হিসাব ও ১৯৬০ সালের ৩০শে জুন তারিখের কোম্পানীর ব্যালান্সশীট (উদ্বৃত্ত পত্র) অনুমোদিত ও গৃহীত হল।" শ্রী....... প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। তারপর সভাপতি তাঁর উপর আলোচনা আহ্বান করেন। আলোচনা শেষে প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।
৮১৫	লভ্যাংশ ঘোষণা	লভ্যাংশ ঘোষণা সম্পর্কে সভাপতি নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং শ্রী........তা সমর্থন করেন। "এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, ১০,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শেয়ার পিছু ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ (আয়কর মুক্ত) এবং ৫০,০০০ সাধারণ শেয়ারের উপর শেয়ার পিছু ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদত্ত হোক এবং এতদ্বারা তা ঘোষিত হোক। এবং ১৯৬৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে তা দেওয়া হোক। ১৯৬৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণের তালিকা বইয়ে যাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল, শুধু ঐ সব শেয়ারহোল্ডারগণকেই অথবা তাদের উপযুক্ত আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকেই এই লভ্যাংশ দেওয়া হোক।
৮১৬	পরিচালক পদে শ্রী... -এর নির্বাচন	এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, পর্যায়ক্রমে অবসরগ্রহণকারী পরিচালক শ্রী......... এতদ্বারা পুনরায় পরিচালক পদে নিযুক্ত হলেন এবং তিনি পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করবেন। শ্রী........... এই প্রস্তাবটি উত্থাপন এবং শ্রী.........এটি সমর্থন করলে, প্রস্তাবটি যথানিয়মে গৃহীত হয়।
৮১৭	পরিচালক পদে শ্রী.... -এর নির্বাচন	কয়েক জন সভ্যের কাছ থেকে কোম্পানী আইনের ২৫৭নং ধারা অনুযায়ী, তারা শ্রী...... কে, পরিচালকের যে পদটি শূন্য হয়েছে তাতে নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপন করতে ইচ্ছুক, এই মর্মে যে নোটিশ পাওয়া গিয়েছিল, তদনুযায়ী শ্রী.........এই প্রস্তাব উত্থাপন ও শ্রী..... ...উহা সমর্থন করলে, নিম্নরূপ প্রস্তাবটি যথানিয়মে গৃহীত হয়। "সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, শ্রী.........এতদ্বারা কোম্পানীর একজন পরিচালক নির্বাচিত হলেন এবং তিনি পর্যায়ক্রমে অবসরগ্রহণযোগ্য হবেন।

ক্রমিক সংখ্যা	আলোচিত বিষয়ের শিরোনাম	বিবরণী
৮১৮	নিরীক্ষক নিয়োগ	কোম্পানীর সভ্য শ্রী ....নিরীক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মর্মে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে ও অপর সভ্য শ্রী........ উহা সমর্থন করলে, প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। "সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, কোম্পানীর বর্তমান নিরীক্ষক সর্বশ্রী ঘোষ এবং ঘোষ কোং-কে ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য নিরীক্ষক পদে পুনরায় নিয়োগ করা হল। তাদের পারিশ্রমিক বাবদ ২৫০০ টাকা প্রদত্ত হবে।" এরপর আর কোন কাজ অবশিষ্ট না থাকায় সভাপতি, পরিচালকগণ, কর্মসচিব এবং কর্মচারিগণকে তাদের প্রশংসনীয় কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভা সমাপ্ত হল। স্বাঃ......... স্বাঃ......... কর্মসচিব সভাপতি তাং............. তাং............ কলিকাতা।

৮· একটি সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণীঃ

জনশক্তি সমবায় ভাণ্ডার লিঃ

কলিকাতা

১৮ই মে, ১৯৬৭ তারিখে বেলা ৪টার সময় সমিতির নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা আরম্ভ হয়। সমিতির ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীদীনেশচন্দ্র গুপ্ত সভার উদ্বোধন করেন।

উপস্থিতি বই পরীক্ষা করে গণপূর্তি সংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত বলে চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন।

এর পর শ্রীদীনেশচন্দ্র গুপ্ত প্রস্তাব করেন যে শেয়ারহোল্ডারগণের এই সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য একজন সভাপতি নির্বাচিত হোক। তখন শ্রীনরেন রায় সভাপতিত্ব করার জন্য শ্রীহরিপদ বসুর নাম প্রস্তাব করলে শ্রীহরেন দাস তা সমর্থন করেন। সকলের ঐক্যমতে শ্রীহরিপদ বসু সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন শ্রীহরিপদ বসু সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সভার বিষয়সূচী অনুসারে একের পর এক বিষয়গুলি উপস্থিত সদস্যগণের বিবেচনার জন্য তোলা হোক বলে প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী অনুমোদন : গত ১৯৬৬ সালের ১২ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী পঠিত, অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এই বিষয়ে কোন আলোচনা তোলা হয় না।

ম্যানেজিং কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট : সমিতির ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীদীনেশ গুপ্ত ম্যানেজিং কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। রিপোর্টটি আলোচিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নিরীক্ষিত হিসাবপত্র, ব্যালান্সশীট ও নিরীক্ষকের রিপোর্ট : সমিতির ১৯৬৬-৬৭ সালের নিরীক্ষিত হিসাবপত্র, ব্যালান্সশীট ও নিরীক্ষকের রিপোর্ট সমিতির

সেক্রেটারী পাঠ করেন ও সে সম্পর্কে সদস্যগণ আলোচনা করেন। ম্যানেজিং কমিটি নিরীক্ষকের রিপোর্টের যে উত্তর প্রস্তুত করেছেন তাও সেক্রেটারী পাঠ করেন এবং সদস্যগণ আলোচনা করেন।

এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে "১৯৬৬-৬৭ সালের নিরীক্ষিত হিসাব-পত্র ও ব্যালান্সশীট গৃহীত হোক এবং নিরীক্ষক তাঁর রিপোর্টে যে সব সুপারিশ করেছেন ও ম্যানেজিং কমিটি তার যে উত্তর দিয়েছেন তা লক্ষ্য করা হোক।"

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় হালদার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং শ্রীবিমলাকান্ত গড়ুই তা সমর্থন করেন।

এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, ৩১-১২-৬৬ তারিখে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের হাতে যে পরিমাণ শেয়ার ছিল তার আদায়ীকৃত মূল্যের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষিত হোক। ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীদীনেশ গুপ্ত এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন ও শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বার্ষিক আয়ব্যয়ের অনুমিত হিসাব: ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অনুমিত হিসাব ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান সভার নিকট উপস্থিত করলে তা আলোচিত হয়। তারপর শ্রীমৃত্যুঞ্জয় হালদার তা গ্রহণের প্রস্তাব করলে ও শ্রীবিমলাকান্ত গড়ুই তা সমর্থন করলে সর্বসম্মতিক্রমে সেটি গৃহীত হয়।

ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচন: ম্যানেজিং কমিটির রিপোর্টের ১২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সমিতির উপবিধির ১৯নং ধারা মতে শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সামন্ত পর্যায়ক্রমে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যপদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এই শূন্যপদ দুটিতে যথাক্রমে শ্রীকালীপদ নস্কর ও শ্রীঅর্জুন রায় নির্বাচিত হন। শ্রীগোপালচন্দ্র সাহা শ্রীকালীপদ নস্করের নাম প্রস্তাব করেন ও শ্রীকিরণচন্দ্র নাথ তা সমর্থন করেন। শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত শ্রীঅর্জুন রায়ের নাম প্রস্তাব করেন ও শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় তা সমর্থন করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন: সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভা শেষ হয়।

স্বাঃ শ্রীহরিপদ বসু
সভাপতি
১৮.৫.৬৭

১০

অফিস সংগঠন
OFFICE ORGANISATION

অফিসের কার্যাবলী (FUNCTIONS OF THE OFFICE)

অফিস হল যে কোন কারবার বা সংগঠনের বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সংযোজনী-কেন্দ্র। কার্যপন্থা ও নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ পরিচালনা বিভাগে গৃহীত হয়, অফিস তার পীঠস্থান। এখান থেকেই সংস্থার যাবতীয় কার্যাবলীর নির্দেশ দেওয়া হয়।

১. অফিসের প্রধান কাজ হল দলিলপত্রাদি নিয়ে—নানারূপ দলিলপত্র প্রস্তুত করা, ব্যবহার করা ও ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ঐগুলি রক্ষা করা। এই সমস্ত কাজ হল 'করণিক' কার্যাবলী। সুতরাং একথা বলা যায় যে, অফিসের কাজই হল সংগঠনের সুদক্ষ চালনার জন্য যোগ্য করণিক-সেবার[1] ব্যবস্থা করা।

২. অফিসের দ্বিতীয় কাজ হল একদিকে সংগঠনের অভ্যন্তরে, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ও ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মচারিগণের মধ্যে এবং অপরদিকে সংগঠন ও তার বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বার্তা, মতামত ও চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করা। সম্মেলন, সাক্ষাৎকার, চিঠিপত্র, স্মারকলিপি, টেলিফোন, টেলিগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়।

৩. অফিসের তৃতীয় কাজ হল নানারূপ তথ্যাদি আহরণ ও সংকলন, বিবিধ বিবরণ প্রণয়ন, ও বিশ্লেষণের জন্য নানারূপ তথ্য-তালিকা ও রেখাচিত্রাদি প্রস্তুত করা।

অফিসের গুরুত্ব : সরকারী অফিস ছাড়া, বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ অফিসের সন্ধান কারবারী সংগঠনের মধ্যেই পাওয়া যায়। ডিক্সীর কথায় বলা যায়, "ঘড়ির কাছে তার মেইন স্প্রিং যেরূপ, কারবারের নিকট তার অফিসও সেরূপ।"

আধুনিক কারবারগুলি উৎপাদন ও বণ্টনমূলক কার্যাবলী, ক্রয়, উৎপাদন, বিক্রয়, হিসাবরক্ষণ, ইত্যাদি বহুসংখ্যক বিভাগের সুনির্দিষ্ট কার্যের মারফত সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই সব বিভাগগুলির স্বতন্ত্র কার্যাবলীর মধ্যে সংযোজন না ঘটলে, কারবারের প্রধান উদ্দেশ্যই ক্ষুণ্ণ হবে, কার্যাবলী অচল হয়ে পড়বে। সুতরাং অফিসের কাজই হল, পরিচালকগণকে কারবারের বিবিধ কার্যক্রম সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা, ঐ সকল পরিকল্পিত কার্যক্রমগুলির সুনিশ্চিত রূপায়ণ, সে সবের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, সেসবের ফলাফলের মূল্যায়ন ও এই কাজে বিবিধ বিভাগগুলির কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা ও তা সম্ভব করে তোলা।

অফিসের স্থান নির্বাচন : অফিসের স্থান সম্পর্কে প্রধান সমস্যা হল, অফিসের গৃহের স্থান, আয়তন ও অভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত স্থির করা। এ সম্পর্কে মূল নীতি-গুলি হল :

১. যথাসম্ভবরূপে খরিদ্দারগণের নিকটবর্তী হয় এরূপ অথচ শান্ত ও স্বাস্থ্য-কর পরিবেশময় স্থান অফিস বাড়ির জন্য নির্বাচন করা।

২. নির্বাচিত স্থানটি আবার যতদূর সম্ভব কারবারী কেন্দ্র, অনুরূপ অন্যান্য

1. Clerical Services.

কারবারী অফিস, ব্যাঙ্ক, ভোজনাগার, ডাক ও তার অফিস ও বাজারের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন।

৩. স্থানটিতে যাতায়াত ও পরিবহণের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। যাতায়াতের খরচও যথাসম্ভব অল্প হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. অফিসের জন্য এরূপ আয়তনের স্থান সংগ্রহ করতে হবে যা শুধু বর্তমান প্রয়োজনের দিক থেকেই যথেষ্ট নয়, ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের প্রয়োজনও যেন তা মেটাতে পারে।

৫. অফিসের ঘরগুলি যেন অফিসের প্রস্তাবিত ও প্রয়োজনীয় বিভাগগুলির পক্ষে উপযোগী হয়। ঘরগুলি যথেষ্ট প্রাকৃতিক আলোকে আলোকিত ও বায়ুচলাচলের উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া, দালানটিতে কর্মচারীবর্গ ও খরিদ্দারগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি, যথা লিফ্ট, প্রক্ষালনাগার, চা-পান ও ভোজনের জন্য ক্যান্টিন গৃহ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

৬. আবার তার ভাড়াও যেন বেশি না হয় সেটাও দেখতে হবে। তবে কম ভাড়ার লোভে যদি এরূপ বাড়ি বা স্থান ভাড়া নেওয়া হয় যাতে অফিসের কার্যদক্ষতা ক্ষুণ্ণ হবে, তাও উচিত হবে না।

অফিস-বিন্যাসের নীতিসমূহ[2] : অফিস-বিন্যাস বলতে অফিসের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের এবং বিভাগস্থ কর্মচারিগণের ও অফিস সাজসরঞ্জামের অবস্থিতি বা বন্দোবস্ত বোঝায়। অফিসের বিভিন্ন বিভাগ ও বিভাগীয় কর্মিগণের কার্যাবলী পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও পরস্পর-নির্ভরশীল। সুতরাং বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে কোন সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অফিস বিন্যস্ত না হলে অফিসের কার্যাবলী সুদক্ষ ও সন্তোষজনকরূপে নির্বাহ হতে পারে না । সেজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে অফিস বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে।

১. **অফিস বাড়ী:** অফিস বাড়ির আকার ও আয়তন, ঘরগুলির অবস্থান, সংবাদাদি আদানপ্রদান ও আলাপনের ব্যবস্থা, আলোর বন্দোবস্ত, মূল্যবান দলিলপত্র নিরাপদে রাখার মত ঘরের ব্যবস্থা ও প্রক্ষালনাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা।

২. **ক্রিয়াগত সংগঠন:** অফিসের প্রকৃতি অনুযায়ী যে সকল বিভাগ স্থাপন প্রয়োজন এবং তাদের কাজের প্রকৃতি, বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী ও কেরানীগণের কর্তব্যসমূহ এবং তাদের যে ধরনের কাজ করতে হবে ইত্যাদি ।

অফিসের ক্রিয়াগত সাংগঠনিক বিন্যাসে পৃথক পৃথকভাবে অভ্যর্থনা ঘর, একান্ত বা প্রাইভেট অফিসঘর ও সাধারণ অফিস ঘরের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন হয়। একটি মাত্র সাধারণ অফিস ঘর থাকবে, না, তা অভ্যর্থনা ঘর ও একটি আলাদা আলাদা ক্ষুদ্রায়তন প্রাইভেট অফিস নিয়ে গঠিত হবে তা কারবারের প্রকৃতি অনুযায়ী সযত্ন বিচারের দ্বারা স্থির করতে হবে।

৩. **অফিসের কাজের পদ্ধতি ও কাজের রুটিন:** অফিস ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হল সুদক্ষভাবে, সর্বাধিক দ্রুত গতিতে ও সর্বনিম্ন ব্যয়ে কর্মসম্পাদন। সুতরাং কারবারের প্রকৃতি অনুযায়ী অফিসের কার্যপদ্ধতি এরূপভাবেই বিন্যস্ত করা প্রয়োজন যেন সুষ্ঠু অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন গতিতে অফিসের কাজ চলতে পারে।

৪. **অফিসের সাজসরঞ্জাম:** চেয়ার, টেবিল, আলমারী, র‍্যাক, নথিবন্ধের সরঞ্জাম ও টাইপরাইটার, ডুপ্লিকেটর প্রভৃতি যন্ত্রাদি অফিসে এরূপভাবে সাজাতে হবে যেন সবচেয়ে কম অসুবিধায় সেগুলির সর্বাধিক ব্যবহার ঘটে।

৫. **অফিসের কর্মী সংখ্যা :** অফিস বিন্যাস পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ

---

2. Principles of Office lay-out.

বিষয় হল কিরূপ সংখ্যক কর্মচারিগণের জন্য স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে ও তাদের প্রত্যেকের জন্য কমপক্ষে কতটা স্থান প্রয়োজন। এর ব্যবস্থা করতে গিয়ে আবার ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের সুবিধার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অফিসের জন্য মোট কতটা স্থান প্রয়োজন হবে তা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী, প্রত্যেক কর্মীর কাজের ধরন..

অফিসের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা (OFFICE LAYOUT)

অফিসের কার্য পদ্ধতিতে তার নির্ধারিত স্থান, তাদের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি এবং পদস্থকর্মচারিগণের একান্ত বা প্রাইভেট অফিসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির দ্বারা স্থির হবে। তা ছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়ঃ

ক. উপর নিচে বারংবার যাতায়াতের অনাবশ্যক পরিশ্রম ও সময় বাঁচানোর জন্য, দালানের একই তলে³ সম্পূর্ণ অফিসটি থাকা প্রয়োজন।

3. Same floor.

খ. আলোবাতাসের প্রাচুর্যের জন্য বহুসংখ্যক ছোট ছোট ঘরের পরিবর্তে একটি বা কয়েকটি বড় বড় হল ঘরই ভাল।

গ. অধস্তন কর্মচারীদের কাজের তদারকিতে ও আলোবাতাসের বিঘ্ন যাতে না হয় সেজন্য পদস্থ কর্মচারীদের নিজস্ব একান্ত অফিসের সংখ্যা অল্প হওয়াই কাম্য।

ঘ. বাইরের ব্যক্তিদের সাথে ক্যাশ বা বিক্রয় বিভাগের মত যে সকল বিভাগের কাজ বেশি তা অফিসের প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি থাকাই সুবিধাজনক।

ঙ. যথাসম্ভব প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ছাড়াও অফিসঘরের মধ্যে সর্বত্র কৃত্রিম আলোবাতাসের পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত থাকা দরকার।

চ. টাইপরাইটার ইত্যাদি যন্ত্রের শব্দে যাতে অন্যান্য কর্মচারীদের কাজের অসুবিধা না হয় সেজন্য শব্দকারী যন্ত্রাদি, অফিসের একটি ভিন্ন ঘরে রাখা এবং সেখানেই সেগুলি ব্যবহার করা উচিত।

ছ. যাতে গল্পগুজবে সময় নষ্ট না হয় সেজন্য কর্মচারীদের কাজের টেবিলগুলি পরস্পরের মুখোমুখী না সাজিয়ে এক সারির পিছনে আরেক সারি করে সাজান উচিত। আগের পৃষ্ঠায় রেখাচিত্র দিয়ে এটা দেখান হল।

পত্রালাপ : কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ

CORRESPONDENCE : CENTRALISATION VS. DECENTRALISATION

রক্ত চলাচল যেরকম প্রাণিদেহের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ, পত্রালাপও কারবারী জগতের পক্ষে সেরূপ। সংবাদাদি আদানপ্রদানের নানা আধুনিক উপায় উদ্ভাবিত হলেও পত্রালাপের গুরুত্ব তাতে কিছুমাত্র কমে নি। অন্যান্য উপায়গুলির তুলনায় আজও পত্রালাপ অল্পব্যয়সাধ্য; তা দ্রুত ও নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পাঠানো যায়; বিষয় অনুযায়ী তা সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত হতে পারে; তা পূর্বচিন্তিত বলে কথাবার্তায় যেরূপ ভুল ভ্রান্তি ঘটতে পারে, চিঠিতে তা এড়ানো যায় ; এবং সর্বোপরি তা লেনদেনের পাকা দলিল বলে বিবেচিত হয়। আধুনিক কারবারী অফিসের কাজের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ সময়ই লিখিতভাবে সংবাদ আদান প্রদানে (যার অধিকাংশই পত্রালাপ) ব্যয় হয়। পত্রালাপের উৎকর্ষ ও ধরনধারণ কারবারের খ্যাতি সৃষ্টিতে যথেষ্টই সাহায্য করে থাকে।

কারবারের সাথে[4] নানারূপ কারবার, ব্যক্তি ও সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির পত্রালাপ যেমন চলে তেমনি তার অভ্যন্তরীণ[5] বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মচারীদের মধ্যেও পত্রালাপ চলে। কারবারী চিঠিপত্রাদি তিন ধরনের হয়ে থাকে ঃ

১. **রুটিনমাফিক কাজকর্মসংক্রান্ত চিঠিপত্র**—ফরমাশ, অর্থপ্রেরণ, প্রাপ্তিজ্ঞাপক, অনুসন্ধান ও অনুসন্ধানের উত্তরজ্ঞাপক, ঘোষণাজ্ঞাপক, কারবারী আমন্ত্রণ, নিয়োগপত্র ইত্যাদি দৈনন্দিন কারবারী কার্যকলাপ সংক্রান্ত চিঠিপত্র এই শ্রেণীর।

২. **ব্যক্তিগত আবেদনমূলক চিঠিপত্র**--অনুরোধ, সহযোগিতা অথবা কোনো বিষয়ে দাক্ষিণ্য মঞ্জুর বা নামঞ্জুর জ্ঞাপক, ধন্যবাদ, প্রশংসা, অভিনন্দন, সুপারিশ, পরিচিতি, সতর্কবাণী বা সহানুভূতি জ্ঞাপক চিঠিপত্র এই প্রকারের।

৩. **বিশেষ আবেদনমূলক চিঠিপত্র**—বিক্রয়, আদায়, ঋণ ও হিসাব সমন্বয় সংক্রান্ত চিঠিপত্র এই শ্রেণীর।

কারবারী চিঠিপত্র কারবারের প্রচারের শক্তিশালী বাহন। এ কারণে কারবারের খ্যাতি ও সাফল্য পত্রালাপের উৎকর্ষের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে সুতরাং সকল কারবারেরই পত্রালাপ ব্যবস্থাটি সুসংগঠিত করা প্রয়োজন। কারবারী পত্রালাপসংগঠন দুই জাতীয় হতে পারে। প্রথমত, প্রত্যেক বিভাগ আলাদাভাবে তার নিজ কার্যাবলী-সংশ্লিষ্ট পত্রালাপের দায়িত্ব নিতে পারে। একে **বিকেন্দ্রিত পত্রালাপ ব্যবস্থা**[6] বলে।

---

4. External. 5. Internal. 6. Decentralisation of Correspondence.

দ্বিতীয়ত, পত্রালাপে বিশেষজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মচারীদের নিয়ে একটি আলাদা পত্রালাপ বিভাগ গঠন করা যেতে পারে। এই পত্রালাপ বিভাগ কারবারের অন্যান্য বিভাগের কাজকর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রালাপের দায়িত্ব বহন করে। বিভাগগুলি নিজেরা কোন পত্রালাপে অংশ গ্রহণ করে না। একে **কেন্দ্রীভূত পত্রালাপ ব্যবস্থা**[7] বলে। নিচে এই দুই প্রকার পত্রালাপ ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা সংক্ষেপে আলোচিত হল :

বিকেন্দ্রিত পত্রালাপ ব্যবস্থার সুবিধা : ১. প্রত্যেক বিভাগ তার নিজস্ব পত্রালাপ পরিচালনা করলে, ঐ সকল পত্রাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভাগীয় কর্মীদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত পরিচিতি থাকায় পত্রগুলি তথ্যনিষ্ঠ ও যথাযথ হয়।

২. প্রত্যেক বিধাগের কার্যাবলীর মধ্যে তার নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্যান্য বিভাগের কার্যাবলীতে থাকে না। সুতরাং প্রত্যেক বিভাগ তার নিজস্ব পত্রালাপ করলে সেই বিভাগের কর্মীরা তাদের বিশিষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে তা যেরূপ ভাবে রচনা ও পরিচালনা করতে পারে, তা অন্য কোনরূপে সম্ভব নয়।

৩. প্রত্যেক বিভাগের কর্মীরা অপরাপর বিভাগের কর্মীদের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে পত্রালাপে প্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ বিভাগের পত্রালাপ সংক্রান্ত দক্ষতা ও খ্যাতি বৃদ্ধির চেষ্টা করে। ফলে নিজ বিভাগের প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়ে।

বিকেন্দ্রিত পত্রালাপ ব্যবস্থার অসুবিধা: ১. বিভাগীয় পত্রালাপ ব্যবস্থার পত্রালাপের জন্য কোন আলাদা বিশেষজ্ঞ পত্র-রচনা কর্মী নিযুক্ত হয় না। সকল কর্মীই নিজের নিজের সাধারণ কর্তব্যের সঙ্গে পত্রালাপের অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করে। এতে তাদের সাধারণ কর্তব্য যেমন ক্ষুণ্ণ হয় তেমনি বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাবে পত্রগুলিও সুরচিত হয় না।

২. উৎকর্ষের দিক দিয়ে এক এক বিভাগের পত্রাদি এক এক রকম হয়। কারো সাথে কারো সামঞ্জস্য থাকে না। এতে এক বিভাগের পত্রালাপ হয়তো কারবারের সুখ্যাতি বৃদ্ধি করে কিন্তু অন্য বিভাগের ত্রুটিপূর্ণ চিঠিতে তা বিনষ্ট হতে পারে।

৩. বিভাগীয় পত্রালাপ ব্যবস্থায় পৃথক পৃথক বিভাগের রচিত চিঠিপত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ ফুটে ওঠে, কারবারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তাতে পরিস্ফুট হয় না।

৪. এটি ব্যয়বহুল। কারণ স্বতন্ত্রবিভাগগুলির বিক্ষিপ্ত পত্রালাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বলে আবশ্যক অনাবশ্যক বহু চিঠিপত্রই লেখা ও পাঠান হয়।

কেন্দ্রীভূত পত্রালাপ ব্যবস্থার সুবিধা : ১. কেন্দ্রীভূত পত্রালাপ ব্যবস্থায় পত্রালাপে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীদের দ্বারা রচিত পত্রাদি সর্বদাই সুলিখিত ও উচ্চমানের হয়। অল্প সময় ও খরচে বেশি সংখ্যক চিঠিপত্র রচিত হতে পারে।

২. এই ব্যবস্থায় গ্রাহকদের মধ্যে কারবার সম্পর্কে সুখ্যাতি রটে ও তারা কারবারটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারবারের লেনদেন বাড়ে।

৩. একই পত্রলেখকদের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে পর পর পত্রগুলি রচিত হওয়ায় ঐ চিঠিপত্রে বক্তব্য লেখার ধরনের ধারাবাহিকতা থাকে।

৪. পত্রলেখকদের সাথে পত্রপ্রাপকগণের মধ্যে এতে এক রকম ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের ও সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। ফলে পত্রলেখকরা পত্রপ্রাপকদের মন ও মেজাজ বুঝে চিঠিপত্র লিখতে পারেন। ফলে চিঠিপত্রগুলি অত্যন্ত কার্যকর হয়।

কেন্দ্রীভূত পত্রালাপ ব্যবস্থার অসুবিধা: ১. পত্রগুলি বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট কিন্তু বিশেষজ্ঞ পত্রলেখকগণের ঐ সব বিভাগের কার্যাবলীর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকায় অনেক সময়ই তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় পত্রলেখকদের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের কাছে যেয়ে অনুসন্ধান করতে হয়। ফলে বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ কাজকর্মের বিঘ্ন ঘটে।

---

7 Centralisation of Correspondence.

২. খসড়া পত্রগুলি অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় পত্রালাপ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠাতে ও তা ফিরে পেতে দেরি হয়।

৩. বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে কেন্দ্রীভূত পত্রালাপ বিভাগের কর্মীদের দ্বারা লিখিত পত্র অনেক সময়ই তথ্যনিষ্ঠ হয় না।

বহিরাগত ও বহির্গামী পত্রাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা
HANDLING OF INCOMING & OUTGOING MAIL

চিঠিপত্রাদি যতই সুরচিত ও নিখুঁত হোক না কেন সেগুলি পাঠাতে বা পেতে দেরি হলে তার দাম অনেকখানি নষ্ট হয়। সুতরাং যাতে অযথা দেরি হয়ে কার্যকারিতা নষ্ট না হয় সেজন্য দ্রুত ও সুপরিকল্পিতরূপে চিঠিপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিচে বহিরাগত ও বহির্গামী চিঠিপত্র সম্পর্কে অফিসগুলিতে যে প্রণালী অবলম্বন করা হয় তা সংক্ষেপে আলোচিত হল:

ক. **বহিরাগত ডাক**[8]: ১. প্রথম ধাপ: ডাক গ্রহণ[9]—পত্রালাপ বিভাগের কাজ আরম্ভ হয় ডাক গ্রহণের দ্বারা। ছোট অফিসে ডাকপিওন দিনে একবার কি-দুইবার ডাক পৌঁছে দেয়, কিন্তু বড় অফিসে, সাধারণত পোস্ট অফিসে পোস্ট বক্স বা পোস্ট ব্যাগ ভাড়া করে রাখা হয়। এবং ডাক গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট কর্মচারী সেখানে গিয়ে দিনে দুবার বা তিনবার ডাক নিয়ে আসে। অনেক সময়, অন্যান্য অফিস থেকে অফিস পিওন এসে ডাকগ্রহণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর হাতে হাতে চিঠিপত্র পৌঁছে দেয়। ভারপ্রাপ্ত কেরানীর কাজ হল এসকল পত্রের জন্য প্রাপ্তি-রসিদ দেওয়া।

২. দ্বিতীয় ধাপ: ডাক খোলা[10]—ছোট অফিসে প্রধানকর্তা নিজেই ডাক খোলেন। কিন্তু বড় বড় অফিসে ডাক গ্রহণ ও খোলার জন্য একটি ডাক গ্রহণ সেক্সন থাকে। তার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীই ডাক গ্রহণ করে ও ডাক খোলে। তবে যে সকল পত্রের উপরে 'private', 'personal' বা 'confidential' লেখা থাকে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ খোলে না।

৩. তৃতীয় ধাপ: সতর্ক অনুসন্ধান[11]—পত্রগুলি খোলার পর সেগুলির ভিতর কোন সংযোজনীপত্র, চেক বা অন্য কোন দলিল আছে কিনা এবং তা পত্রের উল্লেখ মত কিনা তা দেখা দরকার।

৪. চতুর্থ ধাপ: তারিখ বসান[12]—বহিরাগত ডাক খোলার পর তাতে হাতে বা রবার স্ট্যাম্প দিয়ে প্রাপ্তির তারিখ বসান হয়। সেই সাথে প্রাপ্ত পত্রের ক্রমিক সংখ্যা ও সময়ও অনেক সময় লেখা হয়।

৫. পঞ্চম ধাপ: প্রাপ্ত ডাকের বিবরণ লেখা[13]—প্রাপ্ত চিঠিপত্র যাতে হারিয়ে না যায় এবং সেগুলির সম্পর্কে যাতে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সব অফিসেই বিবিধ 'কলম' সহ একটি প্রাপ্তপত্র বই[14] থাকে। তাতে প্রাপ্তির তারিখ, রেফারেন্স নং, প্রেরকের নাম ও ঠিকানা, পত্রের সাথে অন্য কোন কাগজপত্র ছিল কিন না, পত্রের বিষয়বস্তু, অফিসের কোন পদস্থকর্মীর নিকট তা পাঠান হল ইত্যাদি লেখা হয়।

৬. ষষ্ঠ ধাপ: ডাক বাছাই ও বিলি[15]—প্রাপ্ত ডাকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার আগে বা পরে সেগুলি যে সব বিভাগে পাঠান প্রয়োজন, তদনুযায়ী পৃথক পৃথক ট্রে বা ঝুড়িতে তা রাখা হয় এবং বেয়ারা মারফত তা পাঠান হয়। ছোট অফিসে অফিসের কর্তাই কোন্ পত্র কোন্ বিভাগে বা কার কাছে যাবে তা স্থির করেন। বড় অফিসে ডাক গ্রহণ বিভাগের কর্মীই ঐ কাজ সম্পাদন করেন। কোন পত্র একাধিক বিভাগে পাঠানোর প্রয়োজন হলে প্রথমে তা যে বিভাগে যাবে তা স্থির করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের কাছে পাঠান হয়। পরে ঐ বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে পাঠানোর সময় পত্রের

---

8. Incoming Mail. 9. Receiving of the Incoming Mail.
10. Opening the Mail. 11. Scrutiny. 12. Date Stamping.
13. Record of Receipt. 14. Letters Received Book.
15. Sorting and Distribution.

উপরে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে দেয়। চিঠিটি সম্পর্কে যাবতীয় করণীয় কার্য শেষ হলে প্রাপ্ত ডাক বইয়ে তাও লিখে রাখা হয়।

৭. সপ্তম ধাপ: খেয়াল রাখা[16]—বহিরাগত প্রত্যেকটি চিঠি সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা তা অফিস সেক্রেটারী বা বিভাগীয় প্রধান নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত ডাকবই পরীক্ষা করে দেখে থাকেন।

খ. বহির্গামী ডাক[17]: ১. প্রথম ধাপ: পত্র লেখা[18]—প্রাপ্ত কোন পত্রের উত্তর দিতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ফাইল ও অন্যান্য দলিলপত্র দেখে উত্তর মুসাবিদা করতে বা শ্রুতিলেখককে বা স্টেনোগ্রাফারকে তা মুখে মুখে বলে দিতে হয়। ছোট অফিস হলে প্রধান কর্তা বা সেক্রেটারী এটা করেন। বড় অফিসে কেন্দ্রীয় পত্রালাপ বিভাগের উপর এই দায়িত্ব পড়ে। তবে জটিল বিষয় সংক্রান্ত পত্র হলে প্রধান কর্তাই চিঠি স্বয়ং মৌখিকভাবে শ্রুতিলেখককে বলে দেন। এর পর শ্রুতিলেখক তা সযত্নে টাইপ করে তাতে স্বাক্ষরের জন্য চিঠিটা প্রধান কর্তা বা বিভাগীয় কর্তার নিকট পেশ করে।

২. দ্বিতীয় ধাপ: স্বাক্ষরদান ও নিয়ন্ত্রণ[19]: কালিতে মূল কপিটিতে পূর্ণ স্বাক্ষর ও কার্বন কপিতে সংক্ষিপ্ত সই করার পরে চিঠিতে রেফারেন্স নম্বর বসান হয়।

৩. তৃতীয় ধাপ: ডাক পাঠান[20]—চিঠিটি সই হওয়ার ও তাতে রেফারেন্স নম্বর বসিয়ে ডাকে পাঠানোর আগে আর যে সকল করণীয় কাজ বাকী থাকে তা হল, তাতে কোন সংযোজনী দেওয়ার থাকলে তা দিয়ে বহির্গামী ডাকবহিতে উহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া চিঠিটি ঠিকমত ভাঁজ করা এবং খামে তা ভরে দেওয়া, মুখ আটকে তা সীল করা ও তাতে ডাক-টিকিট লাগান এবং পোস্ট অফিসে তা পাঠিয়ে দেওয়া।

অফিস সংগঠনের মূলনীতিসমূহ (PRINCIPLES OF OFFICE ORGANISATION)

দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কার্যনির্বাহের জন্য অফিসকেও বিজ্ঞানসম্মতরূপে সংগঠিত করার জন্য কতকগুলি মৌলিক নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। নিচে ঐগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হল।

১. কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশে অফিস ভাগ করা[21]: কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকার করণীয় কাজ অনুযায়ী গোটা অফিসকে কতকগুলি অংশে বা বিভাগে বিভক্ত করে সেগুলির প্রত্যেককে এক-একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া দরকার। তাতে শৃংখলার সাথে কাজগুলি সম্পাদিত হতে পারে।

২. দায়িত্ব বিভাগ[22]: অফিসের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগগুলির জন্য একজন করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী ও তার অধস্তন কয়েকজন তদারককারী কর্মচারীর অধীনে নিম্নপদস্থ সাধারণ কর্মচারী কাজে নিযুক্ত থাকবে। সাধারণ কর্মচারীরা তদারককারী কর্মচারীর কাছে ও তদারককারী কর্মচারীরা বিভাগীয় প্রধান ও তারা আবার কর্মসচিব বা কোম্পানীর সেক্রেটারী অথবা অফিস ম্যানেজারের নিকট নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী থাকবে। এইরূপে একদিকে কাজের ভার ও দায়িত্ব বণ্টন এবং অপরদিকে ঐ সকল কাজ ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করার অভ্যন্তরীণ নিবারক ব্যবস্থা[23] থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

৩. গোপনীয়তা রক্ষা[24]: কারবারের খরিদ্দার অথবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকারের লোকজন কাজ উপলক্ষে অফিসে এলে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এবং পদস্থ কর্মচারিগণের কাজে যাতে কোন অসুবিধা ও বিঘ্ন না ঘটে

16. Keeping track of the Mail. 17. Outgoing Mail.
18. Production of the Correspondence. 19. Signature and Control.
20. Despatch of the outgoing mail.
21. Sectionalisation on the basis of functions.
22. Division of Responsibilities. 23. Internal check.
24. Maintenance of Privacy.

সেজন্য, পদস্থ কর্মচারীদের জন্য আলাদা ঘর অথবা পার্টিশনের ব্যবস্থাযুক্ত আসনের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

৪. **নিরাপত্তা[25]:** অফিসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও খাতাপত্র, কারবারের সীলমোহর, চেকবহি ইত্যাদি নিরাপদে রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

৫. **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা[26]:** কাজের সুবিধার জন্য, কর্মীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও অভ্যাগতদিগের কাছে অফিসের মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য অফিসটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসম্মতরূপে সাজানো দরকার। তাতে এমন একটি সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ পরিচালনায় বিশেষ সাহায্য করে।

৬. **দলিল ও চিঠিপত্রাদির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ[27]:** সুদক্ষ কার্যপরিচালনা, সময় ও শ্রম সংক্ষেপের জন্য অফিসের যাবতীয় চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে আধুনিক ফাইলিং ও ইনডেক্সিং ব্যবস্থার সাহায্যে রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত একান্ত প্রয়োজন।

৭. **বিভাগীয় প্রধানদের বৈঠকে কাজের পর্যালোচনা[28]:** অফিসে যে পদ্ধতিতে কাজ করা হচ্ছে তার দোষ-ত্রুটি বের করা ও তা সংশোধনের জন্য মাঝে মাঝে বিভাগীয় প্রধানদের বৈঠক ডাকা প্রয়োজন।

৮. **শ্রমসংক্ষেপ করার উপযোগী আধুনিক অফিস যন্ত্রপাতি ব্যবহার[29]:** আজকাল সকল অফিসেই টেলিফোন, অন্তর্বিভাগীয় সংবাদ আদানপ্রদান ব্যবস্থা[30], টাইপরাইটার, টেপরেকর্ডার, জেস্টেটনার ডুপ্লিকেটিং মেশিন ইত্যাদি নানাপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে সময় ও শ্রমসংক্ষেপ করে কারবারের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যয়সংক্ষেপ করা হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখনীয় যে, এইগুলি কার্যনির্বাহের সাধারণ নীতিমাত্র, কারবার অনুযায়ী এগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটে থাকে।

অফিসের বিভিন্ন অংশ বা বিভাগসমূহ

VARIOUS DEPARTMENTS OR SECTIONS OF THE OFFICE

উপোরক্ত নীতিগুলি অনুসরণ করে কাজের ভিত্তিতে অফিসগুলিতে যে সব বিভাগ খোলা হয় তা একটি দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। একথা বলা বাহুল্য যে, কারবার অনুযায়ী এই সব বিভাগগুলি সংখ্যায় ও কাজে পৃথক ধরনের হয়ে থাকে।

১. **ক্যাশ বিভাগ[31]:** অফিস ও কারবারের যাবতীয় আর্থিক আয়, ব্যয় ও আদান-প্রদানের কাজ, নগদে বা চেকের দ্বারা এই বিভাগের মারফত পরিচালিত হয়। ক্যাশিয়ার হলেন এর প্রধান কর্মচারী। প্রয়োজন অনুযায়ী সহকারী ছাড়াও অনেক সময় তাঁর অধীনে ছোটখাট বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত এক বা একাধিক পেটি ক্যাশিয়ার নিযুক্ত হন।

২. **হিসাব বিভাগ[32]:** কারবারের যাবতীয় আয়-ব্যয় ও আর্থিক লেনদেনের হিসাব প্রস্তুত, তা পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এই বিভাগের কাজ। একাউন্ট্যান্ট হলেন এর প্রধান কর্মচারী। কারবার খুব বড় হলে আলাদা হিসাবপরীক্ষা বিভাগ (অডিট বা নিরীক্ষা বিভাগ) খোলা যেতে পারে।

৩. **স্টেশনারী বিভাগ[33]:** অফিস ও কারবারের অন্যান্য বিভাগের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাগজ, কলম, কালি, পেন্সিল, খাতাপত্র ইত্যাদি মজুদ ও সরবরাহের জন্য বড় বড় কারবারের অফিসে একটি আলাদা বিভাগ খোলা হয়ে থাকে।

৪. **এস্টাব্লিশমেন্ট বিভাগ[34]:** কারবারের যাবতীয় কর্মচারীর নিয়োগ, সারভিস রেকর্ড, বদলী, পদোন্নতি ও পদাবনতি, অবসর, কর্মচ্যুতি, ছুটি ইত্যাদির তথ্য ও দলিল রক্ষণাবেক্ষণ, ভাতা ও বেতনের বিল প্রস্তুত করা ইত্যাদি এই বিভাগের কাজ।

---

25. Security. 26. Neatness and cleanliness.
27. Proper maintenance of records and documents.
28. Periodical meetings of sectional heads for review.
29. Application of modern labour saving devices.
30. Internal communication system. 31. Cash Department.
32. Accounts Department. 33. Stationery Department.
34. Establishment Department.

৫. **চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বিভাগ**[35]**:** বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য কারবার ও সরকার প্রভৃতির সাথে কারবার সংক্রান্ত বিষয়ে পত্রাদি রচনা ও তা আদান-প্রদানের কাজ এই বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হয়।

৬. **চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা**[36]**:** চিঠিপত্র আদানপ্রদান বিভাগের অধীনে একটি পৃথক শাখা থাকে ; তার একমাত্র কাজ হল—চিঠিপত্রাদি এলে তা গ্রহণ করা ও যেসব চিঠি পাঠাতে হবে তা যথাযথভাবে পাঠানোর ব্যবস্থা করা এবং সে সবের বিস্তারিত বিবরণ রাখা।

৭. **বিক্রয় বিভাগ**[37]**:** কারবারের দ্রব্যাদি বিক্রয় করার যাবতীয় দায়িত্ব এই বিভাগের ; ওজন, মোড়ক বাঁধাই, সরবরাহ প্রভৃতি সমস্ত কাজই এর অন্তর্গত। এই বিভাগের দায়িত্ব সেল্স ম্যানেজার-এর উপর থাকে। তাকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন কর্ম-চারী থাকে।

৮. **ক্রয় বিভাগ**[38]**:** কারবারের অন্তর্গত ও ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্যাদি কেনার ভার থাকে এই বিভাগের উপর। একজন পারচেজ ম্যানেজারের দায়িত্বে ও কয়েকজন কর্ম-চারীর সহায়তায় বিভাগটি পরিচালিত হয়। সাধারণত বড় কারবার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আলদা বিক্রয় ও ক্রয় বিভাগ থাকে না।

উপরোক্ত বিভাগগুলি ছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনমত আরো অন্যান্য বিভাগ থাকতে পারে। যথা, শ্রমিক-কর্মী বিভাগ[39], আইনগত পরামর্শ বিভাগ[40], নথিবন্ধ-করণ বিভাগ[41] ইত্যাদি।

আধুনিক অফিসে ব্যবহৃত শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্রাদি

LABOUR SAVING DEVICES USED IN A MODERN OFFICE

কারখানার মত অফিসের বিভিন্ন কাজ যথা, চিঠিপত্রাদি ও নির্দেশনামা প্রভৃতির সঠিক প্রতিলিপি[42] প্রস্তুত করা ও পাঠানো, বহির্গামী চিঠিপত্রাদির উপর স্ট্যাম্প বসান বা স্ট্যাম্প-এর ছাপমারা, আগত চিঠিপত্রাদি খোলা, বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভাগের সাথে যোগাযোগ ও মৌখিক আলাপ, চিঠিপত্রাদির নথিবন্ধকরণ[43] প্রভৃতির দ্রুত ও সুদক্ষ সম্পাদনের জন্য বর্তমানে, অফিসে নানাপ্রকারের সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-পাতির সাহায্য লওয়া হয়।

লিখিত বিষয় আদানপ্রদান যন্ত্রাদি[44]**: ১. টাইপরাইটার**[45]**:** ছোট বড় সকল আধু-নিক কারবারেই দৈনন্দিনকার্যে এই যন্ত্রটি অপরিহার্য। এতদিন যাবৎ এর ব্যবহার প্রচলিত য়ে, বর্তমানে আর এটিকে 'আধুনিক' যন্ত্র বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে সন্দে-হের অবকাশ আছে। দ্রুত নির্ভুল ও সুন্দরভাবে কারবারের চিঠিপত্রাদি ও বিভিন্ন নির্দেশাদি এর সাহায্যে সুচারুরূপে অল্পসময়ের মধ্যে টাইপ করে পাঠান এবং সেগুলির যথাযথ প্রতিলিপি প্রস্তুত ও রক্ষা করা যায় বলে সর্বত্রই এর আদর আছে। অতি সম্প্রতি বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণ টাইপরাইটারের তুলনায় অনেক কম পরিশ্রমে অনেক বেশি দ্রুতবেগে চিঠি টাইপ করা যায়।

২. **রোনিও প্রতিলিপিকারক**[46] **:** এই যন্ত্রটির দ্বারা কপিং কালিতে লিখিত অথবা কপিং ফিতার সাহায্যে টাইপরাইটার যন্ত্রে মুদ্রিত পত্র থেকে অল্পসময়ে বহু প্রতিচ্ছবি[47] মুদ্রণ করা সম্ভব।

৩. **স্টেনশিল ডুপ্লিকেটর:** চিঠিপত্র, রেখাচিত্র, ম্যাপ, নকশা প্রভৃতির অল্প-সময়ের মধ্যে দ্রুত প্রতিলিপি এর সাহায্যে প্রস্তুত করা যায়।

---

35. Correspondence Department. 36. Receipt and Despatch Section.
37. Sales Department. 38. Purchase Department.
39. Personnel Department. 40. Law Department.
41. Filing Department or Section. 42. Copy. 43. Filing.
44. Devices of Written Communication. 45. Typewriter.
46. Roneo Letter Copier. 47. Photostat.

... প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যে ও দ্বিতীয়-টিতে সীসার অক্ষরের সাহায্যে অঙ্কিত ও লিখিত বিষয়বস্তুর ইচ্ছামত প্রতিলিপি প্রস্তুত করা যায়।

৬. [illegible]: চিঠিপত্র, দলিল, চুক্তিনামা প্রভৃতির হুবহু প্রতিচ্ছবি গ্রহণের জন্য এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর দ্বারা গৃহীত 'নেগেটিভ' থেকে ইচ্ছামত সংখ্যায় প্রতিচ্ছবি প্রস্তুত করা সম্ভব।

আলাপন ও তা লিপিবদ্ধ করার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি[48]: ১. ***টেলিফোন***: *কারবারের বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সাথে প্রয়োজনমত যোগযোগ স্থাপন ও* আলাপনের সুবিধার জন্য সকল কারবারেই বর্তমানে এই যন্ত্রটি ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। দ্রুত কাজ সম্পাদনের দ্বারা কারবারের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির পক্ষে এটি বিশেষ সহায়ক।

২. **অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা**[49]: বাইরের ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্রুত সংযোগস্থাপন ও আলাপনের জন্য যেমন সাধারণ টেলিফোন ব্যবস্থা দরকার তেমনি, সকল বড় বড় কারবারেই অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিভাগের সাথে প্রয়োজনমত অবিলম্বে সংযোগস্থাপন, বিভাগীয় প্রধানগণের সাথে আলাপন, তাদের নির্দেশ প্রদান, অনুসন্ধান ইত্যাদি কাজের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রয়োজন হয়ে থকে। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ টেলিফোন ব্যবস্থা থাকে ও সে জন্য অভ্যন্তরীণ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ[50] ও পৃথক কর্মী থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রভৃতির সাথে বিভাগীয় প্রধান কর্মচারীদের যোগাযোগের ব্যবস্থাও থাকে।

৩. **ইপসোফোন**[51]: এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি টেলিফোন বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরে, যিনি টেলিফোন করছেন, তাঁর নাম ঠিকানা এবং তাঁর প্রদত্ত সংবাদ বা বক্তব্য শুনে একই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখে। সুতরাং অফিসে কেউ উপস্থিত না থাকলেও টেলিফোনে কোন সংবাদ এসেছিল কিনা, কে তা পাঠিয়েছিল এবং কি সংবাদ পাঠিয়েছিল, ইত্যাদি জানতে পারা যায়। এজন্য কোন পৃথক কর্মচারী নিয়োগ করতে হয় না।

৪. **ডিক্টাফোন**[52]: এই যন্ত্রটির দ্বারা স্টেনোগ্রাফারদের কাজ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ, এর সাহায্যে যে কোন চিঠিপত্র বা বক্তব্য বিষয় অবসর সময়ে কারবারিগণ বা প্রধান কর্মচারিগণ একটি মোমের বা প্ল্যাস্টিকের চাকতি বা চোঙ্গাতে লিপিবদ্ধ করে টাইপিস্টগণের নিকট পাঠালে, তারা গ্রামোফোনের মত ঐ রেকর্ড ধীরে ধীরে বাজায় ও তা শুনে টাইপরাইটার যন্ত্রের সাহায্যে তা টাইপ করে দেয়।

৫. **টেলিফোন ও ডিক্টাফোনের সংমিশ্রণ**[53]: অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘকালব্যাপী টেলিফোনের সাহায্যে যে আলাপ-আলোচনা করা হয় তা পরবর্তীকালে প্রয়োজন হতে পারে মনে করে লিপিবদ্ধ করার জন্য টেলিফোন ও ডিক্টাফোনের সাহায্য লওয়া হয়। পরে প্রয়োজনানুসারে তা বাজিয়ে শোনা যেতে পারে।

সংবাদাদি আদানপ্রদানের মৌখিক ও দৃশ্য ব্যবস্থাসমূহ[54]: আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বড় বড় কারবারগুলি তাদের সংবাদাদি আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য চলচ্চিত্র ও স্লাইড ব্যবহার করে থাকে। তা ছাড়া, সেখানে বিক্রয় কর্মীদের বৈঠক ও তাদের শিক্ষার জন্য স্বল্পদূরত্বসম্পন্ন সীমাবদ্ধ টেলিভিসন ব্যবস্থা ও কারবারের বাৎসরিক বিবরণী পেশের সময় ও কর্মীনিয়োগের জন্য সাধারণ টেলিভিসন ব্যবহার করা হয়।

48. Verbal Communications and Automatic Recording.
49. Internal Communications System. 50. Private Auto Exchange.
51. Ipsophone. 52. Dictaphone.
53. Combination of telephone and dictaphone.
54. Audio-visual means of Communication.

[illegible]

হিসাব প্রস্তুত[illegible] ... [illegible] ও ভাগ করার কাজে একজন মানুষের যে সময় লাগে তার [illegible]
তীয় যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করার কাজে ... বহুগুণ দ্রুতবেগে এই যন্ত্রের দ্বারা তা সম্পন্ন করা যায়।

২. **বিল প্রস্তুতের যন্ত্র**[56]**:** টাইপরাইটার ও কম্পটোমিটার যন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত এই যন্ত্রটির দ্বারা অতি দ্রুত ও অধিক পরিমাণে বিল প্রভৃতি মুদ্রিত করা যায় বলে বৃহদায়তন কারবারে এই যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে।

৩. **বুক-কিপিং মেশিন:** ক্রয়, বিক্রয়, নগদ আদায়, স্টোর রেকর্ড ইত্যাদি কারবারে দৈনন্দিন লেনদেনের বিষয়গুলি এই যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত ও সহজে হিসাবখাতার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা সম্ভব।

অন্যান্য বিবিধ যন্ত্রাদি: ১. **টাইম রেকরডিং মেশিন**[57]**:** কারখানার গেটে শ্রমিকদের হাজিরা বইয়ে আগে তাদের প্রত্যেকের হাজিরার সময় লেখা হত। বর্তমানে তার পরিবর্তে গেটে একটি বা কয়েকটি টাইম রেকরডিং মেশিন রাখা হয় ও তার দ্বারা প্রত্যেক শ্রমিকের নাম লেখা কার্ডে হাজরার সময় মুদ্রিত হয়ে থাকে।

২. **অটো অ্যাবস্ট্রাক্ট**[58]**:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল বিজিনেস মেশিন করপোরেশন (আই বি এম) কর্তৃক এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরি হয়েছে যে-কোন লিখিত বিষয়বস্তু পড়ে নিজেই তার সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করতে পারে। কোম্পানীর সেক্রেটারী, জেনারেল ম্যানেজার প্রভৃতি প্রধান কর্মচারিগণ যারা সর্বদা ব্যস্ত থাকায় সময়াভাবে দীর্ঘ চিঠিপত্র, দলিল ও বিবরণ প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে পাঠ করতে পারে না, তাদের পক্ষে এই যন্ত্রটি খুবই উপযোগী।

৩. **টেলিরাইটার**[59]**:** যন্ত্রটির সাহায্যে সহজে হাতে লেখা সংক্ষিপ্ত বার্তা, তারের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে অবিকলরূপে পাঠানো যায়।

৪. **টেলিপ্রিন্টার**[60]**:** যে সব স্থানে টেলিফোনে সংবাদ পাঠালে ভুল ভ্রান্তি ও বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে, সেখানে এই যন্ত্রটির দ্বারা যে কোন বার্তা যথাযথরূপে পাঠান সম্ভব। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক টেলিফোন প্রান্তে একটি টাইপরাইটার যন্ত্র থাকে। একপ্রান্ত থেকে টাইপরাইটার যন্ত্রে বার্তাটি টাইপ করার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ তা অপর প্রান্তে অবস্থিত টাইপরাইটার যন্ত্রে আপনা-আপনি টাইপ হয়ে যায়। আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প কারবারে টেলিপ্রিন্টার যন্ত্র ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সমস্ত সংবাদপত্র অফিসে এটি ব্যবহৃত হয়।

৫. **খাম সীল করার ও খোলার যন্ত্র**[61]**:** আধুনিক অফিসগুলিতে প্রতিদিন ডাকে শত শত চিঠি আসে ও পাঠাতে হয়। কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐগুলি বন্ধ করার, ডাকটিকিট লাগাবার বা টিকিটের ছাপ মারার ও আগত চিঠিগুলি খোলার ব্যবস্থা করতে অনেক সময় ও পরিশ্রম লাগে। এর পরিবর্তে, শ্রম ও সময় সংক্ষেপের জন্য, ঐ কাজগুলি সম্পাদনের জন্য ছোট ছোট যন্ত্র বর্তমানে সব অফিসেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

৬. **ছিদ্র করার, তারিখ ও ক্রমিক নম্বর বসানোর যন্ত্র**[62]**:** বিভিন্ন অফিসে, চিঠিপত্র যথাযথরূপে নথিবদ্ধ করে রাখার জন্য, ঐগুলি ছিদ্র করার জন্য, আগত চিঠিপত্রে, সেগুলির প্রাপ্তির তারিখ লিপিবদ্ধ করার জন্য ও বিভিন্ন কাগজপত্রে ক্যাশমেমো, বিলবই ইত্যাদিতে ক্রমিক সংখ্যা বসানোর জন্য পৃথক পৃথক যন্ত্র বহুদিন যাবৎ ব্যবহৃত হচ্ছে।

নথিবদ্ধকরণ
FILING

প্রয়োজনানুযায়ী সদাসর্বদা ব্যবহারের জন্য কারবারের বিবিধ দলিল, গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রাদি, রিপোর্ট ও রেকর্ডগুলি সুশৃঙ্খলার সাথে রাখার কাজকেই এককথায় নথিবদ্ধকরণ বলা হয়। প্রতিদিনই কারবারসমূহে অসংখ্য চিঠিপত্রাদি আসে ও অনুরূপ

55. Accounting Machines. 56. Billing Machine.
57. Time Recording Machine. 58. Auto Abstract. 59. Telewriter.
60. Teleprinter. 61. Envelope sealing and opening Machine.
62. Punching, Dating and Numbering Machines.

অসংখ্য পত্র পাঠানো হয়। বিভিন্ন বিষয়ে, দলিলপত্রাদি, চুক্তিনামা প্রভৃতি সম্পাদিত হয়, নানা বিষয়ে রিপোর্ট, রেকর্ড, স্টেটমেন্ট প্রভৃতির প্রস্তুত ও সংগৃহীত হতে থাকে। এই সব দলিল ও চিঠিপত্র যথাযথ সুশৃঙ্খলভাবে রাখা না হলে, প্রয়োজনের মুহূর্তে তা পাওয়া যায় না ও তাতে কাজের বিঘ্ন ও কারবারের বিপত্তি ঘটতে পারে। সেজন্য সকল কারবারেই কোন-না-কোন প্রকারের নথিবন্ধকরণের ব্যবস্থা থাকে। এর বহুবিধ পদ্ধতি থাকলেও, মোটামুটিভাবে সকল পদ্ধতিতেই যে সকল মৌলিক নীতি অনুসৃত হয়, তা নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

নথিবন্ধকরণের মৌলিক নীতিসমূহ : একটি উত্তম নথিবন্ধকরণ ব্যবস্থার অপরিহার্য গুণাবলী[৬৩]: ১· কাল বিলম্ব না করে[৬৪] যাতে কাগজপত্র[৬৫] অনায়াসে পাওয়া যায় সেদিকে প্রধান দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

২· ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের[৬৬] প্রয়োজন হলে যাতে অসুবিধা না হয়, এমন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া আবশ্যক।

৩· যে ব্যবস্থাই প্রবর্তিত হোক না কেন, তা জটিলতাবিহীন অর্থাৎ যথাসম্ভব সহজ ও সরল[৬৭] হওয়া প্রয়োজন।

৪· নথিপত্র যাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা[৬৮] থাকা প্রয়োজন।

৫· আশু এবং সদাসর্বদা প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি ও কদাচিৎ ব্যবহারের কাগজপত্র সম্পর্কে পৃথক ব্যবস্থা অনুসৃত হওয়া আবশ্যক।

৬· সর্বোপরি নথিবন্ধকরণ ব্যবস্থাটির দ্বারা কারবারের যে পরিমাণ উপকার ঘটবে, তার ব্যয় যেন তার চেয়ে বেশি না হয়[৬৯], তা দেখতে হবে।

উপরোক্ত নীতিগুলি অনুসরণ করে যেসব নথিবন্ধকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান ব্যবস্থার আলোচনা করা হল।

নথিবন্ধকরণের পদ্ধতি বা ব্যবস্থাসমূহ[৭০]: ১· **স্বরবর্ণানুক্রমিক নথিবন্ধকরণ[৭১]:** এতে ব্যক্তি, স্থান, প্রতিষ্ঠান, অথবা বিষয়বস্তুর নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী কাগজপত্র নথিবন্ধ করা হয়। এটি হল সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ নথিবন্ধকরণ পদ্ধতি। পদ্ধতির দিক থেকে এটি অত্যন্ত সহজ ও সরল কিন্তু এর অসুবিধা এই যে প্রতিবারই কোন বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে এতে অযথা বহু সময় নষ্ট হয়; কারণ, একই আদ্যক্ষরে অনেক বিষয়বস্তু, স্থান বা ব্যক্তির নাম থাকতে পারে এবং তাতে ভুলের সম্ভাবনাও বাড়ে।

২· **ক্রমিক সংখ্যানুসারে নথিবন্ধকরণ[৭২]:** এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুসমূহের ইচ্ছামত[৭৩] ক্রমিক নম্বর দিয়ে তদনুযায়ী কাগজপত্রাদি নথিবন্ধ করা হয়। এতে অসুবিধা এই যে, কত নম্বর নথিতে কোন্ বিষয়বস্তু রয়েছে তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আবার একটি তালিকা সর্বদাই হাতের কাছে রাখতে হয়।

৩· **ভৌগোলিক নথিবন্ধকরণ[৭৪]:** এই পদ্ধতিতে ভৌগোলিক অঞ্চলানুযায়ী বা স্থানের নাম অনুযায়ী কাগজপত্রগুলি নথিবন্ধ করা হয়। যে সকল কারবারের ব্যবসায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত সেখানে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক।

৪· **তারিখ অনুসারে নথিবন্ধকরণ[৭৫]:** এই পদ্ধতিতে কালক্রমানুসারে কাগজপত্রাদি নথিবন্ধ করা হয়। কিন্তু এ পদ্ধতি সর্ববিষয়ের কাগজপত্র নথিবন্ধ করার উপযোগী নয়। শুধু বিল, ক্যাশমেমো, ভাউচার, অর্ডার প্রভৃতির ক্ষেত্রেই এটি সুবিধাজনক।

৫· **বিষয় অনুসারে নথিবন্ধকরণ[৭৬]:** এতে বিষয়বস্তু অনুযায়ী কাগজপত্রাদি পৃথকভাবে নথিবন্ধ করা হয়।

63. Principles of Filing.: Essentials of a good filing system.
64. Time saving. 65. [illegible] [illegible]ility. 67. Simplicity.
68. Safety. 69. Econo[illegible] 70. Methods of filing.
71. Alphabetic filing. 72. Numerical filing. 73. Arbitrary.
74. Geographic filing. 75. Chronological filing.
76. Subjectwise filing.

নথিবন্ধকরণের সাজসরঞ্জাম[77] : বিজ্ঞানসম্মত ও দক্ষতাপূর্ণ নথিবন্ধকরণের জন্য আধুনিককালে যে সকল বিবিধ সাজসরঞ্জাম উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত হয়েছে, নিচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

নথিবন্ধকরণের যে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা স্থির হবে তদনুযায়ী কাগজপত্রগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে নথিবন্ধ করে তা আলাদা আলাদা ফোল্ডার[78] এর ভিতরে রাখা হয়। ঐ ফোল্ডারগুলি মোটা কাগজের, কার্ডবোর্ডের অথবা ধাতুর তৈরি[79] হতে পারে।

এরপর ঐ ফোল্ডারসহ নথিপত্রগুলি বিভিন্ন প্রকারের ক্যাবিনেটে[80] রাখা হয়। এই সব ক্যাবিনেট কাঠের অথবা ধাতুর হতে পারে। এবং নানান পদ্ধতিতে এই সব ক্যাবিনেটে নথিপত্রগুলি রাখা হতে পারে। এরমধ্যে একটি হল পিজিয়নহোল ক্যাবিনেট[81]। এতে কতকগুলি ছোট ছোট খোপ থাকে। তাতে ফোল্ডারগুলি বিন্যস্ত থাকে। একপ্রকার ক্যাবিনেট আছে, তাতে ফোল্ডারগুলি খাড়াভাবে[82] রাখা হয়। একে ভারটিক্যাল ফাইলিং[83] বলে। হরাইজেন্টাল ফাইলিং[84] হল নথিবন্ধ কাগজপত্রাদি সুবিন্যস্ত রাখার একটি পুরাতন পদ্ধতি। এতে পর পর একটির উপর আর একটি ফোল্ডার সাজিয়ে রাখা হয়। যে সব কাগজপত্র ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা যেগুলি এখনও শ্রেণীবদ্ধ হয় নি, সেগুলি সংরক্ষণের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বাক্সের ন্যায় একপ্রকার ফোল্ডার ব্যবহৃত হয়। তা বক্স ফাইলিং নামে পরিচিত।

ইনডেকসিং বা সূচী অথবা অনুক্রমণী প্রণয়ন
INDEXING

নথিবন্ধ কাগজপত্র ও দলিলাদি প্রয়োজন হলে যাতে অনায়াসে ও সত্বর খুঁজে বের করা যায় সেজন্য তাদের যথাযথ তালিকা তৈরি করা প্রয়োজন। এটিই সূচী কিংবা অনুক্রমণী প্রণয়ন বলে পরিচিত। এ জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়। যথা,—১. সাধারণ সূচী[85], ২. স্বরবর্ণানুক্রমিক[86], ৩. কার্ড সূচী[87] প্রভৃতি।

১. সাধারণ সূচী: বিভিন্ন নথিবন্ধ কাগজপত্র সংবলিত ফোল্ডারের বিষয়বস্তু আদ্যক্ষর অনুযায়ী একটি পুস্তিকায় তাদের নাম ও তার পাশে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে রাখা হয়। প্রত্যেক আদ্যক্ষরের জন্য কয়েকটি করে পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট থাকে। এটি সাধারণত চারপ্রকারের হয়ে থাকে—ক· এই সূচী একটি পুস্তিকার আকারে বাঁধাই করা[88] থাকে।

খ· সূচীর পৃষ্ঠাগুলি আলগাভাবে[89] গ্রথিত থাকে। প্রয়োজনমত তা থেকে যে কোন পৃষ্ঠা বের করে নেওয়া অথবা তাতে নূতন পৃষ্ঠা সংযোগ করা যায়।

গ. পুস্তকাকারে গ্রথিত, আদ্যক্ষরযুক্ত সূচীর আদ্যক্ষরগুলি পুস্তকটি থেকে কিছুটা বেরিয়ে থাকে[90]।

ঘ· পুস্তকাকারে গ্রথিত, সূচীর পৃষ্ঠাগুলি পাশে এমনভাবে কাটা হয় যে আদ্যক্ষরগুলি দেখা যায়[91]।

২. স্বরবর্ণানুক্রমিক সূচী: এতে বিষয়বস্তুর বা নামের প্রথম স্বরবর্ণানুযায়ী সূচী প্রস্তুত হয়। A, E, I, O, U এবং Y, ইংরেজী বর্ণমালার এই স্বরবর্ণগুলি অনুযায়ী প্রতি পৃষ্ঠায় ছয়টি ঘর থাকে ও তাতে বিষয়বস্তু ও নাম অনুযায়ী নথিবন্ধ কাগজপত্রের উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়।

৩· কার্ডসূচী: এতে প্রত্যেকটি কার্ডে আদ্যক্ষর অনুযায়ী নথিবন্ধ কাগজপত্রের ও বিষয়বস্তু ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত থাকে। ঐ কার্ডগুলি একটি কাঠের বা

---

77. Filing Equipment. 78. Folder. 79. Metal folder.
80. Cabinet. 81. Pigeon-hole cabinet. 82. Vertical.
83. Vertical system of filing. 84. Horizontal system of filing.
85. Ordinary Index. 86. Vowel Index. 87. Card Index.
88. Bound Book. 89. Loose Leaf System. 90. Extended Index.
91. Self Indexing system.

ধাতুর ক্যাবিনেটে পৃথক পৃথক ড্রয়ারে শলাকায় গাঁথা থাকে। ঐ সব ড্রয়ারের বাইরে আদ্যক্ষরগুলি লেখা থাকে। সর্বাধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত বলে এর ব্যবহার বিস্তারলাভ করছে।

এর সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, এটি সংকোচনপ্রসারণক্ষম[92]। বিষয়বস্তু বৃদ্ধি পেলে কার্ড ও ক্যাবিনেট সংখ্যা সহজেই বাড়ান যায়। আবার পুরাতন বিষয়বস্তুর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে অপ্রয়োজনীয় কার্ডগুলি ফেলে দেওয়া যায়। প্রয়োজনমত যে কোন সময় সহজেই নূতন বিষয় সংবলিত নূতন কার্ড যথাস্থানে স্থাপন করা যায়। এইরূপে বাস্তবে এর সম্প্রসারণযোগ্যতা অসীম বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার প্রয়োজন হলে যে কোন কার্ড, এমনকি গোটা ড্রয়ার পর্যন্ত স্থানান্তর করা সম্ভব। এক-একটি বিষয়ের জন্য এক-একটি পৃথক কার্ড থাকায়, এতে বিষয়গুলির পূর্ণতর বিবরণ দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্রের উল্লেখ[93] করা যায়।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

৯ কোম্পানীর সেক্রেটারীর কার্যপ্রণালী

1. Discuss the functions and duties of the company secretary.
 [কোম্পানীর সেক্রেটারীর কার্যাবলী ও কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর।]
 উঃ ১৪০-৪২ পৃঃ
2. Discuss the essential qualifications of a private secretary.
 [ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর বা একান্ত সচিবের আবশ্যকীয় গুণাবলীর উল্লেখ কর।]
 উঃ ১৩৭-৩৮ পৃঃ
3. As the secretary of a limited company you are asked to draft a statutory report. Prepare such a report with imaginery details.
 [কোনও একটি লিমিটেড কোম্পানীর সেক্রেটারী হিসাবে তোমাকে একটি বিধিবদ্ধ বিবরণীর খসড়া রচনা করিতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাল্পনিক তথ্যাদির সাহায্যে এরূপ একটি খসড়া রচনা কর।]
 উঃ ১৪৪-৪৫ পৃঃ
4. Draft the minutes of a meeting of the Board of Directors of a Company on the basis of an imaginery agenda.
 [একটি কাল্পনিক আলোচ্য বিষয়ের তালিকা ভিত্তিতে কোনও কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদের একটি সভার মিনিট্‌স্‌ রচনা করে দেখাও।]
 উঃ ১৪৮-৫১ পৃঃ
5. Draft the minutes of the annual general meeting of a Co-operative Society.
 [কোনও একটি সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী (মিনিট্‌স্‌) রচনা কর।]
 উঃ ১৫১-৫২ পৃঃ

১০ অফিস সংগঠন

1. Describe the organisation of a modern office with which you may be familiar. [C. U. 1961]
 [তুমি যার সাথে পরিচিত এরূপ একটি আধুনিক অফিসের সংগঠনটি বর্ণনা কর।]
 উঃ ১৫৯-৬১ পৃঃ
2. In preparing the 'lay-out' of an office, what consideration should be taken into account? Give a sketch of such 'lay-out'. [C. U. 1962]
 [কোনও একটি অফিসের অভ্যন্তরীণ বিন্যাস প্রস্তুত করতে গিয়ে কোন্ কোন বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হয়? এরূপ একটি বিন্যাসের রেখাচিত্র বা স্কেচ দাও।]
 উঃ ১৫৪-৫৬ পৃঃ

92. Elastic. 93. Cross reference.

পঞ্চম খণ্ড
কারবারের জোট
BUSINESS COMBINATIONS

অধ্যায়

১১ কারবারের জোট
BUSINESS COMBINATIONS

১১

কারবারের জোট
BUSINESS COMBINATIONS

ভূমিকা

প্রতিযোগিতা হ্রাস, ব্যয়সংকোচ, মূল্য-স্থিরতা, বিক্রয়ের সুনিশ্চয়তা, অতি-উৎপাদন বন্ধ করা ও সর্বাধিক-মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি পৃথক কারবার যখন মিলিতভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করে তখন তাকে 'কারবারের জোট' বলে। কারবারের জোটগুলিকে যৌথমূলধনী কারবারের পরবর্তী উচ্চতর পর্যায় বলে গণ্য করা হয়।

সব কারবারী জোট যে একই প্রকারের তা নয়। অলিখিত, মৌখিক চুক্তিতে আবদ্ধ অত্যন্ত শিথিলবন্ধ জোট থেকে আরম্ভ করে 'একীভূত জোটের মত চূড়ান্তরূপে সুসংবদ্ধ জোট পর্যন্ত নানারকমের জোটই দেখা যায়। এই সব জোট যেমন স্বেচ্ছামূলক হতে পারে তেমনি বাধ্যতামূলকও হতে পারে।

কারবারী জোট গঠনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে একদিকে যেমন তাদের একটি ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অন্যদিকে দেখা যায় তাদের সংগঠন বৈচিত্র্য। কারবারীজগতে এই জোটগঠনের প্রবণতা ক্রমাগত বাড়ছে। এর অর্থনীতিক ফল হল একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি।

জোটগঠনের কারণ
CAUSES OF COMBINATION

কোনও একটি মাত্র কারণের দরুন যে কারবারী জোট গড়ে ওঠে তা নয়। নানারূপ কারণের ফলে কারবারী জোটের উৎপত্তি হয়। সে কারণগুলিও যেমন জটিল তেমনি আবার অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের সথে জড়িত থাকে।

হ্যানী এই কারণগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : (ক) কতকগুলি কারণ কারবারী জোটগঠনে বাধা করে, যেমন, তীব্র প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি। (খ) কতকগুলি কারণ কারবারী জোট গঠনে প্রলোভিত করে যেমন, মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ, শিল্পের সংরক্ষণ, অত্যধিক পুঁজির দ্বারা মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ। (গ) কতকগুলি কারণ আবার কারবারী জোট গঠনে সাহায্য করে, যেমন, বাণিজ্য শুল্ক, যৌথ-মূলধনী কারবারের উৎপত্তি প্রভৃতি।

কারবারী জোট গঠনের এই নানাবিধ কারণগুলি সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হল।

১. **তীব্র এবং অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা**[1] কারবারী জোট গঠনের একটি প্রধান কারণ। তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে অদক্ষ, দুর্বল, ছোট ও মাঝারি কারবারী সংস্থাগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয় এবং অপেক্ষাকৃত বড় ও শক্তিশালী কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি টিকে থাকে। তারপর চলে অবশিষ্ট বড় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বাজার দখলের নিদারুন প্রতিযোগিতা। একই বাজার দখলের উদ্দেশ্যে একই পণ্য উৎপাদনকারী বড় বড় কারবারগুলি বিপুল পরিমাণ পুঁজি লগ্নী করে, বিরাট আয়তনের উৎপাদন

1. Intense and wasteful competition.

ও বিক্রয় সংগঠন ও ব্যয়বহুল প্রচার যন্ত্র নিয়ে পরস্পরের সাথে উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এরা অল্পকালের মধ্যেই দেখতে পায় কারোই লাভ হচ্ছে না বরং মুনাফা কমছে ও লোকসান বেড়ে চলেছে। গলাকাটা প্রতিযোগিতার দরুন তারা পণ্যের মূল্যহ্রাসে বাধ্য হয়ে লোকসানের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। এই উপলব্ধির ফলে, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি বেঁচে থাকার তাগিদে, অপচয় বন্ধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত জোট গঠনে বাধ্য হয়।

২. **বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা**[২]-ও কারবারী জোট গঠনে বাধ্য করে। সস্তাদরে একসঙ্গে বেশি পরিমাণে কাঁচামাল কেনা, বেশি পরিমাণে কাঁচামাল আনতে ও তৈরি পণ্য বাজারে পাঠাতে পরিবহণে সুবিধাজনক ভাড়ার সুযোগ পাওয়া, আর্থিক সম্বল বেশি থাকায় সুদক্ষ কর্মী নিয়োগ ও দক্ষ উৎপাদন ও বিক্রয় সংগঠন গড়ে তোলা, কম সুদে পর্যাপ্ত ঋণের সুযোগ লাভ ও যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজিসংগ্রহ ইত্যাদি সুবিধা ভোগের দ্বারা উৎপাদন খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে যৌথমূলধনী কারবার রূপে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে। পরবর্তী কালে এই সব সুবিধার পরিমাণ আরও বৃদ্ধির তাগিদে যৌথমূলধনী বৃহদাকার কারবারগুলি আরও বৃহদাকার কারবারী জোট গঠনে প্রবৃত্ত হয়।

৩. **বাণিজ্য চক্রের** চড়তি ও **পড়তির**[৩] **অবস্থা**ও কারবারী জোট গঠনে বাধ্য করে। চড়তির বাজারে ব্যবসা, বাণিজ্য, চাহিদা, বেচাকেনা, ও মুনাফা বাড়ে। তাই সে সময় বহু নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ছোট বড়, দক্ষ অদক্ষ সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই তখন সুদিন। কিন্তু তারপর যখন মন্দা দেখা দেয় তখন লোকসানের ধাক্কায় বহু প্রতিষ্ঠান উঠে যায়। যেগুলি টিকে থাকে তারাও সংকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে এবং তাতেও না হলে জোট গঠন করতে বাধ্য হয়। এমনি ভাবে অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা কারবারী জোটের জন্ম দিয়ে থাকে।

৪. **একচেটিয়া ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা**[৪]-ও কারবারী জোটের জন্ম দিয়ে থাকে। একচেটিয়া কারবার হলে গোটা বাজার হাতের মুঠোর মধ্যে আসে। ইচ্ছেমত চড়া দামে পণ্য বিক্রি করে বিপুল মুনাফা লোটা যায়। এই কারণে একই শিল্পের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারীরা জোট বেঁধে একচেটিয়া কারবার স্থাপনে আগ্রহী হয়।

৫. **সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতি**[৫] কারবারী জোটের একটি প্রধান কারণ। বিদেশী পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বসালে দেশের বাজারে তা দেশী পণ্যের চেয়ে চড়া দামে বিক্রি হয়। ফলে দেশী উৎপাদকরা অর্থাৎ ঐ পণ্য উৎপাদন শিল্পটি বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা পায়। এই সুযোগ ভোগ করার জন্য সংরক্ষিত শিল্পটিতে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। পরে তাদের মধ্যে যখন প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে ওঠে তখন তারা জোট গঠনে প্রবৃত্ত হয়। ১৯৩২ সালে ভারতে চিনি শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা পায়। তার পাঁচ বছরের মধ্যে ১৯৩৭ সালে ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট গড়ে ওঠে। এইভাবে সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতি কারবারী জোটের জন্ম দেয়। এজন্য বলা হয়, সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতি হল কারবারী জোটের জননী।

৬. **র‍্যাশনালাইজেশন বা শিল্প সংস্কারের**[৬] ফলেও কারবারী জোট গঠিত হতে দেখা যায়। কোনও একটা গোটা শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং অপচয় দূর করে তার প্রতিযোগিতা শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত সংস্কারের দরকার হয়। একে শিল্প সংস্কার বা র‍্যাশনালাইজেশন বলে। এজন্য প্রয়োজন হলে

2. Economies of large scale production. 3. Business Cycle.
4. Desire for monopoly power. 5. Protective Tariff.
6. Rationalisation.

অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা বিলোপ করা, উৎপাদন ও দাম নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পণ্যটি উৎপাদন করা, পরিকল্পিতভাবে কাঁচামাল ব্যবহার করা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এই কাজে হাত দিতে গেলে শিল্পটির অন্তর্গত বিভিন্ন কারবারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খানিকটা সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন বোধে এজন্য একাধিক কারবারী সংস্থা নিয়ে তাদের জোটও গঠন করতে হয়। এইভাবে র‍্যাশনালাইজেশনের ফলে কারবারী জোটের জন্ম হয়ে থাকে। ভারতে চটকল শিল্পে র‍্যাশনালাইজেশনের কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন নামে চটকল শিল্পের জোটটি গঠিত হয়েছিল।

৭. **বৃহদায়তনের প্রতি সমীহা**[৭]-ও কারবারী জোট গঠনের অন্যতম কারণ। মানুষ বড় জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে গর্ব বোধ করে। কারবারীরাও বিশাল আয়তনের বিরাট কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে চায়, দেশে বড় কারবারী বলে পরিচিত হতে চায়। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়াতে চায়। এজন্য অনেক সময় তারা নিজেদের কারবারগুলিকে একত্রিত করে বড় আকারের কারবারী জোট গঠন করে। খরিদ্দারেরাও বড় কারবারী প্রতিষ্ঠানের বিরাট নামের দ্বারা তার পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৮. **ব্যক্তিগত সাংগঠনিক দক্ষতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা**[৮]-ও অনেক সময় কারবারী জোটের জন্ম দিয়ে থাকে। সুচতুর কারবারীর সাংগঠনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা, প্রতিভা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাও যেমন কারবারকে সফল করে তোলে, তেমনি তা উত্তরোত্তর আরও অগ্রসর হয়ে একাধিক কারবারী সংস্থার সম্মিলিত জোট সৃষ্টি করে থাকে। তা ছাড়া, কারবারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার তুলনায় এইসব গুণের অধিকারীর সংখ্যা অনেক কম বলে অনেক ক্ষেত্রেই এদের গুণাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় একাধিক কারবারী সংস্থা এদের নেতৃত্বে কারবারী জোট গঠন করে।

৯. **কারবারের যৌথ মূলধনী সংগঠন**[৯] কারবারী জোট গঠনের কার্যটিকে সহজ করে দিয়েছে। অল্প কয়েকজন ব্যক্তি বিভিন্ন কারবারী সংস্থার শেয়ার কিনে সহজেই ঐ সব কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করতে পারে। তারা ইচ্ছা করলে একত্রিত হয়ে সহজেই নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলির জোটও গড়ে তুলতে পারে।

১০. **পেটেন্ট আইন**[১০] কারবারী জোট গঠনের অস্ত্র হিসাবে কাজ করে থাকে। কোনও একটি কারবারী সংস্থা হয়তো এমন একটি "পেটেন্ট স্বত্বের" অধিকারী যা অত্যন্ত লাভজনক। ঐ সুবিধাটি ভোগ করার জন্য অন্য কতকগুলি সংস্থা উপরোক্ত কারবারী সংস্থাটির সাথে জোট বাঁধতে উদ্যোগী হতে পারে।

১১. **শেয়ার বাজার**[১১] কারবারী জোট গঠনের পথ সহজ করে দিয়েছে। শেয়ার বাজারে যে কোনও শেয়ার কেনার সুযোগ আছে। ফলে কিছু কারবারী এক বা একাধিক কোম্পানীর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য শেয়ার বাজারে চুপে চুপে ঐ কোম্পানীর বা কোম্পানীগুলির শেয়ার কিনতে পারে এবং এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত কোম্পানীগুলির জোট গঠন করতে পারে।

১২. **একটি শিল্পের একটি অংশে কারবারী জোট গঠিত হলে, শিল্পটির অন্য অংশের জোট গঠনের সম্ভাবনা বাড়ে।** কয়লা খনিগুলিতে জোট গঠিত হলে, লৌহ ইস্পাত কারখানাগুলি অল্প দামে কয়লার যোগান সুনিশ্চিত করার জন্য কয়লা খনি কেনার চেষ্টা করতে পারে।

জোট গঠনের সুবিধা বা সুফল

১. জোটগঠনের দ্বারা জোটের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বেশি পরিমাণে চলতি পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে এবং ছোট বাজার হতে সহজে ঋণ সংগ্রহের সুবিধাও ভোগ করে।

---

7. Respect for big size. 8. Personal Organisational ability.
9. Corporate Organisation. 10. Patent laws. 11. Share market.

২. জোটের পুঁজির পরিমাণ বেশি থাকায়, তা আধুনিক মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ এবং উন্নত ধরনের শ্রমবিভাগ চালু করতে পারে।

৩. কারবারী জোট গঠনের দ্বারা কোথাও ব্যবস্থাপনার[১২] কোথাও বা পরিচালনার[১৩] দক্ষতা বাড়ে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে উভয়ই ঘটে এবং এর ফলে কারবারের স্থির খরচ[১৪] কমে।

৪. কারবারীজোট একসঙ্গে বেশি পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় ও তৈরী পণ্য বাজারে পাঠায় এবং বিক্রয় করে। এইজন্য তা অল্পদরের কাঁচামাল কিনতে পারে, অল্পভাড়ায় পরিবহণের সুবিধা ভোগ করে এবং তার গড়পড়তা প্রচার, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি খরচ কমে।

৫. কারবারী জোট উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে কমাতে পারে এবং সেজন্য বাজারে কম দামে পণ্য বেচতে পারে। ফলে ক্রেতারা ও সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়।

৬. জোটগঠনের দ্বারা কারবারগুলি বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে যোগানের অনিশ্চয়তা কিছুটা দূর করে বাজারে স্থিরতা আনতে পারে। ফলে উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকে।

৭. প্রতিযোগিতার দরুন সর্বদাই কিছু প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হতে থাকে। তাতে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনীতিক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, বেকার সমস্যা বাড়ে ও উৎপাদনের উপাদানগুলি পড়ে থাকে। কারবারীজোট গঠনের দ্বারা এটা কিছুটা এড়ানো যায়।

৮. জোটের আর্থিক সঙ্গতি বেশি বলে তার পক্ষে বেশি ব্যয়ে গবেষণা চালিয়ে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশল এবং নূতন নূতন পণ্য উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়।

৯. বিভিন্ন দেশী-বিদেশী কারবার জোটগঠনের দ্বারা পরস্পরের সাথে কারিগরি জ্ঞান[১৫] ও 'পেটেন্ট' বিনিময় করে লাভবান হতে পারে।

জোট গঠনের কুফল

জোটগঠনের বিভিন্ন সুফল থাকা সত্ত্বেও তার অনেকগুলি কুফল আছে। তার কতকগুলি কারবারের নিজের পক্ষে অসুবিধাজনক আর অবশিষ্ট অধিকাংশ ফল গুলিই সামাজিক পক্ষে অমঙ্গলজনক।

১. কারবারী জোটের উৎপাদন ব্যয় কমলেও, বেশি মুনাফা লাভের জন্য তারা সাধারণত বেশি দামেই পণ্য বেচে।

২. একচেটিয়া ক্রেতা হিসাবে জোট সাধারণত কাঁচামালের উৎপাদনকারী ও শ্রমিকদের কম দাম ও মজুরি দিয়ে শোষণ করার সুযোগ পায়।

৩. প্রতিযোগী ও নূতন কারবারীদের দূর করে বাজার দখলের জন্য একচেটিয়া কারবারী জোটকে নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করতে দেখা যায়।

৪. মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য বিত্তশালী বড় বড় কারবারী জোটগুলি গণতান্ত্রিক দলীয় ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে বিভিন্নদল, বিশেষত শাসকদলকে, নির্বাচন-বৈতরণী পার হওয়ার জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যে প্রচুর অর্থ সরবরাহ করে দেশের রাজনীতিকে কলুষিত করে।

৫. জোটের দ্বারা আয়তন বড় হলে পরিচালনার ও ব্যবস্থাপনার সুবিধা এবং দক্ষতা বাড়ে বটে, কিন্তু কারবারের আয়তন অতিরিক্ত বড় হলে সকল বিভাগে সমানভাবে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয় না। বরং পরিচালনার ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি দেখা দেয় ও ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে।

---

12. Managerial. 13. Administration 14. Overhead cost.
15. Technical knowledge.

৬. বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপনের পর কারবারী জোটের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত মনোভাবের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ফলে বিভিন্নক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখা দেয় ও শেষ পর্যন্ত তার দরুন কারবারের দক্ষতা নষ্ট হয়।

৭. অনেক সময় কারবারী জোট গঠনের দ্বারা এত বেশি পুঁজি সংগৃহীত হয় যে তার উপযুক্ত ব্যবহারের সমস্যা দেখা দেয়। তাতে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কমে যায়। এর ফলে ফটকাবাজীর ঝোঁক দেখা দেয়।

৮. দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কারবারী জোট গঠিত হলে তা মুনাফার স্বার্থে জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা ও ক্ষতি করতে পারে।

৯. সবশেষে, একচেটিয়া কারবারী জোটের বিশেষ ত্রুটি এই যে, পণ্যের চড়া দাম ধার্য করার জন্য কৃত্রিমভাবে পণ্যের অভাব সৃষ্টি করে; এবং চড়াদাম বজায় রাখার জন্য সর্বদাই তাদের উৎপাদনক্ষমতার তুলনায় বাস্তবে কম উৎপাদন করে থাকে। এইজন্য একচেটিয়া জোটের ফলে সম্পদের ও উৎপাদন ক্ষমতার অপচয় ঘটে।

বিবিধ প্রকারের কারবারী জোট
TYPES OF COMBINATIONS

কারবারী জোটের রূপ অনেক রকমের হতে পারে: ঢিলে ঢালা ধরনের শিথিল জোট থেকে একেবারে পূর্ণ সংহতি বা একীভূত জোট পর্যন্ত নানা রূপের জোট হতে পারে। কিন্তু রূপের দিক থেকে তা যত রকমেরই হোক না কেন, মূলগত ভাবে কারবারী জোট পাঁচ প্রকারের বেশি দেখা যায় না। যেমন, (১) সমান্তরাল জোট[16]; (২) পূর্বাপর জোট[17]; (৩) পার্শ্বিক জোট[18]; (৪) বৃত্তাকার জোট[19]; (৫) তির্যক জোট[20]।

১ **সমান্তরাল জোট**

সংজ্ঞা : উৎপাদনের একই স্তরে নিযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পসংস্থা কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের একই স্তরে নিযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলি যদি কোনও মিলিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জোট বাঁধে তাহলে তাকে সমান্তরাল জোট বলে। কয়েকটি কয়লা খনি কিংবা ইস্পাত কারখানা, কিংবা চিনির কল অথবা কাপড় ব্যবসায়ী যদি একত্রিত হয়ে জোট গঠন করে, তবে তা হবে একটি সমান্তরাল জোট।

ভারতের দৃষ্টান্ত : ভারতের সুগার সিন্ডিকেট, এ সি সি বা এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানীস্, কিংবা ভারত কোকিং কোল ইত্যাদি হল এদেশে সমান্তরাল জোটের দৃষ্টান্ত।

বৈশিষ্ট্য : ১. একই শিল্পে (যেমন, কয়লা কিংবা চিনি) অথবা একই শিল্পের একই অংশে বা স্তরে (যেমন, বস্ত্র শিল্পের মধ্যে সুতাকলগুলি) কিংবা একই ব্যবসা বা বাণিজ্যে নিযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলি এতে যোগ দেয়।

২. ভূতপূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীরা একই ব্যবস্থাপনার অধীনে এসে তার দ্বারা জোটবদ্ধ ভাবে পরিচালিত হয়।

৩. এটি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে গঠিত হতে পারে। এটি এক ধরনের শিথিল জোটও হতে পারে, আবার পূর্ণ সংহতিও হতে পারে।

উদ্দেশ্য ও সুবিধা : ১. নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর হয়ে জোটবদ্ধ সংস্থার প্রতিযোগিতা শক্তি বাড়ে।

২. বৃহদায়তন উৎপাদনের যাবতীয় সুবিধাগুলি বেশি পরিমাণে ভোগ করার ফলে উৎপাদন ও বিক্রয় খরচ কমে।

---

16. Horizontal combination.
17. Vertical combination.
18. Lateral combination.
19. Circular combination.
20. Diagonal combination.

৩. যৌথ আর্থিক সম্বলের দ্বারা গবেষণার উন্নতি সম্ভব হয়।

৪. উৎপাদন ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বাজারে দাম ও মুনাফা বাড়ানো সহজ হয়।

অসুবিধা ও কুফল : ১. এই জাতীয় জোটের দ্বারা যে বাজার সুনিশ্চিত হবেই তার কোনও স্থিরতা নেই। কাঁচামালের যোগানেরও নিশ্চয়তা নেই।

২. এর ফলে গলাকাটা প্রতিযোগিতা দূর না হয়ে বরং মুষ্টিমেয়র হাতে একচেটিয়া কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হতে পারে এবং তা ক্রেতাদের তীব্র ভাবে শোষণে প্রবৃত্ত হতে পারে। এমনিভাবে এটি একটি সমাজবিরোধী শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

রেখাচিত্র নং ১১.১
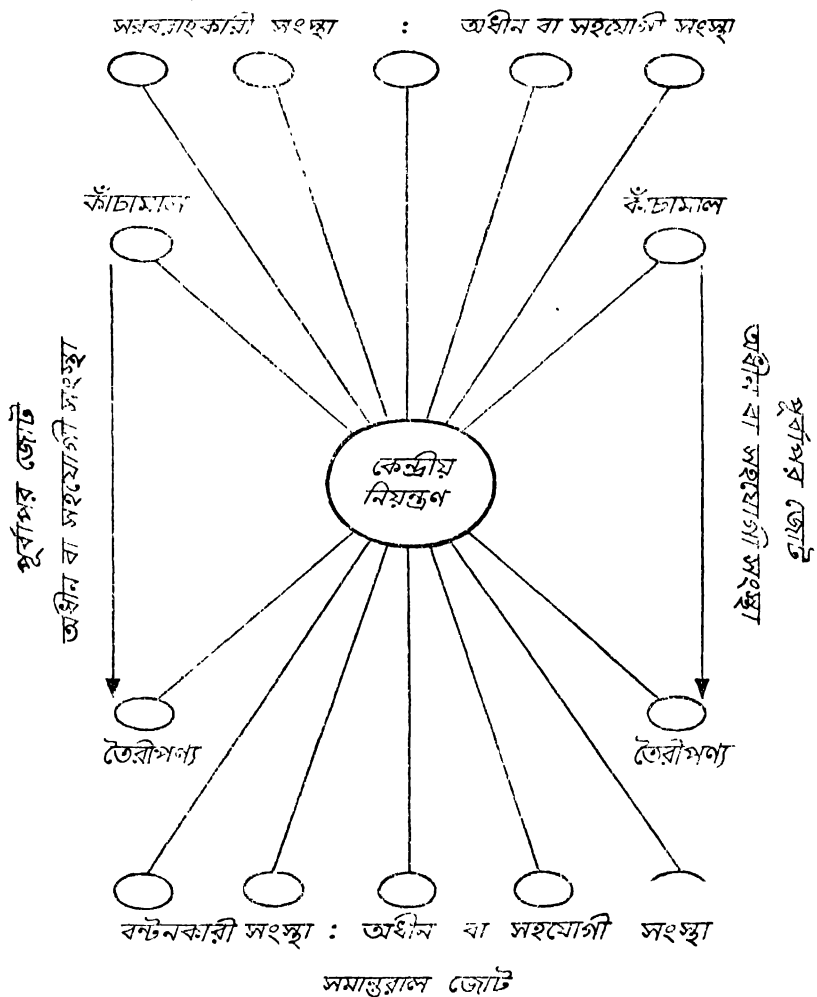
২. পূর্বাপর জোট

সংজ্ঞা : অধ্যাপক রবিনসনের কথায়, পূর্বাপর জোট হল একই শিল্পে পরপর

বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির জোট। এটি হল একই শিল্পের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত এবং এতাবৎকাল স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার জোট।

ভারতের দৃষ্টান্ত ঃ ভারতে টাটা লৌহ ইস্পাত কোম্পানী এই জাতীয় জোটের একটি নিদর্শন।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. এর দ্বারা একটি গোটা শিল্পের পরপর কয়েকটি স্তরে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি, এমন কি কাঁচামাল উৎপাদন থেকে সম্পূর্ণ তৈরি দ্রব্য উৎপাদন এমনকি বিক্রয় পর্যন্ত সমস্ত স্তরে নিযুক্ত সংস্থাগুলি একই ছাদের নিচে, অর্থাৎ একই ব্যবস্থাপনাব বা সংস্থার অধীনে একত্রিত হতে পারে।

২. এটি হল বিশেষভাবেই একটি শিল্পপ্ল্যান্ট।

৩. এই জোটের অধীন সংস্থাগুলির একের যেটি পণ্য অপরের কাছে তা হল কাঁচামাল।

৪. এই জোট যাদের দ্বারা গঠিত হয় তারা আগে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, ছিল পরস্পরের পরিপূরক।

উদ্দেশ্য ও সুবিধা ঃ ১. পৃথক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের কাজগুলি স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদনে যে অপচয় ঘটে এই জাতীয় জোটের দ্বারা তা দূর করা যায়।

২. আগের স্তরের তৈরি পণ্য পরের স্তরে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে কাঁচামাল। এই সংস্থাগুলি আলাদা থাকলে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী মারফৎ তা সংগ্রহ করতে গিয়ে খরচ বেশি পড়ে। এই জাতীয় জোটের দ্বারা আগের ও পরের দুটি স্তর একত্রিত হওয়ায় মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী দূর হয়ে কাঁচামাল সংগ্রহের ও উৎপাদনের খরচ কমে।

৩. এর দ্বারা যেমন উৎপাদন খরচ কমে তেমনি বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও পরিবহণ খরচ কমানো সম্ভব হয়।

৪. এব দ্বারা কাঁচামাল ও তৈরি পণ্য নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী উৎপাদন করা সম্ভব ও সহজ হয়।

৫. পূর্বাপর কারবারী জোট মন্দার ও সংকটের আঘাত সহ্য করার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পারে।

৬. এর দ্বারা পুঁজিও বাঁচানো যায়। মজুতকরণের খরচও কমে।

অসুবিধা ও কুফল ঃ ১. সাধারণত বৃহদায়তন শিল্প ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রে পূর্বাপর জোট সফল হওয়া কঠিন।

২. কিন্তু সাফল্যের জন্য জোটের আকারটি যেমন অতি বৃহৎ হওয়া চাই, তেমনি আবার এত বড় আকারের সংগঠন সফল ভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করাও দুরূহ। বিশেষত, অধীন সংস্থাগুলি একই জাতীয় না হওয়ায় এই অসুবিধা আরও বেশি হয়।

৩. এত বড় আয়তনের জোটের সংগঠন পরিচালনা করা সম্ভব হলেও, তা অনমনীয় হয়ে পড়ে এবং বাজারের পরিবর্তনশীল অবস্থার ও কারিগরী পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়।

উপযোগী ক্ষেত্র ঃ যে ক্ষেত্রে (১) একটি সংস্থার তৈরি পণ্য অপর একটি সংস্থার কাঁচামাল রূপে লাগে (২) একজন উৎপাদনের যে প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত রয়েছে সেটি আরেকজনের প্রক্রিয়ার পরিপূরক, (৩) একের সাথে অপরের উৎপাদনে ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার, এবং (৪) তৈরি পণ্যের মান বজায় রাখবার জন্য নির্দিষ্টমানের কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে পূর্বাপর জোট বিশেষ উপযোগী।

৩. পার্শ্বিক জোট

সংজ্ঞা ঃ পরস্পরের সাথে কোনও না কোনও সম্পর্ক আছে এমন কতকগুলি পণ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যদি জোট বাঁধে তাহলে তাকে পার্শ্বিক জোট বলে।

পার্শ্বিক জোট দুরকমের হতে পারে। একটি হল **এক পণ্য-মুখী পার্শ্বিক জোট**। একটি পণ্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে তার বিবিধ কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি জোটবদ্ধ হলে, তাকে এক পণ্য-মুখী পার্শ্বিক জোট বলে। যেমন মাছ ধরার ছিপ তৈরির একটি সংস্থার সাথে সুতো, বড়শি, ফাৎনা হুইল ইত্যাদি কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি জোটবদ্ধ হলে সেটি হবে পার্শ্বিক জোটের উদাহরণ।

আরেক রকম পার্শ্বিক জোট হল **বহুপণ্য-মুখী পার্শ্বিক জোট**। একটি মূল কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ঐ কাঁচামাল থেকে তৈরি নানা দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি জোটবদ্ধ হলে তাকে বহু পণ্য-মুখী পার্শ্বিক জোট বলে। চামড়া উৎপাদনকারী একটি ট্যানারীর সাথে সুটকেশ, ফুটবল, চামড়ার দস্তান', জুতা ও ব্যাগ তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলি যদি জোট বাঁধে তা হলে সেটি হবে বহুপণ্য-মুখী পার্শ্বিক জোটের উদাহরণ।

প্রথমটির ক্ষেত্রে একটি মাত্র পণ্য উৎপাদনে বিবিধ কাঁচামাল উৎপাদনকারী সংস্থা মিলিত হয়; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি প্রধান কাঁচামাল ব্যবহারকারী বিবিধ পণ্য উৎপাদকারী সংস্থা মিলিত হয়ে থাকে।

সুবিধা : ১. একপণ্য-মুখী পার্শ্বিক জোট কাঁচামাল বাবদ খরচ কমাতে ও কাঁচা-মালের যোগান ও মাল সুনিশ্চিত করতে পারে।

২. বহুপণ্য-মুখী পার্শ্বিক জোট নানা প্রকারের পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির দ্বারা একটি লোকসান অপরটির দ্বারা পোষাতে পারে।

৪. তির্যক জোট

সংজ্ঞা : কোনও একটি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যখন সে পণ্যটি উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অথচ অতিরিক্ত একটি আনুষঙ্গিক দ্রব্য কিংবা সেবাকর্ম উৎপাদনকারী সংস্থা বা ব্যবস্থা মিলিত হয়, তাকে তির্যক জোট বলে। যেমন একটি কারখানায় যদি নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা সংযুক্ত হয়, কিংবা সে কারখানার যন্ত্রপাতি মেরামতির যদি নিজস্ব ব্যবস্থা স্থাপন করা হয় অথবা মেরামতির কাজে নিযুক্ত কোনও সংস্থা যদি ঐ মূল কারখানার সাথে যুক্ত হয়, তাহলে সেটি হবে তির্যক জোটের দৃষ্টান্ত।

সুবিধা : মূলদ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি এর ফলে স্বনির্ভরতা লাভ করে এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যের জন্য বাইরের যোগানের উপর তাকে নির্ভর করতে হয় না।

৫. বৃত্তাকার বা মিশ্র জোট

সংজ্ঞা : বিভিন্ন শিল্পে ও বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধীনে জোটবদ্ধ হলে তাকে বৃত্তাকার বা মিশ্র জোট বলে। যেমন একটি কাপড় কলের সাথে একটি কাগজ কল, একটি চিনির কল ও একটি বৈদ্যুতিক পাখা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান জোট বদ্ধ হলে তা হবে বৃত্তাকার বা মিশ্র জোটের দৃষ্টান্ত। ভারতে অতীতে ম্যানেজিং এজেন্সীগুলির মারফৎ এজাতীয় বহু জোট গঠিত হয়েছে।

কারবারী-জোটের ক্রমবিকাশ ও বিবিধ রূপ
EVOLUTION AND DIFFERENT FORMS OF COMBINATION

কারবারী জোটগঠনের ক্রমবিকাশকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে কারবারীরা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা, মৌখিক অঙ্গীকার, সাধারণ সমিতি[21], ব্যবসায়ী সমিতি, প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে নিজেদের মধ্যে কোন বাধ্য-

21. Simple Association.

বাধকতা না থাকায় কিংবা নিজেদের মধ্যে সাময়িক ঐক্য কোন সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের রূপ গ্রহণ না করায় এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেদের মধ্যে নিবিড় ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনে, কারবারীরা উন্নত ধরনের আরও ঐক্যবন্ধ জোট স্থাপনের চেষ্টা করে। এই পর্যায়ে ব্যবসায়ী সমিতিগুলির সম্মিলিত সংঘ, বিক্রয়কারী কারবারী জোট, উৎপাদক সংঘ ইত্যাদি সংগঠিত হয়। কিন্তু এই পর্যায়ে আগের চেয়ে বেশি ঐক্যবদ্ধ সংঘ ও সংগঠন স্থাপিত হলেও, তা কমবেশী পরিমাণে শিথিল হওয়ায় এই প্রচেষ্টাও স্থায়ী ফল দেয় না।

সর্বশেষে, **তৃতীয় পর্যায়ে** এসে কারবারীদের ঐক্যের প্রচেষ্টা অনেকটা ফলপ্রসূ হতে দেখা যায়। এই পর্যায়ে 'ট্রাস্ট' প্রভৃতি নানান ধরনের স্থায়ী দৃঢ়সংবদ্ধ কারবারী জোট স্থাপিত হতে থাকে এবং সে সবের মাধ্যমে ব্যয়সংকোচ, প্রতিযোগিতা হ্রাস, বাজার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে জোটগুলি বিশেষ সাফল্য লাভে সমর্থ হয়।

কারবারী জোট গঠনের ক্রম-বিকাশের তিনটি পর্যায়ে কারবারী জোটের যে তিন প্রকারের সংগঠন দেখা দিয়েছিল তা মূলত এই—১. প্রাথমিক পর্যায়ে সমিতি[২২] ২. দ্বিতীয় পর্যায়ে সংঘ[২৩]; ও ৩. তৃতীয় পর্যায়ে একত্রীভূত সংগঠন[২৪] বা সংহতি।

রেখাচিত্র নং ১১.২

কারবারী জোটের বিবিধ রূপের বিকাশ
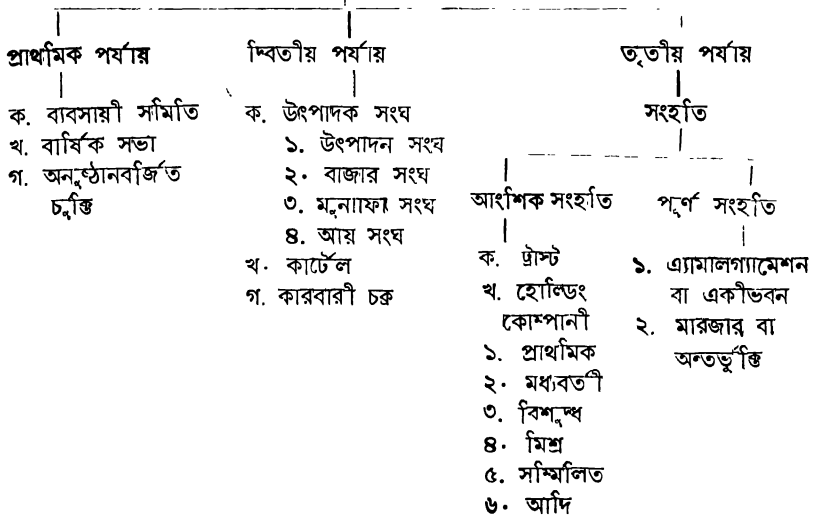
১. প্রাথমিক পর্যায়ের জোট

এই পর্যায়ে জোটের তিন ধরনের সাংগঠনিক রূপ দেখা দিয়েছিল যথা—ক. ব্যবসায়ী সমিতি[২৫], খ. বণিক সভা[২৬] এবং গ. অনুষ্ঠানবর্জিত বা অনুপচারিক চুক্তি[২৭]।

ক. ব্যবসায়ী সমিতি: ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ সমস্যা যথা—প্রতিযোগিতা, শ্রমিক সমস্যা, কাঁচামালের অভাব, সরকারী নীতি ইত্যাদির সম্মুখীন হয়ে, কারবারের মালিকরা তার সমাধান বা প্রতিকারের জন্য একত্রিত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে

22. Association. 23. Federation. 24. Consolidation.
25. Trade Association. 26. Chambers of Commerce.
27. Informal Agreement.

নিজেদের সমিতি স্থাপন করে। পশ্চিমবঙ্গের ক্যালকাটা জুট বেইলার্স এসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান জুট মিল ওনার্স এসোসিয়েশন, বেঙ্গল অয়েল মিল্‌স এসোসিয়েশন, গুজরাটের টেক্সটাইল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি হল এর উদাহরণ। সাধারণত নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা সমস্যার সমাধান ও সরকারের কাছে আবেদন ও প্রতিনিধিত্ব করা প্রভৃতি এগুলির উদ্দেশ্য।

খ. বণিক সভা : রাজ্য, অঞ্চল বা দেশ অথবা শহর ভিত্তিতে বণিক ও শিল্পপতিরা সম্মিলিতভাবে স্থায়ী সংগঠন স্থাপন করে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প সম্প্রসারণ ও সে সবের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে। আঞ্চলিক বা রাজ্য অর্থাৎ স্থানীয় বণিকসভাগুলি সম্মিলিত হয়ে তাদের কেন্দ্রীয় সংগঠনও স্থাপন করে। যেমন— পশ্চিমবঙ্গে ইউরোপীয় বণিক ও শিল্পপতিগণের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, বাঙালী বণিক ও শিল্পপতিদের ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি আছে। আবার সারাভারতের ইউরোপীয় বণিক ও শিল্পপতিদের কেন্দ্রীয় সংগঠন এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স এবং ভারতীয়দের ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স আছে।

গ. অনুষ্ঠানবর্জিত বা অনুপচারিক চুক্তি : নিজেদের মধ্যে বাজার বন্টন। বিক্রয়ের শর্ত, দাম এবং মুনাফার বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে একমত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারীরা অনেক সময় পরস্পরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই প্রকার চুক্তি সাধারণত মৌখিক হয়। মৌখিক চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীরা সকলেই মৌখিক অঙ্গীকার রক্ষা করবে, এই বিশ্বাসই এই জাতীয় কারবারী জোটের ভিত্তি। এর সদস্যরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে একই পন্থা গ্রহণ করলেও তাদের কারবারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এতে ক্ষুণ্ণ হয় না।

কিন্তু মৌখিক প্রতিশ্রুতি কেউ লঙ্ঘন করলে তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই জাতীয় জোট বেশিদিন স্থায়ী হয় না বলে পরবর্তীকালে আরও উন্নত ধরনের জোট গঠিত হয়।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ের জোট

ক্রমে ক্রমে যতই প্রতিযোগিতা তীব্রতর হতে থাকে, ততই প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারীদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ়ভাবে জোট গঠিত হতে থাকে। উৎপাদক সংঘ[২৮], কার্টেল[২৯] এবং কারবারীচক্র[৩০] এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ক. উৎপাদক সংঘ

নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করে নানাভাবে মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ পণ্যের উৎপাদনকারীরা সংঘ গঠন করে থাকে। মুনাফা বন্টনের উদ্দেশ্যে গঠিত সংঘকে 'মুনাফা সংঘ'[৩১], বাজারের বন্টনের জন্য গঠিত সংঘকে 'বাজার সংঘ'[৩২], উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে পরস্পরের মধ্যে তা ভাগাভাগি করার জন্য গঠিত সংঘকে 'উৎপাদন সংঘ'[৩৩] ও আয়ের বন্টনের জন্য সংঘ গঠিত হলে তাকে 'আয় সংঘ'[৩৪] বলে।

১. **উৎপাদন সংঘ :** অতি-উৎপাদন দূর করার জন্য কারবারীরা বাজারের চাহিদা মত নিজেদের মধ্যে মোট উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে সে অনুযায়ী প্রত্যেকের উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গঠিত এই জাতীয় কারবারী জোটকে উৎপাদন সংঘ বলে। এর সদস্যরা সংঘের নির্দেশ মেনে চললেও তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সত্তা এতে অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালিত সদস্যরা চুক্তিমত কাজ করছে কি না, তা তদারকের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই জাতীয় সংঘ বেশী দিন কার্যকরী থাকে না।

---

28. Pool. 29. Cartel. 30. Ring or Corner. 31. Profit Pool.
32. Market Pool. 33. Output Pool. 34. Income Pool.

২. **বাজার সংঘ ঃ** এই জাতীয় সংঘ সমগ্র বাজারকে সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে প্রত্যেকের নিজস্ব বিক্রয় এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়। উৎপাদন সংঘ গঠন করে স্থায়ি-ভাবে প্রতিযোগিতা দূর করার ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই বাজার সংঘ গঠিত হয়। এর সদস্যদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট পৃথক বিক্রয় এলাকা থাকলেও সকলকে সংঘ কর্তৃক নির্দিষ্ট দরে পণ্য বিক্রয় করতে হয়। তবে বিভিন্ন এলাকার বাজারের দর ধার্য করার সময় উৎপাদন ব্যয় ছাড়াও যানবাহন ইত্যাদি খরচ বিবেচনা করা হয়।

৩. **মুনাফা সংঘ ঃ** বাজার সংঘ গঠন করা সত্ত্বেও অতি-উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভবপর হয় না। ফলে অনেক কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। এর প্রতি-কারের জন্য পরবর্তীকালে মুনাফা সংঘ গঠিত হয়। এই সংঘ পণ্যের একটি নিম্নতম দর স্থির করে দেয়। সদস্যেরা যে যতটা বেশি দরে সম্ভব পণ্য বিক্রয় করে এবং নিম্নতম দর ও প্রকৃত বিক্রয়মূল্য এই দুইয়ের পার্থক্য প্রত্যেক সদস্য সংঘে জমা দেয়। ঐ সম্মিলিত মুনাফা পরে সকল সদস্যের মধ্যে তাদের উৎপাদনের অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

৪. **আয় সংঘ ঃ** উৎপাদনের উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার সংঘ যথেষ্ট পরিমাণে সন্তোষজনক না হওয়ায় পরবর্তীকালে আরও উন্নত ধরনের সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আয় সংঘ গঠিত হয়। এই সংঘের সদস্যরা নিজেদের বিক্রয়লব্ধ সকল অর্থ সংঘের হাতে জমা দেয় ও সংঘ কর্তৃক নির্দিষ্ট উৎপাদনের খরচ বাদে সে আয় সদস্যদের মধ্যে তাদের উৎপাদনের অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

উৎপাদক সংঘের সুবিধা ঃ ১. এ গঠন করা সহজ। কোনরূপ আনুষ্ঠানিক জটিলতা নাই। ২. এর সদস্যগণ নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারে। সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরীণ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ ঘটে না ও উৎপাদন অব্যাহত থাকে। ৩. একযোগে কাঁচামাল কেনা ও পরিবহণের সুযোগ প্রভৃতি বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা কিছুটা ভোগ করা যায়। ৪. প্রয়োজনের তুলনায় পুঁজি বেশি হয়ে পড়ার আশংকা থাকে না। ৫. প্রতিযোগিতা কিছুটা কমে। ৬. সদস্যদের মধ্যে বাজার ভাগ করে নিকটবর্তী বাজারে পণ্য বিক্রয় করার ব্যবস্থা হয় বলে পরিবহণ খরচের জন্য পণ্যমূল্য বাড়তে পারে না।

উৎপাদক সংঘের অসুবিধা ঃ ১. এই জাতীয় সংঘ স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে গঠিত হয় বলে কোন ব্যবসায় বা শিল্পে নিযুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে এর অন্তর্ভুক্ত করার সুনিশ্চয়তা নাই। তা ছাড়া যারা এর সদস্য হয় তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা থাকায়, সংঘের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয় না। এই কারণে উৎপাদক সংঘের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা কম।

২. সদস্যদের কারবার পৃথক থাকে বলে এই সংঘ কারিগরি ও পরিচালনার দক্ষতা ভোগ করতে পারে না। উপরন্তু বাজার ও দাম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই সংঘ পরিচালিত হয় বলে অনেক ব্যয়বহুল, দক্ষতাহীন প্রতিষ্ঠানও এর আশীর্বাদে টিকে থাকতে পারে।

৩. প্রথমে প্রতিযোগিতা হ্রাসের জন্য গঠিত হলেও পরে বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে উৎপাদন কমিয়ে ও দাম বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধির একচেটিয়া ঝোঁক এর মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে।

খ. কার্টেল

সংজ্ঞা ঃ সদস্য কারবারী সংস্থাগুলির মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাজারে পণ্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারী সংস্থাগুলি স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তা কার্টেল নামে পরিচিত। নানারূপ বিধিনিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাজার থেকে প্রতিযোগিতা দূর করে বাজারের উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই হল কার্টেলের মূলগত উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য উৎপাদন-

কারীরা, কোনও কোনও স্থলে বিক্রেতা-ব্যবসায়ীরাও, পণ্যের দাম বেঁধে দেয়, সদস্য-দের উৎপাদন বা বিক্রয়ের পরিমাণ স্থির করে দেয়, এবং অধিকন্তু, একটি যুক্ত বিক্রয় সংস্থা বা সিন্ডিকেট স্থাপন করে একমাত্র তার মারফৎ বাজারে পণ্য বিক্রয় করে।

বাস্তবিক পক্ষে, আমেরিকায় যাকে উৎপাদক সংঘ বা "পুল" বলা হয়, ইয়োরোপে তারই নাম হল কার্টেল। তবে বিক্রয় সংস্থা সহ যে কার্টেল বা সিন্ডিকেট দেখা যায় তা উৎপাদক সংঘের তুলনায় বেশি ঘনসংবদ্ধ এবং কার্যকরী জোট। জার্মানি হল কার্টেল জাতীয় জোটের জন্মভূমি।

বৈশিষ্ট্য : ১. চরিত্র বা প্রকৃতির দিক থেকে এটি হল সমান্তরাল জোট।

২. এর সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, মালিকানা ও পরিচালনা অটুট থাকে।

৩. সদস্যদের অভ্যন্তরীণ কোনও বিষয়ে কার্টেল হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

৪. কার্টেল শুধু সদস্যদের উৎপাদনের কোটা, পণ্যের দাম, বিক্রয়ের শর্তাবলী, পণ্যের গুণাগুণ ইত্যাদি স্থির করে দেয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে, যেমন সিন্ডিকেট জাতীয় কার্টেল হলে, সদস্যদের পণ্য বিক্রয়ের একমাত্র অধিকারী হয়।

৫. উৎপাদক সংঘের তুলনায় কার্টেল হল জোটের উচ্চতর রূপ।

কার্টেল-এর প্রকারভেদ: কার্টেল নানান প্রকারের হতে পারে। যেমন ১. **শর্ত নির্ধারণকারী কার্টেল :** এই জাতীয় কার্টেল পণ্য বিক্রয়ের শর্তাবলী, যথা, পণ্য সরবরাহ, দাম পরিশোধের শর্ত, বকেয়া পাওনা বাবদ দেয় অতিরিক্ত অর্থ, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময়, পণ্যের মোড়ক প্রভৃতি স্থির ও নিয়ন্ত্রণ করে।

২. **উৎপাদন ও মূল্য নির্ধারণকারী কার্টেল**[35] **:** এই প্রকারের কার্টেল তার সদস্যদের প্রত্যেকের উৎপাদনের পরিমাণ এবং পণ্যের ন্যূনতম দাম স্থির ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণকারী কার্টেল**[36]**:** এই প্রকারের কার্টেল, উৎপাদন সংঘের মত, সদস্যদের প্রত্যেকের উৎপাদনের পরিমাণ বা "কোটা" স্থির করে দেয়। কোনও সদস্য নির্ধারিত "কোটা"-র বেশি উৎপাদন করতে পারে না।

৪. **বাজার বা আঞ্চলিক কার্টেল**[37]**:** এই প্রকারের কার্টেল বাজার সংঘ বা "মারকেট পুল"-এর মত, পণ্যের গোটা বাজারটিকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে এক একজন সদস্যকে বা একাধিক সদস্যের একটি গোষ্ঠীকে এক একটি আঞ্চলিক বাজার নির্দিষ্ট করে দেয়।

৫. **সিন্ডিকেট বা যথার্থ কার্টেল**[38] **:** এটি হল কার্টেল জাতীয় কারবারী জোটের আরও ঘন সংবদ্ধ এবং কার্যকরী জোট। এক কথায়, এটি হল যথার্থ কার্টেল। একমাত্র একত্রিত ভাবে পণ্য বিক্রয় করার জন্য সকল বা কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান চুক্তিবদ্ধ হয়ে জোট গঠন করে একটি যুক্ত বিক্রয় সংস্থা বা "সেলিং এজেন্সী" স্থাপন করলে তাকে সিন্ডিকেট বা যথার্থ কার্টেল বলে। সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের সাথে একমত হয়ে শুধু এই রকম একটা যুক্ত বিক্রয় সংস্থা বা সিন্ডিকেট স্থাপন করতে পারে কিংবা, একটি লিমিটেড কোম্পানী রূপে সেটি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি এই কোম্পানীর অর্থাৎ সিন্ডিকেটের শেয়ারহোল্ডার হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে ভোটা-ধিকার পায়।

কার্টেল তার সদস্যদের পণ্য-উৎপাদন খরচ অনুযায়ী একটি ন্যূনতম বা ভিত্তি-মূলক দাম এবং সদস্যদের প্রত্যেকের উৎপাদনের কোটা স্থির করে দেয়। সদস্যরা কার্টেল অর্থাৎ সিন্ডিকেটের কাছে ঐ ভিত্তিমূলক দামের চেয়ে বেশি দামে পণ্য

35. Output and Price Cartel. 36. Output Cartel.
37. Market or Regional Cartel. 38. Syndicate or Cartel proper.

বিক্রয় করে। এই দামকে বলা হয় হিসাবের দাম বা "একাউন্টিং প্রাইস"। সিন্ডিকেট পণ্যটি বাজারে যতটা সম্ভব বেশি দামে, প্রয়োজন হলে বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দামে (যা একাউন্টিং প্রাইসের থেকে বেশি) বিক্রয় করে। পণ্য বিক্রয়ের যে মুনাফা হয় তা সদস্যদের মধ্যে তাদের উৎপাদনের কোটা অনুযায়ী বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়।

দৃষ্টান্ত ঃ এই প্রকারের কার্টেল বা সিন্ডিকেটের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল জার্মানির রাইনিশ ওয়েস্টফ্যালিয়ান কোল কার্টেল। ভারতে এর প্রধান দৃষ্টান্ত হল প্রাক্তন ইন্ডিয়ান সুগার সিন্ডিকেট ও এসোসিয়েটেড সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানী অব ইন্ডিয়া।

কার্টেলের সুবিধা ঃ ১. এর গঠনে কে জটিলতা নাই। সহজে, অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যেই এ গঠন সম্ভব।

২. এর সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে বলে তাদের মালিকানা, পরিচালনা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় না।

৩. বাজারের চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে কার্টেল তার সদস্যদের উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন করে বাজারের সাথে সহজেই নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে।

৪. এর দ্বারা শুধু উৎপাদনের পরিমাণের নিয়ন্ত্রণ ঘটে এবং বিশেষ করে যেখানে উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ বিচার করে সদস্যদের মধ্যে মুনাফা বন্টন করা হয়, সেই সকল কার্টেলের ক্ষেত্রে, সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পণ্যের উৎকর্ষ সাধনের প্রতিযোগিতা উৎসাহ লাভ করে। অতএব উৎপাদন সীমাবদ্ধ করলেও কার্টেল সংগঠন পণ্যের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাকে বিনষ্ট না করে বরং উৎসাহ দিতে পারে।

৫. এই জাতীয় সংঘে পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয়, এই দুইটি কাজ স্বতন্ত্র-ভাবে পরিচালিত হয়। বিক্রয়ের দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে একদিকে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টায় মন দিতে পারে এবং অপর দিকে কার্টেল একমাত্র বিক্রয়কারী প্রতিনিধি হিসাবে বাজারে স্থিরতা আনার ও বিক্রয়-ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা করতে পারে।

কার্টেলের অসুবিধা ঃ ১. সদস্য-প্রতিষ্ঠানগুলি স্বতন্ত থাকায়, এর উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যয়সংকোচের সুযোগ নাই।

২. এটি স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংঘ বলে সকল প্রতিষ্ঠানকে এতে যোগদান করতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং যোগানের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন সম্ভব হয় না।

৩. শিল্পে নিযুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান কার্টেলের অধীনে আনা যায় না বলে কার্টেল গঠন সত্ত্বেও প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ দূর হয় না। কার্টেল-বহির্ভূত প্রতিযোগীরা সর্বদাই নূতন পদ্ধতি ও নূতন পণ্য উদ্ভাবন করে প্রতিযোগিতা তীব্র করে তুলতে পারে। গোপনে সদস্যরা বেশী উৎপাদন করে কম দামে বাজারে বিক্রয় করে নিজেদের মুনাফা বাড়াতে চেষ্টা করে। এই সকল কারণে কার্টেল কখনই বাজারে স্থিরতা আনতে সম্পূর্ণ সফল হয় না।

৪. সদস্যরা স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন বলে যে কোন সময়ে কার্টেলের সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে। এইজন্য কার্টেলের স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা বাড়ে।

৫. এরা সাধারণত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে চড়া দামে পণ্যবিক্রয় দ্বারা মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। এই কারণে এদের কার্যকলাপ সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর বলে গণ্য করা হয়।

গ. কারবারী চক্র

উৎপাদনকারীরা যেমন বাজারে যোগান নিয়ন্ত্রণের জন্য উৎপাদন সঙ্ঘ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্টেল গঠন করে, তেমনি, পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত ব্যবসায়ীরাও

অনেক সময় মিলিত হয়ে সাময়িকভাবে বাজারে পণ্যের মোট যোগানকে সম্পূর্ণ নিজেদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে এনে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, এবং সুযোগ নিয়ে অতিমুনাফা অর্জন করার চেষ্টা করে। ব্যবসায়ীদের কারসাজির ফলেই কারবারী চক্র সৃষ্টি হয়। একে সঠিক অর্থে 'জোট' বলা যায় না। এইরূপ চক্র নিতান্তই সাময়িক। বর্তমানে কোনও কোনও পণ্যের কারবারীরা অসাধু উপায়ে অধিকতর মুনাফা উপার্জনের জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করছে। ফট্‌কাবাজীর[39] মনোবৃত্তি থেকেই এইরূপ চক্র সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩. জোটগঠনের তৃতীয় পর্যায়

এই পর্যায়ে যে সকল জোট গঠিত হতে থাকে তা আর আগের মত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিশিষ্ট সদস্যদের সংঘ থাকল না। এই স্তরে জোট স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান-গুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, পৃথক মালিকানা ও পরিচালনা বিসর্জন দিয়ে জোটের মধ্যে একীকৃত হয়ে পড়ে। তাদের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইভাবে সম্যক-রূপে মিলিত কারবারী জোট বা কারবারের সংহতি, জোট গঠনের সর্বোচ্চ স্তরের বৈশিষ্ট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ট্রাস্ট[40], হোল্ডিং কোম্পানী[41] এবং অ্যামালগ্যামেশন[42] ও মার্জার[43] প্রভৃতি, বিভিন্ন ধরনের কারবারের সংহতির[44] বা পূর্ণ সংহতির উদা-হরণ।

সংহতির বিভিন্ন রূপ : কারবারের সংহতিকে দুইটি প্রধান স্তরে বিভক্ত করা যায়। যথা—ক. আংশিক সংহতি[45] এবং খ. পূর্ণ সংহতি[46]।

ক. আংশিক সংহতি

ট্রাস্ট এবং হোল্ডিং কোম্পানী আংশিক সংহতির উদাহরণ। এই জাতীয় জোটের মধ্যে সদস্য-প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণরূপে সংহত হয় না বলে এদের আংশিক সংহতি হিসাবে গণ্য করা হয়।

১. ট্রাস্ট : বৈশিষ্ট্য : একটি দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিযুক্ত ও যৌথ-মূলধনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রিত হয়ে তাদের কারবার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি ট্রাস্ট সংগঠন সৃষ্টি করে এবং তার হাতে মিলনেচ্ছু প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডাররা তাদের অধিকাংশ বা সম্পূর্ণ শেয়ার অর্পণ করে। তার বিনিময়ে ট্রাস্ট সংস্থা তাদের ট্রাস্ট সার্টিফিকেট প্রদান করে। এর ফলে শেয়ারহোল্ডারেরা ট্রাস্ট কারবারের সুফল ভোগ করার অধিকার পায়। অপরদিকে প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ বা সম্পূর্ণ শেয়ার লাভ করে ট্রাস্ট সংস্থা সদস্য কার-খানাগুলির পরিচালনার ও ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্বলাভ করে। সদস্যপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার হারালেও তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না। আগের মতই স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদন কার্য চালাতে পারে; এটি **পূর্বাপর জোটের** দৃষ্টান্ত।

ট্রাস্টের কাছে শেয়ার সমর্পণ করলেও সদস্য-প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা ট্রাস্ট সংস্থার উপর বর্তায় না, শুধুমাত্র ভোট দেওয়ার ক্ষমতা ট্রাস্টের হাতে চলে যায়। সেজন্য, এটি "ভোটিং ট্রাস্ট"[47] নামেও পরিচিত। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এই-রূপ ট্রাস্ট গঠনের ফলে পরিচালনার অভূতপূর্ব কেন্দ্রীকরণ ঘটতে থাকায় তার তীব্র প্রতিকূল সমালোচনা হয় এবং গত শতাব্দীর শেষ দশকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাস্ট সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

ট্রাস্টের সুবিধা : ১. সুসংহত, দৃঢ়সংবদ্ধ ও পূর্ণতর একীকরণ বলে ট্রাস্ট বেশি স্থায়ী হতে পারে।

২. পরিচালনার এবং ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীকরণের দ্বারা ট্রাস্ট সংগঠন একদিকে

39. Speculation. 40. Trust. 41. Holding Company.
42. Amalgamation. 43. Merger, 44. Consolidation.
45. Partial Consolidation. 46. Complete Consolidation.
47. Voting Trust.

বৃহদায়তন উৎপাদনের যাবতীয় সুবিধালাভে সমর্থ হয় এবং অপরদিকে উৎপাদনের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকায় বাজারের চাহিদার সাথে উৎপাদন ও যোগানের বেশি সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে।

৩. উৎপাদনের উপর কর্তৃত্ব থাকায় ট্রাস্ট মোট উৎপাদন ও দামের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে

৪. পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দরুন ট্রাস্ট উৎপাদনের নির্দিষ্ট মান কার্যকর করতে পারে।

৫. একত্রীকরণের দরুন ট্রাস্টের হাতে অভূতপূর্ব পরিমাণে পুঁজির সংস্থান ঘটে।

ট্রাস্টের অসুবিধা ঃ ১. এর গঠন জটিলতাপূর্ণ এবং তাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করতে হয়।

২. অনেক সময় এর প্রয়োজনাতিরিক্ত পুঁজি সংগৃহীত হয়ে বিনিয়োগ সমস্যার সৃষ্টি করে।

৩. এর সংগঠন প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য নয়।

৪. উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকায় ট্রাস্ট বাজারে উৎপাদন কমিয়ে ও দাম বাড়িয়ে অধিক মুনাফার জনস্বার্থবিরোধী নীতিতে বেশী সফল হয়।

ট্রাস্ট (পূর্বাপর জোট) এবং কার্টেলের (সমান্তরাল জোট) তুলনা

ট্রাস্ট	কার্টেল
ট্রাস্ট গঠন পদ্ধতি জটিল এবং ব্যয়বহুল।	১. কার্টেল গঠন সহজসাধ্য ও ব্যয় অল্প।
২. এটি বেশি দৃঢ়সংবদ্ধ সংহতি।	২. এটি শিথিলবদ্ধ জোট।
৩. ট্রাস্ট উৎপাদন এবং বিক্রয় উভয় কাজই করে থাকে।	৩. কার্টেল শুধু বিক্রয়কারী জোট। উৎপাদনের উপর তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নাই।
৪. এটি পূর্বাপর কারবারী জোট।	৪. এটি সমান্তরাল বা সমশিল্প কারবারী জোট।
৫. ট্রাস্ট উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও পরিচালনা ইত্যাদি বৃহদায়তনের যাবতীয় ব্যয়সংকোচই ভোগ করে।	৫. এ শুধু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচ ভোগ করে। বৃহদায়তন উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয়সংকোচ হতে এ বঞ্চিত।
৬. এর স্থায়িত্ব বেশি।	৬. এর স্থায়িত্ব অল্প।
৭. এতে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীভূত হয়।	৭ এতে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীভূত থাকে, শুধুমাত্র বিক্রয়-ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ ঘটে।
৮. শুধুমাত্র যৌথমূলধনী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিই ট্রাস্ট গঠন করতে পারে।	৮ সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানই কার্টেল গঠনে সমর্থ।
৯. ট্রাস্টে যোগদান করলে তা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন বলে এর সদস্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ হয়।	৯ এ থেকে যে কোন সময় বেরিয়ে আসা যায় বলে অনেক বেশী প্রতিষ্ঠান এতে আকৃষ্ট হয়।
১০. পরিচালনা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ট্রাস্টে যোগদানকারী ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে আংশিক ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব সম্প্রসারণ ঘটে না।	১০. পরিচালনার কেন্দ্রীকরণ না থাকায়, কার্টেলে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণের সুবিধা হয়।

২. **সম-স্বার্থ গোষ্ঠী**[48] **: সংজ্ঞা :** হ্যানীর মতে, **সম-স্বার্থ গোষ্ঠী হল** কারবারী সংগঠনের এমন একটি রূপ যার আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নেই, যে সব কোম্পানী বা কারবারী সংস্থা নিয়ে এই জোট গড়ে ওঠে তাদের কারবারী কর্মপন্থা বা 'বিজনেস পলিসি' নিয়ন্ত্রণ করে তাদের একদল শেয়ার বা স্টক হোল্ডার অথবা পরিচালক। অর্থাৎ, একদল ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী কতকগুলি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার সংখ্যা কিনে নেয়। ফলে, তারা সহজেই নিজেদের মনোমত ঐ কোম্পানীগুলির অধিকাংশ ডিরেক্টারকে নির্বাচন করে তাদের পরিচালক পর্ষদগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। এর ফলে, নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী তারা পরিচালক পর্ষদগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মারফৎ ঐ কোম্পানীগুলিকে একই প্রকার পলিসি বা কর্মপন্থা · কর্মনীতি গ্রহণ করাতে পারে। এই ভাবে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব সম্পন্ন কারবারী সংস্থাগুলির একটি অলিখিত, অনুষ্ঠানবিহীন, কিন্তু অতি বাস্তব ও কার্যকর জোট গড়ে ওঠে। এই হল সম-স্বার্থ গোষ্ঠী। আমেরিকায় ট্রাস্ট সংগঠন বেআইনী হলে, তার স্থান নেবার জন্য যে সব নতুন রূপের জোট দেখা দেয়, সম-স্বার্থ গোষ্ঠী হল তাদের অন্যতম।

সম-স্বার্থ গোষ্ঠী জাতীয় কারবারী জোট তিন রকম রূপ নিতে পারে। যথা, (১) পরস্পর সংযুক্ত পরিচালক গোষ্ঠী ; (২) ব্যবস্থাপনা সংহতি ; এবং (৩) আর্থিক সংহতি ।

পরস্পর সংযুক্ত পরিচালক গোষ্ঠী[49] **: সংজ্ঞা :** কয়েকটি কোম্পানীর যারা শেয়ারহোল্ডার এমন একদল ব্যক্তি একই সঙ্গে ঐ সব কোম্পানীতে পরিচালক পদে নির্বাচিত হতে পারে এবং তাদের উদ্যোগে, পৃথক অস্তিত্ব সম্পন্ন হলেও ঐ কোম্পানীগুলি একই লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একই প্রকারে কর্মনীতি ও পন্থা অনুসরণ করতে পারে। এই জাতীয় অলিখিত ও আনুষ্ঠানিক আকারবিহীন সম-স্বার্থ গোষ্ঠী জাতীয় কারবারী জোটকে পরস্পর সংযুক্ত পরিচালক গোষ্ঠী বলে।

ভারতের দৃষ্টান্ত : এদেশে পরস্পর সংযুক্ত পরিচালক গোষ্ঠী জাতীয় জোটের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, জৈন, থাপার প্রভৃতি নয়টি পরিবার একসময় এই জাতীয় জোটের দ্বারা বিভিন্ন কোম্পানীতে ৬০০টি পরিচালক পদ দখল করেছিল। ১৯৫৮ সালে দেশের দশটি সর্বাপেক্ষা ধনী শিল্পপতি পরিবার এই ব্যবস্থায় মোট ২৯৭ কোটি টাকা পুঁজি সম্পন্ন মোট ৯২৯টি কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করত। বর্তমানে আইনের দ্বারা একজনের পক্ষে ২০টির বেশি কোম্পানীতে পরিচালক পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন এই জাতীয় জোটের বিস্তার খর্ব হলেও তা দূর হয়নি।

সুবিধা : ১. জোটবদ্ধ কোম্পানীর স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

২. জোটবদ্ধ কোম্পানীগুলি একই লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একই নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করায় পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে ওঠে।

৩. এই জাতীয় জোট গঠনে কোনও আনুষ্ঠানিক জটিলতা নাই।

অসুবিধা ও কুফল : ১. পরিচালক রূপে নির্বাচিত একদল ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে মতৈক্যের ও সহযোগিতার উপর এই জাতীয় জোট বিশেষভাবেই নির্ভরশীল। তাদের এই মতৈক্য ও সহযোগিতা যতক্ষণ অটুট থাকে ততক্ষণই এই জোটের অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক রূপবিহীন এবং একান্তভাবেই ব্যক্তি-নির্ভর এই জোটের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।

২. বাজারে একাধিপত্য স্থাপন করে উৎপাদন সীমাবদ্ধ ও মূল্যবৃদ্ধি করে মুনাফা বৃদ্ধিই এই জোটের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এরা প্রতিযোগিতা বিনষ্ট করে এবং ক্রেতাদের শোষণ করে। একারণে এটি জনবিরোধী চরিত্র নেয়।

48. Community of Interest. 49. Interlocking Directorate.

৩. জোটবন্ধ কোম্পানীগুলি নিয়ন্ত্রণকারী পরস্পর সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠীর গোষ্ঠীস্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং তাতে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিপন্ন হয়।

৪. বৃহদায়তন উৎপাদনের সমস্ত সুবিধাগুলি অধীন কোম্পানীগুলি ভোগ করতে সক্ষম হয় না।

৫. এই জাতীয় জোট হল এক ধরনের গোপন জোট। বাইরে থেকে তা চোখে পড়ে না। আধিপত্যকারী গোষ্ঠীর হাতের পুতুল রূপে পরিচালকরা কাজ করে। নিজেদের স্বার্থ ও কার্যকলাপ লোকচক্ষু থেকে গোপন রাখাই এর উদ্দেশ্য। এজন্য এই জাতীয় জোট অত্যন্ত আপত্তিজনক ও ক্ষতিকর।

ব্যবস্থাপনা সংহতি[৫০] **:** একই ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপনা সংগঠনের দ্বারা একাধিক কোম্পানী পরিচালিত হলেও তার মারফৎ সম-স্বার্থ গোষ্ঠীর জন্ম হতে পারে। ভারতে অতীতে যে ম্যানেজিং এজেন্সী নামক ব্যবস্থাপনা সংগঠন ছিল তার মারফৎ ব্যবস্থাপনাধীন একাধিক কোম্পানীর এই রূপ অলিখিত ও অনুষ্ঠানবিহীন জোট গড়ে উঠেছিল।

আর্থিক সংহতি[৫১] **:** একই অর্থসংস্থানকারী ব্যক্তি কিংবা সংস্থার দ্বারাও খাতক কোম্পানীগুলির মধ্যে এরকম এক অলিখিত জোট বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে।

৩. **হোল্ডিং কোম্পানী : সংজ্ঞা :** হোল্ডিং কোম্পানী হল এমন একটি রূপের কারবারী সংগঠন, যা আংশিক অথবা সাময়িক সংহতির দ্বারা স্থাপিত হতে পারে কিন্তু অন্যান্য কোম্পানীকে একত্রিত করার জন্য তাদের নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার কিনে তা সৃষ্টি করা হয়। নিয়ন্ত্রিত কোম্পানীগুলিকে বলে অধীন কোম্পানী আর নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীকে বলে হোল্ডিং কোম্পানী বা ধারক কোম্পানী। ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১৯৬৯ সালের সংশোধনীতে বলা হয়েছে, হোল্ডিং কোম্পানী হল এমন একটি কোম্পানী যে অন্যান্য কোম্পানীর ইকুয়িটি শেয়ারের অর্ধেকের বেশি শেয়ার করায়ত্ত করেছে অথবা, অন্যান্য কোম্পানীর পরি-চালক পর্ষদগুলির উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছে। কোম্পানী আইনে একথাও বলা হয়েছে যে, কোনও একটি কোম্পানী যদি অপর একটি অধীন কোম্পানীর অধীন কোম্পানী হয় তবে তা মূল বা আদি ধারক বা হোল্ডিং কোম্পানীরও অধীন কোম্পানী বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ ক যদি খ এর অধীন কোম্পানী হয় এবং খ আবার যদি গ এর অধীন কোম্পানী হয় তা হলে ক-কে খ-এর মারফৎ গ-এর অধীন কোম্পানী বলে গণ্য করা হবে।

হোল্ডিং কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য : ১. হোল্ডিং কোম্পানীকে অন্য অর্থাৎ অধীন কোম্পানীর শেয়ারের অর্ধেকের বেশি, অন্ততঃ শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ারের মালিক হতে হবে কিংবা সে কোম্পানীর পরিচালক পর্যদগুলির গঠনে নিজের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ খাটাবার ক্ষমতা তার থাকা চাই।

২. হোল্ডিং কোম্পানীটি একটি নূতন কোম্পানী রূপে স্থাপিত হতে পারে, কিংবা কোনও একটি বিদ্যমান অর্থাৎ পুরাতন কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার কিনে তাকে হোল্ডিং কোম্পানীতে পরিণত করা যেতে পারে। আবার কয়েকটি কোম্পানী মিলিত হয়েও হোল্ডিং কোম্পানী গঠন করতে পারে।

৩. হোল্ডিং কোম্পানী ও অধীন কোম্পানীগুলির পৃথক ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সত্তা বজায় থাকে। নিজেদের পৃথক পৃথক পরিচালক পর্ষদ দ্বারাই তারা পরিচালিত হয়। তবে নামে অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভাবে পৃথক হলেও, কার্যত, অধীন কোম্পানীগুলি হোল্ডিং কোম্পানীর দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. হোল্ডিং কোম্পানী নিজে কোনও কারবারে লিপ্ত না হয়ে শুধু অধীন

---

50. Managerial Integration. 51. Financial Integration.

কোম্পানীগুলি নিয়ন্ত্রণ করার কাজ নিয়েই থাকতে পারে, আবার অধীন কোম্পানী-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও নিজে প্রত্যক্ষভাবে কোনও কারবার চালাতে পারে।

৫. হোল্ডিং কোম্পানী নগদ টাকায় কিংবা নিজের শেয়ারের বিনিময়ে অন্য অর্থাৎ অধীন কোম্পানীর শেয়ার কিনতে পারে।

৬. একটি হোল্ডিং কোম্পানীর যে-কোনও সংখ্যক অধীন কোম্পানী থাকতে পারে। আবার একটি হোল্ডিং কোম্পানীর অধীন এক বা একাধিক কোম্পানীর নিজেদেরও কতকগুলি অধীন কোম্পানী থাকতে পারে। প্রথমোক্ত কোম্পানীটিকে **মূল বা আদি হোল্ডিং কোম্পানী** এবং দ্বিতীয়োক্ত কোম্পানী বা কোম্পানীগুলিকে **মধ্যবর্তী হোল্ডিং কোম্পানী** বলে।

ভারতের দৃষ্টান্ত ঃ এদেশে প্যারী এ্যান্ড কোং, শ'ওয়ালেস, ব্রুকবন্ড ইত্যাদি হোল্ডিং কোম্পানীর দৃষ্টান্ত। কয়লাখনিগুলি জাতীয়করণের আগে কয়লাখনি কোম্পানীগুলির মধ্যে কয়েকটি হোল্ডিং কোম্পানীর অস্তিত্ব ছিল।

রেখাচিত্র নং ১১.৩
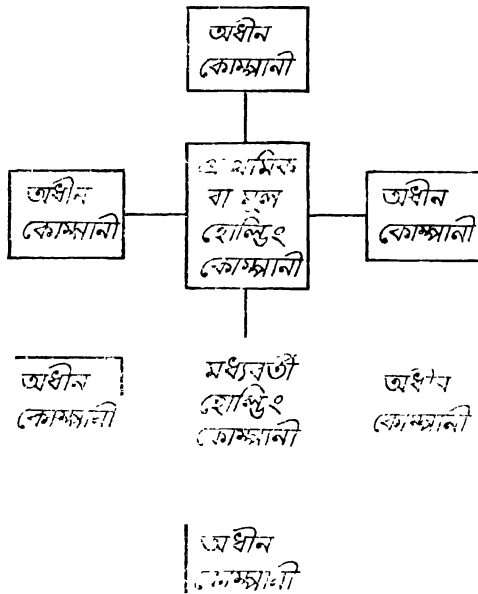
হোল্ডিং কোম্পানীর শ্রেণীবিভাগ ঃ হোল্ডিং কোম্পানীগুলি নিম্নোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

১. প্রাথমিক বা মূল[52] হোল্ডিং কোম্পানী। ২. মধ্যবর্তী[53] হোল্ডিং কোম্পানী। ৩. বিশুদ্ধ[54] হোল্ডিং কোম্পানী। ৪. মিশ্র[55] হোল্ডিং কোম্পানী। ৫. সম্মিলিত[56] হোল্ডিং কোম্পানী। ৬. আদি[57] হোল্ডিং কোম্পানী।

এদের মধ্যে প্রথম দুইটি শ্রেণীর কথা আগেই আলোচিত হয়েছে বলে এখানে বাকীগুলির আলোচনা করা হল।

52. Primary. 53. Intermediary. 54. Pure.
55. Mixed or Operative. 56. Consolidated or Offspring.
57. Parent.

বিশুদ্ধ হোল্ডিং কোম্পানী ঃ যে হোল্ডিং কোম্পানী নিজে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রকার উৎপাদন কার্যে লিপ্ত না থেকে শুধু অধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার সংগ্রহ করে ধরে রাখে, তা হল বিশুদ্ধ হোল্ডিং কোম্পানী।

মিশ্র হোল্ডিং কোম্পানী ঃ যে হোল্ডিং কোম্পানী অন্যান্য অধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন কার্যে লিপ্ত থাকে, তা হল মিশ্র হোল্ডিং কোম্পানী।

সম্মিলিত হোল্ডিং কোম্পানী ঃ একাধিক কোম্পানী রূপে গঠিত শিল্প সংস্থা যখন একত্রিত হয়ে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার ধরে রাখার জন্য হোল্ডিং কোম্পানী গঠন করে, তাকে সম্মিলিত হোল্ডিং কোম্পানী বলা হয়।

আদি হোল্ডিং কোম্পানী ঃ একটি চলতি যৌথ মূলধনী কারবার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার সংগ্রহ করে হোল্ডিং কোম্পানীতে পরিণত হলে তাকে আদি হোল্ডিং কোম্পানী বলা হয়।

হোল্ডিং কোম্পানীর সুবিধা ঃ ১. এ সহজেই গঠন করা যায়।

২. এতে অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ বিনিয়োগ করে অনেক বেশি পরিমাণ কর্তৃত্ব অধিকার করা সম্ভব।

৩. এটি গঠনের জন্য অধীন কোম্পানীগুলির শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতির অপেক্ষা করতে হয় না। শেয়ার বাজার থেকে সরাসরি সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার কিনে প্রতিষ্ঠানকে আয়ত্তে আনা যায়।

৪. বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এর অধীনে এনে সহজেই তাদেব মধ্যে বাজার বণ্টন করা ও প্রতিযোগিতা দূর করা যায়।

৫. পরিচালনার কেন্দ্রীকরণের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে পরিচালনার ব্যয়সংকোচ ভোগ করা যায়।

৬. অধীন প্রতিষ্ঠানগুলি স্বতন্ত্র থাকে বলে তাদের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনে অসুবিধা হয় না।

৭. অধীন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নামেই পরিচালিত হওয়ায় তাদের পূর্ব-লব্ধ সুনাম বা প্রতিষ্ঠাধিকার অক্ষত থাকে ও তার সুফল অব্যাহতভাবে ভোগ করা যায়।

৮. এ বৃহদায়তন উৎপাদনের সকল সুবিধাই পরিপূর্ণরূপে ভোগ করতে পারে।

৯ এর সাহায্যে অধীন প্রতিষ্ঠানগুলি হোল্ডিং কোম্পানী মারফত অধিকতর পুঁজির সুবিধা ভোগ করে।

১০. ট্রাস্টের মতো এর কোন আপাতদৃষ্ট বিরাট সংগঠন নেই বলে এ প্রবল জনমতের বিরোধিতার সম্মুখীন হয় না।

হোল্ডিং কোম্পানীর অসুবিধা ঃ ১. হোল্ডিং কোম্পানী অধীন কোম্পানীগুলির দায়িত্বের ভার না নিয়ে তাদের উপর অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়।

২. হোল্ডিং কোম্পানীর অধীন কোম্পানীগুলির কার্যকলাপে নানারূপ অসাধু পদ্ধতি অবলম্বন করার সুযোগ পায়।

৩. হোল্ডিং কোম্পানীর হাতে অনেক সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত পুঁজি জমে গিয়ে বিনিয়োগের সমস্যা সৃষ্টি করে।

৪. অধীন কোম্পানীগুলির অপরাপর শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থের দিকে নজর না দিয়ে হোল্ডিং কোম্পানী অনেক সময় শুধু নিজের স্বার্থ সাধন করার চেষ্টা করে।

হোল্ডিং কোম্পানী দ্বারা কারবারের সমমুখী বা সমান্তরাল, পূর্বাপর এবং বিভিন্নমুখী প্রভৃতি সকল প্রকার জোটই গঠিত হতে পারে। ভারতের ভূতপূর্ব ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার সাথে হোল্ডিং কোম্পানীর পার্থক্য থাকলেও, ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা অনেকটা হোল্ডিং কোম্পানীর মতই ছিল।

ট্রাস্ট ও হোল্ডিং কোম্পানীর তুলনা

	হোল্ডিং কোম্পানী
১. ট্রাস্ট গঠনের জন্য সকল অংশীদারগণের সম্মতি আবশ্যক।	১. হোল্ডিং কোম্পানী গঠনের জন্য অংশীদারগণের সম্মতি লাগে না।
২. ট্রাস্ট একটি নূতন সংস্থা এবং কতকগুলি যৌথ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গঠিত হয়।	২. কয়েক ব্যক্তি একটি নূতন যৌথ-মূলধনী কারবার স্থাপন করে এই জাতীয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারে অথবা কোন পুরাতন চলতি যৌথমূলধনী কারবারকে হোল্ডিং কোম্পানীতে পরিণত করা যায়।
৩. ট্রাস্ট সংস্থা নিজের মুনাফার জন্য কাজ করে না, তার সুফলভোগীদের স্বার্থে কাজ করে।	হোল্ডিং কোম্পানী নিজের মুনাফার জন্য কাজ করে।
৪. ট্রাস্ট সংস্থাটি ট্রাস্ট বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হয়।	৪. হোল্ডিং কোম্পানীর পরিচালকরা তার শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত হয়।
৫. সদস্য-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ট্রাস্টের নামমাত্র[58]।	৫. হোল্ডিং কোম্পানী অধীন কোম্পানীগুলিতে তার ক্রীত শেয়ারের অংশ অনুসারে প্রকৃত মালিকানার ।
সদস্য-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডারদের সাথে চুক্তি দ্বারা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উপর ট্রাস্ট তার কর্তৃত্ব লাভ করে।	৬ আইনসম্মতভাবে শেয়ার ক্রয় বিনিময়ের দ্বারা হোল্ডিং কোম্পানী অধীন প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে।

খ. পূর্ণ সংহতি

সংজ্ঞাঃ হ্যানী বলেছেন, পূর্ণ সংহতি হল, এমন একটি কারবারী সংগঠন যা অঙ্গীভূত অর্থাৎ যোগদানকারী সংস্থাগুলির সমুদয় সম্পত্তি সরাসরি কিনে নিয়ে এবং ঐসব সম্পত্তি সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত কিংবা একত্রিত করে একটি কারবারী সংস্থায় পরিণত হয়। এটি হল কারবারী জোটের সর্বোচ্চ রূপ।

বৈশিষ্ট্যঃ এই সংজ্ঞা থেকে দেখা যাচ্ছে, পূর্ণ সংহতির বৈশিষ্ট্য হল—
(১) এরূপ কারবারী জোট গঠন করতে হলে, যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির যাবতীয় সম্পত্তি সরাসরি কিনে নিতে হয়।

(২) যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সত্তা সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং তারা পরস্পরের সাথে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যোগদানকারী সংস্থাগুলিকে আত্মসাৎ করে তাদের স্থলে একটি মাত্র নূতন সংস্থা সৃষ্টি হয়।

(৩) এই জাতীয় কারবারী জোট দুরকমের রূপ নিতে পারে। একটি হল "মারজার" বা অন্তর্ভুক্তি এবং অপরটি হল "এ্যামালগ্যামেশন" বা একীভবন।

(৪) জোটবদ্ধ সংস্থাগুলির মিলনটি পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত হয়; এই জোট থেকে তাদের আর বেরিয়ে আসার পথ থাকে না।

"মারজার" বা অন্তর্ভুক্তিঃ একটি কোম্পানী বা কারবারী সংস্থা অন্য কতকগুলি কোম্পানী বা কারবারী সংস্থাকে কিনে নিয়ে এরূপ পূর্ণ সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে

58. Nominal.

পারে। এটি হল পূর্ণ সংহতি নামক কারবারী জোট গঠনের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পূর্ণ সংহতি গঠিত হলে যে কোম্পানী বা সংস্থাটি অন্যান্য সংস্থাকে কিনে নেয় তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। কিন্তু যেসব সংস্থাকে কিনে নেওয়া হয় তাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পায়। তারা ক্রেতা সংস্থাটির মধ্যে নিজেদের সত্তা বিসর্জন দিয়ে তার সাথে সম্পূর্ণ এক হয়ে মিশে গিয়ে তাকে বৃহত্তর আয়তনের সংস্থায় পরিণত করে।

"অ্যামালগ্যামেশন" বা একীভবন ঃ একীভবন হল পূর্ণ সংহতি নামক কারবারী জোট গঠনের আরেক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পূর্ণ সংহতি গঠিত হলে, যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কারবার গুটিয়ে নিয়ে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার কাছে নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি ও দায়দেনা হস্তান্তরিত করে দিয়ে নিজেরা তার মধ্যে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। নব স্থাপিত কোম্পানী বা সংস্থাটি যোগদানকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির সম্পত্তি ও দায়দেনা গ্রহণ করে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়।

"মারজার ও অ্যামালগ্যামেশনে"র মধ্যে পার্থক্য ঃ ১. উভয়েই পূর্ণ সংহতির দুটি আলাদা রূপ মাত্র। তবে "মারজার"-এ যে সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় তাদের অস্তিত্ব লোপ পেলেও, যার অন্তর্ভুক্ত হয় তার অস্তিত্ব লোপ পায় না। কিন্তু "অ্যামালগ্যামেশন"-এ যোগদানকারী সকল সংস্থার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয় এবং তাদের দ্বারা স্থাপিত একটি নূতন সংস্থা তাদের সকলের স্থান গ্রহণ করে।

২. "মারজার"-এ যে সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় তাদের শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়; যে সংস্থাটির তারা অন্তর্ভুক্ত হয় তার শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু "অ্যামালগ্যামেশন" যোগদানকারী সকল কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থই কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়।

৩. সাধারণত, ক্রেতা-প্রতিষ্ঠানটির নিজের উদ্যোগে "মারজার" গঠিত হয় কিন্তু বাইরের কোনও প্রবর্তকের উদ্যোগ ছাড়া "অ্যামালগ্যামেশন" ঘটে না। কারণ যাদের একত্রীভবন ঘটে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান বলে নিজেদের উদ্যোগে একত্রিত হতে পারে না।

পূর্ণ সংহতি বা "মারজার" ও "অ্যামালগ্যামেশনের" সুবিধা ঃ ১. এটি কারবারী জোটের সরলতম, সর্বাপেক্ষা সরাসরি এবং সর্বাধিক স্থায়ী রূপ।

২. যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি একটি মাত্র সংস্থায় পরিণত হয় বলে, এখানে সকলের স্বার্থ সমভাবে সাধিত হয়। হোল্ডিং কোম্পানী প্রভৃতির মত, একটি যোগ-দানকারী সংস্থার স্বার্থে আরেকটি যোগদানকারী সংস্থার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনও অবকাশ থাকে না।

৩. এতে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে সমগ্র জোটের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় সংস্কার, রদবদল, ব্যয়সংকোচ ও দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব হয়।

৪. সম্পূর্ণ একত্রীভূত জোটটির কারিগরী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার, রদবদল, ব্যয়বহুল ও অপচয়মূলক যন্ত্রপাতির ও পদ্ধতি-প্রক্রিয়া পরিবর্তন করে ব্যয়সংকোচ-মূলক, উন্নত সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া চালু করা যায়।

৫. একীভূত সংস্থাটির আর্থিক সম্বল যথেষ্ট হওয়ায় অর্থাভাবে সংস্থার সম্প্রসারণ ক্ষুণ্ণ হয় না। বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি তার হাতে থাকায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ সংগ্রহে ও বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে ঋণপুঁজি সংগ্রহে কোন অসুবিধা হয় না।

৬. পণ্যবিক্রয়, প্রচার এবং বিজ্ঞাপন ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ সংহতির সুবিধা অন্যান্য জোটের তুলনায় অনেক বেশি। আলাদা আলাদা বিক্রয় সংগঠন, প্রচার ও বিজ্ঞাপন

ব্যয়ের পরিবর্তে একটি মাত্র প্রচার বিজ্ঞাপন এবং পণ্যবিক্রয় ব্যবস্থার দ্বারা বিক্রয় এবং প্রচারের খরচ যথেষ্ট হ্রাস পায়।

অসুবিধাঃ ১. এই জাতীয় জোটে যোগদানকারী সংস্থাগুলির মোট সম্পত্তি কিনে নিতে হয় বলে পূর্ণ সংহতি স্থাপনের খরচ খুব বেশি। তাছাড়া শেয়ার হোল্ডারদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সম্মতি ছাড়া এ ধরনের জোট গঠন করাও যায় না।

২. একত্রিত হয়ে যাওয়ার পর যদি দেখা যায় যে যোগদানকারী কোনও একটি সংস্থা তেমন লাভজনক হচ্ছে না, তা হলেও তার সাথে সংশ্রব ছিন্ন করার কোনও উপায় থাকে না।

৩. যোগদানকারী সংস্থাগুলির নিজের নিজের যে সুনাম আগে ছিল, তা জোটগঠনের পরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ তাদের অস্তিত্বই তখন আর থাকে না। নূতন জোটটিকে নূতন করে তার সুনাম অর্জন করতে হয়। সেটা সম্ভব হলেও তা সময় সাপেক্ষ।

৪. একীভূত সংস্থার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উপর যোগদানকারী সংস্থাগুলির শেয়ারহোল্ডারদের আদৌ কোনও কথা না-ও খাটতে পারে।

৫. হোল্ডিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে যেমন অধীন কোম্পানী মারফৎ কারবারী ঝুঁকি কমানো সম্ভব হয়, "মারজার" বা "এ্যামালগ্যামেশন" অর্থাৎ পূর্ণ সংহতির ক্ষেত্রে সে সুযোগ থাকে না।

৬. এটি একটি প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট একচেটিয়া ধরনের জোট বলে, সরাসরি একে সরকারী নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ আঘাত এবং জনমতের সমালোচনার আক্রমণ সহ্য করতে হয়।

৭. পূর্ণ সংহতির ফলে একীভূত সংস্থাটি আয়তনে অত্যধিক বড় হয়ে পড়তে পারে। ফলে একদিকে তার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নষ্ট হতে পারে, অন্যদিকে, বাজারের পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বা তার নমনীয়তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ভারতে কারবারী জোট (COMBINATIONS IN INDIA)

ভারতে অতি ধীর গতিতে কারবারী জোট গঠন অগ্রসর হয়েছে। এর প্রধান কারণ অতীতে শিল্প বিকাশের অভাব ও সে কারণে প্রতিযোগিতার অভাব এবং ভারতের শিল্প বিকাশে প্রাক্তন ব্রিটিশ শাসকদের বিরোধিতা ও অবহেলার নীতি। তবে ১৯২১ সালে বিচার মূলক সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হওয়ার পর এদেশে শিল্প বিকাশের গতিবেগ কিছু বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা ভারতেও আঘাত হানে। এই সময় থেকে এদেশে কারবারী জোট গঠনের অগ্রগতি ঘটতে থাকে।

ভারতের বিভিন্ন শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নানান রূপের ও প্রকৃতির কারবারী জোট দেখা যায় তা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হল।

১. এ্যাসোসিয়েশন ঃ ইন্ডিয়ান মারচ্যান্টস চেমবার-এর দ্বারা প্রকাশিত ডাইরেকটরী অব চেমবারস অব কমার্স এ্যান্ড ট্রেড এ্যাসোসিয়েশন-এর হিসাবে দেখা যায় ভারতে ৮৩৬টি ট্রেড এ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। এদের মধ্যে ১৭০টি হল সাধারণ সমিতি বা জেনারেল এ্যাসোসিয়েশন ও ৬৬৬ টি হল বিশেষ অংশের সমিতি বা সেকশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, অল ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অরগানিজেশন (১৯৪০), অল ইন্ডিয়া অরগানিজেশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ার্স (১৯৩২), এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (১৯৩৩), ইন্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়েশন (১৮৮৫), ইন্ডিয়ান সুগার মিলস এ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৩), ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন (১৯৩০), ইন্ডিয়ান সোপ মেকার্স এ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৪), ইন্ডিয়ান পেপার মিলস এ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৯) ইত্যাদি।

২. চেম্বারস অব কমার্স : বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি (১৯২৬), এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স (১৯২০)। শেষোক্ত দু'টি হল কেন্দ্রীয় সংগঠন। বর্তমানে প্রথমোক্ত সংস্থাটি এদেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রধান মুখপাত্র বলে গণ্য হয়।

৩. পুল ও কার্টেল : এই জাতীয় জোটের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, চটকল শিল্পে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়েশন (উৎপাদক সংঘ); সিমেন্ট শিল্পে সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানী (১৯৩০); চিনি শিল্পে ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট (১৯৩৭-১৯৫০); কাগজ শিল্পে ইণ্ডিয়ান পেপার মেকার্স এ্যাসোসিয়েশন, মূল্য বজায় রাখা ও মূল্যহ্রাস বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এটি গঠিত হয়; তৈল শিল্পে ছিল বার্মাশেল, ব্রিটিশ বার্মা পেট্রোলিয়াম ও আসাম অয়েল কোম্পানীর দ্বারা গঠিত কেরোসিন পুল; জাহাজী পরিবহণ শিল্পে ছিল বি আই এস এন ও সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর দ্বারা গঠিত ট্রাফিক পুল।

৪. হোল্ডিং কোম্পানী : ভারতে হোল্ডিং কোম্পানী জাতীয় জোট অনেক দেখা যায়। এ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী (এসিসি) সিমেন্ট মারকেটিং কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারের এবং পাতিয়ালা সিমেন্ট কোম্পানীর বহু শেয়ারের মালিক। ব্যারাকপুর কোল কোম্পানী লয়াবাদ কোক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারের এবং সিজনা ইলেকট্রিক কোম্পানীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের মালিক। জয়শ্রী টি কোম্পানী জয়শ্রী ঋষিহাট টি কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক। ব্রুক বণ্ড (ইণ্ডিয়া) লিঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের মালিকানার বলে টি এস্টেট লিঃ-কে নিয়ন্ত্রণ করে। শ' ওয়ালেস কোম্পানী লিঃ এ্যাটলাস ফারটিলাইজার লিঃ-এর হোল্ডিং কোম্পানী। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সম্প্রতি স্থাপিত স্টীল অর্থারিটি অব ইণ্ডিয়া লিঃ (এস এ আই এল) সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত এবং সংশ্লিষ্ট উপাদান সরবরাহকারী শিল্পের হোল্ডিং কোম্পানীরূপে কাজ করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে।

৫. সম-স্বার্থ গোষ্ঠী : প্রাক্তন ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা মারফৎ এদেশে সম-স্বার্থ গোষ্ঠী জাতীয় কারবারী জোট বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। এ্যানড্রু ইয়ুল, ম্যাকলিয়ড মারটিন বারন, জারডিন হেণ্ডারসন, ডানকান, অকটেভিয়াস স্টীল, গিলাণ্ডার্স ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান করপোরেশন প্রভৃতি ৯টি ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী সংস্থা ২,৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত। ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সী সংস্থার মধ্যে মুখ্য ছিল টাটা, বিড়লা, সিংহানিয়া, ডালমিয়া, থাপার, গোয়েঙ্কা প্রভৃতি। ১৯৫৯ সালে তুলাবস্ত্র শিল্পে মোট উৎপাদনক্ষমতার তিনভাগের এক ভাগ ৩০টিরও কম ম্যানেজিং এজেন্টদের হাতে, কয়লা শিল্পে ৩০টি কোম্পানী ৪টি ম্যানেজিং এজেন্টের হাতে, চিনি শিল্পে ৩২টি চিনির কল ৫টি ম্যানেজিং এজেন্টের হাতে, চাবাগিচা শিল্পে ৯৬টি চাবাগিচা ৬টি ম্যানেজিং এজেন্টের হাতে, মোট ২৫টির মধ্যে ২০টি সিমেন্ট কোম্পানী এ সি সি ও ডালমিয়া গোষ্ঠীর হাতে এবং লোহ ইস্পাত শিল্পের মোট উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৯০ ভাগ টাটা ও মারটিন বারন গোষ্ঠীর হাতে ছিল। বিদেশী উইমকো সংস্থা দেশের মোট দিয়াশলাই উৎপাদন ক্ষমতার তিন ভাগের দুই ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। দেশের ৯টি শিল্পপতি গোষ্ঠী ভারতীয় শিল্প কোম্পানীগুলির প্রায় ৬০০টির পরিচালকপদ দখল করে ছিল।

৬. পূর্ণ সংহতি : পূর্ণ সংহতির জোটও এদেশে বিরল নয়। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল, ৬টি কোম্পানী নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ১১টি সিমেন্ট কোম্পানী নিয়ে গঠিত এ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী; ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ (ইসকো)-এর মধ্যে স্টীল করপোরেশন অব বেঙ্গল (স্কব)-এর

অন্তর্ভুক্তি; ম্যাকনীল কোম্পানী ও বেরী কোম্পানীকে নিয়ে গঠিত ম্যাকনীল এ্যান্ড বেরী কোম্পানী এবং মার্টিন কোম্পানী ও বার্ন কোম্পানীকে নিয়ে গঠিত মার্টিন বার্ন কোম্পানী।

৭. দেশী বিদেশী কারবারী জোট বা "জয়েন্ট ভেনচার"ঃ স্বাধীনতা লাভের পর দেশী শিল্প সংস্থাগুলির সাথে বিদেশী শিল্প সংস্থাগুলির নানা ধরনের জোটবন্ধ কারবার গঠনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সরকারও এই ধরনের জোট গঠনে উৎসাহ দিচ্ছেন। বিদেশী সর্বাধুনিক কারিগরী জ্ঞান, বিদেশী পুঁজি, বিদেশী পেটেন্ট স্বত্ব ইত্যাদির সুবিধা ভোগই এজাতীয় জোটের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে এই ধরনের সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ৩,৬৯৫টি। উল্লেখযোগ্য চুক্তি বন্ধ জোটগুলি হল, বিড়লা—ন্যুফিল্ড চুক্তি (হিন্দুস্থান মোটরস), টাটা-মার্সিডিস বেনজ্ চুক্তি (টেলকো), আই.সি.আই-টাটা, ইত্যাদি। এজাতীয় জোট সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে যে, এর ফলে দেশী বিদেশী একচেটিয়া বড় পুঁজিপতিদের শক্তি বাড়ছে, ভারতীয় ভোগকারী ও ছোট শিল্পপতিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং দেশে আবার নতুন করে বিদেশী পুঁজির কায়েমীস্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

মালটিন্যাশন্যাল বা বহুজাতিক করপোরেশন
MULTINATIONAL CORPORATION

সংজ্ঞা ঃ সাধারণত এক দেশে গঠিত কিন্তু অন্যান্য দেশে স্থাপিত কারবারী *সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণকারী কোন কোম্পানী* অর্থাৎ কারবারী সংস্থাকে কখনও মালটি-*ন্যাশন্যাল করপোরেশন বা সংক্ষেপে* "মালটিন্যাশন্যাল", কখনও বা "ইন্টারন্যাশন্যাল" আবার কখনও বা "ট্রান্সন্যাশন্যাল" নামে ডাকা হয়ে থাকে। আসলে এগুলি হল বিরাট আকারে বহু দেশে পরিব্যাপ্ত আধুনিক আন্তর্জাতিক কারবারী জোট। ১৯৬৯ সালে কেমব্রিজে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে এই ধরনের আন্তর্জাতিক কারবারী জোটের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ঐ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে বহুজাতিক কারবারী সংস্থা বা মালটি-ন্যাশন্যাল করপোরেশন হল "এমন একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন কারবারী সংস্থা যা বিভিন্ন রূপ আইন ব্যবস্থার (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) অন্তর্গত ভৌগলিকভাবে পৃথক পৃথক বাজারে কারবারে নিযুক্ত রয়েছে এবং যার বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গগুলি (অর্থাৎ অধীন বা সহযোগী সংস্থাগুলি) পুঁজির কোন না কোন ধরনের শরিকানা ব্যবস্থার মারফৎ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।"

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. সাধারণত উৎপাদনের ও বাজারের মাত্রা, বিষয় সম্পত্তির আয়তন বাজারের উপর তার ক্ষমতা ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবের দিক দিয়ে এরা অত্যন্ত বিরাট বা "দৈত্যাকার" হয়ে থাকে।

২. বিভিন্ন দেশে অবস্থিত উৎপাদন, বিক্রয়, অর্থসংস্থান, মুনাফা-পরিকল্পনা, বিত্ত সম্পত্তিআহরণ ও নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ইত্যাদি কর্মে নিযুক্ত সংশিলষ্ট বিবিধ কারবারী সংস্থাগুলির উপর সদর দপ্তরের কোন না কোন ধরনের কেন্দ্রীয় নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। এই কেন্দ্রীয় নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবশ্য নানারূপ হতে পারে। যেমন, সদর দপ্তরটি বা কেন্দ্রীয় সংস্থাটি অতি শক্তিশালী হতে পারে, কিংবা বিভিন্ন দেশে অবস্থিত সংশিলষ্ট কোম্পানী বা সংস্থাগুলির মধ্যে ক্ষমতার কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণ ও সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকতে পারে, অথবা বিভিন্ন দেশে অবস্থিত সংশিলষ্ট কোম্পানী বা সংস্থাগুলি বেশি পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। প্রথমটিকে বলা হয় কেন্দ্র-প্রধান ("এথনোসেন্ট্রিক"), দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বহু-কেন্দ্রিক ("পলিসেন্ট্রিক") এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ভূ-কেন্দ্রিক ("জিওসেন্ট্রিক") মালটি-ন্যাশন্যাল।

৩. এটি হল আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গঠিত পূর্বাপর কারবারী জোট।

৪. কাজে কর্মে, আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গোপনীয়তা রক্ষা করাই এ ধরনের কারবারী জোটের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

দৃষ্টান্ত ও তথ্য ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বহুজাতিক করপোরেশনগুলির দ্রুত বিপুল বৃদ্ধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় ১৯৭০ সালে সারা পৃথিবীর সমস্ত মালটিন্যাশন্যাল করপোরেশনগুলির মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া বাদে পৃথিবীর যে কোন দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের অপেক্ষা বেশি। এই মালটিন্যাশন্যাল করপোরেশনগুলির মধ্যে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক করপোরেশনগুলি হল সর্বপ্রধান। এদের মধ্যে প্রধান হল জেনারেল মোটরস, এসো, ফোর্ড, আই বি এম ইত্যাদি। অন্যান্য মালটিন্যাশন্যাল করপোরেশনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রয়াল ডাচশেল (হল্যান্ড-বৃটিশ), ইউনিলেভার (বৃটিশ-হল্যান্ড), ফিলিপস (হল্যান্ড), আই সি আই (বৃটিশ), ভোকস্‌ওয়াগেন (পশ্চিম জার্মানি), এস কে এফ (সুইডেন), অ্যালক্যান অ্যালুমিনিয়াম (কানাডা), অলিভেত্তি (ইতালী), ডানলপ (বৃটিশ) প্রভৃতি।

বিদেশে মার্কিনী মালটিন্যাশন্যাল করপোরেশনগুলির মোট প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৪৬ সালে ছিল ৭২০ কোটি ডলারের বেশি। তা বেড়ে ১৯৭০ সালে ৭১০০ কোটি ডলারে পৌঁছায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পসম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশই ২০০টি মার্কিনী মালটিন্যাশন্যাল করপোরেশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিম ইয়োরোপে মোট মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগের ৬৬ শতাংশই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক করপোরেশনের হাতে। কারও কারও মতে এই শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর সমগ্র বৈদেশিক কারবারই শ'তিনেক পশ্চিমী বহুজাতিক করপোরেশনের হাতের মুঠোয় চলে যাবে। অতীতে নানা দেশের সাম্রাজ্য যেমন পৃথিবীব্যাপী ছিল, আজ বহুজাতিক করপোরেশনগুলির সাম্রাজ্য তেমনি তাদের স্থান দখল করতে চলেছে।

ভারতে মালটিন্যাশন্যাল করপোরেশন ঃ ভারতে স্বাধীনতালাভের পর থেকে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি (১৯৪৮ সালে ২৪৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৬৮ সালে ১৫৪৩ কোটি টাকা), এবং দেশী বেসরকারী শিল্পের সাথে বিদেশী শিল্প সংস্থাগুলির কারবারী ও অন্যান্য সহযোগিতার ("কোলাবরেশন") চুক্তির ফলে (১৯৭৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০০০টি চুক্তি) এদেশের অর্থনীতিতে মালটিন্যাশন্যাল করপোরেশনগুলির অনুপ্রবেশ বেড়েছে। বর্তমানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পেই যেমন, অ্যালুমিনিয়াম, পরিবহণের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনীয়ারিং, ঢালাই, ওষুধ ইত্যাদি শিল্প প্রভৃতিতে এদের অবস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এটি শুভ লক্ষণ নয়। এইসব বিদেশী আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবারের সাথে অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় একচেটিয়া কারবারগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

১১ কারবারের জোট

1. 'Competition leads to Combination.' Discuss. In this context mention the types of combinations found in India. [C.U. 1960, '61, '67]

["প্রতিযোগিতার ফলে কারবারী জোটের উৎপত্তি হয়।" আলোচনা কর। এই প্রসঙ্গে ভারতে যে সকল প্রকারের কারবারী জোট দেখা যায় তাহা বল।] উঃ ১৬৯-৭০, ১৯০-৯৩ পৃঃ

What are the respective special features of Trusts. Cartels and Holding Companies ? [C.U. 1963]
[ট্রাস্ট, কার্টেল এবং হোল্ডিং কোম্পানীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?
উঃ ১৮২, ১৮০, ১৮৫-৮৬ পৃঃ

3. What is a modern Holding Company ? Describe its features and comment on its importance. [B.U. 1963, '65]
[আধুনিক হোল্ডিং কোম্পানী কি ? ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য কর।]
উঃ ১৮৫-৮৭ পৃঃ

4. What do you understand by Vertical and Horizontal Combinations ? Give examples. What are their respective advantages ? [C.U. 1965]
[পূর্বপর জোট ও সমান্তরাল জোট বলিতে কি বোঝ ? উহাদের দৃষ্টান্ত দাও। উহাদের সুবিধাগুলি কী ?]
উঃ ১৭৩-৭৫ পৃঃ

5. Write a short note on Cartel. [C.U. 1969]
[কার্টেল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] উঃ ১৭৯-৮১ পৃঃ

6. Distinguish between the following :
   (a) Vertical and horizontal expansion ;
   (b) Voluntary and compulsory combination.
Give at least one example of each. [C.U. 1970]
[নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রভেদ নির্ণয় করঃ
(ক) পূর্বাপর ও সমান্তরাল সম্প্রসারণ;
(খ) স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক জোট। উঃ ১৭৩-৭৫ পৃঃ
প্রত্যেকটির অন্ততঃ একটি করিয়া উদাহরণ দাও।]

7. What are the causes of combination ? [B. U. 1966]
[জোট গঠনের কারণগুলি কি কি ?] উঃ ১৬৯-৭১ পৃঃ

8. What is meant by 'Combination' of business ? Enumerate the principal features of trusts and cartels. [C.U. B.Com. 1974]
[কারবারে 'জোট' বলতে কি বোঝায় ? ট্রাস্ট ও কার্টেলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।]
উঃ ১৬৯, ১৮২, ১৮০ পৃঃ

ষষ্ঠ খণ্ড ব্যবস্থাপনার দিগন্ত
HORIZON OF MANAGEMENT

অধ্যায়

১২

ব্যবস্থাপনার বুনিয়াদী দিক
BASIC ASPECTS OF MANAGEMENT

ব্যবস্থাপনার অর্থ, পরিধি ও গুরুত্ব
MANAGEMENT : MEANING, SCOPE & IMPORTANCE

১. মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। পরস্পরের সাথে মিলে মিশে সমাজে বাস করতে হলে প্রত্যেককে এক একটি কাজ বেছে নিয়ে তাতে বিশেষত্ব অর্জন করতে হয় এবং নিজের চেষ্টায় উৎপন্ন সামগ্রী অথবা কাজের বিনিময়ে অপরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রীটি কিংবা কাজটি সংগ্রহ করে পরস্পরের অভাব দূর করতে হয়। কারণ, নিজের একক চেষ্টায় জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী কারো পক্ষেই তৈরি বা উৎপাদন করা সম্ভব নয়। সুতরাং ব্যক্তি জীবন ও সমাজজীবন, দুয়েরই ভিত্তি হল এই পারস্পরিক সহযোগিতা। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে মানুষের সমস্ত উদ্যোগের পিছনেই চাই সংগঠন। আর সংগঠনের কাজ যারা করে তারা হল সংগঠক বা ব্যবস্থাপক।

২. সংগঠিতভাবে এবং একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজগুলি যে উপায়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে তার নাম হল "ব্যবস্থাপনা"। শুধু কারবারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা, দাতব্য, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি সমাজ-জীবনের অন্যান্য যাবতীয় ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপনার এই গুরুত্ব রয়েছে। জনকল্যাণমূলক সমাজ কিংবা সমাজতন্ত্রী সমাজেও সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনের সাথে জড়িত যাবতীয় সামাজিক কার্যাবলী যথাযথভাবে পালনের জন্য সরকারী এবং আধা-সরকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবস্থাপনার সাহায্য নিতে হয়। সংগঠনের ক্ষেত্রে আবার ব্যবস্থাপনা হল একটি সৃজনশীল শক্তিও[1]।

৩. ব্যবস্থাপনা হল বিদ্যমান সমাজে উন্নততর জীবন যাপনের সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের প্রতিটি অর্থনৈতিক কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিকল্পনা[2], সংযোজনা[3], নিয়ন্ত্রণ[4], পথনির্দেশ[5] ইত্যাদি হল ব্যবস্থাপনারই নানাদিক। এই সব বিভিন্ন দিকের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনা নামক কর্মটি মানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক উদ্যোগের ফলাফল নির্ধারণ করে দেয়। ব্যাপক অর্থে বলা যায়, ব্যবস্থাপনা হল—নির্ধারিত লক্ষ্যলাভের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা রচনা এবং নীতি নির্ধারণ করা; তা কাজে পরিণত করার জন্য জনবল, ধনবল, উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও তা কাজে নিয়োগ করা; সে কাজের অগ্রগতির উপর লক্ষ্য রাখা ও যাচাই করা; এবং সে কাজে নিযুক্ত কর্মীদের বৈষয়িক পুরস্কার ও বৈষয়িক সন্তুষ্টির ব্যবস্থা করা—ইত্যাদি যাবতীয় কাজের সমষ্টি।

৪. আরউইক ও ব্রেচ্ বলেছেন, "কোনও মতাদর্শ, কোনও মতবাদ, কোনও রাজনৈতিক তত্ত্বই একটি সুনির্দিষ্ট মানবিক ও বৈষয়িক সম্পদ সমষ্টি থেকে কম চেষ্টায় বেশি ফল আদায় করতে পারে না। ত্রুটিহীন ব্যবস্থাপনাই কেবল তা পারে।"

1. Creative Force. 2. Planning. 3. Coordinating.
4. Controlling. 5. Guiding.

ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমষ্টির কাজ থেকে জ্ঞান ও বৈষয়িক উপকরণ সংগ্রহ করা। তার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে সমষ্টিগত সিদ্ধিতে পরিণত করা।

৫. একটি পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিকল্পনা রচনা, কর্মপ্রণালী স্থির করা, সংগঠন তৈরি করা, কর্মী-সমষ্টির কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালনা ও সংযোজন করা, তাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা এবং সহযোগিতা আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের প্রণোদিত[6] করা—এসবই হল ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত। উইলিয়ম স্প্রিগেল ও আরনেষ্ট ডেভিস-এর কথায়, ব্যবস্থাপনার কর্মপরিধি হলঃ "প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত প্রশাসন-নীতি কাজে পরিণত করা। ব্যবস্থাপনার কাজ হল কারবারের মধ্যে কার্যাবলী পরিচালনা করা, উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সাথে কর্মীদের কাজের মিলন ঘটানো এবং তা থেকে বাঞ্ছিত উৎপাদন লাভ করা। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুসারে উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাও ব্যবস্থাপনার কাজের অন্তর্গত।"

ব্যবস্থাপনা হল একাধারে কলা ও বিজ্ঞান
MANAGEMENT—AN ART & A SCIENCE

কলা হল সুনির্দিষ্ট ফললাভের জন্য ধারাবদ্ধ কৃৎকৌশলের[7] কার্যকরভাবে প্রয়োগ। বাস্তব ফলাফলের দ্বারাই প্রয়োগকারীর যোগ্যতা কতটা তা প্রমাণিত হয়, এই অর্থে প্রতিটি কলাই হল ব্যবহারিক[8]। আবার যেহেতু বিষয়বস্তু অথবা ঘটনা সৃষ্টিই হল সমস্ত কলার কাজ, সেজন্য কলা হল সৃজনশীল।

কলার এই যাবতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিই ব্যবস্থাপনার মধ্যেও রয়েছে। একারণে, ব্যবস্থাপনা হল একটি কলা। প্রথমত, এটি হল এমন এক প্রক্রিয়া যার সাথে কৃৎকৌশলের প্রয়োগ জড়িত রয়েছে। সংগঠনের বিভিন্ন কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হল উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং কৃৎকৌশল ও জ্ঞানের প্রয়োগ। দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়ার লক্ষ্যই হল সুনির্দিষ্ট ফল লাভ। যথা, প্রকল্পগুলি সমাপ্ত করা, বিক্রয়-লক্ষ্যগুলি সম্পূর্ণ করা, উৎপাদন-লক্ষ্যগুলি সম্পাদন করা, বিনিয়োগের উপর যথোপযুক্ত মুনাফা লাভ করা, শ্রমিক-কর্মীদের সাথে শান্তিপূর্ণ এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। তৃতীয়ত, সুব্যবস্থাপনা হল আসলে কার্যকর ব্যবস্থাপনা। সংগঠনিক লক্ষ্যগুলি কার্যকরভাবে সম্পাদনার মধ্য দিয়েই তার সাফল্য প্রকাশ পায়। চতুর্থত, নির্ধারিত পরিস্থিতি বা বিষয়বস্তু সৃষ্টিই হল ব্যবস্থাপনার কাজ; এই অর্থে ব্যবস্থাপনা হল সৃজনশীল। পঞ্চমত, অধিকাংশ কলা-র মত ব্যবস্থাপনাও ব্যক্তিগত ছাপ রাখে। যে কোনও সমস্যার নিরসনে প্রত্যেক ব্যবস্থাপকেরই নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। যে কোনও সমস্যার মোকাবিলায় যে বিচারবুদ্ধি, উপলব্ধি ও নমনীয়তার প্রয়োজন হয়, তা এক একজন ব্যবস্থাপকের এক এক রকমের হয়ে থাকে। কার্যক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে ব্যবস্থাপনা-কলায় পারদর্শী হতে হয়।

কিন্তু ব্যবস্থাপনা শুধু কলা নয়, বিজ্ঞানও বটে। যে অভিজ্ঞতা-লব্ধ অথচ শৃঙ্খলা-বদ্ধ তত্ত্বগত জ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষিত হয়ে তত্ত্বে, বিধিনিয়মে ও মৌলিক নীতিতে সাধারণীকৃত[9] হয়েছে, তাই হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের কাজ হল কার্য-কারণ[10] ও ক্রিয়াগত সম্পর্ক[11] নির্দেশ করা। তার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী আগে থাকতেই বলে দিতে পারেন কোন অবস্থায় কি ফলাফলের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকটা পরিমাণে ব্যবস্থাপনার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ব্যবস্থাপনা ক্রমশ কতকগুলি সাধারণ মূলনীতি নিয়ে গঠিত একটি সুশৃঙ্খল ও ধারাবদ্ধ জ্ঞান হয়ে উঠছে। ব্যবস্থাপনার এই মূলনীতিগুলি হল ব্যবস্থাপকদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের নির্যাস। এই মূলনীতিগুলি নিয়ে চলেছে বারংবার পুঙ্খানুপুঙ্খ

---

6. Motivating. 7. Systematic skill. 8. Practical.
9. Generalised. 10. Cause-and-effect. 11. Functional relation.

পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অদল-বদল। এর মধ্য দিয়ে যেগুলি যাচাই করা হয়ে যাচ্ছে তার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকরা ভবিষ্যত পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি অনুমান করে সম্ভাব্য ফলাফলের ভিত্তিতে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছেন, সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

তবে, বিজ্ঞান হলেও ব্যবস্থাপনা পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়নবিদ্যার মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ, ব্যবস্থাপনা-বিজ্ঞানের কাজ হল মানুষকে নিয়ে, তার আচার-আচরণ ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে, যা কখনও স্থির-নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় নয়, বরং সর্বদা পরিবর্তনশীল। সুতরাং বিজ্ঞান হিসাবে ব্যবস্থাপনা-বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে না, পড়ে সামাজিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে। সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে ব্যবস্থাপনা-বিজ্ঞানের কাজ হল মানবিক প্রচেষ্টা পরিচালনা করা এবং তার মধ্য দিয়ে আরব্ধ কর্ম সম্পাদন করা।

অতএব ব্যবস্থাপনা হল একাধারে কলা এবং বিজ্ঞান। ব্যবস্থাপনা-বিজ্ঞান যে মূলনীতিগুলি প্রতিষ্ঠা করছে, ব্যবস্থাপনা-কলার হাতে তা দৈনন্দিন কাজের পালনীয় নিয়মে পরিণত হচ্ছে। বিজ্ঞান হিসাবে ব্যবস্থাপনার কাজ হল ব্যবস্থাপকদের পেশাগত কর্মে পথনির্দেশের জন্য কতকগুলি মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করা। কলা হিসেবে ব্যবস্থাপনার কাজ হল সেই নীতিগুলির সাহায্যে প্রতিটি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার কৌশল করায়ত্ত করা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, বাস্তবে সমস্যা সমাধানে কোনও মূলনীতি যদি অকেজো বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তা পরিত্যক্ত হয়ে ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত সমাধানটি পুরাতন ও পরিত্যক্ত নীতিটির স্থলে নতুন মূলনীতিরূপে ব্যবস্থাপনা-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে সংযোজিত হবে। এই ভাবে, ব্যবস্থাপনা-কলা ও ব্যবস্থাপনা-বিজ্ঞান আবার পরস্পর নির্ভরশীলও বটে। একদিকে, বিজ্ঞান হিসেবে ব্যবস্থাপনা লালিত হচ্ছে কলা হিসেবে ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক ক্ষেত্র থেকে, অন্যদিকে কলা হিসেবে ব্যবস্থাপনার পথ নির্দেশ করছে বিজ্ঞান হিসেবে ব্যবস্থাপনা।

ব্যবস্থাপনার কাজ
FUNCTIONS OF MANAGEMENT

ব্যবস্থাপনার কাজগুলি যাঁরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন আঁরি ফেয়ল[১২], গালিক[১৩] এবং উইলিয়াম ফক্স[১৪]।

ফেয়লের মতে, (১) পূর্বানুমান[১৫] ও পরিকল্পনা তৈরি করা[১৬], (২) সংগঠন গড়া[১৭], (৩) নির্দেশ দেওয়া[১৮], (৪) সংযোজন করা[১৯] ও (৫) নিয়ন্ত্রণ করা[২০]—ব্যবস্থাপনার কাজ হল এই পাঁচটি।

গালিকের মতে ব্যবস্থাপনার কাজ হল ছয়টি—(১) পরিকল্পনা তৈরি করা (২) সংগঠন গড়ে তোলা, (৩) পরিচালনা করা[২১], (৪) সংযোজনা করা, (৫) রিপোর্ট করা[২২] ও (৬) বাজেট তৈরি করা[২৩]। এই ছয়টির মধ্যে রিপোর্ট করার কাজটি নিয়ন্ত্রণ করার কাজের অন্তর্গত এবং বাজেট তৈরি করার কাজটি আংশিক ভাবে পরিকল্পনা তৈরি করার ও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কাজের অন্তর্গত।

ফক্সের মতে ব্যবস্থাপনার কাজগুলির মধ্যে তিনটি হল মুখ্য বা প্রধান। যথা, (১) পরিকল্পনা তৈরি করা, (২) সংগঠন গড়ে তোলা ও (৩) নিয়ন্ত্রণ করা। তাঁর মতে এই তিনটি হল ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য বুনিয়াদী[২৪] এবং স্বকীয় অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যজাত কাজ[২৫]। এই তিনটি বাদে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজগুলি হল গৌণ কাজ[২৬]।

12. Henry Fayol. 13. Gullick. 14. William M. Fox.
15. Forecasting. 16. Planning 17. Organising. 18. Commanding.
19. Coordinating. 20. Controlling. 21 Directing. 22. Reporting.
23. Budgeting. 24. Basic. 25. Organic Function.
26. Subsidiary Function.

ব্যবস্থাপনার কাজগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে ব্যবস্থাপনার যে প্রধান কাজগুলির সন্ধান পাওয়া যায় তা হল, (১) পরিকল্পনা তৈরি; (২) সংগঠন সৃষ্টি; (৩) কর্মী সংগ্রহ[২৭]; (৪) সংযোজনা; (৫) পরিচালনা[২৮]; (৬) নেতৃত্ব ও প্রেষণা[২৯] এবং (৭) নিয়ন্ত্রণ[৩০]।

১. **পরিকল্পনা তৈরি করা**—এই পরিকল্পনা হল কারবারের বা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত কাজের পরিকল্পনা। ভবিষ্যত কাজের পরিকল্পনা করতে হলে কি করতে হবে তা আগে থেকেই স্থির করতে হয়। এর অর্থ হল, কাজের ফলাফলটি কি হবে তা আগে থেকে স্থির করে নিয়ে, সে জন্য কাজের ধারা কি হবে, কাজের পরপর ধাপগুলি কি হবে, এবং কাজের কোন্ কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা স্থির করতে হয়। অর্থাৎ (ক) পূর্বানুমান, (খ) লক্ষ্য নির্ধারণ, নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি নির্ধারণ, বিভিন্ন কাজের সময়সূচি নির্ধারণ, পদ্ধতি নির্ধারণ ও বাজেট তৈরি করা ইত্যাদি সমস্তই হল পরিকল্পনা তৈরি করার কাজের অন্তর্গত। পরিকল্পনার কাজটি ব্যবস্থাপনার পক্ষে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ কাজটিকে ব্যবস্থাপনার সারবস্তু বলে গণ্য করা হয়।

২. **সংগঠন সৃষ্টি**—ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় কাজ হল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সাধনের জন্য কর্মীদের কর্তব্য ও কাজগুলির একটি উপযুক্ত কাঠামো গড়ে তোলা। সহজ কথায় এই হল "সংগঠন সৃষ্টি" কথাটির অর্থ। কিন্তু সংগঠন বলতে শুধু কর্তব্য ও কাজের একটি কাঠামোই বোঝায় না; সংগঠন আবার একটি প্রক্রিয়াও। এই প্রক্রিয়াটি হল, নির্ধারিত পরিকল্পনা কিংবা লক্ষ্যটি পূরণের জন্য কি কি কাজ করা দরকার তা স্থির করা, সে কাজগুলির ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বা পর্যায়ে তা ভাগ করা, কাজের বিভাগ অনুযায়ী কর্মীদের বিভক্ত করে কর্মীদের এক এক দলের উপর এক একটি কাজের ভার দেওয়া, প্রতিটি দলের প্রতিটি কর্মীর কাজ ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং কার্যনির্বাহক[৩১] ও সাধারণ কর্মীদের[৩২] মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দেওয়া-র প্রক্রিয়া। সুতরাং (ক) কাজগুলি স্থির করা ও বিভিন্ন পর্যায় ও ভাগে তা বিভক্ত করা; (খ) দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব স্থির করা ও ভার-অর্পণ (ভারার্পণ) করা; এবং (গ) কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি হল সংগঠন গড়ার কাজের অন্তর্গত।

৩. **কর্মী সংগ্রহ**—সাংগঠনিক কাঠামোর দ্বারা যে পদগুলি সৃষ্টি করা হয় তাতে কর্মী নিয়োগ করা এবং তাদের তত্ত্বাবধান করাই হল ব্যবস্থাপনার তৃতীয় কাজ। (ক) কাজ অনুযায়ী কর্মীদের কি কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তা স্থির করা[৩৩], (খ) উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের বাছাই করা[৩৪], (গ) যথাসম্ভব সুদক্ষভাবে কাজগুলি সম্পাদনের জন্য নূতন কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পুরাতন কর্মীদের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা[৩৫], (ঘ) কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করা[৩৬], এবং (ঙ) কর্মীদের ক্ষতিপূরণ[৩৭] ও (চ) বরখাস্ত[৩৮] করা প্রভৃতি এই কাজের অন্তর্গত।

৪. **সংযোজনা**—বিভিন্ন ধরনের কাজগুলি নির্বাহের জন্য প্রতিষ্ঠানের যে বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয় তারা যাতে পরস্পর বিরোধী কাজ করে না বসে তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হল প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্যগুলি যাতে কর্মীরা ও বিভাগগুলি সকলেই উপলব্ধি করে এবং তা লাভ করার জন্য পরস্পরের সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে সে দিকে নজর রাখা। এই হল সংযোজনার উদ্দেশ্য।

সংযোজনা বলতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মীদলের কাজগুলির মধ্যে ঐক্য সাধন ও

---

27. Staffing. 28. Directing. 29. Leadership and motivation.
30. Controlling. 31. Executives. 32. Workers.
33. Defining requirements. 34. Selection.
35. Training and development. 36. Appraisal.
37. Compensation. 38. Dismissal.

মিলন প্রতিষ্ঠা বোঝায়। "সংযোজনা হল, সকলের মিলিত লক্ষ্য সাধনে পরস্পরের কাজের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মীদের দলগত প্রচেষ্টার শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা।" এটি হল ব্যবস্থাপনার সারবস্তু।

৫. **পরিচালনা**—ব্যবস্থাপনার পঞ্চম কাজ হল নির্ধারিত কর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য অধস্তন কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া ও তাদের কাজের তদারকী করা। এই কাজটিই হল পরিচালনার কাজ। (ক) অধস্তন কর্মীদের উপর কাজের আদেশ নির্দেশ দেওয়া[৩৯], (খ) যথোপযুক্ত ভাবে কাজটি যাতে সম্পাদিত হয় সেজন্য কর্মীদের পরামর্শ ও উপদেশ এবং শিক্ষা দেওয়া[৪০], এবং (গ) উপদেশ নির্দেশ ও লক্ষ্য অনুযায়ী কর্মীরা কাজটি সম্পাদন করছে কিনা তা তদারক[৪১] করা ইত্যাদি হল পরিচালনার কাজের অন্তর্গত।

৬. **নেতৃত্ব ও প্রেষণা**—কারবারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বলতে এমন একটি মানবিক উপাদান-কে বোঝায় যা কর্মীদলকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সাধনে তাদের প্রেষণা যোগায়। নেতৃত্ব হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যবস্থাপক বুদ্ধিমত্তার সাথে এমনভাবে কর্মীদের কার্যাবলী পরিচালনা করে, তাদের পরামর্শ ও উপদেশ নির্দেশ দেয় এবং সংস্থা ও কর্মীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে যাতে উভয়েরই সর্বাধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হয়। নেতৃত্বের কাজে ব্যবস্থাপককে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের সাথে কর্মীদের ও মানুষের প্রয়োজনের মিলন ঘটাতে হয়। নেতা হিসেবে ব্যবস্থাপককে শুধু কাজের ক্ষেত্রে কর্মীদের পথ দেখালেই চলে না, স্বয়ং সে কাজে তাকে হাতে-কলমে নেতৃত্ব দিতে হয়, নিজের কাজের দ্বারা সকলের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়।

নেতা হিসেবে ব্যবস্থাপকের কর্তব্য হল কাজগুলি কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য অধস্তন কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। কর্মীদের মধ্যে প্রেষণা বা 'মোটিভেশন' সৃষ্টির দ্বারা ব্যবস্থাপক তা সুনিশ্চিত করে। একই লক্ষ্য সাধনের জন্য কর্মীদের

১২·১ নং রেখাচিত্র
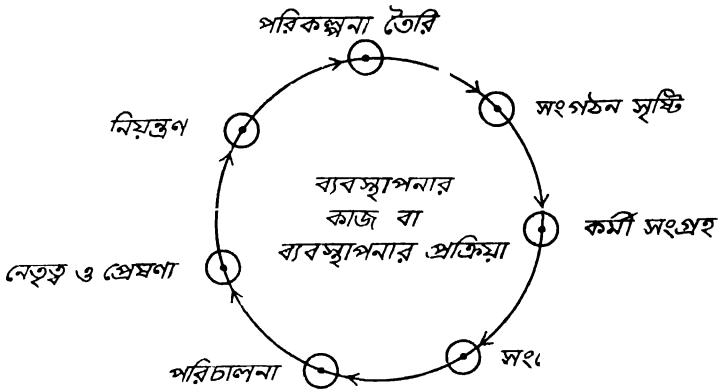
মধ্যে কাজের ও সহযোগিতার ইচ্ছা সৃষ্টি করাই হল প্রেষণা। ব্যবস্থাপকের কাজ হল সর্বোচ্চ উৎপাদিকা শক্তি লাভে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টি করা। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যদি তাদের নির্দিষ্ট কাজগুলি সম্পাদনে স্বেচ্ছায় এগিয়ে না আসে তাহলে ব্যবস্থাপনা-প্রশাসনের সমস্ত কাজই বিফল হবে। এখানেই প্রেষণার গুরুত্ব।

---

39. Communication. 40. Guidance, counselling and training.
41. Supervision.

কর্মীদের মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টি করতে হলে (ক) প্রতিটি কর্মীর প্রকৃতি ও প্রয়োজন, (খ) তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতা, (গ) তার বিশ্বাস ও অবিশ্বাস-গুলি, এবং (ঘ) সমাজের যে অংশ থেকে সে এসেছে তা জানতে ও বুঝতে হবে।

(ক) নিজের কাজ সম্পর্কে গর্ব, (খ) যে প্রতিষ্ঠানের সে কর্মী সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গর্ব এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে একাত্মতাবোধ[42]—এইগুলি হল সফল সংগঠনের ব্যবস্থাপনার দ্বারা সৃষ্ট প্রেষণা-শক্তি[43]।

৭. *নিয়ন্ত্রণ*—ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 'নিয়ন্ত্রণ' নামক কাজটির অর্থ হল সংগঠনটি যাতে গৃহীত পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা। অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থাপককে নিয়ন্ত্রণের কাজটি করতে হয়। সুতরাং নিয়ন্ত্রণের কাজটি হল ভবিষ্যতমুখী[44]। প্রত্যেক ব্যবস্থাপকই তার জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকে। পরিকল্পনার সাথে নিয়ন্ত্রণের কাজটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়া[45]—গোটা ব্যবস্থাপনার কাজটাই হল একটা সমগ্র প্রক্রিয়া। উপরোক্ত সাতটি কাজ হল সে প্রক্রিয়ার এক একটি অঙ্গ। ১২·১ নং রেখাচিত্রে তা দেখান হল।

ব্যবস্থাপনার স্তর-বিভাগ (MANAGEMENT LEVELS)

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর আছে—(১) সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা স্তর[46]; (২) মাধ্যমিক ব্যবস্থাপনা স্তর[47]; এবং (৩) নিম্নতর ব্যবস্থাপনা স্তর[48]।

১. **সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা-স্তর**—ম্যানেজার, ম্যানেজিং ডাইরেকটার প্রভৃতিদের নিয়ে ব্যবস্থাপনার এই স্তরটি গঠিত। এরা হল প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কর্মনির্বাহক বা চীফ একজিকিউটিভস্। কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদ বা বোর্ড অব ডাইরেকটারস কর্তৃক নির্ধারিত কর্মনীতিগুলির (পলিসি) ভিত্তিতে এই মুখ্য কর্মনির্বাহকরা নির্দেশ দিয়ে থাকে।

২. **মাধ্যমিক ব্যবস্থাপনা-স্তর**—বিভাগীয় প্রধান ও সুপারিনটেনডেন্ট্‌দের নিয়ে

রেখাচিত্র নং ১২·২
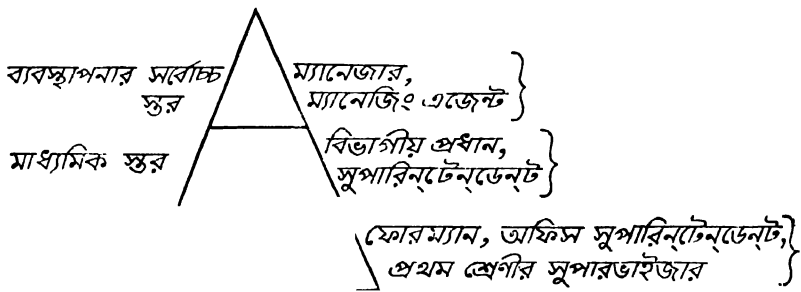
ব্যবস্থাপনার মাধ্যমিক স্তরটি গঠিত। ম্যানেজার বা ম্যানেজিং ডাইরেকটর প্রভৃতি মুখ্য কর্মনির্বাহকদের কাছ থেকে এরা নির্দেশ নেয় এবং সে অনুযায়ী আবার নিজের অধস্তন

42. Sense of belonging. 43. Motiving forces.
44. Forward looking or futuristic. 45. Management Process.
46. Top management level. 47. Middle management level.
48. Lower management level.

কর্মীনির্বাহকদের তারা আদেশ নির্দেশ দেয়। এদের প্রধান কাজটি হল উপরতলার সাথে নিচেরতলার কর্মীনির্বাহকদের এবং এই উভয়ের সাথে নিজেদের কাজকর্মের সংযোজনা প্রতিষ্ঠা করা।

৩. **নিম্নতর ব্যবস্থাপনা-স্তর**—ব্যবস্থাপনার নিম্নতর বা তৃতীয় স্তরে রয়েছে ফোরম্যান, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট ও প্রথম শ্রেণীর সুপারভাইজার প্রভৃতিরা। এদের সাথে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। এরা হল মাধ্যমিক ব্যবস্থাপনা স্তর এবং সাধারণ কর্মী, এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র। মাধ্যমিক ব্যবস্থাপনা স্তর থেকে প্রাপ্ত নির্দেশগুলি সাধারণ কর্মীদের কাছে ব্যাখ্যা করার ভার থাকে এদের উপর। সাধারণ কর্মীদের 'গাইড' করা ও পরিচালনা করার ভার থাকে এদের উপর। কর্মীদের মধ্যে উচ্চ মনোবল বজায় রাখার ভার এরাই বহন করে।

১৩

শিল্পের প্রশাসনিক সংগঠন
ADMINISTRATIVE ORGANISATION IN INDUSTRY

সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও কাঠামো ORGANISATION PROCESS & STRUCTURE

সাংগঠনিক প্রক্রিয়া : "সংগঠন" বলতে একক মালিকানা, অংশীদারী অথবা কোম্পানী রূপে কারবার স্থাপন করা বোঝায় না। এগুলি কারবারের বিবিধ (মালিকানা) রূপ মাত্র। কারবারের (মালিকানা) রূপ যাই হোক না কেন, কম খরচে কাজ করার এবং সুষ্ঠুভাবে কারবার চালানোর জন্য সমস্ত কারবারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই যা অত্যাবশ্যক তা হল তার "সংগঠন"। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশকে যে-ভাবে কাজ করার উপযুক্ত অবস্থায় স্থাপন করা হয় তাই হল তার "সংগঠন"। কারবারী প্রতিষ্ঠানকে কাজের উপযোগী অবস্থায় স্থাপন করতে হলে একদিকে তার বিভিন্ন অংশগুলি ও কাজগুলি কি কি হবে তা স্থির করতে হয়, অন্যদিকে সমগ্র প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে সেই অংশগুলির ও কাজগুলির মধ্যে সংযোগ ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। যে প্রক্রিয়ায় কারবারী প্রতিষ্ঠান কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে তাই হল সাংগঠনিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি হল—১. সংগঠনের উদ্দেশ্য স্থির করা; ২. কার্যাবলী নির্ধারণ করা; ৩. কাজের ভাগ করা; ৪. প্রতিটি কর্মীর কর্তব্য নির্দেশ করা; এবং ভারার্পণ করা। প্রথম অধ্যায়ে ১৩-১৪ পৃষ্ঠায় এই আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সাংগঠনিক কাঠামো : একদিক দিয়ে সংগঠন বলতে যেমন একটি প্রক্রিয়া বোঝায় তেমনি আবার সংগঠন বলতে একটি কাঠামোও বোঝায়। প্রতিষ্ঠানের বিবিধ কাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটাই হল সংগঠনের কাঠামো বা সাংগঠনিক কাঠামো। এই কারণে, ব্যাপক অর্থে সংগঠন বলতে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদান, যেমন কর্মীদের দায়িত্ব, যন্ত্রপাতির ভাগ-বিভাগ ও উপকরণ-ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ[১] ইত্যাদির মধ্যে কাঠামোগত সম্পর্ক বোঝায়। প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের বিবিধ কাজের মধ্যে এই কাঠামোগত সম্পর্কটাই হল তার আনুষ্ঠানিক সংগঠন[২]। এর দুটি দিকের একটি হল সংগঠনের রূপ বা সাংগঠনিক রূপ। সংগঠনের "মূল নীতিগুলির" ভিত্তিতে তা রূপ নেয়। আরেক দিকটি হল যে সব কাজ সম্পাদন করতে হয় সেগুলি। এই কাজগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই সাংগঠনিক কাঠামোটি রূপ গ্রহণ করে।

বিভাগীয়করণ (DEPARTMENTATION)

বিভাগীয়করণ কাকে বলে : প্রতিষ্ঠানকে সংগঠিত করার প্রক্রিয়ার অন্তর্গত কাজ হল দুটি—(১) কারবারের যাবতীয় কার্যাবলীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক একটি ভাগের অন্তর্গত একজাতীয় ও সংশ্লিষ্ট কাজগুলিকে একত্রিত করা[৩]; এবং (২) বিভিন্ন কর্মীর কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্দেশ করা[৪]। এইভাবে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং তাতে তার প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। এই প্রক্রিয়াটিকে বিভাগীয়করণ বলে। অর্থাৎ বিভাগীয়করণ হল প্রশাসনিক সুবিধার জন্য

---

1. Material control. 2. Formal organisation.
3. Dividing and grouping of work.
4. Assigning duties and responsibilities to different people.

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর বিভাগকরণ ও একজাতীয় ও সংশ্লিষ্ট কাজগুলির একত্রীকরণ। এইরূপে যে প্রশাসনিক এককগুলি সৃষ্টি হয় তাদের কোথাও "ডিভিশন", কোথাও "ডিপার্টমেন্ট", কোথাও "ইউনিট", আবার কোথাও বা "ব্রাঞ্চ" নাম দেওয়া হয়।

বিভাগীয়করণের পদ্ধতি ও ভিত্তি[5]: সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে কর্মীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিভক্ত করার অর্থাৎ বিভাগীয়করণের পদ্ধতিগুলি হল—১. ক্রিয়ার দ্বারা[6]; ২. প্রক্রিয়ার দ্বারা[7]; ৩. উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবাকর্মের দ্বারা[8]; ৪. অঞ্চল বা অবস্থানের দ্বারা[9]; ৫. সময়ের দ্বারা[10]; এবং ৬. খরিদ্দারদের দ্বারা[11] বিভাগীয়করণ।

১. ক্রিয়াগত ভিত্তিতে[12] বিভাগীয়করণ: কাঁচামাল ও উপকরণ ক্রয়, উৎপাদন, বিক্রয়, অর্থসংস্থান, কর্মী ইত্যাদি নানারূপ ক্রিয়ার ভিত্তিতে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে বিভক্ত করা হয়। এটি হল বিভাগীয়করণের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও প্রচলিত ভিত্তি।

সুবিধা: এটি হল বিভাগীয়করণের স্বাভাবিক, যুক্তিগ্রাহ্য ও বহুকালের প্রমাণিত পদ্ধতি এবং পেশাগত বিশেষীকরণের[13] অনুসারী।

অসুবিধা: কিন্তু বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত কার্যকলাপসম্পন্ন বিরাট আকারের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিভাগীয়করণের ক্রিয়াগত পদ্ধতি উপযুক্ত নয়। তাছাড়া, বিভিন্ন বিভাগের অধীন কর্মীরা নিজেদের কাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ও ব্যস্ত থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক লক্ষ্যের কথা ভুলে যায় বা তা দেখতে পায় না; ফলে বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয় ও সংযোজনায় অসুবিধা ঘটে।

২. প্রক্রিয়াগত ভিত্তিতে[14] বিভাগীয়করণ: প্রধানত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকারী সংস্থায় এবং বিশেষত সংগঠনের নিম্নতর স্তরে অনেক সময় উৎপাদনের প্রক্রিয়া অথবা ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অনুযায়ী কাজের বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। একটি বৃহৎ কারখানার বড় "জব মেশিন সপ"-এর পক্ষে লেদ-এর কাজ, মিলিং, সেপিং, ড্রিলিং ও গ্রাইন্ডিংয়ের জন্য আলাদা আলাদা "প্রসেস" ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি করার প্রয়োজন হতে পারে। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির প্রকৃতি অনুযায়ীও এ ধরনের প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীয়করণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

সুবিধা: এই পদ্ধতিতে কর্মীদের ও যন্ত্রপাতির পূর্ণ কর্মক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ ঘটে এবং তদারকির সুবিধা হয়।

অসুবিধা: কিন্তু যেখানে কাজের পরিমাণ কম, কিংবা যে সকল প্রতিষ্ঠান দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত নয়, সে সকল ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী নয়।

৩. উৎপন্নদ্রব্য বা সেবাকর্মের ভিত্তিতে বিভাগীয়করণ: অনেক সময় প্রতিষ্ঠান যে সকল দ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন বা সরবরাহ করে তার প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। বৃহদায়তনে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এই ধরনের উৎপন্ন-দ্রব্য বা সেবাকর্মভিত্তিক বিভাগীয়করণ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

সুবিধা: এই পদ্ধতিতে সর্বস্তরের কর্মীদের ব্যক্তিগত কর্মকুশলতা[16], বিশেষীকৃত জ্ঞান[17], বিশেষীকৃত পুঁজি[18]-র সর্বাধিক ব্যবহার এবং খানিক পরিমাণে সংযোজনার[19] সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হয়।

অসুবিধা: কিন্তু এর অসুবিধা হল, বিভাগীয় প্রধানদের মধ্যে অনাবশ্যকভাবে

---

5 Methods and Basis of Departmentation. 6. By Functions.
7. By Process. 8. By Product or service.
9. By Territory or location. 10. By time. 11. By customers.
12. Functional Basis. 13. Occupational specialisation.
14. Process Basis. 15. Product or Service Basis.
16. Personal skill. 17. Specialised knowledge.
18. Specialised capital. 19. Co-ordination.

নিজ নিজ বিভাগের পরিধি ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সংযোজনা প্রতিষ্ঠার অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে ও তার ফলে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে।

৪. অঞ্চল ভিত্তিতে[২০] বিভাগীয়করণ: যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ও দেশে বিস্তৃত সেক্ষেত্রে অঞ্চল বা অবস্থানভিত্তিক বিভাগীয়করণই প্রশস্ত।

সুবিধা: এর ফলে স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে কর্মকর্তার অভিজ্ঞতা ও বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়, স্থানীয় অধিবাসীদের শুভেচ্ছা ও সমর্থন লাভ করা যায়, স্থানীয়ভাবে অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে এবং স্থানীয় কর্মকেন্দ্র বা শাখাগুলি নিম্নতর ব্যবস্থাপনা-কর্মীদের উৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্ররূপে কাজ করে ও ভবিষ্যতে তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মীপদের উপযুক্ত করে তোলে।

অসুবিধা: এই পদ্ধতি অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উপযোগী নয়। তাছাড়া, উপযোগী ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন অঞ্চলের শাখা কর্মকেন্দ্রগুলির মধ্য সংযোগ ও সংযোজনা এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়ে।

৫. সময়ভিত্তিক[২১] বিভাগীয়করণ: কাজের পরিমাণ বেশি হলে কাজের স্বাভাবিক সময়ের মধ্যে তা আবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সন্ধ্যা বা রাত্রির "শিফ্‌ট" চালু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে কাজের সময় বা "শিফ্‌ট" অনুযায়ী বিভাগীয়-করণের প্রয়োজন হয়। সকল ক্ষেত্রে যে এরূপ পদ্ধতি উপযোগী নয় তা বলাই বাহুল্য।

৬. খরিদ্দারভিত্তিক[২২] বিভাগীয়করণ: খরিদ্দারদের সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে কাজের উপর যে সব প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় তারা সাধারণত এই জাতীয় বিভাগীয়করণ গ্রহণ করে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খরিদ্দার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ গঠন করে। যে সব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পাইকার ও খুচরা খরিদ্দার উভয়ের কাছে তাদের পণ্য বিক্রয় করে তারা পাইকারদের জন্য পাইকারী এবং খুচরা খরিদ্দারদের জন্য খুচরা বিক্রয় বিভাগ স্থাপন করে। যে সব ব্যাংক চাষীদের ঋণ দেয় তারা অনেক সময় খাদ্যশস্য, বাণিজ্যিক শস্য প্রভৃতির জন্য আলাদা আলাদা ঋণদান বিভাগ খোলে। রেস্তোঁরাগুলি অনেক সময় ধনী খরিদ্দারদের জন্য ব্যয়বহুল এবং সাধারণ খরিদ্দারদের জন্য সস্তায় খাদ্য, পানীয় সরবরাহের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করে। বিভাগীয় বিপণিগুলিতে পুরুষ, মহিলা ও বালক বালিকা শিশুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থাকে।

সুবিধা ও অসুবিধা: এর ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর খরিদ্দারদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব হলেও এর অসুবিধা হল এই যে, এ জাতীয় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোজনা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের কর্মক্ষমতার ও বিধি-ব্যবস্থাগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার অনেক সময় ঘটে না।

বিভাগীয়করণের বুনিয়াদী উপাদান[২৩]: ত্রুটিশূন্য বিভাগীয়করণের বুনিয়াদী উপাদানগুলি হল:

১. বিশেষায়ণ[২৪]—প্রতিষ্ঠানের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ, যথা উৎপাদন, বিক্রয়, অর্থসংস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কিংবা উৎপাদিত পণ্যের ভিত্তিতে, যে ভিত্তিতেই বিভাগীয়করণ প্রবর্তিত হোক না কেন, তা থেকে যেন বিশেষায়ণ-এর সুবিধা ভোগ করা যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

20. Territorial Basis.
21. Time Basis. 22. Customer Basis.
23. Basic Factors of Departmentation. 24. Specialisation.

২. **নিয়ন্ত্রণ**[25]—বিভাগীয়করণটি এমন হওয়া চাই যেন তাতে কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের[26] নিয়ন্ত্রণ করার কাজটি যথাসম্ভব সরল অথচ কার্যকর হতে পারে। একটি কাজের দ্বারা আরেকটি কাজের যাচাই[27] করতে হলে, এই দু'টি কাজ দু'টি আলাদা কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হওয়া উচিত। বস্তুতপক্ষে নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য সকল কাজই যাচাই করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৩. **সংযোজনা**—সংযোজনার সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের কাজগুলি একই কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের অধীনে আনা উচিত। "ফাইলিং" প্রভৃতির মত কতগুলি কাজ আছে যা "বেওয়ারিশ"[28] বলে গণ্য করা হয়। যে সব বিভাগে এই ধরনের কাজ বেশি হয়, তাদের অধীনেই এই জাতীয় কাজগুলি রাখা উচিত।

৪. **মনোযোগ**[29]—প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পক্ষে যে কাজটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রতি যাতে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় সেজন্য একটি আলাদা বিভাগ স্থাপন করাই উচিত।

৫. **স্থানীয় অবস্থা**[30]—স্থানীয় অবস্থার কথা মনে রেখে, অর্থাৎ সংগঠনের কর্মীদের ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতি[31] কিংবা তাদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক যে সম্পর্ক[32] রয়েছে কিংবা যে কাজগুলি করতে হবে তা একত্রিত করে পুরা-সময়ী কাজে পরিণত করার প্রয়োজন থাকলে, সে সব দিকে লক্ষ্য রেখে বিভাগগুলি সৃষ্টি করতে হবে।

৬. **ব্যয় সঙ্কোচ**[33]—ব্যয় সঙ্কোচের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব না দিলেও, ব্যয় সঙ্কোচের কথা মনে রেখেই বিভাগগুলি সৃষ্টি করা উচিত।

বিভাগীয়করণের গুরুত্ব[34]**ঃ** ১. বিভাগীয়করণ প্রতিষ্ঠানকে তার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে; ২. বিভিন্ন বিভাগগুলিকে নিয়ে সংগঠনের যে কাঠামো গঠিত হয় তা ব্যবস্থাপনার উপায় হিসাবে কাজ করে; ৩. এই সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর ক্রমাগত সম্প্রসারণ সম্ভব করে তোলে; ৪. সুদক্ষভাবে কাজগুলি সম্পাদনে কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের যে মাত্রায় বিশেষায়ণ প্রয়োজন হয় বিভাগীয়করণ তা লাভে সাহায্য করে; ৫. কাজের উপযোগী পরিধির মধ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাজগুলি সরল করে আনে; এবং ৬. বিভাগীয়করণ হল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশের কাজগুলির সংযোজনায় ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিস্বরূপ। এই হল বিভাগীয়করণের গুরুত্ব।

সংগঠনঃ নীতি ও গুরুত্ব ORGANISATION : PRINCIPLES & IMPORTANCE

প্রথম অধ্যায়ের ১৪-১৬ পৃষ্ঠার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মূলনীতিসমূহ
BASIC PRINCIPLES OF MANAGEMENT ORGANISATION

ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কাঠামো সর্বত্র এক রকম হতে পারে না। কারবারের প্রকৃতি, আয়তন, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, উৎপন্ন সামগ্রী ইত্যাদি নানা বিষয়ের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন কারবারের ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কাঠামো বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তবে পার্থক্য সত্ত্বেও সকল প্রকারের সংগঠনেরই একটি স্থানে মিল থাকে। তা এই যে, সর্বত্রই কাঠামোটি যথাসম্ভব দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। বলাবাহুল্য মুনাফাই হল সে দক্ষতার মাপকাঠি। কারবারের মুনাফা বৃদ্ধির কাজে কোন্ জাতীয় কাঠামোর দক্ষতা কতখানি তার দ্বারাই সে কাঠামোর সার্থকতা বিচার করা হয়।

---

25 Control. 26. Executive. 27. Check. 28. "Orphan".
29. Attention. 30. Local conditions. 31. Personalities.
32. Informal relationship. 33. Economy.
34. Importance of Departmentation.

ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কাঠামোর আলোচনায় তিনটি বিষয় মনে রাখা উচিত।

১. ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কাঠামোটি পরিবর্তনহীন, স্থানু হওয়া উচিত নয়। যে মানুষ ব্যবস্থাপনার কাজ করে তারা বদলায়, প্রতিষ্ঠানটি বড় হয়, নতুন নতুন কারবারী জ্ঞান প্রবর্তিত হয়, অর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি বদলায়। সুতরাং এমন পরিবেশে কারবারী সংগঠনের কাঠামোটিও নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হওয়া প্রয়োজন।

২. সংগঠন হল ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কাজ, যথা, পরিকল্পনা, নেতৃত্ব প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের একটি অংশ মাত্র। এক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফল লাভের জন্য ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের মধ্যে সঠিক যোগসূত্র ও সম্পর্ক রক্ষা করা প্রয়োজন। যিনি সফল ব্যবস্থাপক তিনি শুধু যে ভালভাবে তাঁর কাজ করতে জানেন তাই নয়, অধস্তন কর্মীদের দিয়ে কি করে কাজ করিয়ে নিতে হয় তাও জানেন।

৩. কর্তৃত্ব-ক্ষমতা ও দায়িত্ব[৩৫]—কর্তৃত্ব-ক্ষমতা হল সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তি এবং ব্যবস্থাপকের কাজের চাবিকাঠি। কর্তৃত্ব-ক্ষমতা বলতে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার এবং সে সিদ্ধান্ত পালনের জন্য অধস্তন কর্মীদের উপর আদেশদানের অধিকার বোঝায়। আর যে অধস্তন কর্মীকে ঊর্ধ্বতন কর্মী বা কর্তৃপক্ষ কোনও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছে, সে কর্তব্যটি পালনে অধস্তন কর্মীর বাধ্যবাধকতাই হল তার দায়িত্ব। সুতরাং কর্তৃত্ব-ক্ষমতা থাকে ঊর্ধ্বতন কর্মীর আর দায়িত্ব হল অধস্তন কর্মীর। যেখানেই ঊর্ধ্বতন ও অবস্তন কর্মী-সম্পর্ক রয়েছে সেখানেই থাকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও দায়িত্বের সম্পর্ক।

কারবারের সাফল্যের পক্ষে উপযুক্ত ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে হলে যে নীতিগুলি পালন করতে হয় তা হলঃ—

১. ভারার্পণ[৩৬]।

২. দায়িত্ব বণ্টন[৩৭]।

৩. সংযোজিত বিকেন্দ্রীকরণ[৩৮]।

৪. নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা[৩৯]

১. ভারার্পণঃ ক. শব্দটির অর্থ[৪০]—১. ভারার্পণ বলতে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা অধস্তন ব্যবস্থাপনা-কর্মীদের উপর ব্যবস্থাপনার কাজের আংশিক ভার ভাগ করে দেওয়া বোঝায়। (প্রথম অধ্যায়ের ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ব্যবস্থাপক বা মুখ্য কর্মনির্বাহকের[৪১] পক্ষে একাকী ব্যবস্থাপনার সকল কাজ করা সম্ভব নয় বলে তিনি তাঁর ব্যবস্থাপনার কাজের একটি অংশ তাঁর সরাসরি অধস্তন বিভাগীয় প্রধানদের মধ্যে, বিভাগীয় প্রধানরা আবার নিজেদের ব্যবস্থাপনার কাজের বোঝা তাঁদের সরাসরি অধস্তন বিভাগীয় সেকশন প্রধানদের মধ্যে এবং তাঁরা আবার তাঁদের সরাসরি অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মী থাকলে তাঁদের মধ্যে নিজেদের ব্যবস্থাপনার কাজের বোঝা ভাগ করে দেন। এইভাবে, ব্যবস্থাপনা-কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক বা মুখ্য কর্মনির্বাহক থেকে শুরু করে সবচেয়ে নিচের তলার ব্যবস্থাপনা-কর্মী পর্যন্ত ধাপে ধাপে ব্যবস্থাপনার কাজের ভারটি ভাগ করে দিয়ে তা সম্পাদন করানোর ব্যবস্থাকেই ভারার্পণ বলে।

২. ভারার্পণ বলতে অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে ব্যবস্থাপক বা মুখ্য কর্ম-নির্বাহকের কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অংশ বণ্টন করাও বোঝায়। কারণ, অধস্তন ব্যবস্থাপনা

35. Authority and responsibility.
36. Principles of Delegation.
37. Allocation of Responsibilities.
38. Co-ordinated Decentralisation.
39. Machinery of Control.
40. Meaning of the term.
41. Chief Executive.

কর্মীদের মধ্যে এইভাবে ব্যবস্থাপনার কাজের ভারের একাংশ [illegible] তাঁরা যাতে সে কর্তব্য পালন করতে পারেন সেজন্য তাঁদের কিছুটা কর্তৃত্ব-ক্ষমতাও [illegible] প্রতি স্তরের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে নিজের ব্যবস্থাপনার কাজের ভারের একটি অংশ ভাগ করে দেন এবং সবচেয়ে নিচের তলায় অবস্থিত ব্যবস্থাপনা কর্মীরা সাধারণ কর্মীদের দিয়ে হাতে কলমে কাজ করিয়ে নেন।

৩. কিন্তু ভারার্পণ বলতে দায়িত্ব বণ্টন বোঝায় না। অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে ব্যবস্থাপনার কাজের ভারের এবং নিজের কর্তৃত্ব-ক্ষমতার একটি অংশ ভাগ করে দিলেও ব্যবস্থাপক বা মুখ্য কর্মনির্বাহক তার নিজস্ব কর্তব্য বা কাজটুকু সম্পাদন করার জন্য ও অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীরা যাতে সন্তোষজনকভাবে তাদের কাজ নির্বাহ করে তা সুনিশ্চিত করার জন্য কর্তৃত্ব-ক্ষমতার একটি অংশ নিজের কাছে রেখে দেন। তার বলেই তিনি অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের কাছে তাঁদের কাজের কৈফিয়ত চাইতে পারেন এবং তাঁরাও তাঁর কাছে নিজের নিজের কর্তব্য পালনের জন্য দায়ী থাকেন।[৪২] এই কারণে, প্রতিটি ব্যবস্থাপনা কর্মী তাঁর কর্তব্য পালনের জন্য তাঁর সরাসরি উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মীর কাছে এবং উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মীরা আবার ব্যবস্থাপক বা মুখ্য নির্বাহকের কাছে নিজ কর্তব্য পালনের জন্য দায়ী থাকেন। কোন ব্যবস্থাপনা কর্মীই তাঁর নিজের দায়িত্ব অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে অর্থাৎ তাঁদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।

প্রয়োজন থেকেই কারবারের কাজ যে বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ভারার্পণ হল সেগুলিকে ধারাবাহিকভাবে একত্র সংবদ্ধ রাখার উপায়। ভারার্পণ কারবারের সংগঠন সৃষ্টিতে সাহায্য করে, ভারার্পণের সিমেন্টে কর্তব্য, ক্ষমতা ও দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ কারবারের মজবুত সংগঠন সৃষ্টি হয়।

খ. ভারার্পণের উপাদান[৪৩]—ভারার্পণ ব্যবস্থার উপাদান তিনটি।

১. কর্তব্যভার অর্পণ[৪৪]—ব্যবস্থাপক একাকী তাঁর সব কাজ সম্পাদন করতে পারেন না বলেই অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে তাঁর কাজের ভার বা কর্তব্যগুলি ভাগ করে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। কর্তব্যগুলি ভাগ করে দিতে গিয়ে ব্যবস্থাপককে স্থির করতে হয় তাঁর কর্তব্যের কোন অংশটা অর্থাৎ কোন কাজটা তিনি নিজের জন্য রাখবেন আর কোনটির ভার তিনি অধস্তন কর্মীদের উপর দেবেন।

২. কর্তৃত্ব-ক্ষমতা প্রদান[৪৫]—ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব-ক্ষমতা বলতে আদেশ দানের ক্ষমতা, কারবারের বা কোম্পানীর জন্য কাজ করার অধিকার বা অনুমতি, সেজন্য কোম্পানীর সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার ইত্যাদি বোঝায়। ব্যবস্থাপক যে কাজের ভার অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের উপর দিলেন, সে কাজ তিনি নিজে সম্পাদন করতে গেলে তাঁর যে অধিকার ও ক্ষমতার প্রয়োজন হত, অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীরা যাতে সে কাজটি সম্পাদন করতে পারে সেজন্য তাঁদেরও তাঁর ততটুকু অধিকার এবং ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। তবে, এইভাবে ব্যবস্থাপক বা মুখ্য কর্মনির্বাহকের সম্পূর্ণ কর্তব্য যেমন অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় না, তেমনি তাঁর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব-ক্ষমতাও অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় না। নিজের জন্য তাঁকে যেমন কিছুটা কর্তব্য বা কাজ রেখে দিতে হয় তেমনি তা পালনের জন্যও তাঁকে তাঁর কর্তৃত্ব-ক্ষমতার একটি অংশ নিজের কাছে রাখতে হয়। তা না হলে, তিনি আর ব্যবস্থাপক থাকতে পারেন না।

42. Accountability.
43. Elements of Delegation.
44. Assignment of duty.
45. Grant of authority.

৩. **দায়িত্ব সৃষ্টি**[46]—উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ দ্বারা অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে কর্তব্য ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতা বণ্টনের পাশাপাশি অতি যুক্তিযুক্ত ভাবেই উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদেরও কর্তব্য পালনের ও নিজেদের কাজের হিসাব দেওয়ার বাধ্যবাধ্যকতা বা দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। ব্যবস্থাপক বা মুখ্য কর্মনির্বাহক তাঁর কাজের অংশবিশেষের ভার অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে ভাগ করুন বা না করুন, তাঁর নিজের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁকে নিজের কাজের হিসাব দেওয়ার জন্য দায়ী থাকতেই হয়। সুতরাং এটাও স্বাভাবিক যে, যে অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে তিনি তাঁর কর্তব্যভারের একটি অংশ ভাগ করে দিয়েছেন, তাঁদের কাজ যাতে সন্তোষজনক হয় সেজন্য তাঁদের তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন। কাজের হিসাব বা কৈফিয়ত চাওয়ার মারফত তিনি এই নিয়ন্ত্রণ খাটান। কারবারী সংগঠনের কাঠামোটিই এমন যে, তাতে কর্তব্য ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতা উপর থেকে ক্রমশঃ নিচের দিকে অর্থাৎ উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মী থেকে অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে নামে কিন্তু কর্তব্য পালনের দায়িত্ব বা কাজের হিসাব দেওয়ার বাধ্য-বাধতকতাটা নিচে থেকে উপরের দিকে উঠে। অর্থাৎ প্রতি স্তরে অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীরা তাদের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের কাছে দায়ী থাকে।

গ. **ভারার্পণের নীতি**[47] ঃ ছয়টি মূলনীতির উপর ভারার্পণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।

১. **কর্তৃত্ব-ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরস্পরের অনুরূপ হওয়া চাই**[48]—কর্তৃত্বের ক্ষমতার বলেই আদেশ দেওয়া হয়, এবং যে আদেশ পায় তার উপর সে আদেশ পালনের দায়িত্ব এসে পড়ে। সুতরাং কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরস্পরের সমান হওয়া প্রয়োজন। ভারার্পণের ফলে অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীর দায়িত্বের চেয়ে কর্তৃত্ব ক্ষমতা যদি বেশি হয় তবে ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা দেয় আর যদি কোন কর্তৃত্ব-ক্ষমতা না দিয়ে শুধু দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতএব, ভারার্পণ করতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের যাঁর যতটুকু দায়িত্ব তাঁকে সে দায়িত্ব পালনের জন্য ততটুকু কর্তৃত্ব-ক্ষমতাও যেন দেওয়া হয়।

২. **দায়িত্বের ভারার্পণ করা যায় না**[49] ঃ যখন কোনও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মী তাঁর কর্তৃত্ব-ক্ষমতা অধস্তন কর্মীর উপর অর্পণ করেন, তখন কিন্তু তিনি তাঁর দায়িত্বভার লাঘব করেন না কিংবা তা থেকে মুক্ত হন না। বরং তখন তাঁর দায়িত্ব আরও বাড়ে। তিনি তখন তাঁর উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের অধস্তন কর্মীদের কাজের জন্যও দায়ী হন।

৩. **একসঙ্গে দুটি উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধীনতা অনুচিত**[50]—এক সঙ্গে দুজন প্রভুর সেবা করা যায় না। তাতে কেবল কাজ পণ্ড হয়, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুতরাং ভারার্পণ ব্যবস্থাটি এমন হওয়া উচিত যেন আদেশদাতা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ একজনই হয়। একাধিক নয়।

৪. **একই কাজের ভার একাধিক কর্মীর উপর দেওয়া উচিত নয়**[51] ঃ একাধিক কর্মীর উপর একটি কাজের ভার দিলে, সহযোগিতার অভাবে কাজটি পণ্ড হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। তাই এক একটি কাজের ভার এক একজন কর্মীর উপর দেওয়া উচিত।

৫. **সাংগঠনিক ফাঁক রাখা উচিত নয়**[52] ঃ যখন একটি কাজ করা দরকার হয়ে

46. Creation of accountability. 47. Principles of delegation.
48. Authority and responsibility must be equal.
49. Responsibility cannot be delegated.
50. Dual subordination should be avoided.
51. Duties should not overlap.
52. Organisational gaps should be removed.

পড়ে অথচ সে কর্তব্যটি পালনের ভারপ্রাপ্ত কেউ থাকে না তখনই সাংগঠনিক ফাঁকের সৃষ্টি হয়। এরকম ঘটলে, যাঁদের কর্তব্য বা কাজ নির্দিষ্ট আছে তারা ক্ষুব্ধ হয়। কারণ তারা দেখে ওই কাজটি করার কোন নির্দিষ্ট কর্মী না থাকায় তাদের কর্তব্য সম্পাদনে অযথা অসুবিধা ও দেরী হচ্ছে। সুতরাং ভারার্পণ করতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন এরকম কোন সাংগঠনিক ফাঁক না থাকে।

৬. **ব্যতিক্রমের নীতি**[53] : দৈনন্দিন রুটিন মাফিক কাজগুলির ভার যতটা সম্ভব অধস্তন কর্মীদের উপর দিয়ে কর্ম নির্বাহক বা উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মী সাধারণ সমস্যাগুলি ও রুটিন কাজের বহির্ভূত কাজগুলি নিজের জন্য রাখলেই তাঁর পক্ষে সবচেয়ে ভালভাবে কাজ করা সম্ভব, সংক্ষেপে, এই হল ব্যতিক্রমের নীতির মূল কথা। কিন্তু তা করতে হলে আগে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মীটির উচিত হল কাজের নীতিগুলি, পদ্ধতিগুলি সযত্নে স্থির করে নেওয়া, নিজের অধস্তন কর্মীদের কে কেমন তা ভাল করে জানা, তারা যেন কাজে সুশিক্ষিত হয় ও কাজের উপযোগী জ্ঞান যেন তাদের থাকে এবং তিনি নিজে তাদের উপর কর্তৃত্ব-ক্ষমতা ও কর্তব্যের যতটুকু ভারার্পণ করেছেন তা যেন তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে—এসব বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া। তা না হলে দস্তুর মতো বিপত্তি সৃষ্টি হতে পারে।

ঘ. **কার্যকর ভারার্পণ ব্যবস্থার উপায়**[54] : ভারার্পণ ব্যবস্থাটিকে সুদক্ষ ও কার্যকর করার উপায় হল প্রধানত ছ'টি।

১. **পরিকল্পনা ও কাজের নীতিগুলি স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে বলতে হবে**—কারবারের সংগঠনের উদ্দেশ্য যেমন তার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের কর্মীদলের উদ্দেশ্যগুলি সাধন করা, তেমনি ঐ উদ্দেশ্যগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে রচিত কাজের পরিকল্পনা বা পরিকল্পনার অংশ যাতে রূপায়িত হতে পারে তেমন ভাবে সংগঠনের প্রতিটি কাজও স্থির করে নিতে হয়। উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মী যদি অধস্তন কর্মীকে চিন্তা ভাবনায় সাহায্য করার জন্য কাজের নীতিগুলি পরিষ্কার করে দেন এবং ওই কর্মীটির নিজের কার্যক্ষেত্রে যেখানে নিজেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তেমন বিষয়ে সংগঠনের বর্তমান পরিকল্পনা কিছু হয়ে থাকলে তা পরিষ্কার করে বলে দেন, তাহলেই অধস্তন কর্মীর পক্ষে কাজের এরকম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা সম্ভব হতে পারে।

২. **কর্তৃপক্ষ যা আশা করেন তা মনে রেখে কাজের ভার দেওয়া**[55] : এর অর্থ হল কর্মীদের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ যেমন ধরনের কাজ আশা করেন সে দিকে লক্ষ্য রেখে অধস্তন কর্মীদের উপর এমনভাবে ভারার্পণ করা, যাতে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

৩. **যে রকম কাজ আশা করা হচ্ছে সেরকম কাজের উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা**[56] : যদিও কাজ অনুযায়ী ভারার্পণ করতে হয়, তাহলেও কাজের উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করা না হলে কাজটি ও ভারার্পণ উভয়ই পণ্ড হবে।

৪. **আদান প্রদান, সংযোগের পথ খোলা রাখতে হবে**[57] : ভারার্পণ কার্যকর করতে হলে, উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের মধ্যে সংবাদাদির আদান প্রদানের, উপর-নিচের সংযোগের পথটি খোলা রাখতে হবে। এর ফলে যার উপর ভারার্পণ করা হবে সেই অধস্তন কর্মীর পক্ষে নিজের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য উপর থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যেমন সম্ভব হবে তেমনি তাকে যতটুকু ভারার্পণ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যাও তার কাছে করা সম্ভব হবে।

53. The Exception Principle. 54. Making delegation effective.
55. Define job assignments in the light of what is expected.
56. Select the man for the job in the light of the job expected.
57. Keeping open lines of Communication.

৫. যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে[৫৮] **:** অধস্তন কর্মীদের উপর কর্তৃত্ব-ক্ষমতার ও কর্তব্যের যতটুকু ভারার্পণ করা হয়েছে তা যথার্থভাবে প্রয়োগ ও পালন করা হচ্ছে কিনা তা দেখা ও তা সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপককে ভারার্পণের সাথে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ কৌশলও অবলম্বন করতে হবে।

৬. কার্যকর ভারার্পণ ও সফল ভারগ্রহণের জন্য পুরস্কার দিতে হবে[৫৯] **:** যেসব ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মী কার্যকরভাবে ভারার্পণ করতে পারবেন এবং যেসব অধস্তন কর্মীরা সে ভারার্পণ গ্রহণ সফল ও সার্থক করে তুলবেন তাঁদের আর্থিক পুরস্কার, ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং পদোন্নতি প্রভৃতি নানাভাবে পুরস্কৃত করার জন্য ব্যবস্থাপককে সজাগ, সচেতন ও প্রস্তুত থাকতে হবে।

২॥ দায়িত্ব বণ্টন : বৃহদায়তন কারবারের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বতন স্তর থেকে অধস্তন স্তরে কর্তৃত্বভার হস্তান্তরিত ও বণ্টন না করে বৃহদায়তন কারবারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এইরূপে কর্তৃত্ব ভারার্পণ করতে গিয়ে অধস্তন কর্মিগণের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতাও জন্মায়। সুতরাং ভারার্পণ করার সময় কর্তব্য ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়ে তদনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত করতে হয়। তা না হলে ব্যবস্থাপনার কাজে বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী। এর মাধ্যমে অধস্তন কর্মচারিগণকে তাদের নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়িত্বশীল করা হয় এবং সমগ্র ব্যবস্থাপনার কাঠামোটি একটি সুনির্দিষ্ট ভারার্পিত কর্তৃত্ব, দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতার শৃংখলে আবদ্ধ একটি দৃঢ়সংবদ্ধ দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রে পরিণত হয়। সকল পর্যায়ের কর্মচারিগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তৃত্ব, কর্তব্য ও দায়িত্বের জন্য প্রত্যক্ষ ঊর্ধ্বতন কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে এবং তার ফলে ব্যবস্থাপনার একটি সামগ্রিক শৃংখলা স্থাপিত হয়।

৩॥ সংযোজিত বিকেন্দ্রীকরণ[৬০] **:** ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে **বিকেন্দ্রীকরণ** কথাটির অর্থ হল গোটা সংগঠনটির মধ্যে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের থেকে শুরু করে অধস্তন কর্মীস্তর পর্যন্ত সকলের মধ্যে কর্তৃত্ব-ক্ষমতার ভারার্পণ বা বণ্টন। তবে ভারার্পণের সাথে বিকেন্দ্রীকরণের পার্থক্য আছে। ভারার্পণ বলতে একজন ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মীর কাছ থেকে তার সরাসরি অধস্তন একজন ব্যবস্থাপনা কর্মীর উপর কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অংশ বিশেষ অর্পণ করা বোঝায়। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ হল কোন একটি সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা বা দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তৃত্ব-ক্ষমতার যতটা সম্ভব পরিপূর্ণ বণ্টন বা ভারার্পণ বোঝায়। সাধারণত কারবারের আয়তন খুব বড় হয়ে পড়লে, বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়লে, শাখা স্থাপিত হলে, বিভিন্ন অঞ্চলে তার উৎপাদন বা বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপিত হলে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তবে বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ সমস্ত কর্তৃত্ব-ক্ষমতার বণ্টন নয়। যে কর্তৃত্ব-ক্ষমতাটি কেন্দ্রীয়ভাবেই সবচেয়ে ভাল করে প্রয়োগ করা যায়, সেটি বাদে, কাজের সুবিধার জন্য অন্যান্য গুলির বণ্টনই হল বিকেন্দ্রীকরণ। বলাবাহুল্য, যে কোনও কারবারী সংগঠনে কতটা পরিমাণে বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব হবে তা নির্ভর করে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাটি[৬১] অধস্তন ব্যবস্থাপনা-স্তরের উপর কতটা ছেড়ে দেওয়া যায় তার উপর।

বিকেন্দ্রীকরণ হল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি বিশেষ চিন্তাধারা বা দর্শন[৬২]। এর

---

58. Establish proper Controls.
59. Reward effective Delegation and successful assumption of Authority.
60. Co-ordinated Decentralisation.
61. Clear cut decision making authority.
62. Philosophy of Management.

মূল কথা হল, সমস্ত ব্যবস্থাপককে ও তাদের অধস্তন সমস্ত কর্মীদের বিকাশের ও তারা যাতে দায়িত্বশীল কর্মীরূপে নিজেদের প্রতিভা ব্যবহার করতে পারে তার সর্বাধিক সুযোগ দেওয়া উচিত। অতএব নিজস্ব কাজের ক্ষেত্রে তারা যাতে সর্বাধিক পরিমাণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব-ক্ষমতা, ব্যক্তিগত বিকাশ, কারখানার সুবিধা ও সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ দিতে হবে।

আবার বিকেন্দ্রীকরণ হল প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যবস্থাপনা-কর্মকৌশলও[৬৩]। এটি হল ব্যবস্থাপনা-সংগঠন গড়ার এমন একটি পদ্ধতি যাতে আধা-স্বাধীন অধস্তন স্তর ও অংশগুলির মধ্যে কর্তৃত্ব-ক্ষমতা বণ্টন করা হয়।

কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অংশগুলি যাতে পরস্পরের কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে কারবারের একই লক্ষ্য অনুসরণ করে চলে তা সুনিশ্চিত করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় আবার সযত্নে ও সুচিন্তিতভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও থাকা প্রয়োজন। একদিকে কর্তৃত্ব-ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ এবং অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীকরণ এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য অবশ্যই থাকা দরকার। উপযুক্ত ভারসাম্য বিশিষ্ট বিকেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার অপর নামই হল **সংযোজিত বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা**। কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মনীতি বা "পলিসি" নির্ধারণ এবং বিকেন্দ্রিতভাবে ব্যবস্থাপনার[৬৪] মধ্য দিয়েই সংযোজিত বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা রূপ নেয়।

সংগঠনের উপরতলা ও নিচের তলার মধ্যে পারস্পরিক **বা দ্বি-মুখী ভাব-বিনিময় বা আদান-প্রদান ব্যবস্থা**[৬৫] হল বিকেন্দ্রীকরণ বা সংযোজিত বিকেন্দ্রীকরণের একটি প্রধান অবলম্বন। একদিকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ধাপে ধাপে একেবারে নিচের তলা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নীতি ও কর্ম-নীতিগুলি[৬৬] সাধারণ কর্মীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যদিকে একেবারে নিচের তলা থেকে সাধারণ ও অন্যান্য কর্মীদের মনোভাব, অনুভূতি ও পরামর্শগুলি সর্বোচ্চ তলায় অবস্থিত কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত করা—উপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে উপরে[৬৭]—এই হল ভাব বিনিময়ের খাড়াখাড়ি বন্দোবস্ত[৬৮]। এই বন্দোবস্তে ভাব বিনিময়ের তিনটি স্তর আছে।—(১) সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সুপারভাইজারদের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান; (২) সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ কর্মীদের মধ্যে আদান-প্রদান; এবং (৩) সুপারভাইজার ও সাধারণ কর্মীদের মধ্যে আদান-প্রদান।

এছাড়া ভাববিনিময়ের আরও দুরকম বন্দোবস্ত প্রয়োজন। একটি হল সমস্তরে আদান-প্রদান[৬৯] এবং অপরটি হল একই স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে আদান-প্রদান[৭০]। উচ্চ পদস্থ কর্মী, কারখানার ম্যানেজার, ফোরম্যান ও সুপারভাইজার প্রভৃতির যুক্ত সভা বা সম্মেলন ডেকে এটি করা যায়।

এছাড়া আদান-প্রদানের আরেকটি দিকও আছে। তাহল গভীরতার দিক[৭১]। এটি হল, কারবারের সকল কর্মীদের মধ্যে উচ্চ মনোবল ও পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য কারবারের নীতি, কর্মনীতি বা কার্যপন্থা, কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ও অনুধাবন করা।

আদান-প্রদানের এই চতুর্মাত্রিক[৭২] ব্যবস্থার ফলেই বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় কারবারের

63. Technique of Management.
64. Centralised Policy Determination and Decentralised Management.
65. Two-way Communication. 66. Principles and policies.
67. Downwards and Upwards. 68. Vertical Communication.
49. Breadthwards Communication.
70. Lateral Communication at the same level.
71. Depth. 72. Four Dimension.

বিভাগ ও ব্যবস্থাপনার কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সামগ্রিক ঐক্যবোধ ও চেতনা সৃষ্টি করা এবং তা বজায় রাখা সম্ভব।

৪॥ নিয়ন্ত্রণ ঃ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের চতুর্থ নীতি হল নিয়ন্ত্রণ। যেহেতু বৃহদায়তন কারবারের কার্য সম্পাদনের মূল ব্যবস্থাই ভারার্পণ মারফত হয়ে থাকে, সেজন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্তৃত্ব ও কর্তব্যভার অধস্তন কর্মচারিগণের উপর ন্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা যাতে নির্ধারিত ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহার করে এবং নির্ধারিতরূপে নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করে, তার জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। কার্যকর নিয়ন্ত্রণ[৭৩] ব্যবস্থার জন্য সর্বস্তরেই পরিমিত সংখ্যক অধস্তন কর্মচারিগণের মধ্যে ভারার্পণ সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। প্রত্যেক উর্ধ্বতন কর্মচারী যে সংখ্যক অধস্তন কর্মচারিগণের উপর ভারার্পণ করেন, তাদের নিয়ে ভারার্পণ পরিধি[৭৪] গঠিত। ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব অনুযায়ী ভারার্পণ বা নিয়ন্ত্রণ পরিধি ৬ থেকে ১০ ব্যক্তির বেশি বিস্তৃত হওয়া অনুচিত। যদিও কার্যত এর ব্যতিক্রম প্রায়ই দেখা যায়।

এছাড়া, ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ ও সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা[৭৫] থাকা প্রয়োজন। এবং সর্বত্রই পরিকল্পনা ও কার্যক্রম অনুযায়ী অগ্রগতি ঘটছে কিনা ও কেউই যাতে প্রদত্ত ক্ষমতার বাইরে পদক্ষেপ না করে তা সুনিশ্চিত করার জন্য, সকল প্রতিষ্ঠানেই নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকা অবশ্য প্রয়োজন। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারিগণ যেরূপ তাঁদের অধীন কর্মচারীদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, তেমনি জেনারেল ম্যানেজার আবার সকল বিভাগীয় প্রধানগণের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু এ ছাড়া সর্বাঙ্গীণ ও সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারের নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ক্ষেত্র হল—ক. অর্থ[৭৬]; খ. উৎপাদন[৭৭]; গ. উৎকর্ষ[৭৮]; এবং ঘ. বণ্টন[৭৯]।

ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নকশা (ORGANISATION CHART)

বৃহদায়তন কারবারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার কাঠামো গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থাপনা সংগঠনের একটি নকশা প্রস্তুত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও শাখার কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে এবং ঐগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ও অধস্তন কর্মচারীদের কাজ ও দায়িত্বসমূহ বণ্টন করার পর, উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকারী কর্মচারীদের কাজ ও দায়িত্ব অনুযায়ী তাদের পদের নামকরণ করা দরকার। বিভিন্ন বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন ও অধস্তন পদগুলি ক্রমানুসারে সাজালে তা থেকে সমগ্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার কাঠামোর একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। একেই ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নকশা বলে। [পরবর্তী পৃষ্ঠায় ব্যবস্থাপনা সংগঠনের একটি কাল্পনিক নকশা দেওয়া গেল।]

ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিভিন্নরূপ[৮০]

কারবারের লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যনির্বাহের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত করে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থাপনা সংগঠন গড়ে তোলা যায়। এই কারণে ব্যবস্থাপনা সংগঠনের রূপ শুধু যে এক প্রকারের হতে পারে তা নয়। অপেক্ষাকৃত ছোট সরল ধরনের কারবারের ব্যবস্থাপনা সংগঠন একজন জেনারেল ম্যানেজার, দুই তিন জন সহকারী ম্যানেজার ও মুষ্টিমেয় কয়েকজন অধস্তন তদারককারী কর্মচারী নিয়ে গঠিত, সহজ রূপের হতে পারে। আবার অত্যন্ত বৃহদাকার কারবারে বহুসংখ্যক বিভাগ ও বহুসংখ্যক উর্ধ্বতন কর্মচারী নিয়ে গঠিত অত্যন্ত জটিল রূপের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলিত থাকতে পারে।

73. Effective control. 74. Span of delegation or Control.
75. Machinery of Overall Control. 76. Finance. 77. Production.
78. Quality. 79. Distribution. 80. Types of Organisation.

শেয়ারহোল্ডারগণ
পরিচালকমণ্ডলী
ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা ম্যানেজার বা ম্যানেজিং এজেণ্ট বা সেক্রেটারীজ এবং ট্রেজারার্স
সেলস ম্যানেজার
পারচেজ ম্যানেজার
প্রোডাক্সন ম্যানেজার
সেক্রেটারী বা কর্মসচিব
পারসোনেল ম্যানেজার
বিজ্ঞাপন ও প্রচার
আভ্যন্তরীণ বাজার
রপ্তানি
মেশিনটুলস্
কাঁচামাল
ক্যাশ
একাউণ্টস
চিঠিপত্র
স্থানীয় বিক্রয়কর্মী
ভ্রাম্যমান বিক্রয়কর্মী
প্ল্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
ওয়ার্কস ম্যানেজার
কর্মীনিয়োগ
মজুরী
শিক্ষা ও কল্যাণ
১নং ফোরম্যান
২নং ফোরম্যান
৩নং ফোরম্যান
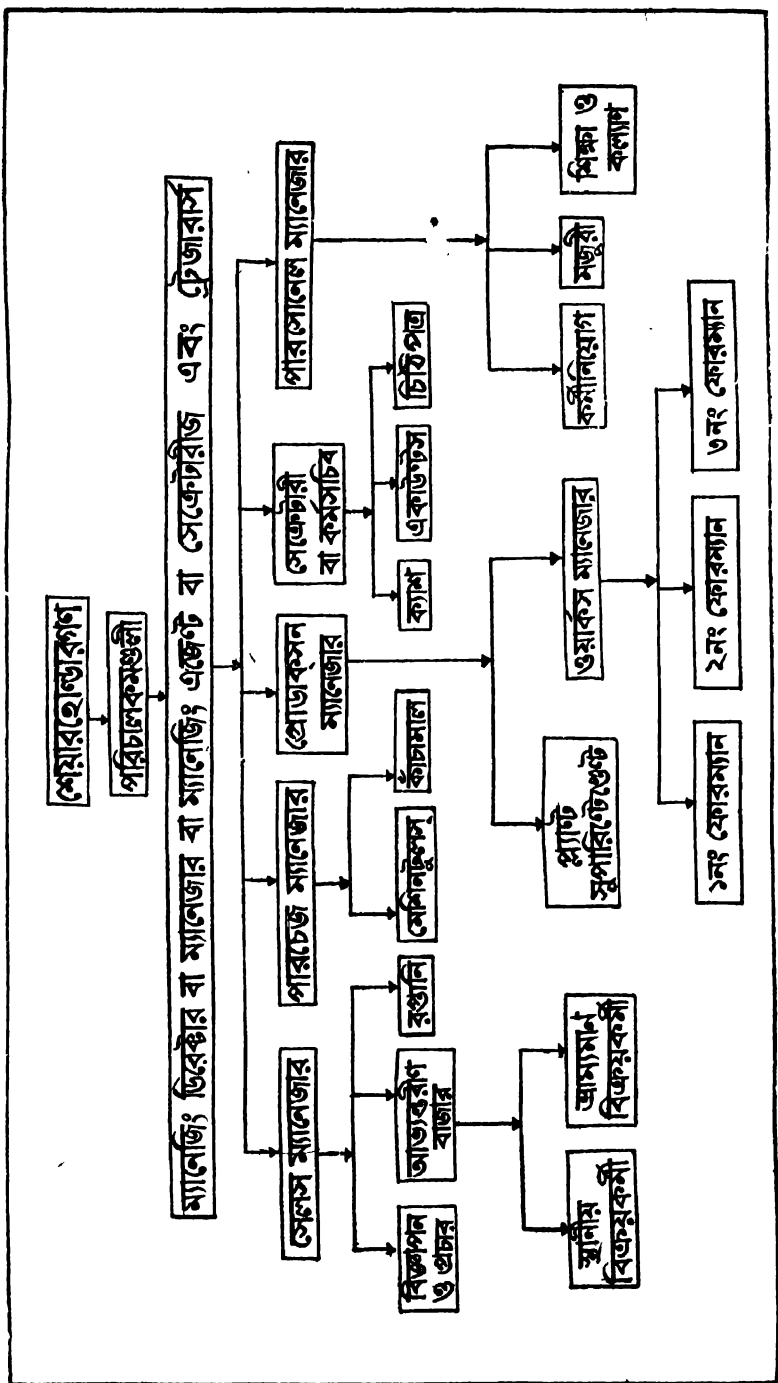
ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মূল কথা হল, কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা কিভাবে কার্যনির্বাহের জন্য ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হবে। কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা কি উচ্চতম স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে নিম্নতর স্তর ও ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে? সংগঠনের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কি তাঁর প্রত্যক্ষ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দ্বারা সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে? এই ক্ষমতা কি ব্যক্তিগত ভিত্তিতেই ন্যস্ত করা হবে? তা কি অস্থায়িভাবে অথবা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের **জন্য**[81] ন্যস্ত করা হবে?—সংক্ষেপে ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিভিন্ন রূপের কথা আলোচনা করতে গেলে এই সব প্রশ্নের আলোচনা অপরিহার্য এবং এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তের বিভিন্নতা অনুসারে ব্যবস্থাপনা সংগঠন বিভিন্ন রূপ নিয়ে থাকে।

প্রধানত যে পাঁচ প্রকারের ব্যবস্থাপনা সংগঠন দেখা যায়, তা হল ১. সরলরৈখিক সংগঠন[82]; ২. ক্রিয়াগত সংগঠন[83]; ৩. সরলরৈখিক এবং পদস্থ কর্মী সংগঠন[84]; ৪. সরলরৈখিক ও ক্রিয়াগত[85]; এবং ৫. কমিটি সংগঠন[86]।

১. সরলরৈখিক সংগঠন বা লাইন অর্গানিজেশন: এটি সবচেয়ে পুরাতন, সহজ ও সরল ধরনের ব্যবস্থাপনা সংগঠন। এটি প্রাচীন সামরিক প্রশাসনিক পদ্ধতির অনুকরণ বিশেষ। এর **মূলবৈশিষ্ট্যগুলি হল:**

ক. সমগ্র উৎপাদন সংগঠনটিকে প্রথমে কয়েকটি সুস্পষ্ট বিভাগে ভাগ করা হয়। এই বিভাগগুলির প্রত্যেকে আপন আপন কার্য সম্পাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

খ. এই বিভাগগুলির চূড়ায় অবস্থিত সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত একজন জেনারেল ম্যানেজার থাকেন। তাঁর সাথে প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যক্ষ যোগ থাকে; কিন্তু বিভাগগুলির পরস্পরের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে না। সুতরাং এক বিভাগের সাথে অন্য বিভাগের যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে একমাত্র জেনারেল ম্যানেজারের মারফত তা করতে হয়।

গ. প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান থাকেন। তিনি নিজ বিভাগের কাজের ও বিভাগীয় সমস্ত কর্মচারীর কাজের জন্য জেনারেল ম্যানেজারের কাছে দায়ী থাকেন। বিভাগীয় প্রধানরা নিজেদের বিভাগের সর্বময় কর্তা হিসাবে তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ, যথা, কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ ও বরখাস্ত, কর্মিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা, উৎপাদন পরিকল্পনা, তদারক ইত্যাদি করেন।

ঘ. প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী আবার তাঁর উপর ন্যস্ত কার্যভার ও দায়িত্ব কয়েকটি ভাগে ভাগ করে, এক এক জন অধস্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর উপর তা ন্যস্ত করেন।

এইরূপে প্রতি পর্যায়ের বা স্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁর উপর ন্যস্ত কার্যভারের জন্য তাঁর অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর কাছে দায়ী থাকেন ও তাঁর অধস্তন ব্যক্তিগণের কাজের তদারক করেন। এই প্রকারের এই ব্যবস্থায় **ঊর্ধ্বতন স্তর থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত পরম্পরায় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব আংশিকভাবে অর্পিত হতে থাকে এবং ঐরূপে লব্ধ ক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়া, অধস্তন কর্মচারিগণের আর কোন কর্তব্য থাকে না।**

এইভাবে এত লম্ব রেখার ন্যায় পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা ও দায়িত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও সংগঠিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কার্যনির্বাহের ব্যবস্থা প্রচলিত হয় বলে একে সরলরৈখিক ব্যবস্থা বলে।

সরলরৈখিক ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মূলনীতি তিনটি: ১. প্রতি পর্যায়ে বা ধাপে শুধুমাত্র একজন ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকবে ও সর্বোচ্চ কর্মকর্তার কাছ থেকে শুধু তাঁর

81. Ad hoc.
82. Line Organisation.
83. Functional Organisation.
84. Line and Staff Organisation.
85. Line and Functional.
86. Committee Organisation.

নিকটই আদেশ আসবে। ২. প্রতি পর্যায়ে একমাত্র অব্যবহিত প্রধানের মারফতই তাঁর অব্যবহিত অধীন কর্মচারীদের আদেশ দেওয়া হবে। ৩. প্রতি ধাপে অধীন কর্মচারীদের সংখ্যা বেশি হবে না। নিচে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখান হলঃ
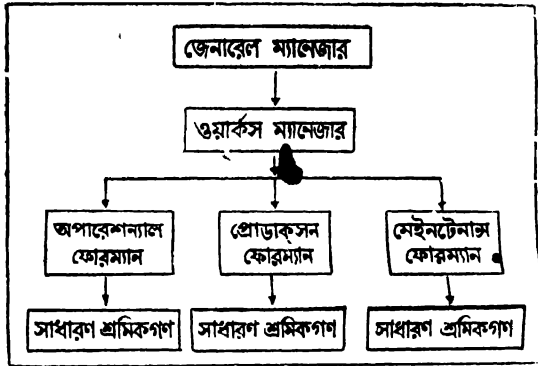
লাইন সংগঠনের সুবিধা ঃ ১. এটি একটি সহজবোধ্য পদ্ধতি। এতে কর্মিগণের কাজের তদারকির পদ্ধতি, উন্নতির পদ্ধতি এবং এক বিভাগের সাথে অন্য বিভাগের ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মিগণের মধ্যে সংযোগ সাধনের ব্যবস্থাটি সুস্পষ্ট।

২. এই ব্যবস্থাটি যেমন সহজবোধ্য তেমনি সরলও বটে। কারণ, এতে কে কার জন্য এবং কার কাছে দায়ী তা প্রত্যেকেরই সুস্পষ্টরূপে জানা থাকে।

৩. এতে প্রত্যেক অধস্তন কর্মচারী মাত্র একজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট দায়ী থাকে বলে, প্রত্যেক পর্যায়ে যে কোন সমস্যা বা করণীয় বিষয় সম্পর্কে যেমন শীঘ্র সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তেমনি তা শীঘ্র জানাও যায়। অর্থাৎ, এই পদ্ধতি দ্রুত কার্য সম্পাদনে সক্ষম।

৩. এতে প্রত্যেকের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কর্তব্য সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হয় বলে সংগঠনে কঠোর শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

লাইন সংগঠনের অসুবিধাঃ ১. এতে বিভাগীয় প্রধানগণকে সকল দিকে তদারকির ভার বহন করতে হয়, অথচ একই ব্যক্তি সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারে না। অর্থাৎ এই ব্যবস্থাতে বিশেষীকরণের স্থান নাই।

২. একমাত্র শীর্ষ স্তরে জেনারেল ম্যানেজারের মারফত ছাড়া বিভাগগুলির মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র না থাকায় তাদের কার্যাবলীর সর্বদা সমন্বয় ঘটে না।

৩. এতে প্রতি পর্যায়ে একজন মাত্র ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর উপর নির্ভর করা হয় বলে এবং তার হাতে সর্ব ক্ষমতা অর্পিত ও কেন্দ্রীভূত হয় বলে, এটি অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিনির্ভরশীল ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এটি স্বৈরাচারে পরিণত হতে পারে।

৪. বাস্তবে অতি অল্প সংখ্যক কারবারকেই অভ্যন্তরীণ ভাবে সুস্পষ্টরূপে পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগে বিভক্ত করা সম্ভব।

২. ক্রিয়াগত সংগঠন বা ফাংশন্যাল অর্গানিজেশন ঃ সরলরৈখিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের সংগঠন হল ক্রিয়াগত ব্যবস্থাপনা সংগঠন। মার্কিন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ টেলর সরলরৈখিক ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য এই নূতন ধরনের ব্যবস্থাপনা সংগঠনের উদ্ভাবন করেন। এর মূলনীতি এই যে, কারবারের প্রত্যেকটি ক্রিয়া[87] নির্বাহের ভার এক একজন বিশেষজ্ঞের উপর অর্পণ করা হয় এবং তিনি তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ও কর্মীদের তদারকি করেন। এর **বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ—**

87. Function.

ক. এতে ক্রিয়ানুযায়ী সমগ্র সংগঠনটিকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়। যথা, শ্রমিককর্মী নিয়োগ[৮৮], পরিকল্পনা[৮৯], ক্রয়[৯০], ব্যয় নিয়ন্ত্রণ[৯১], উৎপাদন[৯২], রক্ষণাবেক্ষণ[৯৩], বিক্রয়[৯৪], গবেষণা[৯৫] ইত্যাদি। এদের মধ্যে আবার প্রয়োজনানুযায়ী কোন কোন বিভাগের অধীনে কতকগুলি উপবিভাগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

খ. ক্রিয়ানুযায়ী সৃষ্ট প্রত্যেকটি বিভাগ একযোগে অন্যান্য সকল বিভাগের, অর্থাৎ সমগ্র সংগঠনের সেবা করে থাকে। যেমন, শ্রমিককর্মী নিয়োগ বিভাগের উপর অন্যান্য সকল বিভাগের শ্রমিককর্মী নিয়োগের ভার দেওয়া হয়, মেরামতি বিভাগ বা ক্রয় বিভাগ, অন্যান্য বিভাগগুলির যন্ত্রপাতি, কলকব্জা মেরামতির বা ক্রয়-বিভাগ সমগ্র সংগঠনের, অর্থাৎ বিভাগগুলির প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ভার নেয়, ইত্যাদি। সুতরাং এতে বিভাগগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপিত হয়।

এই সংগঠনের একটি রেখাচিত্র নিচে দেওয়া হলঃ
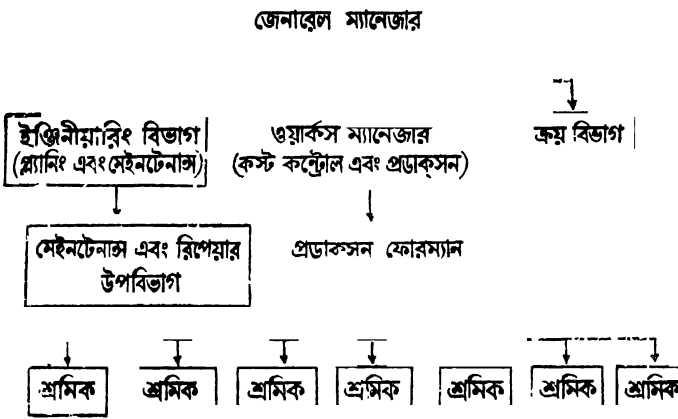
ক্রিয়াগত সংগঠনের সুবিধাঃ ১. এতে ক্রিয়ানুযায়ী বিভাগগুলি সৃষ্ট হয় বলে এটি বিশেষায়ণের সুবিধা সবিশেষ পরিমাণে ভোগ করে।

২. বিশেষায়ণের ভিত্তিতে বিভাগগুলি সংগঠিত বলে শ্রমিককর্মিগণের কর্মদক্ষতা দ্রুত বাড়ে।

৩. বিশেষায়ণ এবং শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি—এই দুইটি বিষয় মিলে এই পদ্ধতিকে ব্যাপক উৎপাদনের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী করেছে।

৪. এতে প্রত্যেক বিভাগ তার সমস্যা সমাধানে সরাসরিভাবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শের দ্বারা উপকৃত হয়।

৫. বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে বিভাগগুলির কাজের সংযোগ-সাধন ও সমন্বয়ের সুবিধা হয়।

৬. এতে মস্তিষ্কের কাজ (অর্থাৎ বিশেষজ্ঞগণ) থেকে কায়িকশ্রমে (অর্থাৎ সাধারণ শ্রমিকের কাজ) পৃথক করা হয় বলে বিশেষায়ণ বৃদ্ধি পায়।

ক্রিয়াগত সংগঠনের অসুবিধাঃ ১. অত্যধিক পরিমাণে বিশেষায়িত বিভাগগুলি একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অধীন হওয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় জটিলতা দেখা দেয়।

88. Personnel. 89. Planning. 90. Purchasing. 91. Cost Control.
92. Production. 93. Maintenance. 94. Sales. 95. Research.

২. নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট বিভাগীয় কর্মিগণের দায়িত্ব নির্দিষ্ট থাকে না বলে এতে কাজে শৈথিল্য ঘটতে ও শৃংখলা বিনষ্ট হতে পারে।

৩. এতে সম পদমর্যাদাসম্পন্ন ফোরম্যানগণের মধ্যে বিবাদ দেখা দেওয়ায় আশংকা থাকে।

৩ ॥ সরলরৈখিক এবং পদস্থ কর্মী ব্যবস্থা বা লাইন এন্ড স্টাফ অর্গানিজেশন ঃ সরলরৈখিক ব্যবস্থাপনার প্রধান দোষ এই যে, তাতে ক্ষমতা অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হয় ও ক্রিয়াগত ব্যবস্থাপনার প্রধান দোষ এই যে, তাতে অত্যধিক পরিমাণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। এই দুই ব্যবস্থার এই দুইটি প্রধান দোষ দূর করে তাদের উভয়ের সুবিধাগুলি ভোগ করার জন্য ঐ দুইটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সংমিশ্রণে সরলরৈখিক এবং পদস্থ কর্মী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য এতে উভয়ের বৈশিষ্ট্যগুলিই দেখতে পাওয়া যায়। এর মূল **বৈশিষ্ট্যগুলি** হল ঃ

ক. এতে একদিকে, সরলরৈখিক ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ন্যায় উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, প্রত্যেক পর্যায়ে একজন করে ভারপ্রাপ্ত কর্মী থাকে ও তাদের মারফত সর্বোচ্চ স্তর থেকে অধস্তন কর্মীদের কাছে আদেশ দেওয়া হয়।

খ. উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রতি পর্যায়ে বা ধাপে ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে সাহায্য করার জন্য স্টাফ অফিসার বা পদস্থ কর্মচারী নামে পরিচিত একাধিক বিশেষজ্ঞ কর্মী থাকে। এই সব স্টাফ অফিসাররা সকলেই সমপদমর্যদাযুক্ত এবং তাদের নিজেদের মধ্যে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন হিসাবে কোন শ্রেণীবিভাগ থাকে না। তাঁরা সকলে, যখন যে পর্যায়ে প্রয়োজন, সেখানে গিয়ে ঐ পর্যায়ের কার্যাবলী ও কার্যপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং ঐ ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

গ. পদস্থ কর্মচারী ব্যবস্থা, রৈখিক ব্যবস্থার উপর কোন কর্তৃত্ব করে না। এটি মূলত, রৈখিক ব্যবস্থার অনুপূরক।
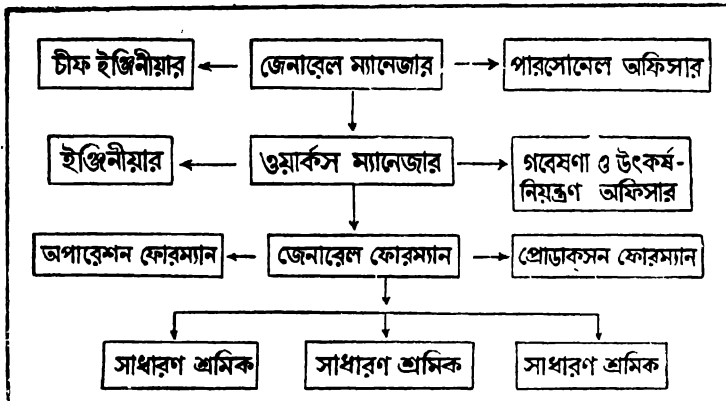
ঘ. পদস্থ কর্মচারিগণের কাজ হল ঃ—তথ্য ও সংবাদের বিশ্লেষণ[৯৬], সংবাদ সরবরাহ ও সেগুলির ব্যাখ্যা করা[৯৭], অনুসন্ধান ও গবেষণা[৯৮], নিয়ন্ত্রণে ও সংযোগসাধনে সহায়তা[৯৯], সাংগঠনিক বিষয়ে ও কার্যনির্বাহে সহায়তা[১০০], কার্যক্রম প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে সুপারিশ[১০১]। উপরে এই সংগঠনের রেখাচিত্র দেওয়া হল।

96. Analysis of facts and information.
97. Interpretation and services of information.
98. Investigation and Research.
99. Assistance in control and co-ordination.
100. Assistance in organisation and execution.
101. Recommendations for formulation of Pragrammes.

সুবিধা : ১. এতে সরলরৈখিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যাবতীয় সুবিধা, যথা—সহজবোধ্যতা, সরলতা, শীঘ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কাজে পরিণত করা এবং কর্তব্য, ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট নির্দেশজনিত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রভৃতি বজায় থাকে।

২. এতে ক্রিয়ানুগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যাবতীয় সুবিধা, যথা—বিশেষায়ণ, শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ লাভ প্রভৃতি ভোগ করা যায়।

অসুবিধা : ১. এর অসুবিধা এই যে এতে অনেক পদস্থ বিশেষজ্ঞ কর্মচারী প্রয়োজন হয়। সুতরাং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে ছাড়া অন্যত্র তা গ্রহণ করা যায় না।

২. কখনও কখনও বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে।

৪॥ সরল রৈখিক ও ক্রিয়াগত সংগঠন বা লাইন অ্যান্ড ফাংশন্যাল অর্গানিজেশন :

ক. বৈশিষ্ট্য : ১. এই জাতীয় সংগঠনে ক্রিয়াগত ভিত্তিতে পদস্থকর্মী বিভাগগুলি স্থাপিত হয়।

২. ইনস্‌পেকশন, টাইম স্টাডি, এমপ্লয়মেন্ট, পারচেজিং, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি বিশেষায়িত কাজগুলির[102] দায়িত্ব ক্রিয়াগত ভিত্তিতে স্থাপিত পদস্থ কর্মী বিভাগগুলির উপর দেওয়া হয়। এই কাজগুলি এমন যা বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই সহজে ও সুদক্ষভাবে সম্পাদিত হয়।

৩. সমগ্র সংগঠনটিই এইভাবে এমন রূপে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয় যে, কোনও কাজই বাদ যায় না আবার একই কাজের ভার একাধিক বিভাগের উপরও পড়ে না।

৪. ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন ভাবে শ্রম বিভাগের নীতিটি প্রয়োগ করা হয়, সংগঠনের কাজ নির্বাহের জন্য বিভিন্ন বিভাগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও তা অনুসরণ করা হয়।

৫. বিশুদ্ধ লাইন অ্যান্ড স্টাফ সংগঠনে পদস্থ কর্মীদের কাজকে একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার কাজ বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞরা শুধু পরামর্শদাতা বলে বিবেচিত হয় না। একাধিক বিভাগে যে সব কাজের প্রয়োজন হয়, তারা এক একজন সেগুলির ভারপ্রাপ্ত কার্য নির্বাহক রূপে কাজ করে।

খ. সুবিধা : ১. এই ব্যবস্থায় লাইন অ্যান্ড স্টাফ সংগঠন এবং ফাংশন্যাল সংগঠন, এই দুই ব্যবস্থার সুবিধাই ভোগ করা যায় অথচ তাদের অসুবিধাগুলি থাকে না।

২. এই ব্যবস্থায় প্রতিটি কর্মী বিশেষরূপে গড়ে ওঠে বলে সংগঠনেরও সম্প্রসারণ ঘটে।

৩. বিশেষায়ন ও মান অনুসারে কর্ম সম্পাদন দ্বারা এই ব্যবস্থায় বৃহদায়তনে উৎপাদন সহজ হয়।

৪. এই ব্যবস্থাটি যদি উপযুক্ত সীমার মধ্যে রাখা হয় তাহলে সহযোগিতার মারফৎ সংযোজন এবং নেতৃত্বের বিকাশ সহজেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

৫॥ কমিটি সংগঠন বা কমিটি অর্গানিজেশন : কমিটি হল নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের ভারপ্রাপ্ত একাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা। যৌথ আলোচনা ও যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল এর পরিচায়ক।

প্রয়োজনীয়তা : কারবারের সাফল্যের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য এবং "টিম স্পিরিট" বা এক হয়ে কাজ করার মনোভাব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই কারণে, ব্যবস্থাপনার সুদক্ষ কাঠামো রূপে লাইন স্টাফ বা লাইন অ্যান্ড ফাংশনাল ইত্যাদি যে সংগঠনই থাকুক না কেন, তার সাথে কমিটি সংগঠন বা কমিটি ব্যবস্থা প্রায়ই প্রচলিত হতে দেখা যায়। কমিটি গঠন ব্যবস্থার ফলে ব্যবস্থাপনা কর্মীদের

102. Specialised activities.

পক্ষে পরস্পরকে ভাল করে জানা এবং পরস্পরের বিভাগের বিভিন্ন সমস্যাগুলি উপলব্ধি করা সহজ হয় এবং পরস্পরের সহযোগিতায় তার সমাধানও সহজে খুজে বের করা যায়।

কমিটিগুলির প্রকারভেদ ঃ কমিটিগুলি স্থায়ী ও অস্থায়ী দু'রকমের হতে পারে। স্থায়ী কমিটিগুলিকে সাধারণত স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং অস্থায়ী কমিটিগুলিকে অ্যাড হক বা স্পেশ্যাল কমিটি বলে।

তাছাড়া, স্টাফ অথরিটি ও লাইন অথরিটি, এই দু'রকম ভিত্তিতে কমিটি গঠিত হতে পারে। স্টাফ অথরিটির ভিত্তিতে কমিটি গঠিত হলে তা পরামর্শদাতা কমিটি[১০৩] রূপে গণ্য হয়। কার্য সম্পাদনের ভার সে কমিটির থাকে না। সে কমিটি কেবল পরামর্শ দেয় ও সুপারিশ করে। যেমন, ফিনান্স কমিটি, ওয়ার্কস কমিটি, সেলস কমিটি প্রভৃতি। আর লাইন অথরিটির ভিত্তিতে কমিটি গঠিত হলে তাকে কার্যনির্বাহী কমিটি[১০৪] বলে গণ্য হয়। এই জাতীয় কমিটিগুলির সিদ্ধান্ত নেবার এবং তা কার্যকর করার ক্ষমতা থাকে। কোম্পানীরূপে গঠিত কারবারের পরিচালক পর্ষদ সর্বোচ্চ পর্যায়ের এরূপ একটি কার্যনির্বাহী কমিটি।

সুবিধা ঃ ১. এর দ্বারা ব্যবস্থাপনা কর্মীদের পরস্পরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একত্রিত করে কারবারের সেবায় লাগান সম্ভব হয়।

২. কর্মীদের সহযোগিতা লাভের জন্য সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।

৩. পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও কাজের সংযোজনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

৪. বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণের সুযোগ থাকে।

৫. কারবারের কাজে সকলের আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়।

অসুবিধা ঃ ১. এর ফলে কাজের গতিবেগ কমে যায়।

২. দীর্ঘ আলোচনায় সময় অযথা নষ্ট হয়।

৩. গোপনীয়তা বজায় থাকে না।

৪. ব্যবস্থাপনা কর্মীদের বিভিন্ন দল-উপদলের বা বিভিন্ন বিভাগের রেষারেষি দেখা দিলে শুধু তাদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অনেক সময় কমিটি ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়।

৫. অপ্রীতিকর পরিস্থিতির দায়িত্ব এড়ানোর জন্যও অনেক সময় কার্যনির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন।

৬. উদ্যোগের অভাব, অস্থিরচিত্ততা, দায়িত্বজ্ঞান হীনতা, সর্ব ক্ষেত্রেই আপস রফার মনোভাব এবং অর্থের অপচয় প্রভৃতি হল এর অন্যান্য কুফল।

ব্যবস্থাপনা কর্মিগণ MANAGEMENT PERSONNEL

ক্রয়, নিয়োগ, উৎপাদন, বিক্রয়, হিসাব রাখা ইত্যাদি নানা কাজ কিন্তু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন সাধারণ কাজের অন্তর্গত। ব্যবস্থাপনা বলতে এসকল কাজ বোঝায় না। ব্যবস্থাপনার কাজটি একটি আলাদা কাজ। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে ক্রিয়াকলাপের (function) দ্বারা একটি কারবারী প্রতিষ্ঠান তার যাবতীয় কার্যাবলীর নির্দেশ দান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকেই ব্যবস্থাপনা[১০৫] বলা যেতে পারে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা সবিশেষরূপেই একটি কার্যনির্বাহক ক্রিয়া বলে গণ্য হয়। এবং এর মূল কথা হল (প্রতিষ্ঠানটির) মানবিক প্রচেষ্টার সক্রিয় নির্দেশনা[১০৬]।

উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে বা পর্যায়ে অবস্থিত ভারপ্রাপ্ত বা নির্বাহী

103. Advisory Committee. 104. Executive Committee.
105. Management. 106. Active direction of human effort.

কর্মচারীদের নিয়ে কারবারের ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কাঠামো গঠিত হয়। তার [illegible] আছে ম্যানেজিংডিরেক্টার অথবা ম্যানেজার[১০৭]। মধ্যভাগে রয়েছে প্রডাকশন্ ওয়ার্কস ম্যানেজার, সেলস্ ম্যানেজার, পারচেজ ম্যানেজার, পারসোনেল ম্যানেজার প্রভৃতি। আর নিম্নভাগে সর্বনিম্ন ব্যবস্থাপনা কর্মীরূপে রয়েছে ফোরম্যানরা।

নিচে সংক্ষেপে ম্যানেজার, ওয়ার্কস ম্যানেজার ও ফোরম্যানের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

১. ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার[১০৮]: সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাপনার ও প্রত্যক্ষভাবে ম্যানেজারের কার্যাবলীকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, পরিকল্পনা প্রণয়ন[১০৯] বা সিদ্ধান্তগ্রহণ[১১০], সংগঠনকার্য ও সমন্বয় সাধন[১১১], শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ[১১২], নির্দেশনা ও তদারকি[১১৩] এবং নিয়ন্ত্রণ[১১৪]।

ক. পরিকল্পনা প্রণয়ন[১১৫]: কারবারী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য কি হবে, ঐ লক্ষ্য লাভ করার জন্য উৎপাদন, পণ্যমূল্য, নিয়োগ, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি সম্পর্কে কোন্ নীতি অনুসরণ করতে হবে, সেজন্য উৎপাদন, ভারার্পণ, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে কর্ম-পন্থা কি হবে, এবং সেজন্য অফিস ও শ্রমিককর্মী সম্পর্কিত কোন্ পদ্ধতিতে কাজে পরিণত করতে হবে—আগে থেকেই ম্যানেজারকে এসকল স্থির করতে হবে, অর্থাৎ এসকল বিষয় সম্পর্কে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

খ. সংগঠন কার্য ও সমন্বয় সাধন: পরিকল্পনা রচিত হওয়ার পর যাতে তা সুষ্ঠুরূপে কাজে পরিণত হয়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য আয়ত্ত করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ম্যানেজারকে তখন ঐ পরিকল্পনা কাজে পরিণতির জন্য যে সকল কাজ পরিচালনার প্রয়োজন হয় সেসবের প্রত্যেকটির নির্বাহের ভার দিয়ে এক একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করতে হয়। প্রতি বিভাগের শীর্ষে কর্তব্য, দায়িত্ব ও তদারকির ভারপ্রাপ্ত একজন করে উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বিভাগীয় ম্যানেজার বা বিভাগীয় কার্যনির্বাহক পদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়। সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয়, যেন ঐ সকল বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের ও তাদের অধীন বিভাগগুলির কাজের মধ্যে একটি সামগ্রিক সমন্বয় ও সংহতি বজায় থাকে।

গ. শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ: নির্ধারিত কাজগুলি যাতে নিরুপদ্রবে নির্বাহ হতে পারে সেজন্য সকল পদে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, কর্মীদের কর্মে উদ্যম সৃষ্টি, উপযুক্ত দক্ষ কর্মী বাছাই, কর্মিগণের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজও ম্যানেজারের দায়িত্বের অন্তর্গত।

ঘ. নির্দেশনা ও তদারকি: ম্যানেজারের স্থান হল তাঁর অধীনে বিভিন্ন অধস্তন পর্যায়ে অনেক ব্যবস্থাপনা সহকর্মী থাকে। এইসব কর্মীদের নির্দেশ দান প্রয়োজন, সহকর্মিগণের সহযোগিতা লাভের জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। একারণে নির্দেশদানের সঙ্গে সঙ্গে অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মিগণের কাজের তদারকি করাও দরকার। কিন্তু তদারকির অর্থ শুধু খবরদারী নয়। সহকর্মিগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য ও সহযোগিতা লাভের জন্য, তাদের প্রকৃত নেতা হওয়ার মত, কর্মদক্ষতা ও শ্রদ্ধাও তাঁকে অর্জন করতে হবে।

ঙ. নিয়ন্ত্রণ: সর্বোপরি, সকল বিভাগগুলির কার্যকলাপ ঠিক পথে, পরিকল্পনা-নুযায়ী চলেছে কিনা, তা দেখার জন্য ম্যানেজারকে অবিরাম বিভাগগুলির কাজের

---

107 Top Management. 108. Manager or General Manager.
109. Planning. 110. Decision making.
111. Organising and Co-ordinating. 112. Staffiing.
113. Directing and supervising. 114. Controlling.
115. Planning.

পুনরালোচনা, সম্পাদিত কার্যাবলীর পরিমাপ ও সেগুলোর আলোতে [illegible] সচেষ্ট থাকতে হয়; এই হল নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলী।

সুতরাং, এককথায়, ম্যানেজারের কাজ হল, প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভের জন্য তার সম্বল[১১৬] ও মানবিক শক্তি[১১৭]কে নির্ধারিত পথে চালনা করিয়ে নির্ধারিত কাজগুলি সম্পাদন করিয়ে নেওয়া।
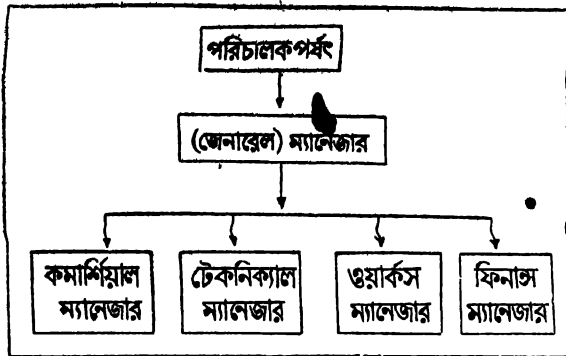
ম্যানেজার বা ম্যানেজারের কার্যপরিধি

২. **ওয়ার্কস ম্যানেজার**[১১৮] : যে পদস্থ ব্যবস্থাপনা কর্মচারী পণ্য প্রস্তুতকারী যাবতীয় বিভাগগুলির প্রধানরূপে তাদের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যানেজারের (বা জেনারেল ম্যানেজারের) বা কোথাও কোথাও পরিচালক পর্ষদের নিকট দায়ী থাকেন তাঁকে ওয়ার্কস ম্যানেজার বলা হয়। তিনি নির্ধারিত উৎপাদন কার্যক্রম[১১৯] অনুসারে উৎপাদন সম্পন্ন করা, কারখানার যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রমিককর্মিগণের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণের ও তদারকির ভারপ্রাপ্ত হন। কারখানা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য তিনিই দায়ী থাকেন। কোন কোন কারখানায় ওয়ার্কস ম্যানেজার নিজে ওয়ার্কস ইঞ্জিনীয়ার রূপে কাজ করতে পারেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওয়ার্কস ইঞ্জিনীয়ার ওয়ার্কাস ম্যানেজারের সহকারী রূপে কাজ করে থাকেন। ওয়ার্কস ম্যানেজারের কাজগুলি হল :

ক. কারখানার প্রধান কর্মচারী বা সর্বময় কর্তারূপে ওয়ার্কস ম্যানেজার তার পরিচালনা ও প্রশাসনিক ও প্রয়োজনীয় স্থলে পুনর্গঠনের ভারপ্রাপ্ত হন।

খ কারখানার উৎপাদনের পরিকল্পনা, বিভিন্ন বিভাগে যন্ত্রপাতির বিন্যাস[১২০], উৎপাদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পরিকল্পনা[১২১], উৎপাদন হার নির্ধারণ[১২২] ইত্যাদির ভার ওয়ার্কস ম্যানেজারের উপর ন্যস্ত হয়; তবে একাজে তিনি একজন প্ল্যানিং ইঞ্জিনীয়ারের সহায়তার উপর নির্ভর করেন।

গ. উৎপাদনের অগ্রগতি, নূতন ধরনের দ্রব্যাদি নির্মাণ, উৎপাদন বৃদ্ধি কাঁচামাল ও হাতিয়ার ক্রয় ও মজুদকরণ, হাতিয়ার ঘর[১২৩] উৎপাদিত দ্রব্যের মোড়ক বাঁধাই ও তা পাঠানো[১২৪], কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ইত্যাদি কাজের ভার তিনি তার অধীন পদস্থ কর্মচারী প্রগ্রেস ম্যানেজারকে অর্পণ করেন। উৎপাদন কার্যক্রম অনুযায়ী যাতে হাতিয়ার ও কাঁচামালের যোগান অব্যাহত থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই প্রগ্রেস ম্যানেজারের দায়িত্ব। ওয়ার্কস ম্যানেজার এর তদারকি করেন।

116. Resources. 117. Man power. 118. Works Manager
119. Production Programme. 120. Shop layout.
121. Process Planning. 122. Rate fixing.
123. Tool Room. 124. Packing and despatch.

ঙ. শ্রমিক কর্মীদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের কাজে একজন শপ্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওয়ার্কস ম্যানেজারের সহকারীরূপে নিযুক্ত থাকেন। তিনিই একাজের অধস্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

ঙ. কারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও হাতিয়ারগুলি যাতে সর্বোচ্চ কর্মক্ষম অবস্থায় সযত্নে রক্ষিত হয়, সেগুলির মেরামতির কাজ যাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হয় এবং যে সকল যন্ত্রপাতি পুরাতন ও কার্যক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে, উৎপাদনে যাতে তা কোন বিঘ্ন না ঘটাতে পারে সেজন্য যথা সময়ে তাদের স্থলে নূতন যন্ত্রপাতি বসান হয়—এসকল কাজের ভার ওয়ার্কস ম্যানেজারের কর্তব্যের অন্তর্গত।

চ. ক্ষুদ্রায়তন কারখানাতে ওয়ার্কস ম্যানেজারের আর একটি দায়িত্ব হল উৎপন্ন-দ্রব্যগুলির উৎকর্ষ ও নির্দিষ্ট মান বজায় সুনিশ্চিত করার জন্য অবিরাম নজর রাখা। একাজে একজন প্রধান পরিদর্শক কর্মচারী তাঁকে সাহায্য করেন।
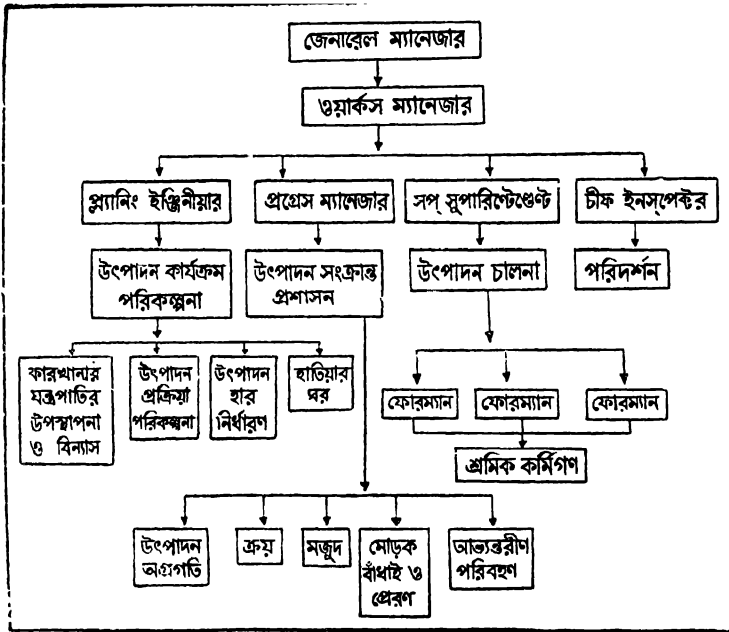
ওয়ার্কস ম্যানেজারের কার্যপারাধ

৩. **ফোরম্যান**[১২৫]ঃ কারখানা অর্থাৎ উৎপাদন সংগঠনে ফোরম্যান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। উচ্চতর স্তরে উৎপাদন সংক্রান্ত যে নীতি পরিকল্পনা, কার্যক্রম প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিসমূহ গৃহীত হয়, তা ফোরম্যানের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষভাবে কাজে পরিণত হয়। সুতরাং ফোরম্যানের সাফল্য, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার উপরই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

উৎপাদন সংগঠনে **ফোরম্যানের ভূমিকা তিন প্রকারের ঃ ১. ফোরম্যান** প্রতিষ্ঠানের **ব্যবস্থাপনা সংগঠনের একটি অংশ স্বরূপ**[১২৬]। কারণ একদিকে ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সর্বনিম্নস্তরে তাঁর হাত দিয়েই ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্তগুলি কাজে পরিণত হয় এবং অপর দিকে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ ঐ সকল ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্তকে অনেকাংশে

125. Foreman. 126. Part of management.

সাহায্য করে। ব্যবস্থাপনা কাঠামোর অংশ হিসাবে তাঁর প্রধান দায়িত্ব হল তাঁর অধীন শ্রমিকদের দিয়ে নির্ধারিত কাজগুলি সম্পন্ন করানো এবং তাদের কাজের তদারক করা।

২. **ফোরম্যান শুধু ব্যবস্থাপনা কাঠামোর অংশ নন, তিনি একজন কারিগরি বিশেষজ্ঞও**[127] বটে। নির্ধারিত কাজগুলি কোন্ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করলে সর্বনিম্ন খরচে সর্বাধিক উৎপাদন ঘটবে, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি সর্বাপেক্ষা কম হবে, কিরূপে উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বজায় থাকবে ও তা বাড়বে, কিরূপে বিভিন্ন স্তরে উৎপাদন প্রক্রিয়া, যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে নিতে হবে, ঐরূপ স্তর কয়টি হবে, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিশেষ জ্ঞান প্রতিষ্ঠানের পক্ষে

৩. **ফোরম্যান আবার তাঁর অধীন শ্রমিকগণের নেতাও**[128] বটে। ফোরম্যান মুখ্যত তাঁর অধীন শ্রমিক বাহিনীর চালক; কিন্তু শুধু আদেশ দিয়াই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয় না। সে আদেশ যথাযথরূপে যাতে পালিত হয় সেজন্য তাঁকে শ্রমিকগণের নিকট থেকে আনুগত্য ও সহযোগিতা অর্জন করতে হয়। এজন্য কি করতে হবে, তা যেমন তিনি বলে দেন, তেমনি তা কিভাবে করতে হবে, তাও তাঁকে প্রয়োজন হলে দেখিয়ে দিতে হয়। আর, সর্বদা শ্রমিকগণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকেন বলে ফোরম্যানকে শ্রমিকগণের সুবিধা অসুবিধার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয় এবং অসুবিধাগুলি শীঘ্র দূর করার ব্যবস্থা করতে হয়।

এবার তাঁর কর্তব্য ও কাজগুলি সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল।

১. **ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রতি কর্তব্য**: ক. একদিকে অধীন শ্রমিকগণকে ব্যবস্থাপকগণের সিদ্ধান্তগুলি জানানো ও অন্যদিকে শ্রমিকগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা, সুবিধা ও অসুবিধার কথা ঊর্ধ্বতন স্তরে পেঁছানো।

খ. নির্ধারিত পরিমাণ উৎপাদন সম্পন্ন করানো ও তার নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা।

গ. উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি ও অপচয় হ্রাসের জন্য নূতন নূতন পরিকল্পনা, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

ঘ. ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সম্পাদিত কার্যাবলীর যথাযথ বিবরণ রক্ষা করা ও প্রয়োজনানুযায়ী ঊর্ধ্বতন স্তরে বিবরণী পেশ করা।

২. **বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্তব্য**: ক. কারখানার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল বাছাইয়ের কাজে সাহায্য করা।

খ. যাতে অপচয় সর্বাপেক্ষা কম হতে পারে সেজন্য, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও কাঁচামাল সর্বোৎকৃষ্ট কায়দায় ব্যবহার করা।

গ. যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ব্যবহার ও শ্রমিকদের কাজ তদারক করা।

৩. **শ্রমিকগণের প্রতি কর্তব্য**: ক. প্রতিষ্ঠানের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে এবং নির্ধারিত কাজগুলি সঠিক পদ্ধতিতে সম্পাদনে শ্রমিকগণকে শিক্ষাদান করা। এবং শ্রমিকগণের পদোন্নতির জন্য তাদের প্রস্তুত করা।

খ. কারখানার অভ্যন্তরে সন্তোষজনক পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা, নিরাপত্তা ও উৎপাদন কার্যের সুষম গতি বজায় রাখা।

গ. শ্রমিকগণের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতা এবং শুভেচ্ছা সৃষ্টি করা ও বজায় রাখা।

ঘ. ঊর্ধ্বতন স্তরে শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং ন্যায্যভাবে যাতে তাদের মজুরি নির্ধারিত হয় সেজন্য তাদের উৎপাদনের হার ন্যায্যভাবে স্থির করা।

ঙ. উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সদাসর্বদা উন্নতির জন্য নানারূপ পরামর্শ দিতে শ্রমিকগণকে উৎসাহ দেওয়া।

---

127. An expert. 128. A leader.

চ. প্রত্যেকটি শ্রমিক যেন তার কর্মদক্ষতা অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে কাজের উদ্যোগ সৃষ্টি হয় সেজন্য চেষ্টা করা।
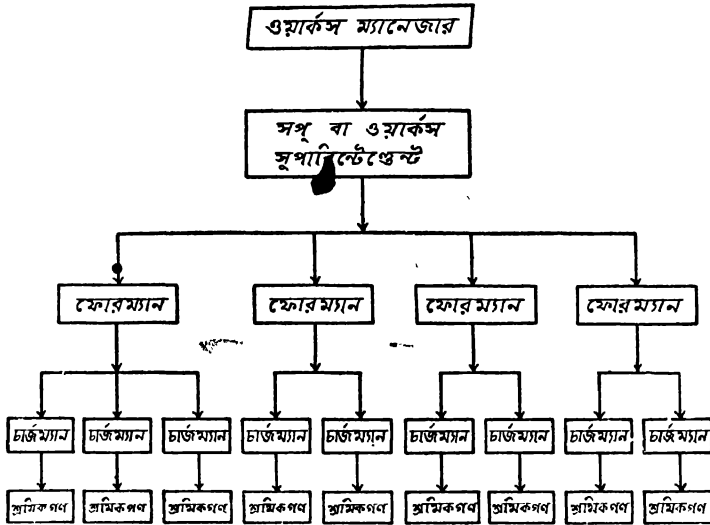
ফোরম্যানের কার্যপরিধি

পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া

THE PROCESS OF PLANNING & CONTROL

পরিকল্পনা কাকে বলে ঃ কারবারী ক্ষেত্রে, পরিকল্পনা হল ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজ। কি করা হবে, কিভাবে তা করা হবে, তা ভেবে চিন্তে আগে থেকে স্থির করার নামই হল পরিকল্পনা। একটা কাজ করার নানা রকম পন্থা থাকতে পারে। তার মধ্যে কোন পন্থায় কাজটি করা হলে তা সবচেয়ে কম খরচে ও ভালভাবে হবে এবং কাজটি সম্পাদনার নিশ্চয়তাও বেশি হবে তা বেছে নেওয়ার নামই পরিকল্পনা। কোনও ভবিষ্যত কাজের পরিকল্পনা করতে গেলে, কাজের পরিমাণটা কতটা, কখন, কোথায় এবং কার দ্বারা সে কাজ করাতে হবে, এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এইসব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং কারবারের লক্ষ্য অনুযায়ী কারবারের পলিসি বা কর্মনীতি ও পদ্ধতি অনুসারে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রচিত হয়।

পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ঃ ১. যে কোনও সংগঠনে পরিকল্পনা হল ফল লাভের দ্রুত ও কার্যকর উপায়। পরিকল্পনাতে ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্বানুমান করা হয় এবং সে অনুসারে তার ব্যবস্থা করা হয় বলে, পরিকল্পনা হল সংগঠনের ক্রমাগত উন্নতি ও সাফল্যলাভের হাতিয়ার।

২. কাজটি সম্পাদন করতে হলে কি কি পরিমাণে অর্থ, সময় ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন হবে তা স্থির করার মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা কাজের মানটি নির্ধারণ করে দেয়।

৩. এই মান নির্ধারিত না হলে, উচ্চতর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দ্বারা কারবারের কার্যাবলীর কার্যকর নিয়ন্ত্রণও সম্ভব নয়। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ নামক ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজটিও পরিকল্পনার উপর বিশেষভাবেই নির্ভরশীল।

কে পরিকল্পনা করে ঃ প্রত্যেকটি ব্যবস্থাপনা কর্মীকেই, তিনি ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ, মধ্যম অথবা নিম্নতর, যে স্তরের কর্মীই হোন না কেন, কাজের পরিকল্পনা

করতে হয়। বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিটি ব্যবস্থাপনা কর্মীই হলেন, একজন ব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক হিসাবে তাঁকে পরিকল্পনার সাহায্য নিতেই হয়। ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে যে পরিকল্পনা রচনা করা হয় তা যেমন মূলগত তেমনি তা ব্যাপক, সুদূর প্রসারী ও বুনিয়াদী। অধস্তন ব্যবস্থাপনা কর্মীরা যে পরিকল্পনা তৈরি করে তা তাদের আপন আপন কর্মের ও ক্ষমতার গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সর্বোচ্চ স্তর থেকে যতই নিচের দিকে নামা যায়, ও কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রের নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই পরিকল্পনার প্রকৃতির প্রয়োগ ক্ষেত্র, পরিধি ও গুরুত্ব কমতে থাকে। ম্যানেজিং ডিরেকটার ব্যস্ত থাকেন পরিকল্পনার সামগ্রিক দিক নিয়ে, ফোরম্যান ব্যস্ত থাকেন তার নির্ধারিত পরিমাণ উৎপাদন সম্পন্ন করার দৈনন্দিন পরিকল্পনা নিয়ে। অতএব, ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে যার স্থান যেখানেই হোক, সব ব্যবস্থাপকই পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকে। -

পরিকল্পনার উপাদান[129]: পূর্বানুমান[130], লক্ষ্য[131], কর্মনীতি[132], **কর্মসূচী**[133] ও কর্মপদ্ধতি[134] নির্ধারণ হল পরিকল্পনার উপাদান বা অঙ্গ।

১. **পূর্বানুমান**—পূর্বানুমান হল ভবিষ্যতে যে অবস্থা দেখা দিতে পারে তার হিসাব করা। ভবিষ্যতে প্রকৃতই কি ঘটবে তা কারো পক্ষেই আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। তবে, অতীতের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান অবস্থা বিচার করে ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তা কতকটা অনুমান করা যায়।

(১) সামগ্রিক অর্থনীতিক পরিস্থিতি, (২) সামগ্রিক অর্থনীতিক পরিস্থিতির মধ্যে যে অংশের সাথে কারবারটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, (৩) কারবারের উৎপন্ন দ্রব্যটির মোট চাহিদা, (৪) কারবারের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার, (৫) বিক্রয়ের সুযোগ সম্ভাবনা, এবং (৬) ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে হয়।

২. **লক্ষ্য নির্ধারণ**—সব পরিকল্পনার গোড়ার পরিকল্পনা হল লক্ষ্য নির্ধারণ করা, কাজের দ্বারা কোন ফলটি চাই তা স্থির করা। কিন্তু শুধু কারবারের সামগ্রিক বা মোট লক্ষ্য স্থির করলেই হয় না, সে লক্ষ্য পূরণের সহায়করূপে কারবারের প্রতিটি অংশের বা বিভাগের বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের লক্ষ্যগুলিও নির্ধারণ করতে হয়। লক্ষ্যহীন কারবার হল নোঙগরহীন নৌকার মত। তার অনির্দিষ্ট ভাবে ভেসে বেড়ানোই সার।

৩. **পলিসি বা কর্মনীতি নির্ধারণ**—কর্মনীতির কাজ হল লক্ষ্য লাভের উপযোগী কাজের বিধিব্যবস্থা করে এবং কারবারের কর্মীদের কর্মপ্রবাহকে সুনির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করে লক্ষ্যটিকে বাস্তবানুগ ভাষায় রূপদান করা। লক্ষ্য নির্ধারণের কাজ হল "কি করতে হবে" তা স্থির করা, আর কর্মনীতি নির্ধারণের কাজ হল সেটি "কিভাবে করতে হবে" তা স্থির করা। কর্মনীতি বা পলিসি কাজের সীমা রেখা বেঁধে দেয় আর সেই সীমারেখার মধ্যে থেকে সুনির্দিষ্ট পথে কারবারের কর্মধারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যলাভের দিকে এগিয়ে যায়। উচ্চতম কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত কর্মনীতিগুলি ব্যবস্থাপনা কর্মীদের কাছে পথ নির্দেশকের কাজ করে, কারবারের সামগ্রিক লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে অধস্তন কর্মীদের তা নিজের নিজের কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে।

৪. **কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ**: কর্মপদ্ধতির কাজ হল লক্ষ্য সাধনের পথে কারবারের কর্মধারাকে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যগুলিকে বিভক্ত উপবিভক্ত করা, লক্ষ্য লাভের প্রয়োজনীয় প্রতিটি সুনির্দিষ্ট কাজের সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ করা। এজন্য প্রতিটি কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি স্থির করতে হয়, স্থির করতে হয় সে পদক্ষেপগুলির কোনটি আগে এবং কোনটি পরে এবং কিভাবে সেগুলি সম্পাদন

129. Elements or Components of Planning. 130. Forecasting.
131. Objectives. 132. Policies. 133. Programmes. 134. Procedures.

করতে হবে। কারবারের সুষ্ঠু ও সংযোজিত কাজের স্বার্থে এইভাবে তার বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসংখ্য কাজগুলির সফলতার জন্য অসংখ্য কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয়। একথা মনে রাখা উচিত যে, কর্মনীতি আর কর্মপদ্ধতি এক জিনিস নয়। কর্মনীতির কাজ হল কর্মীদের চিন্তা ও কর্মে একটি ব্যাপক পথ নির্দেশ করা। বাস্তবে তা প্রয়োগ করতে গেলে তার একাধিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু কর্মপদ্ধতির কাজ হল কর্মনীতির দ্বারা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে কাজের সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশ করা; নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

৫. **কর্মসূচী প্রণয়ন**: নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি অনুসারে, নির্ধারিত কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে ক্রমিক পরম্পরায় সাজানো প্রয়োজনীয় কাজগুলির যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তারই নাম হল কর্মসূচী। কর্মসূচী হল কারবারী পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট বাস্তব-সাধ্য সুস্পষ্ট রূপ যা কর্মীদের সমবেত ও সংযোজিত কর্মধারায় বাস্তবে পরিণত হয়।

কারবারের কর্মনীতি[১৩৫]: যে কোনও সংগঠনে ব্যবস্থাপনার কাজকর্মের ভিত্তি হল তার কর্মনীতিগুলি। তার নানারূপ কর্মধারার মধ্যে সংযোজনা স্থাপনের উপায়। তার লক্ষ্য সাধনের পথনির্দেশিকা। সাধারণত, কারবারের প্রতিটি কাজকর্মের জন্য কতকগুলি করে কর্মনীতি নির্ধারণ করতে হয়। নিচে তার সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হল।

১. **উৎপাদন নীতি**[১৩৬]: উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করতে হয় তা হল,—(ক) কি কি উৎপাদন-প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হবে, (খ) উৎপাদন-প্রক্রিয়ার যন্ত্রীকরণ কতদূর অবধি করা হবে, (গ) উৎপাদনের পরিমাণ কতটা হবে, (ঘ) কি ধরনের গুণাগুণ সম্পন্ন এবং কি কি পরিমাণে কাঁচামালগুলি কেনা হবে, (ঙ) কিভাবে তা কেনা হবে, (চ) কিভাবে ঐসব কাঁচামালের যোগানদার বাছাই করা হবে, (ছ) কারিগরী গবেষণা কতটা পরিচালিত হবে, (জ) উৎপন্ন দ্রব্যের ডিজাইন কিরূপ হবে, (ঝ) দ্রব্য উৎপাদনের তদারকী ও উৎপন্ন দ্রব্যগুলি যাচাই করার ব্যবস্থা কী হবে, ইত্যাদি।

২. **বিক্রয়নীতি**[১৩৭]: যেসব বিষয় সম্পর্কে বিক্রয় নীতি নির্ধারণ করতে হয় তা হল, (ক) কোন কোন বাজারে এবং কোথায় কোথায় খরিদ্দারের পণ্যটি বিক্রি করা হবে, (খ) কোন্ কোন্ ধরনের কি কি পণ্য বিক্রি করা হবে, (গ) পণ্যের দাম কি হবে, কতটা পরিমাণে ব্যাজ[১৩৮] দেওয়া হবে, (ঘ) কি কি ভাবে পণ্যটি বিক্রয় করা হবে, (ঙ) কি ধরনের মোড়ক বাঁধাই করা হবে, (চ) ব্রান্ডের নাম কি হবে, (ছ) বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হবে এবং প্রচার বিজ্ঞাপনের নীতি কি হবে, ইত্যাদি।

৩. **অর্থ সংস্থান**[১৩৯]: (ক) স্থির পুঁজির ও কার্যকর পুঁজির পরিমাণ কি হবে, (খ) তাদের সূত্রগুলি কি হবে, (গ) মুনাফার কতটা কারবারে লগ্নী করা হবে, (ঘ) লভ্যাংশ বণ্টনের নীতি কি হবে, (ঙ) স্থির পুঁজির অবচিতি কি হারে করা হবে, (চ) কতটা পরিমাণে ধারে বিক্রয় করা হবে প্রভৃতি।

৪. **কর্মীনীতি**[১৪০]: (ক) কিভাবে প্রয়োজনীয় কর্মী বাছাই ও নিয়োগ করা হবে, (খ) কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কিরূপ হবে, (গ) মজুরি, বোনাস ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা কতটা দেওয়া হবে, (ঘ) কর্মীদের কাজের সময় ও শর্তাবলী কিরূপ হবে (ঙ) ছুটিছাটা, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে কিরূপ বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, (চ) শ্রমকল্যাণ ব্যবস্থাগুলি কিরূপ হবে, (ছ) শ্রমিক কর্মী সম্পর্ক রক্ষার বিধি ব্যবস্থা কি কি থাকবে ইত্যাদি সম্পর্কে নীতিগুলি হল শ্রমিককর্মী নীতির সমষ্টি।

135. Policies for Business. 136. Production Policies.
137. Sales policy. 138. Trade Discount. 139. Financing Policies.
140. Personnel Policies.

নিয়ন্ত্রণের অপরিহার্য ধাপ[141] **:** পরিকল্পনা ও কর্মসূচী অনুযায়ী সংগঠনের কাজগুলি যাতে পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে সম্পন্ন হতে পারে তা সুনিশ্চিত করাই হল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কাজের পথে কোথায় কোথায় বাধা বিঘ্ন ঘটছে তা খুঁজে বের করা, উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা দূর করার ব্যবস্থা করা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজগুলি শেষ করা এবং সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের এবং কর্মীদের সকলের কাজ যাতে সন্তোষজনক হয় তা সুনিশ্চিত করা—এই হল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কাজ।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পদক্ষেপ হল তিনটি—(১) মান স্থাপন[142]; (৩) সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন[143]; এবং (৩) বিচ্যুতির সংশোধন[144]।

১. মান স্থাপন : যে মাপকাঠিতে অর্থাৎ মানের দ্বারা কর্মীদের এবং গোটা সংগঠনের কাজের পরিমাপ ও মূল্যায়ন করতে হবে, তা নির্ধারণ ও স্থাপন করাই হল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রথম কাজ। কাজের এই মান নির্ধারিত না হলে, সম্পাদিত কাজগুলি স্বাভাবিক বা সচরাচর মানের কিংবা নিচু অথবা উঁচু মানের হয়েছে তা স্থির করা যায় না। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কাজের পরিকল্পিত কর্মসূচীর মধ্যে বা বাজেটের মধ্যে কাজের যে সাধারণ লক্ষণগুলি[145], প্রতিটি ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলি[146], খরচের যে বরাদ্দগুলি[147] এবং যে সময়সূচী[148] স্থির করে থাকেন, সেগুলিই, যে কাজ সম্পন্ন করা হবে তার মান হিসাবে গণ্য করা হয়। নিয়ন্ত্রণের অর্থই হল এইসব নির্ধারিত মান অনুযায়ী কাজগুলি সম্পন্ন করা।

সাধারণত যে সব মান ব্যবহার করা হয় তা হল, পরিমাণগত মান[149], গুণগত মান[150], খরচগত মান[151], আয়গত মান[152], পুঁজিগত মান[153] ও সময়গত মান[154] প্রভৃতি। নির্ধারিত কাজের পরিমাণ হল পরিমাণগত মান, কাজের যে উৎকর্ষ বজায় রাখতে হবে তা হল গুণগত মান, পরিকল্পনার মারফৎ বিভিন্ন কাজগুলির জন্য যে আনুমানিক খরচ স্থির করা হয় তা হল খরচগত মান, কাজগুলির মারফৎ যে পরিমাণ আনুমানিক আয় উপার্জনের লক্ষ্য স্থির করা হয় তা হল আয়গত মান, যে সময়ের মধ্যে কাজটি বা কাজগুলি সম্পন্না করতে হবে তা হল সময়গত মান, এবং সেজন্য যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করা হয় তা হল পুঁজিগত মান।

যে কোনও নির্দিষ্ট কাজের মূল্যায়ন করার জন্য একাধিক মান ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে। যেমন, উৎপাদন বিভাগের কাজের মূল্যায়নের জন্য একই সঙ্গে পরিমাণগত, গুণগত, খরচগত ও সময়গত মান ব্যবহার করা হতে পারে। আবার অফিসের কাজের মূল্যায়নের জন্য হয়ত সময়গত ও খরচগত মান ব্যবহার করা হতে পারে।

সম্পন্ন কাজগুলি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার মান ব্যবহার করা হয়। যেমন, ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তরের কর্মীরা সাধারণত খরচগত, আয়গত ও পুঁজিগত মান রক্ষা সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী। বিভাগীয় ব্যবস্থাপকরা বেশি আগ্রহী খরচগত, গুণগত, পরিমাণগত ও সময়গত মান রক্ষায়। আবার সেকশনগুলির ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকরা, যারা সাধারণ কর্মীদের বেশি কাছাকাছি অবস্থিত, তারা সময়গত ও পরিমাণগত মান বজায় রাখার জন্যই বেশি উৎসুক।

২. কাজের মূল্যায়ন—নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় ধাপ হল সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন অর্থাৎ পরিকল্পিত ও পূর্বনির্ধারিত মানগুলির মাপকাঠিতে সম্পাদিত কাজগুলির

141. Essential steps in Control. 142. Establishment of standards.
143. Evaluation of Performance. 144. Correction of Deviations.
145. Goals. 146. Targets. 147. Cost Schedules.
148. Time schedules. 149. Quantity or physical standard.
150. Quality standard. 151. Cost standard. 152. Revenue standard.
153. Capital standard. 154. Time standard.

বিচার করা। নির্ধারিত মান থেকে সম্পাদিত কাজগুলির তফাৎ কিছু হয়েছে কিনা কেবল তা বিচার করাই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নয়। সে তফাৎ হয়ে থাকলে তার কারণ নির্ণয় এবং প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করাও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য।

কারবারের অসংখ্য কার্যাবলীর প্রত্যেকটিই কোন না কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বটে, কিন্তু তার ফলে নিয়ন্ত্রণের খরচ কাজ সম্পন্ন করার খরচের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে। এই কারণে, নিয়ন্ত্রণের খরচ যথাসম্ভব কম রাখার জন্য, কাজের এমন কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বা বিন্দুতে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করা হয় যে তার ফলে কাজের সকল ক্ষেত্রই নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকে। বিক্রয়, উৎপাদন, খরচ ও বিনিয়োগ হল নিয়ন্ত্রণের এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

৩. **বিচ্যুতির সংশোধন**—নিয়ন্ত্রণের তৃতীয় ধাপ হল যে সব ক্ষেত্রে কাজগুলি অসন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়, কাজ শেষ হওয়ার আগেই তা সংশোধন করে ত্রুটিগুলি দূর করার ব্যবস্থা করা। এই কারণে, কাজের ত্রুটি সময় থাকতে দূর করতে হলে, নিয়ন্ত্রণের কাজটি অবিরাম ও অব্যাহত থাকা চাই, কাজটি সফলভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পিছনে ব্যবস্থাপকদের লেগে থাকা চাই এবং যে ব্যবস্থাপকদের উপর নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হবে তারা যাতে কাজগুলি সংশোধনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হতে পারে সেজন্য তাদের যথেষ্ট কর্তৃত্ব-ক্ষমতাও দিতে হবে। অনেক সংগঠনে কর্তৃত্ব-ক্ষমতা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত থাকে। এই জাতীয় ব্যবস্থাপনা সংগঠনে সংশোধনের ব্যবস্থাগুলির নির্দেশ আসে একেবারে উপরতলা থেকে। তাতে নিচের তলায়, যেখানে সংশোধনের কাজটি সম্পাদিত হবে সেখানে সে নির্দেশ পৌঁছতে প্রায়ই বিলম্ব হয় এবং সংশোধনের কাজটি তার ফলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এইজন্য, যে কর্মীরা কাজটি সম্পন্ন করছে তাদের কাছাকাছি অবস্থিত এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থাপনা কর্মীর উপরই সংশোধন করার উপযুক্ত কর্তৃত্ব-ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার[১৫৫]: আধুনিক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের হাতে নিয়ন্ত্রণের যেসব হাতিয়ার এসেছে তা হল—

১. **বাজেটগত নিয়ন্ত্রণ**[১৫৬]—এর কাজ হল সংগঠনের বিভিন্ন সেকশন সম্পর্কে নানারূপ পরিমাণগত তথ্য সরবরাহ করা।

২. **খরচগত নিয়ন্ত্রণ**[১৫৭]—এর কাজ হল ব্যবস্থাপককে তার উপর ন্যস্ত কাজের জন্য খরচের সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং সে সীমা যাতে লঙ্ঘন করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৩. **আর্থিক নিয়ন্ত্রণ**[১৫৮]—এর উদ্দেশ্য হল কারবারের আয়ব্যয়ের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা।

৪. **পরিসংখ্যানগত নিয়ন্ত্রণ**[১৫৯]—এর উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যানগুলি ঠিক সময়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা।

৫. **কাজের পরিমাপ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ**[১৬০]—এটির সাহায্যে কাজগুলি ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হয়।

৬. **গুণগত নিয়ন্ত্রণ**[১৬১]—কাজের নির্ধারিত মান সুনিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য।

৭. **প্রামাণিক তথ্যপঞ্জী প্রণয়ন**[১৬২] **বা 'ডকুমেন্টেশন'**—এর কাজ হল প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদগুলি নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকদের হাতের কাছে সহজে ব্যবহারযোগ্য রূপে উপস্থিত করা।

155. Tools of control. 156. Budgetary control. 157. Cost control.
158. Financial control. 159. Statistical control.
160. Work measurement and production control.
161. Quality control. 162. Documentation.

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও শিল্পসংস্কার
SCIENTIFIC MANAGEMENT & RATIONALISATION

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
SCIENTIFIC MANAGEMENT

সংজ্ঞা, অর্থ ও প্রয়োগ ক্ষেত্র
DEFINITION, MEANING AND SCOPE

শব্দটির সংজ্ঞা ও অর্থ ঃ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা হল "অন্যান্যদের প্রচেষ্টার মারফৎ কাজ করিয়ে নেওয়া" এবং উৎপাদনশীল কাজকর্মগুলির মধ্যে সংযোজনা প্রতিষ্ঠা। কিন্তু "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা"-র সংজ্ঞা এত সহজে দেওয়া কঠিন। তবে, সংক্ষেপে বলা যায়, **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হল চিন্তার এমন একটি ধারা, এমন একটি মনোভাব যা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কর্মরীতি[1] প্রয়োগ করার চেষ্টা করে।** টেলরের[2] মতে, "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সারবস্তু হল এমন একটি দর্শন (বা দৃষ্টিভঙ্গী) যার মধ্যে ব্যবস্থাপনার চারটি মহৎ নীতির মিলন ঘটেছে ঃ প্রথমটি হল, একটি প্রকৃত বিজ্ঞানের বিকাশ (শিল্প সংক্রান্ত কার্যাবলীর সুশৃঙ্খল অনুধাবন ও বিশ্লেষণ)। দ্বিতীয়টি হল, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শ্রমিককর্মী বাছাই করা। তৃতীয়টি হল, শ্রমিক-কর্মীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বিকাশের ব্যবস্থা। চতুর্থটি হল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা।" এখানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাকে একটি চিন্তাধারা রূপে, একটি বিশেষ দর্শন রূপেই টেলর জোর দিয়েছেন।

পারসন[3] আরও পরিষ্কার করে বলেছেন, "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলতে উদ্দেশ্য-পূর্ণ যৌথপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত এমন রূপ ও পদ্ধতি বিশিষ্ট সংগঠনকে বোঝায় যা প্রচলিত রীতি কিংবা কেবল অভিজ্ঞতা প্রসূত ও সাময়িকভাবে পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার দ্বারা নির্ধারিত কর্মনীতির উপর নির্ভর না করে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভূত নীতি বা বিধির উপর নির্ভর করে।" এই সংজ্ঞাতে পারসন সঠিকভাবেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার এই প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন ঃ (১) এর বিষয়বস্তু হল কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টা নয়, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পন্ন সকলের যুক্ত বা সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা। (২) এর বিষয়বস্তু হল এক ধরনের সংগঠন ও পদ্ধতি। (৩) এতে কতকগুলি মূলনীতি বা বিধি অনুসৃত হওয়া উচিত। (৪) এই মূলনীতি বা বিধিগুলি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে রচিত।

প্রয়োগ ক্ষেত্র ঃ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূলনীতিগুলি সকল প্রকারের কারবারী সংস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের কাজকর্মের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তা প্রয়োগ করা যায় না। টেলর বলেছেন, "আমাদের গৃহস্থালীতে ব্যবসায়ীদের ছোট ও বড় ব্যবসার ব্যবস্থাপনায়, গির্জার, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের, বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমাদের সরকারের বিভাগগুলির কাজেও তা প্রয়োগ করা যায়।"

1. Scientific methods and practices.
2. F. W. Taylor. 3. H. S. Person.

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্পের সুযোগ এবং উৎপাদনের মাত্রা যখন অভূতপূর্ব রূপে বেড়ে গেল তখন সেই সাথে দেখা দিল বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলির সুদক্ষ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার এবং নিয়োগকর্তা ও নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সমস্যা। এই সমস্যাগুলির সমাধানই হল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে[4] আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার ও উদ্ভাবক এফ. ডবলু. টেলর (১৮৫৬-১৯১৫)। সাধারণ শ্রমিক থেকে তিনি একটি ইস্পাত কারখানার প্রধান ইঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নতি লাভ করেছিলেন।

টেলরের প্রায় সমসাময়িক যাঁরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গ্যান্ট[5], গিলব্রেথ[6], হ্যাথাওয়ে[7], এবং এমাবসনের[8] নাম উল্লেখযোগ্য। তবে, টেলর, গ্যান্ট (১৮৬১-১৯১৯) এবং গিলব্রেথ-কেই (১৮৬৮-১৯২৪) "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা"র প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয় এবং টেলর-কে বলা হয় "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা"-র জনক।

টেলর নিজে কিন্তু "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা" শব্দটি উদ্ভাবন করেননি। টেলরের মতবাদ প্রথমে "টেলরবাদ"[9] নামে পরিচিত হয়েছিল। ১৯১০ সালে ব্রাণ্ডিজ[10] (পরে বিচারপতি) প্রথমে এ প্রসঙ্গে "সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট" বা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কথাটি ব্যবহার করলে, অল্প কালের মধ্যেই তা সর্বত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরে টেলরও "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূলনীতি" নামে বইটি প্রকাশ করেন (১৯১১)।

টেলর যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক নামে পরিচিত তার কারণ, প্রথমত তিনিই সর্বপ্রথম কারখানার মধ্যে[11] বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্রধানত তাঁরই প্রতিভাবলে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নামে একটি সম্পূর্ণ নূতন জ্ঞান মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারে সংযুক্ত হয়। তৃতীয়ত, প্রবল বিরোধিতার মুখে তিনি এই নূতন চিন্তাধারা প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করে একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ইংলণ্ডের তুলনায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই মতবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করে। ফ্রান্সে টেলরের অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন ফেয়ল[12] (১৮৪১-১৯২৫)। সাম্প্রতিক কালে ভারত সহ পৃথিবীর নানা দেশেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মতবাদটি উৎসাহভরে প্রচারিত হচ্ছে। এর ফলে, উৎপাদন কর্মে উৎপাদনের কার্যাবলীর যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কারখানার মধ্যে বিঘ্নহীন ও সংযোজিত কর্মধারা সুনিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের প্রাধান্য বেড়েছে, শিল্প-মনস্তত্ত্ববিদদের উদ্ভব হয়েছে, উদ্ভব হয়েছে শ্রমিক-কর্মী-ব্যবস্থাপকের এবং শিল্পের মধ্যে কর্মে নিযুক্ত অবস্থায় কর্মীদের আরও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার এবং আরও নানা আধুনিক বিকাশের।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উপাদান
ELEMENTS OF SCIENTIFIC MANAGEMENT

(১) পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান[13], (২) পরিকল্পনা ও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে কর্মীদের মধ্যে কাজের বণ্টন[14], (৩) বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় শ্রমিক-কর্মী বাছাই, প্রশিক্ষণ ও পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা[15], (৪) কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও কাজের অবস্থার মান প্রবর্তন[16], (৫) ক্রিয়াগত ফোরম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা[17],

---

4. In the 1880s. 5. H. L. Gantt. 6. F. B. Gilbreth.
7. H. K. Hathaway. 8. H. Emerson. 9. Taylorism.
10. L. D. Brandies. 11. At the workshop level. 12. Henri Fayol.
13. Experimentation and scientific investigation.
14. Planning and scientific allotment of task.
15. Scientific selection, training and remuneration of workers.
16. Standardisation of material, machines and equipments and working conditions. 17. Functional Foremanship.

(৬) উপযুক্ত কস্ট অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থা[18], এবং (৭) মানসিক বিপ্লব[19]—এই সাতটিকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উপাদান বা ভিত্তি বলা হয়।

১. পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান—সদাসর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করা হল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জীবনীশক্তি। এর ফলে দক্ষতা বাড়ে ও অপচয় কমে। যে কোনও একটি কাজ করার বিবিধ বিকল্প পন্থাগুলির বিশ্লেষণ, অনুধাবন, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করে কোনটি সবচেয়ে বেশি দক্ষ পন্থা তা খুঁজে বের করা ও প্রবর্তন করাই হল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাফল্যের চাবিকাঠি। এজন্য যে তিন রকমের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, অনুধাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে তা হল—(ক) টাইম স্টাডি, (খ) মোশন স্টাডি ও (গ) ফ্যাটিগ স্টাডি।

(ক) টাইম স্টাডি[20] (কাজের সময় অনুধাবন)—এর মূল কথা হল কোনও একটি কাজ সমাধা করতে বিভিন্ন শ্রমিক-কর্মীর প্রকৃত পক্ষে কতটা করে সময় লাগে তা অনুসন্ধান করা ও তার ভিত্তিতে শ্রমিকদের "স্ট্যান্ডার্ড কাজ"[21] নির্ধারণ করা। এজন্য শিল্পোৎপাদন সংক্রান্ত প্রতিটি কাজ[22]-কে বিশদভাবে কতকগুলি ভাগে ভাগ করে তার প্রত্যেকটি সম্পাদন করতে বিভিন্ন শ্রমিক-কর্মীর প্রকৃতপক্ষে কতটা করে সময় লাগে তা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে হয়। কিমব্যাল ও কিমব্যাল[23]-এর কথায়, "মুখ্যত, টাইম স্টাডি হল শিল্পোৎপাদন সংক্রান্ত কাজকর্মের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ করতে যে সময় লাগে তা পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার কলা-কৌশল[24]।" টাইম স্টাডি সম্পর্কে টেলরের অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

এটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে কোন্ কর্মীটি দক্ষ আর কোন্‌টি অ-দক্ষ তা খুঁজে বের করা যায় এবং অ-দক্ষ শ্রমিকটিকে দক্ষ করে তোলার সমস্যাটির সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।

টাইম স্টাডি করতে গিয়ে যে বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হয় তা হল—(১) যে শ্রমিকদের কাজের সময় পর্যবেক্ষণ করা হবে তারা যেন গড়পড়তা ও স্বাভাবিক সাধারণ দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, অতি সুদক্ষ কিংবা অতি মোটা বুদ্ধি না হয়; (২) এই অনুধাবনের ভিত্তিতে যে স্ট্যান্ডার্ড কাজ নির্ধারিত হবে তা কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হতে পারে; (৩) শিল্প অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড কাজ এক এক রকমের হবে; (৪) যার উপর শ্রমিকদের কাজের সময় কতটা লাগে তা লক্ষ্য করার ভার দেওয়া হবে সে যেন পক্ষপাতিত্বহীন হয়; এবং (৫) কাজটি করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও যে আকস্মিক এবং অনিবার্য দেরী হতে পারে তাও হিসাবে ধরতে হবে।

(খ) মোশন স্টাডি[25] (কাজের নড়াচড়া অনুধাবন)—কোনও একটি কাজ করার সর্বশ্রেষ্ঠ কায়দা নির্ধারণ করার জন্য যে পদ্ধতি নিয়োগ করা হয় তাকে মোশন স্টাডি বলে। যে কোনও কাজ সম্পাদন করার পক্ষে সবচেয়ে সুদক্ষ উপায় কোনটি তা নির্ধারণ করার জন্য, একজন মেশিন চালকের কিংবা একটি মেশিনের কোন ধরনের নড়া-চড়াগুলি[26] সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় তা খুঁজে বের করার জন্য কাজের সময় শ্রমিক ও যন্ত্রের নড়াচড়াগুলি লক্ষ্য ও অনুধাবন করা ও তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতে হয়। এ সম্পর্কে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য স্টপ-ক্লক[27] কিংবা মাইক্রো-ক্রনোমিটারের[28] সাহায্যে সংগ্রহ করে ও তা বিশ্লেষণ করে দরকারী এবং অ-দরকারী নড়াচড়াগুলি স্থির করতে হয়। তারপর শ্রমিক ও যন্ত্রের অ-দরকারী নড়াচড়াগুলি বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা

18. Suitable Cost Accounting. 19. Mental Revolution.
20. Time Study. 21. Standard Task. 22. Industrial Operation.
23. Kimball and Kimball. 24. Art. 25. Motion study.
26. Motions. 27. Stop-clock. 28. Micro-chronometer.

করা হয়। এইভাবে কর্মশক্তির অপচয় বন্ধ করে কাজের গতিবেগ বাড়ানো হয় এবং সবচেয়ে সুদক্ষভাবে কাজটি সম্পাদনের কায়দা নির্ধারণ করা হয়।

মোশন স্টাডির ক্ষেত্রে গিলব্রেথ-এর অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মানুষের যে কোনও কাজে কর্মে মানব দেহের ১৭টি মৌলিক নড়াচড়া লক্ষ্য করা যায়।

(গ) ফ্যাটিগ স্টাডি[২৯] (কাজের ক্লান্তি অনুধাবন)—অতিশয় দ্রুত গতিতে, শ্রমিক-কর্মীদের বারংবার একই রুটিন মাফিক, একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর কাজ করে যেতে হয় বলে তারা কাজ করতে করতে অল্পকালের মধ্যেই ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়। এর ফলে তাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, দক্ষতা কমে, মালিকেরও উৎপাদন কমে। এজন্য টেলর বলে-ছিলেন, শ্রমিকদের ক্লান্তির সমস্যা সমাধান করার জন্য, "কাজ ও বিশ্রাম, এই দুয়ের মধ্যে সময়ের উপযুক্ত সামঞ্জস্য ও বণ্টন করা প্রয়োজন।" ফ্যাটিগ স্টাডির মূল কথাও তাই। এই উদ্দেশ্যে কাজের যে কোনও একটি বিশেষ অবস্থায়, অক্লেশে শ্রমিক-কর্মীরা একটানা কত ঘণ্টা কাজ করতে পারে, এবং কখন এবং কতটুকু বিশ্রাম তাদের প্রয়োজন তা বিশেষভাবে অনুধাবন করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্থির করতে হয়।

টাইম স্টাডি, মোশন স্টাডি ও ফ্যাটিগ স্টাডির দ্বারা যে **সুফল** পাওয়া যায় তা হল, (১) সময় ও কর্মশক্তির অপচয় দূর করে এবং (২) ক্লান্তির সমস্যা সমাধান করে, (৩) স্ট্যান্ডার্ড কাজ নির্ধারণ ও (৪) কাজ সম্পাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কায়দা নির্ণয় করে, (৫) উৎপাদনের দক্ষতা ও (৬) উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং (৭) উৎপাদনের খরচ হ্রাস করা সম্ভব হয়।

আধুনিক টেকনিকঃ সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আই এল ও)[৩০] জনৈক বিশেষজ্ঞ টেলরের টাইম স্টাডিকে আরও উন্নত করে তা "ওয়ার্ক মেজারমেন্ট"[৩১] বা কাজের সময় পরিমাপ-এ ও গিলব্রেথের মোশন স্টাডিকে আরও বিকশিত করে "মেথড স্টাডি"[৩২] বা উৎপাদন পদ্ধতি অনুধাবন-এ পরিণত করেছেন। এই দুটিকে এখন এক কথায় "ওয়ার্ক স্টাডি"[৩৩] বা কাজের অনুধাবন বলে।

টাইম স্টাডি ও মোশন স্টাডির মধ্যে সম্পর্ক ঃ গিলব্রেথ-এর মতে টাইম স্টাডির আগে মোশন স্টাডি না করা হলে, টাইম স্টাডি কাজে লাগে না। মোশন স্টাডির দ্বারা সবচেয়ে ভাল অবস্থায় শরীরের নড়াচড়াগুলি লক্ষ্য করে, কাজের স্ট্যান্ডার্ড মোশনগুলি অর্থাৎ অপরিহার্য নড়াচড়াগুলি নির্দেশ করা হয়। তারপর টাইম স্টাডির দ্বারা নির্ধারিত কাজটি সম্পাদনে বিবিধ নড়াচড়াগুলির মধ্যে কোনটিতে সবচেয়ে কম সময় লাগে তা নির্ধারণ করার দরকার হয়। অতএব টাইম ও মোশন স্টাডি পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি সার্থক হয় না।

২. **পরিকল্পনা ও কাজের বৈজ্ঞানিক বণ্টন**—কারখানায় শিল্পোৎপাদনের যাবতীয় কাজকর্মের ধারাবাহিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, কি কাজ করতে হবে, কি ভাবে তা করতে হবে, কখন তা করতে হবে এবং কোথায় তা করতে হবে, এতটা বিশদ করেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এ দায়িত্ব মুখ্য ব্যবস্থাপকের। এর ফলে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া সহজ হয়। কাজ ভাগ ও নির্দিষ্ট করে দিতে গিয়ে দেখতে হবে যেন, প্রত্যেকটি কাজের ভার এমন কর্মীকেই দেওয়া হয় যে তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মানসিক ঝোঁকের দিক থেকে সে কাজটির জন্য গোটা কারখানার মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত। দেখতে হবে যেন, কর্মীটি কাজের পক্ষে এবং কাজটিও কর্মীটির পক্ষে উপযুক্ত হয়। উভয়ে যেন উভয়ের সাথে খাপ খায়।

---

29. Fatigue study. 30. International Labour Organisation (ILO).
31. Work Measurement. 32. Method Study. 33. Work Study.

৩. **শ্রমিক-কর্মীদের বাছাই, প্রশিক্ষণ ও পারিশ্রমিক—(ক) বাছাই:** প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত শ্রমিক-কর্মী বাছাইয়ের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা নষ্ট হবে। সেজন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রমিক-কর্মী বাছাই করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে শ্রমিক-কর্মী বিভাগ স্থাপন করা এবং কর্মপ্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(খ) **প্রশিক্ষণ:** অতি সন্তোষজনকভাবে কর্মী বাছাই করা হলেও নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মীদের যদি ধারাবাহিকভাবে উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত না থাকে তাহলে সংস্থার পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত ফলটি না-ও পাওয়া যেতে পারে। কাজের ভুল পদ্ধতি দূর করা, কারখানার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং সবচেয়ে সুদক্ষভাবে কি করে কাজটি করতে হয় তা শেখার জন্য এর অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে।

(গ) **পারিশ্রমিক:** কিন্তু ধারাবাহিক বিজ্ঞানসম্মত ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সুনিশ্চিত না-ও হতে পারে। এজন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক-কর্মীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে সুদক্ষভাবে কাজ করার জন্য শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে যাতে উৎসাহ ও আকর্ষণ থাকে সেজন্য তাদের মজুরি সংক্রান্ত প্রণোদনা[৩৪]-র ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অর্থে এবং জিনিসপত্রে, দু'রকম ভাবেই প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। টেলরের মতে গড়পড়তা শ্রমিকের তুলনায় একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি শতকরা ৩০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি হওয়া উচিত।

৪. **মান প্রবর্তন**—ব্যবহৃত কাঁচামাল ও দ্রব্যসামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এবং কাজের অবস্থার সুনির্দিষ্ট মান প্রবর্তন করা না হলে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হবে।

(ক) কাঁচামাল ও দ্রব্যসামগ্রীর মান প্রবর্তনের অর্থ হল সুনির্দিষ্ট মানের ও সর্বোৎকৃষ্ট ধরনের কাঁচামাল ও দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করা। তা না হলে শ্রমিকের সময় ও কর্মশক্তির ও যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতার অপচয় হবে, উৎপন্নদ্রব্য বা সেবার গুণাগুণ একরকমের হবে না, উৎপাদন সর্বাধিক হবে না এবং খরচ বেশি হবে।

(খ) যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের মান প্রবর্তনের অর্থ হল একই গুণাগুণ সম্পন্ন নির্দিষ্ট মানের যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম ব্যবহার। এজন্য সযত্নে তা বাছাই, রক্ষণাবেক্ষণ ও সে সবের তদারক করতে হয়। তা না হলে বাজারে প্রচলিত মানের দ্রব্যসামগ্রী ("স্ট্যান্ডার্ড গুডস") উৎপাদন করা সম্ভব হবে না।

(গ) কাজের অবস্থার মান প্রবর্তনের অর্থ হল, কারখানার সর্বত্র মোটামুটি একই রকমের, এবং বলা বাহুল্য উৎকৃষ্ট ধরনের আলো, বাতাস চলাচল, তাপমাত্রার, তাপ নিয়ন্ত্রণের, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের, শ্রমিকদের কাজের জায়গার ও দুর্ঘটনা থেকে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই এবিষয়ে অবহেলা দেখা যায়। অথচ, এই ব্যবস্থাগুলি না হলে কার্যরত শ্রমিকদের সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখা যায় না এবং তার ফলে দক্ষতা নষ্ট হয়।

৫. **ক্রিয়াগত ভিত্তিতে ফোরম্যান নিয়োগ ব্যবস্থা**—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সুদক্ষভাবে তদারকির[৩৫] গুরুত্বও কম নয়। এই উদ্দেশ্যে টেলর "ক্রিয়াগত ভিত্তিতে ফোরম্যান" নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর অর্থ হল, শ্রমিক-কর্মীদের কাজ তদারক করার কাজটি কয়েকটি বিশেষায়িত ক্রিয়া[৩৬] অনুসারে ভাগ করে সেই ভিত্তিতে এক একটির ভার এক একজন ফোরম্যান বা তদারককারী ঊর্ধ্বতন কর্মীর

34. Wage incentives. 35. Specialised and skilled supervision.
36. Specialised Functions.

উপর ন্যস্ত করা। এইরূপে নিযুক্ত প্রত্যেক ক্রিয়াগত ফোরম্যানকে তার কর্তব্য পালনের জন্য পূর্ণ কর্তৃত্ব-ক্ষমতা দেওয়া হয়। টেলর আট রকমের ক্রিয়াগত ফোরম্যানের কথা বলেছিলেন। যথা,—

(ক) গ্যাং বস[37]-এর কাজ হল প্রতিটি শ্রমিককে কাজ এবং সেজন্য দরকারী হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা তা দেখা এবং দরকার হলে কিভাবে কাজটি করতে হবে তা দেখিয়ে দেওয়া।

(খ) স্পীড বস[38]-এর কাজ হল প্রত্যেকটি শ্রমিক সর্বাধিক সম্ভব গতিতে কাজ করছে কিনা ও সেজন্য ঠিক ঠিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে কিনা তা দেখা।

(গ) রিপেয়ার বস[39]-এর কাজ হল প্রত্যেকটি শ্রমিক তার যন্ত্রপাতি হাতিয়ারগুলি ঠিকমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে কিনা, তাতে ঠিকমত তেল দেয় কিনা ও সেগুলি ঠিকমত রাখে ও ব্যবহার করে কিনা তা দেখা।

(ঘ) ইন্সপেক্টর[40]-এর কাজ হল শ্রমিকরা সঠিকভাবে ও উপযুক্ত যত্ন নিয়ে কাজের ও উৎপন্ন দ্রব্যের মান বজায় রাখছে কিনা দেখা।

(ঙ) রুট ক্লার্ক[41]-এর কাজ হল কোন কাজটির পর কোন কাজ করতে হবে শ্রমিকদের সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া।

(চ) ইনসট্রাকশন কার্ড ক্লার্ক[42]-এর কাজ হল কার্য নির্বাহের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকদের ও শ্রমিকদের নির্দেশ দেবার জন্য পরিকল্পনা বিভাগ যে সব ইন্সট্রাকশন কার্ড বা নির্দেশ পত্র ব্যবহার করে তা তৈরি করা।

(ছ) টাইম অ্যান্ড কস্ট ক্লার্ক[43]-এর কাজ হল সহজে যাতে শ্রমিকদের ওয়েজ বিল[44] তৈরি করা যায় সেজন্য কার কাজে কতটা সময় লাগল ও খরচ পড়ল তার হিসাব রাখা ও সে বিষয়ে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা।

(জ) শপ ডিসিপ্লিনারিয়ান[45]-এর কাজ হল কারখানার মধ্যে শ্রমিকরা নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করলে এবং কাজে অনুপস্থিত থাকলে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তবে অনেকের আবার অভিমত এই যে, তদারককারী ঊর্ধ্বতন কর্মীর সংখ্যা বেশি হলে শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে সুষ্ঠু কাজের পক্ষে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

৬. কস্ট অ্যাকাউন্টিং—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হল উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে কোনও অপচয় ও অদক্ষতা—সময়, উপকরণ, শ্রমশক্তি, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও হাতিয়ার যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তা দূর করা। কস্ট অ্যাকাউন্টিং বা উৎপাদন খরচ নির্ণয় ব্যবস্থা এ কাজে সবচেয়ে উপযোগী উপায়। উৎপাদনের প্রকৃত খরচ, উৎপাদনের প্রতি ধাপের খরচ, চূড়ান্তভাবে দ্রব্যটির উৎপাদন শুরু করার আগে তার কি খরচ পড়তে পারে আগে থেকেই তার হিসাব নির্ণয় ও স্ট্যান্ডার্ড কস্ট[46] নির্ধারণ ইত্যাদি হল কস্ট অ্যাকাউন্টসের বা কস্টিং[47]-এর কাজ। এসবের ফলে কোন কাজগুলি লাভজনক ও কোনগুলি লাভজনক নয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তা সহজেই স্থির করতে পারেন। এই কারণে কস্ট অ্যাকাউন্টিং বা কস্টিং-কে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান উপাদান বলে গণ্য করা হয়।

৭. মানসিক বিপ্লব—সাধারণত, শ্রমিক-কর্মীরা বেশি পরিশ্রম করতে, বেশি দক্ষতার সাথে কাজ করতে চায় না। তারা চায় সর্বাধিক সম্ভব পরিমাণে মজুরি বাড়াতে এবং

---

37. Gang Boss. 38. Speed Boss. 39. Repair Boss. 40. Inspector.
41. Route clerk. 42. Instruction card clerk.
43. Time and cost clerk. 44. Wage Bill.
45. Shop Disciplinarian. 46. Standard Cost. 47. Costing.

মুনাফার অংশ। আর নিয়োগকর্তা বা মালিকরা চায় যথাসম্ভব কম মজুরি দিয়ে তাদের কাছ থেকে যথাসম্ভব্ বেশি কাজ আদায় করতে। এর ফলে শ্রমিক ও মালিকরা দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত। অথচ, শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব না জন্মালে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অন্যান্য যাবতীয় উপাদানগুলি ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই কারণে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সহযোগিতা ছাড়া বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কখনও সফল হতে পারে না বলেই টেলরের অভিমত। পরস্পর বিরোধিতার বদলে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হলে সবচেয়ে আগে দরকার উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন, এক কথায় উভয়ের মানসিক বিপ্লব। কাজ সম্পর্কে, সহকর্মীদের সম্পর্কে ও মালিকদের সম্পর্কে চাই শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন, অন্যদিকে, মালিকদের, সর্বস্তরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে চাই সহকর্মীদের প্রতি, শ্রমিক-কর্মীদের প্রতি নিজেদের কর্তব্যবোধের সম্পূর্ণ পরিবর্তন। শ্রমিকদের ভাবতে হবে দক্ষতার সাথে ও গতিবেগের সাথে কর্তব্য সম্পাদনের কথা, ব্যবস্থাপকদের বুঝতে হবে উভয়পক্ষের স্বার্থ ও সমৃদ্ধি পরস্পরের উপর নির্ভর করে। এই রকম একটা সম্পূর্ণ মানসিক বিপ্লব ছাড়া বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবে রূপ নিতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা

১. এতে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শ্রমিকের ও সামগ্রিকভাবে কারবার এবং সিল্পের দক্ষতা বাড়ে।

২. দক্ষতাবৃদ্ধির দরুন শ্রমিকদের ও সামগ্রিকভাবে কারবার ও শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে বলে মোট উৎপাদন বাড়ে।

৩. উৎপাদনের ও তৎসংক্রান্ত বিবিধ কাজের যথাযথ মান নির্ধারণ ও অবিরাম মানোন্নয়ন ঘটে বলে উৎপাদনের উৎকর্ষ বাড়ে।

৪. সর্বক্ষেত্রে গবেষণা ও সতর্ক নিরীক্ষণের দ্বারা উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ ঘটে।

৫. দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় শ্রমিকগণের আর্থিক আয় ও জীবনধারণের মান বৃদ্ধি পায়।

৬. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির দরুন কারবার ও শিল্পের দেশী এবং বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ে।

৭. রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হয় বলে এতে শ্রমিকদের কল্যাণমূলক বিবিধ ব্যবস্থার দরুন মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষের পরিবর্তে সহযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং একাধারে শ্রমিক, কর্তৃপক্ষ, শিল্প ও দেশের কল্যাণ সাধন করে বলে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সমালোচনা

ক. কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে:

১. এই ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। টাইম ও মোশন স্টাডি, শ্রমিকদের সম্পাদিত কাজের মান ও পরিমাণ নির্ধারণ[48] ইত্যাদি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং অত্যন্ত বৃহদাকার কারবার ছাড়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কারবারের পক্ষে এটা অনুসরণ করা অসম্ভব।

২. এতে পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা অনবরত নূতন নূতন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত ও কাজে প্রযুক্ত হতে থাকে। এবং প্রতিবারই পরিবর্তন সাধনের সময় কারবারের ধারাবাহিক চলতি কার্যক্রমে বিঘ্ন ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

---

48. Standardisation of Performance.

৩. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগে উচ্চবেতনে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সহিত জড়িত নন বলে, তাদের জন্য কারবারের স্থির খরচ[49] বাড়ে।

খ. শ্রমিকগণের দৃষ্টিকোণ থেকে:

১. এই ব্যবস্থায় অনবরত কাজের বেগ[50] বৃদ্ধির দ্বারা শ্রমিকদের কাজের মাত্রা বাড়ান হয় ও তাতে তাদের শরীর ও মনের উপর বিশেষ চাপ পড়ে।

২. এই ব্যবস্থা শ্রমিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সর্বপ্রকার পথ রুদ্ধ করে তাদের যন্ত্রের অংশে পরিণত করে।

৩. কাজের পরিমাণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিকের ভিন্ন ভিন্ন মজুরির হার নির্ধারিত হয় বলে তাদের ঐক্য নষ্ট হয়।

৪. এতে কাজের বৈচিত্র্যের অভাবে শ্রমিকদের জীবনে একঘেয়েমী এসে তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা নষ্ট করে।

৫. ক্রমেই বিভিন্ন পর্যায়ে ও কাজে যন্ত্রের ব্যবহার প্রসারিত হতে থাকায় ধীরে ধীরে শ্রমিকের প্রয়োজন কমতে থাকে। অধিকাংশ কাজই যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ফলে ছাঁটাই শ্রমিক সংখ্যা বাড়তে থাকে।

শিল্পসংস্কার
RATIONALISATION

সংজ্ঞা, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য
DEFINITION, MEANING AND SCOPE

"র্যাশন্যালাইজেশন" শব্দটি এসেছে ইংরেজী "র্যাশন্যাল"[51] কথাটি থেকে, যার অর্থ হল, যুক্তিসংগত বা যুক্তিযুক্ত। এই অর্থে র্যাশন্যালাইজেশন কথাটির মানে হল শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতির প্রয়োগ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ, যুক্তি-পন্থী চিন্তা ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতির ব্যবহারই হল র্যাশন্যালাইজেশন বা যুক্তিসিদ্ধ শিল্পসংস্কারের অর্থ, একথা মেনে নিলেও বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ও পদ্ধতির প্রয়োগ বলতে কি বোঝায় তার একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভব। কারণ এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই নিজস্ব আলাদা ধারণা আছে।

এই কারণে, দেখা যায়, র্যাশন্যালাইজেশন শব্দটির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেহেতু র্যাশন্যালাইজেশন শব্দটির প্রকৃত মর্মার্থ বুঝতে হলে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞার আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. লীগ অব নেশনস্-এর উদ্যোগে আহূত ১৯২৭ সালে জেনেভায় বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে[52] এই বলে র্যাশন্যালাইজেশন-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল: "র্যাশন্যালাইজেশন হল মানুষের প্রচেষ্টার কিংবা উপকরণের অপচয় কমিয়ে ন্যূনতম করার উপযোগী পদ্ধতি বা কারিগরী কৌশল এবং সংগঠন। শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন, উপকরণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের মান প্রবর্তন, উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলির সরলীকরণ এবং পরিবহণ ও বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতিসাধন প্রভৃতি এর অন্তর্গত।" র্যাশন্যালাইজেশনের লক্ষ্য হল ন্যূনতম প্রচেষ্টার দ্বারা সর্বাধিক দক্ষতা অর্জন। এই সংজ্ঞায় শিল্প সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অধ্যাপক সারজেন্ট ফ্লোরেন্স[53]-এর মতে, র্যাশন্যালাইজেশন হল একটি সমগ্র শিল্পের অন্তর্গত সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কোন না কোন রকম যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে অপচয় এবং দক্ষতার অভাব দূর করার আন্দোলন।"

---

49. Overhead Costs. 50. Speed. 51. Rational.
52. The World Economic Conference at Geneva in 1927 under the auspices of the league of Nations. 53. Prof. Sargent Florence.

ফ্লোরেন্স র‍্যাশন্যালাইজেশনের অভ্যন্তরীণ দিক (অর্থাৎ উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক কারিগরী কলাকৌশল ব্যবহার ইত্যাদি) এবং বাহ্যিক দিক (অর্থাৎ শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রচেষ্টা), এই উভয় দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩. অধ্যাপক রবিনসন[৫৪]-এর মতে, "র‍্যাশন্যালাইজেশন বলতে সমগ্র শিল্পটির সাথে তার অন্তর্গত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের পুনর্গঠন বোঝায়।" অর্থাৎ র‍্যাশন্যালাইজেশন বলতে শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ বোঝায় না, সঠিক পথে শিল্পের পুনর্গঠনও বোঝায়। তাঁর মতে কারবারী জোট গঠনও র‍্যাশন্যালাইজেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৪. এদেশে ১৯৫৬ সালে কানপুর টেক্সটাইল মিলস র‍্যাশন্যালাইজেশন এনকোয়ারি কমিটি[৫৫]-ও র‍্যাশন্যালাইজেশনের একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী র‍্যাশন্যালাইজেশন হল এমন একটি সংস্কার যার "ভিত্তি হল যুক্তিসিদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক এবং ক্ষেত্র হল বহু—মানুষ, উপকরণ, যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা ও অর্থ—উদ্দেশ্য হল ন্যূনতম খরচে ও ক্ষয় ক্ষতিতে অথচ তীব্রতা বৃদ্ধি না করে সর্বাধিক সম্ভব উৎপাদন লাভ করা।"

৫. ১৯৬৯ সালের ভারতের ন্যাশন্যাল লেবার-কমিশন[৫৬] এই বলে র‍্যাশন্যালাইজেশনের সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ "এ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা পরিকল্পিত উৎপাদন, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানের একত্রীকরণ, অর্থ সংস্থানের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন প্রক্রিয়ার ও বিক্রয় ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং মানব (শ্রম) শক্তির কাম্যতম ব্যবহারের সুবিধাগুলি একত্রিত করে।" এই সংজ্ঞায় র‍্যাশন্যালাইজেশনের সাথে উৎপাদক শক্তি বৃদ্ধির আন্দোলনের মিলন ঘটানো হয়েছে।

র‍্যাশন্যালাইজেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
AIMS & OBJECTS OF RATIONALISATION

১৯২৭ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের মতে র‍্যাশনালাইজেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি হলঃ ১. ন্যূনতম প্রচেষ্টায় শ্রমের সর্বাধিক দক্ষতা লাভ; ২. শক্তি ও কাঁচামালের অপচয় দূর করা; ৩. উৎপন্ন দ্রব্যের অলাভজনক বৈচিত্র্য কমানো; ৪. উৎপাদন পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট মানের যন্ত্রাংশ প্রভৃতি ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা করা; ৫. অপ্রয়োজনীয় পরিবহণ, আর্থিক খরচের অত্যধিক বোঝা, এবং অকারণ মধ্যস্থ কারবারীর উপস্থিতি দূর করে পণ্য বণ্টন প্রণালীর সরলীকরণ; ৬. সমাজের জীবনমান ও স্থিতি বৃদ্ধি করা; ৭. ভোগকারীদের অল্প দামে পণ্য যোগান দেওয়া; এবং ৮. উৎপাদকদের উচ্চতর পারিশ্রমিক সুনিশ্চিত করা ও তাদের মধ্যে তা ন্যায়সঙ্গত ও সমতাপূর্ণভাবে বণ্টন করা।

অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি হল—উৎপাদন শক্তির সর্বাধিক বৃদ্ধি, আর্থিক ও শিল্পগত পুনর্গঠন, অপচয় দূরীকরণ, সরলীকরণ ও মান প্রবর্তন, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কাজের অবস্থার উন্নতি এবং ভোগকারিদের জন্য সস্তায় উন্নত দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি।

র‍্যাশন্যালাইজেশনের অপরিহার্য উপাদান বা মূল বৈশিষ্ট্য
ESSENTIAL ELEMENTS OR BASIC FEATURES OF RATIONALISATION

র‍্যাশন্যালাইজেশন বা যুক্তিসিদ্ধ শিল্প সংস্কারের অপরিহার্য উপাদান বা মূলগত বৈশিষ্ট্যগুলি[৫৭] হলঃ

54. Prof. E. A. G. Rabinson.
55. Kanpur Textile Mills Rationalisation Enquiry Committee, 1956.
56. National Commission on Labour (1969). 57. Basic Features.

১. **বিশেষায়ণ বা বিশেষীকরণ**[58]—প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন ও বণ্টন বা বিক্রয় ব্যবস্থায় যে অপচয় ঘটে তা দূর করার জন্য শিল্প সংস্থার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্মীদের কাজের বিশেষায়ণ, এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে উৎপাদিত পণ্যের ও বাজারের বিশেষায়ণ প্রবর্তন করার প্রয়োজন হয়।

২. **যন্ত্রীকরণ**[59]—উৎপাদন খরচ ন্যূনতম করার জন্য সর্বাধিক দ্রুতগতিতে ব্যাপক পরিমাণে নির্দিষ্ট মানের পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়াতে হয়। ফলে কায়িক শ্রমনির্ভর উৎপাদন পদ্ধতিগুলির বদলে ক্রমশঃ যন্ত্র-নির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

৩. **মান প্রবর্তন**[60]—সর্বনিম্ন গড় খরচে বৃহদায়তনে উৎপাদনের প্রয়োজনে উৎপাদিত পণ্যের অ-লাভজনক বৈচিত্র্য কমাতে হয়। এবং সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর পণ্যগুলি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী উৎপাদনের জন্য পণ্যের আকার, আয়তন, গুণাগুণ প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট করে দিতে হয়। এইভাবে নির্দিষ্ট মানের পণ্য উৎপাদন করতে হলে আবার কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ারও মান সুনির্দিষ্ট করে দিতে হয়। এইভাবে র‍্যাশন্যালাইজেশনের ফলে সর্বক্ষেত্রে মান প্রবর্তন করতে হয়।

৪. **সরলীকরণ**[61]—বিশেষায়ণ ও মান প্রবর্তনের ফলে উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ক্রমশঃ সরলীকরণ ঘটে। ফলে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে এবং সময় বাঁচে।

৫. **তীব্রতাবৃদ্ধি**[62]—এই কথাটির অর্থ হল যন্ত্রপাতির সবিশেষ পরিবর্তন না করে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে এবং দ্রুতগতিতে যন্ত্রগুলি চালিয়ে কারখানার বর্তমান যন্ত্রপাতি ও সংগঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার করা। ফলে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে উৎপাদন বাড়ে এবং আরও দক্ষতা বাড়াতে শ্রমিকদের উপর চাপ দেওয়া হয়।

৬. **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা**—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া র‍্যাশন্যালাইজেশনের লক্ষ্যগুলি পূর্ণ হয় না। সুতরাং ব্যবস্থাপনার ও সংগঠনের পুরানো প্রচলিত রীতিগুলির বদলে আধুনিক পদ্ধতিগুলি প্রবর্তন করতে হয়।

৭. **শিল্পগত গবেষণা**[63]—র‍্যাশন্যালাইজেশন সফল করতে হলে শিল্পগত গবেষণা অব্যাহত রাখতে হয়। উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা এবং বিক্রয় ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতির জন্য অব্যাহত ভাবে গবেষণার প্রয়োজন।

৮. **কারবারী জোট গঠন**[64]—বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচগুলি ভোগ করার জন্য রুগ্ন, দুর্বল, ছোট অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি জোট গঠন করে বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে সামগ্রিক ভাবে শিল্পটির মধ্যে মানুষ অর্থাৎ শ্রমশক্তির ও উপকরণের অপচয় দূর করা সম্ভব হয়।

৯. **সামাজিক ও মানবিক দিক**[65]—র‍্যাশন্যালাইজেশনের কাজ শুধু অর্থনৈতিক দিক নিয়েই নয়। সামাজিক এবং মানবিক দিকটাও সে উপেক্ষা করে না। "এটা কেবল একটা যান্ত্রিক বিজ্ঞান নয়, একটা মানবিক কলাও বটে।" র‍্যাশন্যালাইজেশন যে উৎপাদন ও ভোগের দিকেও লক্ষ্য রাখে, সেটা তার সামাজিক লক্ষ্যের পরিচয়। আর উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ, শ্রম বিরোধের কারণগুলি দূর করা, শ্রমিক-কর্মীদের উপযুক্ত প্রণোদনার ব্যবস্থা করা, পারিশ্রমিক ও কর্মে উন্নতির যথোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এগুলি হল র‍্যাশন্যালাইজেশনের মানবিক দিক। র‍্যাশন্যালাইজেশনের যে কোনও পরিকল্পনায় সমাজের কায়িক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণ সম্পর্কে যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দিলে চলে না। র‍্যাশন্যালাইজেশনের ফলে যেন বেকার সমস্যা আবার অত্যন্ত বেড়ে না যায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

58. Specialisation. 59. Mechanisation. 60. Standardisation.
61. Simplification. 62. Intensification. 63. Industrial Research.
64. Combination. 65. Social and Human Aspects.

র‍্যাশন্যালাইজেশনের বিভিন্ন পর্যায়
STAGES OF RATIONALISATION

র‍্যাশন্যালাইজেশনের তিনটি পর্যায়। যথা—১. পরিকল্পনা[৬৬]; ২. পুনর্বিন্যাস[৬৭] এবং ৩. উন্নয়ন[৬৮]।

১. পরিকল্পনা : প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বাগ্রে বাজারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সযত্নে পর্যবেক্ষণ এবং অনুধাবন করে কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করা বাঞ্ছনীয় এবং কোন্ পদ্ধতিতে তা বিক্রয় করা উচিত, তা স্থির করা হয়। তারপর সে অনুযায়ী একটি বিক্রয়ের কার্যক্রম[৬৯], এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে একটি আর্থিক সংস্থানের কার্যক্রম ও উৎপাদনের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়।

২. পুনর্বিন্যাস[৭০]: দ্বিতীয় পর্যায়ে উৎপন্ন দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং প্রক্রিয়া-সমূহের নির্দিষ্ট মান নির্ধারিত ও প্রবর্তিত[৭১] এবং সরলীকরণ[৭২] হয়ে থাকে। এতে বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদনের[৭৩] সুবিধা হয়। ফলে, উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে, অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ[৭৪] এবং কাঁচামালে প্রয়োজনীয় অর্থবিনিয়োগের পরিমাণ কমে, পড়তা খরচের হিসাব[৭৫] করা সহজ হয়।

৩. উন্নয়ন[৭৬]: তৃতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট মান প্রবর্তন ও সরলীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বিভিন্ন কারবারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষায়ণ[৭৭] ও বিভাগীয়করণ[৭৮] প্রচলিত হয়। যান্ত্রিকীকরণ[৭৯]-এর দরুন কাজের দক্ষতা ও বেগ[৮০] বৃদ্ধি পায় বলে তাতে সকল কাজে, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও যুক্তিসিদ্ধ শিল্পসংস্কারের : তুলনা
SCIENTIFIC MANAGEMENT & RATIONALISATION : A COMPARISON

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও যুক্তিসিদ্ধ শিল্পসংস্কার বা র‍্যাশন্যালাইজেশন একই জিনিস বলে অনেকের কাছে মনে হতে পারে। পিটার ড্রাকার[৮১]-তো মনে করেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলে প্রচলিত জার্মানি তারই নাম দিয়েছে র‍্যাশন্যালাইজেশন। এই বিভ্রান্তির কারণ হল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং অপচয় সর্বনূ্যন করে সর্বাধিক দক্ষতা অর্জন হল উভয়েরই লক্ষ্য। কিন্তু লক্ষ্যের এই মিল সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং র‍্যাশন্যালাইজেশনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

১. প্রয়োগ ক্ষেত্র[৮২]—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ক্ষেত্র র‍্যাশন্যালাইজেশনের তুলনায় সঙ্কীর্ণ। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার কাজ হল একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে অপচয় ও দক্ষতার অভাবের কারণগুলি দূর করা। কিন্তু র‍্যাশন্যালাইজেশনের কাজ হল গোটা শিল্পের অপচয় ও দক্ষতার অভাব নিশ্চিহ্ন করা। এই কারণে শিল্পের অন্তর্গত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি বাদ দিয়ে কেবল একটি প্রতিষ্ঠানে র‍্যাশন্যালাইজেশন প্রবর্তন করা যায় না।

২. পরিধি[৮৩]—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পরিধি র‍্যাশন্যালাইজেশনের তুলনায় সীমা-বদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার কাজ হল মুখ্যত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত করা। আর র‍্যাশন্যালাইজেশনের কাজ হল শিল্পগতভাবে উৎপাদন, অর্থ সংস্থান, বিক্রয় ও প্রচার-বিজ্ঞাপন, পরিবহণ ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা।

66. Planning. 67. Re-arrangement. 68. Development.
69. Sales programme. 70. Re-arrangement. 71. Standardisation.
72. Simplification. 73. Mass production. 74. Spare parts.
75. Costing. 76. Development. 77. Specialisation.
78. Sectionalisation. 79. Mechanisation. 80. Speed.
81. Peter Drucker. 82. Scope. 83. Coverage.

৩. **পদ্ধতি**[84]—বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবস্থাপনার কাজগুলি সম্পাদন করার পদ্ধতিগুলি মোটামুটি স্থির, সুপরিচিত ও পূর্বনির্দিষ্ট। কিন্তু র‍্যাশন্যালাইজেশনের লক্ষ্যলাভের এরূপ কোনও স্থির ও পূর্বনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। তা পরিস্থিতি অনুযায়ী স্থির করতে হয় এবং সব শিল্পে ও সব সময়ে তা একরূপ না-ও হতে পারে।

৪. **প্রয়োগ**[85]—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা যায় কেবল যে-সব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে তাতেই। যে-সব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি তাতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যেমন বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠনের প্রশ্নটি র‍্যাশন্যালাইজেশনের অন্তর্গত তেমনি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনা, তার আয়তন, স্থান নির্বাচন, বিন্যাস ইত্যাদিও র‍্যাশন্যালাইজেশনের বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে।

৫. **পদক্ষেপ**[86]—উভয়ের পদক্ষেপগুলিও আলাদা ধরনের। যথা—(১) শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষের ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমাধানই হল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিষয়বস্তু। সুতরাং কারবারী জোট গঠনের সাথে তার আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু কারবারী জোট গঠন হল র‍্যাশন্যালাইজেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ তার মধ্য দিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা দূর করে দুর্বল সংস্থাগুলিকে সবল সংস্থার সাথে একত্রিত করে র‍্যাশন্যালাইজেশন সমগ্র শিল্পের দক্ষতা বাড়াতে চেষ্টা করে।

(২) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠান বিশেষের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বর্তমানে যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে সে-সবের দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি। উৎপন্ন সামগ্রীগুলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য কমানো তার উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না, কারণ তার ভয় থাকে কোনও একটি দ্রব্যের উৎপাদন ত্যাগ করলে অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা তা উৎপাদন করে বাজার দখল করতে পারে। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা-বৈচিত্র্য কমানো ও দ্রব্য-মান প্রবর্তন করা ব্যবস্থাপনার কাজের অন্তর্গত নয়। কিন্তু র‍্যাশন্যালাইজেশনের উদ্দেশ্য হল শিল্পগতভাবে সমস্ত সংস্থাগুলিতে অলাভজনক দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে, উৎপাদন পদ্ধতির সরলীকরণ ও অল্প কয়েকটি দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এবং তা যাতে নির্দিষ্ট মানের হয় সেজন্য উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মান প্রবর্তন করা।

(৩) অদক্ষ কারখানা ও সংস্থাগুলি তুলে দেবার কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার থাকে না। কারণ তার কাজ হল প্রতিষ্ঠান বিশেষের পরিধির মধ্যে বিশেষ করে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা। কিন্তু র‍্যাশন্যালাইজেশন শিল্পগতভাবে উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস ও বাজারের মোট চাহিদার সাথে মোট যোগানের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র শিল্পের অন্তর্গত অদক্ষ প্রতিষ্ঠান ও কারখানাগুলি বিলোপের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(৪) শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে স্বল্প ও দুষ্প্রাপ্য উপকরণগুলির যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা করার এক্তিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নেই। র‍্যাশন্যালাইজেশন কিন্তু সরকারের সহযোগিতায় বা বেসরকারীভাবেও সমগ্র শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগে ও সহযোগিতায় সহজেই স্বল্প ও দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল ও উপকরণগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি বন্ধ করতে পারে।

৬. **সামাজিক উদ্দেশ্য**[87]—সামাজিক লক্ষ্য পূরণের সাথে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কিন্তু র‍্যাশন্যালাইজেশনের তা আছে। ন্যায্য মজুরি ও নানারূপ কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মারফৎ শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, সস্তায় উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য উৎপাদন করে ভোগকারীদের জীবনমানের উন্নতি ও সাধারণভাবে সমগ্র সমাজের উন্নতি সাধনই র‍্যাশন্যালাইজেশনের উদ্দেশ্য। "র‍্যাশনালাইজেশনের উদ্দেশ্য হল

---

84. Methodology or Mechanism.
85. Application.
86. Measures or Steps.
87. Social objectives.

সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বোত্তম মঙ্গল, আর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল নিয়োগ কর্তাই হোক আর নিয়োগ কর্তা এবং শ্রমিক-কর্মীই হোক, সীমাবদ্ধ সংখ্যক মানুষের সর্বোত্তম মঙ্গল।"

র‍্যাশনাল্যাইজেশনের সুবিধা

ADVANTAGES OR BENEFITS OF RATIONALISATION

র‍্যাশন্যালাইজেশনের পরিকল্পনা সঠিকভাবে কার্যকর করা হলে উৎপাদক বা নিয়োগকর্তা, শ্রমিক-কর্মী, ভোগকারী এবং সমগ্র সমাজ, সকলেরই নানারূপ সুবিধা হতে পারে। তার প্রধান কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হল।

১. উৎপাদকদের সুবিধা : র‍্যাশন্যালাইজেশন—(১) উৎপাদন, পরিবহণ ও বিক্রয় খরচ কমিয়ে **মুনাফা বাড়ায়** ও তাতে স্থিরতা আনে; (২) গলাকাটা প্রতিযোগিতা দূর করে বা কমিয়ে এনে সকলের **লোকসান কমায়** ও গোটা শিল্পে **স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে**; (৩) **অতি-উৎপাদন দূর করে** বাজারের চাহিদার সাথে উৎপাদনের সামঞ্জস্য এনে উৎপাদকের লোকসান দূর করে; (৪) সরলীকরণ, মান প্রবর্তন ও বিশেষায়ন প্রবর্তন করে র‍্যাশন্যালাইজেশন **উৎপাদকদের মধ্যেও বিশেষায়ন এনে দেয়,** ফলে উৎপাদকরা প্রত্যেকে অল্প কয়েকটি ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত থেকে ব্যয়সংকোচ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এর দরুন শিল্পে প্রতিযোগীদের মধ্যে **প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতার সৃষ্টি হয়;** এবং (৫) একই শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দ্রব্য উৎপাদনে সহযোগিতা সৃষ্টি হলে উৎপাদকদের **বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও কারিগরী ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়** এবং এজন্যও উৎপাদকরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সকল উৎপাদকরাই লাভবান হয়।

২. শ্রমিকদের সুবিধা : র‍্যাশন্যালাইজেশন—(১) বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শ্রমিক বাছাই করে, তাদের মধ্যে কাজের বণ্টন করে, কাজের বোঝা কমিয়ে, কাজের সময় স্থির করে দিয়ে, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করে **শ্রমের অপচয় বন্ধ ও দক্ষতা বাড়ায়**; (২) শ্রমের অপচয় বন্ধ ও দক্ষতা বৃদ্ধির দরুন শ্রমিকদের **উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ে**; (৩) উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে **শ্রমিক-কর্মীদের আয় বাড়ে**; (৪) আয় বৃদ্ধির ফলে **শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে**; এবং (৫) সাময়িকভাবে এবং প্রথম দিকে র‍্যাশন্যালাইজেশনের দরুন কিছু শ্রমিক ছাঁটাই হলেও , **শেষ পর্যন্ত** এর **ফলে** শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি এবং বাজারে কম দামে উৎকৃষ্ট পণ্যের যোগান বৃদ্ধির ফলে মোট চাহিদা বাড়ে। ফলে সেই বর্ধিত চাহিদা মেটাতে পণ্যের উৎপাদনও বাড়াতে হয়: তখন শ্রমিকদের **কাজের সংস্থানও বাড়ে।** এই ভাবে ছাঁটাই শ্রমিক ও নূতন কর্মপ্রার্থীদের কাজের সংস্থান হয়।

৩. ভোগকারীদের সুবিধা : র‍্যাশন্যালাইজেশনের ফলে ভোগকারীরা—(১) **অল্প দামে পণ্য কেনার সুবিধা পায়,** কারণ উৎপাদন খরচ কমে যায়; (২) **তৈরি পণ্যগুলি উৎকৃষ্ট হয়**; (৩) **নির্দিষ্ট মানের দ্রব্যসামগ্রী** কেনার সুযোগ পায় এবং তা থেকে পছন্দমত জিনিসটি বেছে নিতে পারে; এবং (৪) সস্তায়, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং নির্দিষ্ট মানের পণ্য কেনা ও ব্যবহারের ফলে **ভোগকারীদের জীবনমান বাড়ে।**

৪. সমগ্র সমাজের সুবিধা : র‍্যাশন্যালাইজেশনের ফলে, (১) সবচেয়ে কম খরচে ও উপকরণের কম অপচয়ে নানা দ্রব্যের মোট উৎপাদন বাড়লে দেশের **জাতীয় আয়ও বাড়ে**; (২) মোট **কর্মসংস্থান বাড়ে**; (৩) শিল্পগুলির মধ্যে দেশের যাবতীয় **উপকরণের সুষ্ঠু বণ্টন** ঘটে; (৪) উৎপাদনের খরচ হ্রাস ও পরিমাণ বাড়লে **রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ** দেখা দেয়; (৫) বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উৎপাদনের স্থিতিশীলতা এলে দেশের **সমগ্র অর্থনীতির** মধ্যেও **স্থিতিশীলতা** দেখা দেয়; এবং (৬) উৎপাদন, আয় ও ভোগ বৃদ্ধির ফলে **জাতীয় সমৃদ্ধি সৃষ্টি হয়।**

র‍্যাশনালাইজেশনের বিপদ বা বিরুদ্ধে আপত্তি
DANGERS OF OR OBJECTIONS TO RATIONALISATION

উৎপাদক বা নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক উভয় পক্ষই র‍্যাশন্যালাইজেশনকে অনেক সময় বিপদ বলে গণ্য করে এবং একারণে তাদের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হয়।

১. **নিয়োগকর্তাদের আপত্তিঃ** নিয়োগকর্তারা যেসব কারণে র‍্যাশন্যালাইজেশনের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে এবং এটাকে বিপদ বলে মনে করে তাহল—(১) এর জন্য খুব বেশি পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন হয় এবং তাদের আশংকা হয় যে সে পরিমাণ পুঁজি তারা সংগ্রহ করতে পারবে না বা সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগ করলেও তা থেকে সুফল পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ হতে পারে না; (২) র‍্যাশন্যালাইজেশন প্রবর্তন করতে গেলে বর্তমানে যে পুঁজি খাটছে, যে যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতি রয়েছে তা সবই বাতিল করতে হবে। এটা তাদের পক্ষে একটা দুরূহ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। একারণে তারা পরিবর্তন-বিরোধী হয়; (৩) ভবিষ্যতে যদি শিল্পটির জাতীয়করণ করা হয় তাহলে র‍্যাশন্যালাইজেশনের ফলে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করা হবে তা সবই নষ্ট হবে; (৪) অনেক সময়, র‍্যাশন্যালাইজেশন করতে হলে তাদের কি কি করতে হবে, কোন ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ও সুপরামর্শের অভাবেও তারা এর বিরোধিতা করে; এবং (৫) র‍্যাশন্যালাইজেশনের ফলে প্রতিষ্ঠানের আয়তন অত্যন্ত বড় হয়ে যাবে, তা আর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যাবে না একথা মনে করেও তারা এর বিরোধিতা করে।

২. **শ্রমিকদের আপত্তিঃ** শ্রমিকদের পক্ষ থেকে র‍্যাশন্যালাইজেশনের যে কারণে সমালোচনা ও বিরোধিতা করা হয় তা হল—(১) এর ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হবে এবং তাদের মধ্যে বেকার সংখ্যা বাড়বে। শেষ পর্যন্ত হয়তো এর ফলে দেশে মোট চাহিদা, মোট যোগান, মোট উৎপাদন এবং মোট কর্মসংস্থান বাড়বে কিন্তু কতদিনে তা হবে তার কোনও স্থিরতা নেই। ইতোমধ্যে যারা ছাঁটাই হবে এবং যাদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে তাদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। এই কারণে এমনভাবে র‍্যাশন্যালাইজেশনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যেন তাতে যথাসম্ভব কম পরিমাণে শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং যারা ছাঁটাই হবে তাদের যেন বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা হয়। (২) এর ফলে শ্রমিকদের উপর কাজের বোঝা[৮৮] বিলক্ষণ বাড়বে। কারণ এর দ্বারা তাদের কাছ থেকে সর্বাধিক সম্ভব কাজ আদায় করে নেবার চেষ্টা করা হবে। ইঞ্জিনীয়ার ও মনস্তত্ত্ববিদদের সমবেত প্রচেষ্টায় এবং কাজের পরিবেশের উন্নতি, ফ্যাটিগ স্টাডি, কাজের মাঝে মাঝে উপযুক্ত সময়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা এই আশংকা দূর করার চেষ্টা করা যেতে পারে; (৩) র‍্যাশন্যালাইজেশনের ফলে যে আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস ঘটে তার সুবিধা সবটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ও ব্যবস্থাপকরা নিজেরা আত্মসাৎ করে বলে শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট আশংকা থাকে যে এর ফলে তাদের উপর শোষণের মাত্রা আরও বাড়ানো হবে। শ্রমিকদের এই আশংকা দূর করতে হলে র‍্যাশনালাইজেশন ব্যবস্থায় এমন মজুরি ও প্রণোদনার প্রবর্তন করতে হবে যেন তার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকরা র‍্যাশন্যালাইজেশনের সুফলের ন্যায়সঙ্গত অংশ পায়; (৪) এর ফলে উৎপাদনে শ্রমিকদের তুলনায় যন্ত্রের প্রাধান্য বাড়ে বলে শ্রমিকদের গুরুত্ব ও পদমর্যাদা কমে যাবে। এই আশংকা কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে যেমন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সুদক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব হওয়ায় দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন থাকে না, তেমনি আবার একথাও

88. Work-load.

সত্য যে, অন্যদিকে কাজের যতই যন্ত্রীকরণ হতে থাকে ততই শ্রমিকরাও অ-দক্ষ থেকে অর্ধ-দক্ষ এবং অর্ধ-দক্ষ থেকে সুদক্ষ শ্রমিকে পরিণত হতে থাকে।

ভারতীয় শিল্পে র‍্যাশন্যালাইজেশন
RATIONALISATION IN INDIAN INDUSTRIES

এ দেশে র‍্যাশন্যালাইজেশন পশ্চিমী দেশগুলির মত একটি জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত হওয়া দূরের কথা, খন্ড খন্ড ও সাময়িক ভাবে ছাড়া যথার্থভাবে তা গ্রহণ করাও হয়নি। এখানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে র‍্যাশন্যালাইজেশনের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

১. তুলা বস্ত্র শিল্পের র‍্যাশন্যালাইজেশন : স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন সময়ে নানা কমিটি ও কর্তৃমহল থেকে তুলা বস্ত্র শিল্পে র‍্যাশন্যালাইজেশনের সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে তুলা বস্ত্র শিল্পের ওয়ার্কিং পার্টির টেকনিক্যাল সাব-কমিটি, ১৯৫২ সালে কানুনগো কমিটি, ১৯৫৮ সালে যোশী কমিটি ও ১৯৬১ সালে তুলা বস্ত্র শিল্পের ওয়ার্কিং গ্রুপ এই শিল্পের গুরুতর সমস্যাগুলির উল্লেখ করে র‍্যাশন্যালাইজেশন প্রবর্তনের সুপারিশ করে। কিন্তু তাতে দেরী হওয়ায় কতকগুলি কাপড়ের কল মাঝে মাঝেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে দেশের ১৫০টি কাপড়ের কলই অলাভজনক ও অদক্ষ।

এই শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা দরকার। তা না হলে অন্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় বিদেশে ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানি বজায় রাখা সম্ভব হবে না। দেশের বাজারেও বর্তমান চাহিদা বজায় রাখতে হলে সস্তায় উৎকৃষ্ট কাপড় যোগান দেওয়া দরকার। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের তুলা বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতাও অত্যন্ত কম। তা সবিশেষ বাড়ানো দরকার। এই সব কারণে তুলা বস্ত্র শিল্পে র‍্যাশন্যালাইজেশন প্রয়োজন।

১৯৬১ সালে তুলা বস্ত্র শিল্পের ওয়ার্কিং গ্রুপ হিসাব করেছিলেন। সংগঠিত তুলাবস্ত্র শিল্প ক্ষেত্রে সমস্ত কাপড় কলগুলির যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য মোট ৮০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। তার মধ্যে আধুনিকীকরণের জন্য লাগবে ১৮০ কোটি টাকা। এজন্য বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনতে প্রায় ৬০ কোটি টাকার বিদেশীমুদ্রা দরকার হবে। কিন্তু আধুনিকীকরণের জন্য যে ১৮০ কোটি টাকা লাগবে তার মধ্যে কাপড়ের কলগুলি নিজেরা মাত্র ৮০ কোটি টাকা দিতে পারবে। অতএব সরকারী এন আই ডি সি. আই এফ সি প্রভৃতি অর্থসংস্থানকারী সরকারী সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে বাকি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ওয়ার্কিং গ্রুপ আরও হিসাব করেছিলেন যে, এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা'র ফলে কাপড়কল শ্রমিকদের শতকরা ১৫ ভাগ বেকার হবে, তবে বেকার শ্রমিকদের অনুপাতটা বেড়ে যদি শতকরা ২০ ভাগও হয়, তাহলেও তাদের কাজের ব্যবস্থা করা কোনও গুরুতর সমস্যা হবে না। ভারত সরকার ওয়ার্কিং গ্রুপের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সুপারিশগুলি গ্রহণ করেছেন।

এই র‍্যাশন্যালাইজেশন চালু করার জন্য এন আই ডি সি ১৯·৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে এবং ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তার মধ্যে ১০·৪ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ১৯৬৪ সালে ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর এন আই ডি সি-র এই কাজের ভার এই নতুন সংস্থাকে দেওয়া হয়।

সরকার বর্তমানে যে ১০৩টি কাপড়কলের ব্যবস্থাপনার ভার নিজ হাতে নিয়েছেন তাদের আধুনিকীকরণের জন্য ৪১·৮২ কোটি টাকা লাগবে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয়

সরকার ও ন্যাশন্যাল টেক্সটাইল করপোরেশন ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২০·৫৩ কোটি টাকা দিয়েছেন।

ন্যাশন্যাল লেবার কমিশন মন্তব্য করেছেন, র‍্যাশন্যালাইজেশন সম্পর্কে "সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে এবং আরও যুক্তিসিদ্ধ সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রবর্তন শুরু হয়েছে", এবং "মতৈক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন কেন্দ্রে র‍্যাশন্যালাইজেশন বেশ অগ্রগতি ঘটেছে।"

২. চটকল শিল্পে র‍্যাশন্যালাইজেশনঃ

ভারতে চটকল শিল্পের যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম অতিশয় পুরণো এবং প্রায় অকেজো বললেই চলে। তুলনায় প্রতিযোগী দেশগুলির যন্ত্রপাতি অতি আধুনিক ও সুদক্ষ। এই কারণে বিদেশে চটকল শিল্পের পক্ষে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। সুতরাং এই শিল্পটির আধুনিকীকরণ এবং পুনর্বাসন জরুরী হয়ে পড়েছে। এজন্য অনুমান ৪৫ কোটি টাকার প্রয়োজন এবং ১৫ বৎসরেরও বেশি লাগবে। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে এন আই ডি সি ৭·৫ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর ও তার মধ্যে ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৫·৮ কোটি টাকা দিয়েছিল। পরে এরূপ উদ্দেশ্যে ঋণদানের ভার ইনডাসট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার উপর ন্যস্ত হয়।

বর্তমানে চটকল শিল্পের স্পিনিং সেকশনের আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু উইভিং সেকশনের আধুনিকীকরণের কাজ বাকি রয়েছে। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে সরকার আধুনিকীকরণ ও পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ সমেত শিল্পটির বিকাশের নানা বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য "জুট টেক্সটাইল কনসালটেটিভ কাউনসিল" গঠন করেছেন।

৩. কয়লা শিল্পে র‍্যাশন্যালাইজেশনঃ

দেশের নানা অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত আকারে বহু ছোট ছোট কয়লা খনি রয়েছে। তাদের উৎপাদন খরচ অত্যন্ত বেশি এবং খনি থেকে যে কয়লা তোলা হয় তা উৎকৃষ্ট নয়। কয়লা খনি শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতাও বেশি নয়। কয়লা খনিগুলির মোট উৎপাদনও বেশি নয়। এই সকল কারণে, কয়লা শিল্পের যন্ত্রীকরণ এবং র‍্যাশন্যালাইজেশন অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট কয়লা খনিগুলিকে স্বেচ্ছায় জোটবদ্ধ করার জন্য একটি এমালগ্যামেশন কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। সরকার ন্যাশন্যাল কোল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এন সি ডি সি) গঠন করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কয়লা খনির পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এদেশের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এন সি ডি সি-র সহযোগিতায় কয়লা খনি শিল্পে যন্ত্রীকরণ আরম্ভ হয়েছে। অতি সম্প্রতি ভারত সরকার ২১৪টি কোকিং কয়লা ও ৭১১টি নন-কোকিং কয়লা খনি জাতীয়করণ করেছেন। এর ফলে কয়লা খনি শিল্পে র‍্যাশন্যালাইজেশনের গতিবেগ বাড়ছে।

৪. চিনি শিল্পে র‍্যাশন্যালাইজেশনঃ

অতি পুরণো যন্ত্রপাতি, উৎপন্ন চিনির অবনত মান, চড়া উৎপাদন খরচ ও দাম, এইগুলি হল চিনি শিল্পের সমস্যা। এই কারণে চিনি শিল্পের আধুনিকীকরণ ও পুনর্বাসন অতিশয় প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে বলে সরকার, ট্যারিফ কমিশন, রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি ও সুগার এনকোয়ারি কমিশন মত প্রকাশ করেছেন।

চিনি শিল্পের উন্নয়ন পরিষদের হিসাবে এজন্য ৬০ কোটি টাকা দরকার। এন আই ডি সি চিনিকল শিল্পকে এজন্য খানিক পরিমাণে ঋণ দিয়েছিল। বর্তমানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন (আই এফ সি) এবং ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (আই ডি বি আই) চিনি শিল্পকে ঋণ দিচ্ছে।

র‍্যাশন্যালাইজেশন সম্পর্কে সরকারের নীতি
RATIONALISATION : GOVT. POLICY

ভারত সরকারের অভিমত হল, শিল্পে এমনভাবে র‍্যাশন্যালাইজেশন প্রবর্তন করতে হবে যেন তার ফলে শ্রমিকদের বিশেষ দুর্দশা ভোগ করতে না হয় ("র‍্যাশন্যালাইজেশন উইদাউট টিয়ারস") এবং শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে যেন তা প্রবর্তন করা হয়।

বিভিন্ন পরিকল্পনা কালে, ভারত সরকার এ বিষয়ে যে নীতি গ্রহণ করেছেন, সংক্ষেপে তা হল এইঃ (১) কারিগরী দিক থেকে শ্রমিকদের কাজের বোঝা বিচার; (২) র‍্যাশন্যালাইজেশনের ফলে ছাঁটাই শ্রমিকের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা; (৩) ছাঁটাই শ্রমিকদের বিকল্প কাজ শিক্ষা দেওয়া; (৪) র‍্যাশন্যালাইজেশনের ফলে শিল্পের যে লাভ হবে শ্রমিকদের তার অংশ দেওয়া; (৫) র‍্যাশন্যালাইজেশন সম্পর্কে শিল্প বিরোধের মামলায় রায় দেবার সময় শিল্প ট্রাইব্যুন্যালের শ্রমিক-মালিক চুক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত; এবং (৬) উৎপাদনক্ষমতা না বাড়লে জীবনধারণের মান বাড়বে না একথা শ্রমিকদের বুঝতে হবে এবং এই কারণে নিজেদের ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের র‍্যাশন্যালাইজেশনের বিরোধিতা করা উচিত নয়।

র‍্যাশন্যালাইজেশন সম্পর্কে মালিকদের পথ নির্দেশ করার জন্য ১৯৫৭ সালে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে (ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স) র‍্যাশন্যালাইজেশন সম্পর্কে একটি মডেল চুক্তি রচনা করা হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই চুক্তিতে নিম্নোক্ত ধারাগুলি উল্লেখযোগ্যঃ (১) একমাত্র অপচয়ের ক্ষেত্র ছাড়া বর্তমানে নিযুক্ত শ্রমিকদের ছাঁটাই হবে না কিংবা তাদের আয় কমবে না। এবং ছাঁটাই অপরিহার্য হলে, একই সংস্থায় কিংবা একই নিয়োগকর্তার অধীনে অন্য কোনও সংস্থায় তাদের বিকল্প কাজ দিতে হবে; (২) র‍্যাশন্যালাইজেশনের সুফল সমগ্র সমাজ, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিককর্মীদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করে দিতে হবে; (৩) শ্রমিকদের কাজের বোঝার উপযুক্ত-ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং কাজের পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে হবে। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত শ্রমসম্মেলনে এই মডেল চুক্তিটি আরেকবার অনুমোদন করা হয়।

সংক্ষেপে, এই হল র‍্যাশন্যালাইজেশন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি।

উৎপাদিকা শক্তির ধারণা
CONCEPT OF PRODUCTIVITY

'উৎপাদিকা শক্তি' কথাটি বর্তমানে একটি বহুল আলোচিত শব্দ। উৎপাদিকা শক্তি বলতে উৎপাদন প্রচেষ্টার ফল ও তজ্জন্য নিয়োজিত উপায়সমূহের সম্পর্ক বোঝায়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদিত সম্পদ ও সেজন্য ব্যবহৃত উৎপাদনের উপাদানগুলির সম্পর্ক নির্দেশ করে। এর দ্বারা নিয়োজিত উপাদান বা উৎপাদনের উপায়গুলি কতটা দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝতে পারা যায়। অতএব, একই পরিমাণ উপাদান সমষ্টি ব্যবহার করে যদি আগের চেয়ে বেশী উৎপাদন করা যায়, তা হলে উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পেয়েছে, এবং আগের চেয়ে অল্প উৎপাদন হলে উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পেয়েছে ও উৎপাদনের পরিমাণ আগের মত হলে উৎপাদিকা-শক্তি একই রয়েছে বুঝতে হবে। ফলত, সর্বাধিক উৎপাদিকা শক্তি বলতে ন্যূনতম উপাদান সমষ্টির দ্বারা সর্বাধিক উৎপাদন বোঝায়।

উৎপাদিকা শক্তির ধারণাটিকে দুটি স্তরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যথা—১. উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্তরে[১]; এবং ২. জাতীয় স্তরে[২]।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্তরে উৎপাদিকা শক্তি : উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্তরে[1] উৎপাদিকা শক্তিকে তার নিয়োজিত উপাদান[3] ও উৎপন্ন[4]-এর অনুপাত বলে গণ্য করা যায়। এবং নিম্নলিখিতরূপে এটা প্রকাশ করা যায়—

$$\text{উৎপাদিকা শক্তি } (P) = \frac{\text{উৎপন্ন } (O)}{\text{নিয়োজিত উপাদান } (I)}$$

উপরোক্ত সংকেতের সাহায্যে একে একে পুঁজি, শ্রম, প্রভৃতি প্রত্যেকটি উপাদানের উৎপাদিকা শক্তির হিসাব করা যায়। যেমন, একজন শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা যদি ১০ টাকার পরিমাণ সম্পদ উৎপন্ন হয়, তবে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি হবে—

$$P = \frac{O}{I} = \frac{10/}{1\ (\text{Labour})} = 10/-$$

অর্থাৎ এককথায়, যে কোন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের কাজে তার দ্বারা নিয়োজিত উপকরণ-সমষ্টিদ্বারা উৎপন্ন সম্পদের মূল্য বা পরিমাণকে বিভক্ত করে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিকা শক্তির হিসাব করা যায়।

বাস্তবে, অধিকাংশ স্থলেই কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি কথাটি শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি (labour productivity) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপভাবে দেখলে, যে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকা শক্তি হবে—

$$\text{(শ্রমের) উৎপাদিকা শক্তি} = \frac{\text{প্রাপ্ত ফল } (o)}{\text{উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রম-ঘণ্টা (মোট নিযুক্ত শ্রমিক} \times \text{কাজের ঘণ্টা)}}$$

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "উৎপাদিকা শক্তি" কথাটির দ্বারা শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি[5] বোঝান হয়; মোট উৎপন্ন ও শ্রমঘণ্টা[6]-এর ভিত্তি শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির হিসাব করা হয়ে থাকে। কিন্তু এইভাবে উৎপাদিকা শক্তি হিসাব করার মধ্যে কতকগুলি ত্রুটি থেকে যায়। কারণ, এতে সব শ্রমিকের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি একরূপ ধরা হয়, অথচ তা অবাস্তব। তা ছাড়া, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি শুধু শ্রমিকের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা নয়, আরও অন্যান্য বহু বিষয়, যথা; কারিগরি উন্নতি, কাঁচামাল ও সাজসরঞ্জামের অব্যাহত যোগান, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। কারও কারও মতে, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে পুঁজির ও অন্যান্য উপকরণের তুলনায় শ্রমের যোগানের স্বল্পতার দরুন, সেখানে উৎপাদিকা শক্তি বলতে শ্রম-ঘণ্টা পিছু উৎপন্নের পরিমাণ অর্থাৎ শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকেই ধরা হয়। কারণ সেখানে স্বল্প-মানবিক সম্পদের প্রকৃষ্ট ব্যবহারই প্রধান সমস্যা। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রমের যোগানের তুলনায় পুঁজি বা জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে পুঁজি বা অন্য কোন স্বল্প উৎপাদনের উৎপাদিকা শক্তির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা বা তদনুযায়ী উৎপাদিকা শক্তির সংশোধন আবশ্যক: যেমন ইস্রায়েল রাষ্ট্রে এই বলে উৎপাদিকা শক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে, এটা হল উৎপাদিত মূল্যের[7] সাথে প্রয়োজনীয় বিদেশী-মুদ্রার অনুপাত।

শ্রম-ঘণ্টা বা অন্য যে কোন ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকা শক্তির পরিমাপ করা হোক না কেন, তার সূচকসংখ্যা[8] তৈরি করে একই শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন

1. Unit level. 2. National level. 3. Input. 4. Output.
5. Labour productivity. 6. Man-hour of labour.
7. Added value=output. 8. Index.

প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও অগ্রগতির তুলনা করা যায়। এমনকি আরও নিম্নস্তরে, প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগ বা এমনকি কাজের স্তরে[9] এই প্রকার উৎপাদিকা শক্তির সূচকসংখ্যা তৈরি করে তার সাহায্যে নূতন গৃহীত কোন শ্রম-সংক্ষেপ যন্ত্র কিংবা মজুরিপ্রথার ফলাফল বিচার করা সম্ভব এবং তদনুযায়ী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গৃহীত ও সংশোধিত হতে পারে। এইরূপে প্রতিষ্ঠান-স্তরে উৎপাদিকা শক্তির সূচক-সংখ্যা উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্তগ্রহণে মূল্যবান সহায়তা করে থাকে।

জাতীয় স্তরে 'উৎপাদিকা শক্তির' ধারণা[10] : জাতীয় স্তরে উৎপাদিকা শক্তির ধারণাটিকে অনেক সময় ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে এর দ্বারা দেশের যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ও তার যাবতীয় সম্ভাব্য সম্পদ বা উপকরণের[11] অনুপাত বোঝান হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য জাতীয় স্তরে উৎপাদিকা শক্তি বলতে উৎপন্নের[12] সাথে নিয়োজিত উপাদানের বা 'ইনপুটের' অনুপাত বা সম্পর্ক বোঝান হয় এবং শেষ পর্যন্ত এর দ্বারা শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বোঝান হয়ে থাকে।

জাতীয় স্তরে উৎপাদিকা শক্তির ধারণা ও তার ভিত্তিতে প্রস্তুত সূচকসংখ্যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে। তা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক ও শিল্প সংগঠনের প্রকৃতির উপর আলোকপাত করে। উৎপাদিকা শক্তির জাতীয় সূচক-সংখ্যা সমগ্র দেশের অর্থনীতির ও শিল্পের পরিবর্তন ও অগ্রগতির দিক্ নির্দেশক স্বরূপ। শুধু তাই নয়, তা দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুমান করতে এবং সরকার ও কারবারী গোষ্ঠীকে তাদের নীতি নির্ধারণে মূল্যবান সাহায্য করে থাকে। অর্থনীতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

জাতীয় স্তরে উৎপাদিকা শক্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা সরকারকে কোন্ শিল্পে কি পরিমাণ সংরক্ষণ প্রয়োজন, দেশের কর ও রাজস্বনীতি কি হবে, শ্রমিক কল্যাণের জন্য কি ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক—ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। দেশের পক্ষে কিরূপ প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন[13] প্রয়োজন, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের উপর কোন্ প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তনের ফলাফল কিরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের সামগ্রিক ও সর্বাধিক কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অর্থনীতিক কাজের মধ্যে দেশের প্রাকৃতিক, আর্থিক ও মানবিক সম্পদের কিরূপ বণ্টন প্রয়োজন, এসকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাতীয় উৎপাদিকা শক্তিব সূচকসংখ্যা সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করে।

'বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি' ও 'বর্ধিত' উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য[14] : বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি এবং বর্ধিত উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষনীয়। 'বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি' বললে, উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি বোঝায়। আগে যে পরি-মান উৎপাদন করা সম্ভব হত, এখন তা অপেক্ষা বেশি পরিমাণ উৎপাদনের ক্ষমতা জন্মেছে বোঝায়। কিন্তু বর্ধিত উৎপাদন বললে, উৎপাদনের পরিমাণ আগে যা ছিল, এখন তার চেয়ে বেশী হয়েছে বোঝায় মাত্র। উৎপাদিকা শক্তি না বাড়লেও তা ঘটতে পারে। বাজারে চাহিদা কম থাকলে, কারখানার বা শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব, তা অপেক্ষা অল্প পরি-মাণে উৎপাদন ঘটে। ঐ অবস্থায় চাহিদা কিছুটা বাড়লে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি না বাড়িয়ে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য পরিবর্তন না ঘটিয়ে একই যন্ত্রপাতি ও বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা, কেবল অতিরিক্ত কাঁচামাল ও শ্রমের দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান

9. Departmental or job level.
10. The concept of productivity at the national level.
11. Resources. 12. Output. 13. Technological changes.
14. Difference between increased productivity and increased production.

যায়। এই হল বর্ধিত উৎপাদন। কিন্তু বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি বললে, পুরনো যন্ত্রপাতি ও বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন ও নূতন যন্ত্রপাতি ও বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বারা উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি বোঝায়। এতেও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তবে তার আগে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটে।

বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তির সহায়কসমূহ[15]**:** যে সকল বিষয়ের সাহায্যে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব, নিচে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল:

১. **প্রযুক্তি বিদ্যাগত বিষয়**[16]**:** শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত থেকে আজ পর্যন্ত উৎপাদিকা শক্তির যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে, তার জন্য দায়ী হল যান্ত্রিক শক্তির[17] প্রয়োগ, শ্রমের বিশেষায়ণ, বিশেষায়িত ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার, বিভিন্ন প্রকার কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও কারখানা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন ও উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলির সংযোজন। এই সকলই হল প্রযুক্তি বিদ্যাগত বিষয়।

২. **ব্যবস্থাপনাগত বিষয়**[18]**:** প্রযুক্তি বিদ্যাগত বিষয়ের মত ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ও সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উৎসাহী, উদ্যোগী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, সুচতুর, সুদক্ষ কল্পনাশক্তি বিশিষ্ট, সতর্ক ও সাহসী ব্যবস্থাপকের। এইরূপ ব্যবস্থাপনা-নেতৃত্ব ছাড়া, সুসংগঠিত ও উন্নতিশীল শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠিত ও সাফল্য অর্জন করা যায় না। সুদক্ষ শ্রমিক ও দক্ষ যন্ত্রপাতির সাথে সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রতিভার সমন্বয় ছাড়া উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি আশা করা যায় না।

৩. **আর্থিক বিষয়**[19]**:** উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন প্রযুক্তি-বিদ্যাগত বিষয়, গবেষণা চালনা, নূতন উদ্ভাবিত উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হলে, প্রভূত আর্থিক সম্বলের প্রয়োজন। এই কারণে যে সব দেশে পুঁজির অভাব নাই, সেখানে উৎপাদিকা শক্তিও সবিশেষ পরিমাণে বেড়েছে ও বাড়ছে।

৪. **সামাজিক বা প্রতিষ্ঠানিক বিষয়**[20]**:** দেশের সামাজিক গঠন এবং তা থেকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে। দেশের মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেরণা[21] উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নূতন পরিবর্তন, নূতন দ্রব্য উদ্ভাবন, নূতন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, নূতন কলকব্জা, যন্ত্রপাতি এবং নূতন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে যদি ভোগকারী জনসাধারণ, বিনিয়োগকারিগণ ও শ্রমিকগণের মনোভাব অনুকূল না হয়, তারা যদি পুরাতনের প্রতি অন্ধমোহে আবিষ্ট থাকে, তা হলে দেশে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির কোন চেষ্টাই ফলবতী হতে পারে না।

৫. **প্রাকৃতিক বিষয়**[22]**:** উৎপাদন প্রচেষ্টা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উপর দেশের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও আবহাওয়ার পরিবেশের প্রভাব কম নয়। মানুষের চেষ্টায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতির দ্বারা এদের প্রভাব বর্তমানে খানিক পরিমাণে দূর করা সম্ভব হয়েছে, তবে খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর শিল্পের উপর প্রাকৃতিক বিষয়ের প্রভাব স্বভাবতই বেশী।

৬. **সরকারী নীতি**[23]**:** আধুনিক কালে সব দেশেই কর নীতি, শুল্ক নীতি, রাজস্ব নীতি, অর্থ সম্বন্ধীয় নীতি, মুদ্রা নীতি ও প্রশাসনিক নীতির দ্বারা সরকার দেশের উৎপাদিকা শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই সব নীতির নানা-

15. Contributories to increased productivity.
16. Technological factor. 17. Mechanical power.
18. Managerial factor. 19. Financial factor.
20. Sociological or Institutional factor. 21. Motivation.
22. Natural factor. 23. Governmental Policy.

রূপ অদলবদল করে সরকার দেশে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মারফত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার (TOOLS OF INCREASING PRODUCTIVITY)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও শিল্পসংস্কার টাইম স্টাডি, মোশন স্টাডি, শিল্পে মানবিক সম্পর্ক, প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থা ও শ্রমিক কল্যাণ, বিশেষায়ণ ও নির্দিষ্ট মানানুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাগত পরিকল্পনা, উৎকর্ষ ও খরচ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ, কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাস ও কাজের পরিবেশের ও যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার এবং মাল মশলা ব্যবহার পদ্ধতির উন্নতি ও পরিশেষে সর্বস্তরের জন্য উপযুক্ত কর্মী বাছাই ও নিয়োগ—এই কয়েকটি হল উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার। নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে তা দেখান হল ঃ
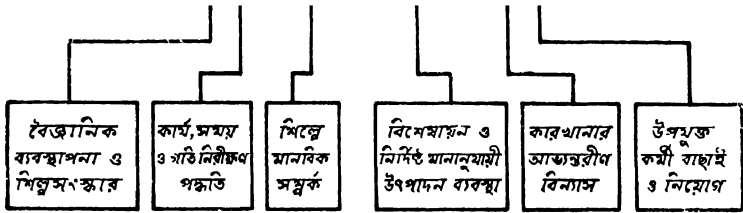
মজুরি ও
শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থা

উৎপাদিকা শক্তি-র বিশ্লেষণের গুরুত্ব (IMPORTANCE OF PRODUCTIVITY)

১. উৎপাদিকা শক্তির সূচক সংখ্যাকে দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পগত অগ্রগতির পরিচয় বলে গণ্য করা হয়। অতীতের তুলনায় বর্তমানে এই অগ্রগতি কতটা ঘটেছে উৎপাদিকা শক্তির সূচক সংখ্যা হল তা নির্দেশ করে।

২. মূল্যস্তর, কর্মসংস্থান, মজুরি, কাজের ঘণ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারের, কারবারী সংস্থাগুলির ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির নীতি কি হবে তা স্থির করতে উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির সূচক সংখ্যা তাদের সাহায্য করে।

৩. পরিকল্পনা রচনায় উৎপাদিকা শক্তির সূচক সংখ্যা একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। কারণ দেশের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন শিল্পের তুলনামূলক দক্ষতা কি তা না জানলে পরিকল্পনা রচনা করা যায় না। উৎপাদিকাশক্তির বিশ্লেষণ ও সূচক সংখ্যা এই অতিপ্রতিযোগীয় তথ্যগুলি সরবরাহ করে।

৪. বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি সম্পর্কে সমীক্ষা না করা হলে দেশের বিভিন্ন শিল্পের কি পরিমাণ সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন তা সরকারের পক্ষে স্থির করা কঠিন।

৫. সরকারের কর-নীতি এবং আর্থিক আয়-ব্যয় নীতি নির্ধারণেও উৎপাদিকা শক্তির সমীক্ষা প্রয়োজন হয়।

৬. র‍্যাশন্যালাইজেশন ও অন্যান্য কারিগরী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়নেও উৎপাদিকা শক্তির সূচক সংখ্যা প্রয়োজন হয়।

ভারতে শিল্পের উৎপাদনশীলতা (INDUSTRIAL PRODUCTIVITY IN INDIA)

শিল্পের উৎপাদনশীলতা বলতে শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ বোঝান হয়। উৎপাদনশীলতার এই মাপকাঠি ব্যবহারে দেখা যায় যে, উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে এই ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত হিসাবে দেখা যায়, ১৯৩৯ সালে ভারতের শিল্প শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার সূচক সংখ্যা ১০০ থেকে বেড়ে ১৯৪০ সালে ১০৪·২-এ পরিণত হয়। তার পর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা কমে যায় (৭২·৫)। ১৯৪৮ সাল থেকে শ্রমের উৎপাদনশীলতা আবার বেড়ে ১৯৫৩ সালে সূচকসংখ্যা ১০৫·৮-এ এবং ১৯৫৪ সালে তা ১১৩-তে পৌঁছায়। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে দ্রব্যাদি উৎপাদনশিল্পে শ্রমের মোট উৎপাদনশীলতা ৭৫ শতাংশ, ও খনি-শিল্পে ৮৪ শতাংশ বেড়েছে।

শিল্পের সুসংবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার দ্বারাই উৎপাদনশীলতার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ জন্য শিল্পমালিক, শ্রমিকসংঘ এবং সরকার, এই তিন পক্ষেরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে।

ভারতের শিল্প-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থা
MEASURES ADOPTED FOR RAISING INDUSTRIAL PRODUCTIVITY IN INDIA

ভরতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যার সাথে যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এটা উপলব্ধি করে প্রথম পরিকল্পনাকালেই এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা থেকে ব্যবস্থা-পনা ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত চারজন বিশেষজ্ঞ ভারতে আমন্ত্রিত হন। এই বিশেষজ্ঞ দলের অনুসন্ধান ও পরামর্শে ভারত সরকার ১৯৫৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ[24] প্রতিষ্ঠা করেন। এটি একটি স্বয়ংচালিত সংস্থা। একে সাহায্য করার জন্য বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কানপুর ও লুধিয়ানায় ছয়টি আঞ্চলিক দপ্তর স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে ৪৭টি স্থানীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ স্থাপিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে উৎপাদন-শীলতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সম্মেলনে একটি পনের দফা কার্যক্রম রচিত হয়েছে। উৎ-পাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহায়তার উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে গঠিত এশীয় উৎপাদনশীলতা সংগঠনে ভারত সদস্য হিসাবে যোগদান করেছে। সুযোগ্য উদ্ভা-বকদের পুরস্কার দান ও উদ্ভাবন কার্যে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৬০ সালে একটি উদ্ভাবন উন্নয়ন পর্ষৎ স্থাপন করেছেন। তা ছাড়া শিল্পে ও বাণিজ্যে পণ্যাদি, কাঁচামাল, কার্যধারা ও প্রক্রিয়াসমূহের জাতীয় মান প্রতিষ্ঠা এবং গুণগত নিয়ন্ত্রণ ও সরলীকরণের জন্য ভারতীয় মানক সংস্থা ব ইন্ডিযান স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আন্দোলনে উৎসাহ দানের জন্য ১৯৬৬ সালকে উৎপাদনশীলতা বৎসর রূপে পালন করা হয়। জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের ৮ দফা কর্মসূচী হল; (১) সংবাদের প্রচারের দ্বারা উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি; (২) ব্যবস্থাপনায় সর্বস্তরে উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; (৩) স্থানীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদগুলিকে বিশেষজ্ঞ সরবরাহ; (৪) বিভিন্ন কারখানার কর্মীদের পরস্পরের কারখানা সফর; (৫) গবেষণা; (৬) উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা; (৭) উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে বিদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করা; এবং (৮) এদেশে উৎপদানশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ।

---

24. National Productivity Council (NPC).

স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা : সুবিধা এবং অসুবিধা
AUTOMATION : ITS MERITS AND DEMERITS

মানব সমাজে সময় সংক্ষেপ, শ্রমসংক্ষেপ এবং ব্যয়সংকোচের জন্য এপর্যন্ত যত প্রকার বিধিব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে, তার মধ্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাহায্যে কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা সর্বশ্রেষ্ঠ। এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রব্যবস্থার মধ্যে আবার অতি আধুনিককালে বৈদ্যুতিক কম্পিউটার যন্ত্র[25] সর্বোৎকৃষ্ট। প্রাণহীন অথচ তীব্রসচেতন মস্তিষ্কবিশিষ্ট দানবের সাথেই একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে।

এই যন্ত্রের অভূতপূর্ব স্মৃতিশক্তি ও কর্মক্ষমতার সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জে. লিয়ন্‌স্ কোম্পানীতে ১০ হাজার কর্মচারীর বেতন ইত্যাদির হিসাব প্রস্তুত করতে আগে উপযুক্ত তদারককারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীবর্গের অধীনে ৩৭ জন পুরা সময়ের অধস্তন *কর্মচারীর • প্রয়োজন হত। বর্তমানে সেখানে 'লিও' নামক বৈদ্যুতিক কম্পিউটার যন্ত্রদ্বারা মাত্র চার ঘণ্টায় ঐ কাজ* সম্পাদিত হচ্ছে। চিকাগোর একটি ডাকমারফত কারবারে কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিদিন ৯০ হাজার হিসাব রাখা ও ৮ হাজার বিভিন্ন প্রকারের পণ্যের মজুতের হিসাব রাখার কাজ চলছে। আর একটি কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে একটি মার্কিন সরকারী দপ্তরে প্রতিদিন ৮০ হাজার চেক লেখা হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক জীবনবীমা কোম্পানীতে একটি কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে ২ হাজার কোটি ডলারের জীবনবীমাপত্রের প্রিমিয়াম ও ডিভিডেণ্ডের হিসাব করার কাজ সম্পাদিত হচ্ছে। মার্কিন সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তর দুটি কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে বৎসরে চারবার করে ৮ কোটি ব্যক্তির হিসাব পরীক্ষার কাজ চালাচ্ছে। নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে এরূপ একটি কম্পিউটার যন্ত্রব্যবস্থা বসান হয়েছে, যা একই সঙ্গে শেয়ারদালালদের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেবে, স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে সমস্ত লেনদেনগুলির যথাযথ হিসাব রাখবে এবং প্রতিদিন ১ কোটি ৬০ লক্ষ শেয়ার সম্পর্কে নিজ মস্তিষ্কে তথ্য মজুত করবে। মার্কিন দেশে কম্পিউটারের সাহায্যে চালকবিহীন রেলইঞ্জিনও চালান হচ্ছে। বর্তমানে মহাকাশ অভিযানগুলি এই কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্য না পেলে সুসম্পন্ন হত কি না সন্দেহ। সামরিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের তো কথাই নাই।

সুবিধা : স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক কম্পিউটার যন্ত্রব্যবস্থার প্রধান সুবিধা এই যে:
১. এর সাহায্যে এত বেশী পরিমাণে **তথ্যাদি মজুত** করা যায় এবং দরকারমত মুহূর্তে তা পাওয়া যায়, যা আর অন্য কোনরূপে সম্ভব নয়।

২. এ এত **দ্রুতগতিতে** কাজ করতে সক্ষম যে, তার সহিত অন্য কোন কিছুরই তুলনা হয় না।

৩. হাল্কা সূক্ষ্ম কাজ থেকে বিপুল ভারী ও কঠিন সবরকম **শ্রমসংক্ষেপের** কাজই কম্পিউটার দ্রুতগতিতে করতে পারে।

৪. স্বল্পতম সময়ে বহুব্যক্তির কাজ দ্রুততম গতিসম্পন্ন করতে পারে বলে এর সাহায্যে **সর্বাধিক সম্ভব ব্যয় সংকোচ** সম্ভব।

৫. স্বল্পতম সময়ে, দ্রুততম গতিতে কম্পিউটার সম্পূর্ণ **সুদক্ষ, সঠিক ও নির্ভুলভাবে** কাজ করতে পারে।

অসুবিধা : ১. শ্রমসংকোচ করতে গিয়ে কম্পিউটার বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করে। এজন্য যে সব দেশে কর্মহীনতার সমস্যা রয়েছে, তাদের পক্ষে কম্পিউটার হল অভিশাপ।

25. Electronic Computer.

২. কম্পিউটার অতি ব্যয়বহুল। ছোট কারবারের পক্ষে এ যন্ত্র ব্যবহার করা সাধ্যাতীত।

৩. অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে একটি অসুবিধা হল, এই যন্ত্রনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক এসব দেশে নাই বললেই চলে। সুতরাং এসব দেশ এই প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে গেলে বিদেশী অগ্রসর দেশগুলির উপর এজন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৪. কম্পিউটার মানুষকে যন্ত্রের প্রভু না করে, যন্ত্রের দাসে পরিণত করে এবং শ্রমিককে যন্ত্রের এক সামান্য যান্ত্রিক অংশের পর্যায়ে নামিয়ে আনে।

৫. এর দ্বারা বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন ব্যয় এত কমে যেতে পারে যে, চারু ও কারুশিল্পগুলি তার সাথে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

৬. অটোমেশন প্রবর্তনের আরেকটি প্রধান অসুবিধা বা বাধা হল এই যে, এর বিপুল খরচের সাশ্রয় করার জন্য উৎপাদন-ধারা অব্যাহত রাখতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ অর্ডারের বা চাহিদার অভাবে তা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে।

সাইবারনেটিকস (CYBERNETICS)

পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রব্যবস্থার সাহায্যে সম্পাদন করার ব্যবস্থাকে সাইবারনেটিকস বলা হয়। রুটিং, সিডিউলিং, ডেসপ্যাচিং ও ইনসপেকশন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার কাজগুলির সবই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার যে "চিন্তার কাজগুলি" রয়েছে তা সম্পাদন করার একটি বিশেষ পদ্ধতি হল সাইবারনেটিকস। এজন্য সাইবারনেটিকসকে অনেক সময় "ইলেকট্রনিক ব্রেন" বলা হয়। আর অটোমেশন হল প্রধানত শ্রমিক-কর্মীদের কাজগুলি সম্পাদনের এক বিশেষ পদ্ধতি। অতএব সাইবারনেটিকস আর অটোমেশন-এর মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য রয়েছে।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও সংযোজিত করার জন্য সাইবারনেটিকস ব্যবস্থায় নানারূপ যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। সাইবারনেটিকস ব্যবস্থার চারটি পর্যায়ঃ (১) কাজের অগ্রগতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি আপনাআপনি রিপোর্ট করার ব্যবস্থা; (২) সাধারণ বিচ্যুতি হলে তৎক্ষণাৎ আপনাআপনি তার সংশোধন বা প্রতিকারের ব্যবস্থা; (৩) অসাধারণ ও অস্বাভাবিক বিচ্যুতি হলে নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রটির কাছে প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করা; এবং (৪) বিচ্যুতিগুলি দূর করে সঠিকভাবে কাজটি সম্পাদনের ব্যবস্থা করা।

অটোমেশন-এর ভিত্তিতেই এবং অটোমেশনের আরো উচ্চতর পর্যায়েই সাইবারনেটিকস-এর আবির্ভাব। বলাবাহুল্য, এটা অটোমেশনের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় বহুল এবং অটোমেশনের অসুবিধাগুলি সাইবারনেটিকসে আরও বেশি করে প্রযোজ্য।

ভারতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রব্যবস্থা : সমস্যা
AUTOMATION AND INDIA : PROBLEMS

দক্ষতাবৃদ্ধি, সময়সংক্ষেপ, শ্রমলাঘব এবং ব্যয়সংকোচ ও উৎপাদনবৃদ্ধি ইত্যাদি সুবিধাগুলি আরও বেশি পরিমাণে ভোগ করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এদেশের সরকারী ও বেসরকারী কারবারগুলিতে বৈদ্যুতিক কম্পিউটার যন্ত্র ও অনুরূপ সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা হচ্ছে। এই সব সরকারী কারবারগুলির মধ্যে জীবনবীমা করপোরেশন, ভারতীয় রেলপথগুলি ও সরকারী লৌহইস্পাতশিল্প প্রভৃতি ভারীশিল্প এবং স্টেট ব্যাঙ্ক ও বেসরকারী শিল্প ও কারবারগুলির মধ্যে বিদেশী পেট্রোলিয়াম কোম্পানী-সমূহ, বেসরকারী ব্যাঙ্ক এবং তুলাবস্ত্র ও চটকল শিল্পের নাম উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত

ভারতে বিভিন্ন প্রকার কারবারে প্রায় ১০০টির মত বৈদ্যুতিক কম্পিউটার যন্ত্র বসান হয়েছে, অন্যান্য ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির তো কথাই নাই।

ভারতের মত দরিদ্র অথচ উন্নয়নশীল দেশে এই সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির বহুল প্রবর্তন বাঞ্ছনীয় কি না সে বিষয়ে বর্তমানে প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এদের নানারূপ সুবিধাগুলির কথা অস্বীকার করা যায় না। অথচ ঐ সুবিধাগুলি লাভ করতে গিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য এবং সামর্থ্য ও বাস্তব পরিস্থিতিতে এর ব্যাপক প্রবর্তন যে কতকগুলি বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করছে ও পুরনো কতকগুলি সমস্যাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাও অস্বীকার করার উপায় নাই।

ভারতে এর অসুবিধা: প্রথমত, এই সব যন্ত্রগুলি মুখ্যত শ্রম লাঘবের যন্ত্র। যে সব দেশে পুঁজির তুলনায় শ্রমের অভাব রয়েছে, সে সব দেশের পক্ষেই এইগুলি যথার্থ উপযোগী। ভারতে তার বিপরীত পরিস্থিতি বর্তমান। এখানে পুঁজির তুলনায় শ্রমের যোগান বেশী। সুতরাং এদেশে এরূপ যন্ত্রপাতি অপরিহার্য নয়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা হল, ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতার সমস্যা। প্রত্যেকটি পরিকল্পনার শেষে কর্মহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকারী হিসাবে দেশে পূর্ণ ও আংশিক কর্মহীনের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৪ কোটির মত। এর উপর স্বায়ংক্রিয় যন্ত্রাদি বেশি পরিমাণে প্রবর্তনের ফলে দ্রুতগতিতে কর্মহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এক জীবনবীমা করপোরেশনেই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে বর্তমান ৫০ হাজার কর্মচারীর স্থলে ৮ হাজারের বেশী কর্মচারীর প্রয়োজন হবে না এবং ৪০ হাজারের বেশি কর্মচারী উদ্বৃত্ত হবে ও তাদের কর্মচ্যুতি ঘটবে। সম্প্রতি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় অটোমেশন প্রবর্তনের যে প্রবল চেষ্টা চলেছে তাতে ছাঁটাই ও কর্মহীনতা বৃদ্ধির সংকট দেখা দিয়েছে।

তৃতীয়ত, এর ফলে শিল্পোন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটলেও, দেশে নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকবে। ফলে দেশে শিক্ষিত কর্মহীনের সমস্যা আরও তীব্র হয়ে উঠবে।

চতুর্থত, ভারতে নানাবিধ শিল্পে এই ধরনের যন্ত্রপাতি বসাতে হলে বিপুল ব্যয়ে তা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে এবং এজন্য বিরাট পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হবে। বর্তমানে ভারতের সে সামর্থ্য নাই বলে এজন্য আবার বিদেশী ঋণের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, এই সব যন্ত্রগুলির জন্য প্রতি বৎসর নানারূপ যন্ত্রাংশ আমদানিরও প্রয়োজন হবে। সুতরাং এই কারণেও বিদেশের উপর ভারতের নির্ভরতা বাড়বে।

পঞ্চমত, বেসরকারী শিল্পে এর ফলে মালিকদের লাভই বেশি হবে। ব্যয়বহুল বলে অত্যন্ত বড় শিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্পগুলি এই সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারবে না। সুতরাং এটা দেশের শিল্প বাণিজ্যে একচেটিয়া কারবারীদের ক্ষমতাই আরও বাড়িয়ে তুলবে।

ষষ্ঠত, এই সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে, উচ্চ কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকের প্রয়োজন কমবে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরিতে কম দক্ষ শ্রমিক দিয়েই উৎপাদন চালান সম্ভব হবে। অতএব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা ও মজুরি হ্রাসেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

এই সব দিক বিবেচনা করলে ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পে ও অন্যান্য কারবারে উন্নত দেশগুলির উপযোগী অত্যন্ত আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রচলন সবিশেষ অবাঞ্ছিত বলেই মনে হয়।

১৫

উৎপাদনে নিযুক্ত কারবারী প্রতিষ্ঠানের সংগঠন
ORGANISATION OF MANUFACTURING UNDERTAKINGS

যে কোন কারবার, বিশেষত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কারবার স্থাপন করতে হলে, প্রথমেই তার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, উপযুক্ত কারখানাবাড়ী নির্মাণ, কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাস বা সাজসজ্জা, কারখানার বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ, উপযুক্ত পরিমাণ মালমশলা মজুতকরণ, উৎপাদনের মোট ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও পড়তা হিসাবের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা দরকার হয়। কারখানার যাবতীয় কার্যকলাপের হিসাবপত্র যে অফিসে থাকে, সে অফিসই হল কারবারের মূল কেন্দ্র। এই জন্য অফিসের গুরুত্বও কম নয়। সেজন্য বর্তমানে অফিসের উপযুক্ত অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, বিজ্ঞানসম্মত নীতিতে কাজ পরিচালন, নানাবিধ সময় এবং শ্রম সংক্ষেপের যন্ত্রাদির ব্যবহার ইত্যাদি প্রবর্তিত হচ্ছে।

স্থান নির্বাচনের বা অবস্থানের সমস্যা (THE PROBLEM OF LOCATION)

কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তনের সমস্যার (২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মত তার অবস্থানের সমস্যাও একটি গুরুতর বিষয়। তা শুধু উদ্যোক্তার ইচ্ছামত স্থির হয় না। কারবারী প্রতিষ্ঠানের আসল লক্ষ্য হল সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা উপার্জন। এজন্য যেমন অবস্থানুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন[1] প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তার কাম্য অবস্থান[2] কাম্য অবস্থানের প্রশ্নটির সমাধান বহুবিধ বিষয়ের বিবেচনার উপর নির্ভর করে এবং সেসবের ভারসাম্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অবস্থানের সমস্যা বলতে দুটি বিষয় বোঝায়—ক. শিল্পের অবস্থান বা স্থানীকরণ[3] এবং খ. কারখানার অবস্থান বা স্থান নির্বাচন[4]। প্রথমটি হল গোটা শিল্পের সমস্যা. দ্বিতীয়টি হল প্রতিষ্ঠানবিশেষের সমস্যা।

শিল্পের অবস্থান নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ
FACTORS OF LOCATION OF INDUSTRY

শিল্পের অবস্থান নির্ধারণকারী বিষয়গুলি মুখ্য[5] ও গৌণ[6], এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (ক) **মুখ্য নির্ধারকঃ** কাঁচামাল, শক্তি ও জ্বালানী এবং শ্রমিকের সহজ লভ্যতা, বাজারের নৈকট্য, পরিবহণের সুবিধা এবং সামরিক গুরুত্ব বা জাতীয় নিরাপত্তা প্রভৃতিকে মুখ্য বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। (খ) **গৌণ নির্ধারকঃ** ঐতিহাসিক আকস্মিকতা বা স্থানবিশেষে প্রথম প্রতিষ্ঠান স্থাপনাজনিত ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ[7], অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকা, আর্থিক, সুবিধা, ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি গৌণ বিষয়রূপে গণ্য হয়।

ক. মুখ্য নির্ধারকঃ

১. কাঁচামাল[8]ঃ কাঁচামাল প্রধানত দুই শ্রেণীর। বালি, মাটি, জল প্রভৃতি, যা সর্বত্রই পাওয়া যায়। যে সব শিল্প এরকম কাঁচামালের উপর নির্ভর করে তাদের কোন বিশেষ স্থানে স্থানীকরণ ঘটে না। আর এক রকম কাঁচামাল হল খনিজ পদার্থ, কাঠ, কয়লা, আখ ইত্যাদির মত জিনিস যা সর্বত্র পাওয়া যায় না। এদের স্থানীকৃত কাঁচামাল[9]

---

1. Optimum size. 2. Optimum location. 3. Location of industry.
4. Plant location or site selection. 5. Primary. 6. Secondary.
7. Historical accident or momentum of early start.
8. Raw material. 9. Localised raw material.

বলে। এরা আবার দু'রকমের; যথা—বিশুদ্ধ কাঁচামাল[10] ও স্থূল কাঁচামাল[11]। পাট, তুলা, পশম প্রভৃতি যে সব কাঁচামালের দ্বারা তৈরী পণ্যের ওজন কাঁচামালের ওজনের সমান হয় তা হল বিশুদ্ধ কাঁচামাল; আর আখ, লোহা-আকরিক, কয়লা প্রভৃতি যে সব কাঁচামালের দ্বারা তৈরী পণ্যের ওজন কাঁচামালের ওজনের ভগ্নাংশ মাত্র হয় সেগুলি হল স্থূল কাঁচামাল। বিশুদ্ধ কাঁচামাল ব্যবহারকারী শিল্পগুলি যেমন কাঁচামালের উৎপাদক অঞ্চলে স্থানীভূত হতে পারে, তেমনি আবার অন্যান্য সুবিধা বেশি হলে তা বাজারের নিকটবর্তী অঞ্চলেও আকৃষ্ট হতে পারে। চটকল ও কাপড়ের কল শিল্প এর দৃষ্টান্ত। কিন্তু স্থূল কাঁচামাল ব্যবহারকারী শিল্পগুলি সর্বদাই কাঁচামাল উৎপাদক অঞ্চলে আকৃষ্ট হয়। কারণ তাতে কাঁচামালের পরিবহণ ব্যয় কম এবং অল্প ওজনের তৈরী পণ্য কম পরিবহণ খরচে বাজারে পাঠান যায়। এই জন্য লৌহ-ইস্পাত শিল্প ও চিনি শিল্প প্রভৃতি কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চলে আকৃষ্ট হয়।

২. শক্তি ও জ্বালানী[12]ঃ আগে কয়লাই শক্তি ও জ্বালানীর একমাত্র উৎস ছিল। সেজন্য অতীতে লৌহ ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প কয়লা খনির নিকটবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হত। কিন্তু বর্তমানে খনিজ তৈল ও বিদ্যুৎশক্তি প্রাধান্য লাভ করায় এবং বিশেষত, দূরবর্তী স্থানেও সস্তায় বিদ্যুতের যোগান সম্ভব হওয়ায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পগুলি ছড়িয়ে পড়ছে ও অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা শিল্পস্থানীকরণ নির্ধারিত হচ্ছে। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে ইদানীংকালে যে শিল্প সম্প্রসারণ ঘটছে তা জলবিদ্যুতের উৎপাদন ছাড়া সম্ভব হত না।

৩. শ্রমশক্তি[13]ঃ যেখানে সস্তা মজুরিতে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক সারা বৎসর পাওয়া যায়, সেখানে শিল্পগুলি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে। কলকাতা বোম্বাই বা আমেদাবাদে শিল্পস্থানীকরণের পিছনে এই বিষয়টি অন্যতম শক্তিরূপে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, কোন অঞ্চলের শ্রমশক্তি যদি সচলতা হারায়, তবেই তা সেখানে শিল্প আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু যদি শ্রমের সচলতা থাকে তবে, শিল্পকে আকৃষ্ট না করে নিজেই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আসামের চা বাগিচা শিল্পে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের তুলা ও চিনি শিল্পে বাইরে থেকে শ্রমিক এনে চা বাগিচা ও তুলা এবং আখ চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

৪. বাজারঃ বাজারের নৈকট্য শিল্পস্থানীকরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে বটে, তবে সব শিল্পের ক্ষেত্রে এর প্রভাব এক নয়। যে সব শিল্প বিশুদ্ধ, অর্থাৎ এমন কাঁচামাল ব্যবহার করে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যার ওজন বিশেষ কমে না, ফলে কাঁচামাল ও তৈরী পণ্যের ওজন প্রায় একই হয় (যেমন তুলা বা পাট), বা যে সব শিল্প এমন পণ্য উৎপাদন করে যা ভঙ্গুর (যেমন কাঁচ ও কাঁচের জিনিস), কিংবা যে সকল শিল্প শীঘ্র পচনশীল প্রকৃতির দ্রব্য উৎপাদন করে (যেমন রুটি), অথবা যে সব শিল্পের পণ্য ওজনে খুব ভারী বা আয়তনে বড় হয় (যেমন ইট)—সে সব শিল্প সর্বদাই বাজারের কাছাকাছি স্থাপিত হয়। যে সব শিল্পের কাঁচামাল বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হয় তাও সাধারণত বাজারের কাছে আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

৫. পরিবহণঃ সকল শিল্পের স্থানীকরণেই পরিবহণের সুবিধা কম বেশী প্রভাব বিস্তার করে। কারণ, যেখানে সড়ক, রেল বা জলপথ প্রভৃতি কোন প্রকার পরিবহণের ব্যবস্থা নাই, সেখানে কাঁচামাল কিংবা অন্যান্য অনেক সুবিধা থাকলেও কখনই শিল্প স্থাপিত হতে পারে না। পরিবহণ ব্যবস্থা ও তার মাশুল স্বভাবতই শিল্প স্থানীকরণকে প্রভাবিত করে। এজন্য সর্বত্রই পরিবহণ রেখার কাছাকাছি স্থানে শিল্প স্থানীকরণ ঘটে থাকে।

10. Pure material.
11. Gross material.
12. Power and fuel.
13. Labour.

তবে মাশুল বেশি হলে, কাঁচামালের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজারের নিকটবর্তী স্থানে এবং মাশুলের হার অল্প হলে (যেমন ভারতীয় রেলপথে দূরবর্তী স্থানগামী এবং ভারী ও বৃহদায়তন দ্রব্যের মাশুলের হার অল্প) বাজার থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে (যেখানে অন্যান্য সুবিধা বেশি) শিল্প স্থানীকরণ ঘটতে পারে।

৬. সামরিক গুরুত্ব[14]**:** ইদানিংকালে যুদ্ধের সময় শত্রু বিমানের আক্রমণে শিল্পাঞ্চলগুলি সহজেই বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে শিল্পের কেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব বেড়েছে।

খ. গৌণ নির্ধারক:

৭. ঐতিহাসিক আকস্মিকতা ও প্রথম প্রতিষ্ঠান স্থাপনজনিত ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ[15] **:** অতীতে কোন আকস্মিকতার দরুন কিংবা কোথাও কোন একটি শিল্প যে কারণেই হোক প্রথম স্থাপিত হয়েছিল বলে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সেখানে অন্যান্য শিল্পও আকৃষ্ট হতে থাকে এবং শিল্পস্থানীকরণের বিভিন্ন সুবিধাগুলি সৃষ্ট হতে থাকে। ফলে ক্রমেই স্থানটিতে শিল্পের কেন্দ্রীকরণ বাড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উত্তরপ্রদেশের কানপুরের নাম করা যায়।

৮. জলবায়ু ও মাটি: কৃষিজাত কাঁচামালনির্ভর শিল্পগুলি বিশেষভাবেই অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকা বিশিষ্ট অঞ্চলে আকৃষ্ট হয়। চা, কফি, রবার, তুলাবস্ত্র প্রভৃতি শিল্প এর দৃষ্টান্ত। আর্দ্র বাতাস সুতা প্রস্তুতের পক্ষে প্রয়োজন বলে যে সকল অঞ্চলে বেশি তাপমাত্রা ও বাতাসে বেশি আর্দ্রতা আছে সেখানে তুলাবস্ত্র শিল্প আকৃষ্ট হয়। তেমনি অনেক ক্ষেত্রে জল নিকাশের ব্যবস্থা, শিল্পজাত আবর্জনাদি ফেলার উপযুক্ত স্থান প্রভৃতি সুবিধাও শিল্পের স্থান নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে। তবে, আধুনিক কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সাহায্যে কারখানার অভ্যন্তরে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হওয়ায় শিল্পের স্থানীকরণে জলবায়ুর প্রভাব কমছে। অবশ্য এতে উৎপাদন ব্যয় বেশী পড়ে এবং সেজন্য সর্বত্র ও সব ক্ষেত্রে এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না।

৯. আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা: পুঁজি ও ঋণ হিসাবে সহজে অর্থ সংগ্রহের সুবিধা, গুদামজাতকরণের সুবিধা ইত্যাদিও অনেক পরিমাণে নূতন শিল্পকে আকৃষ্ট করে। তবে, পুঁজির সচলতা বর্তমান কালে অনেক বেড়েছে বলে শিল্প স্থানীকরণে এর প্রভাব কিছু কমেছে। অনেক সময়ে সরকার নূতন নূতন শিল্পাঞ্চল গঠন করার ইচ্ছায় পুরণো শিল্পাঞ্চলগুলির বাইরে নূতন স্থানে শিল্প স্থাপন করলে বিশেষ আর্থিক সাহায্য দানের নীতি গ্রহণ করলে, সে অনুযায়ী নূতন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠতে পারে।

১০. ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব: অনেক সময় কোন একটি বিশেষ স্থানের প্রতি উদ্যোক্তাদের পক্ষপাতিত্ব থাকলে, (যেমন নিজ গ্রাম, শহর বা প্রদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইচ্ছা) সেখানে অন্যান্য সুবিধা না থাকলেও এবং ঐ প্রচেষ্টা সফল হলে পরবর্তী-কালে তা বৃহৎ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়ে অন্যান্য শিল্প আকর্ষণ করতে পারে।

ভারতে কয়েকটি প্রধান শিল্পের অবস্থান
LOCATION OF SOME INDIAN INDUSTRIES

ভারতের প্রধান প্রধান কয়েকটি শিল্পের অবস্থান নির্ধারণে বা স্থান নির্বাচনে যে সব নির্ধারক বিষয়গুলি প্রভাব বিস্তার করেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

১. চটকল শিল্প: ভারতের ১১৩টি চটকলের মধ্যে ১০১টি পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার কাছে, ৪টি অন্ধ্রে, ৩টি বিহারে, ৩টি উত্তর প্রদেশে, ১টি মধ্য প্রদেশে ও ১টি আসামে

---

14. Strategic Consideration.
15. Historical accident or momentum of the early start.

অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার কাছে অধিকাংশ চটকল স্থাপনের কারণ হলঃ (১) এই অঞ্চলে কাঁচাপাটের (অর্থাৎ কাঁচামালের) পর্যাপ্ত যোগান, (২) অপেক্ষাকৃত কম খরচে নানা প্রকার পরিবহণের এবং সড়ক ও রেলপথের সুবিধা, (৩) নিকটবর্তী রাণীগঞ্জের কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তির সুলভ ও সহজলভ্যতা, (৪) সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান, (৫) কলকাতা বন্দর থেকে রপ্তানির সুবিধা (৬) ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলির অবস্থিতি প্রভৃতি।

২. ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পঃ অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিল্পগুলির মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের অন্তর্গত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানগুলিও পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত; যদিও অতি সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে এই শিল্পটি বিস্তারলাভ করছে। **কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে এই শিল্পটি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হলঃ** (১) এর প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যথা, কয়লা ও লৌহইস্পাত ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লা খনি এবং বার্ণপুর ও দুর্গাপুরের লৌহইস্পাত কারখানা থেকে সহজে পাওয়া যায়; (২) এই অঞ্চলে সুদক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান রয়েছে। (৩) তৈরী দ্রব্যগুলি দেশের নানা স্থানে পাঠানোর উপযোগী সুলভ সড়ক ও রেলপরিবহণের সুবিধা রয়েছে। (৪) বিদ্যুতের সুলভ ও পর্যাপ্ত যোগান পাওয়া যায়। (৫) নিকটবর্তী কলকাতা বন্দর মারফৎ বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি এবং তৈরী পণ্য বিদেশে রপ্তানী সুবিধা বর্তমান। (৬) অর্থ-সংস্থানের জন্য ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলি রয়েছে। এবং (৭) কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল শিল্প সমৃদ্ধ হওয়ায় এখানে নানারূপ ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের ভাল বাজারও বর্তমান।

৩. তুলাবস্ত্র শিল্পঃ ভারতের সর্বত্র তুলাবস্ত্র কল থাকলেও, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে তা সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত। সেখানে এর স্থানিকতার কারণ হল, (১) নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে দেশী কাঁচা তুলার সুলভ ও সহজলভ্যতা, (২) নিকটবর্তী বোম্বাই বন্দর দিয়ে মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উৎকৃষ্ট তুলা আমদানির এবং বিদেশে কাপড় রপ্তানির সুবিধা, (৩) পরিবহণ, (৪) সুলভ বিদ্যুৎশক্তি ও (৫) সুলভ এবং দক্ষ শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান এবং (৬) নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলির অবস্থিতি।

কারখানার স্থান মনোনয়ন (SITE SELECTION)

কোন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সময় উদ্যোক্তাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে কারখানার জন্য উপযুক্ত স্থানটি স্থির করতে হয়।

যে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে ও যে প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করা হবে তার প্রকৃতির কথা মনে রেখে, পুরণো কোনও শিল্পাঞ্চলে কারখানাটি প্রতিষ্ঠা করা হবে কি না এবং তা হলে কোন্ শিল্পাঞ্চলটিতে তা স্থাপন করা হবে তা শিল্পস্থানী-করণের নির্ধারণকারী বিষয়গুলি বিবেচনার দ্বারা স্থির করার পর উদ্যোক্তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে তা ঐ শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত প্রধান শহরে স্থাপন করা হবে না কি কোন নিকটবর্তী শহরতলীতে বা গ্রামে স্থাপন করা হবে। অঞ্চলটি নির্বাচনের পর সেখানে কারখানার যথাযথ স্থান[16] স্থির করার সময় উদ্যোক্তাকে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হয় তা হলঃ

১. স্থানটিতে বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে কিনা এবং থাকলে সেখানে কি কি জিনিস উৎপন্ন হচ্ছে। ঐগুলির মধ্যে তার উৎপাদনীয় দ্রব্যের পক্ষে কাঁচামাল বা আনুষঙ্গিক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন কোন দ্রব্য আছে কি না; বলা বাহুল্য সেরূপ কোনও দ্রব্য থাকলে তাঁর পক্ষে সুবিধা হবে।

16. Exact site.

২. কোন্ কোন্ জ্বালানী ও শক্তি সেখানে সহজলভ্য (কয়লা, খনিজ তৈল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি) এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের সরবরাহ সেখানে আছে কিনা; কারণ তাঁর জ্বালানী, শক্তি ও জলের অব্যাহত পর্যাপ্ত যোগান চাই।

৩. সড়ক, রেলপথ বা জলপথ পরিবহণের ভাল ব্যবস্থা আছে কিনা এবং রেলপথের সংযোগ থাকলে সেখানে সাইডিং-এর কি সুবিধা আছে। এরূপ সুবিধা তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক।

৪. কারখানার দূষিত জল নিকাশের বা কারখানার আবর্জনাদি ফেলার সুবিধা সেখানে আছে কিনা; সকল কারখানাতেই এই ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

৫. সেখানে সারা বৎসরব্যাপী শ্রমের যোগান আছে কিনা এবং শ্রমিকরা দক্ষ, স্বল্পদক্ষ বা অদক্ষ প্রভৃতি কোন্ শ্রেণীর এবং তারা তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রেণীর কিনা

৬. সেখানে প্রায়ই শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটে কি না; কারণ তাতে তাঁর উৎপাদন ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকা থাকে।

৭. সেখানে স্থানীয় সরকারের শ্রম, কর প্রভৃতি সংক্রান্ত নীতি কিরূপ; এইগুলি তাঁর পক্ষে যত অনুকূল হবে, স্থানটি তাঁর পক্ষে তত বাঞ্ছনীয় হবে।

৮. সেখানে কারখানার বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের পক্ষে যথেষ্ট জায়গা আছে কিনা, তা না হ'লে ভবিষ্যতে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

৯ সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পরিবেশ মনোরম ও স্থানটি মোটমুটি স্বাস্থ্যকর কিনা।

১০. সেখানে শ্রমিক কর্মচারিগণের প্রয়োজনীয় বাসস্থানের বর্তমান বন্দোবস্ত কিরূপ রয়েছে; এটা যত বেশি থাকবে ততই তাঁর সুবিধা। কারণ, তা হলে শ্রমিক কর্মচারিগণের বাসস্থান নির্মাণের জন্য তাঁর বেশী খরচ করার প্রয়োজন হবে না।

১১. সেখানে অগ্নিকাণ্ড ও চুরিডাকাতির হাত থেকে রক্ষার কি রকম ব্যবস্থা আছে; কারখানা ও সম্পত্তির নিরাপত্তার দিকটি কখনই অবহেলা করার নয়।

১২. সেখানে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কিরূপ, বেশি সংখ্যক ব্যাঙ্ক থাকলে তাঁর ঋণগ্রহণের সুবিধা বেশি হবে।

১৩. সেখানে বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি আছে কিনা; শ্রমিককর্মচারিগণের পরিবারবর্গের জন্য এই সকল সুবিধা অত্যাবশ্যক। না হলে তাঁকে নিজ ব্যয়ে এসকলের ব্যবস্থা করতে হতে পারে।

১৪. সেখানে আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা কি রকম আছে; সেটা তার শ্রমিককর্মিগণের পক্ষে আবশ্যক।

১৫. সেখানে জমির দর কিরূপ; দর কম হলে তাঁকে জমির জন্য কম বিনিয়োগ করলেই চলবে এবং তাঁর পক্ষে যথেষ্ট জায়গা কেনা সম্ভব হবে।

১৬. সেখানে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান কিরূপ; কারণ উৎপাদনের অবিরাম গতির জন্য সুলভ কাঁচামালের অব্যাহত যোগান প্রয়োজন।

১৭. উৎপাদনীয় দ্রব্যটির স্থানীয় বাজার আছে কিনা বা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব কিনা; তাতে স্থানীয় ভাবেই তাঁর কিছু বিক্রয়ের পরিমাণ সুনিশ্চিত হবে;—ইত্যাদি।

বিভিন্ন স্থানে উপরোক্ত বিষয়গুলি কিরূপ ও কতটা আছে তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পর যে স্থানটিতে তুলনামূলক ভাবে ঐ সব বিষয়ের সুবিধাগুলি সর্বাধিক, অথচ কোন উল্লেখযোগ্য প্রবল অসুবিধা নাই, উদ্যোক্তা সেরূপ স্থানটিই মনোনয়ন করবেন।

কারখানা বাড়ী (FACTORY BUILDING)

কারখানা বাড়ীতে শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি নিয়ে কর্মব্যস্ত থাকে। কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্যাদি, অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের গুদাম এবং কার্যালয় ইত্যাদি সেখানে থাকে। কারবারের প্রধান কাজ—উৎপাদন এখানেই ঘটে।

কারখানার বাড়ীর প্রধান কাজ হল, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য, রৌদ্র বৃষ্টি থেকে রক্ষা করা। আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, তাপ ও আলো নিয়ন্ত্রণ করে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বাড়ীর অভ্যন্তরীণ ভাগ দেওয়াল দিয়ে বিভক্ত করে আগুনের বিপদ থেকে রক্ষা করা, এক বিভাগের গোলমালে[17] অন্য বিভাগে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না দেওয়া এবং ধোঁয়া, ময়লা, ধুলোবালি প্রভৃতি থেকে বিভাগগুলিকে রক্ষা করা ইত্যাদি এর ফলে সম্ভব হয়।

বাড়ীর গঠন, উচ্চতা, আকার, আয়তন প্রভৃতি কিরূপ হবে তা অনেকাংশে শিল্পের প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন, লৌহ-ইস্পাত শিল্পের কারখানা বাড়ী সর্বদাই সুউচ্চ এবং ছাউনীবিশিষ্ট হয়। তা কখনও পাকা দেওয়াল ঘেরা বাড়ী হয় না। চুল্লীর উচ্চ তাপমাত্রাই এর অন্যতম প্রধান কারণ। এই কারখানার শ্রমিকদের মাথার উপর সচল ভারোত্তোলন যন্ত্র[18] সর্বদাই চলাচল করতে থাকে, সেজন্য কারখানা বাড়ীর উচ্চতা বেশি হয়। আবার, যে কারখানায় অত্যন্ত ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তার বাড়ী সর্বদাই একতলা হয়ে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির কম্পনে যাতে দালানে ফাটল না ধরে সেজন্য বাড়ীর ভিত্ ও গঠন খুব সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। কারখানা বাড়ীর বিভিন্ন অংশে আলো ও বাতাসের এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য সাধারণত E, F, H, L, T এবং U প্রভৃতি অক্ষরের আকারে সেগুলি নির্মিত হয়।

কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাস
PLANT LAYOUT OR LAYOUT OF WORKS

সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সম্পন্ন সর্বাধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমশক্তি, কাঁচামাল ও হাতিয়ার প্রভৃতির ওঠান, নামান, স্থাপন, অপসারণ[19] ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের সুদক্ষ ব্যবহার-কৌশলপূর্ণ বন্দোবস্তকেই কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাস[20] বলা যায়।

কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাসের মূল লক্ষ্য হল—

১. প্রতিটি তলে[21] যে স্থান রয়েছে তার যেন সর্বাধিক ব্যবহার ঘটে;

২. কাঁচামাল, হাতিয়ার ও নির্মাণাধীন দ্রব্য আনতে ও সরাতে যেন সর্বাধিক ব্যয়-সংকোচ হয়;

৩. কর্মরত শ্রমিকদের কাজের যেন উত্তম তদারকি চলে;

৪. কারখানার ভিতর কোথাও যেন নির্ধারিত গতিতে উৎপাদন প্রবাহ চলার পথে কোনও বিঘ্ন না ঘটে।

৫. শ্রমিককর্মী, কাঁচামাল, নির্মাণাধীন দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাসের নির্ধারক বিষয়সমূহ[22] : যে কোন কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাস কিরূপ হবে তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

১. **শিল্পটির প্রকৃতি**[23] : কতকগুলি শিল্পে অবিরাম ধারায় একদিকে কাঁচামাল যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চালিত করে পর পর কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা অবশেষে অন্যদিকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত পণ্য নির্গত হয়। কাগজ, সুতা প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্প এই ধরনের।

---

17. Noise. 18. Overhead cranes. 19. Handling.
20. Plant or works layout. 21. Floors.
22. Factors determining Plant layout. 23. The type of the industry.

সম্পাদিত হওয়ায় এতে তদারকির বিশেষায়ণ সম্ভব হয়। এবং (৪) এতে শ্রমের বিশেষায়ণ বেশি পরিমাণে ঘটে বলে শ্রমশক্তিরও পূর্ণতর ব্যবহার ঘটে।

অসুবিধা ঃ (১) এতে বেশি জায়গা লাগে। (২) বারংবার নির্মাণাধীন দ্রব্যগুলি এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে আনা-নেওয়া করতে হয়। ফলে একটি দ্রব্য প্রস্তুত করতে বেশি সময় লাগে ও উৎপাদন গতি নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা দেখা দেয়। (৩) অনেক সময় কোন কোন বিভাগে ব্যবহারের অপেক্ষায় পড়ে-থাকা কাঁচামাল ও নির্মাণাধীন দ্রব্যের পরিমাণ বেশি হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কাজ জমে যায়।

কাজের বিভাগীয়করণ ঃ একজাতীয় কাজগুলির একত্রীকরণ

DEPARTMENTALISATION OF WORK & GROUPING OF ACITIVIES

প্রত্যেক শিল্প কারবারের কার্যাবলীরই দুটি দিক থাকে ঃ (১) তার বাণিজ্যিক দিক। কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় প্রভৃতি এর অন্তর্গত। (২) তার উৎপাদনের দিক। কারখানা চালনা ও উৎপাদনের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি এর অন্তর্গত।

আধুনিক কালে কারিগরি ক্ষেত্রের ক্রমাগত উন্নতির ফলে উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলির জটিলতা ক্রমেই বাড়ছে। সেজন্য কারখানাতে উৎপাদনের সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে কাজগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে সেগুলির ভার এক-একটি বিভাগের হাতে অর্পণ করা হয়। কাজের এই বিভাগে সরলরৈখিক পদ্ধতি[৩৬], পদস্থ কর্মচারী ও সরলরৈখিক পদ্ধতি[৩৭] কিংবা ক্রিয়াগত পদ্ধতি[৩৮] প্রভৃতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিভাগ গঠনের বিবিধ ভিত্তি[৩৯] ঃ সকল উৎপাদনকারী কারবারী প্রতিষ্ঠানেই তার বিবিধ কার্যাবলী ও অধস্তন কর্মচারী এবং শ্রমিকগণকে কতকগুলি অংশে ভাগ করে এক একটি বিভাগ সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু নানাবিধ ভিত্তিতে এইরূপ বিভাগ গঠন করা যায়। যেমন, সৈন্যবাহিনীর ন্যায় **সংখ্যার ভিত্তিতে,** অর্থাৎ শ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। যেমন, ১০০ জন করে শ্রমিক নিয়ে এক একটি বিভাগ সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু (২) উচ্চতর উৎপাদন সংগঠনের পক্ষে তা উপযুক্ত নয়। (২) **উৎপাদিত দ্রব্যের ভিত্তিতে** বিভাগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। যে কারখানায় ৫টি বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সেখানে দ্রব্য অনুযায়ী পাঁচটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করা যেতে পারে। (৩) **খরিদ্দারগণের শ্রেণী অনুসারেও** বিভাগ সৃষ্টি করা যায়। (৪) যে সব প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত, তাদের পক্ষে **আঞ্চলিক ভিত্তিতে** প্রতি অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করা সুবিধাজনক হতে পারে। (৫) **উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসারে** পৃথক পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। (৬) প্রতিষ্ঠানের **বিবিধ** কার্যের প্রকৃতি অনুসারে পৃথক পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করা যায়।

ক্রিয়াভিত্তিক বিভাগ[৪০] ঃ এই শেষোক্ত ভিত্তি, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বিবিধ কাজ অনুসারে পৃথক পৃথক কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত পৃথক পৃথক বিভাগ সৃষ্টির পদ্ধতিটি বহু প্রতিষ্ঠানেই প্রচলিত হয়েছে। এর কারণ হল, কারবার চালাতে গিয়ে প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকেই কয়েকটি প্রধান প্রধান কাজ সম্পাদন করতে হয়, যেমন, উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণ[৪১], কাঁচামাল ও বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়[৪২], তৈয়ারী দ্রব্য বিক্রয়[৪৩], হিসাব প্রণয়ন[৪৪], শ্রমিককর্মী নিয়োগ ও চালনা[৪৫] এবং সমগ্র কারবার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আইনগত বিষয় ও অন্যান্য সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে পত্রালাপ ইত্যাদি[৪৬]। সুতরাং সরাসরি

---

36. Line system. 37. Line and staff system.
38. Functional system. 39. The basis of departmentalisation.
40. Departmentalisation of functions.
41. Production or manufacturing. 42. Purchasing
43. Sales or Marketing. 44. Accounting. 45. Personnel.
46. Legal matters and Centralised Correspondence.

এই সব সুস্পষ্ট বিভিন্ন কার্যাবলীর ভিত্তিতে পৃথক পৃথক বিভাগ গঠন করে, তাদের কাজ অনুযায়ী এক একটির ভার অর্পণ করাই ঐ কাজগুলি সম্পাদন করার একটি প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হয়। তা যেমন স্বাভাবিক এবং বহুদিন যাবৎ প্রচলিত ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি, তেমনি এতে বিভাগীয় এবং কর্মীদের বিশেষায়ণও সহজে ঘটতে পারে।

এই ভাবে কাজের প্রকৃতি অনুসারে সৃষ্ট, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের যে সব প্রধান প্রধান বিভাগ প্রয়োজন রেখাচিত্র এবং আলোচনা সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করা হল।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ

DEPARTMENTS IN A MANUFACTURING ORGANISATION

১. উৎপাদন বিভাগ[৪৭]**:** উৎপাদন বিভাগটি হল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মূল বিভাগ। প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র, মূল কার্যস্থল। অন্যান্য বিভাগগুলি হল এর সহায়ক বা সেবাকারী বিভাগ[৪৮]।

উৎপাদন বিভাগের কাজ হল উৎপাদন করা। কিন্তু উৎপাদন করার আগে থেকে পরবর্তী কিছু দূর পর্যন্ত পরপর অনেকগুলি কাজ উৎপাদন বিভাগকে সম্পাদন করতে হয়। এই কাজগুলিকে প্রাক-উৎপাদন[৪৯], উৎপাদন এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়রূপে গণ্য করা যায়। এই সব কাজগুলি স্পষ্টতঃই পৃথক এবং তদনুযায়ী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক একটি পৃথক উপ-বিভাগের উপর এই সব কাজ নির্বাহের ভার অর্পণ করা হয়।

ক. প্রাক্-উৎপাদন পর্যায়সমূহ[৫০] **:** উৎপাদনের কাজ আরম্ভ ও সম্পূর্ণ করার অনেক আগেই উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় ও পর্যায়গুলি সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা[৫১] প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। যে দ্রব্যটি উৎপন্ন হবে, তার প্রতিটি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও নির্মীয়মান অংশের কাজ কোথা থেকে আরম্ভ হবে, কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া-স্তরের[৫২] মধ্য দিয়ে কিরূপে তা যাবে তার নক্সাটি কি হবে, উৎপাদনের হার বা গতিবেগ[৫৩] কি হবে, কোন্ তারিখে উৎপাদন আরম্ভ হবে, কোন্ তারিখে শেষ হবে, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রভৃতির সংগ্রহের ও যোগানের ব্যবস্থা কি হবে এবং পরিকল্পনামত কাজ অগ্রসর হচ্ছে কিনা, তা সুনিশ্চিত করার জন্য তদারকি ব্যবস্থাই বা কিরকম হবে—এইসব যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। একে **উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ**[৫৪] বলে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল উৎপাদনের কাজ পরিচালনাকালে কি কি অসুবিধা দেখা দিতে পারে তা আগে থেকেই যথাসম্ভব অনুমান করে তা দূর করার ব্যবস্থা করে রাখা। এরূপ উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের আরেক উদ্দেশ্য হল আগে থেকেই বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া ও তাদের গতিবেগের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা।

খ. উৎপাদন পর্যায়[৫৫]**:** এরূপ একটি সামগ্রিক উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম বিশেষজ্ঞ এবং পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের পরামর্শে প্রস্তুত হওয়ার পর তা কাজে পরিণত করার ভার দেওয়া হয় ওয়ার্কস ম্যানেজার বা ওয়ার্কস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উপর। ওয়ার্কস ম্যানেজার বা ওয়ার্কস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও তার অধীন কর্মীরা লাইন পদ্ধতির কর্মী। তাদের মধ্যে আছে ফোরম্যান, চার্জম্যান ও সাধারণ শ্রমিকরা। এদের দ্বারা উৎপাদন পরিকল্পনাটি কাজে রূপায়িত হয়।

47. Production or Manufacturing Department.
48. Service Department. 49. Pre-production.
50. Pre-production stage. 51. Production Planning.
52. Routing. 53. Scheduling. 54. Production Control.
55. Actual Production.

একটি দ্রব্যউৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনসংগঠনের ছক্
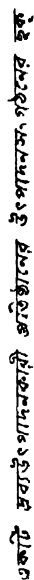
গ. খরচনিয়ন্ত্রণ[56] **:** উৎপাদন বিভাগ যাতে নির্দিষ্ট মান অনুসারে উৎপাদন ঘটেছে কিনা তা বুঝতে পারে এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়াগুলির[57] মান যাতে নির্দিষ্ট হয় সেজন্য তদনুযায়ী খরচের আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করা হয়। একে অনেক সময় উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণ বাজেট[58] বলে।

ঘ. পরিদর্শন বা তদারকি[59] **:** নির্দিষ্ট মান অনুসারে উৎপাদিত সামগ্রীর উৎকর্ষ পরিমাপ করার প্রক্রিয়াকে তদারকি বলা যায়। উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ যাতে নির্দিষ্ট-মান অনুযায়ী থাকে তা সুনিশ্চিত করার জন্য তদারকির কাজের গুরুত্ব যথেষ্ট। এজন্য আধুনিক কালে পরিসংখ্যান-ভিত্তিক উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি[60] উদ্ভাবিত হয়েছে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে এজন্য একটি পৃথক তদারকি বিভাগ[61] সৃষ্টি করা হয়। ফোরম্যান, উৎপাদন, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভাগ প্রভৃতিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করে।

ঙ. মোড়কবাঁধাই ও মজুদকরণ[62] **:** উৎপাদন বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে মজুদ বিভাগ ও মোড়ক বাঁধাই বিভাগ দুটি। সম্ভব হলে তদারকি বা পরিদর্শন বিভাগ ও মজুদ বিভাগ পরস্পরের কাছে থাকা দরকার। তাতে পণ্য-তৈরীর তদারকির শেষে তা তাড়াতাড়ি মজুদ বিভাগে মজুদ করা সম্ভব হতে পারে। ফলে তৈরী জিনিসগুলির বার বার আনা-নেওয়ার[63] দরুন অহেতুক সময় ও অর্থব্যয় হয় না।

মজুদ বিভাগের কাছাকাছি মোড়ক বাঁধাই ও পণ্যপ্রেরণ বা ডেসপ্যাচ[64] বিভাগটি স্থাপন করা প্রয়োজন। তাতে মজুদ বিভাগ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী সহজে পণ্যের মোড়ক বাঁধাই ও খরিদ্দারের নিকট তা পাঠানোর সুবিধা হয়। তবে প্রধান পথটির কাছাকাছি দ্রব্যপ্রেরণ বিভাগের অবস্থিতি বাঞ্ছনীয়। তাতে দ্রব্যগুলি গন্তব্যস্থলে পাঠাতে সুবিধা হয়।

২. ক্রয়বিভাগ[65] **:** ক্রয়বিভাগের প্রধান কাজ হল বর্তমান অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত দামে, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য যখন এবং যেখানে আবশ্যক, কারবারকে, সেভাবে তা সরবরাহ করা।

ক. ক্রয়বিভাগের উদ্দেশ্য : এর মূল **উদ্দেশ্য** হল,—১. কারবারকে সঠিক সময়-মত, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক ধরনের কাঁচামাল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ও সেবাকর্ম যে স্থানটিতে প্রয়োজন ঠিক সেইখানে সরবরাহ করা ও তা অব্যাহত রাখা। এবং

২. প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সর্বাপেক্ষা কম দামে খরিদ বা সংগ্রহ করা।

ক্রয় বিভাগের কাজ : উপরোক্ত উদ্দেশ্য দুটি পূর্ণ করার জন্য ক্রয় বিভাগকে নিম্নোক্ত **কাজগুলি** নির্বাহ করতে হয়—

১. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীগুলির বিশদ বিবরণ, যথা, মাপজোখ, উৎকর্ষ ইত্যাদি নির্ধারণ করা।

২. বিক্রেতাদের কাছ থেকে মূল্যজ্ঞাপন পত্র[66] ও দরপত্র[67] আহ্বান করা ও তা থেকে উপযুক্ত যোগানদার বাছাই করা।

৩. অল্প পরিমাণে খরিদের ক্ষেত্রে সরাসরি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা।

৪. কোম্পানীর ক্রয় সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করা।

৫. ক্রীত দ্রব্যাদির পরিমাণ, সংখ্যা ও উৎকর্ষ প্রভৃতি সম্পর্কে তদারক করা ও

56. Cost Control. 57. Operations. 58. Manufacturing Budget.
59. Inspection. 60. Statistical Quality Control method.
61. Inspection Department. 62. Packing and storage. 63. Handling.
64. Despatch. 65. Purchasing Department.
66. Quotation. 67. Tender.

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সরবরাহকারীরা সরবরাহ করছে কিনা সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও তা সুনিশ্চিত করা।

৬. কোন্ কোন্ সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রভৃতির সরবরাহ পাওয়া যেতে পারে এবং কোন্ কোন্ সরবরাহকারী নির্ভরযোগ্য সে সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। এবং

৭. বাজারের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকা।

খ. **ক্রয় বিভাগের সংগঠন** : আধুনিক বৃহদায়তন ও সম্প্রসারণশীল প্রতিষ্ঠানে ক্রয়ের দায়িত্বগুলি উপযুক্তরূপে পালনের জন্য একজন পদস্থ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অধীনে একটি পৃথক ক্রয়-বিভাগ স্থাপিত ও পরিচালিত হয়। ক্রয়-বিভাগটি হল আসলে একটি বিশেষজ্ঞ বিভাগ[৬৮]। তবে, এটি সাধারণত, রৈখিক প্রথায়[৬৯], জেনারেল ম্যানেজারের নিচে একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অধীনে কয়েকজন সহকারী ক্রয় কর্মচারী[৭০], টাইপিষ্ট প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয়। স্বভাবতই যে কারবারে এরূপ ক্রয়-বিভাগ স্থাপিত হয়, সেখানে কারবারের অন্যান্য বিভাগগুলি স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নিজেরা সরাসরি কেনে না। যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী কেনার কাজ কেন্দ্রীয় ভাবে ক্রয় বিভাগের মারফত সম্পাদিত হয়। এর সুবিধা এই যে, তাতে অনাবশ্যক খরচ বাঁচে, বিশেষজ্ঞ ক্রয় কর্মচারী মারফত উৎকৃষ্ট দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অল্প দামে খরিদ করা যায় এবং কারবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অব্যাহত যোগান সুনিশ্চিত হয়।

৩. **বিক্রয় বিভাগ**[৭১] : দ্রব্য বিক্রয় করার মধ্য দিয়ে কারবারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের কাজটি পরিণতি লাভ করে ও তার মুনাফা উপার্জন, অর্থাৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। সুতরাং কারবারের পক্ষে বিক্রয়ের কাজটি হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আধুনিক বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিক্রয় কাজ একটি উন্নত পর্যায়ের বিশেষায়ণে পরিণত হয়েছে। এজন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলিতে এটি পরিচালনার জন্য একটি পৃথক বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে। এর ভার একজন বিক্রয় ম্যানেজারের[৭২] উপর থাকে। তিনি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে দায়ী থাকেন। বিক্রয় ম্যানেজারের কাজ হল বিক্রয় বিভাগের সামগ্রিক কার্যাবলীর সঙ্গে উৎপাদন বিভাগের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন[৭৩] করা।

যে সব প্রতিষ্ঠানে সুস্পষ্টরূপে কতকগুলি পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দ্রব্য উৎপাদিত হয়, সেখানে কখনও কখনও একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয় বিভাগের পরিবর্তে দ্রব্যানুযায়ী পৃথক পৃথক বিক্রয় বিভাগ স্থাপিত হয়ে থাকে।

৪. **হিসাব প্রণয়ন বিভাগ**[৭৪] : প্রতিষ্ঠান বড় হলে একজন প্রধান হিসাবরক্ষক কর্মচারীর অধীনে একটি পৃথক হিসাব প্রণয়ন বিভাগ স্থাপিত হয়। উৎপাদন খরচ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব এবং কোম্পানীর উপরি খরচ[৭৫] গুলির হিসাব এই বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত ও রক্ষিত হয়। উৎপাদিত দ্রব্যগুলির পড়তা খরচের হিসাবও এই বিভাগের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রধান হিসাবরক্ষক সরাসরিভাবে জেনারেল ম্যানেজারের অধীন থাকেন।

৫. **শ্রমিক কর্মচারী বিভাগ**[৭৬] : একে অনেক ক্ষেত্রে শিল্পসম্পর্ক বিভাগও[৭৭] বলে। বেশি সংখ্যক শ্রমিককর্মী নিয়োগকারী বৃহদায়তনে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে একটি পৃথক শ্রমিককর্মী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তার সর্বময় ভার একজন শ্রমিককর্মী ব্যবস্থাপক বা পারসোনেল ম্যানেজারের উপর অর্পণ করা হয়। ফ্যাক্টরী ম্যানেজারের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় তাকে কাজ করতে হয়। অফিস, কারখানা, ক্রয়,

---

68. Staff Department. 69. Line System. 70. Purchasing Assistant.
71. Marketing or Sales Department. 72. Sales Manager.
73. Co-ordination. 74. Accounting Department. 75. Overhead Costs.
76. Personnel Department. 77. Industrial Relations Department.

বিক্রয়, প্রভৃতি সকল বিভাগের কর্মচারী ও শ্রমিক সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, অর্থাৎ তাদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, বরখাস্ত প্রভৃতি সবই এর এক্তিয়ারভুক্ত।

৬. কেন্দ্রীয় পত্রালাপ ও আইনগত বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ[৭৮] **:** অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, সরকার ও কারবার বহির্ভূত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও কারবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানাবিধ আইনগত পরামর্শ গ্রহণ ও ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতির জন্য জেনারেল ম্যানেজারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় পত্রালাপ ও আইনগত বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ স্থাপিত হয়ে থাকে।

বাজেটগত নিয়ন্ত্রণ (BUDGETARY CONTROL)

এতদিন যাবৎ সরকারী আয়-ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রেই বাজেট কথাটির ব্যবহার নিবদ্ধ ছিল। তার দ্বারা আগামী বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব বোঝাত। এই অর্থে বাজেট শব্দটির একটি আর্থিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু সম্প্রতি কারবারী জগতেও 'বাজেট' শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। শিল্প কারবারে বাজেটের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক প্রগতিশীল বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ দক্ষতা বৃদ্ধি অর্থাৎ অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য, বিভিন্ন স্তরে এর প্রয়োগ বাড়ছে।

অতীতে সম্পাদিত কাজের মান ও ফলাফল বিবেচনা করে, আগামী বৎসরের জন্য কার্যকলাপের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্দেশ করে, তা সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, শ্রমশক্তি, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল প্রভৃতি নানাবিধ সম্পদের সম্ভাব্য ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব প্রণয়নকেই কারবারী বাজেট বলা হয়। এইভাবে বাজেট দ্বারা পূর্ব পরিকল্পিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ ও কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণই আধুনিক কারবারগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

কারবারের বিভিন্ন বিভাগে, বিভাগীয় বাজেট তৈরী করে সেগুলির সমন্বয়ে[৭৯], সমগ্র কারবারের জন্য একটি সামগ্রিক বাজেট[৮০] প্রস্তুত করা হয়।

কারবারী বাজেট নিম্নোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা,—

১. বিক্রয় বাজেট[৮১]। ২. উৎপাদন বাজেট[৮২]। ৩. আর্থিক বাজেট[৮৩]। ৪. উৎপাদন-ক্ষমতা বাজেট[৮৪]; এটি আবার নিম্নলিখিত উপবিভাগে বিভক্ত--

ক. স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বাজেট[৮৫]; খ. কাঁচামালের বাজেট[৮৬]; গ সহায়ক দ্রব্যের বাজেট[৮৭]; ঘ. শ্রমশক্তির বাজেট[৮৮]; এবং ঙ. গবেষণা বাজেট[৮৯]।

একমাত্র বাজেটের মারফৎ নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই সামগ্রিকভাবে কারবারের ও তার অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন বিভাগের সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্দেশ ও ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। কারণ, প্রত্যেক পর্যায়ের ও বিভাগের কাজগুলি নির্দিষ্ট হওয়ায়, লক্ষ্যের সাথে সম্পাদিত কাজের তুলনা, কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা এবং তার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্ভব হয়ে থাকে। বাজেট দ্বারা কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের ফলেই কারবারের সম্পদসমূহের ব্যবহারে সর্বাধিক মিতব্যয়িতা সম্ভব হয়। এই জন্য আধুনিক কারবারে নিয়ন্ত্রণের উপায়[৯০] হিসাবে বাজেটের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে।

মজুদকরণ (STORAGE)

যন্ত্রপাতির উন্নতি, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি, শ্রমবিভাগের উন্নতি সাধন ইত্যাদি যেমন কারবারের মুনাফা বৃদ্ধির সহায়ক, তেমনি দ্রব্যাদি যথাযথভাবে মজুদ রাখা, সেসবের ক্ষয় ক্ষতি নিবারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সর্বদা উপযুক্ত পরিমাণে

---

78. Central Correspondence and Legal Matters' Department.
79. Co-ordinated. 80. Master Budget. 81. Sales Budget.
82. Production Budget. 83. Financial Budget.
84. Manufacturing Capacity Budget. 85. Physical Property Budget.
86. Raw materials Budget. 87. Supplies' Budget.
88. Labour Budget. 89. Research Budget. 90. Tool of control.

সামগ্রী মজুদ রাখা, মজুদঘরে[91] উপযুক্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদির ফলেও কারবারের অনেক অনাবশ্যক খরচ বন্ধ হয়ে মুনাফা বাড়তে পারে।

যে সকল জিনিস মজুদ করা হয়, পড়তার হিসাবের সুবিধার জন্য সেগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—

১. **কাঁচামাল ঃ** যা উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা হয়।

২. **সহায়ক দ্রব্য ঃ** যা পরোক্ষভাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—পিচ্ছিল কারক তৈল, ভেসেলীন, ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার্য তুলা ও পাটের আঁশ, প্যাকিং-এর জন্য কাগজ, কার্ড বোর্ড ইত্যাদি।

৩. **যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম।** এবং

৪. **উৎপন্ন দ্রব্য ঃ** যেখানে কাঁচামাল, উৎপাদনের সহায়ক দ্রব্যাদি এবং যন্ত্রপাতির সাজ-সরঞ্জাম ও অতিরিক্ত অংশাদি মজুদ থাকে, তাকে মজুদাগার বা মজুদঘর, এবং যে স্থানে উৎপন্ন দ্রব্যাদি মজুদ থাকে, তাকে মালগুদাম[93] বলে।

মজুদাগার ও মালগুদাম যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া দরকার। কারণ, তা না হলে দ্রব্য-সামগ্রী শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা সম্ভব হয় না এবং তার ফলে তাদের ওঠাতে নামাতে, রাখতে ও বের করতে অসুবিধা হয়। স্থানটি আর্দ্রতামুক্ত ও আলোবাতাস-যুক্ত হওয়া দরকার। কোন কোন জিনিস আবার শুষ্ক আবহাওয়ায় নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও প্রয়োজন। সমস্ত দ্রব্যই শ্রেণীবদ্ধভাবে 'র‍্যাক'[94] ও 'বিন'[95]-এ সাজিয়ে রাখা উচিত। অযথা সময় নষ্ট ও দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য অত্যন্ত উঁচু র‍্যাকের পরিবর্তে মাঝারি উচ্চতার র‍্যাকই ভাল।

'স্টোর লেজার'-এ মজুদ দ্রব্যাদির আলাদা আলাদা হিসাব রাখা হলেও, কাজের সুবিধার জন্য, প্রত্যেক 'র‍্যাক' বা 'বিনে'র সাথে রাখা স্টোর কার্ড বা বিন কার্ড-এ প্রত্যেক দ্রব্যের জমা ও খরচের যথাযথ হিসাব লেখা হয়। তাতে মজুদের পরিমাণ একনজরে জানা যায়।

অন্যান্য বিভাগের মত মজুদবিভাগের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে মজুদ সংরক্ষণ, মজুদবিভাগের ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষণ প্রয়োজন। এজন্য তার ভারপ্রাপ্ত মজুদ-রক্ষকেরও[96] অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার উপর কারবারের সাফল্য আংশিকভাবে নির্ভর করে।

পড়তা হিসাব ও উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
COST ACCOUNTS AND COST CONTROL

শিল্প কারবারে দ্রব্যের এককপিছু উৎপাদন খরচ বা পড়তার হিসাব করার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর উপর দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য ধার্য করা নির্ভর করে। বর্তমানের তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে সঠিকভাবে পড়তা দরের হিসাব করা ও সে অনুসারে বিক্রয়মূল্য ধার্য করার উপর কারবারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে. এই কাজে ভুল হলে কারবারের বিলক্ষণ লোকসান ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

পড়তা হিসাবের পদ্ধতি[97] বিশ্লেষণমূলক। অর্থাৎ, প্রতিটি কাজের বা দ্রব্যের একক পিছু কি পরিমাণ মজুরি, কাঁচামাল ও স্থির খরচ বাবদ কতটা খরচ হয়েছে তার পৃথক পৃথক হিসাব করা হয় ও এইরূপে প্রতি এককের মোট উৎপাদন খরচ বের করে বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়। পড়তা দরের সাথে কারবারের আর্থিক হিসাবের[98] ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আর্থিক হিসাব বিশ্লেষণমূলক নয়। তাতে সামগ্রিক-ভাবে কারবারের সর্বমোট আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা হয় এবং তা থেকে কারবারের লাভ-ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়।

---
91. Stores. 92. Store room or Store house. 93. Stock room.
94. Rack. 95. Bin. 96. Store-keeper. 97. Overhead cost.
98. Financial Accounts.

কারবারের মুনাফার পরিমাণ যেমন একদিকে বাজার দামের উপর নির্ভর করে, তেমনি তা উৎপাদন খরচের উপরও নির্ভর করে। সুতরাং, আধুনিক তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে সর্বদাই কারবারগুলি তাদের উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের চেষ্টা করে। পড়তা হিসাবপদ্ধতি ছাড়া উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ[৯৯] করা যায় না বলে আধুনিক কারবারগুলিতে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

পড়তা হিসাবের সুবিধা : ১. এর সাহায্যে দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন খরচ জানা যায় বলে, খরিদ্দারদের কাছে তৎপরতার সাথে বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করা[১০০] যায়। ২. পড়তা জানা থাকায় উৎপাদনের সম্ভাব্য ব্যয় হিসাব[১০১] করা সম্ভব হয়। ৩. উৎপাদনের বিভিন্ন ব্যয়গুলি বিশ্লেষণের সাহায্যে কোথায় এবং কোন্ খাতে অপচয় ও অমিতব্যয়িতা ঘটছে তা ধরা যায়। ফলে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। ৪. বৎসরের কোন সময়, হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হলে, এর দ্বারা সহজেই অসমাপ্ত কাজ ও অসম্পূর্ণ দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ[১০২] করা সম্ভব হয়। ৫. বিভিন্ন বিভাগ ও কাজের দক্ষতার তুলনামূলক বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এর সাহায্যে সংগ্রহ করা যায়। ৬. একাধিক দ্রব্য উৎপাদনকারী কারবারগুলি এর সাহায্যে সহজেই, কোন্‌টির উৎপাদন লাভজনক ও কোন্‌টি অ-লাভজনক তা স্থির করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারে। ৭. এর সাহায্যে মুনাফার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ তৎপরতার সাথে খুঁজে বের করা যায়। ৮. এর সাহায্যে উৎপাদন ব্যয়ের যথাযথ বিশ্লেষণমূলক হিসাব করা হয় বলে চুরি, অপচয় ও অপব্যবহার বন্ধ হয়।

প্রত্যক্ষ খরচ (DIRECT EXPENDITURE)

কোন দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত কাঁচামাল, মজুরি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচকে প্রত্যক্ষ ব্যয় বলে।

পরোক্ষ খরচ (INDIRECT COST)

উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণের সাথে সম্পর্করহিত, কারবারের যে সকল খরচ হয়ে থাকে তাই উৎপাদনের পরোক্ষ ব্যয়। এইগুলিকে উপরি ব্যয় বা উপরি খরচ[১০৩] বলে। এদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় : ক. কারখানার স্থির খরচ[১০৪]। খ. অফিস বা পরিচালনার স্থির খরচ[১০৫]। গ. বিক্রয়ের স্থির খরচ[১০৬]।

পড়তা খরচের শ্রেণীবিভাগ (CLASSIFICATION OF COST)

পড়তা খরচের শ্রেণীবিভাগ নিচে দেখান হল,—

১.	প্রত্যক্ষ খরচ[১০৭]=কাঁচামাল+মজুরি+আনুষঙ্গিক ব্যয়।	= মুখ্য খরচ[১০৮]
২.	মুখ্য খরচ[১০৯]+কারখানার স্থির বা উপরি খরচ[১১০]	= কারখানার পড়তা খরচ[১১১]
৩.	কারখানার পড়তা খরচ[১১২]+অফিস বা পরিচালনার স্থির বা উপরি খরচ[১১৩]	= উৎপাদন ব্যয়[১১৪]

---

99. Cost Control. 100. Quoting prices. 101. Estimate.
102. Valuation of incomplete processes and incomplete goods.
103. Overhead expenses or charges.
104. Factory overhead or works expenses.
105. Office overhead or administrative expenses.
106. Marketing overhead or selling expenses. 107. Direct expenses.
108. Prime cost. 109. Prime cost. 110. Factory overhead or on cost.
111. Factory or Works cost. 112. Factory or Works cost.
113. Office overhead or Administrative expenses.
114. Cost of Production.

৪. উৎপাদন ব্যয়[115]+বিক্রয়ের স্থির খরচ[116] } = মোট খরচ[117]

৫. মোট খরচ[118]+নীট মুনাফা[119] } = বিক্রয় মূল্য[120]

উৎপাদনের নির্ধারণে কারখানার খরচ ও অফিসের খরচ বণ্টনের[121] নীতি

কারখানার খরচ ও অফিসের খরচ মিলিতভাবেই পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করে: কারখানার খরচকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, প্রত্যক্ষ খরচ এবং পরোক্ষ খরচ। **প্রত্যক্ষ খরচগুলি**[122] নিম্নরূপ—

১. কাঁচামালের মূল্য ২. প্রত্যক্ষ মজুরি ৩. অন্যান্য ধার্যোপযোগী খরচ[123]:

কারখানার **পরোক্ষ** খরচ বলতে স্থির বা উপরি খরচ[124] বোঝায়। এই খরচগুলি হল—কারখানার ম্যানেজার ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানকারীদের বেতন, যন্ত্রপাতি মুছিবার ছেঁড়া কাপড়, তুলা ও পাট প্রভৃতির টুকরার মূল্য, যন্ত্রপাতির অবচিতি[125], শক্তি, আলো, বাতাস ও তাপের খরচ, খাজনা, শ্রমিক বীমা, কারখানার অগ্নি, চুরি ও দুর্ঘটনা বীমা এবং মেরামতি খরচ ইত্যাদি।

প্রথমোক্ত খরচগুলি প্রত্যক্ষভাবে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হিসাবে ধার্য হয়ে থাকে। কারণ, কোন্ দ্রব্য উৎপাদনে কতখানি কাঁচামাল বা মজুরিবাবদ কত ব্যয় হয়েছে, তা প্রত্যক্ষভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর খরচ অর্থাৎ স্থির বা উপরি খরচগুলি প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্যের উৎপাদনের সাথে জড়িত না হওয়ায় পণ্যের ব্যয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কারখানার স্থির বা উপরি খরচ উৎপাদিত দ্রব্যের একক পিছু বণ্টনের জন্য কতকগুলি নীতি অনুসৃত হয়।

কারখানার উপরি খরচ বণ্টনের নীতিসমূহ

PRINCIPLES OF ALLOCATING FACTORY ON COST

উৎপন্ন দ্রব্যের এককপিছু স্থির বা উপরি খরচ নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি-গুলি ক্ষেত্রানুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১. **মুখ্য খরচের শতাংশ**[126]: স্থির বা উপরি খরচ এবং মুখ্য খরচ (প্রত্যক্ষ মজুরি+প্রত্যক্ষ ব্যবহৃত কাঁচামাল)-এর শতকরা হার স্থির করে তদনুসারে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগ, কাজ বা উৎপন্ন দ্রব্যের স্থির বা উপরি খরচ নির্ধারণ করা হয়।

উদাহরণ.—একটি কারখানায় তিনটি বিভাগ আছে। তাদের প্রত্যক্ষ মজুরি, কাঁচামাল এবং স্থির খরচ যথাক্রমে মোট ৪,০০০ টাকা, ৬,০০০ টাকা ও ৮,০০০ টাকা। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের মুখ্য খরচ (প্রত্যক্ষ মজুরি+প্রত্যক্ষ কাঁচামাল) যথাক্রমে, ৪,০০০, ৪,০০০ ও ২,০০০ টাকা। এই পদ্ধতিতে স্থির খরচ নির্ধারণের নিয়ম হল—

$$\frac{\text{মুখ্য খরচ}}{\text{স্থির খরচ}} \times ১০০$$

মোট মুখ্য খরচ=প্রত্যক্ষ মজুরি+প্রত্যক্ষ কাঁচামাল

=৬,০০০ টাকা+৪,০০০ টাকা=১০,০০০ টাকা

স্থির খরচ ও মুখ্য খরচের শতকবা ভাগ $\frac{\text{৮,০০০ টাকা}}{\text{১০,০০০ টাকা}} \times ১০০ = ৮০\%$

115. Cost of Production. 116. Selling or Distributive expenses.
117. Total cost. 118. Total cost. 119. Net Profit 120. Selling Price.
121. Principle of allocating Factory & Office Expenses for determining cost.
122. Direct Expenses. 123. Chargeable expenses.
124. Factory on cost. 125. Depreciation.
126. Prime cost percentage.

∴ ১ম বিভাগের স্থির খরচের পরিমাণ

=বিভাগীয় মুখ্য খরচের শতকরা ৮০ ভাগ

=৪,০০০ টাকা × $\frac{৮০}{১০০}$

=৩,২০০ টাকা

২য় বিভাগের স্থির খরচের পরিমাণ = ৪,০০০ টাকা × $\frac{৮০}{১০০}$ = ৩,২০০ টাকা

৩য় বিভাগের স্থির খরচের পরিমাণ = ২০০০ টাকা × $\frac{৮০}{১০০}$ = ১,৬০০ টাকা

২. **প্রত্যক্ষ মজুরির শতাংশ**[127]ঃ এই পদ্ধতিতে কারখানার স্থির খরচ[128] ও প্রত্যক্ষ মজুরির শতকরা হার স্থির করে, ঐ হারে প্রত্যেক বিভাগ, কাজ বা পণ্যের প্রত্যক্ষ মজুরি অনুযায়ী তাদের স্থির খরচ ধার্য হয়ে থাকে।

৩. **প্রত্যক্ষ কাঁচামালের শতাংশ**[129]ঃ এই পদ্ধতিতে কারখানার স্থির খরচ ও প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ব্যয়ের শতকরা হার স্থির করে ঐ হারে প্রত্যেক বিভাগ, কাজ কিংবা পণ্যের প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ব্যয় অনুযায়ী স্থির খরচ নির্ধারিত হয়।

৪. **উৎপন্নের এককপিছু হার**[130]ঃ যে সব শিল্পে বা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য-গুলি একই প্রকারের, সেখানে অনেক সময়, সারা বৎসরে মোট উৎপাদিত পণ্যের একক দ্বারা মোট স্থির খরচকে ভাগ করে একক পিছু স্থির খরচ নির্ধারণ করা হয়। যেমন, যদি কোন বৈদ্যুতিক পাখার কারখানায় সারা বৎসরে ১০,০০০ পাখা উৎপাদিত হয় এবং স্থির খরচ ১ লক্ষ টাকা হয়, তবে এই নিয়মে পাখা পিছু স্থির খরচ পড়বে—

$$\frac{১,০০,০০০ \text{ টাকা}}{১০,০০০ \text{ পাখা}} = ১০ \text{ টাকা।}$$

৫. **যন্ত্রপাতির কাজের সময় হার**[131]ঃ আধুনিককালে ক্রমেই কারখানাগুলিতে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে, বিভিন্ন বিভাগ ও কাজের[132] স্থির খরচ নির্ণয়ের জন্য যাবতীয় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কাজের মোট সময় বা ঘণ্টা দ্বারা মোট স্থির খরচকে ভাগ করে, ঐ হারে প্রত্যেক বিভাগে বা কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির সময়ের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ স্থির খরচ নির্ণয় করা হয়।

৬. **প্রত্যক্ষ শ্রম-ঘণ্টা প্রতি হার**[133]ঃ এই পদ্ধতিতে মোট স্থির খরচকে মোট প্রত্যক্ষ শ্রমের সময় অর্থাৎ ঘণ্টার দ্বারা ভাগ করে ঐ হারে সমস্ত বিভাগ, কাজ বা পণ্যের ব্যবহৃত শ্রমঘণ্টা অনুযায়ী তাদের স্থির খরচ নির্ধারিত হয়।

৭. **উৎপাদন-ঘণ্টাহার**[134]ঃ এটি পঞ্চম পদ্ধতির রকমফের বিশেষ এবং ইস্পাত রোলিং মিল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে স্থির খরচ ও মোট উৎপাদন ঘন্টার শতাংশ হিসাব করে সেই হারে বিভিন্ন বিভাগের, কাজের ও পণ্যের একক পিছু স্থির খরচ নির্ধারিত হয়।

অফিসের স্থির খরচ বণ্টনের নীতি

PRINCIPLE ALLOCATION OF OFFICE EXPENSES

অফিসের স্থির বা উপরি খরচকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, পরিচালন ব্যয়[135] এবং বিক্রয় খরচ[136]। পরিচালন ব্যয় বলতে এখানে পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার সম্মিলিত ব্যয়কে বোঝায়। ডিরেক্টারগণের ফী[137], কর্মচারিগণের বেতন, ডাক খরচ, টেলিফোন খরচ, অফিস-গৃহের ভাড়া ও কর, আসবাবপত্রের অবচিতি,[138] অফিসের অগ্নি ও চুরি

---

127. Percentage on Direct wages. 128. Factory on cost.
129. Percentage on Direct material. 130. Rate per unit produced.
131. Machine-hour rate. 132. Jobs.
133. Rate per direct labour-hour. 134. Rate per production-hour.
135. Administrative expenses. 136. Selling or distributive expenses.
137. Fees. 138. Depreciation.

প্রভৃতির বীমার খরচ ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত। বিক্রয় খরচ বলতে, প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়, বিক্রয় প্রতিনিধি[139] ও বিক্রয় কর্মিগণের দস্তুরি[140], বিক্রয় কর্মচারিগণের বেতন, ভ্রমণ ব্যয় ও রাহা খরচ ইত্যাদি বোঝায়।

অফিসের স্থির খরচ বণ্টনের মূল নীতি হল এর সাথে কারখানার পড়তা খরচের[141] শতকরা ভাগ নির্ণয় করে ঐ হারে বিভিন্ন বিভাগে, কাজে[142] বা উৎপাদনের একক পিছু অফিসের স্থির বা উপরি খরচ বণ্টন করা হয়।

কারখানা ও অফিসের স্থির খরচ বণ্টনের এই সব পদ্ধতি সব শিল্প ও কারবারের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। যেমন, যে সব শিল্পে উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত মানের নির্দিষ্ট যন্ত্র ব্যবহৃত হয় না, বা বহুবিধ প্রধান ও সহায়ক যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না, সেখানে মেসিন বা যন্ত্র-ঘণ্টা হার[143] পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত নয়। সুতরাং উৎপাদিত পণ্য, উৎপাদনের পদ্ধতি, শিল্পের প্রকৃতি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিচার করে এই সমস্ত পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোন্‌টি ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রহণীয় তা স্থির করতে হয়।

ব্যবস্থাপনা হিসাব বিদ্যা
MANAGEMENT ACCOUNTANCY OR ACCOUNTING

ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যানসি বা ব্যবস্থাপনা হিসাববিদ্যা কিংবা ব্যবস্থাপনা হিসাব-রক্ষার কাজ বলতে, ব্যাপক অর্থে, হিসাবরক্ষণের সেই দিকটিকেই বোঝায় যার কাজ হল কারবারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য সুদক্ষ ও সু-উপযোগী পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজে সহায়তা করতে পারে এমন সমস্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা।[144]

আধুনিক কারবারী কার্যকলাপের এবং বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান জটিলতার ফলে হিসাবরক্ষকের (অ্যাকাউন্ট্যান্ট) দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ও প্রভাব প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর ফলে হিসাবরক্ষকদের মধ্যে যেমন বিশেষায়ণ ঘটেছে তেমনি হিসাব শাস্ত্রেরও একটি নূতন শাখার—ব্যবস্থাপনা হিসাব-বিদ্যার জন্ম হয়েছে।

ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা ব্যবস্থাপক-হিসাবরক্ষকের প্রধান কাজ হল হিসাব রক্ষার ব্যবস্থাপনাগত দিকটি নিয়ে। সাধারণ হিসাবরক্ষক যিনি, তাঁর কাজ হল কারবারের দৈনন্দিন কার্যকলাপের আর্থিক হিসাব রাখা। সাধারণ হিসাব রক্ষক বা অ্যাকাউন্ট্যান্ট হলেন আসলে ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এই কাজের ভার তাঁর উপর দিয়ে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট তাঁর মুখ্য নজর কেন্দ্রীভূত করেন বিভিন্ন নথিপত্র থেকে সেই সব তথ্য সংগ্রহ, দলিল প্রস্তুত এবং বিবরণ-বিবৃতি তৈরি করার কাজে যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে স্বল্পতম পরিশ্রমে ও সর্বাধিক দক্ষতার সাথে কাজ করতে সাহায্য করবে।

এই কর্তব্যটি পালনের জন্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টকে তাঁর জ্ঞান ও গবেষণার পরিধি প্রসারিত করতে হয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট অথচ প্রত্যেকটি আলাদা এমন নানান কার্যক্ষেত্রে, যার মধ্যে রয়েছে কর ব্যবস্থা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, ইলেকট্রনিক ডাটা প্রসেসিং, শেয়ার বাজার, অর্থনীতিক বিবিধ বিষয়, পরিসংখ্যান গবেষণা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

139. Sales Agent. 140. Commission.
141. Works cost or Factory cost. 142. Job.
143. Machine-hour rate.
144. Brown. J. L. & Howard L. R., Principles and practice of Management Accountancy.

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে তাঁকে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তার মূল বৈশিষ্ট্য হলঃ (১) সে তথ্যগুলি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হওয়া চাই; এবং (২) তা অবশ্যই যথাসময়ে পেশ করা চাই। প্রথমটির প্রয়োজনে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টের পক্ষে কারবারটির সমস্ত দিক সম্পর্কে বিশদ উপলব্ধি থাকা চাই এবং চাই প্রয়োজনীয় বিষয়ে সেই সারাংশটুকু মাত্র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার ক্ষমতা যার ফলে খুঁটিনাটি নিয়ে অযথা সময় নষ্ট না করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ চট্ করে বিষয়টির গোড়ায় যেতে পারেন। সুতরাং কোন্ তথ্যটুকু ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হবে আর কোন্‌টির প্রয়োজন হবে না, সেটুকু বোঝার ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই।

দ্বিতীয়টির প্রয়োজনে, তাঁকে বুঝতে হবে যে, যে তথ্যগুলি, সংবাদগুলি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হবে তা যদি যথাসময়ে না করা যায় তাহলে কোন কাজ হবে না, কারবারের কাজকর্মের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে তা সাহায্য করবে না। এক্ষেত্রে তাঁর কাজগুলি হলঃ (ক) পরিকল্পনার কাজে সাহায্য করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে পূর্বানুমানগুলি[145] ও বাজেটগুলি পেশ করা; (খ) পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে কাজকর্মগুলির নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার জন্য যথোপযুক্ত চল্‌তি সংবাদ ও তথ্য[146] ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা; এবং (গ) কারবারের কাজকর্মের এমন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যাতে প্রাসঙ্গিক সংবাদ ও তথ্যগুলি আপনা থেকেই এমনভাবে সংগৃহীত ও প্রস্তুত এবং সংক্ষেপিত হয়ে যায় যেন তার ফলে তা সহজেই ও দ্রুত বিশ্লেষণ ও সম্পাদন করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা সম্ভব হয়।

---

145. Forecasts. 146. Current information.

১৬

শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা
PERSONNEL MANAGEMENT

অর্থ ও তাৎপর্য (MEANING)

১. "পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট" বা শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা বলতে এমন কতকগুলি নীতি-নিয়ম বোঝায় যা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মীদের সংগঠিত করার ও তাদের সাথে আচরণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

২. এর উদ্দেশ্য হল, শ্রমিক-কর্মীরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সকলে সমষ্টিগত-ভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বাধিক সাধ্যমত নিজেদের কর্মক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম হয় সেজন্য তাদের উপযুক্তভাবে সাহায্য করা। সুতরাং কর্মীদের ব্যক্তিগত গুণাবলী ও যোগ্যতার দক্ষতার বিকাশই এর উদ্দেশ্য।

৩. এইভাবে শ্রমিক-কর্মীদের প্রতি যদি সযত্ন ব্যবহার করা হয় তাহলে তাদের ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সুনিশ্চিত হবে। প্রতিষ্ঠানের মনোভাবে ও প্রচেষ্টায় সাড়া দিয়ে তারাও প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের বলে মনে করে এবং নিজেদের তার অংশ বলে মনে করে কুণ্ঠাহীনভাবে তাদের যা দেবার তা প্রতিষ্ঠানকে দেবে। এজন্য কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী পদ্ধতি বা কর্তৃত্বের জোর জুলুম নয়, গণতান্ত্রিক মনোভাব ও পদ্ধতিই বেশি ফলপ্রসূ হয়।

৪. মজুরি, কাজের সুযোগ-সুবিধা, কাজের শর্তাবলী, চাকুরির নিরাপত্তা প্রভৃতি সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মীদের কতকগুলি আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। তারা নিজেদের উন্নতি এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তগুলির শরিক হতে চায়। তাদের এই আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে তৃপ্ত হলে সন্তুষ্ট শ্রমিক-কর্মীরা প্রতিষ্ঠানেরও নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি সাধনে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হতে পারে। এই কারণে বলা হয়েছে শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হল, "মানবিক ও ভৌত[1] উপকরণগুলিকে এমন একটি কর্মতৎপর সংগঠনে পরিণত করা যা, যাদের জন্য কাজ করা হচ্ছে তাদের লক্ষ্যগুলি যেমন সন্তোষজনক ভাবে পূর্ণ করবে তেমনি যারা সে কাজ করছে তাদের মধ্যেও উঁচু মনোবল এবং কাজের তৃপ্তি সঞ্চার করবে।"

গুরুত্বঃ ১. পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট হল কারবারের ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্ব-পূর্ণ শাখা।

২. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাজকর্মের ও সাফল্যের এটি হল একটি মূল চাবিকাঠি।

৩. উৎপাদন, অর্থসংস্থান, বিক্রয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সবরকমের কাজের ব্যবস্থা-পনারই এ হল একটি অঙ্গ। কারণ সমস্ত বিভাগেই কর্মীদের সহযোগিতা নিয়ে ব্যবস্থাপকদের কাজ করতে হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও ফলাফলের জন্য কর্মীদের নেতৃত্ব দিতে পরিচালনা করতে হয়। এই অর্থে প্রত্যেক ব্যবস্থাপকই কিছুটা পরিমাণে শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপক রূপে কাজ করে থাকে।

৪. সুতরাং উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার সমস্ত স্তরেই শ্রমিককর্মী-ব্যবস্থাপনার কাজটি পরিব্যাপ্ত।

1. Physical.

৫. শুধু শিল্প কারবারেই নয়, যে কোনও সংগঠন, ক্লাব, সমিতি, দাতব্য ও সেবা প্রতিষ্ঠান, সরকারী অফিস, যেখানেই অধীন কর্মীদের নিয়ে কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে হয় সেখানেই শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন দেখা দেয়।

শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যকলাপ

FUNCTIONS & ACTIVITIES OF PERSONNEL DEPARTMENT

শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগের কাজ হল প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য সাধনের অথবা নীতিগুলি পালনের উদ্দেশ্যে, কর্মী সংগ্রহ, বাছাই ও প্রশিক্ষণ, মজুরি ও বেতন, শিল্পগত সুসম্পর্ক, শ্রমিককল্যাণ, যোগ্যতা নির্ধারণ ও কর্মীদের কাজের রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নীতিগুলি রচনা করা এবং তা কাজে পরিণত করার ব্যবস্থা করা। সুতরাং এ থেকে সুস্পষ্টভাবে শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগের যে সব কাজের উৎপত্তি হয়েছে তা হল ঃ

১. শ্রমিক-কর্মীদের সম্পর্কে সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনাগত নীতি নির্ধারণ করা এবং শ্রমিক-কর্মীদের কাজে নেতৃত্বপ্রদান ও তাদের সহযোগিতা আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি যথোপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা।

২. ঠিক কাজটির জন্য ঠিক লোক বাছাই করা, এবং সে জন্য উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য কর্মী নিয়োগ ও বজায় রাখা। এজন্য বাজার সমীক্ষা (মারকেট স্টাডি) এবং উপযুক্ত শ্রমিক-কর্মী কোন্ কোন্ সূত্র থেকে পাওয়া যায় ও তা কিভাবে সংগ্রহ করা যায় তা অনুধাবন করে সংস্থার জন্য কোন্ কোন্ ধরনের কি কি সংখ্যক শ্রমিক-কর্মী লাগবে সে সম্পর্কে আগে থেকে হিসাব করা ('ম্যানপাওয়ার ফোরকাসটিং' ও 'ম্যানপাওয়ার বাজেট')।

৩. শ্রমিক-কর্মীদের সম্পর্কে বৃত্তিগত নির্দেশনা দান ('ভোকেশন্যাল গাইডান্স') এবং উপযুক্ত পদে বা কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করা (প্লেসমেন্ট)।

৪. কর্মীদের বিকাশের ও দক্ষতা এবং যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য কর্মরত অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ও বাইরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫. কর্মীরা কে কোন হারে মজুরির যোগ্য, কার কিরূপ পদোন্নতি হওয়া উচিত, কাকে বদলি করা দরকার, কার পদাবনতি কিংবা কাকে বরখাস্ত করা উচিত ইত্যাদি সহ সমস্ত কর্মীদের কাজের সম্ভাব্যতা ক্ষমতা ও প্রকৃতপক্ষে তারা কতটা কাজ করছে তার বিচার ও মূল্যায়ন করা।

৬. বিভিন্ন কাজের বিশ্লেষণ ('জব এ্যানালিসিস'), মূল্যায়ন ('ইভ্যালুয়েশান) এবং গ্রেড নির্ধারণ বা বর্গীকরণ ('গ্রেডিং') করা।

৭. বিভিন্ন ধরনের কাজের মজুরির হার নির্ধারণ, মজুরি হারের কাঠামো ('রেটস্ট্রাকচার') নির্ধারণ, মাঝে মাঝে সেগুলির পুনর্বিচার ('রিভিয়ু') ও রদবদল ('রিয়্যাডজাষ্টমেন্ট') করা, মজুরি ও বেতন সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং নানা ধরনের প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থা, মুনাফার শরিকানা ব্যবস্থা, বোনাস প্ল্যান ইত্যাদি প্রবর্তন ও পরিচালনা করা।

৮. শ্রমিক-কর্মীদের জন্য বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা, দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার ব্যবস্থা, দুর্ঘটনা থেকে নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে নিয়মিত তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত এবং ডিসপেনসারীর ব্যবস্থা, ক্যানটিন ও আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত, রিডিংরুম ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা, অসুখবিসুকে ছুটির ও অন্যান্য ছুটির ব্যবস্থা, লম্বা ছুটির ব্যবস্থা ('ভ্যাকেশন') এবং যারা দীর্ঘ-কাল ধরে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে তাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা।

৯. নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং শ্রমিক-কর্মীরা যাতে ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে তার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১০. প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাতে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে সেজন্য শ্রমিক-কর্মীদের সাথে উন্নততর সম্পর্ক বজায় রাখা।

১১. নানা বিষয়ে শ্রমিক-কর্মীদের কাছ থেকে যাতে সহযোগিতা পাওয়া যায় সেজন্য তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে যোগাযোগ রাখা।

১২. প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও ধরনের শ্রমিক-কর্মী সম্পর্কে মাঝে মাঝে পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা এবং যাচাই করা।

১৩. শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এবং এ বিষয়ে নানা সমস্যার সমাধানের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা।

শ্রমিক-কর্মী বিভাগের সাংগঠনিক ছক

ORGANISATIONAL CHART OF THE PERSONNEL DEPARTMENT

একটি বড় কারবারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ বা পারসোনেল ডিপার্টমেন্টের সাংগঠনিক ছকের একটি নমুনা নিচে দেওয়া হল।
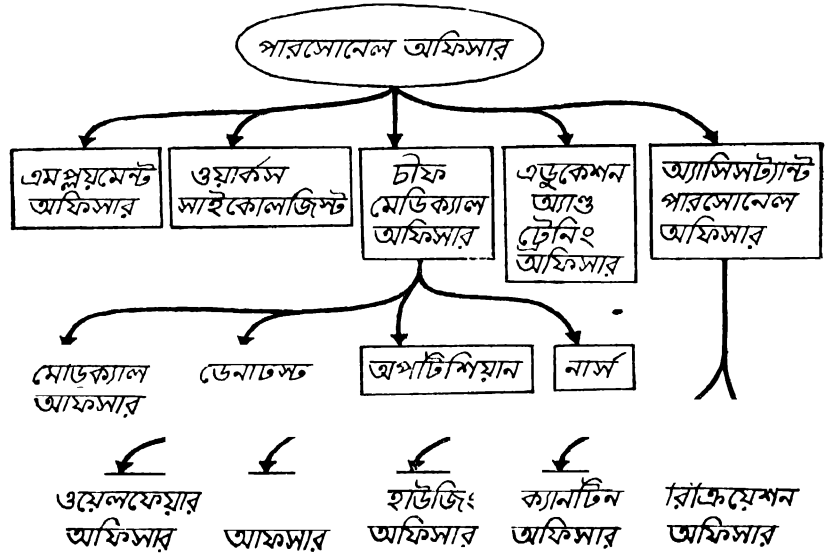
কল্যাণমূলক কার্যক্রম

WELFARE PROGRAMME

বর্তমানে সব কারবারেই মালিক-কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন যে, কারবারের সুষ্ঠু ও নিরুপদ্রব কাজ এবং ক্রমোন্নতির জন্য চাই সন্তুষ্ট শ্রমিক-কর্মী এবং শ্রমের ক্রমবর্ধমান দক্ষতা। শ্রমিক-কর্মীরা সন্তুষ্ট থাকলে কারবারে ও শিল্পে শান্তি সুনিশ্চিত হয়। অন্যদিকে তাদের শারীরিক ও মানসিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে, তাদের কর্মদক্ষতা বাড়ে, ফলে উৎপাদনের পরিমাণগত ও গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়ে কারবারটি উন্নতিলাভ করে। যে সব ব্যবস্থার দ্বারা এসব সম্ভব হয়, এককথায় তাকে কল্যাণমূলক কার্যক্রম বলে। কল্যাণমূলক কার্যক্রমের দ্বারা শ্রমিক-কর্মী ও মালিক, উভয়পক্ষই লাভবান হয় এবং উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং শ্রম-কল্যাণ কার্যক্রম কারবারের অনাবশ্যক ব্যয় বাড়ায় না বরং তা কারবারের আয় বাড়ায় ও অগ্রগতিতে সাহায্য করে। (পরবর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য।)

শ্রমিক-কর্মীদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য আর্থিক প্রণোদনা হিসাবে তাদের কার্য ও কারবারের মুনাফা অনুযায়ী বোনাস-এর ব্যবস্থা, অথবা তাদের মুনাফার অংশ

কল্যাণমূলক কার্যক্রম
বোনাস (১)
সামাজিক বীমা (২)
অবসর গ্রহণকালীন আর্থিক সুবিধা (৩)
কারবারের লাভের অংশ বন্টন (৪)
বিশ্রামাগার (৫)
ছুটি (৬)
ক্যান্টিন (৭)
চিকিৎসা (৮)
কার-খানার অবস্থা (৯)
খেলাধুলা (১০)
সাংস্কৃতিক কার্যাবলী (১১)
শিক্ষা (১২)
লাইব্রেরী ও পাঠাগার (১৩)
ভ্রমণ (১৪)
পরামর্শ (১৫)
শিল্পে শান্তি
শারীরিক কার্যক্ষমতা
মানসিক তৎপরতা
কারবারের অব্যাহত কার্যকলাপ ও উন্নতি
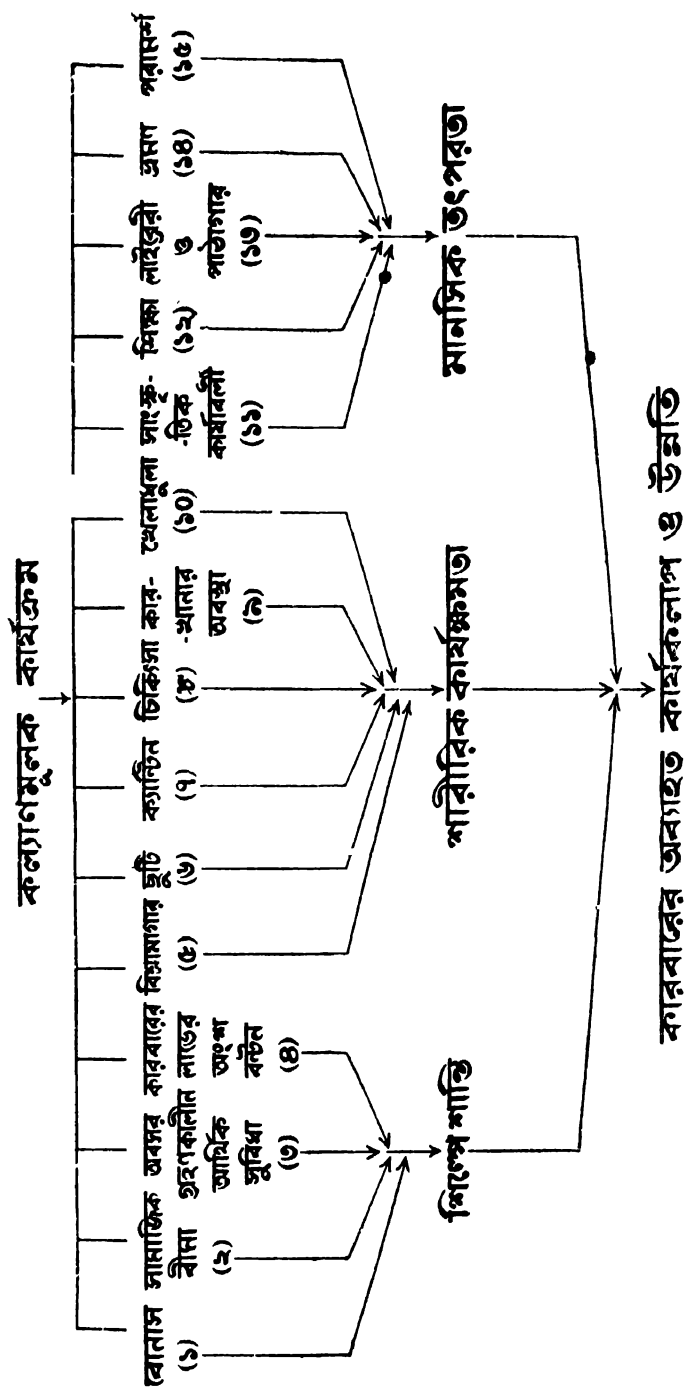
প্রদানের নানারূপ ব্যবস্থা, ভবিষ্যৎ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার জন্য পেনসন, গ্র্যাচুইটি কিংবা প্রভিডেন্ট ফান্ড শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়ক বলে প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই আজকাল এই ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয়েছে। এছাড়া **দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য বীমা** ব্যবস্থাও কর্মীদের জীবনে অনিশ্চয়তা দূর করে বলে অনেক দেশেই তা প্রচলিত হয়েছে। ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই শ্রমিক-কর্মীদের জন্য সামগ্রিক **সামাজিক বীমা** ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়ে তাদের অসন্তোষের উল্লেখযোগ্য কারণগুলি দূর করতে সমর্থ হয়েছে।

শ্রমিক-কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি তাদের শারীরিক কার্যক্ষমতা বজায় ও বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থার প্রয়োজন। (১) উপযুক্ত আলো বাতাস, ও জলের ব্যবস্থা সম্পন্ন সুপ্রশস্ত **বাসস্থান** (২) কারখানায় একটি করে **বিশ্রামাগার,** (৩) যথোপযুক্ত **ছুটির** ব্যবস্থা, (৪) স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের জন্য **ক্যানটিন,** (৫) কার্যরত অবস্থায় অসুখ হয়ে পড়লে কিংবা দুর্ঘটনা ঘটলে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কারখানার অভ্যন্তরে **চিকিৎসা কেন্দ্র,** (৬) কার্যরত অবস্থায় **দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য নানা প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা,** (৭) **চিত্ত বিনোদন** ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য **ব্যায়ামাগার, ক্লাব এবং খেলাধূলা ও বাৎসরিক ক্রীড়ার** ব্যবস্থাগুলি এজন্য অপরিহার্য।

তাছাড়া, (৮) **লাইব্রেরী ও পাঠাগারের ব্যবস্থা, সঙ্গীত ও নাটক, পত্র-পত্রিকা পরিচালনা** প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের ব্যবস্থাও প্রয়োজন। অনুরূপ কারণেই তাদের মাঝে মাঝে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য **দেশ ভ্রমণ,** পরিশেষে (৯) কারখানার বিভিন্ন কার্যাবলীর উন্নতি সাধনের জন্য তাদের পরামর্শ আহ্বান করা যেতে পারে এবং এজন্য প্রত্যেক বিভাগে একটি করে **পরামর্শ বাক্স** রাখা উচিত। এই সকল বাক্সে সংগৃহীত, শ্রমিক-কর্মীদের পরামর্শ দ্বারা কার্যকরভাবে সকল প্রতিষ্ঠানই উপকৃত হতে পারে।

শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থার সাফল্যের শর্তাবলী : শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলি পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হলেও, এর সাফল্য তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

১. কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থাগুলি যদি উপর থেকে শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে যদি শ্রমিকদের ধারণা হয়, তাহলে তা সফল হয় না। এই কারণে ব্যবস্থাগুলি এমনভাবে প্রবর্তন করা উচিত যেন তাতে শ্রমিকদের কাজের স্বাধীনতা কোনও ভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়। তা শ্রমিক-কর্মীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচির সাধারণ মানের উপযোগী হয় এবং তা যেন তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয়।

২ মজুরির হার কম রেখে শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলি চালু করলে তা ব্যর্থ হবে। কারণ তাতে শ্রমিকদের দুর্বল মনোবলকে আরও দুর্বল করবে। সুতরাং শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করতে গেলে দেখতে হবে যেন মজুরির হার উপযুক্ত ও সন্তোষজনক হয়।

৩. শ্রমিককল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থাগুলির সাথে সাথে শ্রমিকদের সাথে কর্তৃপক্ষের একটি মানবিক সম্পর্কও গড়ে তোলা হয়। তা না হলে এই বিধিব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্যই বিফল হবে।

ভারতে শ্রমকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা

LABOUR WELFARE MEASURES IN INDIA

শ্রমিকরা যাতে অনুকূল পরিবেশে কাজ করতে পারে সেজন্য ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরীর এ্যাক্ট, ১৯৫২ সালের মাইনস এ্যাক্ট, ১৯৫১ সালের প্ল্যানটেশন লেবার এ্যাক্ট, এবং ১৯৬৬ সালের বিড়ি এ্যান্ড সিগার ওয়ারকারস এ্যাক্ট (কনডিশন অব এমপ্লয়মেন্ট) প্রভৃতি

আইনে ক্যানটিন, বিশ্রামাগার, চিকিৎসা, শিক্ষা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা কলকারখানা, খনি ও বাগিচাগুলিতে করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের কনট্রাক্ট লেবার এ্যাক্ট-এও ঠিকা শ্রমিকদের জন্য এজাতীয় সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫০০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগকারী প্রত্যেকটি কারখানায় ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া কয়লা খনি, অভ্রখনি, লৌহ আকরিক খনি, চুণাপাথর ও ডলোমাইট খনির শ্রমিকদের কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থার অর্থসংস্থানের জন্য বিভিন্ন আইন পাশ করা হয়েছে।

বোম্বাই, কলকাতা, কোচিন, কান্ডলা, মাদ্রাজ, মারমাগাও, বিশাখাপত্তনম ও অন্যান্য বন্দরে শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, চিকিৎসা, তাদের পুত্রকন্যার জন্য স্কুল ফী কনসেশন, আমোদ-প্রমোদের ও ক্যানটিনের বন্দোবস্ত এবং ন্যায্যমূল্যের দোকান ও সমবায় ভাণ্ডার-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৬১ সালের মোটর ট্রান্সপোরট ওয়ারকারস এ্যাক্ট দ্বারা মোটর পরিবহণ শ্রমিকদের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ করা এবং কল্যাণমূলক বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থাগুলিতে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে শ্রমিক-কল্যাণ তহবিল খোলা হয়েছে। শ্রমিকদের সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রয়োজন মিটানোই এর উদ্দেশ্য।

মজুরি প্রদান পদ্ধতি
METHODS OF WAGE PAYMENT

দীর্ঘকাল ধরেই বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের সন্তোষজনক এবং তাদের দক্ষতার আনুপাতিক মজুরিব্যবস্থা উদ্ভাবনের গবেষণা চলেছে। এসম্পর্কে ব্যবস্থাপনা-বিশেষজ্ঞ টেলর, হালসে, রোয়ান, গ্যান্ট ও এমারসন প্রভৃতির প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রবর্তিত বিজ্ঞানসম্মত মজুরি ব্যবস্থাগুলি বহু প্রতিষ্ঠানেই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এসম্পর্কে অসুবিধা এই যে, বিভিন্ন শিল্পের অন্তর্নিহিত পার্থক্যের দরুন এদের কোনটিই সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। শিল্প ব্যবস্থার জটিলতার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানেই শুধু একটি মাত্র পদ্ধতি ব্যবহার করলেই চলে না; একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণও প্রয়োজন হয়। তেমনি আবার স্থান, কাল ও অবস্থা ভেদে ঐ সব পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দরকার হয। তবে, ওই সব বিজ্ঞানসম্মত মজুরি ব্যবস্থা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য অঙ্গ।

শ্রমশক্তির পারিশ্রমিক প্রদানের দুটি মৌলিক এবং প্রাচীনতম পদ্ধতি হল—১. সময়-ভিত্তিক মজুরি[২]। এবং, ২. ঠিকা অথবা ফুরন মজুরি[৩]। অন্যান্য যাবতীয় মজুরিব্যবস্থা এই দুটির রকমফের বিশেষ।

১. সময় ভিত্তিক মজুরি ঃ এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় যথা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক কাজের জন্য নির্দিষ্ট হারে মজুরি দেওয়া হয়। যেমন, দিন-মজুরদের দৈনিক আট ঘণ্টা পরিশ্রমের ৪ টাকা, ৫ টাকা অথবা ৬ টাকা হারে মজুরি দেওয়া হয়। অফিসের কর্মচারী মাসান্তে বেতন পান। কারখানার শ্রমিকরা সপ্তাহে সাড়ে ছয় দিন অথবা ৪৪ ঘণ্টা কাজের জন্য নির্দিষ্ট হারে মজুরি পান। এক্ষেত্রে, কাজের সময়কেই মজুরির হার নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি সর্বাধিক প্রচলিত মজুরিব্যবস্থা।

উপযুক্ত ক্ষেত্র ঃ যে সব ক্ষেত্রে কাজের পরিমাপ করা যায় না (যেমন, ম্যানেজার ফোরম্যান প্রভৃতি ব্যবস্থাপক কর্মীদের কাজ), যে ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ নয় উৎকর্ষই প্রধান বিষয়, যে ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির গতিবেগ দ্বারা উৎপাদনের হার সীমাবদ্ধ,

2. Time wages. 3. Piece wages.

যে ক্ষেত্রে মূল্যবান সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, উৎপাদনের যে সব ক্ষেত্রে কর্মীর কারিগরিকুশলতাই[4] বেশি প্রয়োজন এবং যে সব ক্ষেত্রে অনিবার্য কারণে কাজের সাময়িক বিরাম ঘটে (যেমন বৃষ্টিপাতের দরুন)—সেসব ক্ষেত্রে সময়-ভিত্তিক মজুরি-ব্যবস্থাই প্রকৃষ্ট।

সুবিধা: ১. এটি অত্যন্ত সরল পদ্ধতি। ২. মজুরির হিসাব করা সহজ হয়। সুতরাং শ্রমিকরা যেমন তাদের প্রাপ্য মজুরি সহজেই জানতে পারে, তেমনি মালিকপক্ষও মজুরিবাবদ কত খরচ হবে তা আগেই অনুমান করতে পারে।

অসুবিধা: ১. কাজের পরিমাণ অথবা উৎকর্ষের পরিবর্তে সময় অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হয় বলে অদক্ষ ও দক্ষ, উভয় শ্রেণীর শ্রমিক একই প্রকারের আয় উপার্জন করে। ২. সুতরাং দক্ষ শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট ও নিরুৎসাহিত হয়। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে না। ৩. এই কারণে কারবারের আনুপাতিক স্থির খরচ বাড়তে থাকে।

২. ঠিকা অথবা ফুরন মজুরি: এই পদ্ধতিতে প্রথমে কাজের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করা হয় এবং তাকে একক[5] ধরে, তার ভিত্তিতে মজুরির হার নির্ধারিত হয়। পরে শ্রমিকরা তাদের কাজের জন্য ওই নির্দিষ্ট হারে মজুরি পেয়ে থাকে। যেমন, কাপড়ের কলে ১ জোড়া কাপড়কে একক ধরে তার মজুরি ২ টাকা ধার্য হতে পারে। অতএব একজন শ্রমিক ৩ জোড়া কাপড় উৎপাদন করলে ৬ টাকা, ৪ জোড়ার জন্য ৮ টাকা ও ৫ জোড়ার জন্য ১০ টাকা মজুরি পাবে। শুধু ব্যক্তিগত নয়, টিম হিসাবে, দলগতভাবেও শ্রমিকরা ফুরন প্রথায় মজুরি পেতে পারে। সময়-ভিত্তিক মজুরি প্রথায় যেমন কাজের সময়কে ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা হয়, তেমনি ফুরন প্রথায় কাজের পরিমাণ মজুরির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত সে ক্ষেত্রেও প্রতি স্তরে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ফুরন প্রথায় দেওয়া যেতে পারে।

উপযুক্ত ক্ষেত্র: যে সকল ক্ষেত্রে কাজের নির্দিষ্ট মান[6] নির্ধারণ করা এবং তার সাহায্যে সম্পাদিত কাজের পরিমাপ সহজসাধ্য, যে ক্ষেত্রে কাজের উৎকর্ষ নয়, পরিমাণই প্রধান বিষয় (কয়লা উত্তোলন, মাটি কাটা, ইট তৈরী প্রভৃতি), যে সকল শিল্পে স্থির খরচ অত্যধিক, সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা পড়তা খরচ হ্রাস করার জন্য ও যে সকল বহুল উৎপাদন[7] শিল্পে তদারকী কাজের[8] দ্বারা উৎকর্ষ বজায় রাখা সম্ভব—সেসব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

সুবিধা: ১. এতে কাজের পরিমাণের অনুপাতে মজুরি দেওয়া হয় বলে দক্ষ শ্রমিকরা কাজের উপযুক্ত মজুরি পায়। ২. ফলে তারা উৎপাদন ও দক্ষতা বাড়াতে উৎসাহিত হয়। ৩. কারবারের মোট উৎপাদন বাড়ে। ৪. উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আনুপাতিক স্থির খরচ কমে গিয়ে পড়তা খরচও কমে। ৫. এটিও মজুরি প্রদানের সরল পদ্ধতি এবং এতেও সহজে মজুরির হিসাব করা যায়। ফলে উৎপাদনের আগেই ফরমাস মত খরিদ্দারদের কাছে দ্রব্যমূল্য উল্লেখ করা চলে। ৬. এতে শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ থাকায় তারা সন্তুষ্ট হয়।

অসুবিধা: ১. শ্রমিকরা দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবল আগ্রহের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায়, কাঁচামালের অপচয় বৃদ্ধি ও যন্ত্রপাতির অপব্যবহার হয়। ২. তা দূর করার জন্য আবার তদারকী ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে গিয়ে স্থির খরচ বাড়ে। ৩. কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হয় বলে শ্রমিকরা উৎকর্ষের জন্য যত্ন লয় না। ফলে ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে। ৪. অল্প সময় কাজ করে বেশি আয় উপার্জন করা যায় বলে, অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিকদের অনুপস্থিতি বাড়ে। ৫. শ্রমিকরা আয় বৃদ্ধির

---

4. Individual craftsmanship. 5. Unit. 6. Standard.
7. Mass production. 8. Inspection.

আকাঙ্ক্ষায় প্রাণপণ পরিশ্রম করায় অচিরে তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। ৬. এই পদ্ধতিতে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কিছু উৎসাহ দেওয়া হয় বলে অল্পসংখ্যক শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। ফলে এতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিপদ থাকে। ৭. পরিশেষে, আয়ের পার্থক্যের দরুন শ্রমিকদের মধ্যে রেষারেষি দেখা দেয় ও তাতে শ্রমিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়।

৩. **'টাস্ক ওয়েজেস' বা সময়-ফুরন ভিত্তিক মজুরি**[9] : সময়-ভিত্তিক ও ফুরন মজুরি পদ্ধতির ত্রুটিগুলি দূর করে তাদের সমন্বয়ে আরেক প্রকার মজুরি পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটেছে। এটি 'টাস্ক ওয়েজেস' নামে পরিচিত। এতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক শ্রমিককেই তা সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগে কাজটি সম্পন্ন হলে সেজন্য কোন পুরস্কার দেওয়া হয় না।

সুবিধা : ১. এর সুবিধা এই যে, কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক উভয়েই কাজের জন্য কত পারিশ্রমিক পড়বে তা আগে জানতে পারে।

অসুবিধা : কিন্তু এতে নির্দিষ্ট সময়ের আগে নির্ধারিত কাজটি সম্পাদনে সক্ষম দক্ষ শ্রমিকরা নিরুৎসাহিত হয়।

প্রণোদনামূলক মজুরি প্রথাসমূহ
METHODS OF INCENTIVE WAGE PAYMENT

সময় ভিত্তিক, ফুরন বা কাজ-ভিত্তিক এবং সময়-ফুরন ভিত্তিক মজুরিপদ্ধতিতে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট উৎসাহ দানে অক্ষমতার দরুন, পরবর্তীকালে যে সব প্রণোদনামূলক মজুরিপ্রথার প্রবর্তন ঘটে, তা নিচে আলোচিত হল।

১. **ব্যালান্স অথবা নির্দিষ্ট তারিখ ব্যবস্থা**[10] : এতে কাজের নির্দিষ্ট সময় ও সে জন্য সময়-ভিত্তিক নির্দিষ্ট মজুরির হার (টাইম রেট) স্থির করা হয়। তারপর ফুরন প্রথায় নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট মজুরির হার স্থির করে দেওয়া হয়। সময় অনুযায়ী যে মজুরির হার ধার্য হয় তা শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি[11] নির্দেশ করে। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কাজের জন্য ফুরন হারে মজুরির পরিমাণ যদি সময়-হারে[12] মজুরির পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়, তবে শ্রমিক তাই পাবে। কিন্তু ফুরন হারে মজুরির পরিমাণ সময়-হারে মজুরির পরিমাণ অপেক্ষা কম হলে, শ্রমিক সময়-হারে ঐ নিম্নতম মজুরি পাবে এবং মজুরির ঐ ঘাটতি তাকে আগাম হিসাবে দেওয়া হবে ও পরবর্তী সময়ের মজুরি থেকে তা কেটে নেওয়া হবে। যথা, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের জন্য ১২ টাকা ন্যূনতম মজুরি ও প্রতি একক কাজের ফুরন মজুরি ২ টাকা। একজন দক্ষ শ্রমিক ১ দিনে ৭ একক কার্য-সম্পাদন করলে ৭×২ টাকা=১৪ টাকা মজুরি পাবে। অন্য একজন শ্রমিক যদি ঐ সময় ৫ একক কাজ সম্পাদন করে তবে তার কাজের অনুপাতে প্রাপ্য মজুরি হয় ৫×২ টাকা=১০ টাকা। কিন্তু দৈনিক হারে তার ন্যূনতম মজুরি ১২ টাকা। সুতরাং সে ১২ টাকাই মজুরি পাবে এবং তার যে ঘাটতি হল (১২ টাকা−১০ টাকা=২ টাকা) তা আগাম হিসাবে তাকে দেওয়া হবে ও পরে তার প্রাপ্য মজুরি থেকে তা কেটে নেওয়া হবে।

দক্ষ শ্রমিকরা এতে বেশি পরিশ্রমে বেশি উপার্জনের সুযোগ পায় বলে উৎসাহিত হয়।

২. **প্রগতিশীল মজুরিপ্রথা**[13] : টাস্কমজুরি পদ্ধতিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত উৎসাহদানে অক্ষমতার দরুন তা সংশোধন করে প্রগতিশীল মজুরিপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছে।

---
9. Task wages. 10. Balance or Date System. 11. Minimum wages.
12. At the time rate. 13. Progressive Wages System.

এতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরির হার নির্ধারিত হয়। এবং ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত কাজ সম্পাদনের[14] জন্য অতিরিক্ত নির্দিষ্ট মজুরির ব্যবস্থা থাকে। তবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন ধীরে ধীরে শ্রান্তি আসে ও সেজন্য উৎপাদনের উৎকর্ষ হ্রাস পায় বলে, ঐ অতিরিক্ত মজুরির হার ক্রমহ্রাসমান হয়ে থাকে। অর্থাৎ অতিরিক্ত সম্পাদিত কাজ যত বেশি হবে, সে জন্য অতিরিক্ত মজুরির হার ততই কমতে থাকবে। এর উদ্দেশ্য হল অতিরিক্ত আয়ের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে শ্রমিকরা যাতে অত্যধিক পরিশ্রম না করে, সেজন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া ও তার বেশি কাজ করতে নিরুৎসাহিত করা।

৩. **বোনাস-মজুরি পদ্ধতিসমূহ[15]** : প্রণোদনামূলক মজুরি পদ্ধতিসমূহের মধ্যে বোনাস-মজুরি পদ্ধতিগুলি বেশি উন্নত। এই সব বোনাস-মজুরি ব্যবস্থার সাথে প্রগতিশীল মজুরিপদ্ধতির মূল পার্থক্য হল, প্রথমটির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পুরস্কার দেওয়া হয় তারা যেটুকু সময় বাঁচায় সেজন্য আর দ্বিতীয়টিতে তাদের পুরস্কার দেওয়া হয় অতিরিক্ত কাজের জন্য[16]।

এতে সাধারণত কাজ সম্পাদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়[17] এবং তার মধ্যে উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট এককের পরিমাণ[18] স্থির করে ঘণ্টা হিসাবে মজুরির হার[19] ধার্য করা হয়। যে শ্রমিক ঐ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই নির্ধারিত এককগুলি উৎপাদনে সক্ষম হবে, সে যতটা সময় কাজ করেছে তার জন্য ঘণ্টা-হারে মজুরি ছাড়াও, যে সময় সে বাঁচিয়েছে সেজন্যও ওই সময়ের মজুরির একটি অংশ বোনাস রূপে পাবে। বিভিন্ন বোনাস মজুরি পদ্ধতিতে এই বোনাসের অংশ বিভিন্ন রূপে হিসাব করা হয়।

প্রচলিত বিভিন্ন বোনাস-মজুরি পদ্ধতির মধ্যে হালসে বোনাস প্ল্যান[20] ও রোয়ান বোনাস ব্যবস্থা[21] এই দুটি বহুল পরিচিত। শুধু বোনাস হিসাবের পদ্ধতিটি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে দুটি একরূপ। এই পদ্ধতি দুটির পার্থক্য বোঝানোর জন্য নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

ক. **হালসে বোনাস প্ল্যান** : ধরা যাক, কোন কার্যের নির্ধারিত সময়[22] ৮ ঘণ্টা এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ কাজে সময় লেগেছে ৬ ঘণ্টা[23] ও প্রতি ঘণ্টা কাজের মজুরি[24] হল ১ টাকা। শ্রমিক ও মালিক উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হয়েছে যে, সংক্ষেপিত সময়ের[25] মজুরির শতকরা ৫০ ভাগ বোনাস হিসাবে দেওয়া হবে। সুতরাং মজুরির পরিমাণ নিম্নলিখিত ভাবে হিসাব করা হবে—

প্রকৃত সময় × হার + বাঁচান বা সংক্ষেপিত সময়ের ৫০% × ঘণ্টা প্রতি হার

$$৬ \text{ ঘণ্টা} \times ১ + \frac{৫০}{১০০} \times ২ \text{ ঘণ্টা} \times ১ \text{ টাকা} = ৭ \text{ টাকা মোট মজুরি।}$$

খ. **রোয়ান বোনাস ব্যবস্থা** : উপরের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী রোয়ান প্রথায় মজুরি হিসাব নিচে দেওয়া হল। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে রোয়ান প্রথায় বোনাসের অংশ শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে চুক্তিদ্বারা স্থির হয় না। তা স্থির হয় নির্ধারিত সময় ও সংক্ষেপিত সময়-এর অনুপাত[26] দ্বারা। এই হল হালসে ও রোয়ান পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য।

$$\text{প্রকৃত সময়} \times \text{হার} + \frac{\text{বাঁচান সময়}}{\text{নির্ধারিত সময়}} \times \text{প্রকৃত সময়} \times \text{ঘণ্টাপ্রতি হার}$$

$$\therefore\ ৬\ (\text{ঘণ্টা}) \times ১ \text{ টাকা} + \frac{২\ (\text{ঘণ্টা})}{৮\ (\text{ঘণ্টা})} \times ৬\ (\text{ঘণ্টা}) \times ১ \text{ টাকা} = ৭\cdot৫০ \text{ টাকা}$$

14. Extra work. 15. Bonus Plan. 16. For extra work.
17. Specified time. 18. Units of work. 19. Hourly rate.
20. Halsey Bonous Plan. 21. Rowan Bonus System.
22. Standard time. 23. Actual time. 24. Hourly rate.
25. Time saved. 26. Ratio.

এ সম্পর্কে অবশ্য বলা বাহুল্য যে, শ্রমিকরা যদি উল্লিখিত দৃষ্টান্তমত ৮ ঘণ্টার কাজ ৬ ঘণ্টায় সম্পন্ন করে, তবেই তাদের সে দিনের কাজ শেষ হয় না। তারা বাকী ২ ঘণ্টায় আরও কাজ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে সেজন্য প্রাপ্য মজুরি, অর্থাৎ ২ ঘণ্টায় ২ টাকা উপার্জন করবে। সুতরাং হালসে প্রথায় একজন শ্রমিক সর্বমোট মজুরি পাবে ৭ টাকা+২ টাকা=৯ টাকা। আর রোয়ান প্রথায় তার সর্বমোট মজুরি হবে ৭·৫০ টাকা+২·০০ টাকা=৯·৫০ টাকা। আর একটি কথা, এটি রোয়ান প্রথায় সর্বদাই সংক্ষেপিত সময় ও নির্ধারিত সময়ের অনুপাতে কাজের প্রকৃত সময়ের মজুরির অংশ বোনাস হিসাবে দেওয়া হয়। এটি অপরিবর্তনীয়। কিন্তু হালসে প্রথায়, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে চুক্তিদ্বারা বোনাসের হার ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়। অতএব হালসে পদ্ধতিতে শ্রমিকদের সর্বমোট মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু রোয়ান পদ্ধতিতে তা সম্ভব নয়।

সুবিধাঃ হালসে ও রোয়ান, দুই পদ্ধতিরই সুবিধা এই যে,—(১) অতিরিক্ত কাজের জন্য পুরস্কৃত হয় বলে শ্রমিকরা দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়। (২) কর্তৃপক্ষও শ্রমিকগণের দ্বারা অতিরিক্ত উৎপন্নের একটি অংশ লাভ করে থাকে। উপরিখরচ কমে।

অসুবিধাঃ উভয়েরই অসুবিধা এই যে,—(১) শ্রমিকরা তাদের অতিরিক্ত কাজের জন্য আংশিকভাবে পুরস্কৃত হয়, সম্পূর্ণ ফল ভোগ করতে পারে না। (২) এই পদ্ধতিগুলিতে মজুরির হিসাব করা জটিল বলে শ্রমিকরা বুঝতে পারে না। (৩) কাজের নির্ধারিত সময়, বোনাসের অংশ, ঘণ্টাপিছু মজুরির হার ইত্যাদি স্থির করার পর সে অনুসারে কাজ করে অতিরিক্ত উৎপাদন করবে কিনা, তা সম্পূর্ণত শ্রমিকদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত প্রণোদনামূলক মজুরি প্রথাসমূহ
INCENTIVE METHODS UNDER SCIENTIFIC MANAGEMENT

শিল্প কারবারগুলিতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের সময় থেকেই, টেলর, মেরিক, গ্যান্ট, এমারসন প্রমুখরা এই নূতন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তার সহায়ক নূতন নূতন ধরনের মজুরিপ্রথা প্রবর্তন করেন। নিচে তাঁদের প্রবর্তিত মজুরি প্রথাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

টেলরের পার্থক্যমূলক ফুরন মজুরি হার[২৭]**ঃ** টেলর প্রথমে কাজের সময় ও গতি-সমীক্ষা[২৮] করে কাজের সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন। সেজন্য দু'রকম মজুরির হার নির্দিষ্ট করা হয়। ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজটি সম্পাদনে অক্ষম, অপেক্ষাকৃত অল্পদক্ষ শ্রমিকদের জন্য একটি নিম্নতর হার[২৯] ও ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বা ততোধিক কাজ সম্পাদনে সক্ষম অধিকতর দক্ষ শ্রমিকদের জন্য একটি উচ্চতর হার[৩০] নির্ধারিত হয়।

কিন্তু টেলরের নিজের প্রতিষ্ঠানেই এই পদ্ধতি ব্যর্থ হল। কারণ, এতে তিনটি অসুবিধা ছিল। প্রথমত, এতে কোন ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ নির্ধারিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, এতে আয়ের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটত। যেমন, নির্দিষ্ট কাজ যদি ১০০ একক ধার্য হয় তবে যে শ্রমিক ৯৯ একক পর্যন্ত উৎপাদন করেছে, সেও মাত্র ১ এককের জন্য ১০০ একক উৎপাদনকারী অপেক্ষা অনেক কম হারে মজুরি পাবে ও তার আয় যথেষ্ট কম হবে। এইরূপে একই শ্রমিক কোনও দিন উচ্চতর হারে অনেক

27. Taylor's Differential Piece Rate.
28. Standard time and standard task.
29. Lower rate.
30. Higher rate.

বেশী ও অনেকদিন নিম্নতর হারে অনেক কম উপার্জন করবে। তৃতীয়ত, এটি প্রবর্তন করতে গেলে কাজের সময় ও গতি সমীক্ষা করে সময় ও কাজের পরিমাণ নির্ধারণ[31] করতে হয় এবং তা সম্ভবপর করার জন্য কারখানার সর্বত্র নির্দিষ্ট মানের যন্ত্রপাতি ও কার্যপদ্ধতি[32] চালু করতে হয়। এটি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

মেরিকের বিবিধ ফুরনহার[33]ঃ শ্রমিকদের পক্ষে টেলর প্রবর্তিত পদ্ধতির অসুবিধা দূর করার জন্য মেরিক তার সংস্কার করে যে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তাতে শ্রমিকদের,—নূতন ও সেজন্য অল্প দক্ষ, সাধারণ এবং দক্ষ, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকরা নির্ধারিত সময়ে কাজের শতকরা ৮৩ ভাগ সম্পাদন করতে পারবে ধরে নিয়ে তাদের জন্য একটি নিম্নতর হার, সাধারণ শ্রমিকগণ নির্ধারিত কাজের শতকরা ১০০ ভাগ সম্পাদন করবে ধরে নিয়ে, তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চতর হার, ও দক্ষ শ্রমিকরা নির্ধারিত কাজের অতিরিক্ত সম্পাদনে সক্ষম ধরে নিয়ে, তাদের জন্য একটি উচ্চতম মজুরির হার স্থির করা হয়। এইরূপে শ্রমিকদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে তাদের জন্য তিন প্রকারের মজুরির হার স্থির করা হয়। যেন, সর্বনিম্ন, মাঝারি ও শ্রেষ্ঠ এই তিন প্রকার শ্রমিকদের কারো অসুবিধা না হতে পারে।

গ্যান্টের টাস্ক ও বোনাস ব্যবস্থা[34]ঃ টেলরের পার্থক্যমূলক ফুরন মজুরি প্রথাকে ভিত্তি করে অথচ তার মূল ত্রুটি-দৈনিক ন্যূনতম মজুরির অভাব-দূর করে গ্যান্ট একটি নূতন মজুরি প্রথা প্রবর্তন করেন। এতে সময়-ভিত্তিক, দৈনিকমজুরি পদ্ধতি ও কার্জভিত্তিক ফুরন মজুরি পদ্ধতির সমন্বয় করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায়, সম্পূর্ণ দক্ষ শ্রমিকদের[35] কার্য-ক্ষমতা অনুযায়ী একটি উচ্চমানের কাজের পরিমাণ[36] এবং একটি ঘণ্টা পিছু মজুরির হার স্থির করা হয়। যে সব নিম্নমানের শ্রমিকদের ঐ নির্ধারিত মানের কাজ সম্পাদনে অক্ষম হয় তারা ঘণ্টা হারে একটি দৈনিক ন্যূনতম মজুরি পায়। আর যারা নির্ধারিত মানের সমপরিমাণ বা ততোধিক কাজ সম্পাদনে সক্ষম, সেই সব দক্ষতর শ্রমিকরা বোনাস বাবদ নির্ধারিত সময়ের প্রাপ্য মজুরির নির্দিষ্ট অংশ সহ ফুরন পদ্ধতিতে কাজের পরিমাণের জন্য পারিশ্রমিক পাবে।

এমারসনের দক্ষতা মজুরি প্ল্যান[37]ঃ গ্যান্ট-এর প্রথার কিছু সংস্কার করে এমারসন একটি নূতন প্রথার প্রবর্তন করেন। এতেও খুব উচ্চমানের কাজের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কিন্তু সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের একই নির্দিষ্ট দৈনিক হারে মজুরি দেওয়া হয়। তবে যাতে নির্ধারিত কাজের একটি ন্যূনতম অংশ যথা, শতকরা ৬০ কিংবা ৬৬⅔ ভাগ ইত্যাদি, অন্তত সম্পন্ন হয়, সেজন্য তা স্থির করে, যে সব শ্রমিক তা সম্পাদন করবে, তাদের ঐ দৈনিক মজুরি ছাড়াও, তার একটি নির্দিষ্ট শতকরা অংশ, যথা ৩% কিংবা ৪% কি ৫% বোনাস বাবদ দেওয়া হয়। যারা বেশী পরিমাণ উৎপাদনে সক্ষম সেই সব শ্রমিক নির্ধারিত কাজের আর যত বেশী অংশ সম্পন্ন করবে, ততই দৈনিক মজুরি ছাড়াও তার ক্রমবর্ধমান শতাংশ বোনাস বাবদ পাবে। যথা—শতকরা ৮০ ভাগ সম্পাদন করলে, দৈনিক মজুরি ছাড়া, তার ১০ শতাংশ বোনাস, শতকরা ৯০ ভাগ সম্পাদন করলে, দৈনিক মজুরি ছাড়া বোনাস বাবদ তারা শতকরা ২২ ভাগ, নির্ধারিত কার্য সম্পূর্ণ সম্পাদন করলে দৈনিক মজুরি ছাড়া বোনাস বাবদ তার শতকরা ৩০ ভাগ এবং যারা নির্ধারিত কাজেরও বেশি সম্পন্ন করবে তারা দৈনিক মজুরি ছাড়া তার আরও বেশি শতাংশ বোনাস হিসাবে পাবে। এরূপে একটি অতি উচ্চমানের নির্ধারিত কাজ, অবশ্য

31. Standard time and standard task. 32. Standardisation.
33. Merrick's Multiple Piece Rate.
34. Gantt's Task and Bonus System.
35. 100 per cent efficinet workers. 36. High Standard Task.
37. Emerson's Efficiency Wages Plan.

সম্পাদনের জন্য তার একটি ন্যূনতম অংশ, এবং তা সুনিশ্চিত করার জন্য দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ছাড়া তার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বোনাস, সকল শ্রেণীর মজুরদের জন্য দৈনিক ন্যূনতম মজুরি এবং নির্ধারিত কাজের ক্রমবর্ধমান অংশ সম্পাদনের জন্য ক্রমোচ্চহারে দৈনিক মজুরির একাংশ বোনাসের ব্যবস্থা, এই প্রথার বৈশিষ্ট্য।

ন্যূনতম মজুরি ও ভারতে ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮
MINIMUM WAGES & THE MINIMUM WAGE ACT IN INDIA, 1948

ন্যূনতম মজুরির ধারণা[৩৮] **ঃ** শ্রমিকের মজুরির হার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়, এই হল দীর্ঘকাল প্রচলিত প্রথা বা সাধারণ নিয়ম। চুক্তি করার স্বাধীনতা নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিভিন্ন দেশে আইনের দ্বারা মজুরি সম্পর্কে শ্রমিক ও মালিকের চুক্তি করার স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এর পিছনে যে যুক্তি রয়েছে তা হল, জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে তা প্রয়োজন। যেসব উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা এই হস্তক্ষেপ ঘটেছে তার মধ্যে একটি হল শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ। এজন্য শ্রমিকদের আন্দোলনও অনেকাংশে দায়ী। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য শ্রমিক আন্দোলনের ও সে আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সমর্থনের কারণগুলি হল (১) শ্রমিকদের দুঃসহ অবস্থা; (২) অত্যন্ত কম মজুরির হার; (৩) মালিকগণ কর্তৃক শ্রমিকদের অসহায় অবস্থার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ।

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের উদ্দেশ্য হল ঃ এরূপ একটি মজুরির ব্যবস্থা করা যার ফলে শ্রমিকদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে। ১৯২৮ সালে জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কে যে দলিলটি গৃহীত হয় তাতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই এল ও) সদস্য দেশগুলিকে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। সে সময় অবশ্য তৎকালীন ভারত সরকার তা অনুমোদন করেনি। পরে ১৯৪৫ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় কংগ্রেস ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

সংজ্ঞা ঃ কিন্তু ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের কাজটি সহজ নয়। **যে মজুরিতে সাদাসিধে জীবনযাপনকারী ও নিয়মিত কাজ করে এমন একজন শ্রমিকের অন্ততঃ ন্যূনতম প্রয়োজন মিটতে পারে তাকে ন্যূনতম মজুরি বলে গণ্য করা হয়।**

নিয়মিত মজুরির ভিত্তি হিসাবে দুটি নীতি গৃহীত হয়েছে। একটি হল "জীবন ধারণোপযোগী মজুরি"[৩৯] এবং অপরটি হল "ন্যায্য মজুরি"[৪০]। অর্থাৎ ন্যূনতম মজুরিটি এমন হওয়া চাই যে, তাতে যেন শ্রমিক ও তার পরিবারের ন্যূনতম জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত হয় এবং সেই সাথে এও দেখতে হবে যেন, ওই মজুরিটি তার পক্ষে ন্যায্যও হয়। অর্থাৎ সে মজুরি এমন হওয়া প্রয়োজন যে, তাতে যেন শ্রমিক ও তার পরিবারের যুক্তিসঙ্গত জীবনমান অনুযায়ী খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, পুত্রকন্যার শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন মেটে এবং তারপরে কিছু সঞ্চয়ও হয়। প্রতিদিন ২,৪০০ থেকে ৩,০০০ ক্যালরি মূল্যের খাদ্য, বছরে ৩০ গজ কাপড় এবং ১০০ বর্গ ফিট স্থান একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সবল ও সুস্থদেহী শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছে। এর ভিত্তিতে শ্রমিক ও তার পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজনের বা ন্যূনতম জীবন ধারণের খরচ হিসাব করতে হয়। কিন্তু এই বিষয়ে অসুবিধা হল, একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মূল্যস্তরের তারতম্য থাকতে পারে, আবার মূল্যস্তরের ওঠা নামাও হয়। তা ছাড়া শ্রমিক পরিবারের আয়তন বা লোকসংখ্যাও হিসাবে ধরতে হবে। তার উপর আবার প্রশ্ন থাকে, শিল্পের

38. The concept of minimum wage.
39. "Living wage." 40. "Fair wage."

অবস্থা অনুযায়ী মালিক বা নিয়োগকর্তাদের পক্ষে এই ভাবে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা।

ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮ : এই কেন্দ্রীয় আইনটির দ্বারা কতকগুলি নির্দিষ্ট শিল্পে (কোন্ কোন্ শিল্পে তা আইনে উল্লেখ করা আছে), শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণের এবং তা মাঝে মাঝে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাগিচা, তামাক-জাত দ্রব্য তৈরি, বিড়ি কারখানা, চালকল, ময়দাকল, ডাল ভাঙা ইত্যাদি ১২টি শিল্প এই আইনের অধীনে আনা হয়েছে। সরকার ইচ্ছা করলে অন্যান্য শিল্পেও এই আইন প্রয়োগ করতে পারেন। এই আইনে একটি কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য এডভাইসরী বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদের কাজ হল ন্যূনতম মজুরি স্থির করার জন্য অনুসন্ধান চালানো। কেন্দ্রীয় বোর্ডের অন্যতম কাজ হল রাজ্য বোর্ডগুলির কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা। ১৯৬০ সালে ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনে সারা ভারত ন্যূনতম মজুরি হিসাবে ১০০ টাকা ধার্য করার সুপারিশ করা হয়েছিল। অধিকাংশ রাজ্যে আইনে উল্লিখিত 'ক' তপশীলের অন্তর্গত শিল্পগুলিতে এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। কোনও কোনও রাজ্য অবশ্য অন্যান্য কতকগুলি শিল্পেও এটি প্রয়োগ করেছে।

সমালোচনা : (১) শুধু অল্প কয়েকটি শিল্পে মাত্র এই আইনটি প্রয়োগ করা হয়েছে; অথচ আরও অনেক শিল্পে যেখানে শ্রমিকদের মজুরি অতিমাত্রায় অল্প সেগুলি এই আইন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই আইনের দ্বারা শ্রমিকদের উপকার সামান্যই হয়েছে। (২) যেসব শিল্পে আইনটি প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানেও তা একরকম কাগজে কলমেই আবদ্ধ রয়েছে। কারণ আইনটি বলবৎ করার কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। (৩) প্রকৃতপক্ষে এই আইনে যে মজুরি প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা হল "বাঁচানোর মজুরি"[৪১], ন্যূনতম মজুরি নয়।

ওয়েজ বোর্ড বা মজুরি পর্ষদ (WAGE BOARDS)

মজুরি নিয়ে শ্রমবিরোধের মীমাংসা এবং বিভিন্ন শিল্পে মজুরি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার, শ্রমিক, মালিক ও সরকার এই তিন পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে ত্রিপাক্ষিক মজুরি পর্ষদ[৪২] গঠনের ব্যবস্থা করেছেন। এর চেয়ারম্যান সরকার মনোনীত হয়ে থাকেন। ১৯৫৭ সালে সর্বপ্রথম এরকম যে ওয়েজ বোর্ড নিযুক্ত হয় তা ছিল তুলাবস্ত্র শিল্পের জন্য। তারপর থেকে এ পর্যন্ত ২২টি ওয়েজ বোর্ড গঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে একমাত্র ওয়ারকিং জার্নালিস্ট বা কার্যরত সাংবাদিকদের ওয়েজ বোর্ডটিই হল বিধিবদ্ধ ওয়েজ বোর্ড[৪৩], অন্যগুলি তা নয়। এর ফলে, অ-বিধিবদ্ধ ওয়েজবোর্ডগুলির সুপারিশ মানার কোনও বাধ্যবাধকতা কোনও পক্ষের থাকে না। সেগুলি গ্রহণের জন্য আবেদন নিবেদন করা এবং পরামর্শ দেওয়া চলে মাত্র। এই কারণে মাত্র অর্ধেক সংখ্যক ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশগুলি এ পর্যন্ত কাজে পরিণত হয়েছে। যেসব শিল্পে ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ বলবৎ করা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে, তুলা বস্ত্রশিল্প, সিমেন্ট, চিনি এবং সংবাদপত্র।

সমালোচনা : (১) ওয়েজ বোর্ডগুলির সুপারিশগুলি তৎপরতার সাথে বলবৎ করা হয় না। অনেক ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ আবার আদৌ বলবৎ করা হয়নি। (২) সুপারিশ করতে ওয়েজ বোর্ডগুলি অত্যন্ত দেরী করে। (৩) সবসময় সমস্ত দিক বিবেচনা করে ওয়েজ বোর্ডগুলি সুপারিশ করে না। (৪) বাস্তব অবস্থার অনুরূপ না হয়ে তত্ত্বগত বিচার বিবেচনাই তাদের কাছে প্রাধান্য পায়। (৫) অ-বিধিবদ্ধ ওয়েজ বোর্ড-গুলি খুব কমই ফলপ্রসূ হয়েছে।

---

41. "Saving wage." 42 Tripartite Wage Board.
43. Statutory Wage Board.

তবে এসব ত্রুটি সত্ত্বেও ওয়েজ বোর্ডগুলি কিছুটা ভাল কাজ [illegible] বজায় থাকা উচিত বলে ন্যাশনাল লেবার কমিশন মন্তব্য করেছেন।

বোনাস কমিশন ও বোনাস আইন, ১৯৬৫

১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার বোনাস কমিশন গঠন করেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে কমিশন রিপোর্ট পেশ করেন।

বোনাসের সংজ্ঞা ঃ কমিশন বোনাসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল ঃ "শ্রমিকরা যে প্রতিষ্ঠানের কাজ করছেন, বোনাস হল তার সমৃদ্ধিতে তাঁদের অংশ"[44]।

বোনাস কমিশনের সুপারিশ ঃ কিভাবে বোনাসের হিসাব করতে হবে কমিশন তার একটি সূত্র দিয়েছেন। সূত্রটি হল এই ঃ অবচিতি, আয়কর, সুপার ট্যাক্স, আদায়ীকৃত পুঁজির উপর ৭ শতাংশ হারে আয় এবং রিজার্ভ ফান্ডের উপর ৪ শতাংশ হারে আয় মোট মুনাফা[45] থেকে বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তার শতকরা ৬০ ভাগ মাসিক ১,৬০০ টাকা বেতনভোগী পর্যন্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের বোনাস বাবদ দিতে হবে। বাকি শতকরা ৪০ ভাগ থেকে গ্রাচুয়িটি, অন্যান্য রিজার্ভ, সুপার প্রফিট ট্যাক্স ইত্যাদি এবং কোম্পানী ইচ্ছা করলে ১,৬০০ টাকা বেতন পর্যন্ত তদারককারী কর্মীদের বোনাস দিতে পারে। সারা বছর কাজ করেছে এমন শ্রমিকরা হয় তাদের বার্ষিক আয়ের শতকরা ৪ ভাগ নয়তো ৪০ টাকা এই দুয়ের মধ্যে যেটি বেশি তা ন্যূনতম বোনাস হিসেবে পাবেন। আর মূল মজুরি[46] ও ডি এ মিলিয়ে মোট বার্ষিক আয়ের শতকরা ২০ ভাগ হবে বোনাসের সর্বোচ্চ সীমা। যে কর্মচারীটি এক বছরের কম সময় কাজ করেছে তার বোনাস আনুপাতিক ভাবে স্থির হবে। যদি কোনও বৎসর উদ্বৃত্তের পরিমাণটি সর্বোচ্চ পরিমাণ বোনাস দিতে যা লাগে তার চেয়ে বেশি হয় তবে তা পরবর্তী পর পর চার বৎসরের ঘাটতি পূরণের কাজে লাগানো যাবে। তেমনি কোনও বৎসরের উদ্বৃত্ত যদি ন্যূনতম হারে বোনাস দিতে যে টাকা লাগবে তার চেয়েও কম হয়, তাহলে তা পরবর্তী পব পর চার বৎসরের উদ্বৃত্ত থেকে পূরণ করা যাবে। যদিও কোনও বিশেষ বৎসরে কোম্পানীর লোকসানও হয় তাহলেও শ্রমিকদের বোনাস দিতে হবে। বোনাস দিতে বৎসরের হিসাব শেষ হওয়ার পর আট মাসের বেশি দেরী করা উচিত নয়। নূতন প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রথম ছয় বৎসর বোনাস দিতে হবে না।

বোনাস আইন ঃ বোনাস কমিশনের সুপাবিশগুলি কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোনাস আইন পাশ করেন।

১. **প্রযোজ্য ক্ষেত্র**—শ্রমিককর্মচারীর সংখ্যা যাই থাকুক সমস্ত বেসরকারী কলকারখানায় (ফ্যাক্টরি) এটি প্রযোজ্য। ফ্যাক্টরি ছাড়াও ২০ জন বা তার বেশি সংখ্যক শ্রমিক-কর্মী নিয়োগকারী অন্যান্য সংস্থায়ও এটি প্রযোজ্য। জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের আর সকল রাজ্যে এটি প্রযোজ্য। প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রতিযোগিতাহীন ক্ষেত্রে নিযুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থানগুলিতেও এটি প্রযোজ্য (রেল এবং ডাক ও তার বিভাগ ছাড়া)।

২. **যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ঃ** রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিপজিট ইনস্যুরেন্স করপোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, এল আই সি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কবপোরেশন, স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোবেশন, এগ্রিকালচারাল রিফিন্যান্স করপোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেল, ডাক ও তার বিভাগ, নাবিক, স্টিভেডোর শ্রমিক, বাড়িঘর তৈরির ঠিকাদারদের শ্রমিক এবং মুনাফার উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে না এমন সংস্থাতে এই আইনটি প্রযোজ্য নয়।

---

44. 'A share of the workers in the prosperity of the concern in which they are employed'.
45. Total profits.
46. Basic wages.

৩. **বোনাসের হার**—১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে একটি অর্ডিন্যান্স দ্বারা সরকার ন্যূনতম বোনাসের হার শতকরা ৪ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ৮·৩৩ ভাগ ধার্য করেছেন। ১৯৬৯ সালে একটি সংশোধনী দ্বারা সরকার মূল আইনের কতকগুলি ত্রুটি দূর করেছেন। *এর ফলে যা থেকে বোনাস দেওয়া হবে সেই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেড়েছে।*

মুনাফার শরিকানা ও সহ-অংশীদারী
PROFIT SHARING AND CO-PARTNERSHIP

এরা বস্তুত কোন পৃথক মজুরি প্রথা নয়। বরং মজুরি প্রথার অতিরিক্ত ব্যবস্থা। মজুরি ব্যবস্থা যতই 'প্রগতিশীল,' 'প্রণোদনা মূলক' অথবা 'বৈজ্ঞানিক' হোক না কেন, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত পুরস্কারের যত ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, সর্বদাই তারা অনুভব করেছে যে, কোন মজুরি ব্যবস্থাতেই শ্রমের সম্পূর্ণ ফল তাদের ভোগ করতে দেওয়া হয় না। তারা মনে করে যে, মুনাফা তারাই সৃষ্টি করে কিন্তু তার ভোগ থেকে তাদেরই অন্যায় ভাবে বঞ্চিত করে সবটুকুই মালিকরা গ্রাস করে। শ্রমিকদের এই ধারণাই শ্রমিক ও মালিকের বিরোধের মূল কারণ বলে অনেকে মনে করেন। শ্রমিকদের এই ক্ষোভ ও অসন্তোষ দূর করে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে একটি হৃদ্য, পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে শিল্পবিরোধের চিরস্থায়ী সমাধান ও তার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই আধুনিক কালে যথোপযুক্ত মজুরি প্রথার সাথে শ্রমিকদের লভ্যাংশ প্রদান ও তাদের সাথে মালিকপক্ষের, কারবারের সহ-অংশীদারী প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দেশে দেশে বিস্তার লাভ করেছে। অধুনা অনেকের মতেই এই ব্যবস্থা দুটির যথাযথ প্রয়োগ শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার শক্তিশালী উপায়।

মুনাফার শরিকানা : যে কোন ধরনের মজুরি প্রথা অনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ ও প্রদান ছাড়াও অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে, তাদের জন্য কারবারের মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করা যায়। এইরূপে শ্রমিকগণকে মুনাফার শরিকানা ভোগ করতে দেওয়া হয়। ষান্মাসিক বা বৎসরান্তে মুনাফার ঐ নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকগণের মধ্যে তাদের মজুরির অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হয়। এটি "মুনাফার শরিকানা" নামে পরিচিত।

উদ্দেশ্য : মুনাফার অংশ ভোগের অধিকার প্রদানের দ্বারা কারবারের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে শ্রমিকদের আগ্রহ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাদের সহযোগিতা আদায় ও শিল্পে শান্তিস্থাপনই এই নীতির মূল উদ্দেশ্য।

সুবিধা : ১. এর দ্বারা শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ দূর হয়ে শিল্পে শান্তি স্থাপিত হয় এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে উন্নতি ঘটে।

২. শিল্পে শান্তি অব্যাহত থাকায় ও শ্রমিকরা কারবারের মঙ্গলে আগ্রহী হওয়ায় উৎপাদন বাড়ে।

৩. শ্রমিকরা আগ্রহ নিয়ে কাজ করে বলে কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যের অপচয় কমে এবং যন্ত্রপাতি যত্নের সাথে ব্যবহৃত হয়। ফলে কারবারের ব্যয় কমে ও মুনাফা বাড়ে।

৪. মুনাফা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকরা উৎসাহিত হওয়ায় দায়িত্বের সাথে কাজ করে। তাদের উপর তদারকীর প্রয়োজন কমে যায়। ফলে তদারকী খরচ কমে।

৫. কারবারের মুনাফা বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের আয় বাড়ে বলে, আয় বৃদ্ধির চেষ্টায় তাদের এক প্রতিষ্ঠান থেকে অপর প্রতিষ্ঠানে অনবরত ঘুরতে হয় না। একই কারবারের শ্রমিকরা স্থায়িভাবে দীর্ঘকাল কার্যরত থাকায় কারবারের উৎপাদনে কোন বিঘ্ন হয় না।

৬. এতে আয় বৃদ্ধির সুযোগ থাকায় সুদক্ষ শ্রমিকরা আকৃষ্ট হয়।

অসুবিধা : ১. এর সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের পুরস্কার তাদের পরিশ্রমের আনুপাতিক হয় না। কারণ, কারবারের সব শ্রমিকের জন্য মুনাফার যে অংশ নির্দিষ্ট হয়, তা খেয়ালখুশীমত স্থির হয়।

২. মুনাফার অংশ বাৎসরিক বা ষান্মাসিক শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়; অতএব, তারা পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কৃত হয় না। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। সুতরাং এতে তাদের আগ্রহ ও উদ্যম হ্রাস পায়।

৩. এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের পুরস্কারের পরিমাণ অনিশ্চিত এবং তার বণ্টন অনিয়মিত হয়। কারবারের মুনাফার হ্রাসবৃদ্ধির সাথে শ্রমিকদের প্রাপ্য পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। মুনাফা না হলে কিছুই পাওয়া যায় না, আর অল্প হলে তাদের প্রাপ্য অংশ নামমাত্র হয়। এতে আর তাদের কিছুমাত্র উৎসাহ থাকে না।

৪. এজন্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে সতর্কভাবে কারবারের মুনাফা হিসাব করতে হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে শ্রমিকরা অংশ গ্রহণ করতে পারে না বলে মুনাফার পরিবর্তনের দরুন তাদের প্রাপ্য অংশের হ্রাসবৃদ্ধি হলে, সে সম্পর্কে তাদের অবিশ্বাস দেখা দেয় ও তা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায়।

৫. একই শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অবস্থা অনুযায়ী কোথাও তারা বেশী, কোথাও বা অল্প পরিমাণে পুরস্কৃত হয়। এতে তাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয় ও শিল্প-ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের সংহতি গড়ে উঠতে পারে না।

৬. চড়্‌তির বাজারে কারবারের মুনাফা বাড়ে বলে এই ব্যবস্থা কার্যকর হলেও, মন্দার বাজারে কারবারের মুনাফা থাকে না বলে তখন এই নীতি অকেজো হয়ে পড়ে। তাতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ে।

৭. মালিকপক্ষ থেকে এই আপত্তি ওঠে যে, শ্রমিকরা যদি মুনাফার অংশ পায়, তবে কারবারের লোকসানের ভাগও তাদের বহন করা উচিত।

ভারতে মুনাফার শরিকানা
PROFIT SHARING IN INDIA

ফরাসী দেশে ১৮২০ সালে এই ব্যবস্থা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। ১৮৭০ সালের পর এটি মার্কিন দেশে প্রচলিত হয়। ভারতে ১৯৩৭ সালে টাটা আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানীতে এটি প্রথম প্রবর্তিত হয়। স্বাধীনতালাভের পর ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে অশান্তি দূর করার উপায় হিসাবে এটি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

১৯৪৮ সালের মে মাসে ১৪ জন সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি তুলাবস্ত্র, চটকল, ইস্পাত, সিমেন্ট, সিগারেট ও মোটর গাড়ির টায়ার নির্মাণ শিল্পে পাঁচ বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে শ্রমিকগণকে মুনাফার অংশদানের পরিকল্পনা প্রবর্তনের সুপারিশ করে।

কমিটি সুপারিশ করে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির চলতি ব্যয়, কর, ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি বাদে নীট মুনাফার ১০% সঞ্চয় তহবিলে জমা দিয়ে ৬% লভ্যাংশ ঘোষণার পর বাকি মুনাফার ৫০% ভাগ শ্রমিকগণের মধ্যে বণ্টন করা যেতে পারে। তাতে প্রত্যেক শ্রমিকের প্রাপ্য অংশ, তার বোনাস ও অন্যান্য ভাতাবাবদ, মোট বেতনের অনুপাতে প্রদত্ত হবে। কোন শ্রমিকের মুনাফার অংশ বাবদ প্রাপ্য অর্থ তার মূল বেতনের ২৫% পর্যন্ত নগদে দেওয়া হবে ও বাকি অংশ তার প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসাবে বা অন্যভাবে জমা হবে. কমিটি আরও বলেছেন যে, এটি শিল্পহিসাবে প্রবর্তিত না হয়ে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিতে প্রবর্তিত হওয়া উচিত।

মন্তব্য: এ পর্যন্ত কোন দেশেই এই পরিকল্পনা উদ্দেশ্য লাভে সফল হয়নি। ভারতেও টাটা লৌহ-ইস্পাত কোম্পানীর এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ

সন্তোষজনক নয়। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোথাও এটি এ পর্যন্ত সফল হয় নি বলে সমালোচকদের মত। তা ছাড়া, বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত উদ্বৃত্ত মুনাফার হিসাব বের করা অত্যন্ত কঠিন। এরূপ অবস্থায় শ্রমিকদের মুনাফার যে অংশ দেওয়া হবে তাতে তারা সন্তুষ্ট হবে বলে মনে হয় না। এই সব অসুবিধার জন্য এদেশে এই ব্যবস্থার প্রয়োগের সম্ভাবনা অল্প। খুব সম্ভব এই সব কারণেই সরকার এখন পর্যন্ত এটি কোন শিল্পে প্রবর্তন করেন নি।

সহ-অংশীদারী: ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করতে পারে না বলে মুনাফার শরিকানা ব্যবস্থায়, মুনাফার হিসাব সম্পর্কে শ্রমিকদের মনে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য এবং কারবারের সাথে তাদের একাত্মবোধ বৃদ্ধির জন্য একটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তা সহ-অংশীদারী ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

এই ব্যবস্থায়, যথোপযুক্ত মজুরি প্রথার সাথে শ্রমিকদের মধ্যে কারবারের মুনাফার অংশ বণ্টন করা ছাড়াও অল্পসংখ্যক শ্রমিক-প্রতিনিধিদের কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের জন্য, অংশীদাররূপে গ্রহণ করা হয়। এই শ্রমিক প্রতিনিধিরা একদিকে কারবারের কর্মচারী ও অন্যদিকে তার মালিকদের অন্যতম বলে গণ্য হয়। এই ব্যবস্থাব অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে শ্রমিকরা মুনাফার যে অংশ বোনাস হিসাব পায় তা কারবারেই বিনিয়োগ করা হয়।

সুবিধা ঃ এতে শ্রমিকরা কারবারের অংশীদার হয়ে পড়ে বলে অন্যত্র চলে যায় না। ফলে, সুদক্ষ শ্রমিকদের সেবা থেকে কারবার কখনও বঞ্চিত হয় না এবং কারবারেব দক্ষতা অব্যাহত থাকে।

অসুবিধা ঃ মালিকানাতে শ্রমিকদের গ্রহণ করা হলেও তাদের অংশ এত সামান্য য়, প্রকৃতপক্ষে কারবারের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় তাদের কোন কার্যকর কর্তৃত্ব থাকে না। এ ছাড়া, শ্রমিকদের কঠিন পরিশ্রমলব্ধ বোনাসবাবদ যে অর্থ কারবারে বিনিয়োজিত হয়, কারবারের লোকসান হলে তার সবটাই বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

লাভের ভাগাভাগি[৪৭] ঃ মুনাফার শরিকানা নীতিতে শ্রমিকদের যে মুনাফার অংশ ভোগ করতে দেওয়া হয়, তার সাথে কারবারের উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। এবং অধিকার হিসাবে, তা শ্রমিকদের ভোগ করতে দেওয়া হয় না, নিতান্তই মালিকপক্ষের সদিচ্ছা ও সহানুভূতির উপর তা নির্ভর করে। বর্তমানে এর সংশোধন করে যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, তা 'লাভের ভাগাভাগি' নামে পরিচিত। এতে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের সে অনুপাতে পুরস্কৃত করা হয়। সুতরাং এটি শ্রমিকদের দক্ষতাবৃদ্ধির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে বলে উৎপাদনবৃদ্ধিতে কার্যকর উৎসাহ যোগায় এবং পুরস্কারে শ্রমিকগণের ন্যায্য অধিকার জন্মায়।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

১২ ব্যবস্থাপনার বুনিয়াদী দিক

1. Discuss the meaning, scope and importance of the term "Management."
   ["ব্যবস্থাপনা" শব্দটির অর্থ, পরিধি এবং গুরুত্ব আলোচনা কর।] উঃ ১৯৭-৮ পৃঃ
2. Management is an art and a science as well."—Explain.
   ["ব্যবস্থাপনা হল একটি কলা এবং একটি বিজ্ঞানও"—কথাটি ব্যাখ্যা কর।]
   উঃ ১৯৮-৯ পৃঃ

47. Gain Sharing.

3. Following Fayol, Gullick and Fox, discuss in functions of management.
[ফেয়ল, গালিক ও ফকসের অনুসরণে ব্যবস্থাপনার কাজগুলি আলোচনা কর।]
উঃ ১৯৯-২০২ পৃঃ

4. Write a short note in levels of management.
[ব্যবস্থাপনার স্তরবিভাগ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ।] উঃ ২০২-৩ পৃঃ

১৩. শিল্পের প্রশাসনিক সংগঠন

1. What is meant by delegation of authority? Distinguish between 'Staff Authority' and 'Line Authority'. Suggest measures that will maintain a harmonius relationship between 'Staff Authority' and "Line Authority"
[কর্তৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ কাকে বলে? 'পদস্থ কর্মচারী' এবং 'সরলরৈখিক' কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। 'পদস্থ কর্মচারী' এবং 'সরল রৈখিক' সংগঠনের মধ্যে সুসঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দাও।]
উঃ ২০৮-৯, ২১৬-২০ পৃঃ

2. Discuss the respective advantages of 'Line' and 'Staff' Organisations. [C. U. 1963]
['সরল রৈখিক' এবং 'পদস্থ কর্মচারী' সংগঠনের সুবিধাগুলি আলোচনা কর।]
উঃ ২১৬-১৯ পৃঃ

3. Decentralisation demands effective co-ordination. Why? [C. U. 1964]
[বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কার্যকর সংযোজন ব্যবস্থা প্রয়োজন। কেন?] উঃ ২১২-১৪ পৃঃ

4. What is meant by delegation? How you would make delegation effective? [C. U. 1969]
[ভারার্পণ বলতে কি বোঝায়? এরূপ অর্পণ কার্যকর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন?] উঃ ২১১-১২ পৃঃ

১৪ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও শিল্পসংস্কার

1. Taylor laid down certain conditions for securing results by the applications of 'Scientific Management' in an industry. What are those conditions? [C. U 1967]
[টেলর 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার'-র প্রয়োগ দ্বারা ফল লাভের জন্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা শর্তের উল্লেখ করেছিলেন। ঐ গুলি কি কি?] উঃ ২৩২-৩৭ পৃঃ

2. Do you think rationalisation of old industries like cotton or jute is desirable when India is faced with a huge unemployment problem? [C. U. 1963, '65]
[ভারত যখন বিপুল বেকারসমস্যার সম্মুখীন, তখন সুতীবস্ত্র কিংবা চটকলের ন্যায় শিল্পগুলিতে শিল্পসংস্কার বাঞ্ছনীয় বলে তুমি মনে কর কি?] উঃ ২৪৩-৪৭ পৃঃ

3. What is Rationalisation? Discuss its effect on Indian Industries and the employment situation. [C. U. 1965]
[শিল্পসংস্কার কাকে বলে? ভারতীয় শিল্পগুলি এবং কর্মসংস্থানের পরিস্থিতির উপর তার প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।] উঃ ২৩৮-৩৯, ২৪৩-৪৭ পৃঃ

4. It is suggested that Indian businessmen should introduce 'scientific management" in their enterprises.
Do you agree with this suggestion? Give reasons for your answer. [C. U. 1968]
[ভারতীয় কারবারীদের উচিত তাদের কারবারে 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা' প্রবর্তন করা। তুমি কি এই পরামর্শের সাথে একমত? তোমার উত্তরের যুক্তি প্রদর্শন কর।]
উঃ ২৪৩-৪৭ পৃঃ

5. Is there any difference between 'increased production' and 'increased productivity'? Discuss fully. [C. U. 1966]
['বর্ধিত উৎপাদন' এবং 'বর্ধিত উৎপাদনশীলতা'-র মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?]
উঃ ২৪৯-৫১ পৃঃ

6. What is the difference between 'increased productivity' and 'increased production'? What steps are actually advocated for increased productivity? [C. U. Hon. 1968]
['বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি' এবং 'বর্ধিত উৎপাদনের' মধ্যে পার্থক্য কি? উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সাধারণতঃ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা প্রচার করা হয়?] উঃ ২৪৯-৫১ পৃঃ
7. Explain the main characteristic features of 'Scientific Management'. What are its merits? [C. U. 1970]
['বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। এর গুণাবলী কি কি?]
উঃ ২৩৯, ২৩২-৩৭ পৃঃ

১৫ উৎপাদনে নিযুক্ত কারবারী প্রতিষ্ঠানের সংগঠন

1. What is meant by lay-out of a factory? What special factors should be taken into account in designing the lay-out of a proposed factory? [C. U. 1964]
[কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাস বলতে কি বোঝায়? প্রস্তাবিত কোন একটি কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাস রচনায় কি কি বিশেষ বিষয়ের কথা বিবেচনা করা উচিত?
উঃ ২৬১-৬২ পৃঃ
2. What factors should be taken into consideration in selecting the site of a factory? [C. U. 1965, '66]
[কোনও কারখানার স্থান নির্বাচনে কি কি বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত?]
উঃ ২৫৯-৬০ পৃঃ
3. Why so much importance is now being attached to 'costing' in a factory? What are the main elements of costing and how do they affect the selling price of a product. [C. U. 1965]
[কারখানাতে 'পড়তা খরচের' উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে কেন? পড়তা খরচের প্রধান উপাদানগুলি কি এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় খরচকে তারা কিভাবে প্রভাবিত করে?]
উঃ ২৭০-৭২ পৃঃ
4. Majority of the units of engineering industries of India are located in Calcutta. What are the reasons therefor? [C. U. 1969]
[ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় উপস্থিত। এর কারণ কি?] উঃ ২৫৯ পৃঃ
5. Explain the need for and features of departmentalisation in a factory. [C. U. B. Com. 1974]
[কারখানার বিভাগীয়করণের প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।]
উঃ ২৬৪-৬৫ পৃঃ

১৬ শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা

1. Suggest the best system of wage payment, giving its full description with advtanges and disadvantages. [B. U. 1962]
[পূর্ণ বিবরণ এবং সুবিধা ও অসুবিধা সহ শ্রেষ্ঠ মজুরিপ্রদান ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দাও।] উঃ ২৮৪-৮৫ পৃঃ
2. Discuss any four systems of wage payments to industrial workers and their respective advantages. [C. U. 1963]
[শিল্পশ্রমিকদের জন্য যে কোন চারটি মজুরি প্রদান ব্যবস্থা আলোচনা কর এবং তাদের আপন আপন সুবিধাগুলি উল্লেখ কর।] উঃ ২৮৫-৮৭ পৃঃ
3. What are the usual methods of wage-payments? Discuss their respective advantages. [C. U. 1964, 1965]
[মজুরি প্রদানের সচরাচর পদ্ধতিগুলি কি? তাদের প্রত্যেকের সুবিধাগুলি আলোচনা কর।]
উঃ ২৮৪-৮৭ পৃঃ
4. What is it desirable to have a separate department for dealing with personnel matters in a big organisation? Discuss fully. [C. U. '66]
[একটি বড় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারী সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য একটি পৃথক বিভাগ রাখা বাঞ্ছনীয় কেন? সম্যকরূপে আলোচনা কর।] উঃ ২৭৬-৭৮ পৃঃ

সপ্তম খণ্ড বিক্রয় ব্যবস্থা
MARKETING

অধ্যায়

১৭

পণ্য বণ্টন প্রণালী
CHANNELS OF DISTRIBUTION

পণ্য বণ্টন[1] ও পণ্য বণ্টন প্রণালী[2] ঃ 'পণ্য বণ্টন' বলতে ক্রেতাদের কাছে উৎপাদিত দ্রব্যটি পেঁৗছে দেওয়ার কাজটাকে বোঝায়। পণ্য বণ্টন প্রণালী হল ক্রেতাদের কাছে তাদের ব্যবহার ও ভোগের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যটি পেঁৗছে দেবার ব্যবস্থা। বর্তমান কালে পণ্য বণ্টনের সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে। মানুষ যখন নিজের দরকারী দ্রব্যটি নিজেই উৎপাদন বা তৈরি করে নিত, তখন পণ্য বণ্টনের কোনও সমস্যা ছিল না। যে উৎপাদনকারী, সেই ছিল আবার ভোগ বা ব্যবহারকারীও। কিন্তু সভ্যতার সেই আদিম স্তর আজ আর নেই। এখন সভ্যতা যেমন উন্নত, তেমনি জটিল হয়ে উঠেছে। জটিল হয়ে পড়েছে উৎপাদন ব্যবস্থা, জটিল হয়ে পড়েছে পণ্য বণ্টন প্রণালীও। কারণ, এই জটিলতা দেখা দেবার ও তা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্য উৎপাদনকারী আর দ্রব্য ব্যবহারকারী বা ভোগকারীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে ও তা বেড়ে চলেছে। সৃষ্টি হয়েছে সময়গত, স্থানগত ও ব্যক্তিগত বাধা[3]-র (প্রথম অধ্যায় ৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী বা ভোগকারীর মধ্যে এই দূরত্ব, তাদের মধ্যে অবস্থিত এই বাধা দূর করাই হল পণ্য বণ্টন প্রণালীর কাজ। উৎপন্ন সামগ্রী যেহেতু নানা রকমের, ক্রেতারাও যেহেতু নানা রকমের, সেহেতু পণ্য বণ্টন প্রণালীও অর্থাৎ পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থাও এক রকমের হতে পারে না, নানা রকমের হয়ে থাকে।

মধ্যস্থ কারবারী (MIDDLEMEN)

মধ্যস্থ কারবারী বা ব্যবসায়ী[4] ঃ যে ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী নিজেই সরাসরি ভোগকারী বা ব্যবহারকারীর কাছে পণ্যটি বিক্রয়ের অর্থাৎ পেঁৗছে দেবার ব্যবস্থা[5] করে তার ও ক্রেতার মধ্যে দূরত্বটি দূর করতে সক্ষম হয়েছে সে ক্ষেত্র ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই উৎপাদনকারী এবং ভোগ ও ব্যবহারকারীর মধ্যে দূরত্ব ও বাধাগুলি দূর করতে হলে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, যার সাহায্য না নিলে চলে না, সে হল মধ্যস্থ কারবারী। 'মধ্যস্থ' কথাটার এখানে অর্থই হল যে উৎপাদনকারী ও ভোগ বা ব্যবহারকারীর মাঝখানে রয়েছে ওই দু'পক্ষের মাঝখানে থেকে সে তাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের বা যোগসূত্রের কাজ করে।

মধ্যস্থ কারবারী হল সেই (স্বতন্ত্র) ব্যক্তি বা কারবারী সংস্থা যে পণ্য বণ্টন বা বিক্রয় ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী এবং ভোগ বা ব্যবহারকারীর মাঝখানে থেকে ('মধ্যস্থ'), পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ে সাহায্য করে এবং পণ্য বিক্রয়ের কয়েকটি বা সমস্ত কাজই সম্পাদন করে। তার মারফৎই পণ্যের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণটি উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ভোগ বা ব্যবহারকারীর কাছে হস্তান্তরিত হয়। অর্থের বা মুনাফার বিনিময়ে সে এই কাজ করে এবং সেকারণে পণ্যের বিক্রয় খরচ এবং সেহেতু দামও বাড়ে। তবে তার কাজের ফলে পণ্য বণ্টন ব্যবস্থায় কিছুটা ব্যয় সংকোচও হয়। **মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য বণ্টন ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ভোগ বা ব্যবহারকারীর মাঝখানে এই মধ্যস্থতা করার কাজের নামই হল ব্যবসায়[6]।** সুতরাং মধ্যস্থ কারবারীরা হল ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীরা আসলে হল মধ্যস্থ কারবারী।

1. Distribution (of goods). 2. Channel of Distribution.
3. Time hindrance, place hindrance and personal hindrance.
4. Middlemen or Traders. 5. Direct selling by producer. 6. Trade.

মধ্যস্থ কারবারীদের প্রকার ভেদ[7] : পণ্যের বেচাকেনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে নিজেরা পণ্যের মালিকানা নেয় কি নেয় না, সে অনুসারে মধ্যস্থ কারবারীদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) ক্রিয়াগত মধ্যস্থ[8] কারবারী এবং (খ) বণিক মধ্যস্থ কারবারী[9]।

ক. ক্রিয়াগত মধ্যস্থ কারবারী—এরা উৎপাদনকারীর কাছ থেকে নিজেরা পণ্যের মালিকানা গ্রহণ না করে, অর্থাৎ নিজেরা পণ্যটি না কিনে, কেবল পণ্যের বেচাকেনায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে মাত্র। উৎপাদনকারীর হাতেই পণ্যের মালিকানা থাকে আর এরা উৎপাদনকারীর বাণিজ্যিক প্রতিনিধিরূপে[10] কাজ করে। কাজের বিনিময়ে এরা পারিশ্রমিক রূপে বিক্রয় মূল্যের নির্দিষ্ট শতাংশ কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কমিশন বা দস্তুরি পায়। দালাল[11], ফড়িয়া[12], কমিশন এজেন্ট[13], ঝুঁকিবাহক এজেন্ট[14], নিলামদার[15], আড়তদার ইত্যাদি হল ক্রিয়াগত মধ্যস্থ কারবারীর দৃষ্টান্ত।

১. **দালাল** হল সেই বাণিজ্যিক প্রতিনিধি যার কাছে মাল অথবা মালের মালিকানা কোনটাই থাকে না, সে শুধু ক্রেতার বা বিক্রেতার হয়ে বিক্রেতা বা ক্রেতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও মধ্যস্থতা করে পণ্যটি কিনিয়ে কিংবা বিক্রি করিয়ে দেয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বেচাকেনার শর্তগুলি স্থির হয়ে গেলেই তার কাজ শেষ। ক্রেতার হয়ে কাজ করলে সে হয় ক্রেতার প্রতিনিধি[16], আর বিক্রেতার হয়ে কাজ করলে সে হয় বিক্রেতার প্রতিনিধি[17]। পারিশ্রমিক রূপে, লেনদেনের উপর সে শুধু নির্দিষ্ট হারে কমিশন বা দস্তুরি পায়।

২. **কমিশন এজেন্ট** বিক্রেতার প্রতিনিধি হয়ে পণ্য বিক্রয়ের কাজ করে, তবে সে শুধু মাল বিক্রির কাজে মধ্যস্থতাই করে না, বিক্রয়ে সাহায্য করতে গিয়ে সে মালের দখলও নেয় এবং ক্রেতার কাছে তাব মালিকানা হস্তান্তরের বন্দোবস্তও করে দেয়। পণ্য বিক্রয় করতে গিয়ে তাকে পণ্য গুদামজাত করা, গুণাগুণ অনুযায়ী তা বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করা[18], মোড়ক বাঁধাই করা[19], নমুনা তৈরি করা[20] এবং ক্রেতার কাছে তা পাঠানো ইত্যাদি নানা কাজ করতে হয়। পারিশ্রমিক হিসাবে মোট বিক্রয়ের একটা নির্দিষ্ট শতাংশ সে পায়।

৩. **ঝুঁকিবাহক (কমিশন) এজেন্ট** হল সেই কমিশন এজেন্ট যাকে উৎপাদনকারী বা পণ্যের মালিক শুধু পণ্য বিক্রয়ের ভারই দেয়নি, তাকে ধারে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষমতাও দিয়েছে। ধারে বিক্রয়ে টাকা আদায় না হলে সে ঝুঁকিও অর্থাৎ লোকসানও তারই। এই বাড়তি ঝুঁকি সে নেয় বলে পারিশ্রমিক বাবদ তাকে সাধারণ কমিশনের বেশি কিছু অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া হয় এবং এজন্য তাকে "ডেল ক্রেডার" এজেন্ট বা ঝুঁকিবাহক এজেন্ট বলা হয়।

৪. **ফড়িয়া** হল পণ্য বিক্রেতার এমন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি যার হেফাজতে মাল থাকে এবং যে নিজ নামে, সুবিধামত সময়ে এবং নগদে বা ধারে তা বিক্রয় করে। পারিশ্রমিক হিসাবে সে পায় কমিশন।

৫. **নিলামদার** হল পণ্যের মালিক ও বিক্রেতার এমন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি যে মাল নিজের হেফাজতে নিয়ে তা কিনতে ইচ্ছুক ক্রেতাদের দেখাবার ব্যবস্থা করে এবং নিলাম ডেকে তা বিক্রয় করে। ক্রয়ে ইচ্ছুক যে ক্রেতা সর্বোচ্চ ডাক দেয় অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি দাম দিতে চায় তা যদি অন্ততঃ পণ্যটির ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্যেব[21] সমান হয় তবেই সে

7. Types of Middlemen. 8. Functional Middlemen.
9. Merchant Middlemen 10. Mercantile Agents 11. Broker
12. Factor. 13. Commission Agent. 14. Delcredre Agent.
15. Auctioneer. 16. Buying Agent. 17. Selling Agent.
18. Grading. 19. Packaging. 20. Sampling.
21. Minimum reserve price.

পণ্যটি কিনতে পারে। নিলামদার পণ্যের মূল্য অনুযায়ী অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন পায়।

খ. বণিক মধ্যস্থ কারবারী—যে মধ্যস্থ কারবারীরা পণ্য বিক্রয় করতে গিয়ে নিজেরা পণ্যের মালিকানা গ্রহণ করে, ঝুঁকি নেয় এবং কমিশনের জন্য নয়, মুনাফা উপার্জনের জন্য পণ্য কেনা বেচার কাজ করে, তারাই হল বণিক মধ্যস্থ কারবারী।

এরা দু'রকমের—(১) পাইকারী ব্যবসায়ী এবং (২) খুচরা ব্যবসায়ী।

পণ্য বণ্টন প্রণালী
CHANNELS OF DISTRIBUTION

পণ্য বণ্টন প্রণালী হল উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ভোগ বা ব্যবহারকারীদের কাছে পণ্য পেঁৗছে দেবার পথ। এর আরেক নাম হল ব্যবসায়-প্রণালী বা খাত[22]। এই পথে উৎপাদনকারীর হাত থেকে সরাসরি কিংবা নানান মধ্যস্থ কারবারীর হাত ঘুরে এবং পথে মালিকানা হস্তান্তর হতে হতে অবশেষে পণ্য ও তার মালিকানা প্রকৃত ভোগকারী বা ব্যবহারকারীর কাছে পেঁৗছায়। পণ্য চলার এই পথের এক প্রান্তে রয়েছে উৎপাদনকারী অন্য প্রান্তে রয়েছে ভোগ বা ব্যবহারকারী আর মাঝখানে রয়েছে নানা ধরনের মধ্যস্থ কারবারীরা—এদের সকলকে নিয়েই হল পণ্য বণ্টন প্রণালী বা ব্যবসায় খাত।

পণ্য বণ্টন প্রণালীর প্রকারভেদ[23]ঃ পণ্য ও অন্যান্য বিষয় অনুসারে পণ্য বণ্টন প্রণালী নানা প্রকার হতে পারে, কিন্তু তা মূলত দু'রকমেরঃ (১) **উৎপাদনকারী কর্তৃক ভোগকারী বা ব্যবহারকারীর কাছে সরাসরি পণ্য বিক্রয় প্রণালী[24]**, এই পথে মাঝখানে কোনও মধ্যস্থ কারবারী থাকে না; এবং

(২) উৎপাদনকারী কর্তৃক **মধ্যস্থ কারবারী মারফৎ ভোগ বা ব্যবহারকারীর কাছে পণ্য বিক্রয় প্রণালী[25]**। মধ্যস্থ কারবারীরা নানান জাতীয় হয় বলে এই প্রণালীটির নানা রকমফের দেখা যায়।

পণ্যের বাজার যেহেতু মূলতঃ দু'কমের, যথা, (ক) ভোগ্যপণ্যের বাজার[26] এবং (খ) শিল্পের প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার[27], সেহেতু এই দু'রকম বাজারেই সাধারণত যেসব পণ্য বণ্টন প্রণালী দেখা যায় তা হলঃ

ক. পণ্যের বাজারে বণ্টন প্রণালীঃ এই বাজারে সাধারণভাবে পাঁচ রকমের পণ্য বণ্টন প্রণালী দেখা যায়।

১. উৎপাদনকারী → ভোগকারীঃ এটি হল পণ্য বণ্টনের সরাসরি এবং সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত প্রণালী। এখানে কোনও মধ্যস্থ কারবারী নেই। উৎপাদনকারী নিজে (ক) সেলসম্যান বা ক্যানভাসার রেখে, (খ) ডাক মারফৎ, এবং (গ) নিজের শাখা দোকান খুলে ভোগকারীদের কাছে তার পণ্য বিক্রয় করে।

২. উৎপাদনকারী → খুচরা ব্যবসায়ী → ভোগকারীঃ অনেক উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ছোট ও বড় খুচরা ব্যবসায়ীরা পণ্য কিনে এনে ভোগকারীদের কাছে তা বিক্রয় করে। এই প্রণালীতে শুধু একজন মধ্যস্থ কারবারী থাকে।

৩. উৎপাদনকারী → পাইকারী ব্যবসায়ী → খুচরা ব্যবসায়ী → ভোগকারীঃ এটি ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের চিরাচরিত পথ। সব দেশেই হাজার হাজার ছোট ও বড় উৎপাদনকারী এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী এই পথে নিযুক্ত রয়েছে। এই পথে মধ্যস্থ কারবারীর সংখ্যা একাধিক।

৪. উৎপাদনকারী → উৎপাদনকারীর এজেন্ট → খুচরা ব্যবসায়ী → ভোগকারীঃ এই পথে একাধিক এবং বিভিন্ন প্রকারের মধ্যস্থ কারবারী থাকে। পাইকারী ব্যবসায়ীদের

22. Trade channel.
23. Types of channels of distribution.
24. Direct Selling.
25. Selling through intermediaries.
26. Consumer market.
27. Industrial market.

মারফৎ খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে না গিয়ে উৎপাদনকারীরা সেলিং এজেন্ট, দালাল, বা অনুরূপ প্রতিনিধির মারফৎ খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে খুচরা ব্যবসায়ীরা বড় আকারের ব্যবসায়ী হয়ে থাকে। এদের কাছ থেকে ভোগকারীরা পণ্য কিনে নেয়।

৫. উৎপাদনকারী → এজেন্ট → পাইকারী ব্যবসায়ী → খুচরা ব্যবসায়ী → ভোগকারী ঃ এটি দীর্ঘতর পণ্য-বিক্রয় প্রণালী। উৎপাদনকারীর ঘর থেকে নানা ধরনের এজেন্ট মারফৎ পণ্য পাইকারী ব্যবসায়ী এবং তারপর খুচরা ব্যবসায়ীর হাত ঘুরে অবশেষে এই পথে ভোগকারীর ঘরে পৌঁছায়। মধ্যস্থ কারবারীর সংখ্যা এই পথে বেশি হওয়ায় স্বভাবতঃই ভোগকারীর হাতে পণ্যটি বেশি দামে পৌঁছায়।

নিচে ১৭·১নং রেখাচিত্রে ভোগ্যপণ্যের বাজারের এই সচরাচর পণ্য বণ্টন প্রণালীগুলি সাধারণভাবে দেখান হল।
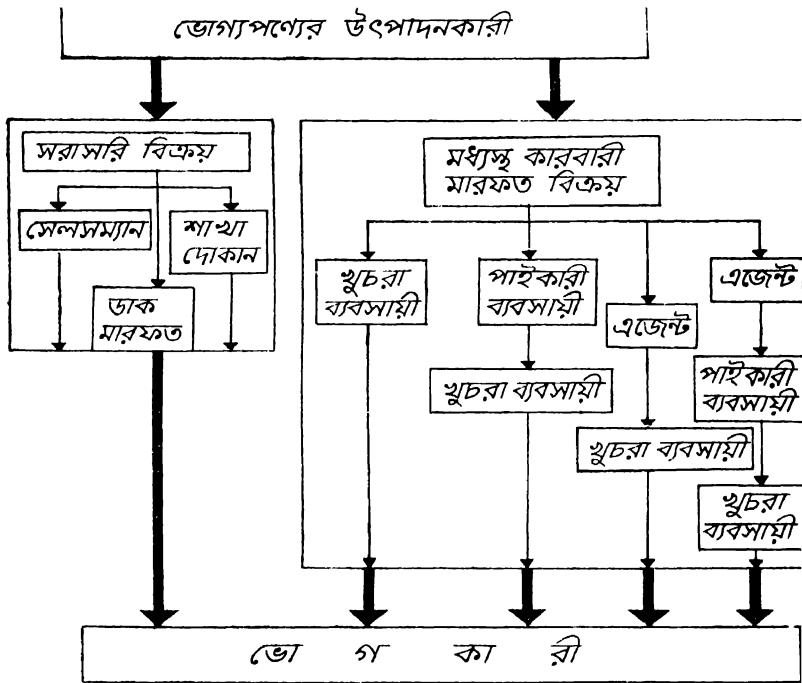
রেখাচিত্র ১৭·১

খ. শিল্প পণ্যের বাজারে পণ্য বণ্টন প্রণালী ঃ কলকারখানার নানারূপ যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে সাধারণভাবে চার রকমের পণ্য বণ্টন প্রণালী লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে একটি হল সরাসরি বিক্রয়, বাকিগুলি মধ্যস্থ কারবারী মারফৎ বিক্রয় ব্যবস্থা।

১. উৎপাদনকারী → ব্যবহারকারী ঃ শিল্প পণ্যের বাজারে ব্যবহারকারীদের কাছে শিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরাসরি বিক্রয় ব্যবস্থায় বেচাকেনার পরিমাণই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। জাহাজ, রেল ইঞ্জিন ও বগী, এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ-জেনারেটর প্রভৃতি

উৎপাদনকারীরা সরাসরিভাবেই ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রয় করে থাকে। এখানে কোন মধ্যস্থ কারবারী থাকে না।

২. উৎপাদনকারী → ডিস্ট্রিবিউটর → ব্যবহারকারী : ছোটখাট সাজসরঞ্জাম ও রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি শিল্পজাত নানা শিল্প-কাঁচামাল উৎপাদনকারীদের দ্বারা ডিস্ট্রিবিউটর নামক পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফৎ ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে দেখা যায়। বাড়ি তৈরির মালমশলা ও যন্ত্রপাতি, এয়ারকন্ডিশনিং যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই পথটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩. উৎপাদনকারী → এজেন্ট → ব্যবহারকারী : যে সব উৎপাদনকারীর নিজস্ব বিক্রয় ব্যবস্থা নেই, কিংবা যারা বাজারে কোনও নূতন দ্রব্য বিক্রয় করতে চায় কিংবা কোনও নূতন বাজারে প্রবেশ করতে চায় তারাই সাধারণত পণ্য বিক্রয়ে এজেন্ট রূপে মধ্যস্থ কারবারীদের সাহায্য নিয়ে থাকে।

৪. উৎপাদনকারী → এজেন্ট → ডিস্ট্রিবিউটর → ব্যবহারকারী : যে সব শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রে যে কোনও কারণেই হোক এজেন্টদের মারফৎ ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না কিংবা ক্রেতাকে তাড়াতাড়ি পণ্যটি যাতে প্রয়োজনমত তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করা যায় সেজন্য বিক্রয় পথের মাঝখানে কোথাও তা যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রাখা দরকার হয়, আবার পণ্যটি সরাসরি ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে বিক্রয় করার উপযোগীও নয়, সে সব ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীদের পক্ষে এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটরদের সাহায্য ছাড়া ব্যবহারকারীদের কাছে পণ্যটি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, শিল্পের প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে খুচরা ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

নিচে ১৭·২নং রেখাচিত্রে শিল্পপণ্যের বণ্টন প্রণালীগুলি দেখান হল।
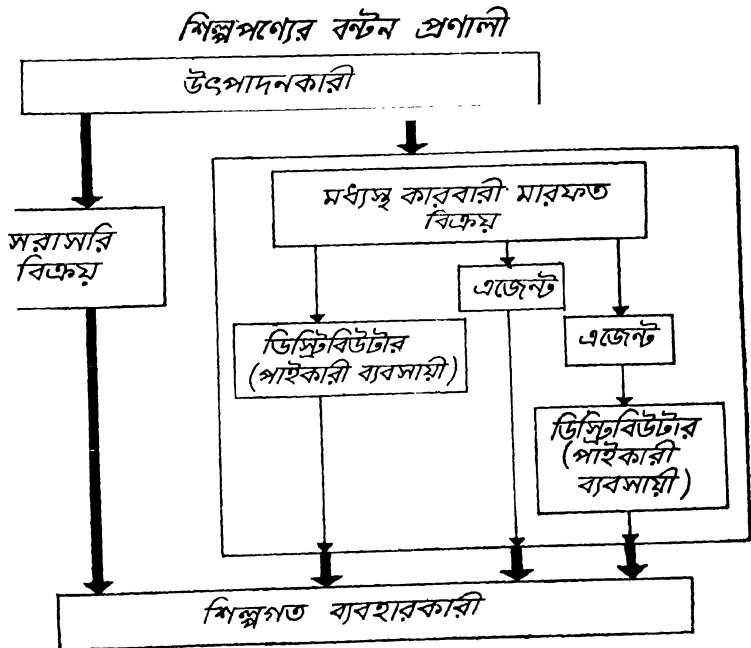
রেখাচিত্র ১৭·২

ঔষধ বিক্রয় প্রণালীর একটি নমুনা ঃ ভোগ্যপণ্য ও যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বণ্টনের সাধারণ প্রণালীর আলোচনার পর এবার একটি সুনির্দিষ্ট দ্রব্যের বণ্টন প্রণালীর দৃষ্টান্ত হিসাবে ঔষধ বিক্রয় প্রণালী নিচের রেখাচিত্র নং ১৭·৩-এর সাহায্যে দেখান হল ঃ
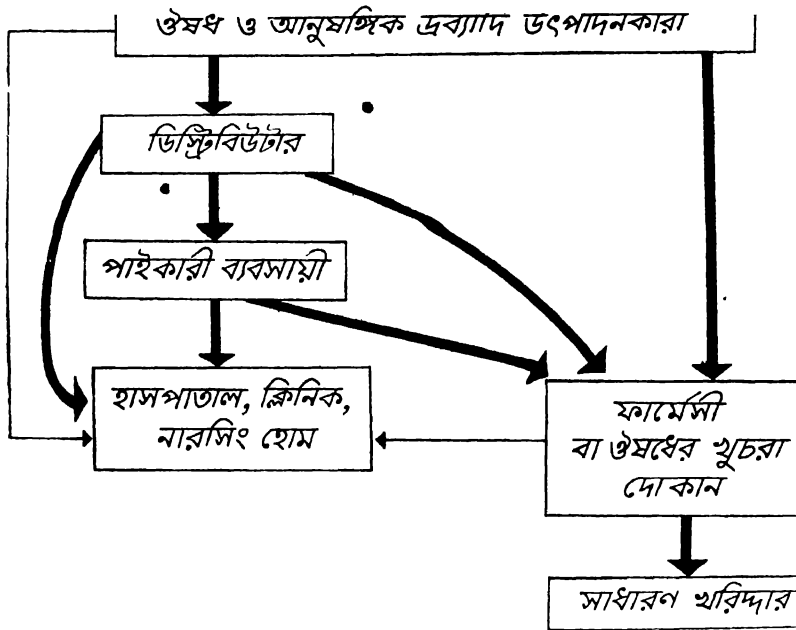
রেখাচিত্র ১৭·৩

ঔষধ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি উৎপাদনকারীর কাছ থেকে হাসপাতালগুলি, ক্লিনিক ও নার্সিং হোমগুলি সরাসরি এবং/অথবা ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে কিংবা পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফৎ পেয়ে থাকে। তারা আবার দরকার হলে খানিকটা পরিমাণে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও কিনে থাকে। খুচরা ব্যবসায়ীরা, ঔষধ উৎপাদনকারী, ডিস্ট্রিবিউটর এবং পাইকারী ব্যবসায়ী, এই তিন সূত্র থেকেই সরবরাহ সংগ্রহ করতে পারে। সাধারণ ব্যবহারকারী খরিদ্দারেরা খুচরা দোকানদার বা ডিসপেনসারী থেকেই ঔষধ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্য কিনে থাকে।

রাষ্ট্রায়ত্ত পণ্যবণ্টন প্রণালী

PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

ভারতে ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকদের মধ্যেও, মজুতদারী, কালোবাজারী এবং সে কারণে খাদ্যসামগ্রী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির দ্বারা মূল্য-বৃদ্ধির অপচেষ্টা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। এর হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রবল দাবি উঠেছে। ফলে ১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রথমে গম ও পরে চালের পাইকারী ব্যবসায় সরকার অধিগ্রহণ করবে। কিন্তু পাইকারী ব্যবসায়ীদের চাপে এক বৎসর পরে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। এখন পণ্যবণ্টনে আংশিক সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে সরকারী ফুড

করপোরেশন প্রধানত লেভি মারফৎ উৎপাদকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় রেশন দোকান মারফৎ ও অন্যত্র ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ জনসাধারণের কাছে চাল, গম, ময়দা, চিনি বিক্রি করে। তাছাড়া বড় বড় কয়েকটি শহরে সমবায় ভিত্তিতে গঠিত সুপার বাজার ও সমবায় দোকান মারফৎ নানান নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করা হয়।

পণ্য বণ্টন প্রণালী মনোনয়ন
CHOICE OF THE CHANNEL OF DISTRIBUTION

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উপযোগী পণ্য বণ্টন প্রণালীটি বেছে নেওয়ার কাজটা পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে তার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম। এ বিষয়ে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হলে প্রতিষ্ঠানকে প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বিষয়গুলি বিবেচনা না করলে চলে না। তবে মনে রাখা দরকার যে, বর্তমানে প্রচলিত পণ্যের উপযুক্ত বণ্টন প্রণালীটি নূতন কোনও পণ্যের উপযোগী বণ্টন প্রণালীর মত হবে না।

বর্তমানে প্রচলিত পণ্যের বণ্টন প্রণালী মনোনয়ন[28] করতে গেলে সাতটি বিষয় বিবেচনা করতে হয় তা হল :

১. পণ্যের প্রকৃতি[29] : পণ্যের প্রকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিক্রয় প্রণালী নির্বাচনে প্রথম বিবেচনার বিষয়।

(ক) যদি পণ্যটি পচনশীল অথবা ব্যবহারের ফ্যাশনটা অতি পরিবর্তনশীল হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিক্রয় করতে হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে পাইকারী ব্যবসায়ীর মারফৎ না গিয়ে হয় সরাসরি নয়তো কেবল খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফৎ ভোগকারীদের কাছে পণ্যটি পৌঁছে দিতে হয়। পাউরুটি বিক্রয় ব্যবস্থা এর একটি দৃষ্টান্ত।

(খ) পণ্যটি যদি **মরসুমী** ধরনের[30] হয় তাহলে পাইকারী ব্যবসায়ীদের সাহায্য গ্রহণের বিশেষ দরকার নাও হতে পারে।

(গ) পণ্যটির **একক পিছু দাম**[31] যত অল্প এবং তার বেচাকেনার পরিমাণ যত বেশি হবে, সাধারণত তার বণ্টন প্রণালীও তত বেশি দীর্ঘ হবে এবং তাতে নিযুক্ত মধ্যস্থ কারবারীর সংখ্যাও তত বেশি হবে। হোসিয়ারী ও প্রসাধনী দ্রব্য এর দৃষ্টান্ত।

(ঘ) পণ্যটি **আয়তনে যত বড় ও ওজনে যত বেশি**[32] হবে, তত তার পরিবহণ খরচ ও চলাচলের অসুবিধা বেশি হয়। সুতরাং এই জাতীয় পণ্যের বণ্টন পথটি যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। এই কারণে এ জাতীয় পণ্য সাধারণত উৎপাদনকারীরা সরাসরি ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রয় করে থাকে। বড় বড় যন্ত্র ও যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম এর দৃষ্টান্ত।

(ঙ) পণ্যটির যদি **মেরামতী**[33] প্রয়োজন হয়, তাহলে পাইকারী ব্যবসায়ীদের সাহায্য বিশেষ কাজে লাগে না। খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফৎ ব্যবহারকারীদের কাছে তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে উৎপাদনকারীকে পণ্যের মেরামতীর বা 'সারভিসিং'-এর বন্দোবস্ত নিজেকেই করতে হয় এবং এজন্য আলাদা কর্মী ও বিভাগ রাখতে হয়। মোটরগাড়ি, এয়ারকণ্ডিশনিং যন্ত্র, নানারকম বড় বড় যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।

(চ) **নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্য**[34] সাধারণত ডিস্ট্রিবিউটর নামক পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফৎ বিক্রয় হয়ে থাকে। মেশিনটুল এর দৃষ্টান্ত। আর দ্রব্যটি যদি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী তৈরী না হয় তাহলে হয় সরাসরি নয়তো বড়জোর খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফৎ বিক্রয় হয়ে থাকে।

28. Choice of suitable channel of distribution for an existing product.
29. Nature of the Product. 30. Seasonal. 31. Unit value.
32. Bulk and Weight. 33. Servicing. 34. Standardised goods.

২. বাজারের প্রকৃতি[35] **:** বাজারের প্রকৃতি যেভাবে পণ্যবিক্রয় প্রণালী নির্ধারণকে প্রভাবিত করে তা হল :

(ক) পণ্যটি **কোন্ বাজারে বিক্রয় করা হবে** তার উপর প্রণালী নির্বাচন নির্ভর করবে। যদি ভোগ্যপণ্যের বাজারের জন্য হয় তাহলে তা সরাসরি কিংবা খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফৎ অথবা পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফৎ বিক্রয় করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু পণ্যটি যদি শিল্পের প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারের জন্য হয় তবে তা কখনই খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফৎ বিক্রয় করার প্রয়োজন হবে না। হয় সরাসরি, নয়তো কোন না কোন ধরনের এজেন্ট কিংবা ডিস্ট্রিবিউটর জাতীয় পাইকারী ব্যবসায়ী মারফৎ ব্যবহারকারীদের কাছে তা পেঁ'ছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) **সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা** যদি কম হয়, এবং পণ্যটি যদি দামী হয়, যেমন যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অনেক শিল্প পণ্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো উৎপাদনকারীর নিজের সেলসম্যান দ্বারাই তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু পণ্যটির সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে মধ্যস্থ কারবারীদের সাহায্য নেবার দরকার হবে।

(গ) **অধিকাংশ ক্রেতা যদি কতকগুলি অঞ্চলে বা এলাকায় কেন্দ্রীভূত থাকে** তাহলে উৎপাদনকারীর পক্ষে সরাসরি নিজের সেলসম্যানদের সাহায্যেই ক্রেতাদের কাছে তা বিক্রয় করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ক্রেতারা যদি সংখ্যায় বেশি এবং বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকে তাহলে নানারূপ মধ্যস্থ কারবারীর সাহায্য নিতে হবে।

(ঘ) **অরডার বা ফরমাশের পরিমাণ** যদি বেশি হয় তাহলে মধ্যস্থ কারবারীর মারফৎ বিক্রয় করা দরকার হয়। যেমন, নানা ধরনের খাদ্য সম্ভার, মশলাপাতি বিক্রয়ের জন্য পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাহায্য নিতে হয়। লেনদেনের মোট পরিমাণ বেশি হয় বলে এই পদ্ধতিতে ব্যয়সংকোচ হয়।

(ঙ) ভোগকারী ও ব্যবহারকারীদের কেনাকাটার অভ্যাসটি কিরকম, এজন্য তারা কতটা চেষ্টা করতে প্রস্তুত, তারা ধারে কিনতে চায় কিনা এবং সেলসম্যানের কাছ থেকে কেনাটা পছন্দ করে কিনা ইত্যাদিও বিক্রয় প্রণালী বেছে নেওয়ার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে।

৩. ব্যবসায়ের কাঠামো[36] **:** প্রায়ই দেখা যায়, নানা ধরনের মধ্যস্থ কারবারীরা এক একটি পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থায় আধিপত্য করে এবং বাজারটি নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং পণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় প্রণালী বেছে নিতে গিয়ে এদিকটাও বিবেচনা করতে হয়। এবিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিবেচ্য বিষয়গুলি হল—(ক) **মধ্যস্থ কারবারীরা কি ধরনের কাজ**[37] **করে**—যদি বাজারে পণ্যটি মজুদ করে রাখার দরকার হয় এবং পাইকারী ব্যবসায়ীরা তা করে তা হলে তাদের সাহায্য না নিলে উৎপাদনকারীর চলে না। খুচরা দোকানদারদের কাছ থেকে কেনাকাটা করাই যদি ভোগকারীদের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক হয়, তাহলে তাদের মারফৎ পণ্য বিক্রয় করাই উৎপাদনকারীর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর্থিক দিক দিয়ে যদি উৎপাদনকারী মধ্যস্থ কারবারীদের তুলনায় দুর্বল হয় তাহলে তাদের মারফৎ বিক্রয় করা ছাড়া উপায় থাকে না।

(খ) **প্রয়োজনীয় ধরনের মধ্যস্থ কারবারী পাওয়া যায় কি না**[38]—উৎপাদনকারীর পক্ষে ঠিক যে ধরনের মধ্যস্থ কারবারী দরকার তা পাওয়া যায় কি না তার উপর বিক্রয় প্রণালী নির্বাচন নির্ভর করবে। যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে উৎপাদনকারীকে অগত্যা নিজস্ব বিক্রয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়।

35. Nature of the Market.
36. The structure of trade.
37. Service rendered.
38. Desired middlemen.

(গ) উৎপাদকের বিক্রয় নীতি সম্পর্কে মধ্যস্থ কারবারীদের মনোভাব[39]—অনেক সময় উৎপাদনকারীর বিক্রয় নীতি মধ্যস্থ কারবারীদের পছন্দ হয় না। অনেক মধ্যস্থ কারবারী সোল এজেন্সী কিংবা সোল ডিস্ট্রিবিউটরশিপ না পেলে কাজ করতে রাজী হয় না। পণ্যের দাম কমানো হবে না বা কমবে না, এই গ্যারান্টি না পেলে কিংবা বেশি দিনের জন্য ধারে মাল না পেলে, মধ্যস্থ কারবারীরা পণ্য বিক্রয়ে রাজী হয় না। এসব ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীকে নিজস্ব বিক্রয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হয়।

(ঘ) বিক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে সম্ভাবনা[40]—অন্যান্য সুবিধা কমবেশি একরকম হলে, যে প্রণালীতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে বিক্রয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা, উৎপাদনকারীকে সেটি বেছে নিতে হবে।

(ঙ) বিক্রয় খরচ[41]—বিক্রয় প্রণালী মনোনয়নে খরচটাও অবশ্য বিবেচ্য। যে বিক্রয় প্রণালীতে খরচ অপেক্ষাকৃত কম পড়বে সেটিই বাঞ্ছনীয় হবে।

(চ) চিরাচরিত প্রণালীর আধিপত্য[42]—যে পণ্যের বাজারে চিরাচরিত বিক্রয় প্রণালীর আধিপত্য রয়েছে, সেখানে অনেক সময় তা মেনে নেওয়া ছাড়া উৎপাদনকারীর অন্য উপায় থাকে না।

৪. উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও আয়তন[43] ঃ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর প্রকৃতি ও আয়তন বিক্রয় প্রণালী মনোনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সাধারণত কোম্পানী যদি বড় হয় তাহলে সরাসরি বা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত বিক্রয় প্রণালীই বেশি সুবিধাজনক হয়ে থাকে। ছোট কোম্পানী হলে প্রচলিত বিক্রয় প্রণালী মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

(ক) খ্যাতি[44]—খ্যাতিমান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিজের পছন্দমত বিক্রয় প্রণালী ও মধ্যস্থ কারবারী স্থির করার সুবিধা বেশি থাকে।

(খ) আর্থিক সম্বল[45]—আর্থিক সম্বল বেশি থাকলে, নিজের সরাসরি বিক্রয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নিজের পছন্দমত শর্ত অনুযায়ী মধ্যস্থ কারবারী স্থির করা, প্রয়োজন হলে মধ্যস্থ কারবারীদের বেশি করে ঋণ দেওয়া প্রভৃতি সম্ভব হয়।

(গ) ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা[46] না থাকলে উৎপাদনকারীরা পণ্য বিক্রয়ের ভার মধ্যস্থ কারবারীদের উপর দিতে বাধ্য হয়।

(ঘ) বিক্রয় প্রণালী নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা[47] থাকলে সহায়সম্বল বিশিষ্ট উৎপাদনকারীরা অনেক সময় খরচ বেশি পড়লেও সরাসরি বিক্রয় ব্যবস্থা গড়ে তোলাই পছন্দ করে। তাতে বাজারের সাথে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ সৃষ্টি হয়, বাজারটি তারা অনুধাবন করতে পারে এবং ভোগ বা ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়। ফলে ভবিষ্যতে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধিতে বেশি সুবিধা হয়।

৫. প্রতিযোগিতা ঃ বাজারে প্রতিযোগিতার প্রকৃতি ও পরিমাণ বিক্রয় প্রণালী মনোনয়নে প্রভাব বিস্তার করে। প্রায় একই জাতীয় পণ্যের একাধিক বিক্রেতা থাকলে তাদের সকলকে প্রায় একই ধরনের বিক্রয় প্রণালী গ্রহণ করতে দেখা যায়।

৬. সরকারী বিধি নিষেধ[48] ঃ যে সব পণ্য বিক্রয়ের উপর নানা সরকারী বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে সব উৎপাদককেই প্রায় একই এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রণালীতে পণ্য বিক্রয় করতে হয়। মদ, আফিম, চরস, গাঁজা ইত্যাদি জাতীয় পণ্য এর দৃষ্টান্ত।

39. Attitude of the middlemen to the sales policies of the manufacturer. 40. Sales volume possibilities.
41. Sales cost. 42. Domination of customary channels.
43. Nature and size of the Producer. 44. Reputation.
45. Financial resources. 46. Experience and ability of management.
47. Desire for control of the channel. 48. Legal Constraints.

৭. ক. মুনাফার বিবেচনা[49] **:** উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে যে সব বিক্রয় প্রণালী কমবেশি উপযোগী বলে দেখা যাবে তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে উপযোগী বিক্রয় প্রণালীটি চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন করতে হলে, ওই প্রণালীগুলির প্রত্যেকটিতে আনুমানিক চাহিদা ও বিক্রয়, আয় এবং খরচের পরিমাণ হিসাব করে কোন্‌টি থেকে কতটা আনুমানিক মুনাফা হতে পারে তার হিসাব করে দেখতে হয়। যে প্রণালী যত বেশি সরাসরি হবে তাতে বিক্রয় খরচ তত বেশি পড়ে কিন্তু পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার উপর উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণ বাড়ে ও সেকারণে বিক্রয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা তত বাড়ে। আর যে প্রণালী যত বেশি পরোক্ষ হবে তাতে বিক্রয় খরচ তত কম পড়ে। কিন্তু বিক্রয় ব্যবস্থার উপর উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণ তত কমে ও সেকারণে বিক্রয়ের পরিমাণও তত সীমাবদ্ধ হয়। এই সমস্ত দিক বিবেচনার পর উপযুক্ত বিক্রয় প্রণালীটি স্থির করতে হয়।

খ. নূতন পণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় প্রণালী মনোনয়ন[50] **:** পণ্যটি যদি এমন হয় যে আগে আর কখনও এজাতীয় পণ্য উৎপাদিত ও বাজারে বিক্রয় হয়নি, তাহলে এরকম পণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় ব্যবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যে-সব উপায় গ্রহণ করা উচিত তা হল:

১. সর্বপ্রথমে, এরকম একটি পণ্য যে পাওয়া যাচ্ছে এবং তার দ্বারা কি কি প্রয়োজন মিটবে তা সম্ভাব্য ভোগ বা ব্যবহারকারীদের জানানোর জন্য ভালভাবে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের সাহায্য নিতে হবে। অবশ্য পণ্যটি যদি গুরুত্বপূর্ণ ধরনের হয় তাহলেই এটা বেশি দরকার। তা না হলে, তৎক্ষণাৎ বিক্রয়ের জন্য পাইকারী ব্যবসায়ী ও সাধারণ ডিস্ট্রিবিউটরদের সাহায্য নিলেই চলতে পারে।

২. এর পর একটি জোরালো বিক্রয় পদ্ধতির[51] সাহায্য নিতে হবে। বিশেষ বিশেষ পণ্যের জন্য যে-সব বিশেষ বিশেষ দোকান[52] থাকে তাদের সাহায্য নিলে বিক্রয় পদ্ধতিটা জোরালো হয়, কিন্তু তাতে আবার খরচ বেশি পড়ে। তা বহন করা সম্ভব কিনা, সেটা বিবেচনা করতে হবে। পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফৎ বিক্রয় করা হলে খরচ কিছুটা হয়তো কম পড়তে পারে, কিন্তু তাদের মারফৎ গেলে হয়তো পণ্যটির বিক্রয় পদ্ধতিটা ততটা জোরালো হবে না। তবে আবার পাইকারী ব্যবসায়ীদের সাথে যদি অসংখ্য খুচরা ব্যবসায়ীদের সংযোগ থাকে তবে হয়তো বিক্রির খানিকটা সুবিধা হতেও পারে। অনেক ক্ষেত্রে, সরাসরি বিক্রয়ের ব্যবস্থাটাই খুব জোরালো হয়, কিন্তু তাতে খরচ বেশি পড়ে এবং অনেক সেলসম্যান নিয়োগ করতে হয়। আর পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফৎ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেও যদি সেলসম্যান নিয়োগ করে অনবরত তাদের দৃষ্টি পণ্যটির প্রতি আকর্ষণ করা হতে থাকে তাহলে আরো ফল পাওয়া যেতে পারে। তবে এতে খরচ আরো বেশি পড়ে।

৩. ধীরে ধীরে পণ্যটি বাজারে প্রচলিত হয়ে গেলে তখন উৎপাদনকারী অপেক্ষাকৃত কম খরচের এবং প্রচলিত বিক্রয় প্রণালী অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু তখন দেখতে হবে, যে-সব মধ্যস্থ কারবারীর সাহায্যে পণ্যটি বাজারে চালু করা সম্ভব হয়েছে তারা যেন অসন্তুষ্ট না হয়। কারণ ভবিষ্যতে আবার একটি নূতন পণ্যের জন্য হয়তো তাদের সাহায্য দরকার হতে পারে।

পাইকারী ব্যবসায়ী
WHOLESALER

সংজ্ঞা : যে ব্যবসায়ীরা একদিকে প্রাথমিক দ্রব্য (কৃষিজ, খনিজ, বনজ) উৎপাদনকারী[53], দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকারী[54] অথবা আমদানিকারী এবং অন্যদিকে খুচরা ব্যবসায়ী অথবা

49. Profit Criterion. 50. Choice of sales channel for new products.
51. Aggressive sales method. 52. Specially shop.
53. Primary Producers. 54. Manufacturers.

শিল্পগত ব্যবহারকারীদের[55] মাঝখানে মধ্যস্থ কারবারীরূপে কাজ করে তাদের পাইকারী ব্যবসায়ী এবং তাদের কাজকে পাইকারী ব্যবসায় বলে গণ্য করা হয়। তারা সাধারণত খুচরা ব্যবসায়ী ও শিল্পগত ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য বেশি পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী কিনে থাকে। জনে জনে সাধারণ ভোগকারীদের কাছে সরাসরি-ভাবে সামান্য সামান্য পরিমাণে বিক্রয় তারা করে না। সুতরাং এ থেকে বলা যায় যে, পাইকারী ব্যবসায় হল উৎপাদনকারীর কাছ থেকে খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে পণ্য পেঁছে দেবার সংযোগ-পথ। তবে এ থেকে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, পাইকারী ব্যবসায়ীদের বুঝি দ্রব্য উৎপাদনের সাথে বা খুচরা বিক্রয়ের সাথে কোনও সম্পর্ক থাকে না। কারণ বাস্তবে এমন অনেক পাইকারী ব্যবসায়ীর সন্ধান পাওয়া যায়, যারা পাইকারী ব্যবসায়ের সাথে একদিকে পণ্য-উৎপাদন এবং অন্যদিকে খুচরা ব্যবসায়-ও চালায়।

পাইকারী ব্যবসায়ীর প্রকার ভেদ[56] : তিন প্রকারের পাইকারী ব্যবসায়ী দেখা যায়—উৎপাদক-পাইকারী ব্যবসায়ী[57], খুচরা-পাইকারী ব্যবসায়ী[58] এবং বণিক বা যথার্থ-পাইকারী ব্যবসায়ী[59]।

১. **উৎপাদক-পাইকারী ব্যবসায়ী**—খরচ কমানো ও মুনাফা বাড়ানোর জন্য পাইকারী ব্যবসায়ী যখন পাইকারী ব্যবসায়ের সাথে, সে যে জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা করে তা উৎপাদনের কাজও শুরু করে, কিংবা কোনও দ্রব্যের উৎপাদনকারী যখন সেই সাথে সেই দ্রব্যটির পাইকারী ব্যবসায়ও আরম্ভ করে এবং সেই সাথে অন্যান্য দ্রব্যও উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে কিনে এনে তারা পাইকারী বেচাকেনা শুরু করে তাকে উৎপাদক-পাইকারী ব্যবসায়ী বলা হয়। এরা যথার্থ পাইকারী ব্যবসায়ী নয়।

২. **খুচরা-পাইকারী ব্যবসায়ী**—যে পাইকারী ব্যবসায়ীরা পাইকারীভাবে মাল কিনে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় না করে তা নিজ দোকান মারফৎ সাধারণ ভোগকারীদের কাছে খুচরা বিক্রয় করে তাদের খুচরা-পাইকারী ব্যবসায়ী বলে। এরাও যথার্থ পাইকারী ব্যবসায়ী নয়। এরা পাইকারী ব্যবসায়ের সাথে খুচরা ব্যবসায় চালায়।

৩. **বণিক বা যথার্থ পাইকারী ব্যবসায়ী**—যারা দ্রব্য উৎপাদনের সাথে জড়িত নয়, খুচরা বিক্রয় করে না, একমাত্র পাইকারীভাবে দ্রব্যসামগ্রী কিনে তা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে তারাই হল বণিক পাইকারী ব্যবসায়ী বা যথার্থ পাইকারী ব্যবসায়ী। যথার্থ বা বণিক পাইকারী ব্যবসায়ী দু'রকমের,—(ক) সীমাবদ্ধ পাইকারী ব্যবসায়ী[60] এবং (খ) সারভিস হোলসেলার[61]।

৩. (ক). **সীমাবদ্ধ পাইকারী ব্যবসায়ী**—এরা সীমাবদ্ধ পরিমাণে দ্রব্য মজুদ রাখে এবং বেশি দিনের জন্য বেশি ধারে মাল বিক্রি করে না। পাইকারী ব্যবসায়ীদের সব কাজ এরা সম্পাদন করে না।

৩. (খ). **সারভিস হোলসেলার**—এরা নিজেদের ব্যবসায়ের লাইনের সব রকম মাল মজুদ রাখে, নিজেদের সেলসম্যান রাখে, ধারে বিক্রি করে, ও অন্যান্য নানা কাজ সম্পাদন করে। পাইকারী ব্যবসায়ের যাবতীয় কাজ এরা করে থাকে। ছয় রকমের "সারভিস হোলসেলার" দেখা যায়।

৩. (খ-১). ***পাঁচমিশেলী পণ্যের পাইকারী ব্যবসায়ী***[62]—পরস্পর সংশ্লিষ্ট নয় এমন পাঁচমিশেলী ধরনের দ্রব্যসামগ্রী এরা মজুদ রাখে ও খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে তা বিক্রয় করে। এইভাবে এরা ঝুঁকি কমায় ও মুনাফা বাড়ায়।

---

55. Industrial consumers or users.
56. Types of wholesalers.
57. Manufacturer-wholesaler.
58. Retailer wholesaler.
59. Merchant or Proper wholesaler.
60. Limited-function wholesaler.
61. Service-wholesaler.
62. General-merchandise wholesaler.

৩. (খ-২). **এক ধরনের পণ্যের পাইকারী ব্যবসায়ী**[63]—এরা একটি মাত্র লাইনে বা এক ধরনের বা বড়জোড় সেই সাথে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের পাইকারী ব্যবসায় করে।

৩. (খ-৩). **সীমাবদ্ধ পণ্যের বিশিষ্ট পাইকারী ব্যবসায়ী**[64]—এরা হল অল্প কয়েকটি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একটি মাত্র দ্রব্যের পাইকারী ব্যবসায়ী। পাইকারী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এরা হল বিশেষায়ণের দৃষ্টান্ত।

৩. (খ-৪). **জাতীয় পাইকারী ব্যবসায়ী**[65]—এদের পাইকারী ব্যবসায় গোটা দেশে বিস্তৃত থাকে। সারা দেশে এরা পণ্যের সরবরাহ-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে।

৩. (খ-৫). **আঞ্চলিক পাইকারী ব্যবসায়ী**[66]—এদের পাইকারী ব্যবসায় দেশের এক একটি অঞ্চলব্যাপী হয়ে থাকে।

৩. (খ-৬). **স্থানীয় পাইকারী ব্যবসায়ী**[67]—এদের পাইকারী ব্যবসায় একটি শহর, নগর বা জেলাতে সীমাবদ্ধ থাকে। এদের ব্যবসায় পরিচালনার খরচ কম, বেচাকেনার পরিমাণও কম।

পাইকারী ব্যবসায়ের কাজ[68]**ঃ** পাইকারী ব্যবসায় বা ব্যবসায়ীদের দ্বারা পণ্য বণ্টন প্রণালীতে উৎপাদনকারী, খুচরা ব্যবসায়ী ও ভোগ ও ব্যবহারকারীদের পক্ষে যে সব প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পাদিত হয়ে থাকে তা হলঃ ১. **সংগ্রহ**[69]-- প্রাথমিক উৎপাদক, বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনকারী এবং আমদানিকারী প্রভৃতি নানা সূত্র থেকে পাইকারী ব্যবসায়ীরা নানা রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে তা যোগান দিয়ে থাকে।

২. **মজুদ**[70]—সংগ্রহের পর খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বা শিল্পের ব্যবহারকারীদের কাছে তা বিক্রির অপেক্ষায় পাইকারী ব্যবসায়ীরা দ্রব্যসামগ্রীর বিরাট পরিমাণ মজুদ নিজেদের গুদামে রাখার ব্যবস্থা করে।

৩. **গ্রেডিং ও মোড়কবাঁধাই**[71]—গুদামে অবস্থিত দ্রব্যসামগ্রীগুলির গুণাগুণ অনুসারে তা বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করে সে-সবের উপযুক্ত ও সুবিধাজনক মোড়কবাঁধাইয়ের কাজও তারাই করে থাকে।

৪. **প্রেরণ**[72]—বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের প্রয়োজন-মাফিক দ্রব্যসামগ্রী পাঠানোর কাজটাও পাইকারী ব্যবসায়ীরাই করে থাকে।

৫. **পরিবহণ**[73]—প্রাথমিক উৎপাদনকারী, শিল্প উৎপাদক অথবা আমদানিকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত দ্রব্যগুলি আনা এবং নিজেদের গুদাম থেকে তা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে ফরমাশমত পাঠানোর জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা পাইকারী ব্যবসায়ীদেরই করতে হয়। এজন্য তারা নিজেদের মোটর ভ্যান, লরী ইত্যাদিও রাখে।

৬. **অর্থ সংস্থান**[74]—সাধারণ খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে ধারে মাল বিক্রি করে পাইকারী ব্যবসায়ীরা যেমন খুচরা ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে, তেমনি দেশে দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনের ধারাটিকেও অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে থাকে। অনেক সময়, ছোট ছোট উৎপাদনকারীরা যাতে তাদের পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারে এবং তার ফলে তারা পাইকারী ব্যবসায়ীকে তাদের দ্রব্য সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে সে উদ্দেশ্যে পাইকারী ব্যবসায়ীরা উৎপাদনকারীদেরও ঋণ বা দাদন দিয়ে থাকে।

৭. **মূল্য নির্ধারণ**[75]—পাইকারী ব্যবসায়ীরা যে দরে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে দ্রব্য-

---

63. General-line wholesaler. 64. Specialty wholesaler.
65. National wholesaler. 66. Sectional or Regional wholesaler.
67. Local wholesaler.
68. Functions of wholesaler or wholesale trade. 69. Assembling.
70. Storing or warehousing. 71. Grading and Packaging.
72. Dispersing. 73. Transporting. 74. Financing. 75. Pricing.

সামগ্রী বিক্রি করে, খুচরা ব্যবসায়ীরা সে দরের ভিত্তিতেই আবার সাধারণ ভোগ ও ব্যবহারকারীদের কাছে তা বিক্রি করে থাকে।

৮. **ঝুঁকিবহন**[৭৬]—দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করার পর তা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত, চাহিদার পরিবর্তন এবং পণ্যটি আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনিষ্ট হওয়ার দরুন লোকসানের ঝুঁকি কিংবা ধারে বিক্রির পাওনা টাকা অনাদায়ের ঝুঁকি পাইকারী ব্যবসায়ীরাই বহন করে।

পাইকারী ব্যবসায়ের সংগঠন[৭৭]**ঃ** পাইকারী ব্যবসায়ের সংগঠন প্রধানত দু'টি অংশে বিভক্ত—(১) প্রশাসনিক[৭৮], এবং (২) কার্যনির্বাহী[৭৯]।

১. **প্রশাসনিক অংশের কাজ হল** টাকা পয়সা লেনদেন, হিসাব রাখা, পত্রালাপ, নথিপত্র তৈরি করা ও রাখা এবং সাধারণ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ চালানো। এজন্য একটি সাধারণ অফিস এবং তার ক্যাশ বা ফিন্যান্স, এ্যাকাউন্টস, করেসপনডেন্স, এবং জেনারেল অফিস ইত্যাদি বিভাগগুলি থাকে।

২. **কার্যনির্বাহী অংশের কাজগুলি** ক্রয় বিভাগ, গুদাম বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, প্রচার বিভাগ ও ডেসপ্যাচ বিভাগে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্রয় ও বিক্রয় একসাথে বিক্রয় বিভাগের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে।

পাইকারী ব্যবসায়ে **যথেষ্ট পুঁজির প্রয়োজন হয়**। কারণ, বিরাট পরিমাণে নানা দ্রব্য মজুদ রাখা, উৎপাদনকারীদের (বিশেষত, ছোট ছোট উৎপাদনকারী হলে) দাদন দেওয়া এবং খরিদ্দার অর্থাৎ খুচরা ব্যবসায়ীদের ধারে বিক্রয় করা এই তিন রকমের প্রয়োজন মেটাতে হয়। তবে দ্রব্য অনুযায়ী পাইকারী ব্যবসায়গুলিতে প্রয়োজনীয় পুঁজির হেরফের হয়ে থাকে।

পাইকারী ব্যবসায়ের জন্য **স্থান মনোনয়নের প্রশ্নটি** খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে তা অবশ্যই এমন হওয়া চাই যেন, সেখানে খুচরা ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের ও দ্রব্যসামগ্রী আনতে ও অন্যত্র পাঠাতে অসুবিধা না থাকে। সাধারণত শহর বন্দরের ব্যবসা কেন্দ্রগুলিই পাইকারী ব্যবসায়ের উপযুক্ত স্থান হিসাবে গণ্য করা হয়।

পাইকারী ব্যবসায়ের সেবাকার্য[৮০] ঃ পাইকারী ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ করে দেয় এবং তার মধ্য দিয়ে উৎপাদনকারী, খুচরা ব্যবসায়ী এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ ও ভোগকারীদের সেবা করে থাকে।

১. **পাইকারী ব্যবসায়ী যেসব কাজের দ্বারা উৎপাদনকারীর সেবা করে তা হল ঃ** (১) উৎপাদনকারীর বিক্রয় প্রতিনিধি[৮১] রূপে সে পণ্য বাজারে বিক্রয় করে দেওয়ার ভার নেয়। ফলে পণ্য বিক্রয়ের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে উৎপাদনকারী পণ্য উৎপাদনের সমস্যাগুলি সমাধানের উপর তার মনোযোগ দিতে পারে। (২) অনেক সময় উৎপাদিত দ্রব্যগুলি মজুদ করে রাখার জন্য উৎপাদনকারীকে গুদামের ব্যবস্থা করতেও হয় না। উৎপাদনের সাথে সাথেই পাইকারী ব্যবসায়ীর ঘরে তা পাঠিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়। পাইকারী ব্যবসায়ী নিজের ঘরে পণ্যগুলি মজুদ রাখার ব্যবস্থা করে। (৩) হয় নিজেই আগে থেকে উৎপাদনকারীকে বেশি পরিমাণে ফরমাশ[৮২] দিয়ে কিংবা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের অল্প পরিমাণে ফরমাশগুলি জড়ো করে উৎপাদনকারীর কাছে তা পাঠিয়ে দিয়ে পাইকারী ব্যবসায়ী উৎপাদনকারীকে বহু ছোট ছোট খুচরা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অল্প অল্প পরিমাণে ফরমাশ সংগ্রহ করার অসুবিধা থেকে বাঁচিয়ে দেয়। (৪) আগে থাকতেই পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাওয়া ফরমাশগুলির মারফৎ

76. Risk-bearing. 77. Organisation of wholesale trade.
78. Administrative. 79. Executive.
80. Services rendered by wholesalers. 81. Selling Agent.
82. Bulk orders.

বাজারে চাহিদার প্রকৃতিতে ও ধরনে কি রকম পরিবর্তন ঘটছে তা উৎপাদনকারী আগেই জানতে পারে এবং সে অনুসারে পণ্যের গুণাগুণের, ডিজাইনের, পরিমাণের ও অন্যান্য পরিবর্তন করে নিয়ে সেভাবে ব্যয় সংকোচের সাথে নিশ্চিন্ত ভাবে পণ্যটি উৎপাদন করতে পারে। এজন্য তাকে নিজে সরাসরি বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজটি করতে হয় না। (৫) সরাসরি নগদে তৈরী পণ্য কিনে নিয়ে কিংবা সেজন্য আগাম ঋণ দিয়ে (দাদন) এবং দরকার মতো খুচরা ব্যবসায়ীকে ধারে পণ্য বিক্রয় করে পাইকারী ব্যবসায়ী উৎপাদনকারীকে অপেক্ষাকৃত কম পুঁজিতে কারবার চালাতে সাহায্য করে। (৬) পাইকারী ব্যবসায়ীরা বাজারে চাহিদার ও দামের ওঠানামার ঝুঁকি নিজেরা নিয়ে উৎপাদনকারীকে তা থেকে মুক্তি দেয়। ফলে উৎপাদনকারীরা উৎপাদনের ধারাটি অব্যাহত রাখতে পারে।

২. **পাইকারী ব্যবসায়ীরা খুচরা ব্যবসায়ীদের যে সেবা করে তা হল:** (১) পাইকারী ব্যবসায়ীরা খুচরা ব্যবসায়ীদের "ক্রয় প্রতিনিধি"[৮৩] হিসাবে কাজ করে। নানারূপ দ্রব্যের সাধারণ ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এত বেশি যে এত বিভিন্ন উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করা ছোট খুচরা ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভব নয়। পাইকারী ব্যবসায়ীরা ছোট খুচরা কারবারীদের হয়ে সে কাজটি করে দেয় এবং তাদের কাছ থেকে বিনা আয়াসে খুচরা ব্যবসায়ীরা তা সংগ্রহ করে। (২) পাইকারী ব্যবসায়ীরা নিজেরা উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে নানান দ্রব্য কিনে এনে মজুদ করে ও তা থেকে দরকার মতো পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী খুচরা ব্যবসায়ীদের সত্বর সরবরাহ করে দ্রব্য মজুদ রাখার দায় থেকে খুচরা কারবারীদের বাঁচিয়ে দেয়। (৩) উৎপাদনকারীর ঘর থেকে একসঙ্গে বেশি পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী কিনে আনে বলে পাইকারী ব্যবসায়ীদের পরিবহণ খরচ তুলনামূলকভাবে কম পড়ে। আবার অপেক্ষাকৃত কম পরিবহণ খরচে তারা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে দ্রব্য পাঠাবার ব্যবস্থা করে। সুতরাং খুচরা ব্যবসায়ীরা উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে অল্প পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী কিনে আনলে যে পরিবহণ খরচ পড়ত, পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দ্রব্যসামগ্রী কেনায় তার থেকে কম পরিবহণ খরচ লাগে। (৪) পাইকারী ব্যবসায়ীরা খুচরা কারবারীদের বাকিতে মাল বিক্রি করে, নিজেরা মাল মজুদ রেখে এবং সত্বর প্রয়োজন মত দ্রব্যসামগ্রী তাদের সরবরাহ করে খুচরা কারবারীদের কম পুঁজিতে ব্যবসা করতে সাহায্য করে। (৫) সস্তায় ভাল জিনিস নিজেরা সংগ্রহ করে ও খুচরা কারবারীদের তা সরবরাহ করে পাইকারী ব্যবসয়ীরা খুচরা কারবারীদের সুবিধা করে দেয়। (৬) বাজারের চাহিদার ও দরের ওঠানামার ঝুঁকিটা এবং মজুদ পণ্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি প্রধানত পাইকারী ব্যবসায়ীরাই বহন করে খুচরা কারবারীদের তা থেকে রেহাই দেয়। সামান্য পরিমাণে সামগ্রীর ক্রেতা খুচরা ব্যবসায়ীরা এইসব ঝুঁকি সামান্যই বহন করে। (৭) নূতন ধরনের সামগ্রীর প্রতি খুচরা ব্যবসায়ীর দৃষ্টি পাইকারী ব্যবসায়ীরাই আকর্ষণ করে থাকে।

৩. **পাইকারী ব্যবসায়ীরা সমগ্র সমাজেরও সেবা করে:** (১) অবিরাম আগাম ক্রয়ের দ্বারা পাইকারী ব্যবসায় বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখে। (২) বাজার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ গভীর জ্ঞান থাকায় পাইকারী ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ পণ্য কি কি পরিমাণে দরকার হবে তা অনুধাবন করে উৎপাদনকারীদের সেই মতো উৎপাদনের নির্দেশ দেয়। (৩) ফলে উৎপাদনকারীরা যেমন চাহিদামতো দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম হয় তেমনি ক্রেতা সাধারণেরও প্রয়োজন মেটে। (৪) পাইকারী ব্যবসায়ীরা খুচরা কারবারীদের মারফৎ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অবিরাম সরবরাহ সুনিশ্চিত করে এবং সর্বদা বাজার প্রসারিত করার চেষ্টা করে।

83. Purchasing Agent.

খুচরা ব্যবসায়ী

RETAILERS

সংজ্ঞা ও গুরুত্ব : উৎপাদনকারী থেকে ভোগকারী পর্যন্ত বিস্তৃত পণ্য বণ্টন প্রণালীর শেষতম গ্রন্থি হল খুচরা ব্যবসায়ী। উৎপাদনকারীদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য খুচরা ব্যবসায়ীদের হাত দিয়েই অবশেষে ভোগকারীর কাছে পৌঁছায়। উৎপাদনকারীর দিক থেকে সে হল বিশেষজ্ঞ বিক্রয় প্রতিনিধি[৮৪], আর ভোগকারীর দিক থেকে সে হল ক্রয় ও সরবরাহ প্রতিনিধি[৮৫]। খুচরা ব্যবসায়ের সংগঠনের অনেক বৈচিত্র্য দেখা গেলেও, খুচরা ব্যবসায়ের মূল বৈশিষ্ট্য হল পাইকারী ব্যবসায়ীর (বা ক্ষেত্র বিশেষে উৎপাদনকারীর) কাছ থেকে দ্রব্যসামগ্রী বেশি পরিমাণে ক্রয় এবং সাধারণ ভোগকারীদের কাছে অল্প অল্প পরিমাণে ("ছোট ছোট লপ্তে"[৮৬]) বিক্রয়। খরিদ্দারকে পছন্দমতো পণ্য সরবরাহ করাই তার কাজ হলেও, সেই সাথে তার সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তাকে খুশী করাই হল তার আসল কাজ। এ কারণে বলা হয় যে, সাধারণ ভোগকারীর সেবা করাই হল খুচরা ব্যবসায়ীর কাজের সারবস্তু[৮৭]।

খুচরা ব্যবসায়ের কাজ[৮৮] : ছোট ও বড় সব ধরনের খুচরা ব্যবসায়েরই কাজ হল— (১) খরিদ্দাররা কোন্ কোন্ দ্রব্যসামগ্রী কি কি পরিমাণে চায় এবং চাইতে পারে তার আনুমানিক হিসাব করা। (২) বিভিন্ন পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে খরিদ্দারদেব চাহিদামতো দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করা। (৩) খরিদ্দারদের দরকার মতো পণ্য বিক্রয় করে তাদের প্রয়োজন মেটানো। (৪) পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পণ্য দ্রব্য আনার জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করা। (৫) খরিদ্দারদের কেনাকাটার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রেখে সামর্থ্য অনুসারে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি মজুদ করে রাখা ও তা থেকে খরিদ্দারদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা। (৬) যেসব দ্রব্য পাইকারী ব্যবসায়ীরা গুণাগুণ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেনি (অর্থাৎ "বর্গীকরণ" বা গ্রেডিং হয়নি) সেগুলির বর্গীকরণ করা। (৭) মজুদ দ্রব্যের দামের ওঠানামার, চুরি, ডাকাতি ও অগ্নিকাণ্ডের দরুন ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি বহন করা। (৮) দ্রব্যগুলির ও চাহিদা সম্পর্কে বাজারের নানান তথ্য সংগ্রহ করা ও তা বিচার-বিবেচনা করে তা থেকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

খুচরা ব্যবসায়ীদের সেবাকার্য : খুচরা ব্যবসায়ীরা ভোগকারী, পাইকারী ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারী, সকলেরই সেবা করে থাকে।

ক. ভোগকারীর সেবা—(১) যে কোন সময় নিজেদের প্রয়োজনমতো সাধারণ ভোগকারীরা খুচরা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীটি কিনে এনে প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাকে নিজের ঘরে সব দরকারী জিনিস মজুদ করে রাখতে হয় না। খুচরা ব্যবসায়ী তার হয়ে নিজে মজুদ করে রাখে। (২) এক একটা পণ্যের নানারকম নমুনার জিনিস তারা মজুদ রেখে তা থেকে ভোগকারীদের ঠিক পছন্দ মতো জিনিসটি কেনার সুযোগ দেয়। (৩) নূতন কোন দ্রব্য বাজারে দেখা দিলে খুচরা ব্যবসায়ীই তা ভোগকারীদের নজরে এনে তা জনপ্রিয় করে তোলে, বাজার সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল করে। (৪) বিভিন্ন জিনিসের গুণাগুণ কি তা খুচরা ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই ভোগকারীরা জানতে পারে। খুচরা ব্যবসায়ী হল ভোগকারীর অবৈতনিক পরামর্শদাতা। (৫) বাকিতে বিক্রি, বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি বাড়তি সুবিধাও ভোগকারীরা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে।

---

84. Specialist Selling Agent. 85. Buying and supply Agent.
86. "in small lots". 87. Service is the essence in retail selling.
88. Functions of Retail Trade.

খ. পাইকারী ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীর সেবা : (১) ভোগকারীদের চাহিদার পরিবর্তনের খবরটা অর্থাৎ বাজার সম্পর্কে তথ্য খুচরা ব্যবসায়ীই পাইকারী ব্যবসায়ী ও তার মারফৎ উৎপাদনকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। (২) গুণাগুণ অনুসারে দ্রব্যসামগ্রীর বর্গীকরণ বা গ্রেডিংয়ের কাজও খুচরা ব্যবসায়ীরা খানিক পরিমাণে করে থাকে। (৩) পচন, চুরি, ডাকাতি, অগ্নিকাণ্ড এবং দরের ওঠানামায় ঝুঁকি অর্থাৎ এককথায় কারবারের ঝুঁকি খুচরা ব্যবসায়ীরাও নিজেরা খানিক পরিমাণে বহন করে, উৎপাদনকারী ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি সেই পরিমাণে কমিয়ে দেয়।

খুচরা কারবারের প্রকারভেদ[৮৮] : খুচরা ব্যবসায় বহু বিচিত্র প্রকারের হলেও মূলতঃ তা দু'রকমের—(ক) অস্থায়ী বা ভ্রাম্যমাণ[৮৯], এবং (খ) স্থায়ী[৯০]।

ক. ফিরিওয়ালা, হাটের ও মেলার দোকানদার, ফুটপাথের স্টল, প্রভৃতি হল অস্থায়ী বা ভ্রাম্যমাণ খুচরা ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্ত। এরা দিনের পর দিন একই নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবসায় করে না, পুঁজির পরিমাণ যৎসামান্য, কোনও এক ধরনের বা একই দ্রব্যের ব্যবসায়ে এরা টিঁকে থাকে না। যখন যেটা সুবিধা সে ব্যবসা করে।

খ. ছোট ও বড় খুচরা দোকানগুলি হল স্থায়ী খুচরা ব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত। গ্রাম, শহর নগরের আনাচে কানাচে, পথে ঘাটে রাস্তার পাশে অবস্থিত ছোট নানান জিনিসের ও ধরনের খুচরা দোকান সর্বত্রই দেখা যায়। খুচরা ব্যবসায়ে এখনও পর্যন্ত ছোট আয়তনের খুচরা দোকানগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে রয়েছে। রাস্তার পাশে অবস্থিত ছোট ছোট দোকান[৯১], পুরাতন জিনিসের দোকান[৯২], পাঁচ মিশেলী রকমারী পণ্যের দোকান[৯৩] এক ধরনের জিনিসের দোকান[৯৪], এবং একই লাইনের জিনিসের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের জিনিসের (যেমন, শুধু পুরুষের বা মেয়েদের বা বালকবালিকা শিশুদের পোশাকের দোকান)[৯৫] প্রভৃতি নানা ধরনের ছোট খুচরা ব্যবসায়।

বড় আয়তনের খুচরা ব্যবসায় বর্তমানে ক্রমেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (১) বহু শাখা বিপণি[৯৬], (২) বিভাগীয় বিপণি[৯৭], (৩) বিপণিমালা[৯৮], (৪) একদর বিপণি[৯৯], (৫) ডাক মারফৎ ব্যবসায়[১০০], (৬) ক্রেতা-সমবায় বিপণি বা সমবায় ভাণ্ডার[১০১], এবং (৭) অধি-বিপণি বা সংযুক্ত বিপণি[১০২]।

বহু-শাখা বিপণি

MULTIPLE SHOP

পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফত ক্রয়ে পণ্যের দাম বেশি পড়ে। সরাসরি উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে কিনলে স্বল্প দামেই তা পাওয়া যেতে পারে, ক্রেতাদের মধ্যে এই ধারণা ক্রমে শক্তিশালী আবেদনে পরিণত হয়। প্রত্যক্ষ বিক্রয় দ্বারা উৎপাদন-কারীদের বেশি মুনাফা উপার্জনের সম্ভাবনা বাড়ে। এই দুটি কারণ উৎপাদনকারীদের নিজস্ব বিপণি মারফত সরাসরি ক্রেতাদের নিকট পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে বহু-শাখা বিপণি ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

বহু-শাখা বিপণি কাকে বলে : পণ্যের উৎপাদনকারী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও শহরের বিভিন্ন অংশে বহুসংখ্যক খুচরা দোকান খুলে তার পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে তাকে বহু-শাখা বিপণি বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কোন উৎপাদনকারীর ৪টি দোকান থাকলেই তা বহু-শাখা বিপণির কারবার বলে গণ্য হয়। বাটার জুতার দোকান,

---

88. Types of Retail Business. 89. Mobile or itinerant.
90. Fixed. 91. Street stalls. 92. Second-hand goods dealers.
93. General stores. 94. Single line stores. 95. Specialty shops.
96. Multiple shops. 97. Departmental stores. 98. Chain stores.
99. One-price-shops. 100. Mail Order Business.
101. Consumers' co-operative.
102. Combination Stores or Super Market.

ঢাকা আয়ুর্বেদ ও সাধনা ঔষধালয়, মহেশ ভট্টাচার্যের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান, ঊষা সেলাইকল ও পাখার দোকান প্রভৃতি, ভারতে বহু-শাখা বিপণির দৃষ্টান্ত।

কোথাও শাখা দোকান খোলার সময় এলাকার জনসংখ্যা ও সম্ভাব্য বিক্রয়ের পরিমাণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ ঃ বহু-শাখা বিপণি প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থাকায় এতে বেশি পুঁজি লাগে। সেজন্য এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সাধারণত যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়।

কারবারের সামগ্রিক পরিচালনা ডিরেক্টার বোর্ড বা পরিচালক সমিতির উপর ন্যস্ত থাকে এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা ব্যবস্থাপক পরিচালক প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করে থাকেন।

দোকানগুলি সাধারণত কারবারের বিক্রয় বিভাগের অধীনে থেকে, বিক্রয় বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক শাখা দোকানের একজন করে ভার-প্রাপ্ত কর্মচারী বা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার থাকে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন সেল্‌স্‌ম্যান থাকে।

প্রত্যেক শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে (সাপ্তাহিক, পাক্ষিক অথবা মাসিক) হেড অফিসে মোট বিক্রয়, কোন্ শ্রেণীর দ্রব্যের চাহিদা বেশি ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করতে হয়। সে অনুযায়ী কেন্দ্রীয় অফিসের নির্দেশমত কেন্দ্রীয় স্টোর বা গুদাম থেকে মালপত্র নির্দিষ্ট সময়ান্তে সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেক দিনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কেন্দ্রীয় অফিসের নির্দেশমত স্থানে জমা দিতে হয়। তা খরচ করার কোন অধিকার স্থানীয় শাখার থাকে না। স্থানীয় শাখার সাজগোজ, মেরামত, অদলবদল ইত্যাদির ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় অফিস থেকেই করা হয়ে থাকে।

শাখা অফিসগুলি ঠিকমত কাজ করছে কিনা, তা তদারক করার জন্য মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় অফিস থেকে আকস্মিক তদন্তের ব্যবস্থা থাকে।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. এই জাতীয় সংগঠনের মধ্যে পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থার একত্রীকরণ হওয়ায় এটিকে পূর্বাপর জোটের[১০৩] সংগঠন বলা যায়।

২. এই জাতীয় পূর্বাপর জোট প্রধানত পণ্যের উৎপাদনকারী কর্তৃক, নিজ মালি-কানায় সংগঠিত হয়। কিন্তু উৎপাদক-মালিকদের সাথে বিক্রয় সংগঠনের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত দৈনন্দিন সম্পর্ক থাকে না। বিক্রয় সংগঠনের সাথে মালিকের পরোক্ষ সম্পর্ক থাকে মাত্র। বিক্রয় সংগঠনটি অর্থাৎ দোকানগুলির প্রত্যক্ষ পরিচালনা বেতনভুক বিভিন্ন কর্মচারীর হাতে থাকে।

৩. এইরূপ প্রতিষ্ঠান সাধারণত একই শ্রেণীর পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে আত্মনিয়োগ করে তাতেই বিশেষত্ব অর্জন করে। তবে অনেক সময় কারবারের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য এরা নানান পণ্যও বিক্রয় করে। যেমন, বাটা সু কোম্পানী প্রথমে পাদুকা নির্মাতা ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরে ছাতা, খেলনা, মোজা, কালি ইত্যাদি নানা প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় শুরু করেছে। কিংবা, কলকাতার পরিচিত দেশী মিষ্টি বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান 'জলযোগ' বেকারী বিভাগও খুলেছে।

৪. এরা সর্বত্র নির্দিষ্ট দরে[১০৪] পণ্য বিক্রয় করে। খরিদ্দারদের দরাদরির সুযোগ নেই।

৫. সর্বদাই নগদ বিক্রয় এদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এরা কোথাও বাকীতে পণ্য বিক্রয় করে না।

৬. এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দোকান বহু এবং তা বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হলেও

---

103. Vertical combination.   104. Fixed Price.

সর্বত্রই ঐ সকল দোকানের সাজসজ্জা, সাইন বোর্ড, দোকানের নাম লেখার ধরন ইত্যাদি মোটামুটি এক প্রকারের হয়ে থাকে। ফলে সহজেই এরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

৭. অন্যান্য সাধারণ দোকানগুলি প্রধানত যেমন জনাকীর্ণ স্থানে বা ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, বহু-শাখা বিপণির শাখাগুলি শুধুমাত্র সেরূপ অঞ্চলে স্থাপিত হয় না। এদের নীতি হল—'ক্রেতাকে বাজারে আকর্ষণ করা নয়, বাজারকে ক্রেতার নিকট নিয়ে যাওয়া।' অর্থাৎ দোকানগুলি ক্রেতাদের বাসস্থানের যথাসম্ভব কাছে স্থাপন করা হয়। এক কথায়, বিক্রয়ের কেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি এরা অনুসরণ করে।

৮. এদের ব্যবসায় ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে।

সুবিধা : ক. বিক্রয়কারীর দিক থেকে : ১. এতে নগদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকায় বিক্রেতার বিশেষ সুবিধা হয়। বাকীতে বিক্রয় করলে প্রতি বৎসর যে অনাদায়ী পাওনা[১০৫] বাবদ লোকসান হয়, নগদ বিক্রয়ের ফলে বহু-শাখা বিপণিকে সে জন্য ক্ষতি-গ্রস্ত হতে হয় না।

২. নগদ বিক্রয় ব্যবস্থার আর একটি সুফল এই যে, অনতিবিলম্বে বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাওয়া যায় বলে কারবারে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে পুঁজি নিয়োগ করতে হয় না।

৩. এই জাতীয় সংগঠনের প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প হয়; কারণ একদিকে কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে প্রচারের ব্যবস্থা হয়, প্রত্যেক দোকানের জন্য পৃথক বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে সকল শাখা দোকানই সাজ-সজ্জায় একরূপ ও সকলেই একই শ্রেণীর পণ্য বিক্রয় করে বলে এক দোকান অপর দোকানের প্রচারে সহায়তা করে।

৪. এর অন্তর্গত বহু দোকানের মারফত একই জাতীয় পণ্য বিক্রয় হয় বলে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ খুব বেশী হয়।

৫. উৎপাদনকারী সরাসরিভাবেই এর মারফৎ পণ্য বিক্রয় করে এবং তার নিকট সদ্য প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়। সেজন্য ক্রেতারা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পণ্য কিনতে পছন্দ করে। এজন্য এর বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রুত বাড়ে।

৬. উৎপাদনকারীর সাথে ক্রেতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে ক্রেতারা ঠিক কোন্ ধরনের পণ্য কতটা পরিমাণে চায়, তা উৎপাদনকারী অবিলম্বে জানতে পারে। ফলে উৎপাদনকারী ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদামত উপযুক্ত গুণাগুণবিশিষ্ট সঠিক শ্রেণীর পণ্য সঠিক পরিমাণে উৎপাদন ও সরবরাহ করতে সমর্থ হয়।

৭. বিক্রয়বৃদ্ধির দরুন বৃহদায়তনে উৎপাদন করতে পারে বলে বিক্রেতার উৎপাদনে ব্যয়সংকোচ ঘটে; কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত উপায়ে বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য চালান হয় বলে বিক্রয়ব্যয় কমে; মধ্যস্থ কারবারীকে উচ্ছেদ করে সরাসরি ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রয় করা হয় বলে বিক্রেতার আয় বাড়ে; এইরূপে নানাদিকে সুবিধার ফলে বহু-শাখা বিপণির কারবারে মুনাফা বাড়ে।

৮. বিক্রয়কারী স্বয়ং উৎপাদক বলে মূল পণ্য প্রস্তুতের সঙ্গে নানাবিধ উপদ্রব্য[১০৬] প্রস্তুত করে বিক্রয় করতে পারে। তাতেও তার আয় বাড়ে।

৯. একই কেন্দ্রীয় গুদামে[১০৭] পণ্য মজুত করে তা থেকে সকল বিপণিতে পণ্য সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেক বিপণির জন্য পৃথক পৃথক গুদামের ব্যবস্থা করতে না হওয়ায় পণ্য মজুতের জন্য গুদামের খরচ কমে।

১০. যে কোন সময়ে একটি দোকানে কোন পণ্যের অভাব হলে অবিলম্বে অন্য

105. Bad Debts. 106. By-products. 107. Central Stores.

শাখা দোকান থেকে তা এনে চাহিদা মেটাতে পারা যায় বলে কোন দোকানেই কখনও পণ্যের অভাব অনুভব করা যায় না ও সেজন্য অসুবিধা ভোগ করতে হয় না।

খ. ক্রেতার পক্ষ থেকে : ১. এই দোকানগুলি যথাসম্ভব ক্রেতাদের বাসস্থানের নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে ক্রেতাদের খুব সুবিধা হয়। অযথা সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয় না।

২. নির্দিষ্ট দরে পণ্য বিক্রয় হয় বলে দরাদরির অসুবিধা ভোগ করতে হয় না।

৩. এই সব দোকানে সুনির্দিষ্ট মানের পণ্য অতি পরিচিত ট্রেডমার্ক বা পণ্যচিহ্ন সহযোগে বিক্রয় করা হয়। ফলে ক্রেতারা নির্ভয়ে পণ্য কিনতে পারে। প্রতারিত হওয়ার আশংকা থাকে না।

৪. মধ্যস্থ কারবারী না থাকায় অপেক্ষাকৃত কমদামে ক্রেতারা পণ্য কিনতে পারে।

৫. সর্বদা টাট্‌কা পণ্য পাওয়া যায় বলে ক্রেতারা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৬. বিক্রয়কারী নিজেই উৎপাদনকারী হওয়ায়, পণ্য সম্পর্কে কখনও কোন অভিযোগ থাকলে ক্রেতারা তাদের অভিযোগ সহজেই সরাসরি জানাতে পারে এবং তার দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

অসুবিধা : ক্রেতার দিক থেকে : ১. এইসব দোকানে শুধু এক প্রকারের বা মুষ্টিমেয় কয়েক প্রকার সামগ্রী বিক্রয় হয় বলে ক্রেতারা এদের নিকট থেকে তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী ক্রয়ের সুবিধা পায় না। ২. সর্বদা একই ধরন-ধারণের অল্প কয়েক প্রকার মাত্র পণ্য এরা বিক্রয় করায়, বৈচিত্র্যহীন পণ্যসম্ভার ক্রেতার বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে।

উৎপাদনকারীদের দিক থেকে : ১. এই জাতীয় কারবারে একই সংগে উৎপাদন ও বহু বিপণি পরিচালনা করতে গেলে প্রচুর পরিমাণে পুঁজি লাগে এবং সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ২. এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যথেষ্ট সাংগঠনিক দক্ষতাও প্রয়োজন। তার অভাবে বহু কর্মচারী, শ্রমিক, ম্যানেজার ও বিক্রয়কর্মীর কাজের উপর সজাগ দৃষ্টি থাকে না। ফলে সর্বত্র শৈথিল্য দেখা দেয় ও প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বাড়ে। ৩. নানাদিক দিয়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়সংকোচ ঘটলেও, শহরের প্রধান প্রধান অঞ্চলে, বড় বড় রাস্তার উপর ভাল দোকানঘর বেশি ভাড়ায় সংগ্রহ করতে গিয়ে বেশি খরচা পড়ে। যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে ঘর সংগ্রহ করে ও তা বিপুল ব্যয়ে সাজিয়ে সকল দোকানই প্রতিষ্ঠা করতে হয়, কিন্তু সবগুলি থেকেই যে মুনাফা হয় তা নয়। ৪. এই সকল প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট বৃহদায়তন হয়। ফলে বাজারের চাহিদা, ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত এরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না।

সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থার দিক থেকে : এদের সম্প্রসারণের ফলে শেষ পর্যন্ত শিল্পে প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়ে একচেটিয়া কারবারের প্রবণতা বাড়ে।

বিভাগীয় বিপণি
DEPARTMENTAL STORES

আধুনিককালে একজাতীয় বৃহদায়তন স্বয়ংসম্পূর্ণ খুচরা বিপণি বড় বড় শহরে দেখা যায়। একই মালিকানা ও পরিচালনায়, একই বিপণির অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগ থেকে ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ভোগ্যপণ্য বিক্রয় করা হয়। লণ্ডনের সেলফ্রিজেস[১০৮] নামক বিভাগীয় বিপণিতে তিন শত বিভাগ আছে। কলকাতায় 'কমলালয় স্টোর্স লিমিটেড'-এ ৩০টিরও বেশী বিভাগ থেকে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য বিক্রয় করা হয়। 'হল এ্যাণ্ড এণ্ডারসন' কলিকাতার অপর একটি বৃহৎ অভিজাত বিভাগীয় বিপণি। এক একটি বিভাগে এক এক জাতীয় পণ্য বিক্রয় করা হয় এবং এই সকল বিভাগ

108. Selfridges of London.

ফলে দোকানটি এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ক্রেতাদের যাবতীয় দরকারী সামগ্রীই এরা বিক্রয় করে। জাপানের টোকিও শহরে ৭টি বিভাগীয় বিপণি আছে, তাদের মধ্যে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানটির নাম 'নিটসুকোশী'। এর সাত তলা বাড়িতে মাছ ও শাকসবজি থেকে আরম্ভ করে কাঠের আসবাব পর্যন্ত হরেক রকমের পণ্য বিক্রয় হয়।

ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ : এই জাতীয় দোকান একমালিকী, অংশীদারী অথবা প্রাইভেট লিমিটেড আকারে গঠন করা হয়। এক মালিকানায় গঠিত হলে, মালিক নিজেই তত্ত্বাবধান করে ও প্রাইভেট লিমিটেড কারবার হলে ম্যানেজিং ডিরেক্টার-এর উপর তার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব অর্পিত হয়। তার অধীনে সমগ্র কারবারের একজন জেনারেল ম্যানেজার ও একজন সেক্রেটারী থাকে। সেক্রেটারী কারবারের আর্থিক দিক ও হিসাবপত্র তত্ত্বাবধান করে। জেনারেল ম্যানেজার কারবারের ক্রয়-বিক্রয় ও অফিস পরিচালনা করে। জেনারেল ম্যানেজারকে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক বিভাগের একজন করে বিভাগীয় ম্যানেজার থাকে। এই সব বিভাগীয় ম্যানেজারকে সহকারী বিভাগীয় ম্যানেজার ও বিক্রয়-কর্মীরা সহায়তা করে। প্রত্যেক বিভাগে পণ্যসামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয়ের যাবতীয় দায়িত্ব বিভাগীয় ম্যানেজার বহন করে। তার কাজ বাজার থেকে তার বিভাগের জন্য বিক্রয়যোগ্য পণ্যসামগ্রী পছন্দ ও ক্রয় করা, তা দোকানের গুদামে আনা ও মজুতের ব্যবস্থা করা, দ্রব্যগুলির উপযুক্ত বিক্রয়মূল্য ধার্য এবং বিক্রয়ের তদারক করা। যাতে অর্থের অহেতুক লগ্নী না হয়, সেজন্য মালপত্র ক্রয় বাবদ প্রত্যেক বিভাগীয় ম্যানেজারকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। খুব বড় কারবার হলে প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র ক্যাশিয়ার থাকে, নতুবা, সাধারণত সমগ্র বিপণির জন্য কেন্দ্রীয় ক্যাশবিভাগ থাকে। প্রত্যেক বিভাগে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় হলে সেলসম্যান তাব ক্যাশমেমো কেটে ও ক্রেতার নিকট থেকে দাম নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছে জমা দেয় এবং ওয়াসিলযুক্ত রসিদ বা ক্যাশমেমোটি ও একটি কাউন্ডার টোকেন বা বিক্রয়ের সাংকেতিক নম্বরযুক্ত একটি কাগজ ক্রেতাকে দেয়। তারপর বিক্রীত সামগ্রীটি প্যাকিং ও ডেলিভারী বিভাগে পাঠিয়ে দেয়। ক্রেতা ঐ টোকেনটি দেখিয়ে প্যাকিং ও ডেলিভারী বিভাগ থেকে তার ক্রীত সামগ্রীটি খালাস করে নেয়।

বৈশিষ্ট্য : (১) বিভাগীয় বিপণি কারবার বহু-শাখা বিপণির মত একই সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রেতা নয়। এরা বাজার থেকে তৈরী পণ্য পাইকাবী দরে কিনে খুচরা দরে বিক্রয় করে। (২) এরা একই স্থানে বহু প্রকাবের দ্রব্যসামগ্রী মজুত ও বিক্রয় করে। (৩) যদিও কোথাও কোথাও অত্যন্ত পরিচিত কিছু কিছু ক্রেতার নিকটে এরা বাকীতে পণ্য বিক্রয় করে থাকে, তাহলেও নগদ বিক্রয়ই এই জাতীয় কারবারের বৈশিষ্ট্য। (৪) এই বিপণিগুলি আয়তনে বড় বলে ছোটখাট শহরের পক্ষে অনুপযুক্ত। সুতরাং সাধারণত বড় বড় শহরেই এদের দেখা যায়। (৫) বহু-শাখা বিপণির মত এরা বিক্ষিপ্ত আকারে ক্রেতাদের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হয় না। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বহুপ্রকারের পণ্য বিক্রয়ের কেন্দ্রীকরণ ঘটে। সেজন্য এরা সাধারণত শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়। (৬) অল্প কয়েকটি পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধভাবে ক্রেতাদের সেবা করা এর উদ্দেশ্য নয়। তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী একস্থানে একত্রিত করে তাদের পছন্দ ও বাছাই ও ক্রয়ের সুবিধা দিয়ে পরিশ্রম ও সময় সাশ্রয় করে নানা-ভাবে সেবা করাই বিভাগীয় বিপণিব উদ্দেশ্য। (৭) ক্রেতাদের সুবিধার জন্য এরা বিক্রীত সামগ্রী নিজেরাই ক্রেতাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে।

সুবিধা : ক. ক্রেতাদের দিক থেকে : (১) একই দোকান থেকে এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা সম্ভব হয় বলে ক্রেতাদের সময় ও পরিশ্রম লাঘব হয়।

(২) ক্রেতারা এই সব দোকানে বিভিন্ন উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুত একই দ্রব্যের রকমারী মজুত থেকে নিজেদের পছন্দমত দ্রব্যটি সংগ্রহ করতে পারে। (৩) এদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট মান ও উৎকর্ষযুক্ত দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা পাওয়া যায়। (৪) বাড়িতে বাড়িতে বিক্রীত দ্রব্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় ক্রেতাদের বিশেষ সুবিধা হয়। (৫) শহরের কেন্দ্রস্থলে এই সব দোকান স্থাপিত হওয়ায় শহরের যে কোন প্রান্তের মানুষ এদের কাছ থেকে দ্রব্যসামগ্রী কিনতে বিশেষ বেগ পায় না।

খ. প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে : (১) এর অন্তর্গত এক বিভাগ সর্বদাই অপর বিভাগের প্রচারে সাহায্য করে। কারণ কোন একটি দ্রব্য কিনতে কোন ক্রেতা সংশ্লিষ্ট বিভাগে উপস্থিত হলে পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগের পণ্যসামগ্রী দেখতে পেয়ে আকৃষ্ট হয়। ফলে একটির পরিবর্তে অনেক সময়েই একাধিক পণ্য ক্রয় করে ফেলে। (২) এক-সঙ্গে বহু বিভাগের জন্য বহু পরিমাণে পণ্যাদি কিনতে হয় বলে এর বৃহদায়তনে ক্রয়জনিত ব্যয়সংকোচ বেশি হয়। (৩) প্রচুর অর্থশালী হওয়ায় ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বহু বিভাগের দ্রব্যসামগ্রীগুলি এরা অত্যন্ত পরিপাটি করে সাজাতে পারে। সমগ্র দোকানটির অভ্যন্তরে একটি সুরুচিসম্মত, মনোহর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে অথচ, তাতে মোট প্রচার ব্যয় বেশি হলেও, তা সকল বিভাগ একযোগে বহন করে বলে গড়পড়তা প্রচার ব্যয় কমে। (৪) অর্থসম্পদশালী বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এরা ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য পারদর্শী বিশেষজ্ঞদের উচ্চ বেতনে নিযুক্ত করতে পাবে এবং প্রত্যেক বিভাগে উপযুক্ত শ্রমবিভাগ চালু করে ক্রয় ও বিক্রয় উভয় দিকেই দক্ষতা বাড়াতে পারে। খুচরা কারবারের সাফল্যের জন্য ঠিক এই জাতীয় গুণাবলীই প্রয়োজন। (৫) এই সব প্রতিষ্ঠানে সাধারণত সমাজের বিত্তশালী সচ্ছল শ্রেণীর খরিদ্দারই বেশি থাকে। সুতরাং ক্রেতার সংখ্যার তুলনায় এদের বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। (৬) বৃহদায়তন ক্রয় ও বিক্রয়ের দরুন এদের গড়পড়তা স্থিব খরচ বা পরিচালনা ব্যয় কমে। (৭) বিভিন্ন বিভাগের বিক্রয়েব ও ব্যয়েব তুলনা দ্বাবা সহজেই তাদের মধ্যে কোন্‌টি লাভজনক ও কোন্‌ কর্মচারী সুদক্ষ তা যাচাই করা যায়।

অসুবিধা : ক. ক্রেতাদের দিক থেকে : (১) এই বিপণিগুলি ক্রেতাদের বাসস্থানের দূরবর্তী হয়। (২) ছোটখাটো দ্রব্য সামান্য পরিমাণে কিনতে হলে সাধারণ ক্রেতারা এদের কাছ থেকে কিনতে সংকোচ অনুভব করে। (৩) পরিচালনা, প্রচার ইত্যাদির দরুন ব্যয় হওয়ায়, ছোটখাটো খুচরা দোকান অপেক্ষা এদের পণ্যমূল্য বেশি হয়। (৪) এরা ধনী এবং সাধাবণ ক্রেতাদের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহাব কবে বলে সাধারণ ক্রেতারা এদের কাছে যেতে উৎসাহ পায় না।

খ. প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে : (১) এতে বেশি মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। (২) সুদক্ষ পরিচালক ছাড়া এরূপ বিরাট কাববাবেব বিভিন্ন বিভাগের অসংখ্য কর্মচারীদের উপর নজর রাখা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন বিভাগেব জন্য বহুসংখ্যক সৎ ও দক্ষ কর্মচারী সংগ্রহ করাও কঠিন। (৩) এই সব দোকানের বাড়িভাড়া, ব্যবস্থাপনার খরচ প্রভৃতি অত্যধিক হওয়ায়, উচ্চহারে মুনাফা ছাড়া এরা টিকতে পারে না। অথচ উচ্চহারে মুনাফা করা প্রতিযোগিতার বাজারে খুবই কঠিন। সুতরাং এই জাতীয় কারবারে ঝুঁকি খুব বেশি। (৪) বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় মালিকের পক্ষে ক্রেতাদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ভারতে বিভাগীয় বিপণির প্রসার : ভারতে বিভাগীয় বিপণিগুলি বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। তার প্রধান কারণ, এ দেশের অধিকাংশ মানুষের আয় অতি সামান্য এবং এদের পণ্যের দাম অপেক্ষাকৃত বেশি। যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষের অবস্থা এখন স্বচ্ছল, শুধু তাদের চাহিদার উপর নির্ভর করে বিভাগীয় বিপণিগুলি লাভজনকভাবে

চলতে পারে না। তবে তা সত্ত্বেও, এক ধরনের বিভাগীয় বিপণি স্থাপনের চেষ্টা এদেশে হয়েছে। মাদ্রাজের স্পেনসার্স, কলকাতার কমলালয়, হল এ্যান্ড এ্যান্ডারসন প্রভৃতির নাম এ ক্ষেত্রে করা যায়। বোম্বাই, দিল্লি, কানপুর প্রভৃতি শহরেও ইদানীং-কালে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের এবং অন্য এক ধরনের বিভাগীয় বিপণি বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।

বিভাগীয় এবং বহু-শাখা বিপণির তুলনা

বিভাগীয় বিপণি	বহু-শাখা বিপণি
১. এরা বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করে, একস্থান থেকে তা বিক্রয় করে। অর্থাৎ এতে বিকেন্দ্রিত উৎপাদনের সাথে কেন্দ্রীভূত বিক্রয় বা বণ্টনের সমন্বয় করে[১০৯]।	১. এরা পণ্য উৎপাদন করে বিভিন্ন শাখা মারফত বিক্রয় করে; অর্থাৎ এতে কেন্দ্রীভূত উৎপাদনের সাথে বিক্রয় বা বণ্টনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে[১১০]।
২. এরা বহু বিচিত্র পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে।	২. এরা সাধারণত একজাতীয় পণ্যের বিক্রেতা।
৩. বড় বড় শহর ছাড়া বিভাগীয় বিপণি দেখা যায় না।	৩. ছোট বড় সকল শহরেই এরা থাকতে পারে।
৪. এরা শহরের কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসকারী ক্রেতাদের আকর্ষণ করে।	৪. এরা বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত এলাকায় অবস্থিত ক্রেতাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাদের সমীপবর্তী স্থানে স্থাপিত হয়।
৫. এরা বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ থেকে বঞ্চিত। কারণ এরা নিজে পণ্য উৎপাদন করে না।	৫. বহু-শাখা বিপণি বিক্রয়ের ব্যয়-সংকোচের সাথে উৎপাদনের ব্যয়-সংকোচ ভোগ করে, কারণ এরা নিজে পণ্যোৎপাদনকারীও বটে।
৬. এরা নিজেরা উৎপাদন করে না বলে মধ্যস্থ কারবারীদের মারফত এদের পণ্য খরিদ করতে হয়। সুতরাং মধ্যস্থ কারবারীদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে পারে না।	৬. নিজেরাই পণ্য উৎপাদন করে বিক্রয় করে বলে এরা সম্পূর্ণভাবে মধ্যস্থ কারবারীকে দূর করতে পারে।
৭. এরা পার্শ্বিক[১১১] ধরনের কারবারী জোট।	৭. এরা পূর্বাপর[১১২] ধরনের কারবারী জোট।

বিপণিমালা (CHAIN STORES)

ইউরোপে, আমেরিকায় এবং ইদানীংকালে ভারতেও এক বিশেষ ধরনের খুচরা কারবার দেখা যাচ্ছে—এতে একই বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বহু শাখা থাকে। ঐ শাখাগুলি থেকে অল্প কয়েক প্রকার পণ্য বিক্রয় হয়। প্রতিষ্ঠানটি নিজে পণ্যগুলি উৎপাদন করে না, বাজার থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে পাইকারী দরে কিনে খুচরা দরে বহু শাখা মারফত বিকেন্দ্রিতভাবে বিক্রয় করে থাকে। এরা 'চেইন স্টোরস' নামে পরিচিত। অনেক সময় কোন কোন 'চেইন স্টোরস' প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র একজাতীয় পণ্যের মধ্যে নিজের কারবার সীমাবদ্ধ রাখে। উলওয়ার্থ নামে পরিচিত 'চেইন স্টোরস'-এর

---

109. Decentralised production and centralised distribution.
110. Centralised production and decentralised distribution.
111. Lateral. 112. Vertical.

ইংলন্ড, কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দুই হাজার শাখা আছে। কলকাতা এ. টস., চেম্বারস্, বি. কে. সাহা প্রভৃতি চায়ের দোকানগুলি এই শ্রেণীর।

'বহু-শাখা বিপণি'র মত এদেরও অনেক শাখা থাকে বটে, কিন্তু এরা বহু-শাখা বিপণির মত নিজে পণ্যের উৎপাদক নয়। আবার 'বিভাগীয় বিপণি'র মত এরা একসঙ্গে একাধিক পণ্য বিক্রয় করলেও এদের কারবার শুধু একটিমাত্র দোকানেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভাগীয় বিপণির কোন শাখা নাই। কিন্তু এরা বহু-শাখাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ভাবে পণ্য খরিদ করে বিকেন্দ্রীয়ভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাই এদের মূল বৈশিষ্ট্য।

একদর বিপণি (ONE-PRICE SHOP)

'চেইন স্টোরস'-এর মতই আর এক জাতীয় খুচরা কারবার দেখা যায় যারা বহু-শাখার মারফত একাধিক পণ্য বিক্রয় করে। তবে এদের বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা যে সব পণ্যের কারবার করে তার সবই একদরে বিক্রয় করে থাকে। তবে 'চেইন স্টোরস'-এর সাথে এদের একটি পার্থক্য এই যে, অনেক সময় এরা কিছু কিছু পণ্য নিজেরাও উৎপাদন করতে পারে। পথে-ঘাটে অনেক সময় ফেরীওয়ালাদের ঠেলাগাড়িতে করে দু' আনা বা সাড়ে ছয় আনায় যে হরেকরকম পণ্য বিক্রয় করতে দেখি তা একদরের দোকানের অতি প্রাথমিক নমুনা বলা যায়। তবে এখানে স্থায়িভাবে এক দরের বিপণি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এরকম ব্যবসায় ইউরোপ ও আমেরিকায় বিস্তার লাভ করেছে। সকল দ্রব্যই একই দরে পাওয়া যায় বলে ক্রেতারা কমদরে ভাল জিনিস কেনার আশায় এই সব প্রতিষ্ঠানে ভিড় করে। এবং ক্রেতাদের এই মনোভাব এই জাতীয় কারবারের সাফল্যের ভিত্তি। সাধারণত শহরের জনবহুল, প্রধান প্রধান রাজপথের ধারে, এই সকল দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত কেন্দ্রীভূত উৎপাদন এবং ক্রয়, কেন্দ্রীয় পরিচালনা এবং বিকেন্দ্রিত অথচ বৃহদায়তন বিক্রয়ের সুবিধাগুলিই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সহায়তা করে।

ডাক মারফত কারবার (MAIL ORDER BUSINESS)

সাধারণত সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানই যেমন দোকানে ক্রেতার নিকট সরাসরি পণ্য বিক্রয় করে তেমনি ডাকযোগেও কোন কোন ক্রেতার নিকট হতে পণ্যের ফরমাশ পায় ও তা সরবরাহ করে। কিন্তু এক বিশেষ ধরনের কারবার দেখা যায় যারা শুধু বিজ্ঞাপন ও ডাক মারফতেই ক্রেতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। একে 'ডাক মারফত ব্যবসায়' বলে।

বর্তমান কালে যোগাযোগ ও ডাক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে সকল দেশেই এই জাতীয় কারবারের সুযোগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের কোন দোকান বা এমন কি অফিস ও পণ্য মজুতের জন্য গুদাম দরকার হয় না এবং সেকারণে খরচ কমে যায়। সাধারণত মালিক অল্প মূলধনে এরূপ কারবার খুলে তার বাড়িকেই এর কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। কারবারের একমাত্র মাধ্যম হল ডাকঘর। মালিক ডাক কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে একটি 'পোস্টবক্স' ভাড়া করে এবং তার নম্বরই তার কারবারের ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করে। এই ঠিকানাসহ সে নানা পত্র ও পত্রিকায়, নানাস্থানে নানাভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উৎসুক ক্রেতাদের নিকট থেকে সাড়া পেলে তাদের নিকট 'ক্যাটালগ' বা পণ্য-মূল্যের বিবরণী পাঠায় এবং অত্যন্ত সযত্নরচিত পত্রাদির সাহায্যে তাদের সাথে পত্রালাপ করে ও তা ধৈর্যের সাথে 'ফলো আপ' বা অনুসরণ করে, ক্রেতার নিকট থেকে ফরমাশ আদায় করে। তার কারবারের অপর দিক হল সাবধানতার সাথে কারবারের পণ্য স্থির করা ও বাজার থেকে অর্ডার মাফিক তা সুলভে সংগ্রহ করা ও ক্রেতার

নিকট পাঠানো। পণ্যগুলি সাধারণত বেশী দামের হলে বা খুব বড় আকারের হলে এ জাতীয় কারবারের সুবিধা হয় না। অর্ডারী মালপত্র পাঠাবার সময় অতি সযত্নে তা 'প্যাক' করার দিকেও তাকে নজর রাখতে হয়, যেন গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর আগেই তা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এই কারবারের নিয়ম হল, ক্রেতার নিকট পণ্যটি ভি. পি. পি.[113] করে পাঠানো হয় এবং দাম দিয়ে ক্রেতা তা খালাস করে নেয়। এইরূপে আগাগোড়াই ডাক মারফত এই জাতীয় কারবার চলে।

ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডার
CONSUMERS' CO-OPERATIVE STORES

ভোগকারীদের মধ্যে পণ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে সমবায় নীতির প্রয়োগের ফলে ক্রেতা-সমবায় ভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়েছে। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের দূর করে সস্তায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী কিনে এনে নিজেদের (সমিতির সদস্যদের) মধ্যে বিক্রয় করার জন্যই ভোগকারীরা এই সমবায় ভাণ্ডার গঠন করে। তাঁরা স্বেচ্ছায় সামান্য সামান্য পরিমাণে অর্থ দিয়ে শেয়ার কিনে সমিতির পুঁজি সংগ্রহ করে। মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে এরা ব্যবসায় করে না। এদের উদ্দেশ্য হল সদস্যদের সেবা করা। যদি কখনও কিছু মুনাফা হয়ে যায়, তাহলে তা সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে এরা বেশি পরিমাণে জিনিস কিনে আনে এবং যথা-সম্ভব কম খরচে সমিতির কাজ চালায়।

বৈশিষ্ট্য ঃ (১) এদের সদস্যরা স্বেচ্ছায় সমিতি গড়ে তোলে ও তাতে যোগ দেয়। (২) সদস্য হতে কোনও বিধি নিষেধ নেই। (৩) মুনাফা নয়, সেবাই এদের উদ্দেশ্য। (৪) সাধারণত এরা নগদেই পণ্য বিক্রি করে। (৫) এরা সরাসরি উৎ-পাদনকারীদের কাছ থেকে পণ্য কিনে সদস্যদের মধ্যে বিক্রি করে বলে এই ব্যবস্থায় কোনও মধ্যস্থ কারবারী থাকে না। (৬) প্রত্যেক সদস্যের একটি মাত্র ভোট, এই গণতান্ত্রিক নীতিতে সমিতি পরিচালিত হয়।

সুবিধাঃ (১) সরাসরি উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে কেনে বলে এবং বেশী পরিমাণে কেনে বলে, সমবায় ভাণ্ডার এই দু'টি কারণে বেশ কম দামে পণ্য কিনতে পারে। (২) মধ্যস্থ কারবারীরা থাকে না বলে, তারা যে ভেজাল দেয়, মাপে চুরি করে—সমবায় ভাণ্ডারের বেলায় এই সবের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সমবায় ভাণ্ডার সদস্যদের খাঁটি ও উৎকৃষ্ট জিনিস সরবরাহ করতে পারে। (৩) অপেক্ষাকৃত কম দামে জিনিসগুলি কেনে বলে, সমবায় ভাণ্ডার তার সদস্যদের কাছেও কম দামেই তা বিক্রি করতে পারে। (৪) সমবায় ভাণ্ডার পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী দু'রকমের মধ্যস্থ কারবারীকেই দূর করে দিয়ে পণ্য বণ্টনের অনাবশ্যক খরচ কমিয়ে দেয়। (৫) সমবায় ভাণ্ডারের সদস্যরা তো, সমিতির মুনাফা হলে তার অংশ পায়ই, তাছাড়া ক্রেতাদেরও আকর্ষণ করার জন্য বোনাস দেওয়া হয়। (৬) সমবায় সমিতিরূপে সমবায় ভাণ্ডার সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর অংশের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেয় শিক্ষা দেয় গণতান্ত্রিক রীতিতে ও সমাজের সকলের সাথে মিলেমিশে চলার নীতি। তাছাড়া, সদস্যের জন্য সমিতির আয় থেকে নানান কল্যাণকর কাজও করা হয়ে থাকে।

সীমাবদ্ধতা[114] ঃ (১) অধিকাংশ সমিতির আয়তন ও সম্বল লাভজনকভাবে চলার মতো নয়। প্রধানত অল্পবিত্ত মানুষদের নিয়েই এগুলি গঠিত হয়। তাদের প্রয়োজন অনেক কিন্তু সামর্থ্য সামান্য। (২) পুঁজির পরিমাণ অল্প বলে এরা একসাথে বেশি পরিমাণে সামগ্রী কেনার সুবিধা বিশেষ ভোগ করতে পারে না। (৩) জনপ্রিয় উদ্যোক্তার

113. Value Payable Post. 114. Limitations.

অভাবও সমবায় ভাণ্ডারগুলির বিকাশ ও সাফল্যের পথে আরেকটি বাধা। (৪) দুর্বল ও অনভিজ্ঞ পরিচালকমণ্ডলীর দরুন সমবায় ভাণ্ডারের সাংগঠনিক দুর্বলতা এর সাফল্যের পথে আরেক প্রবল বাধা। (৫) সমিতির প্রতি সদস্যদের আনুগত্যের অভাবও সমবায় ভাণ্ডারের সাফল্যের পথে আরেকটি বিঘ্ন। সদস্যদের কাছ থেকে যে পরিমাণ সমর্থন পেলে সমবায় ভাণ্ডার সফল হতে পারে, তার সবিশেষ অভাব দেখা যায়। (৬) সমবায় নীতির সাফল্য নির্ভর করে সমিতির স্বেচ্ছামূলক চরিত্রের উপর। যে মুহূর্তে তা নষ্ট হয় সেই মুহূর্তেই তার শক্তিও নষ্ট হয়। এদেশে সমবায় সমিতি-গুলি স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে গঠিত হলেও প্রধানত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার বলেই তা চালু থাকে। তা প্রত্যাহারের সাথে সাথেই সমিতিরও পতন ঘটে। আত্মনির্ভরশীল না হয়ে সমিতিগুলি পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। (৭) ব্যবসাবাণিজ্যের রীতিনীতি-গুলির দিকে সমবায় ভাণ্ডার বিশেষ নজর দেয় না। পণ্যগুলি ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা, প্রচার, সুদক্ষভাবে অফিস ও সংগঠন পরি-চালনা করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় ভাণ্ডারগুলি শাখা-বিপণি বা বিভাগীয় বিপণি প্রভৃতির তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

এই সব ত্রুটির ফলেই সমবায় ভাণ্ডার যথেষ্ট সাফল্যলাভে সক্ষম হচ্ছে না। তবে এসব ত্রুটি যে দূর করা যায় না তা নয়। সমবায়ের মহৎ নীতির সাথে তা পালনে ঐকান্তিক মনোভাব এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে সমবায় ভাণ্ডারের সাফল্যও সুনিশ্চিত হতে পারে।

ভারতে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন: এদেশে ক্রেতা বা ভোগকারী সমবায় সমিতি বা সমবায় ভাণ্ডারগুলির সাফল্য এখনও সীমাবদ্ধ রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থার সময় সমবায় সমিতি গঠনের আন্দোলন প্রথম বিস্তার লাভ করে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে সমবায় ভাণ্ডারের সংখ্যা ২৫ গুণ ও বেচাকেনার পরিমাণ ১৪৪ গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু তারপর রেশনিং ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সমিতির সংখ্যা কমে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় ভাণ্ডারের কোন অগ্রগতি ঘটেনি।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমবায় ভাণ্ডার গঠনের আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়। তারপর থেকে এই আন্দোলন শক্তিশালী, সংহত ও প্রসারিত করার চেষ্টা চলেছে। ভোগ্য পণ্য বণ্টনের সরকারী নীতিতে সমবায় ভাণ্ডারকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলনের উন্নতি ঘটছে। ভারতের সমস্ত জেলায় কেন্দ্রীয় বা পাইকারী সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে দেশে মোট প্রায় ১৩ হাজার ১ শতটি প্রাথমিক ভোগকারী সমবায় সমিতি[115], ৪০০টি কেন্দ্রীয় বা পাইকারী ভোগকারী সমবায় সমিতি[116] ও ১৪টি জাতীয় সমবায় ভোগকারী ফেডারেশন[117] ছিল। সর্বোপরি রয়েছে জাতীয় সমবায় ভোগকারী ফেডারেশন[118]। কেন্দ্রীয় বা পাইকারী ভোগকারী সমবায় সমিতিগুলির শাখার সংখ্যা ছিল সেসময় ৩০৫০। ভোগকারী সমবায় সমিতিগুলির মোট খুচরা বেচাকেনার পরিমাণ ছিল (১৯৭১-৭২) প্রায় ২৫০ কোটি টাকা।

অধিবিপণি বা সুপার বাজার (SUPER MARKET)

সংজ্ঞা: সুপার বাজার বা অধিবিপণি বা সংযুক্ত বিপণির সন্তোষজনক সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর একটি কারণ বিভাগীয় বিপণির সাথে এর মিল, যদিও অমিলও

115. Primary Consumer Co-operatives.
116. Central Wholesale Consumer Corporation.
117. National Co-operative Consumers' Federation.
118. National Co-operative Consumers' Federation.

আছে। ফিলিপ ও ডানকান[119]-এর মতেঃ "সুপার বাজার হল সাধারণত এমন একটি বিভাগীয় বিপণি যা বহুবিচিত্র ধরনের পণ্য বিক্রয় করে এবং যেখানে খাদ্য বিক্রয়, যার বেশীর ভাগটাই ভোগকারীকে নিজের হাতে তুলে নিতে হয়, একটা বড়ো ভূমিকা নিয়ে থাকে।"

বৈশিষ্ট্য ঃ সুপার বাজারের সাথে অন্যান্য সব ধরনের খুচরা ব্যবসায়েরই কিছু না কিছু মিল হয়তো আছে, কিন্তু সুপার বাজারে বৈশিষ্ট্যগুলি আর কোনও খুচরা বাজারেরই নাই। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ (১) একই ছাদের নিচে ক্রেতাদের কাছে বহু রকমের পণ্য বিক্রয় করা হয়। (২) মূলত এই জাতীয় খুচরা ব্যবসায়ী বিভাগীয় বিপণির ভিত্তিতে গঠিত। (৩) এখানে ক্রেতাকে সাহায্য করার জন্য সেলসম্যান বা বিক্রয় কর্মচারী থাকে না; ক্রেতাকেই নিজ পছন্দমত জিনিসটি নিজের হাতে তুলে নিতে হয় ("সেলফ সার্ভিস")। (৪) এখানে ক্রেতাদের কয়েকটি সীমাবদ্ধ সুবিধা, যেমন, ক্রমাগত ক্রয় (নন-স্টপ শপিং), বাতানুকূল পরিবেশ, ক্রেতাদের গান-বাজনা শোনানো, বিশ্রাম স্থানের ব্যবস্থা, সঙ্গের শিশুদের জন্য খেলাঘরের ব্যবস্থা, ইত্যাদির বন্দোবস্ত থাকে। (৫) কম দাম ও বিক্রয় চাতুর্য।

প্রকৃতি ঃ (১) সাধারণত বড় শহরের দোকান বাজারের প্রধান কেন্দ্রে বিভাগীয় বিপণির ভিত্তিতে সুপার বাজার স্থাপিত হয়। বিভিন্ন বিভাগের এক একটিতে এক একটি পণ্য বিক্রয় হয়। (২) এই বাজারে কোনও বিভাগেই কোনও সেলসম্যান বা বিক্রয়কর্মী থাকে না। (৩) প্রতি বিভাগে কতকগুলি ছোট ছোট ট্রলি বা হাত-ঠেলা গাড়ি থাকে। ক্রেতা তার একটি নিয়ে তাতে বিভাগের পর বিভাগ থেকে তার পছন্দ মত দ্রব্যগুলি ট্রলিতে তুলে নিয়ে সবশেষে বাইরে যাওয়ার দরজার কাছে অবস্থিত ক্যাশিয়ারের কাউন্টারে গিয়ে দাম মিটিয়ে দেয়। (৪) দ্রব্যগুলি প্যাকেট করা থাকে ও তাতে দাম লেখা থাকে। তাই দামের হিসাব করতে অসুবিধা হয় না। (৫) সাধারণত নগদেই এখানে বিক্রয় করা হয়। (৬) এখানে ক্রেতাদের অনেক সময় নিয়ে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভাগ থেকে জিনিস কেনার ব্যবস্থা, গোটা দালানটি বাতানুকূল করার ব্যবস্থা, ক্রেতার ক্লান্তি দূর করার জন্য গানবাজনা শোনানোর ব্যবস্থা, বিশ্রাম করার জায়গা, সঙ্গের শিশুদের জন্য খেলাঘর ইত্যাদি "সীমাবদ্ধ সেবা"-র বন্দোবস্ত থাকে।

সুবিধা ঃ (১) **ক্রেতারা এখানে কম দরে পছন্দসই জিনিস কিনতে পারে।** কারণ, খুব বেশী পরিমাণে একসাথে দ্রব্য ক্রয়, অল্প সময়ের মধ্যে বেশী পরিমাণে এবং নগদে বিক্রয়, পরিচালনার ব্যয় সংকোচ ও অল্প মুনাফার নীতি সুপার বাজারগুলি অনুসরণ করে থাকে। (২) বিক্রয়কর্মী রাখে না এবং ক্রেতাদের জন্য নানারকমের সুবিধার বন্দোবস্ত এখানে করা হয় না বলে সুপার বাজারের **পরিচালনার খরচ কম পড়ে।** (৩) বিক্রয়কর্মীর চাপে পড়ে কিনতে হয় না, নিজেরা **পছন্দ মতো** এবং যতক্ষণ খুশী ঘুরে ঘুরে জিনিসগুলি **কেনার স্বাধীনতা** ক্রেতারা এখানে ভোগ করে। (৪) কম দরে বিক্রয় এবং শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে সুপার বাজার অনেক বেশীসংখ্যক ক্রেতা আকর্ষণ করতে পারে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশী পরিমাণে বিক্রয় করতে পারে। সুতরাং **লেনদেন অনেক বেশী হয়।**

অসুবিধা ঃ (১) এজন্য বিরাট বাড়ি ভাড়া নিতে, বিভাগগুলি সাজাতে, বিপুল পরিমাণ পণ্য মজুদ করতে বিরাট পরিমাণ পুঁজি লাগে। (২) অন্য যে কোনও ধরনের খুচরা ব্যবসায়ের তুলনায় সুপার বাজার চালাতে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনেক বেশী দক্ষতা প্রয়োজন হয়। তা না হলে সফল হওয়া যায় না। (৩) অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের খুচরা ব্যবসায়ীরা খরিদ্দারদের প্রতি যে মনোযোগ দিতে

---

119. **Phillips and Duncan.**

পারে, তাদের যে পরিমাণ সেবা যত্ন করতে পারে, সুপার বাজার তা পারে না। এখানে কর্তৃপক্ষ ও খরিদ্দারের সঙ্গে কোনও সরাসরি সম্পর্কই থাকে না। সবই যান্ত্রিকভাবে চলে। অনেক খরিদ্দারেরা তা পছন্দ নয়। (৪) সব পণ্য সুপার বাজারে বিক্রির উপযোগী নয়। বিশেষত যেসব পণ্য বিক্রয় করতে হলে খরিদ্দারের কাছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য বিক্রয়কর্মী লাগে, তা সুপার বাজারে বিক্রি করা যায় না। কারণ এখানে বিক্রয়কর্মী নিয়োগ করা হয় না। প্রধানত খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যই এই বাজারের উপযুক্ত। (৫) এ কেবল জনাকীর্ণ অতি বড় শহরেরই উপযোগী। খুব বেশী খরিদ্দার না হলে সুপার বাজার চালানো যায় না। তাতে তার খরচ ওঠে না।

সুপার বাজার ও বিভাগীয় বিপণির পার্থক্য : সুপার বাজার বিভাগীয় বিপণির ভিত্তিতে গঠিত হলেও, বিভাগীয় বিপণির সাথে তার যথেষ্ট পার্থক্য আছে : (১) সুপার বাজারে খাদ্য সামগ্রীর বিক্রয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান স্থান নেয়; বিভাগীয় বিপণিতে তা হয় না। (২) সুপার বাজারে কোনও বিক্রয়কর্মী নিয়োগ করা হয় না, কিন্তু বিভাগীয় বিপণিতে বিক্রয়কর্মী লাগে। (৩) সুপার বাজারে যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুরে ঘুরে খরিদ্দাররা কেনাকাটা করতে পারে, বিভাগীয় বিপণিতে তা হয় না। (৪) সুপার বাজারে খরিদ্দারদের কতকগুলি "সীমাবদ্ধ সুবিধা"—মাত্র দেওয়া হয়, বিভাগীয় বিপণিতে তা হয় না। ক্রেতাদের বাড়িতে তাদের কেনা জিনিসগুলি বিনা পারিশ্রমিকে পেঁৗছে দেবার ব্যবস্থার মত কতকগুলি অবাধ সুবিধা ("ফ্রী সারভিস") বিভাগীয় বিপণিতে করা হয়ে থাকে। (৫) সুপার বাজারে সাধারণত কেবল নগদেই জিনিস বিক্রি করা হয়। বিভাগীয় বিপণিতে পরিচিত খরিদ্দারদের বাকীতেও পণ্য বিক্রি করা হতে পারে।

ভারতে সুপার বাজার : আসল সুপার বাজার যাকে বলে তা এখনও ভারতে দেখা দেয়নি। ভোগকারী সমবায় ভাণ্ডারের ভিত্তিতে একধরনের সুপার বাজার এখানে স্থাপিত হতে দেখা যাচ্ছে মাত্র। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার অমূল্যায়নের পর দ্রব্য স্তর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রেতাদের রক্ষা করার জন্য বড় বড় শহরগুলিতে সুপার বাজার স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯৬৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৮২টি সুপার বাজার স্থাপিত হয়।

নূতন দিল্লীর সুপার বাজার* : নূতন দিল্লীর কনট্ সার্কাসে অবস্থিত 'দি কো-অপারেটিভ স্টোরস্ লিঃ' নামক একটি সমবায় সমিতির দ্বারা কনট্ সার্কাসে গোবিন্দবল্লভ পন্থ সুপার বাজারটি স্থাপিত হয়েছে। যে কেউ এই সমবায় সমিতিটির সদস্য হতে পারে।

সমিতির সদস্যদের নিকট থেকে সংগৃহীত শেয়ার পুঁজিবাবদ ২ লক্ষ টাকা, সরকারের নিকট থেকে শেয়ার পুঁজি বাবদ সংগৃহীত ১৯ লক্ষ টাকা এবং সরকারী ঋণ ১৬ লক্ষ টাকা, মোট ৩৭ লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে এই সুপার বাজারটি স্থাপিত হয়েছে। নূতন দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নিকট থেকে নূতন দিল্লীর কনট্ সার্কাসে অবস্থিত একটি ছয়তলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে তাতে সুপার বাজারটি স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া নূতন দিল্লীর অন্যত্র দুটি অঞ্চলে, যথাক্রমে প্যাটেল নগরে সমবায় সমিতির নিজ বাড়িতে এবং আই. এন. এ. কলোনীতে 'আপনা বাজার' নামে সুপার বাজারের দুটি শাখা স্থাপিত হয়েছে।

সুপার বাজার ও তার দুটি শাখাতে মোট ১১ শত কর্মচারী নিযুক্ত আছে এবং তাতে দৈনিক মোট ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় হয়। সুপার বাজারে

* New Delhi Super Bazar.

নূতন দিল্লীর সুপার বাজারের নক্সা
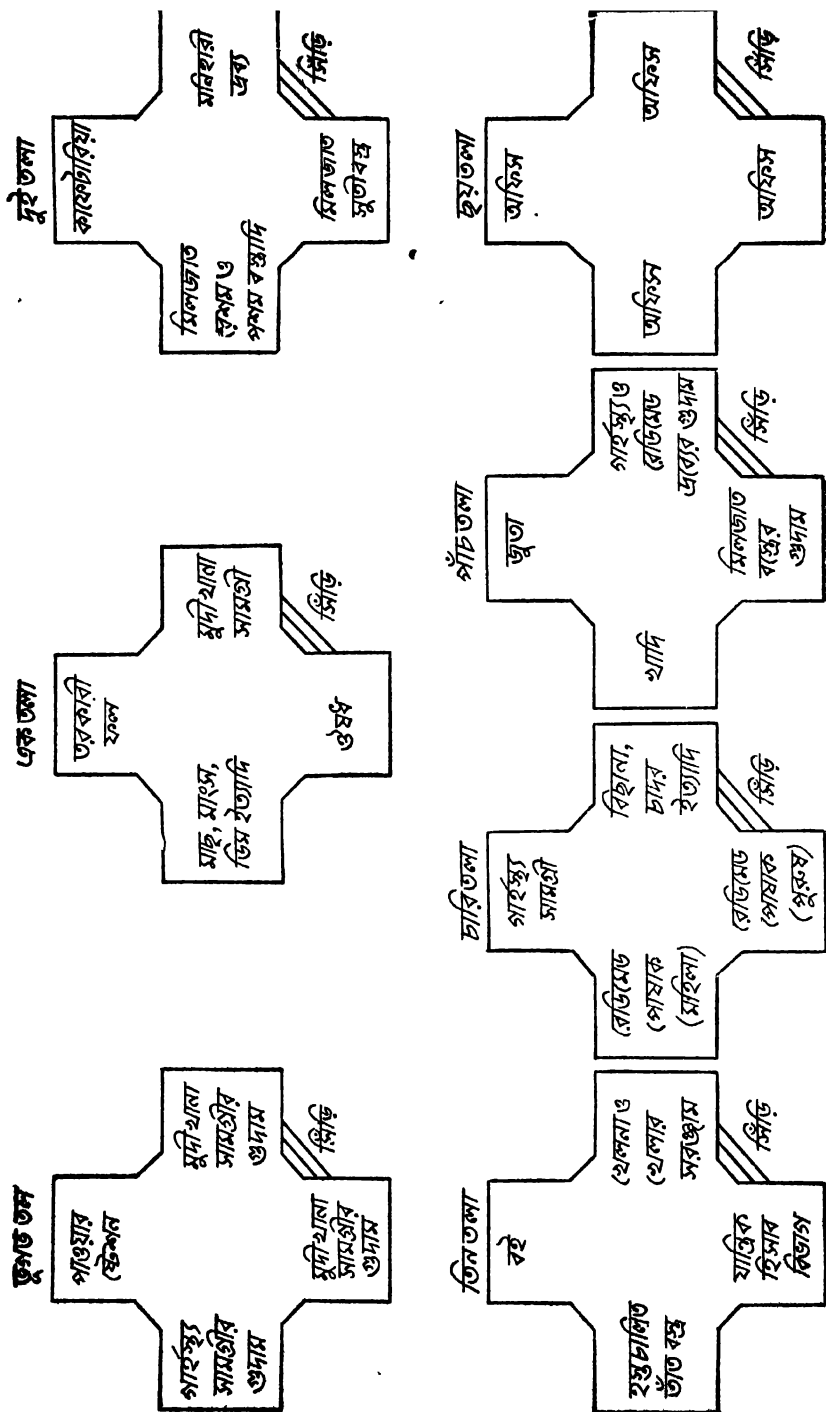
প্রতিদিন প্রায় ১ লক্ষ খরিদ্দারের ও আপনা বাজার দুটিতে প্রত্যহ প্রায় ৪০ হাজার খরিদ্দারের আগমন ঘটে।

চেয়ারম্যান
পরিচালক পর্ষৎ
|
জেনারেল ম্যানেজার
|
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
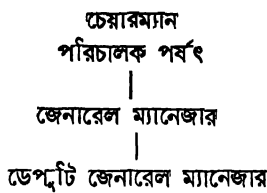
প্রশাসনিক অফিস	এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার	এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার	কন্ট্রোলার অব একাউন্টস্	পারসোনেল অফিস
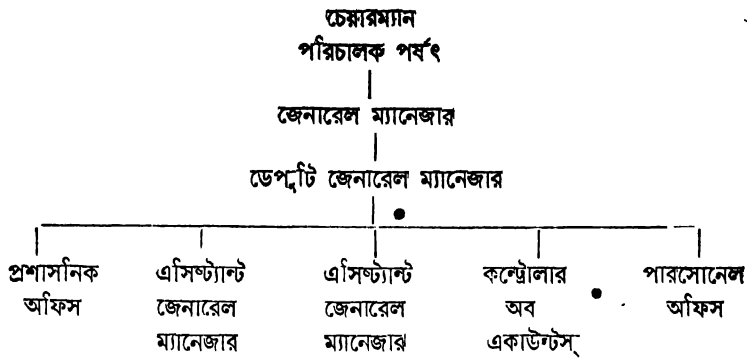
উপরে সুপার বাজারের প্রশাসনিক কাঠামোর রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে। পরিচালক পর্ষৎ ও চেয়ারম্যানের পরিচালনাধীনে একজন জেনারেল ম্যানেজার, একজন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, প্রশাসনিক অফিস, দুজন এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, কন্ট্রোলার অব একাউন্ট্স্ ও পারসোনেল অফিসের সাহায্যে ব্যবস্থাপনার কর্তব্য-গুলি সম্পাদন করে থাকেন।

নূতন দিল্লীর কনট্ সার্কাসের যে ছয়তলা বাড়িটিতে সুপার বাজার অবস্থিত তার ভূগর্ভে আর একটি তলা আছে, তাতে এক অংশে পাওয়ার স্টেশন অবস্থিত এবং বাকী অংশ গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। **একতলায়** মুদীখানার দ্রব্য-সামগ্রী, শুষ্ক ফল, তরকারি ও টাটকা ফল, মাছ, মাংস, ডিম, মিষ্টি খাবার, ঔষধ ইত্যাদি বিক্রয় হয়। মুদীখানায় দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় বিভাগে কোন বিক্রয় কর্মচারী নেই, প্যাকেটে নানা রূপ ওজনের সামগ্রী থাকে, খরিদ্দাররা তা পছন্দমত তুলে নিয়ে ক্যাশিয়া-রের কাছে গিয়ে দাম দেয়। **দ্বিতীয় তলায়** মনোহারী দ্রব্যাদি, কাফেটারিয়া, মিল-জাত সুতী, পশম, রেশম ও নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতি বস্ত্র বিক্রয় বিভাগ। **তৃতীয় তলায়** বিবিধ খেলনা দ্রব্য, খেলাধুলোর সাজসরঞ্জাম, সাইকেল, বই, কাগজ কলম পেন্সিল ইত্যাদি, হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র বিভাগ ও ব্যাঙ্ক এবং যান্ত্রিক হিসাব বিভাগ। **চতুর্থ তলায়** মাটি ও চীনা মাটির বাসন, বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম, বাসনপত্র, প্লাস্টিক দ্রব্যাদি, ট্রানসিসটর, হোসিয়ারী দ্রব্য, রেডিমেড জামা কাপড় ইত্যাদি নানাবিধ গার্হস্থ সামগ্রী বিভাগ। **পঞ্চম তলায়** জুতা, স্যুটকেশ প্রভৃতি নানারূপ চর্মনির্মিত দ্রব্য ও খাদি বিভাগ। **ষষ্ঠ তলায়** সুপার বাজারের অফিস।

খুচরা কারবারের মূল্য প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি

DIFFERENT METHODS OF PAYMENT IN RETAIL SALES

সকল প্রকারের খুচরা কারবারেই সাধারণত নগদ দামেই বেচাকেনা হয়ে থাকে। তবে একমাত্র বিভাগীয় বিপণির ক্ষেত্রেই কিছু কিছু বাকীতে বিক্রয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

এ ছাড়া আধুনিক কালে, অনেক দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণত ক্রেতা-দের পক্ষে একেবারে দাম দিতে অসুবিধা হয় বলে বিভিন্ন দেশে, বিলম্বে মূল্য প্রদানের পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। তা দু'রকমের। যথা,—(১) ভাড়া ক্রয় ব্যবস্থা[১২০] এবং (২) বিলম্বিত মূল্য প্রদান পদ্ধতি[১২১]।

120. Hire Purchase System.
121. Deferred Payment or Instalment System.

নূতন দিল্লীর সুপার বাজারের নক্সা

প্রতিদিন প্রায় ১ লক্ষ খরিদ্দারের ও আপনা বাজার দ্বটিতে প্রত্যহ প্রায় ৪০ হাজার খরিদ্দারের আগমন ঘটে।

উপরে স্বপার বাজারের প্রশাসনিক কাঠামোর রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে। পরিচালক পর্ষৎ ও চেয়ারম্যানের পরিচালনাধীনে একজন জেনারেল ম্যানেজার, একজন ডেপ্রটি জেনারেল ম্যানেজার, প্রশাসনিক অফিস, দ্বজন এসিষ্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, কন্ট্রোলার অব একাউন্ট্স্ ও পারসোনেল অফিসের সাহায্যে ব্যবস্থাপনার কর্তব্য-গ্বলি সম্পাদন করে থাকেন।

ন্বতন দিল্লীর কনট্ সার্কসেব যে ছয়তলা বড়িটিতে স্বপার বাজার অবস্থিত তার ভূগর্ভে আর একটি তলা আছে, তাতে এক অংশে পাওয়ার স্টেশন অবস্থিত এবং বাকী অংশ গ্বদাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। **একতলায়** ম্বদীখানার দ্রব্য-সামগ্রী, শ্বুক ফল, তরকারি ও টাটকা ফল, মাছ, মাংস, ডিম, মিষ্টি খাবার, ঔষধ ইত্যাদি বিক্রয় হয়। ম্বদীখানায় দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় বিভাগে কোন বিক্রয় কর্মচারী নেই, প্যাকেটে নানা র্বপ ওজনের সামগ্রী থাকে, খরিদ্দাররা তা পছন্দমত তুলে নিয়ে ক্যাশিয়া-রের কাছে গিয়ে দাম দেয়। **দ্বিতীয় তলায়** মনোহারী দ্রব্যাদি, কাফেটারিয়া, মিল-জাত স্বতী, পশম, রেশম ও নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতি বস্ত্র বিক্রয় বিভাগ। **তৃতীয় তলায়** বিবিধ খেলনা দ্রব্য, খেলাধ্বলার সাজসরঞ্জাম, সাইকেল, বই, কাগজ কলম পেন্সিল ইত্যাদি, হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র বিভাগ ও ব্যাঙ্ক এবং যান্ত্রিক হিসাব বিভাগ। **চতুর্থ তলায়** মাটি ও চীনা মাটির বাসন, বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম, বাসনপত্র, প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি, ট্রানসিসটর, হোসিয়ারী দ্রব্য, রেডিমেড জামা কাপড় ইত্যাদি নানাবিধ গার্হস্থ সামগ্রী বিভাগ। **পঞ্চম তলায়** জ্বতা, স্যুটকেশ প্রভৃতি নানার্বপ চর্মনির্মিত দ্রব্য ও খাদি বিভাগ। **ষষ্ঠ তলায়** স্বপার বাজারের অফিস।

খ্বচরা কারবারের ম্ল্য প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি

DIFFERENT METHODS OF PAYMENT IN RETAIL SALES

সকল প্রকারের খ্বচরা কারবারেই সাধারণত নগদ দামেই বেচাকেনা হয়ে থাকে। তবে একমাত্র বিভাগীয় বিপণির ক্ষেত্রেই কিছ্ব কিছ্ব বাকীতে বিক্রয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

এ ছাড়া আধ্বনিক কালে, অনেক দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণত ক্রেতা-দের পক্ষে একেবারে দাম দিতে অস্ববিধা হয় বলে বিভিন্ন দেশে, বিলম্বে ম্ল্য প্রদানের পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। তা দ্ব'রকমের। যথা,—(১) ভাড়া ক্রয় ব্যবস্থা[১২০] এবং (২) বিলম্বিত ম্ল্য প্রদান পদ্ধতি[১২১]।

---

120. Hire Purchase System.
121. Deferred Payment or Instalment System.

[illegible] ভাড়া ক্রয় ব্যবস্থাঃ ভাড়া ক্রয় অথবা [illegible]
[illegible] তার দাম পায় বলে এই পদ্ধতিতে দ্রব্য কিনতে [illegible]
পারে। কারণ বিক্রেতা দ্রব্যটির দামের সাথে যত দিনে তার মূল্য শোধ না হবে [illegible]
জন্য তার উপর সুদও যোগ করে।

ভাড়া ক্রয় ব্যবস্থাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তিটি আসলে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি নয়। চুক্তি অনুযায়ী যতদিনে পূর্ণমূল্য শোধ না হয় ততদিন পর্যন্ত ক্রেতা দ্রব্যটির প্রকৃত মালিক হয় না। ব্যবহারকারী থাকে মাত্র। ক্রেতা ততদিন পর্যন্ত দ্রব্যটি ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু বিক্রয়ের দ্বারা হস্তান্তর করতে পারে না।

দ্রব্যের মূল্য সাধারণত কয়েকটি মাসিক কিস্তিতে বিভক্ত করা হয় এবং প্রথম কিস্তির পরিমাণ সামান্য বেশী ধার্য করা হয়। প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে ক্রেতা দ্রব্যটি নিয়ে যায় ও ব্যবহার করতে থাকে এবং পরে নির্দিষ্ট সময়মত অন্যান্য কিস্তি প্রদানের জন্য দায়ী থাকে। কিস্তি বাকী পড়লে বিক্রেতা দ্রব্যটি ফেরত নিয়ে যেতে পারে এবং ইতিমধ্যে কিস্তিবাবদ যত টাকা দেওয়া হয়েছে তা ভাড়াবাবদ দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। সমস্ত কিস্তি শোধ করা হলে তবেই দ্রব্যটির উপর ক্রেতার স্বত্ব জন্মায়।

২. **বিলম্বিত মূল্য প্রদানের পদ্ধতিঃ** কিস্তিবন্দী পদ্ধতি ক্রেতার দিক থেকে অসুবিধাজনক হওয়ায় পরবর্তীকালে তার সংশোধন করে আর এক ধরনের মূল্য প্রদান পদ্ধতি প্রচলিত হয়; তা বিলম্বিত মূল্য প্রদান পদ্ধতি নামে পরিচিত।

এই পদ্ধতিতে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে প্রথম কিস্তি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যটিতে ক্রেতাব স্বত্ব জন্মায় ও সে মালিক বলে গণ্য হয়। কিস্তি প্রদানে অক্ষম হলে বিক্রেতা তার দ্রব্য ফেরত নিতে পারে বটে, কিন্তু ক্রেতা তার প্রদত্ত মূল্য বাবদ, সম্ভবক্ষেত্রে দ্রব্যের আনুপাতিক অংশ রেখে দিতে পারে।

সুবিধাঃ ১. বিক্রেতার দিক থেকে এটি লাভজনক। কারণ দ্রব্যের মূল্য একসঙ্গে পরিশোধ করতে হয় না বলে ক্রেতারা এই পদ্ধতিতে বেশী করে ক্রয় করে। সুতরাং মোট বিক্রয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২. বিক্রেতার দিক থেকে আর একটি সুবিধা এই যে, কিস্তি দিতে ক্রেতা অপারগ হলে বিক্রেতা তার দ্রব্যটি ফেরত পেতে পারে। সুতরাং অন্যান্য কারবারীর মত অনাদায়ী দেনা[১২২] বাবদ বিক্রেতার কোন লোকসান হয় না।

৩. বিক্রেতার আর একটি সুবিধা এই যে, এই পদ্ধতিতে তার সাধারণ মুনাফা ছাড়াও যে টাকা খাটে, তার উপর সুদ পর্যন্ত ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করা যায়।

৪. ক্রেতার দিক থেকে সুবিধা এই যে, যাদের মাসিক বা সাপ্তাহিক আয় নির্দিষ্ট হওয়ায় একসঙ্গে বেশী পণ্য বা বেশী দামের পণ্য কেনা সম্ভব হয় না, তারা এই ব্যবস্থায় সহজেই বেশী দামের দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার করতে পারে। এই ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার ফলেই আজকাল সীমাবদ্ধ আয়সম্পন্ন শ্রেণীর মানুষেরও নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি বা বিভিন্ন প্রকারের আধুনিক জীবনযাপনের দ্রব্যসামগ্রী, যথা রেডিও, টেলিভিসন টাইপরাইটার, সাইকেল প্রভৃতি কেনা সম্ভব হয়েছে এবং সেসবের ব্যবহার বেড়েছে।

অসুবিধাঃ ১. বিক্রেতাদের দিক থেকে অসুবিধা এই যে, এই পদ্ধতিতে দলিলপত্র সম্পাদন, চিঠিপত্র লেখালেখি, ক্রেতাকে তাগিদ দেওয়া প্রভৃতি নানারূপ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হয়।

২. বিক্রেতাদের দিক থেকে দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, সাধারণত চড়তির বাজারে বিক্রয় বাড়ে বটে, কিন্তু মন্দার বাজারে অধিকাংশ ক্রেতাই কিস্তি শোধ দিতে অপারগ হয়ে পড়ে এবং বিক্রয়ও কমে যায়।

122. Bad Debt.

[illegible]
[illegible] বা দ্রব্য ফেরত পাওয়ার জন্য মামলা-মকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়তে হয়।

৪. বিক্রেতাদের দিক থেকে চতুর্থ অসুবিধা এই যে, এই জাতীয় মূল্য-প্রদান [illegible] সর্বপ্রকার দ্রব্যসামগ্রীর বেলায় চালু করা যায় না। শুধু যে সকল ভোগ্যপণ্য অধিককাল স্থায়ী[123] যথা—বাড়ি, গাড়ি, রেডিও, ঘড়ি ইত্যাদি, তাদের ক্ষেত্রেই এই কারবার চলে।

৫. ক্রেতার দিক থেকে অসুবিধা এই যে, সদ্য দাম দিতে হবে না বলে লোভে পড়ে অনেক সময় তারা নিজ সামর্থ্যের অতিরিক্ত দ্রব্য কিনে অতিরিক্ত ঋণের বোঝা গ্রহণ করে।

মধ্যস্থ কারবারীর বিলোপসাধন
ELIMINATION OF MIDDLEMEN

পণ্য বণ্টন প্রণালীতে পাইকারী ব্যবসায়ী, খুচরা ব্যবসায়ী ও অন্যান্য মধ্যস্থ কারবারীদের রাখা উচিত কিনা তা নিয়ে বর্তমানে প্রবল বিতর্ক চলেছে। কারও অভিমত, মধ্যস্থ কারবারীদের রাখা উচিত কারণ, তারা সমাজের পক্ষে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে, উৎপাদক ও ভোগ-ব্যবহারকারীর পক্ষে দরকারী কাজ করে থাকে। কেউ আবার মধ্যস্থ কারবারীদের তুলে দেবার পক্ষে দৃঢ় মত পোষণ করেন। ইদানীং-কালে উৎপাদনকারীদের মধ্যেও এই ধারণা বেশী করে প্রচলিত হচ্ছে যে, মধ্যস্থ কারবারীদের উপর নির্ভরশীল না থেকে সরাসরি ভোগকারী ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করাই শ্রেয়ঃ।

মধ্যস্থ কারবারীদের রাখার সপক্ষে যুক্তি: যাঁরা মধ্যস্থ কারবারীদের রাখার পক্ষপাতী তাঁদের প্রধান যুক্তিগুলি হল—(১) তারা ঋণ দিয়ে, বিক্রি করার ঝুঁকি নিয়ে, উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে, বিবিধ দ্রব্য একস্থানে সংগ্রহ ও বণ্টন করে উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উভয়েরই সেবা করে এবং তা সুদক্ষভাবে ও কম খরচে করে।

(২) উৎপাদনকারীদের তারা পণ্য বিক্রয়ে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়।

(৩) উৎপাদনেব ক্ষেত্রে যেমন শ্রমের বিভাগ ও বিশেষায়ণ দরকার, তেমনি পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে না কেন? মধ্যস্থ কারবারীদের বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ রূপেই পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে থাকতে দেওয়া উচিত।

(৪) মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা না থাকলে ভোগ ও ব্যবহারকারীদের যেমন উৎপাদকদেব সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে অসুবিধা হবে, তেমনি উৎপাদকদেরও ভোগকারী ও ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ করা সহজ হবে না।

(৫) মধ্যস্থ কারবারীদের বিলোপ করা হলেই যে পণ্য বণ্টনের খরচ কমে যাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বিকল্প ব্যবস্থায় খবচ বেশীও পড়তে পারে।

মধ্যস্থ কারবারীদের বিপক্ষে যুক্তি: যাঁরা মধ্যস্থ কারবারীদের বিলোপ করার পক্ষপাতী তাঁদের প্রধান যুক্তিগুলি হল,—(১) মধ্যস্থ কারবারীরা মোটা কমিশন নিয়ে ও অন্যান্য নানান কারচুপি করে বেশী পারিশ্রমিক নেয়। সেকারণে অযথা পণ্যের দাম বেড়ে যায়। যে পণ্যের বিক্রয়ে যত বেশী মধ্যস্থ কারবারী নিযুক্ত রয়েছে তার দামও তত বেশী হয়। (২) মধ্যস্থ কারবারীরা পণ্য উৎপাদনের কোনও ঝুঁকি নেয় না, অথচ, শ্রমিক-বিরোধ প্রভৃতি কারণে উৎপাদনে গোলযোগ হলে, বা তাছাড়াও মাঝে মাঝে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে সুবিধা বুঝে চড়া দামে পণ্য বিক্রি করে মুনাফা লোটে। এটা সমাজবিরোধী আচরণ। (৩) তারা উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ভোগকারী বা ব্যবহারকারীর কাছে পণ্যের যোগানটি দ্রুত ও অব্যাহত না রেখে,

---

123. Durable.

[illegible] করে পণ্য বণ্টনে বিঘ্ন সৃষ্টি [illegible]
(অর্থাৎ পণ্য মজুদ করার ও তা থেকে দরকার মতো খরিদ্দারদের সরবরাহ করার) যে কাজটি তাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য তা তারা করে না। (ঙ) বর্তমানে মধ্যস্থ কারবারীদের সাহায্য ছাড়াই উৎপাদনকারীরা সরাসরি ভোগকারী ও ব্যবহারকারীদের কাছে পণ্য বিক্রয়ের নানা উপায় উদ্ভাবন করে ফেলেছে। ক্রেতাসমবায় ভাণ্ডারও এরূপ আরেকটি উপায়। সুতরাং আজকের দিনে মধ্যস্থ কারবারীদের আর প্রয়োজন নেই।

উপসংহার ঃ মধ্যস্থ কারবারীদের সপক্ষে ও বিপক্ষে এই যুক্তিগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মধ্যস্থ কাববারীবা যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজই করে না, তা নয়। বিশেষ কবে ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে পণ্য বণ্টন ব্যবস্থায় ওই কাজগুলি অপবিহার্যও বটে। তবে তা থেকে একথা মনে কবলে ভুল হবে যে, পণ্য বণ্টন ব্যবস্থায় তারা অপবিহার্য। কাবণ কাজগুলি অপবিহার্য হলেও, তা সম্পাদন করার জন্য তারা অপবিহার্য নয। অন্য কোনও ব্যবস্থাব দ্বাবাও তা সম্পাদন করা যায। এজন্য পণ্য বণ্টন ব্যবস্থাব সম্পূর্ণ ব্যাশন্যালাইজেশন ও পুনর্গঠন প্রযোজন। তাহলে ক্রমশঃ মধ্যস্থ কাববাবীব সংখ্যা কমিযে এনে শেষ পর্যন্ত তা বিলোপ কবা সম্ভব হবে। আবও সবাসবি পণ্য বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন কবা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যেই যে মধ্যস্থ কাববাবীব সংখ্যা কমানোব চেষ্টা শুরু হযেছে, বহু-শাখা বিপণি, বিপণি মালা, বিভাগীয বিপণি ও ডাক মাবফৎ ব্যবসায প্রভৃতি তাবই প্রমাণ।

১৮

গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা
WAREHOUSING

গুদামজাতকরণ কাকে বলে : দূর অথবা নিকট ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী নির্দিষ্ট স্থানে সযত্নে মজুদ ও গুণ যাতে নষ্ট না হয় এরূপভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা, গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা বলে পরিচিত। পণ্যসামগ্রীর এরূপ মজুদ ও সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল, স্থান ও কালের ব্যবধান অতিক্রম করা। সব পণ্য-সামগ্রী দেশের সর্বত্র বা সকল সময়ে উৎপাদিত হয় না। এজন্য, উৎপাদনকারী অঞ্চল থেকে দূরবর্তী বাজারে চাহিদা মত তা পাঠাতে হয়। সুতরাং সযত্নে তা মজুদ করে রাখতে হয় এবং প্রয়োজনমত গুদাম থেকে তা সরবরাহ করতে হয়। গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা, স্থান ও কালের ব্যবধান অতিক্রম করে দ্রব্যসামগ্রীর এই ভোগ ও ব্যবহার অব্যাহত রাখার প্রধান সহায়ক।

গুদামগুলি তিন রকম কেন্দ্রে স্থাপিত হতে পারে। (১) উৎপাদন কেন্দ্রে ঐগুলি স্থাপিত হলে সহজেই স্থানীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে দ্রব্যগুলি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হতে পারে। (২) গুদামগুলি পরিবহণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হলে দ্রব্যগুলি সংগ্রহের ও বাজারে পাঠাতে সুবিধা অধিক হয়। (৩) গুদামগুলি বাজারে বা ব্যবহারের কেন্দ্রে স্থাপিত হলে বাজারে দ্রব্যগুলি দরকার মত অবিলম্বে সরবরাহ করার সুবিধা পাওয়া যায়। তাতে পরিবহণ ব্যয় কমে।

গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা ছাড়া উৎপন্ন সামগ্রীগুলি প্রয়োজনমত উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ভোগকেন্দ্র পাঠানো, গুণাগুণ অক্ষত রেখে এক সময়ে উৎপন্ন দ্রব্যের অন্য সময়ে ব্যবহার প্রভৃতি সম্ভব হত না।

গুদামসমূহের শ্রেণীবিভাগ : গুদামগুলির দু'রকম শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। যথা—(ক) গুদামজাত দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে, এবং (খ) মালিকানা অনুসারে।

ক. গুদামজাত দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে গুদামগুলিকে আবার দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

১ কাঁচামালের গুদাম[1]।

২ তৈয়ারী পণ্যের গুদাম[2]।

খ. মালিকানা অনুসারে গুদামগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যথা—

১ ব্যক্তিগত গুদাম[3] : ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ কারবারের প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে কারবারের অঙ্গ হিসাবে গুদাম রাখে।

২ বেসরকারী গুদাম[4] : আর এক প্রকারের গুদাম আছে, তা কয়েকজন মিলে অংশীদারী, যৌথমূলধনী অথবা সমবায় কারবাররূপে গঠন করে। এই জাতীয় গুদাম যে-কোন ব্যবসায়ী ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করতে পারে।

৩ শুল্কাধীন গুদাম[5] : শুল্ক দেওয়ার আগে আমদানিকৃত শুল্কদেয় পণ্যগুলি

1. Warehousing for raw materials.
2. Warehousing for finished goods.
3. Private warehousing.
4. Warehousing for public use.
5. Bonded warehouse.

রাখার জন্য শুল্ককর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রণাধীন এই সব গুদামগুলি বন্দর এলাকায় স্থাপিত হয়।

শুল্কাধীন গুদাম (BONDED WAREHOUSE)

দেয়শুল্ক না দিলে মালিককে তার পণ্য অর্পণ করা হবে না—শুল্ককর্তৃপক্ষের কাছে এই অঙ্গীকারে[6] যে গুদামের মালিক আবদ্ধ থাকে, তা হল শুল্কাধীন গুদাম। সরকারী ব্যবহারজীবীর[7] নির্দেশমত ঐ অঙ্গীকারের শর্তগুলি স্থির হয়ে থাকে এবং তাতে মালিকের পক্ষে কয়েকজন জামিনদার[8] দিতে হয়।

শুল্ককর্তৃপক্ষ এই গুদামে রাখা দ্রব্যসামগ্রী প্রত্যক্ষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে। সরকারী তালাচাবি বন্ধ এই গুদাম সরকারী রক্ষীর পাহারাধীনে থাকে। এতে পণ্যদ্রব্য জমা দেওয়ার সময় মালিককে তার পূর্ণ তালিকা ও বিবরণ শুল্ককর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করতে হয়। একে গুদামজমার দাখিলা[9] বলে। এরপর শুল্ককর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করে অনুমোদন করলে জমা নেওয়ার আদেশ দেন। একে জমা নেবার আদেশ[10] বলে। এই লিখিত আদেশ প্রাপ্তির পর দ্রব্যগুলি গুদামে জমা লওয়া হয়। জমা লওয়ার সময় মালিককে যে রসিদ দেওয়া হয়, তাকে ওয়ারেন্ট[11] বলে। এর পর মালিক সম্পূর্ণ বা কিস্তিতে শুল্ক জমা দিলে, একসঙ্গে অথবা দফায় দফায় তার পণ্যসামগ্রী খালাস করতে পারে।

সুবিধা : ১. বিক্রয়ের সুবিধার জন্য এই গুদামে রক্ষিত অবস্থায় দ্রব্যগুলির প্রয়োজনমত, মান অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধকরণ[12], নমুনা প্রস্তুতকরণ[13], মিশ্রণ[14] এবং মোড়কবাঁধাই[15] প্রভৃতি সম্পাদন করার সুযোগ আমদানিকারীরা পায়।

২. কিস্তিতে পণ্যসামগ্রী খালাস করা যায় বলে একসঙ্গে শুল্কবাবদ বেশী অর্থ প্রয়োজন হয় না। যে পরিমাণ পণ্য ছাড়ানো হয় শুধুমাত্র তদনুপাতে শুল্ক জমা দিলেই চলে। সুতরাং প্রয়োজনবোধে এইরূপে আংশিকভাবে পণ্য খালাস করে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা ধীরে ধীরে বাদবাকী পণ্যের শুল্ক পরিশোধ করা যায়।

৩. এটি আমদানি ব্যবসায় ছাড়াও পুনঃরপ্তানি[16] ব্যবসায়ের বিশেষ সহায়ক। সাধারণত পণ্যদ্রব্য একবার আমদানি করে আবার তা রপ্তানি করলে, প্রথমে আমদানি শুল্ক জমা দিতে হয় ও পরে তা ফেরত পাওয়া যায়। কিন্তু শুল্কাধীন গুদামে ঐ আমদানি পণ্য জমা রেখে সেখান থেকে পুনরায় রপ্তানি করলে কোন আমদানি শুল্ক লাগে না বলে একবার শুল্ক জমা দেওয়া ও আবার তা ফেরত লওয়ার জন্য অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।

৪. অনুরূপভাবে আবগারী শুল্কদেয় রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক[17] জমা দেওয়া ও ফেরত লওয়া ইত্যাদির ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্য কারখানা থেকে সরাসরিভাবে পণ্যগুলি শুল্কাধীন গুদামে পাঠানো হয়। সেক্ষেত্রে আর কোন আবগারী শুল্কই লাগে না। এতে যে শুধু ঝঞ্ঝাট বাঁচে তাই নয়, জমা দিয়ে অনাবশ্যকভাবে টাকা ফেলে রাখতে হয় না।

৫. এই গুদামগুলি আধুনিক কায়দায়, বিজ্ঞানসম্মতরূপে নির্মিত, পণ্যসংরক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পরিচালিত ও নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থাযুক্ত থাকায় অল্প খরচে ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করে।

6. Bond. 7. State solicitor. 8. Sureties.
9. Entry for warehousing. 10. Landing order. 11. Warrant.
12. Grading. 13. Sampling. 14. Blending. 15. Packing.
16. Re-export. 17. Excise Duty.

গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার অর্থনীতিক গুরুত্ব
ECONOMIC IMPORTANCE OF WAREHOUSING

(১) গুদামে মজুদ থেকে চাহিদা মত বাজারে পণ্যের যোগান দিয়ে, পণ্যের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা মূল্যের স্থিরতা আনা সম্ভব হয়। (২) ছোট বড় সব ব্যবসায়ীরাই সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্থাপিত গুদামের সাহায্যে অল্পব্যয়ে পণ্য মজুদ করার সুবিধা পায়। নিজস্ব ব্যয়ে আলাদা গুদাম রাখতে হয় না। (৩) গুদামে পণ্য মজুদ করে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বাজারে বিক্রয়ের সুবিধা ভোগ করা চলে। এজন্য এতে কারবারের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে। (৪) বাজারের কাছাকাছি অঞ্চলে গুদামজাত করার দরুন, কম পরিবহণ খরচে ও সত্বর দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতাদের সরবরাহ করা যায়। এতে সময় ও পরিবহণ ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে। (৫) শুল্কাধীন গুদামে পুনঃরপ্তানি দ্রব্যের শুল্ক এবং ঐগুলি বন্দরের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় অতিরিক্ত পরিবহণ ব্যয় লাগে না। এতে পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় বাড়ে। (৬) শুল্কাধীন গুদামে পণ্য জমা রাখলে আবগারী শুল্ক-সংক্রান্ত যে সুবিধা পাওয়া যায়, তা রপ্তানি বাণিজ্যবৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক। (৭) শুল্কাধীন গুদামের অন্যান্য সুবিধাগুলি যথা, শ্রেণীবদ্ধকরণ, মিশ্রণ, নমুনা প্রস্তুতকরণ, মোড়কবাঁধাই ও খরিদ্দারগণের সামগ্রী পরিদর্শনের সুবিধা প্রদান প্রভৃতি পণ্য বিক্রয় বাড়াতে সাহায্য করে। (৮) গুদামে মজুদ পণ্যের রসিদ[18] হস্তান্তর করে সহজেই পণ্যের বিক্রয় সমাধা করা যায়। এতে পণ্য স্থানান্তর করতে হয় না বলে সময়, শ্রম ও অর্থ বাঁচে। (৯) প্রয়োজন হলে গুদামে মজুদ দ্রব্যের রসিদ ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক[19] রেখে সহজে ঋণ লওয়া যায়। (১০) গুদামে পণ্য মজুদ রেখে ব্যবসায়ী ও উৎপাদকরা সুবিধাজনক বাজার দরের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। (১১) স্বতন্ত্র কারবার হিসাবে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার দেশের শিল্প সম্প্রসারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। কারণ নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে উৎপাদন বাড়ে, সুতরাং ক্রমেই অধিকতর পরিমাণ দ্রব্যের মজুদ সংরক্ষণের জন্য বৃহদাকার গুদামের সংখ্যা বাড়ানো দরকার হয়। এই সব গুদামের নির্মাণে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। শিল্পপতিরা নিজেরা এজন্য অর্থবিনিয়োগ করলে, শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ সংকুচিত হবে। আর শিল্পে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখলে গুদামের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করতে পারে না। এতে মজুদের জন্য স্থানাভাবে উৎপাদন বাড়াতে অসুবিধা হয়। এজন্য সরকারী ও বেসরকারী গুদাম স্থাপিত হওয়ায় স্বল্প ভাড়ায় ঐ সব গুদামে নিরাপদে দ্রব্যসামগ্রী মজুদ করা চলে। এইরূপে একটি পৃথক শ্রেণীর সহায়ক-কারবার রূপে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা দেশের শিল্পায়নে সাহায্য করে থাকে।

ভারতের গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা (WAREHOUSING IN INDIA)

পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সব সময়েই রয়েছে। ভারতে বর্তমান অর্থনীতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যুগে এর গুরুত্ব আরও বেড়েছে। কিন্তু অনুন্নত দেশের অন্যতম ত্রুটি যথোপযুক্ত গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার অভাব ভারতের অর্থনীতিক কাঠামোর দুর্বলতা বাড়িয়েছে।

বর্তমানে দেশের গুদামগুলির অধিকাংশই কৃষিজাত ফসলের জন্য। তুলনায় শহরাঞ্চলে অবস্থিত শিল্পোৎপাদনের জন্য গুদাম আয়তনে বৃহত্তর হলেও সংখ্যায় অল্প। গুদামগুলিকে সংগঠনগত, অর্থাৎ মালিকানা ও পরিচালনার দিক দিয়ে বিচার করলে, চার শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।

১. **ব্যক্তিগত গুদাম ঃ** গ্রামে ও শহরে বড় বড় উৎপাদনকারীদের এবং ব্যবসায়ীদের

18. Warrant. 19. Hypothecation.

পণ্য রাখার জন্য নিজেদের গুদাম আছে; সেগুলির মালিকানা, পরিচালনা ও ব্যবহার সকলই একান্ত ব্যক্তিগত।

২. **বেসরকারী গুদাম :** এইগুলি কয়েকজন ব্যবসায়ী দ্বারা গঠিত অংশীদারী অথবা প্রাইভেট বা পাবলিক লিমিটেড কারবার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। তা অধিকাংশই শহরাঞ্চলে অথবা মফস্বলের গঞ্জ এলাকায় অবস্থিত। যে কোন উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী নির্ধারিত ভাড়ার পণ্য রাখার জন্য তা ব্যবহার করতে পারে। কলকাতার "দি বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়্যার-হাউস লিমিটেড" এর একটি দৃষ্টান্ত।

৩. **সমবায় গুদাম :** গ্রামাঞ্চলে ও মফস্বলে কৃষি ও কুটির শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী যথাযথরূপে ও নিরাপদে গুদামজাত করার ক্ষমতা দরিদ্র কৃষক ও কুটির শিল্পীদের নেই। সেজন্য গুদাম সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করে গুদাম স্থাপন করা হচ্ছে। মাদ্রাজে এই জাতীয় গুদামের সংখ্যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অধিক। সর্বত্র এই জাতীয় গুদাম প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার উৎসাহ দিচ্ছেন।

৪. **রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত গুদাম :** সারাভারত গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির (১৯৫১-৫২) গুদাম সংক্রান্ত সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলির দ্বারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৩৫০টি বৃহদাকার গুদাম স্থাপনের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। এই সব গুদাম তৈয়ারীর জন্য একটি কেন্দ্রীয় গুদাম করপোরেশন[২০] ও প্রতি রাজ্যে একটি রাজ্য গুদাম করপোরেশন[২১] প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব গুদামে উপযুক্ত ভাড়ায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা পণ্য রাখতে পারে। তা ছাড়া এদেব কাছে রক্ষিত পণ্যদ্রব্যের জমা রসিদ ব্যাংক বন্ধক রেখে ঋণ পাওয়ার সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সব জমা রসিদগুলি পুনর্বাট্টার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা গ্রহণযোগ্য। ১৯৭৩-৭৪ সালে কেন্দ্রীয় গুদাম করপোরেশনের গুদামেব সংখ্যা ১৪৬-এ এবং পণ্য ধারণ ক্ষমতা ১৬ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। রাজ্য গুদাম করপোবেশনেব সংখ্যা এখন ১৫টি, তাদের গুদামের সংখ্যা হল ৮১৮ এবং পণ্যধারণ ক্ষমতা হল ১৭ লক্ষ টন।

---

20. Central Warehousing Corporation.
21. State Warehousing Corporation.

১৭

ব্যবসায়ে ব্যবহৃত শব্দাদি ও দলিলপত্র
TERMS & DOCUMENTS IN TRADE

বহিঃশুল্ক এবং অন্তঃশুল্ক
CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

শুল্ক (DUTY)

সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকারের কর সকল দেশেই বসান হয়। এই করগুলি দুরকমের, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। দ্রব্যসামগ্রীর উপর কর পরোক্ষ করের অন্তর্গত। শুল্ক এই সকল পরোক্ষ করের অন্যতম। সরকারের আয় বৃদ্ধি, কোন বিশেষ দ্রব্যের ভোগের বা ব্যবহারের কাজে জনসাধারণকে নিবৃত্ত করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে শুল্ক বসান হয়। শুল্ক দুই শ্রেণীর, যথা, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক এবং আবগারী বা উৎপাদন শুল্ক বা অন্তঃশুল্ক।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক বা বহিঃশুল্ক (CUSTOMS DUTY)

দেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বন্দর থেকে বিদেশ যাত্রার আগে অর্থাৎ রপ্তানির সময় এবং বিদেশজাত পণ্যসামগ্রী বন্দরে এসে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের আগে অর্থাৎ আমদানির সময় যে কর দিতে হয়, তাই রপ্তানি[১] ও আমদানি শুল্ক[২]।

আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের দুটি উদ্দেশ্য,—সরকারের আয় বৃদ্ধি[৩] এবং দেশীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ[৪]। বিদেশী পণ্য আমদানির উপর শুল্ক বসালে তার প্রথম ফল হয় সরকারের আয় বৃদ্ধি। কিন্তু তার দরুন আমদানি পণ্যের মূল্য বাড়ে। আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থাৎ কমে। ফলে প্রতিযোগী দেশী পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হয় এবং সে শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নতি ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে, আমদানি শুল্কজাত আয় থেকে সংরক্ষিত শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা হয়। এইরূপে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগী দেশীয় পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলিকে রক্ষা ও লালন করা আমদানি শুল্কের অপর প্রধান উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে, রপ্তানি শুল্ক থেকেও প্রথমত, সরকারের আয় বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয়ত, রপ্তানি শুল্ক হ্রাসের দ্বারা দেশীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিয়ে ঐ পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণে সহায়তা করা যায় অনেক সময় স্বল্পযোগানের[৫] নানাবিধ দেশীয় সম্পদ ও দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ যাতে রপ্তানির দরুন কমে না, সেজন্য তা রপ্তানির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যও রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়।

আবগারী বা উৎপাদন শুল্ক (EXCISE DUTY)

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকর্মের উৎপাদন অথবা ব্যবহারের উপর যে শুল্ক বসান হয়, তাকে আবগারী বা অন্তঃশুল্ক বা উৎপাদন শুল্ক বলে। ভারতে কাপড়, চিনি, দিয়াশলাই, দেশীয় মদ, গাঁজা, আফিম, তামাক প্রভৃতি উৎপাদনের উপর শুল্ক এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত। প্রমোদ কর, পেটেন্টের উপর কর, মদ গাঁজা, পেট্রল প্রভৃতি বিক্রয়ের লাইসেন্সের উপর কর ইত্যাদিও আবগারী শুল্কের পর্যায়ে পড়ে।

1. Export Duty. 2. Import Duty. 3. Revenue.
4. Protective. 5. Scarce.

আবগারী শুল্কের উদ্দেশ্য দুইটি। সরকারের আয় বৃদ্ধি এর প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয় লক্ষ্য হল, ক্ষতিকারক পণ্য বিশেষের (যথা, মদ, আফিম প্রভৃতি) ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা। কারণ আবগারী শুল্কের দরুন দ্রব্যের মূল্য বাড়ে, ফলে ক্রেতারা ঐ সব দ্রব্য ক্রয়ে নিরুৎসাহিত হয়।

শুল্ক ধার্যের পদ্ধতিসমূহ: শুল্ক ধার্যের পদ্ধতি দুটি। (১) দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ (সংখ্যা, আয়তন ও ওজন প্রভৃতি) অনুযায়ী শুল্ক ধার্য হতে পারে। একে নির্দিষ্ট পরিমাণ-ভিত্তিক শুল্ক[6] বলে। (২) একে পণ্যসামগ্রীর মূল্য অনুযায়ী শুল্ক ধার্য হতে পারে। একে মূল্য-ভিত্তিক শুল্ক[7] বলে। কাপড়ের জোড়া বা মিটার পিছু ধার্য শুল্ক হল প্রথমটির দৃষ্টান্ত; আমদানীকৃত মোটরগাড়ি বা ঘড়ির মূল্যানুযায়ী ধার্য শুল্ক, (শতকরা ৫০% অথবা ৮০% ভাগ ইত্যাদি) হল দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক বা বহিঃশুল্ক ও আবগারী বা অন্তঃশুল্কের পার্থক্য[8]:
১. বহিঃশুল্কের পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহারের স্থান (অর্থাৎ দেশ) এক নয়। অন্তঃশুল্কের পণ্যগুলির উৎপাদন ও ব্যবহারের স্থান একই। আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের পণ্য এক দেশে উৎপাদিত ও অপর দেশে ব্যবহৃত হয়। অন্তঃশুল্কের পণ্য যে দেশে উৎপাদিত সে দেশেই ব্যবহৃত হয়।

২. বহিঃশুল্কের উদ্দেশ্য শিল্পসংরক্ষণ, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারের আয় বৃদ্ধি। অন্তঃশুল্কের উদ্দেশ্য সরকারের আয় বৃদ্ধি এবং দ্রব্যবিশেষের, বিশেষত ক্ষতিকারক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।

শুল্ক সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দ

শুল্ক ফেরত[9]: একই দ্রব্যের উপর দুবার কর আদায় করা অনুচিত, এটি কর সম্পর্কে সর্বজনস্বীকৃত নীতি। সেজন্য, যে দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক দেওয়া হয়েছে তা রপ্তানির সময় আবার সে জন্য রপ্তানি শুল্ক দেওয়া হলে রপ্তানিকারক আবগারী শুল্ক ফেরত পায়। একে 'শুল্ক ফেরত' বা "ড্রব্যাক" বলে। একই কারণে, পুনঃরপ্তানি দ্রব্যের উপর যে আমদানি শুল্ক দেওয়া হয়েছে তা ফেরত দেওয়া হয়।

ডিবেঞ্চার[10]: শুল্ক ফেরত দেওয়ার স্বীকৃতির হিসাবে সরকার যে দলিল দেয় তাকে ডিবেঞ্চার বলে। এটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল।

রাজবৃত্তি[11]: উন্নয়নের[12] জন্য বা বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিল্পবিশেষকে, তার উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী যে সরকারী অর্থ সাহায্য করা হয় তাকে রাজবৃত্তি বলে।

ভরতুকি বা সহায়ক বৃত্তি[13]: জাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্য কোন শিল্পকে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ[14] অর্থ সাহায্য করা হলে তাকে সহায়ক বৃত্তি বা ভরতুকি বলে।

পণ্য-মাসুল[15]: অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ব্যবসায়ের জন্য রেলগাড়ি, মোটরলরি, বিমান, নৌকা, স্টীমার বা সমুদ্রগামী জাহাজ দ্বারা পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠাতে হলে, পরিবহণ বাবদ যে অর্থ দিতে হয় তাকে পণ্য-মাসুল বলে। সাধারণত দ্রব্যের ওজন বা তা যতটা স্থান[16] জুড়ে থাকে সে অনুসারে তার মাসুল ধার্য হয়। মাসুল নির্ধারণের জন্য সচরাচর পরিবহণকারীদের দ্বারাই পণ্যের ওজন লওয়া হয়। তবে জাহাজে পণ্য পাঠানোর সময়, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওজনকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পণ্যের ওজন লওয়া হয় এবং সে যে **ওজনের প্রত্যয়ন পত্র**[17] দেয় সে অনুসারে পরিবহণ প্রতিষ্ঠান মাসুল ধার্য করে।

---

6. Specific Duty. 7. Ad-valorem Duty.
8. Difference between Custom and Excise Duty. 9. Drawback.
10. Debenture. 11. Bounty. 12. Development. 13. Subsidy.
14. Lump. 15. Freight. 16. Space. 17. Certificate of Weighment.

পণ্য বোঝাইয়ের নির্দেশ[18] : পণ্য প্রেরকের সাথে পণ্য পরিবহণের চুক্তি সম্পাদিত হলে, জাহাজের কর্তৃপক্ষ জাহাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ঐ পণ্য জাহাজে বোঝাই করার জন্য যে লিখিত নির্দেশ দেয় তাকে 'পণ্য বোঝাইয়ের নির্দেশ' বলে।

মৃতভার মাসুল[19] : পণ্য পাঠানোর জন্য জাহাজের নির্দিষ্ট আয়তনের স্থান নির্দিষ্ট হারে ভাড়া করে, প্রেরক যদি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে না পারে তা হলে অব্যবহৃত স্থানের জন্য তার কাছ থেকে স্বল্পতর হারে পণ্য-মাসুল আদায় করা হয়। একে মৃতভার মাসুল বলে।

পণ্য-মাসুলের বিল[20] : পণ্য-মাসুল আদায়ের জন্য জাহাজ কোম্পানী প্রেরকের কাছে মাসুলের যে লিখিত হিসাব দাখিল করে তাকে পণ্য-মাসুলের বিল বলে।

পরিদর্শনী[21] : জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ের কাজ পরিদর্শনের জন্য প্রেরকের কাছ থেকে পণ্য-মাসুলের শতকরা ১০ ভাগ অতিরিক্ত আদায় করা হয়। একে পরিদর্শনী বলে।

মোট ওজন[22] : মোড়কসহ পণ্যের ওজনকে 'মোট ওজন' বলে।

কড়তা[23] : প্রেরিত পণ্যের মোড়ক বা আবরণ প্রভৃতির যে ওজন তাকে কড়ত বলে।

নীট ওজন[24] : মোট ওজন থেকে কড়তা বাদ দিলে পণ্যের প্রকৃত ওজন পাওয়া যায়। এটি হল নীট ওজন।

ঢলতা[25] : প্রেরিত পণ্যের বারংবার বোঝাই, ওঠানো এবং নামানোর জন্য ওজন হ্রাস, ক্ষয়ক্ষতি, কড়তার ভুলচুক প্রভৃতির দরুন বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যের মোট ওজন থেকে যে ছাড় বাদ দেয়, তাহাই ঢলতা।

রেল রসিদ[26] : পরিবহণের জন্য রেলকর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যসামগ্রী জমা দিলে, তারা প্রেরককে একটি রসিদ দেয়। এই রসিদে প্রেরিত পণ্যের গুণাগুণ, পরিমাণ এবং দেয় মাসুলের পরিমাণ লেখা থাকে। একে রেল রসিদ বলে। এটি পরিবাহিত পণ্যের মালিকানার নিদর্শন এবং এর হস্তান্তরের দ্বারাই পরিবাহিত পণ্য বিক্রয় করা চলে। এই রসিদের আইনসঙ্গত অধিকারী রেলকর্তৃপক্ষের কাছে পণ্যের দখল পাওয়ার দাবি করতে পারে।

বহনপত্র বা চালানি রসিদ[27] : পণ্যের পরিমাণ, গুণাগুণ ও মাসুলের পরিমাণ ইত্যাদি তথ্যসহ পণ্যপরিবহণের এই লিখিত চুক্তিপত্রটি পরিবাহিত পণ্যের রসিদ হিসাবে জাহাজ কর্তৃপক্ষ পণ্যের মালিককে দেয়। এটি প্রেরিত পণ্যের মালিকানার নির্দশন এবং এর আইনসঙ্গত অধিকারী এর বলে, জাহাজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পণ্যের দখল দাবি করতে পারে। সাধারণত, এই বহনপত্র হস্তান্তর দ্বারাই বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্যসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। পণ্য-মাসুল দেওয়া হয়েছে কিনা তা বহনপত্রে লেখা থাকে। পণ্য প্রেরক মাসুল দিয়ে থাকলে তাতে 'মাসুল দেওয়া হয়েছে'[28] এবং না থাকলে 'মাসুল দেওয়া হয় নাই'[29] এই কথাগুলি লেখা থাকে, এবং সেক্ষেত্রে পণ্য প্রাপক তা দিয়ে দেয়।

বহনপত্রের একটি ধারা অনুযায়ী প্রেরিত পণ্যের অবস্থা—তার প্যাকিং-এ কোন ত্রুটি আছে কিনা বা ঐগুলি অক্ষত কিনা তা উল্লেখ করতে হয়। যদি পণ্যে বা প্যাকিং-এ কোন দোষত্রুটি না থাকে, তবে তাব বহনপত্রকে **নির্দোষ বহনপত্র**[30] এবং দোষযুক্ত হলে তাকে **ত্রুটিযুক্ত বহনপত্র**[31] বলে।

---

18. Shipping Order. 19. Dead Freight. 20. Freight Bill.
21. Primage. 22. Gross Weight. 23. Tare. 24. Net Weight.
25. Draft. 26. Railway Receipt (R|R). 27. Bill of Lading.
28. 'Freight Paid'. 29. 'Freight not Paid.' 30. Clean Bill.
31. Foul Bill.

বহনপত্রে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি[32] লেখা হয় ঃ

১. জাহাজ কোম্পানীর নাম।
২. জাহাজের নাম।
৩. যে বন্দরে পণ্য বোঝাই হবে, তার ও জাহাজের গন্তব্যস্থলের নাম।
৪. প্রেরিত পণ্যের বিবরণ।
৫. পণ্য খালাসের স্থান।
৬. পণ্যপ্রাপক বা প্রাপকগণের নাম।
৭. পণ্যের যে ওজন অনুযায়ী মাসুল প্রদেয়।
৮. সন, তারিখ।

বহনপত্রটি প্রেরিত পণ্যের মালিকানার নিদর্শন এবং হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মতো বলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে গণ্য করা হয়।

চালান[33] ঃ ক্রেতার কাছে পাঠানোর সময় তার সাথে বিক্রেতা পণ্যের পরিচয়, সংখ্যা, পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্য এবং প্যাকিং-এর বিবরণ ইত্যাদি তথ্যসহ যে মুদ্রিত বিবরণী পাঠায় তাকে চালান বলে। ক্রেতা পণ্যের সাথে এই চালানে উল্লিখিত বিবরণ মিলিয়ে নেয় ও ভুল-ত্রুটি থাকলে তা ফেরত পাঠিয়ে সংশোধন করে নেয়।

ক্রয় ও বিক্রয় চিঠা[34] ঃ মৌখিক ক্রয়বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হলে, পরে ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের কাছে ঐ চুক্তির বিষয়, যথা পণ্যের পরিমাণ, দর প্রভৃতির লিখিত বিবরণ পাঠিয়ে দেয়। ক্রেতা যে বিবরণ পাঠায় তা ক্রয় চিঠা ও বিক্রেতা যে বিবরণ পাঠায় তাকে বিক্রয় চিঠা বলে।

দেনাচিঠা[35] ঃ চালানে বর্ণিত হিসাবে ভুলবশত, দাম কম করে ধরা ও আদায় করা হলে বিক্রেতা পরে ক্রেতার কাছে সেজন্য প্রাপ্য অর্থের যে বিবরণ পাঠায় তাকে দেনাচিঠা বলে।

পাওনাচিঠা[36] ঃ চালানে ভুলবশত বেশী দাম ধরা ও আদায় করা হলে, ঐ অতিরিক্ত অর্থের একটি বিবরণ বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পাঠায়। একে পাওনাচিঠা বলে।

নমুনা বা নকল চালান[37] ঃ পণ্য বিক্রয় ও পাঠানোর আগেই বিক্রেতা চালানোর ন্যায় পণ্যের পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ পাঠিয়ে থাকে। তাকে নমুনা চালান বলে। চার রকমের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়। যে ক্ষেত্রে ক্রেতা অপরিচিত, সেখানে এই নমুনা চালান আগে পাঠিয়ে বিক্রেতা মূল্য দাবি করে। দ্বিতীয়ত, পণ্য ক্রয় করা হলে কিরূপ খরচ পড়বে, ক্রেতাকে তার আভাস দেওয়ার জন্য পণ্য পাঠানোর আগেই বিক্রেতা এটি পাঠায়। তৃতীয়ত, পণ্য রপ্তানির জন্য পাঠানোর আগে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে নমুনা চালান পাঠিয়ে বিক্রেতা দেয় শুল্কের পরিমাণ জানতে চায়। চতুর্থত, চালানি কারবারে[38] পণ্যের মালিকপ্রেরক[39] পণ্য প্রাপকের[40] কাছে নমুনা চালান পাঠিয়ে তাকে ঐ পণ্যের দরের আভাস দিয়ে থাকে।

বাণিজ্যদূত প্রত্যয়িত চালান[41] ঃ কোন কোন দেশ আমদানিকৃত পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক ধার্যের জন্য রপ্তানিকারী-দেশে অবস্থিত স্বদেশের বাণিজ্যদূত কর্তৃক প্রত্যয়িত[42] চালান দাবি করে। সে ক্ষেত্রে, রপ্তানিকারক তার স্বদেশে অবস্থিত আমদানি-কারক-দেশের বাণিজ্যদূতের কাছে রপ্তানি পণ্যের চালান পেশ করে এবং তাকে দিয়ে তা প্রত্যয়িত করে নেয়। এই প্রত্যয়নের নিদর্শনরূপে বাণিজ্যদূত ঐ চালানে সই করেন এইরূপে প্রত্যয়নের জন্য বাণিজ্যদূতকে নির্দিষ্ট দর্শনী[43] দিতে হয়।

প্রভব লেখ[44] ঃ আমদানিকারক দেশে শুল্কসংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা লাভের জন্য, রপ্তানি-দ্রব্যের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে আমদানিকারক-দেশ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রপ্তানি-

32. Particulars of Bill of Lading. 33. Invoice.
34. Bought Note and Sold Note. 35. Debit Note. 36. Credit Note.
37. Pro-forma Invoice. 38. Consignment. 39. Consignor.
40. Consignee. 41. Consular Invoice. 42. Certified. 43. Fee.
44. Certificate of Origin.

কারক-দেশে অবস্থিত, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণাপত্র রপ্তানিকারী পণ্যের সাথে পাঠিয়ে দেয়। এই দলিলটিকে 'প্রভব লেখ' বলে।

বীমা[45] : এখানে 'বীমা' কথাটি 'সামুদ্রিক বীমা' বা 'নৌবীমা'[46] অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিক্রয়ের চুক্তি অনুযায়ী রপ্তানিকারী অথবা আমদানিকারী পণ্য পাঠানোর সময় সামুদ্রিক বিপদ-আপদের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পণ্যের সামুদ্রিক বীমা করে এবং তদনুযায়ী বিক্রেতা অথবা ক্রেতার নামে বীমা সম্পাদিত হয়।

মূল্য জ্ঞাপন[47] : ক্রেতাকে পণ্যের মূল্য জ্ঞাপনের সময় বিক্রয়ের বিভিন্ন শর্তাবলীর পরিচায়করূপে যে সকল সাংকেতিক শব্দ বিক্রেতা ব্যবহার করে. নিচে তা ব্যাখ্যা করা হল।

১. **বিক্রেতার গুদাম দর ('লোকো')**[48] : বিজ্ঞাপিত বিক্রয়-মূল্যের সাথে 'লোকো' শব্দটি ব্যবহৃত হলে বিক্রেতার গুদাম থেকে ক্রেতাকে যে দরে পণ্যটি ক্রয় করতে হবে তা বোঝায়। এই শর্তে বিক্রেতা তার গুদামের দরজায় ক্রেতাকে পণ্য ডেলিভারী দেয় এবং তারপর পরিবহণ ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ এমনকি প্যাকিং খরচ পর্যন্ত ক্রেতা নিজে দিয়ে পণ্য নিয়ে আসে।

২. **জাহাজ পর্যন্ত দর ('এফ. এ. এস.)**[49] : এতে গুদাম থেকে পণ্য বের করে জাহাজ পর্যন্ত পণ্য পেঁৗছে দেওয়ার যাবতীয় খরচ বিক্রেতার। অতঃপর জাহাজে পণ্য বোঝাই থেকে শুরু করে নিজ দেশে, নিজ গুদামে পণ্য পেঁৗছানো পর্যন্ত সমস্ত খরচ ক্রেতার।

৩. **মালগাড়ী বোঝাই সমেত দর ('এফ. ও. ডব্লিও.')**[50] : এই শর্ত সংবলিত মূল্যে রেল ওয়াগনে পণ্য বোঝাই পর্যন্ত যাবতীয় খরচ বিক্রেতা বহন করে।

৪. **জাহাজে বোঝাই সমেত দর ('এফ. ও. বি.')**[51] : এতে জাহাজে বোঝাই করা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ বিক্রেতার।

৫. **মূল্য ও মাসুল সমেত দর ('সি. এন্ড. এফ্.)**[52] : এতে পণ্যের মূল্য ছাড়াও পরিবহণের মাসুলও ধরা থাকে, অর্থাৎ বিক্রেতা মাসুল দেয়।

৬. **দাম-বীমা-মাসুল সমেত দর ('সি. আই. এফ্.')**[53] : এতে প্রকৃত মূল্য সহ ক্রেতার নিকট পণ্য পেঁৗছে দেওয়ার বীমা সমেত যাবতীয় খরচ ধরা থাকে অর্থাৎ এতে পরিবহণকালীন ঝুঁকি থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং এসব খরচ বিক্রেতা বহন করে।

৭. **দাম-বীমা-আসুল-মুদ্রাবিনিময় সমেত দর ('সি. আই. এফ্. ই.')**[54] : এতে যাবতীয় পরিবহণ ব্যয়, বীমা ইত্যাদি ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি হ্রাসের খরচও দামের অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থাৎ তা বিক্রেতা বহন করে।

৮. **ক্রেতার গুদাম পর্যন্ত পেঁৗছান দর ('ফ্র্যাঙ্কো')**[55] : বিক্রেতার গুদাম থেকে ক্রেতার গুদাম পর্যন্ত পণ্য পেঁৗছে দেওয়ার যাবতীয় খরচসহ মূল্য এর দ্বারা জ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ যাবতীয় খরচ বিক্রেতা বহন করে।

পণ্যমূল্য প্রদানের শর্তসমূহ[56] : ব্যবসায়ে পণ্যের মূল্য প্রদানের বিবিধ পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে নিচে আলোচিত হল।

45. Insurance. 46. Marine Insurance. 47. Price Quotation.
48. Loco. 49. Free Alongside Ship (F.A.S.).
50. Free on Wagon (F.O.W.). 51. Free on board (F.O.B.)
52. Cost & Freight (C. & F.)
53. Cost, Insurance & Freight (C. I. F.).
54. Cost, Insurance, Freight & Exchange (C.I.F.E.) 55. Franco.
56. Terms of Payment.

১. **নগদ মূল্য**[57] : পণ্য কিনে হাতে হাতে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থাকে 'নগদ মূল্য প্রদান ব্যবস্থা' বলে।

২. **সত্বর নগদ**[58]: এতে চালানপত্র পাওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

৩. **নীট নগদ**[59] : দস্তুরি ও অন্যান্য ছাড় বাদ দিয়ে মূল্য পরিশোধকে নীট নগদ বলে।

ফরমাশ সহ নগদ[60] : এতে পণ্যের ফরমাশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খরিদ্দার মূল্য পরিশোধ করে।

৫. **পণ্য সরবরাহের সময় নগদ**[61] : এতে পণ্য সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এর রকমফের হল ভি. পি. পি. অর্থাৎ পোস্টাল পার্শেলে পণ্য পাঠালে, তা ডেলিভারী নেওয়ার সময় মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

৬. **বিলম্বিত মূল্য প্রদান**[62]: নগদের পরিবর্তে বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। এতে পণ্য কেনার পরে কিস্তিতে বা এককালীন মূল্য পরিশোধ করা হয়।

জাহাজী বিবরণ[63]: পণ্যভর্তি জাহাজ বিদেশ থেকে বন্দরে এসে হাজির হওয়াব ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে নির্ধারিত কয়েকটি বিষয় সহ একটি বিবরণী জাহাজের অধ্যক্ষ দাখিল করে। এটি বাধ্যতামূলক। একে জাহাজী বিবরণ বলে। এই বিবরণ দাখিল করার আগে জাহাজের মধ্যে কোন পণ্য খোলা যায় না কিংবা কোন পণ্য জাহাজ থেকে নামানো যায় না।

অসত্য বা ত্রুটিযুক্ত বিবরণী দেওয়া হলে জাহাজের অধ্যক্ষকে দণ্ড ভোগ করতে হয়। বিবরণী বহির্ভূত কোন দ্রব্য জাহাজে পেলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ তা আটক করে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবরণীতে লিপিবদ্ধ থাকেঃ

১. জাহাজের নাম। যে বন্দরে তা রেজিস্ট্রি হয়েছে। কোন্ দেশের জাহাজ। জাহাজের অধ্যক্ষের নাম। কোন্ বন্দর থেকে এসেছে। লস্করের সংখ্যা। যাত্রীদের সংখ্যা।

২. মোড়কের সংখ্যা[64] এবং সেগুলির ভিতরে অবস্থিত দ্রব্য, পণ্যপ্রাপকের নাম অর্থাৎ সমগ্র পণ্যের বিস্তৃত বিবরণ।

৩. জাহাজের অধ্যক্ষ এবং লস্করদের শুল্কপ্রদেয় ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রীর তালিকা।

আগম পত্র[65]: বন্দরে পণ্যসমেত জাহাজ পৌঁছালে, আমদানিকারী অথবা তার প্রতিনিধিকে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে পণ্যের পূর্ণ বিবরণসহ একটি তালিবা পেশ করতে হয়। শুল্ক কর্তৃপক্ষ তা যথাবিহিত পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন করলে তবে জাহাজ থেকে পণ্য খালাস করা যায়। এই বিবরণকে আগম পত্র বলে। একে শুল্ক চালানও[66] বলা হয়।

ডক রসিদ ও মেট রসিদ[67]: রপ্তানি পণ্য জাহাজে বোঝাই করার জন্য রপ্তানিকারী ডক কর্তৃপক্ষেব কাছে পণ্য জমা দিলে যে কাঁচা রসিদ পায় তাকে ডক-রসিদ বলে। তা জাহাজের 'মেট'-এর কাছে জমা দিলে যে কাঁচা রসিদ পাওয়া যায় তাকে ডক-রসিদ বলে। জাহাজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বহনপত্র নেবার সময় রপ্তানিকারী এই কাঁচা রসিদ (অর্থাৎ ডক বা মেট রসিদ) ফেরত দেয়।

অজ্ঞাত আমদানি পণ্যপত্র[68] : আমদানি পণ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ জানা না থাকলে

57. Spot Cash. 58. Prompt Cash. 59. Net Cash.
60. Cash with Order (C.W.O.). 61. Cash on Delivery (C.O.D.).
62. Deferred Payment.
63. Ship's Report or Ship's Import Manifest.
64. Packages. 65. Bill of Entry. 66. Customs Challan.
67. Dock's Receipt & Mate's Receipt. 68. Bill of Sight.

আমদানিকারীর পক্ষে আগম পত্র পেশ করা সম্ভব হয় না। তখন একটি পৃথক দলিলে, সম্ভব মত বর্ণনা দিয়ে আমদানিকারীকে একটি লিখিত ঘোষণা পেশ করতে হয় যে, পণ্য-মোড়ক খুলে না দেখে তার পক্ষে আগমপত্র সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। এটি অজ্ঞাত আমদানি পণ্য পত্র বা 'বিল অফ সাইট' নামে পরিচিত।

লিপিবন্ধকরণ (নোটিং)[69] : রপ্তানিপণ্যের কোন্‌গুলি শুল্ক প্রদেয় এবং কোন্‌গুলি শুল্ক প্রদেয় নয়, তা শুল্ক দপ্তরের রেজিস্টারীতে লিপিবন্ধ করাতে হয়। একে লিপিবন্ধকরণ বা 'নোটিং' বলে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান[70] : শুল্কে প্রদেয় অথবা নিষিদ্ধ পণ্যের চোরাই চালান ঘটছে সন্দেহ করে তা ধরার জন্য শুল্ক-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাহাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান কাজকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান বা 'রামেজিং' বলে।

দলিলী হুণ্ডী[71] : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে রপ্তানিকারী পণ্য মূল্য আদায়ের জন্য বহনপত্র বা চালানি রসিদ, চালানপত্র, প্রভব লেখ, বাণিজ্য দূত প্রত্যায়িত চালান, বীমাপত্র, জাহাজী দলিল প্রভৃতি সহ একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডি[72] অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফট[73] প্রস্তুত করে নিজ ব্যাঙ্কের মারফত আমদানিকারীর কাছে পাঠায়।

এই হুণ্ডি দুরকমের। প্রথমত, ঐ সব দলিল সহ যদি বাণিজ্যিক হুণ্ডি স্বীকৃতির জন্য পাঠানো হয়, তা হলে আমদানিকারী স্বীকৃতির চিহ্ন রূপে তাতে সই দিলেই ঐ পণ্যসংক্রান্ত দলিলপত্র তাকে অর্পণ করা হয় এবং এইরূপে সে পণ্যের অধিকার লাভ করে। একে স্বীকারসাপেক্ষ হুণ্ডি বা ডি/এ বিল[74] বলে। দ্বিতীয়ত অবিলম্বে মূল্য আদায়ের শর্ত থাকলে ঐ দলিলপত্রের সাথে যে হুণ্ডি বা ড্রাফট পাঠানো হয় তার মূল্য পরিশোধ করলে আমদানিকারীকে ঐগুলি অর্পণ করা হয়। একে পরিশোধসাপেক্ষ হুণ্ডি বা ডি/পি বিল[75] বলে।

ঋণের প্রত্যয়ন পত্র[76] : মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা লাভের জন্য বিক্রেতা অপরিচিত ক্রেতাকে তার (বিক্রেতার) নিজের ব্যাঙ্কের অথবা অন্য কোন সুপরিচিত ব্যাঙ্কের কাছে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ জমা রাখার নির্দেশ দেয়, যেন ঐ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে মূল্য বাবদ অর্থ সহজেই পাওয়া যায়। এজন্য ক্রেতারা সাধারণত তাদের ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বিক্রেতার উদ্দেশ্যে লিখিত এই মর্মে পত্র আদায় করে যে, বিক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সহ হুণ্ডির অর্থ পরিশোধের জন্য ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার নামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আমানতের হিসাব তাদের কাছে খোলা হয়েছে। এই পত্রকে প্রত্যয়ন পত্র বলে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ঐ হিসাব থেকে বিক্রেতাকে নগদে মূল্য পরিশোধ করাও চলতে পারে কিংবা হুণ্ডি দ্বারা মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা থাকতে পারে। ঐ হুণ্ডি ক্রেতার উপর কাটা[77] হতে পারে, আবার ঐ ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত হতে পারে। প্রত্যয়ন পত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল।

প্রত্যয়ন পত্র দুই শ্রেণীতে হতে পারে। প্রথমত, যে প্রত্যয়ন পত্র যে কোন সময় প্রত্যাহৃত হতে পারে তাকে **প্রত্যাহার যোগ্য**[78] **প্রত্যয়ন পত্র** বলা হয়। এই ধরনের ঋণকে প্রত্যাহার যোগ্য ঋণ বলে। দ্বিতীয়ত, যার নামে হিসাব খোলা হয়েছে, তার অনুমতি ছাড়া যে প্রত্যয়ন পত্র প্রত্যাহার করা যায় না, তাকে **অ-প্রত্যাহার যোগ্য**[79] **প্রত্যয়ন পত্র** বলে।

---

69. Noting. 70. Rummaging. 71. Documentary Bill.
72. Bill of Exchange. 73. Bank Draft.
74. Document Against Acceptance Bill (D|A Bill).
75. Documents Against Payment Bill (D|P Bill).
76. Letter of Credit. 77. Drawn. 78. Revocable. 79. Irrevocable.

দলিলসাপেক্ষ ঋণ[80] : বিক্রেতাকে ক্রেতার ব্যাঙ্কের যে ঋণের বেলায় স্বীকৃতির[81] জন্য প্রেরিত পণ্যের দলিল পত্র সহ হুণ্ডিটি দাখিল করতে হয়, তাকে দলিলসাপেক্ষ ঋণ বলে।

শর্তবিহীন ঋণ[82] : ক্রেতার ব্যাঙ্কের স্বীকৃতির জন্য যে হুণ্ডির সহিত বিক্রেতাকে কোন প্রকার দলিলপত্র দাখিল করতে হয় না, তাহাকে শর্তবিহীন ঋণ বলে।

আবর্তমান ঋণ[83] : ব্যাঙ্কের সাথে ব্যবসায়ীদের অনেক সময় এরূপ বন্দোবস্ত থাকে যে কোনও একটি ঋণের নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্ত পালিত হলে ব্যাঙ্ক বারবার ঐ ঋণ মঞ্জুর করবে। এরূপ ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট[84] থাকতে পারে এবং প্রথমবার ঋণ গ্রহণের পর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এরূপে বারবার আপনা থেকেই ঐ ঋণ মঞ্জুর হতে থাকে। কখনও কখনও আগের ঋণ পরিশোধের পর পরবর্তী ঋণ মঞ্জুর হয়। আবার কখনও ঋণের পরিমাণ অনির্দিষ্টও থাকতে পারে।

নির্দিষ্ট ঋণ[85] : একবারে অথবা কিস্তিতে, যে ভাবেই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ বাবদ টাকা তোলা হোক না কেন, ঋণের মোট পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলে তাকে নির্দিষ্ট ঋণ বলে।

অ-বাণিজ্যিক ঋণ[86] : ব্যবসায়গত ঋণ প্রদান ছাড়াও ব্যাঙ্কগুলি আরও কয়েক প্রকার ঋণের সুবিধা দিয়ে থাকে। নিচে সেরূপ ঋণের দলিলগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হল।

১. ভ্রমণকারীর ঋণের প্রত্যয়ন পত্র[87] : দূরদেশে ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য তাদের ব্যাঙ্ক তাদের বিদেযস্থ শাখা বা প্রতিনিধিদের ঐ ভ্রমণকারীদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে ঋণ মঞ্জুর করার অনুরোধ করে যে চিঠি দেয় তাকে ভ্রমণকারীব ঋণের প্রত্যয়ন পত্র বলে। ভ্রমণকারীরা এই চিঠি সঙ্গে বহন করে ও প্রয়োজনমত তা দেখিয়ে ড্রাফ্‌টের সাহায্যে টাকা তোলে। সাধারণ ভ্রমণকারীরা ছাড়া ব্যবসায়ীরাও এই সুবিধা বিশেষ ভাবেই নিয়ে থাকে।

২. ভ্রমণকারীর চেক[88] : বিদেশ ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শাখা ও প্রতিনিধি আছে এরূপ বড় ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারী-সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলির[89] ভ্রমণকারীদের চেক নামে এক ধরনের চেকের ব্যবস্থা আছে। তাতে ঐ প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক ও সংস্থাগুলির স্থানীয় শাখায় টাকা দিয়ে বিভিন্ন মূল্যের[90] কুপন কিনতে হয়। কুপনগুলি নেবার সময় ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সামনে ঐগুলিতে ক্রেতাকে সই করতে হয়। পরে বিদেশে গিয়ে টাকার প্রয়োজন হলে ঐ প্রতিষ্ঠানেব স্থানীয় শাখায় উপস্থিত হয়ে ফের কুপনে সই করে তা জমা দিলে স্থানীয় শাখাটি সই মিলিয়ে কুপন-মূল্যের সমপরিমাণ প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দিয়ে দেয়। টমাস কুক এন্ড সন্স এবং আমেরিকান এক্সপ্রেস ইনকরপোরেটেড, যথাক্রমে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দুটি এজন্য বিশ্ববিখ্যাত।

৩. সার্কুলার চেক[91] : ভ্রমণকারীদের সহায়তার জন্য আর এক প্রকারের বন্দোবস্ত আছে। বিভিন্ন দেশের বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলি ভিন্ন দেশে অবস্থিত তাদের প্রতিনিধি মারফত চেক বিক্রয় করে। সেই সব দেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা স্থানীয় প্রতিনিধিদের কাছে প্রয়োজনমত টাকা জমা দিয়ে ঐ সব চেক কেনে। চেকগুলি বিক্রয়ের সময় প্রতিনিধিরা তাতে টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে দেয়। পরে ক্রেতা-ভ্রমণকারীরা সেই সব দেশে গিয়ে উপস্থিত হলে ঐ চেক ভাঙিয়ে টাকা তুলতে পারে।

80. Documentary Credit. 81. Acceptance.
82. Clean or Open Credit. 83. Revolving Credit. 84. Fixed.
85. Fixed Credit. 86. Non-commercial Credit.
87. Traveller's Letter of Credit. 88. Traveller's Cheque.
89. International Tourist Agencies. 90. Different denominations.
91. Circular Cheque.

হেপাজতি বা জিম্মা রসিদ[92] : পণ্য আমদানির জন্য ঋণের প্রয়োজনে আমদানিকারী সমস্ত জাহাজী দলিলাদি[93] ও পণ্যের মালিকানাস্বত্ব[94] ব্যাঙ্কের কাছে হস্তান্তরিত করতে পারে। পরে পণ্যগুলি আমদানি বন্দরে পেঁছালে তা খালাস করার প্রয়োজনে ঐ আমদানিকারী ব্যাঙ্কের কাছে একটি রসিদ দিয়ে ঐ পণ্যের দলিলগুলি ফেরৎ নিয়ে পণ্য খালাস করে। এই রসিদকে 'জিম্মা রসিদ' বলে। আমদানিকারী পণ্যগুলি বিক্রয় করে ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করে। যতদিন পর্যন্ত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হয়, ততদিন পর্যন্ত পণ্য ওই আমদানিকারীর কাছে থাকলেও তার প্রকৃত মালিকানা থাকে ব্যাঙ্কের। আমদানিকারী শুধু পণ্যের জিম্মাদার থাকে। এজন্য ঐ রসিদকে হেপাজতি বা জিম্মা রসিদ বলে। এই রসিদে সাধারণত এই শর্তগুলি থাকে : (১) পণ্যগুলি আমদানিকারীর কাছে থাকলেও তার প্রকৃত মালিকানা তার ব্যাঙ্কের এবং আমদানিকারী শুধু তার জিম্মাদার থাকে। (২) আমদানিকারীর গুদামে তার অন্যান্য পণ্যদ্রব্য থেকে পৃথকভাবে এই দ্রব্যগুলি রাখা হবে। (৩) ঐ পণ্যদ্রব্যকে আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করার জন্য আমদানিকারী ব্যাঙ্কের নামে তার বীমা করে, বীমার পলিসিটি ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত রাখবে। (৪) ব্যাঙ্ক যে কোন সময় ওই জিম্মা রসিদ বাতিল করে পণ্যের দখল নিতে পারবে। (৫) ব্যাঙ্কের তরফ থেকে কোন শর্ত ভঙ্গ হলেও তাতে তার অধিকার ক্ষুন্ন হবে না।

বন্ধক পত্র[95] : যখন কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্ক ঋণদান করে ঋণগ্রাহকের স্বীকৃতি পত্রের বলে কোন পণ্যের উপর পূর্বস্বত্ব[96] লাভ করে, তাকে বন্ধক পত্র বলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়ে, এই পদ্ধতিতে ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্ক থেকে প্রায়ই ঋণ নিয়ে থাকে। রপ্তানিকারীরা যখন দলিল সহ আমদানিকারীর উপর প্রদত্ত দলিলী হুন্ডির[97] দ্বারা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেয়, তখন এরূপ পত্র দিয়ে থাকে। আমদানি-কারী হুন্ডির টাকা শোধ করতে অস্বীকার করলে ব্যাঙ্ক এই পত্রের বলে তার অধীন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে ঐ ঋণ আদায় করতে পারে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ যথেষ্ট না হলে রপ্তানিকারীর কাছ থেকে বকেয়া অর্থ আদায় করতে পারে। এইরূপে এই পত্রের সাহায্যে ঋণদানকারী ঋণের অর্থ আদায়ের দরুন ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে নিজের স্বার্থরক্ষা করতে পারে।

আমদানিকারীরাও অনুরূপভাবে এই পত্রের দ্বারা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে।

নৌ-ভাটক সনদ বা চার্টার পার্টি[98] : যে লিখিত চুক্তির দ্বারা জাহাজের মালিক মাসুলের বিনিময়ে পণ্য বহনের উদ্দেশ্যে একখানি সম্পূর্ণ জাহাজ বা জাহাজের অধিকাংশ একটি নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রার[99] জন্য বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পণ্যপ্রেরকের কাছে ইজারা বা ভাড়া দেয়, তাকে চার্টার পার্টি বলা হয়। যে দলিল মারফত এই চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকেও চার্টার পার্টি বলে। যে ব্যক্তি জাহাজ ভাড়া নেয় (পণ্য-প্রেরক) তাকে ইজারা গ্রহণকারী বা চার্টারার[100] বলে।

চার্টার পার্টির বৈশিষ্ট্যগুলি হল : ১. চার্টার পার্টির চুক্তিটি লিখিত হবে।

২. এর দ্বারা জাহাজের মালিক সম্পূর্ণ জাহাজ বা তার অধিকাংশ চার্টারারকে ভাড়া বা ইজারা[101] দেয়।

৩. জাহাজের মালিক একটি নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রার জন্য অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহাজ ইজারা দিলে তাকে নির্দিষ্ট **সমুদ্রযাত্রার সনদ বা ভয়েজ চার্টার**[102] বলে। আর,

92. Trust Receipt. 93. Shipping documents.
94. Title of the goods. 95. Letter of Hypothecation.
96. Lien. 97. Documentary Bills. 98. Charter Party.
99. Voyage. 100. Charterer. 101. Lease. 102. Voyage Charter.

একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা দিলে তাকে **সময়ানুসারে সনদ বা টাইম চার্টার**[103] বলে।

চার্টার পার্টির শর্তাবলী বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। চার্টার পার্টির চুক্তির দ্বারা জাহাজের মালিক একটি নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রা বা সময়ের জন্য সম্পূর্ণ জাহাজ চার্টারারকে ইজারা দিতে বা হস্তান্তর করতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িকভাবে চার্টারারকে ঐ জাহাজের মালিকরূপে গণ্য করা হয় এবং ঐ সময়ের জন্য জাহাজ সম্পর্কে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব চার্টারারকে বহন করতে হয়। কিন্তু যেখানে চার্টারারকে সম্পূর্ণ জাহাজ ইজারা দেওয়া বা হস্তান্তর করা হয় না, জাহাজের সমুদয় স্থান পণ্য বহনের জন্য ভাড়া দেওয়া হয় মাত্র, সেক্ষেত্রে চার্টারার ঐ জাহাজের মালিকানা লাভ করে না বা কর্মচারিগণও তার অধীন হয় না। চার্টারার নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ঐ জাহাজ মারফত গন্তব্যস্থলে পণ্য নিয়ে যাওয়ার অধিকার লাভ করে মাত্র। এবং সে ইচ্ছানুসারে সমগ্র জাহাজে কেবল নিজ পণ্য অথবা, নিজ পণ্যের সাথে আলাদা চুক্তিমত অন্যের পণ্যও বহন করতে পারে। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দ্বিতীয় প্রকার শর্ত সম্বলিত চার্টার পার্টি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

103. Time Charter.

২০

বৈদেশিক ব্যবসায়
FOREIGN TRADE

বৈদেশিক ব্যবসায় কাকে বলে ঃ যে দেশ অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যত উন্নত ও অগ্রসর হোক না কেন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রতিটির ক্ষেত্রে কোন দেশের পক্ষেই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হওয়া সম্ভব নয়। যে জিনিসটি প্রয়োজনীয় হলেও দেশের মধ্যে তা আদৌ উৎপাদন করা বর্তমানে সম্ভব নয় কিংবা উৎপাদন করলে তার যা খরচ পড়ে তার চেয়ে কম দামে তা অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করা যায়, তেমন জিনিসটি বিদেশ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। এই কারণে এক দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়। দুটি ভিন্ন, সার্বভৌম দেশের মধ্যে, তাদের সীমান্ত পারাপার হয়ে যে ব্যবসায় চলে তারই নাম হল বৈদেশিক ব্যবসায় বা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়[1]। বৈদেশিক ব্যবসায় দুরকমের—(ক) রপ্তানি ব্যবসায়, এবং (খ) আমদানি ব্যবসায়। প্রথমটি হল বিদেশীদের কাছে পণ্য বিক্রির এবং দ্বিতীয়টি হল বিদেশীদের কাছ থেকে পণ্য কেনার ব্যবসায়।

অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের সাথে বৈদেশিক ব্যবসায়ের প্রধান পার্থক্য ঃ (১) বৈদেশিক ব্যবসায় চলে দুটি ভিন্ন, সার্বভৌম দেশের মধ্যে, আর অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় চলে একই দেশের সীমানার মধ্যে। (২) বৈদেশিক ব্যবসায়ে বেচাকেনা চলে প্রধানত পাইকারী ভিত্তিতে। খুচরা কারবার তাতে চলে না। অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে পাইকারী ও খুচরা, দুরকম বেচাকেনাই চলে। (৩) বৈদেশিক ব্যবসায়ে দুই দেশের মুদ্রার অর্থাৎ দুটি বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের প্রশ্নটি জড়িত থাকে, অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে কোনও বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের প্রশ্ন থাকে না। (৪) বৈদেশিক ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট দুটি ভিন্ন দেশের সরকারী বিধিনিয়ম মেনে চলতে হয়। অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে শুধু নিজ দেশের সরকারী বিধি নিয়ম মানতে হয়।

বৈদেশিক ব্যবসায়ের ভিত্তি[2] ঃ শ্রমের বিভাগ[3] ও বিশেষায়ণ[4] হল বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ভিত্তি। সাধারণত, কোনো দেশে সে ধরনের সামগ্রীই উৎপাদন করা হয় যার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি দেশের মধ্যে রয়েছে এবং যা কম খরচে উৎপাদন করা যায়। এইভাবে এক একটি পণ্যের উৎপাদনে বিশেষায়ণ লাভ করে, যাবতীয় উপকরণগুলি সবচেয়ে ভাল ভাবে ব্যবহার করে দেশটি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করে এবং সেই উদ্বৃত্ত পণ্যের বিনিময়ে (অর্থাৎ রপ্তানি করে) আরেকটি দেশ থেকে সে সেই সামগ্রীটি সংগ্রহ (অর্থাৎ আমদানি) করে যার উপকরণ তার নেই বলে কিংবা তার উৎপাদনে খরচ বেশী পড়ত বলে সে তা উৎপাদন করেনি বা করে না। এইভাবে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের কাজটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ করে নিয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই অপেক্ষাকৃত কম দামে নিজের প্রয়োজনীয় পণ্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে পারে। এই হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব। সে তত্ত্বের মূল কথা হল, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানগুলির বণ্টনে পার্থক্য রয়েছে। উপাদান বণ্টনে এই পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন

1. International Trade.
2. Basis of Foreign Trade.
3. Division of Labour.
4. Specialisation.

সামগ্রীর উৎপাদন খরচে তুলনামূলক বা আপেক্ষিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রত্যেকটি দেশ কেবল সেই সব সামগ্রীই উৎপাদন করে যার উপযোগী সর্বাধিক সুবিধা তার রয়েছে এবং সে কারণে সর্বাধিক সুবিধাজনকভাবে অর্থাৎ সবচেয়ে কম খরচে তা উৎপাদন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। এইভাবে, প্রত্যেকটি দেশ কেবল সেই সব সামগ্রী রপ্তানি করবে যার উৎপাদনে সে বিশিষ্টতা লাভ করেছে এবং যা তার প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত, আর আমদানি করবে শুধু সেই সব সামগ্রী যার উৎপাদনে তার সুবিধা কম, অর্থাৎ সে বিশিষ্টতা লাভ করেনি এবং সে কারণে তার উৎপাদন খরচ পড়ে তুলনামূলকভাবে বেশি।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার কারণ : বিভিন্ন দেশে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের তুলনামূলক উৎপাদন ব্যয়ের নিয়ম দ্বারাই যদি আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও যোগান নিয়মিত হয় তবে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয় কেন, এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে,—(১) এই নিয়মটি শুধু একটি অর্থনীতিক প্রবণতার ইঙ্গিত দেয় মাত্র। এটি ব্যতিক্রমহীন ও সর্বত্র কার্যকর নয়। কারণ সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক বিবিধ শক্তি এর পথে সর্বদাই বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। (২) সকল বিষয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেশে কোন্ কোন্ দ্রব্যের উৎপাদনে সর্বাধিক তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে তা নির্ধারিত হয়ে গেছে একথা কোন দেশ সম্বন্ধেই বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সকল দেশই এখন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত নূতন নূতন পণ্য, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে, কোন্ ক্ষেত্রে তার তুলনামূলক সুবিধা সর্বাধিক, তার অনুসন্ধানে নিযুক্ত রয়েছে। সেজন্য দেখা যায়, একাধিক দেশ একই সঙ্গে একই প্রকারের দ্রব্য উৎপাদন করছে। (৩) উৎপাদনের ক্রম-হ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান নিয়মের দ্বারা তুলনামূলক উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্র সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে থাকে। প্রথম নিয়মটির দরুন একটি নির্দিষ্ট সীমার পর উৎপাদন ব্যয় বাড়ে বলে পণ্যটি তখন দেশে উৎপাদন না করে আমদানি করা লাভজনক হয়। আর দ্বিতীয় নিয়মটির দরুন উৎপাদন যতই বাড়ে ততই উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় রপ্তানির সুযোগ বাড়ে। এই সব কারণে তুলনামূলক উৎপাদন ব্যয়ের নিয়ম সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ও বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখতে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সুবিধা : ১. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ফলে প্রকৃতপক্ষে দেশ বিশেষে, বিশেষ বিশেষ শিল্পের স্থানীকরণ ঘটে ও তার দরুন বিশেষায়ণের সর্ববিধ সুফল ভোগ করা সম্ভব হয়।

২. সর্বাধিক তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন নিবন্ধ থাকায় উৎপাদনের উপাদান ও অন্যান্য সহায়ক সম্পদের সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক ব্যবহার ঘটে বলে উৎপাদনের দক্ষতা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩. দেশে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বেড়ে সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় উৎপাদনের সর্বমোট পরিমাণ সর্বাধিক বাড়ে।

৪. সমগ্র বিশ্বের সকল দেশের ভোগকারীদের ভোগের পরিমাণ সর্বাধিক হতে পারে।

৫. সব দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সম্প্রসারণ ঘটে। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক বন্ধুত্বের বন্ধনে, পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতা বেড়ে আন্তর্জাতিক শান্তির ও সহাবস্থানের সম্ভাবনা শক্তিশালী হয়।

অসুবিধা : ১. আন্তর্জাতিক ব্যবসায় অনুসরণ করতে গিয়ে প্রত্যেক দেশ সর্ব প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন না করে শুধু যে ক্ষেত্রে তার তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধা

সর্বাধিক, সে সব দ্রব্য উৎপাদন করায় তার অর্থনীতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও আত্মনির্ভরশীলতা নষ্ট হয়ে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। যুদ্ধ প্রভৃতি সংকটের সময় এর মারাত্মক ফল ফলতে পারে।

২. এতে শুধুমাত্র অল্প কয়েকটি শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি ঘটায় দেশের মধ্যে শিল্প সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়।

৩. অনুন্নত ও উন্নত এই দুই প্রকারের অসম অবস্থাসম্পন্ন দেশের মধ্যে অবাধ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের দরুন, অনুন্নত দেশটির পক্ষে প্রতিযোগিতায় সুবিধা আদায় করা কঠিন হয়।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সুবিধাগুলি তার অসুবিধা অপেক্ষা বেশী হওয়ায় সকলেই এর পক্ষপাতী।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের অথবা আমদানি-রপ্তানির উদ্বৃত্ত[5] : আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হলে তাকে **বৈদেশিক ব্যবসায়ের অনুকূল উদ্বৃত্ত[6]** বলে। আবার রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হলে তাকে **বৈদেশিক ব্যবসায়ের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত[7]** বলে। প্রথমটি অতিরিক্ত অর্থনীতিক সুস্থতার লক্ষণ কিন্তু দ্বিতীয়টি ধারাবাহিক হলে দেশের গভীর অর্থনীতিক সংকট উপস্থিত হয়েছে বুঝতে হবে।

বৈদেশিক ব্যবসায়ের সমস্যা : অবাধ আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক ব্যবসায়ের যত সুবিধাই থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির দরুন তার জটিলতা বেড়েছে।

১. প্রত্যেক দেশ স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায় সম্পর্কে, অর্থাৎ দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে, মুদ্রাবিনিময় সম্পর্কে, কর ও শুল্ক সম্পর্কে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র আইন, নিয়ম ও পদ্ধতি আছে।

২. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় প্রত্যেক দেশেই সরকারের নিয়মাধীন বলে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য পেতে ও আমদানি দ্রব্যের মূল্য পাঠাতে অনেক অসুবিধা আছে। তা ছাড়া মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারের পরিবর্তন ঘটতে পারে ও তাতে রপ্তানি বা আমদানি ব্যবসায়ের লাভ ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

৩. রপ্তানি দ্রব্য পাঠানোর পর তার মূল্য পেতে যথেষ্ট দেরী হয়।

৪. রপ্তানি দ্রব্য পাঠানোর অনেক পরে, তা আমদানিকারীর কাছে পৌঁছায়। পথে দ্রব্যাদি আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। তাতে বিক্রয়ের সর্তানুযায়ী রপ্তানিকারী বা আমদানিকারী অথবা উভয়েই সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৫. সুদূরবর্তী অপরিচিত বিক্রেতা ও ক্রেতার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আমদানি ও রপ্তানিকারী উভয়কে নিঃসন্দেহ হতে হয়।

৬. আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর সহযোগিতা ছাড়া চলে না।

৭. উভয় দেশের সরকারের আইন অনুযায়ী এবং ব্যবসায়িক প্রথাগত নানাবিধ দলিল এতে প্রয়োজন হয়। অনেক খুঁটিনাটি আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।

রপ্তানি ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ
EXPORT AND IMPORT CONTROL

বর্তমানে সব দেশেই রপ্তানি ও আমদানি ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণের কারণ : ১. আমদানি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা আমদানি কমিয়ে প্রত্যেক দেশই অর্থনীতিক ও শিল্পগত আত্মনির্ভরতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে চায়।

---

5. Balance of Trade 6. Favourable Balance of Trade.
7. Unfavourable Balance of Trade.

নিয়ন্ত্রণবিহীন রপ্তানি বাণিজ্যের দরুন দেশের মূল্যবান খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্য ঐ সকল দ্রব্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

৩. আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণের অভাবে অনেক অপ্রয়োজনীয় আমদানির দরুন মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটে। সুতরাং কষ্টার্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও জাতীয় স্বার্থে তার যথাযথ ব্যবহারের জন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৪. আমদানি রপ্তানির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বৃহৎ কারবারীদের সাথে সমপরিমাণে আমদানি ও রপ্তানির সুযোগ ভোগ করতে পারে না। সকল সুযোগ-সুবিধাই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা গ্রাস করে।

৫. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে দেশীয় শিল্পসমূহকে উৎসাহ দেওয়া হয়।

৬. দেশের রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশী হলে আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিলে, তা দূর করে ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

৭. জাতির আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। এর দ্বারা দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ স্থাপনে উৎসাহ প্রদান ও তাদের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। অনুরূপ কারণে, দেশরক্ষার জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও কাঁচামাল যাতে অন্যদেশের হস্তগত না হয়, সেজন্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন হয়ে থাকে।

৮. যে সব দেশ পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি গ্রহণ করেছে তাদেব পক্ষে পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে আমদানি ও বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্যথায় গোটা পরিকল্পনাটি বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ ঃ ১, নিষিদ্ধকরণ[8] ঃ জাতীয় স্বার্থে অবাঞ্ছিত বিদেশী পণ্যের আমদানি ও সীমাবদ্ধ যোগানের গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় সম্পদের সংরক্ষণের জন্য সে সবের রপ্তানি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, আমদানি ও রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

২. **অনুমতিপত্রদান ব্যবস্থা**[9] ঃ বিবিধ দ্রব্যের রপ্তানি ও আমদানি হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের রপ্তানি ও আমদানির অনুমতিপত্র প্রদানের ব্যবস্থা সকল দেশেই প্রচলিত। তা দু'রকমের। একটি হল সাধারণ খোলা অনুমতি[10] এবং অপরটি হল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে প্রদত্ত বিশেষ অনুমতি পত্র[11]।

৩. **শুল্ক**[12] ঃ আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক ধার্য করে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ একটি বহুল প্রচলিত পন্থা। এই শুল্ক ধার্য করে ও ধার্য শুল্কের হ্রাস-বৃদ্ধি করে প্রয়োজনানুযায়ী আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমানো বাড়ানো যায়।

৪. **পরিমাণ নির্ধারণ**[13] ঃ পণ্য বিশেষের কোনটি কতটা পরিমাণে আমদানি ও রপ্তানি করা যাবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে সরকার আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

৫. **বিশেষ সুবিধা**[14] ঃ একাধিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা তারা পরস্পরকে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক থেকে রেহাই, শুল্ক হ্রাস ইত্যাদি বিশেষ

---

8. Prohibition. 9. Licensing. 10. Open General Licence (OGL).
11. Private Licence. 12. Duty. 13. Quota.
14. Preferential Treatment.

সুবিধা দিতে পারে। 'ভূতপূর্ব' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে[15] এই প্রকার বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এবং পশ্চিম ইয়োরোপের কমন মার্কেটভুক্ত দেশগুলির মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা রয়েছে।

৬. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ[16]ঃ বহির্ব্যবসায়ে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় করে মূল্য প্রদান করতে হয়। সুতরাং মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারের আকস্মিক পরিবর্তনে ক্রেতা বা বিক্রেতার ক্ষতি হয়ে থাকে। এজন্য বর্তমান কাগজের মুদ্রামান ব্যবস্থাতে সকল দেশেই মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ছাড়া মূল্যবান ও দুর্লভ বিদেশী মুদ্রার যাতে অপচয় ও অপব্যবহার না হয় সেজন্যও বিনিময় হারের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সরকারকে বিদেশী মুদ্রার যাবতীয় আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে।

৭. বহির্ব্যবসায়ে সরকারী একচেটিয়া কারবার[17]ঃ আজকাল অনেক দেশেই বহির্ব্যবসায়ে সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিতভাবে আমদানি ও রপ্তানির জন্য সরকারী একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হচ্ছে। সকল সমাজতান্ত্রিক দেশেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত, ভারতেও এটি অংশত বর্তমান।

নিয়ন্ত্রণ সংগঠন ঃ আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে দেশে যে সংগঠন দেখা যায় তা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে।

১. সর্বোচ্চ স্তরে সরকার কর্তৃক আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতিসমূহ স্থির হয়ে থাকে এবং তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তর ও তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা আমদানি ও রপ্তানির অনুমতিপত্র (লাইসেন্স) দিয়ে থাকে।

২. শুল্কে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমদানি ও রপ্তানি পণ্যাদির উপর ধার্য শুল্ক আদায় করা হয় এবং এ জন্য বন্দর ও আমদানি রপ্তানি কেন্দ্রে কঠোরভাবে পণ্যের আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৩. প্রতি বন্দরে বন্দর কর্তৃপক্ষ পণ্য বোঝাই ও খালাসের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের পাশাপাশি শুল্কদপ্তর ও আমদানি ও রপ্তানিনিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্তব্য পালনে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।

রপ্তানি ব্যবসায় (THE EXPORT TRADE)

রপ্তানিকারিগণের শ্রেণীবিভাগ ঃ রপ্তানি ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যবসায়ীদের প্রথমেই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা,—ক. প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারী[18] এবং খ. পরোক্ষ রপ্তানিকারী[19]।

ক. প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারী ঃ পণ্যের উৎপাদনকারীরা সরাসরিভাবে পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে, প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারী হিসাবে কাজ করে। তিন ভাবে তারা প্রত্যক্ষভাবে রপ্তানি করে। ১. **পণ্যোৎপাদনকারীরা** সরাসরিভাবে বিদেশস্থ ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে রপ্তানি করে। ২. **বিদেশস্থ পাইকারী কারবারী অথবা পণ্য পরিবেশক**[20] মারফত পণ্যোৎপাদনকারীরা পণ্য রপ্তানি ও বিক্রয় করে। ৩. **বিদেশস্থ-ঠিকাদার**[21] এবং পণ্য আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানের[22] কাছে তারা পণ্য রপ্তানি ও বিক্রয় করে।

খ. পরোক্ষ রপ্তানিকারিগণ[23]ঃ রপ্তানি ব্যবসায়ে মোটামুটি পাঁচ রকমের মধ্যস্থ-

---

15. Imperial Preference. 16. Exchange Control.
17. State Monopoly of Foreign Trade. 18. Direct Exporter.
19. Indirect Exporter. 20. Wholesalers or Distributors.
21. Jobbers. 22. Import Houses. 23. Indirect Exporters.

কারবারীরা পরোক্ষ রপ্তানিকারী হিসাবে নিযুক্ত রয়েছে :—১. **রপ্তানিকারক বণিক এবং ঠিকাদারগণ**[24] দেশস্থ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে পণ্য কিনে বিদেশে চালান দেয়। ২. **রপ্তানি কমিশন কারবার**[25] **নামক এক প্রকার রপ্তানি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান** বিদেশস্থ আমদানিকারীর প্রতিনিধি হিসাবে কমিশন বা দস্তুরির বিনিময়ে উৎপাদনকারীদের পণ্য বিদেশে চালান দেয়। ৩. **উৎপাদনকারীর রপ্তানি প্রতিনিধি**[26] নামক ব্যবসায়ীরা উৎপাদনকারীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশে পণ্য রপ্তানি ও বিক্রয় করে। এরা পারিশ্রমিক বাবদ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে দস্তুরি পায়। ৪. **অপর দেশে অবস্থানকারী বিদেশী ক্রেতাগণ**[27] নিজ দেশে আমদানিকারীদের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশের বাজার থেকে অথবা আমদানিকারীদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য কিনে নিজ দেশে চালান দেয়। সরকারী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রেই এটা বেশী দেখা যায়। ৫. **রপ্তানিকারী ও আমদানিকারী দালালগণ**[28] রপ্তানিকারী ও আমদানিকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যবর্তী কারবারী হিসাবে দস্তুরির বিনিময়ে পণ্য রপ্তানি করে থাকে। তারা প্রত্যেকে সাধারণত এক এক শ্রেণীর পণ্যের কারবারে বিশেষত্ব অর্জন করে। চা, কফি, রবার, তৈলবীজ, তুলা প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়েই এদের অধিক দেখতে পাওয়া যায়।

ফরমাশ পত্র[29] **:** যে দলিলটি থেকে রপ্তানি ব্যবসায়ের সূত্রপাত ঘটে, তাকে 'ইন্‌ডেন্ট' বা ফরমাশ পত্র বলে। ইন্‌ডেন্ট শব্দটির প্রকৃত অর্থ খাঁজ। রপ্তানি কারবারে এটি অর্ডার অর্থাৎ ফরমাশ কথাটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এর কারণ কার্বণ কাগজের সাহায্যে প্রতিলিপি প্রস্তুত করার ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার আগে একই ফরমাশপত্র দুই তিনখানি লিখে একসঙ্গে তাদের প্রান্তগুলি আঁকাবাঁকা করে ছিঁড়ে দেওয়া হত। সেগুলি যে একে অপরের প্রতিলিপি মাত্র তা প্রমাণ করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্যই এরূপ ছিন্ন ফরমাশপত্রকে ইন্‌ডেন্ট বলা হত। বর্তমানে প্রতিলিপি মুদ্রণের নানাবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় এই পদ্ধতি উঠে গেছে। কিন্তু ঐতিহ্যবশত এর পুরাতন নামটি থেকে গেছে।

পণ্যের বিবরণ, যথা—পরিমাণ, আয়তন, ট্রেড মার্ক, গুণাবলী, মূল্য, প্যাকিং ও পণ্য প্রেরণ সম্পর্কে নির্দেশ, জাহাজে বোঝাইয়ের তারিখ এবং মূল্য প্রদান পদ্ধতি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে আমদানিকারীর নির্দেশ, ফরমাশ পত্রে উল্লেখিত থাকে।

ইন্‌ডেন্ট দুরকমের, যথা, ঐচ্ছিক[30] এবং নির্দিষ্ট[31]। ঐচ্ছিক ফরমাশ পত্রের ক্ষেত্রে, আমদানিকারীর যে সব নির্দেশ থাকে তা প্রয়োজনমত রপ্তানিকারী রদবদল করতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট ফরমাশপত্রের ক্ষেত্রে তা চলে না।

রপ্তানি প্রণালী (EXPORT PROCEDURE)

ভারত থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করতে হলে রপ্তানিকারীকে যে সব ধাপগুলি এবং আইনগত এবং প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা পার হতে হয় তা নিচে বর্ণনা করা হল।

১. বিদেশী ক্রেতার কাছ থেকে ফরমাশ প্রাপ্তি[32] **:** বিদেশী ক্রেতার কাছ থেকে রপ্তানিকারী পণ্যের জন্য বা ফরমাশ পত্র বা ইন্‌ডেন্ট পেলে রপ্তানির কার্যকলাপ শুরু হয়। এই ফরমাশ পত্রে বিদেশী ফরমাশদাতা পণ্যের বিশদ বিবরণ, দাম, পণ্যের মোড়ক ও গাঁটরী বাঁধাই, জাহাজে বোঝাই, বীমা ও মূল্য প্রদানের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ নির্দেশ দেয়।

---

24. [illegible]port Merchants and Jobbers. 25. Export Commission House.
26. [illegible]ufacturer's Export Agent. 27. Resident Buyers.
28. [illegible] and Import Brokers. 29. Indent.
30. [illegible]t. 31. Closed or Firm Indent.
32. [illegible]ent from foreign customer.

২. **ঋণের প্রত্যয়ন পত্র দাবি**[33] : উপরোক্ত নির্দেশ ও শর্তাদি গ্রহণযোগ্য হলে রপ্তানিকারী ফরমাশদাতাকে পত্র বা সাংকেতিক তারবার্তা মারফৎ স্বীকৃতি জানায় এবং ফরমাশ-দাতার কাছ থেকে ঋণের প্রত্যয়ন পত্র দাবি করে ও ঐ পণ্যগুলি আমদানির জন্য ফরমাশ দাতার আমদানির সরকারী অনুমতি পত্র আছে কিনা তা জানতে চায়।
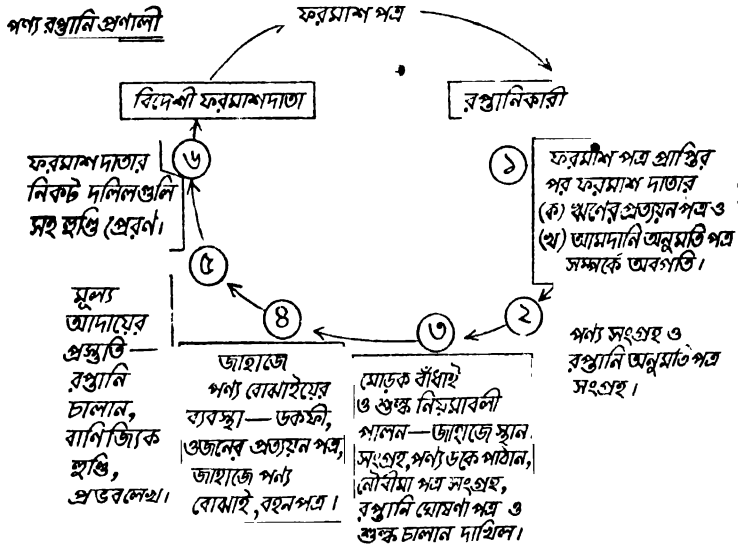
৩. **রপ্তানির সরকারী অনুমতি পত্র সংগ্রহ**[34] : ফরমাশী পণ্যটি রপ্তানির খোলা অনুমতি তালিকার[35] অন্তর্গত না হলে রপ্তানিকারীকে তা রপ্তানির জন্য সরকারী অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হবে। ভারত সরকারের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে যে সব পণ্যের রপ্তানির জন্য অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে তার একটি তালিকা আছে। এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা সরকারী খাজাঞ্চিখানায়[36] নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রপ্তানিকারীকে আবেদন করতে হয়। সাধারণত এই অনুমতি পত্র তিন মাসের জন্য বলবৎ থাকে। পুরাতন রপ্তানিকারীদের জন্য সরকার সাধারণত রপ্তানির জন্য 'কোটা'[37] নির্দিষ্ট করে দেয়।

রপ্তানির অনুমতি পত্র প্রাপ্তি ও ফরমাশদাতার কাছ থেকে ঋণের প্রত্যয়ন পত্র প্রাপ্তির পর রপ্তানিকারী নিজে উৎপাদক না হলে বাজার থেকে বা উৎপাদকদের কাছ থেকে দ্রব্যটি কেনার বন্দোবস্ত করে।

৪. **বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ-নির্দেশ পালন**[38] : ভারতে বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে নেপাল, ভুটান প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ছাড়া অন্যত্র পণ্য রপ্তানি করতে হলে, কালেকটর অব কাস্টমস অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে রপ্তানিকারীকে নির্দিষ্ট কতকগুলি ফরমে এই মর্মে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হয় যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সে রপ্তানি দ্রব্যের পূর্ণ রপ্তানি মূল্য

---

33. Letter of Credit. 34. Procuring Export Licence.
35. O. G. L. 36. Treasury. 37. Quota.
38. Observing Foreign Exchange Regulations.

বাবদ বিদেশী মুদ্রা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে জমা দেবে। তা জমা না পড়লে শাস্তির বিধান আছে।

৫. মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির করা[৩৯] ঃ বিনিময় হারের ওঠানামার ফলে রপ্তানির মুনাফা যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য রপ্তানিকারীকে ব্যাঙ্কের সাথে কি দরে রপ্তানি মূল্য বাবদ প্রাপ্ত বিদেশী মুদ্রা দেশী টাকায় ভাঙান হবে সে সম্পর্কে চুক্তি করতে হয়।

৬. জাহাজে বোঝাইয়ের আদেশ পত্র[৪০] ঃ এরপর রপ্তানিকারী সুবিধাজনক শর্তে জাহাজ কোম্পানীর সাথে জাহাজে স্থান সংগ্রহের চুক্তি করে তার কাছ থেকে সংশিলষ্ট জাহাজের কাপ্তেনের উপর পণ্য বোঝাইয়ের আদেশ পত্র সংগ্রহ করে।

৭. মোড়কবাঁধাই ও জাহাজের বোঝাইয়ের জন্য প্রেরণ[৪১] ঃ জাহাজ কোম্পানী পণ্যের ওজন ও মোড়ক বা গাঁটরীগুলির মাপ অনুযায়ী মাসুল আদায় করে বলে রপ্তানিকারীকে অতঃপর পণ্য যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এরূপভাবে মোড়ক ও গাঁটরী বাঁধতে হয়, যেন যথাসম্ভব অল্প আয়তনের গাঁটরী বা মোড়কের মধ্যে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে পণ্য ধরে। দ্রব্যানুসারে কাঠের বাক্সে কিংবা চটের থলিতে দ্রব্যের মোড়ক বা গাঁটরী বাঁধাইয়ের পর তার উপর চারদিকে প্রেরকের নাম ও প্রেরক-বন্দর ও দেশ, প্রাপকের নাম ঠিকানা ও গন্তব্য বন্দর, দ্রব্যটি কাঁচ কিংবা অন্য কোন ভঙ্গুর সামগ্রী হলে তাতে সাবধান বাণী যথা, ইংরেজীতে 'গ্লাস উইথ কেয়ার' 'দিস সাইড আপ'—ইত্যাদি বড় ও মোটা হরফে স্পষ্ট করে কালো কালিতে লিখে দিতে হবে। তা ছাড়াও বিশেষ চিহ্ন স্বরূপ তাতে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা বৃত্ত কিংবা ষড়ভুজ ইত্যাদির ছাপ দিয়ে তার মধ্যে প্রাপকের নাম প্রভৃতি চিহ্নাদি আমদানি-কারীর নির্দেশমত এঁকে দেওয়া যেতে পারে। এসবের পরে মোড়কগুলি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রপ্তানিকারীর গুদাম থেকে জাহাজ-ঘাটে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয় এবং এ কাজে ফরোয়ারডিং এজেন্ট নামে বিশেষজ্ঞ ঠিকাদারের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. **শুল্কবিভাগীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন**[৪২] ঃ এরপর রপ্তানিকারী তিন কেতায়[৪৩] একটি শুল্কচালান বা জাহাজী চালান[৪৪] প্রস্তুত করে রপ্তানির সরকারী অনুমতিপত্রসহ[৪৫] একটি রপ্তানি ঘোষণাপত্র[৪৬] শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করে। তা পরীক্ষা করে শুল্কে কর্তৃপক্ষ রপ্তানির আদেশ[৪৭] দেয় এবং শুল্কে কর্তৃপক্ষ ওই জাহাজী বিলের উপর দেয় শুল্কের পরিমাণ লিখে দেয়। নির্ধারিত শুল্ক জমা দিলে ও জাহাজ-ঘাটার ফি[৪৮] বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে রসিদসহ জাহাজী বিলের একটি প্রতিলিপি ফেরত নওয়া হয়। এর পর রপ্তানিকারীকে রপ্তানির শুল্কে বিভাগীয় অনুমতি পত্র[৪৯] দেওয়া হয়।

৯. ডক রসিদ ও মেট রসিদ[৫০] ঃ এরপর রপ্তানি পণ্য ডকে পাঠান হলে, ডক কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য ফি[৫১] প্রদানের পর রপ্তানিকারী ডক কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কোন ওজনকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পণ্য ওজন করিয়ে ওজনের প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করে। ডক-কর্তৃপক্ষ জাহাজে পণ্য বোঝাই করার ভার নিলে রপ্তানিকারী তার কাছ থেকে ডক রসিদ পায়। সেজন্য ডককর্তৃপক্ষকে জাহাজী বিল ও জাহাজে বোঝাইয়ের আদেশ

---

39. Fixing the rate of exchange. 40. Shipping Order.
41. Packing and Forwarding.
42. Observance of shipping formalities. 43. In triplicate.
44. Customs challan or shipping bill. 45. Export licence.
46. Export declaration. 47. Export order. 48. Wharfage.
49. Customs Export Pass. 50. Dock's Receipt and Mate's Receipt.
51. Dock dues.

পত্র[৫২] ও সেই সঙ্গে শুল্ক কর্তৃপক্ষের রপ্তানি অনুমতিপত্র[৫৩] দেখাতে হয়। রপ্তানি-কারী নিজেই পণ্য বোঝাইয়ের ব্যবস্থা করলে জাহাজের কাপ্তেনের নিকট জাহাজী বিল ও জাহাজে বোঝাইয়ের আদেশপত্র জমা দিতে হয়। কাপ্তেনের সহকারী[৫৪] তখন পণ্য বোঝাই করে রপ্তানিকারীকে মেট রসিদ দেয়।

১০. বহনপত্র বা চালানি রসিদ[৫৫] ঃ এবার রপ্তানিকারী তিন বা পাঁচ কেতায়[৫৬] একটি বহনপত্র বা চালানি রসিদ প্রস্তুত করে। তাতে জাহাজের নাম, যে বন্দরে পণ্য বোঝাই করা হয়েছে তার নাম, গন্তব্যস্থল, পণ্যের বর্ণনা, তারিখ, মাসুল ও প্রাপকের নাম প্রভৃতি লেখা হয়। তাতে যথারীতি টিকিট লাগাতে হয়। ডক বা মেট রসিদসহ চালানি রসিদটি রপ্তানিকারী জাহাজী পরিবহণ কোম্পানীর কাছে দাখিল করলে জাহাজের অধ্যক্ষ তা পরীক্ষা করে তাতে সই করে। এই সময়ে জাহাজ কোম্পানী রপ্তানিকারীর কাছে মাসুলের হিসাব দেয়; একে মাসুল চিঠি বা 'ফ্রেট নোট[৫৭]' বলে। রপ্তানিকারী তখন মাসুল মিটিয়ে দিতে পারে কিংবা তা আমদানিকারীর কাছে থেকে আদায়যোগ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে চালানি রসিদের উপর 'ফ্রেট ফরওয়ার্ড[৫৮]' কথাটি লিখতে হয়।

১১. বীমাপত্র[৫৯] ঃ জাহাজে পরিবহণকালে পথের ঝুঁকি দূর করার জন্য রপ্তানি-কারী এবার কোনও বীমা কোম্পানী অথবা বীমার দায়গ্রাহকের কাছ থেকে নৌ-বীমা-পত্র গ্রহণ করে।

১২. রপ্তানি চালান[৬০] ঃ এর পর রপ্তানিকারী চারটি কেতায় পণ্যের রপ্তানি চালান প্রস্তুত করে। তাতে পণ্যের বর্ণনা, গুণাগুণ, দর, বিভিন্ন দেয়, মূল্য প্রদানের শর্তাদি প্রভৃতি লেখা হয়। প্রয়োজন হলে রপ্তানিকারী তার দেশে অবস্থিত আমদানিকারী রাষ্ট্রের বাণিজ্যদূতের দ্বারা উপরোক্ত চালান প্রত্যয়ন করিয়ে নেয় এবং পণ্যের প্রভাব-লেখ[৬১] সংগ্রহ করে।

১৩. আমদানিকারীকে জানানো[৬২] ঃ এই সময় আমদানিকারীকে অগ্রিম জানানোর জন্য রপ্তানিকারী তার কাছে চালানি রসিদের হস্তান্তর-অযোগ্য একটি নকল, রপ্তানি চালানের একটি নকল অন্যান্য দলিলপত্রের নকলসহ পাঠিয়ে দেয়।

১৪. মূল্য আদায়[৬৩] ঃ এবার রপ্তানিপণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য রপ্তানিকারী এইভাবে অগ্রসর হয়,—(ক) সে তিন কেতায় রপ্তানিপণ্যের মূল্য বাবদ একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডি প্রস্তুত করে; (খ). এর পর সে বাণিজ্যিক হুণ্ডি, চালানি রসিদ, নৌ-বীমাপত্র, রপ্তানি চালান, প্রভবলেখ, বাণিজ্যদূত কর্তৃক প্রত্যায়িত চালান[৬৪] প্রভৃতি একত্র করে আমদানিকারীর কাছে ব্যাঙ্ক মারফত পাঠায়। এই সব দলিলসংযুক্ত হুণ্ডিকে দলিলীহুণ্ডি[৬৫] বলে। এই দলিলীহুণ্ডি স্বীকার সাপেক্ষ[৬৬] হলে আমদানি-কারীর দেশে অবস্থিত ব্যাঙ্কের শাখা কর্তৃক আমদানিকারীকে দিয়ে হুণ্ডিটি সই করিয়ে নিয়ে চালানি রসিদ ও অন্যান্য দলিলগুলি অর্পণ করে। দলিলীহুণ্ডিটি মূল্য প্রদান সাপেক্ষ[৬৭] হলে আমদানিকারীর কাছ থেকে মূল্য আদায় করে দলিলগুলি আমদানিকারীকে অর্পণ করা হয়। যদি রপ্তানিকারীর অবিলম্বে টাকার প্রয়োজন হয়, তবে সে তার ব্যাঙ্কের কাছে দলিলীহুণ্ডি বিক্রয় বা বাট্টা করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে

---

52. Shipping Order. 53. Custom's Export Pass. 54. Mate.
55. Bill of lading. 56. In three or five copies. 57. Freight Note.
58. Freight Forward. 59. Insurance Policy. 60. Export Invoice.
61. Certificate of Origin. 62. Informing the Importer.
63. Realisation of price. 64. Consular Invoice.
65 Documentary Bill.
66. Documents Against Acceptance or D|A Bill.
67. Documents Against Payment or D|P Bill.

ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারীর নামে আমদানিকারী কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের প্রত্যয়ন পত্র[68] এবং প্রেরিত পণ্যের বন্ধকপত্র[69] দাবি করে। এরূপ বন্ধকপত্রের দ্বারা ব্যাঙ্ক রপ্তানিপণ্যের উপর পূর্বস্বত্ব লাভ করে। আমদানিকারী হুণ্ডির টাকা না দিলে, পণ্য বিক্রি করে দিয়ে টাকা উসুল করার অধিকার ব্যাঙ্ক পায়।

ব্যাঙ্ক তার শাখা মারফত দলিলীহুণ্ডির তিন কেতা তিন দফায় পর পর তিন ডাকে[70] আমদানিকারীর কাছে পাঠায়। তার এক প্রস্থ হারিয়ে গেলেও অন্তত এক প্রস্থ যাতে আমদানিকারীর কাছে পৌঁছায়, সেজন্যই এরূপ ব্যবস্থা।

আমদানিকারী হুণ্ডি স্বীকার বা মূল্য পরিশোধ করে দলিলীহুণ্ডি গ্রহণ করে ও তার বলে আমদানি পণ্য খালাস করে নেয়। পরে তা যথারীতি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে রপ্তানিকারীকে জানায়। পণ্যের দোষ বেরোলে রপ্তানিকারীকে অভিযোগ জানায় ও পত্রালাপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে আপসে অথবা স্থানীয় বণিকসভার[71] মধ্যস্থতায় তার মীমাংসা করে। এই হল পণ্যরপ্তানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মোড়ক বা গাঁটরি বাঁধাই ও চিহ্নাদি প্রদান[72] **:** বহির্ব্যবসায়ের পণ্য দ্রব্যাদির যথাযথ মোড়কে আবরিত বা গাঁটরি বাঁধাই ও ঐ সব গাঁটরিতে চিহ্নাদি প্রদানের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য বিক্রেতাকেই সর্বদাই দ্রব্য অনুযায়ী উপযুক্ত মোড়কে তা আবরণের বা গাঁটরি বাঁধাই-এর ব্যবস্থা করতে হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য, পথে যাতে তা ভেঙে না যায় বা কোন প্রকারে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মোড়ক বা গাঁটরির ধরনধারণ আমদানিকারক বন্দরে পণ্যাদি খালাসের ব্যবস্থা ও ঐ দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বন্দরে আধুনিক ভারী ক্রেন প্রভৃতি না থাকলে বড় আকারের পরিবর্তে গাঁটরিগুলি ক্ষুদ্রাকার হবে। বন্দর থেকে দেশের ভিতরে প্রাণী-বাহিত পরিবহণ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে সেখানে বড় আকারের গাঁটরি পাঠানো চলে না। দ্রব্য অনুযায়ী গাঁটরির উপাদান ব্যবহার করতে হয়। কাঁচের জিনিস হলে শক্ত কাঠের বাক্সের ভিতর কাগজ বা অন্য নমনীয় পদার্থের মধ্যে দ্রব্যগুলি সযত্নে রাখতে হয় যাতে ভেঙে না যায়। কাপড়ের গাঁটরি হলে চটের আবরণীতে লোহার পাতে দৃঢ়ভাবে বেঁধে কোণগুলি যাতে নষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা করতে হয়।

মোড়ক বা গাঁটরিতে চিহ্নাদি দেওয়ার জন্য, দ্রব্যের গাঁটরি বাঁধাই ও রপ্তানি যথাযথ আবরণী ও গাঁটরি বাঁধাইয়ের কাজটি সম্পাদনের জন্য আধুনিক দেশগুলিতে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়।

আমদানি ব্যবসায় (THE IMPORT TRADE)

আমদানিকারিগণের শ্রেণীবিভাগ : দুই প্রকারের আমদানিকারী দেখতে পাওয়া যায়,—(১) প্রত্যক্ষ আমদানিকারী—এরা নিজেদের প্রয়োজনে বিদেশস্থ রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান অথবা উৎপাদকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সরাসরি ফরমাশ পত্র পাঠিয়ে নিজেদের নামেই পণ্য আমদানি করে। এরা নিজ দেশে উৎপাদনকারী অথবা পণ্যের বিক্রেতা হতে পারে। (২) মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী। এরা নিজেদের প্রয়োজনে পণ্য আমদানি করে না। বিবিধ পণ্যের পাইকারী ব্যবসায়ী এবং উৎপাদনকারীরা তাদের প্রয়োজনীয় বিদেশী পণ্য এদের মারফত আমদানি করে। এদের মধ্যস্থ আমদানি ব্যবসায়ী[73] বলা যায়। এরা নিজেদের খরিদ্দারদের প্রয়োজনানুযায়ী বিদেশে পণ্যের ফরমাশ পাঠায় এবং ওই ব্যবসায়ীদের নামেই পণ্য আমদানি করে। এরা শুধু প্রকৃত

---

68. Letter of credit.
69. Letter of hypothecation.
70. In three succeeding mails.
71. Chamber of Commerce.
72. Packing and Marking.
73. Import Intermediaries.

আমদানিকারী ও বিদেশী রপ্তানিকারীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী আমদানি-বিশেষজ্ঞ মাত্র। ভারতের এই জাতীয় ব্যবসায়কে ফরমাশী পণ্য আমদানির ব্যবসায়[৭৪]

ফরমাশী পণ্য আমদানির ব্যবসায়[৭৫] : এটি আমদানি ব্যবসায়ের একটি প্রধান অঙ্গ। এতে নিযুক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি আমদানি ব্যবসায়ে মধ্যবর্তী কারবারী হিসাবে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ফরমাশী পণ্য আমদানির প্রতিষ্ঠান[৭৬] বলে। এদের কাছে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিদেশী পণ্য কেনার জন্য ফরমাশ দেয়। ফরমাশ মত ফরমাশী পণ্য আমদানি প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশী উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে নিজেরা পণ্য ক্রয় ও আমদানি করে খরিদ্দারদের কাছে বিক্রয় করতে পারে; কিংবা খরিদ্দারের হয়ে বিদেশী বিক্রেতার সাথে পণ্য ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় এবং খরিদ্দারের নামেই পণ্য ক্রয় ও আমদানি করে। প্রথম ক্ষেত্রে পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্যটুকু এদের মুনাফা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এরা শুধু দস্তুরি পায়।

যে সব খরিদ্দার এদের পণ্যের ফরমাশ দেয় তাদের ফরমাশ-দাতা[৭৭] ও এদের ফরমাশ-গ্রহীতা[৭৮] বলে।

ফরমাশ পত্র গ্রহণ না প্রত্যাখ্যান করা হল, ফরমাশগ্রহীতা ফরমাশ পত্র পাওয়ার পর চার সপ্তাহের মধ্যে ফরমাশদাতাকে তা জানিয়ে দেবে। গৃহীত হলে জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ের জন্য ফরমাশ-গ্রহীতাকে ছয় মাস সময় দেওয়া হয়। তা পার হলে ফরমাশদাতা ফরমাশ বাতিল করতে পারে। ফরমাশগ্রহীতা দস্তুরির ভিত্তিতে পণ্য আমদানি করলে পরিবহণকালে পণ্যের ঝুঁকির জন্য ফরমাশদাতার নামে নৌবীমা করা হয়। বন্দরে পণ্য পৌঁছলে মূল্য প্রদান ও পণ্য খালাসের জন্য যাবতীয় দলিলপত্র ফরমাশগ্রহীতা ফরমাশদাতার কাছে পাঠায়। যথাসময়ে মূল্য প্রদান না করার দরুন ফরমাশগ্রহীতার কোন ক্ষতি হলে ফরমাশদাতা দায়ী হয়। ফরমাশ মাফিক পণ্য না পেলে, পণ্য প্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে ফরমাশদাতা ফরমাশগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাবে।

ভারতে এই ধরনের ব্যবসায় আগে খুবই বেশী পরিমাণে চলত। বর্তমানে বিদেশী পণ্যের ক্রেতারা সরাসরি আমদানি শুরু করায় এই ব্যবসায় কমে যাচ্ছে।

ফরমায়েশী পণ্য আমদানি ব্যবসায়ের সুবিধা : (১) স্থানীয় ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা এতে যথেষ্ট উপকৃত হয়। কারণ, বিদেশী বাজার সম্পর্কে তাদের সম্যক পরিচিতি না থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতিতে তারা সহজেই পণ্য আমদানি করতে পারে। (২) ফরমায়েশী পণ্য আমদানিকারীরা ধারাবাহিক আমদানির জন্য বিদেশী ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের সাথে পরিচিত থাকায়, সুবিধা দরে পণ্য কিনতে পারে এবং এদের মারফত পণ্য আমদানি করে অল্প পরিমাণে ক্রয়কারী স্থানীয় ক্রেতারা ঐ সুবিধাজনক দরে পণ্য আমদানি করে লাভবান হয়। (৩) ফরমাশগ্রহীতারা প্রয়োজন হলে ফরমাশদাতাদের পক্ষে পণ্যমূল্য বাবদ হুণ্ডি গ্রাহক (ড্রয়ী) রূপে কাজ করে আমদানি ব্যবসায়ের অর্থ-সংস্থানে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করে। (৪) ফরমায়েশী পণ্য আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আমদানি ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞ হিসাবে নানাভাবে স্থানীয় ব্যবসায়ে সাহায্য করে।

অসুবিধা : (১) ফরমায়েশী পণ্য আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী হিসাবে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে থেকে, আমদানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয়। (২) বিদেশী বাজার ও আমদানি ব্যবসায় সম্বন্ধে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এরা অনেক সময় অতিরিক্ত মূল্য ও দস্তুরি আদায় করে। (৩) এরা সাধারণত আমদানির প্রত্যক্ষ কোন ঝুঁকি নেয় না, অথচ সাহায্য করার নামে

74. Indent Trade. 75. Indent Trade. 76. Indent Firms.
77. Indentor. 78. Indentee.

সবিশেষ দস্তুরি আদায় করে। এজন্য অন্যান্য মধ্যস্থ কারবারীর মত এরা নিজেদের পরগাছা বলে প্রমাণ করেছে।

আমদানি প্রণালী (IMPORT PROCEDURE)

বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে হলে আমদানিকারীকে নিম্নলিখিত প্রণালী বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

১. আমদানির অনুমতিপত্র সংগ্রহ[৭৯] : আমদানি পণ্যগুলি দুই প্রকার হতে পারে। কতকগুলি পণ্যের আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বিভিন্ন সময় সরকারের 'আমদানি ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণাদেশ'[৮০] এই প্রকার পণ্যের তালিকা দেওয়া হয়। একে 'খোলা সাধারণ অনুমতি তালিকা'[৮১] বলে। এই তালিকার অন্তর্গত দ্রব্যগুলি আমদানির জন্য শুধু সরকারের সাধারণ অনুমতি আবশ্যক হয়। এই তালিকা বহির্ভূত দ্রব্যগুলির আমদানির জন্য সরকারের আমদানি অনুমতি পত্রের[৮২] প্রয়োজন হয়। এবং সে ক্ষেত্রেই আমদানির জন্য সরকারী আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। আমদানিকারীরাও তিন প্রকারের। (১) পুরাতন আমদানিকারী[৮৩]—এদের জন্য সরকার থেকে আমদানির কোটা[৮৪] নির্দিষ্ট থাকে। (২) নূতন আমদানিকারী—এদের পক্ষে 'কোটা' আদায় করা সময়সাপেক্ষ। (৩) প্রকৃত ব্যবহারকারী—এদের সাধারণত কলকারখানার মালিক, বিদেশ থেকে নিজেদের কারখানার জন্য এদের কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। ভারত সরকার প্রতি বৎসর প্রত্যেকটি দ্রব্যের আমদানির একটি ঊর্ধ্বতম আর্থিক সীমা নির্দিষ্ট করেন। এই সীমার মধ্যে মোট আমদানির পরিমাণটি বিভিন্ন আমদানিকারীদের মধ্যে 'কোটা' হিসাবে ভাগ করে দেওয়া হয়।

আমদানির প্রস্তাবিত পণ্যটি যদি খোলা আমদানি[৮৫] অনুমতি তালিকা বহির্ভূত হয়, তবে প্রথমে আমদানিকারীকে সেজন্য অনুমতিপত্র আদায়ের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে হয় এবং এজন্য সরকারী খাজাঞ্চিখানায়, স্টেট ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হয়। অনুমতিপত্রের জন্য আবেদনের সাথে ওই ফি জমার রসিদ ও আয়কর সার্টিফিকেট দাখিল করতে হয়। তা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে আমদানিকারীকে আমদানি অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়।

২. বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ[৮৬] : সব দেশেই বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকায়, আমদানিকারীকে এরপর আমদানি পণ্যের মূল্য প্রদানের জন্য দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে হয়। ভারতে বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী আমদানিকারীকে নির্দিষ্ট ফরমে কোন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক (অর্থাৎ যে ব্যাঙ্ক আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে) মারফত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্র পরীক্ষা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা মঞ্জুর করে।

৩. ফরমাশ প্রেরণ[৮৭] : আমদানির অনুমতিপত্র ও বিদেশী মুদ্রার মঞ্জুরী পাওয়ার পর আমদানিকারী এবার বিদেশস্থ রপ্তানিকারীকে ফরমাশ পাঠায়। এই ফরমাশে পণ্যের দর নির্দিষ্ট না থাকলে ঐ ফরমাশকে খোলা ফরমাশ[৮৮] বলে। আর দর নির্দিষ্ট থাকলে তাকে পাকা ফরমাশ[৮৯] বলে। আমদানিকারী বিদেশস্থ রপ্তানি-

---

79. Procuring Import Licence. 80. Import Trade Control Order.
81. O. G. L. List. 82. Import licence. 83. Established Importer.
84. Quota. 85. O. G. L. 86. Procuring Foreign Exchange.
87. Sending the Indent. 88. Open Indent. 89. Closed Indent.

কারীর কাছে সরাসরি ফরমাশ পাঠাতে পারে কিংবা, বিদেশস্থ ইন্‌ডেণ্ট হাউস[90] নামে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের মধ্যস্থ কারবারীর উপর ফরমাশ দিতে পারে।

৪. ঋণের প্রত্যয়ন পত্র[91] **:** রপ্তানিকারীর আস্থা সৃষ্টির জন্য আমদানিকারী তাকে নিজের সম্পর্কে ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত একটি ঋণের প্রত্যয়ন পত্র পাঠায়। এর দ্বারা ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারীকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তাতে উল্লেখিত মূল্যের সীমার মধ্যে যে কোন মূল্যের হুণ্ডি আমদানিকারীর উপর কাটা হলে, ব্যাঙ্ক ঐ টাকা শোধ করবে। অবশ্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এরূপ প্রত্যয়ন পত্র আদায় করতে হলে আমদানিকারীকে আগেই সে পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে ব্যাঙ্কের কাছে আমানত হিসাব খুলতে হয়।

৫. রপ্তানিকারী-প্রেরিত দলিলীহুণ্ডি প্রাপ্তি[92] **:** পণ্য জাহাজে বোঝাইয়ের পর তা পেঁছানোর সম্ভাব্য তারিখ সহ সংবাদ ও বিবিধ দলিলের নকল আমদানিকারীর কাছে পেঁছায়। এর পর ব্যাঙ্ক মারফত দলিলীহুণ্ডি আসার সংবাদ তার কাছে পেঁছালে, তা ডি/এ বিল[93] হলে স্বীকার অর্থাৎ সই করে, আর ডি/পি বিল[94] হলে মূল্য পরিশোধ করে আমদানিকারী পণ্যের মালিকানার দলিল অর্থাৎ চালানি রসিদ ও অন্যান্য দলিল হাতে পায়।

৬. পণ্য খালাসের বন্দোবস্ত[95] **:** এবার আমদানিকারী নিজে অথবা **পণ্য খালাসী প্রতিনিধির**[96] মারফত এইভাবে পণ্য খালাসের বন্দোবস্ত করে ঃ—(ক) প্রথমেই চালানি রসিদ, চালান ও অন্যান্য দলিলের সাহায্য নিয়ে আমদানিকারী দুই বা তিন কেতায় একটি আগমপত্র[97] প্রস্তুত করে শুল্ককর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে। তার সাহায্যে শুল্ককর্তৃপক্ষ শুল্ক ধার্য করে দিলে তা শুল্ক অফিসে জমা দিতে হয়। আগম পত্রে জাহাজের লাইন ও রোটেশন নম্বর উল্লেখ করতে হয়। (খ) এরপর আগম-পত্রটি তার দ্বিতীয় প্রতিলিপিসহ[98] আমদানি বিভাগে যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করার জন্য পাঠানো হয় ও আমদানি তদারককারী কর্মচারী[99] সমস্ত দলিলগুলি পরীক্ষা করে "পাশ একজামিনার" নামে পরিচিত কর্মচারীর কাছে পাঠায়। দলিলগুলি

90. Indent House. 91. Letter of Credit.
92. Procuring Documentary Bills. 93. D|A Bills. 94. D|P Bills.
95. Measures for clearing the goods imported. 96. Clearing Agent.
97. Bill of Entry. 98. Duplicate. 99. Import Supervisor.

পরীক্ষা করে এই কর্মচারী আগমপত্রে "এপ্রেইজ এ্যান্ড পাশ" কথাটি লিখে এ্যাসিস্টান্ট কালেক্টর-এর কাছে পাঠালে তিনি আগমপত্রের প্রতিলিপিটি সই করে আমদানিকারীকে ফেরত দেন। তখন তা "কাস্টমস্ পাশ" অথবা শুধু "পাশ" নামে অভিহিত হয়। এর পর এই দলিলটি জেটিতে নিযুক্ত শুল্কবিভাগীয় মূল্য নিরূপকের[100] কাছে পাঠান হয়। তিনি দলিলপত্র ও পণ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করে "এপ্রেইজ ইন ফুল" বা 'সম্পূর্ণরূপে মূল্য নিরূপিত' এই কথাটি লিখে সেটি ফেরত দিয়ে দেন। এখানেই যাবতীয় শুল্কবিভাগীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। (গ) এবার আমদানিকারী অথবা তার প্রতিনিধি 'জেটি চালান'[101] পূরণ করে তৎসহ জেটি অর্থাৎ বন্দরকর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অর্থ জমা দেয়। এবার জেটির যে শেডে পণ্যসমেত জাহাজটি অপেক্ষা করছে, তার ফোরম্যানের কাছে (১) কাস্টম্স্ পাশ, (২) জেটি চালান, (৩) চালানি রসিদ বা বহনপত্র এবং (৪) চালান প্রভৃতি দলিলগুলি নিবন্ধনের জন্য জমা দেওয়া হয়। ফোরম্যান তখন পুনরায় শুল্ক মূল্য নিরূপক এবং শুল্কবিভাগীয় যাচাই কর্মচারীর কাছে ঐ দলিলগুলি পাঠালে, তাবা যাচাইয়ের পর তাতে 'শুল্কবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত'[102] এই কথাটি লিখে দেয়। তখন শেড ফোরম্যান ঐ পণ্য খালাসের আদেশ পত্র[103] দেয়। এবার কাস্টম্স্ পাশ ও খালাসের আদেশ পত্র জেটির পণ্যখালাস বিভাগের প্রধান কর্মচারীর কাছে পাঠান হলে, তিনি তা সই করে পণ্যের জন্য একটি 'গেট পাশ' মঞ্জুর করেন। তাতে পণ্যের পূর্ণবিবরণ এবং যে গেট বা দরজা দিয়ে পণ্য জেটি থেকে বাইরে যাবে তার উল্লেখ থাকে। জেটি থেকে পণ্য পরিবহণের জন্য যে গাড়ি নিযুক্ত হয়, তার জন্যও 'পাশ' বা টিকিট নিতে হয় এবং পণ্য বাইরে আনার সময় গেটে অবস্থিত কর্মচারীর[104] কাছে 'গেট পাশ' ও 'গাড়ির টিকিট' দেখাতে হয়।

ভারতের বহির্ব্যবসায়ের কয়েকটি দিক
SOME ASPECTS OF FOREIGN TRADE IN INDIA

১. ভারতে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ: নিচের হিসাবে তা সংক্ষেপে দেখান হল।

বৎসর	আমদানি (কোটি টাকা)	রপ্তানি (কোটি টাকা)	মোট (কোটি টাকা)	বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (কোটি টাকা)
১৯৫০-৫১	৬৫০·৪৩	৬০০·৬৮	১২৫১·১১	— ৪৯·৭৫
১৯৬০-৬১	১,১২১·৬২	৬৪২·৫২	১,৭৬৩·৯৪	—৪৭৯·৩০
১৯৭৩-৭৪	২,৬৩৬·৩০	২,৪১১·২৬	৫,০৪৭·৫৬	—২২৫·০৪

২. ভারতে রপ্তানি ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ: বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথমদিকে ১৯৪০ সালের মে মাসে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ভারতে সর্বপ্রথম রপ্তানি ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত হয়। প্রথমে ১৮৭৮ সালের নৌ-শুল্ক আইন[105] অনুযায়ী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। পরে ভারত রক্ষাবিধি[106] অনুযায়ী তা প্রতি বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধির দ্বারা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯৪৭ সালে রপ্তানি ও আমদানি আইন[107] নামে স্বতন্ত্র একটি আইন পাশ হয়। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয়

100. Appraiser. 101. Jetty challan.
102. 'Passed out of Customs Control in Full'.
103. Delivery Order. 104. Gate officer. 105. Sea Customs Act.
106. Defence of India Rules.
107. Export and Import Control Act.

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রিদপ্তর নীতি নির্ধারণ করে এবং এক বছর বা ছয় মাস আগে তা ঘোষণা করা হয়।

নিয়ন্ত্রণ সংগঠন : সারাভারতে রপ্তানি ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ সংগঠনের সর্বপ্রধান কর্তা হলেন চীফ কন্ট্রোলার অব ইম্‌পোর্টস্‌ এ্যান্ড এক্‌স্‌পোর্টস। এঁর অধীনে কলকাতা ও বোম্বাই বন্দরের একজন করে জয়েন্ট চীফ কন্ট্রোলার অব ইম্‌পোর্টস্‌ এ্যান্ড এক্‌স্‌পোর্টস্‌ আছেন। এ ছাড়া মাদ্রাজ এবং কোচীন বন্দরে একজন করে ডেপুটি চীফ কন্ট্রোলার অব ইম্‌পোর্টস্‌ এ্যান্ড এক্‌স্‌পোর্টস্‌ আছেন। পণ্ডিচেরীতে ভূতপূর্ব ফরাসী অধিকৃত ভারতীয় বন্দরসমূহের জন্য একজন চীফ কন্ট্রোলার অব ইম্‌পোর্টস্‌ এ্যান্ড এক্‌স্‌পোর্টস্‌ আছেন। এ ছাড়া রাজকোটে একজন এক্‌স্‌পোর্ট এ্যান্ড ইমপোর্ট ট্রেড কন্ট্রোলার ও অমৃতসর, শিলং ও ত্রিপুরাতে একজন করে এক্‌স্‌পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোলার আছেন। আন্দামানের চীফ কমিশনারকে রপ্তানি লাইসেন্স দেওয়ার অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বন্দর ও শুল্ককর্তৃপক্ষও আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার জন্য দায়ী থাকে। বন্দর কর্তৃপক্ষ জাহাজ থেকে পণ্য খালাস ও জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ে তদারকী করে ও শুল্ককর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে। শুল্ককর্তৃপক্ষ আমদানী রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ধারিত হারে শুল্ক ধার্য ও আদায় করে।

৩. আমদানি নিয়ন্ত্রণ নীতি : ভারতের সীমাবদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পণ্যাদি আমদানির কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করাই বর্তমান আমদানি নীতির মূল উদ্দেশ্য। এইজন্য পুঁজিদ্রব্য, পুঁজিদ্রব্য মেরামতির সাজসরঞ্জাম ও শিল্পের কাঁচামালকে আমদানি লাইসেন্স প্রদানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ভোগ্যপণ্য আমদানির পরিমাণ ও তার লাইসেন্স সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। দেশীয় পণ্যের প্রতিযোগী পণ্য আমদানিও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ডলার ও অন্যান্য দুর্লভ মুদ্রা এলাকা[১০৮] থেকে আমদানি হ্রাস ও সুলভ মুদ্রা এলাকা[১০৯] থেকে আমদানি বৃদ্ধি করার জন্য প্রথমোক্ত এলাকা থেকে অল্প ও দ্বিতীয় এলাকা থেকে বেশী আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যবর্তীকাল থেকে তীব্র বৈদেশিক মুদ্রাসংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যাবতীয় অনপরিহার্য[১১০] দ্রব্যের আমদানি অতিশয় কঠোরভাবে হ্রাস করা হয়েছে। প্রতি ছয়মাস অন্তর এজন্য লাইসেন্স প্রদানের নীতির পর্যালোচনা করে তা প্রয়োজনীয়রূপে সংশোধিত হয়ে থাকে।

আমদানির লাইসেন্স দুই প্রকারের। একটি হল **খোলা আমদানি অনুমতি পত্র**। এটি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দেশ থেকে কয়েকটি বিশেষ পণ্য আমদানির সাধারণ অনুমতি পত্র। প্রয়োজনানুসারে মাঝে মাঝে এর অন্তর্গত পণ্যের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করা হয়। অপরটি হল **পৃথক আমদানি অনুমতি পত্র**[১১১]। এতে অনুমোদিত আমদানিকারীর নাম ও ঠিকানা, পণ্যের পরিচয়, পরিমাণ ও মূল্য এবং যে মুদ্রা এলাকা হতে তা আমদানি করতে হবে, তা উল্লিখিত থাকে।

৪. রপ্তানি নীতি : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পর থেকে শিল্পোন্নতির প্রয়োজনে বিদেশী যন্ত্রপাতি ও অপরিহার্য বিদেশী কাঁচামাল আমদানি সম্ভবপর করার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য, সরকার রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদানের[১১২] নীতি গ্রহণ করেছেন। এজন্য শুল্কহার হ্রাস ও বিলোপ, আবগারী

108. Hard currency area.
109. Soft currency area.
110. Non-essential goods.
111. Individual licence.
112. Export promotion.

শুল্ক প্রত্যর্পণ[113] ও রপ্তানি বন্দরে রেলপথে পরিবাহিত পণ্যের রেল মাসুল শতকরা আংশিক মকুব[114] ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫. রপ্তানি প্রসারের ব্যবস্থা: আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা, ও মন্দার অবস্থা, দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা, দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের স্বল্প হার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ধীর গতি প্রভৃতি কারণে ভারত অনেক দিন ধরেই বিদেশী মুদ্রার সংকটে পড়েছে। এই সংকট সমাধানে সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন রপ্তানি প্রসারের প্রচেষ্টা হল তার মধ্যে একটি।

এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৭ সালে একটি রপ্তানি প্রসার কমিটি[115] নিয়োগ করেছিলেন। কমিটির সুপারিশে বলা হয়—(১) অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে হবে; (২) উদার রপ্তানি নীতি গ্রহণ করতে হবে; (৩) উন্নত ও বিকাশমান, সব রকম দেশের সাথেই বাণিজ্য চুক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে: (৪) রপ্তানি শুল্ক কমাতে হবে; (৫) উৎপাদিত সামগ্রীর গুণগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে; (৬) পুনঃ রপ্তানি ব্যবসাকে উৎসাহ দিতে হবে; এবং (৭) যাতে বেশি পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করা যায় সেজন্য দেশের মধ্যে পণ্যসামগ্রীর ভোগ-ব্যবহার কমাতে হবে।

এই সুপারিশগুলি মেনে নিয়ে ভারত সরকার রপ্তানি প্রসারের জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা হল: (১) **উদার রপ্তানি নীতি**—বহু পণ্যের উপর রপ্তানির বিধি নিষেধ দূর করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি পণ্য বিনিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের খরচ কমানোর জন্য রপ্তানি শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর আদায়ীকৃত আমদানি শুল্ক ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২) বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাণিজ্য মন্ত্রীদপ্তরের অধীন **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ**[116] নামে একটি আলাদা বিভাগ খুলেছেন।

(৩) সরকারকে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সরকার, শিল্প মালিক ও রপ্তানিকারী এই তিন পক্ষের সমান সংখ্যক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি **বাণিজ্য পর্ষৎ**[117] গঠিত হয়েছে।

(৪) বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের দ্বারা রচিত রপ্তানি নীতিগুলি কাজে পরিণত করার ভার দিয়ে **ডিরেক্টরেট অব এক্সপোর্ট প্রমোশন**[118] নামে একটি আলাদা ডিরেকটরেট খোলা হয়েছে।

(৫) রপ্তানির সুযোগ সুবিধা অনুসন্ধানের ও রপ্তানি-ব্যবস্থাপনা এবং রপ্তানি বাণিজ্যে নিযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণের উন্নতির জন্য গবেষণা পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সরকার ইণ্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব ফরেন ট্রেড[119] নামে একটি স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা[120] স্থাপন করেছেন।

(৬) সবিশেষ পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা উপার্জনকারী পণ্যগুলির জন্য ভারত সরকার প্রত্যেকটি উৎপাদক ও রপ্তানিকারীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে কোম্পানী আইনের অধীনে ২২টি **রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ**[121] স্থাপন করেছেন। যে সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই পরিষদ গঠিত হয়েছে তার মধ্যে আছে তামাক, চামড়াজাত দ্রব্য, কাজু বাদাম, লাক্ষা, তুলা, রেশম, ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য প্রভৃতি। বিদেশে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য, যেখানে রপ্তানি সম্ভাবনা বেশী রয়েছে সে সব দেশে সম্ভাব্য

---

113. Drawback. 114. Rebate. 115. Export Promotion Committee.
116. Department of International Trade. 117. Board of Trade.
118. Directorate of Export Promotion.
119. Indian Institute of Foreign Trade.
120. Autonomous institution. 121. Export Promotion Council.

আমদানিকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে অফিস খোলা, রপ্তানিকারীদের কাছে বিদেশী বাজারের নানা তথ্য সরবরাহ করা, বিদেশের বাজারে কোন ধরনের সামগ্রীর চাহিদা বেশী এবং তাদের দাম কি রকম, সে দেশে সংশ্লিষ্ট পণ্যটি আমদানির জন্য কি কি ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে ও কাদের মারফত আমদানি করা হয়, জাহাজে পাঠানোর বিধি ব্যবস্থাই বা কী, ইত্যাদি দরকারী তথ্যগুলি সংগ্রহ ও রপ্তানিকারীদের তা সরবরাহ করে রপ্তানি পরিষদগুলি রপ্তানি প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করছে।

(৭) চা, কফি, নারিকেল কাতা ('কয়ার') প্রভৃতি নানা **রপ্তানিযোগ্য পণ্যের** রপ্তানি প্রসারে সাহায্য করার জন্য আলাদা আলাদা **পর্ষদ**[১২২] গঠিত হয়েছে।

(৮) ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য দেশে ও বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের মেলা ও এগজিবিশন সংগঠিত করা, বিদেশে প্রতিনিধি পাঠানো ও অফিস খোলা ইত্যাদি নানাভাবে রপ্তানি প্রসারে সাহায্য করার জন্য **ভারতীয় রপ্তানিকারক সংগঠনগুলির একটি ফেডারেশন**[১২৩] **গঠিত হয়েছে।**

(৯) রপ্তানিকারীদের ঋণ দেওয়া এবং রপ্তানির ঝুঁকি কমানোর জন্য ১৯৬৩ সালে **এক্স্পোরট ক্রেডিট এ্যান্ড গ্যারান্টি করপোরেশন**[১২৪] নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে।

(১০) প্রধানত সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সরকারী রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে **স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের**[১২৫] এবং বিবিধ ধাতু রপ্তানির জন্য মিনারেলস এ্যান্ড মেটালস্ ট্রেডিং করপোরেশন[১২৬] স্থাপন করেছেন।

(১১) এ ছাড়া রপ্তানি প্রসারের জন্য গৃহীত অন্যান্য বিধি ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে—রপ্তানি পণ্যের রেলভাড়া হ্রাস, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস ও বিলোপ, ভারতীয় মানক সংস্থা[১২৭] স্থাপন, বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি বৃদ্ধি, বিদেশে ভারতীয় পণ্যের প্রচারকার্য, নানা দেশে ভারতীয় ট্রেড কমিশনার, কনসাল ও হাই কমিশনার এবং রাষ্ট্রদূত নিয়োগ প্রভৃতি।

৬. ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যে ঋণ সংস্থানকারী সংস্থা : ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যে ঋণদাতা সংস্থাগুলি হল—(১) **এক্স্চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি।** সাধারণত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির ভারতীয় শাখাগুলিকেই এই নামে পরিচিত। প্রথম থেকেই এদের প্রধান ব্যবসা ছিল রপ্তানিকারীদের ঋণ দেওয়া এবং তাতে বিদেশী মুদ্রার প্রশ্ন জড়িত বলে এরা এই নামে পরিচিত হয়েছে। এরা সাধারণত লেটার অব ক্রেডিট দিয়ে, ডকুমেন্টারি বিল স্বীকার করে বা তার মূল্য পরিশোধ করে এবং তা কিনে ও বাট্টা করে আমদানি ও রপ্তানিকারীদের ব্যবসায়ে ঋণ জুগিয়ে থাকে।

(২) বর্তমানে ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও উপরোক্ত উপায়ে রপ্তানি ও আমদানিকারীদের ঋণের সংস্থান করে থাকে।

(৩) অনেক সময় ইনডেন্ট্ ফারম্গুলিও (অর্থাৎ ফরমায়েশী পণ্যের আমদানি ও রপ্তানিকারী ব্যবসায়ীরা) যাদের হয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানি করে, তাদের ঋণের সংস্থানও করে থাকে।

(৪) স্টেট ব্যাঙ্কও লেটার অব ক্রেডিট দিয়ে, অন্যান্য ভাবে ঋণের সংস্থান

122. Boards for exportable commodities.
123. Federation of Indian Export Organisations.
124. Export Credit and Guarantee Corporation.
125. State Trading Corporation.
126. Mineral and Metals Trading Corporation.
127. Indian Standards Institution (I.S.I.).

করে এবং বিদেশী মুদ্রা আগাম বিক্রি করে[128] বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ সংস্থান করছে।

(৫) এক্‌স্‌পোর্ট ক্রেডিট এ্যান্ড গ্যারান্টি করপোরেশন—রপ্তানি পণ্যের জন্য ঋণ দিয়ে ও রপ্তানি ঝুঁকির বীমা করে এই করপোরেশন রপ্তানি ঋণের সংস্থান করছে।

ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রের ভূমিকা
THE STATE IN FOREIGN TRADE IN INDIA

(১) স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন, (২) এক্‌স্‌পোর্ট ক্রেডিট এ্যান্ড গ্যারান্টি করপোরেশন এবং (৩) মিনারেলস এ্যান্ড মেটালস ট্রেডিং করপোরেশন—এই তিনটি সরকারী সংস্থা মারফৎ ভারত সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

১. স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন (প্রাঃ) লিমিটেড

১. উদ্দেশ্য ঃ ১৯৫৬ সালের মে মাসে ভারত সরকার কর্তৃক ভারতীয় কোম্পানী আইনের (১৯৫৬) অধীনে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন গঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করা ও প্রতিযোগিতামূলক দামে অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর আমদানির ব্যবস্থা করা। নানান ধরনের সামগ্রী রপ্তানি করা, বর্তমান রপ্তানি বাজারগুলিকে আরো প্রসারিত করা, দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে কতকগুলি বিশেষ পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি-উন্নয়নের চেষ্টা করা ও কতকগুলি নির্দিষ্ট আমদানি দ্রব্যের বিধি ব্যবস্থা করাই এর কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কতকগুলি পণ্যের দাম যাতে না পড়তে পারে ও তাদের আপৎকালীন মজুদ ধারণ করার ভারও নিয়ে থাকে। বেসরকারী ব্যবসায়ীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে এটি কাজ করে এবং আর্থিক ও সাংগঠনিক সাহায্য দিয়ে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টার ঘাটতি পূরণ করে থাকে। এর প্রতিষ্ঠাকে ভারতের বহির্বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগত উন্নতি[129] বলে গণ্য করা হয়।

(২) এর বিপক্ষে যুক্তি ঃ সংস্থাটি স্থাপনের বিরোধীরা যে সব যুক্তিতে এর বিরোধিতা করে তা হলঃ (ক) এতে বহির্বাণিজ্যে আমলাতান্ত্রিকতা দেখা দেবে, (খ) সরকারী দক্ষতা ও তৎপরতার অভাব রয়েছে; (গ) এতে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতি ঘটবে; (ঘ) সরকারী একচেটিয়া কারবারের কুফল কম নয়; (ঙ) বাণিজ্যে ক্ষতি প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব হবে; এবং (চ) বেসরকারী উদ্যোগের সংকোচন প্রভৃতি ঘটবে।

(৩) **পক্ষে যুক্তি ঃ** কিন্তু এর সমর্থকদের মতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ভারতীয় সংবিধান ও সরকারী নীতিসম্মত। এতে, (ক) জাতীয় স্বার্থরক্ষার্থে সরকার কর্তৃক আমদানি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে; (খ) অসুস্থ বেসরকারী প্রতিযোগিতার বিলোপ ঘটবে; (গ) মধ্যস্থ কারবারীদের বিলোপের দ্বারা রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হবে; (ঘ) আমদানি ব্যয় সংকোচ ঘটবে; (ঙ) আমদানি পণ্যের সুষম বণ্টন ঘটবে; (চ) বহির্বাণিজ্যে অনুকূল শর্ত আদায় করা সম্ভব হবে; (ছ) আমদানি পণ্যের মূল্যের স্থিতি বজায় থাকবে; (জ) ভারতীয় পণ্যের নূতন বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধি হবে; (ঝ) বিদেশী মুদ্রা তহবিলের উপর

128. Selling Forward Exchange. 129. Institutional development.

চাপ কমানোর জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে সরাসরি চুক্তি[130] দ্বারা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা সম্ভব হবে।

(৪) কাজ : (ক) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নূতন বাজার সৃষ্টি, (খ) অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানির নূতন নূতন উৎস আবিষ্কার, (গ) আমদানির ব্যয়সংকোচ সাধন, (ঘ) বাণিজ্যের অনুকূল শর্ত আদায়. এবং সেগুলির (ঙ) স্থিত মূল্যে[131] দ্রব্য আমদানি ও দেশের মধ্যে যথাযথ বণ্টন এই হল এর কাজ।

(৫) সম্পাদিত কার্যাবলী : (ক) প্রথম থেকেই করপোরেশন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে এরূপভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করছে যেন তাদের কাছে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা ইস্পাত, সিমেন্ট এবং যন্ত্রপাতি আমদানি করা যায়। ফলে বিদেশী মুদ্রা তহবিলের উপর চাপ পড়ছে না। (খ) করপোরেশন ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা করছে এবং দেশের বিবিধ চিরাচরিত ও নূতন দ্রব্যসামগ্রীর বাজার সৃষ্টি করছে। (গ) কস্টিক সোডা, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, পারদ, কর্পূর, রং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল বেশি পরিমাণে আমদানি ও দেশের মধ্যে তা বণ্টনে এরূপ ব্যবস্থা করেছে যাতে তাদের দর যুক্তিসংগত স্তরে নেমে আসে। শুধু তাই নয়, এদের আমদানির পরিমাণ ও সময় এমনভাবে স্থির করার চেষ্টা করা হয় যেন বিভিন্ন শিল্পে তা যোগানে বিভ্রাট না ঘটে। (ঘ) আমদানি ও রপ্তানির কাজ যাতে দ্রুত ও সুদক্ষভাবে সম্পাদিত হয় সেজন্য করপোরেশন বন্দর, খনি এবং পরিবহণের উন্নতির জন্যও যথেষ্ট সাহায্য কবছে।

খনিজ আকরিক, জুতা, কুটির শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, চা, কফি, তামাক এবং পশমী দ্রব্য এর বপ্তানির মধ্যে প্রধান। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে সিমেন্ট, সোডা এ্যাস, কস্টিক সোডা, কাঁচা রেশম, কাঁচা তুলা, ইস্পাত, শিল্পের কাঁচামাল, রাসায়নিক সার, সাজিমাটি, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, গুঁড়া দুগ্ধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২-৭৩ সালে করপোরেশনের রপ্তানি, আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মোট পবিমাণ হয়েছিল ৩৪৭ কোটি টাকা। তার মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৭০ কোটি টাকা, আমদানি ছিল ১৫৯ কোটি টাকার পরিমাণ।

মন্তব্য : এ পর্যন্ত বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে করপোরেশন তার প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রমাণ করলেও, এর কার্যাবলী সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হচ্ছে না। এ বিষয়ে আরও যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

২. একসপোর্ট ক্রেডিট এ্যান্ড গ্যারান্টি করপোরেশন : ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে কোম্পানীর আইন অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন গঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভারতে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ভারত সরকাব যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কিন্তু ১৯৬৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি বিলোপ করে তার পরিবর্তে এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়। এই সংস্থা রপ্তানি বীমা সংক্রান্ত ঝুঁকি বহনের সাথে সাথে রপ্তানি ঋণের সংস্থানেও সাহায্য করে থাকে। বাণিজ্যিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে করপোরেশন লোকসানের শতকরা ৮০ ও রাজনৈতিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে লোকসানের শতকরা ৮৫ ভাগ পূরণ করে।

১৯৭৩-৭৪ সালে করপোরেশন ১,৪২৬ কোটি টাকার রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করেছে এবং ১,২৬১ কোটি টাকার রপ্তানি ঋণের সংস্থানে সাহায্য করেছে।

---

130. Barter agreement. 131. Stable price.

৩. মিনারেলস এ্যান্ড মেটালস্ ট্রেডিং করপোরেশন : ১৯৬৩ সালে স্থাপিত এই সংস্থাটি ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠিত হয়েছে।

এর প্রধান উদ্দেশ্য হল—(ক) ভারতীয় বিভিন্ন ধাতুর, আকরিকের ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যের বিভিন্ন রপ্তানি বাজার সৃষ্টি করা; এবং (খ) সরকারের আমদানি নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত অত্যাবশ্যক কতকগুলি কাঁচামাল আমদানির কাজ সংগঠিত করা ও তার ভার গ্রহণ করা।

করপোরেশন বর্তমানে, লৌহ ও অ-লৌহ জাতীয় ধাতুর এবং ১৯৭০-এর ১লা জানুয়ারী থেকে রাসায়নিক সার ও সারের কাঁচামাল আমদানি করেছে। করপোরেশন যে সব ধাতু রপ্তানি করে তার মধ্যে আছে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, ফেরো-মেঙ্গানিজ এবং কয়লা, অভ্র, সিলিম্যানাইট, চীনা মাটি, ক্রোম, বক্সাইট প্রভৃতি।

১৯৭৩-৭৪ সালে করপোরেশন মোট ৪৭৪ কোটি টাকার আমদানি রপ্তানি করেছে। তার মধ্যে আমদানির পরিমাণ হল ৩৫৩ কোটি টাকা এবং রপ্তানি ১২৫ কোটি টাকা।

২১

প্রচার ও বিজ্ঞাপন
PUBLICITY & ADVERTISEMENT

আধুনিক পণ্যের বাজার তীব্র প্রতিযোগিতার বাজার। সুতরাং এতে দক্ষতা-সম্পন্ন উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে দক্ষতাসম্পন্ন বিক্রয় ক্ষমতার গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কম নয়। বরং এর গুরুত্ব এত যে, আধুনিক কারবারী জগতে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন, প্রচার ও বিক্রয়বিদ্যা নিজেই একটি পৃথক কারবারে, কারবারের একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসাবে গড়ে উঠেছে।

বিজ্ঞাপন ঃ যে সব উপায়ে প্রচারের কাজ চলে তার মধ্যে লিখিত বা মুদ্রিত আবেদন হল একটি। এই লিখিত বা 'মুদ্রিত প্রচার'কে[1] 'বিজ্ঞাপন'[2] বলে। সুতরাং বিজ্ঞাপনকে প্রচারের অঙ্গ বলা যায়। হ্যান্ডবিল, পোস্টার, দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি, সাময়িকী, শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি হল বিজ্ঞাপনের উদাহরণ। যা কিছু লিখিত, মুদ্রিত প্রচার, তাই হল বিজ্ঞাপন। বিবিধ ভারতী বিজ্ঞাপন কার্যক্রম থেকে বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে যে ঘোষণা করা হয়, তা হল প্রচার, বিজ্ঞাপন নয়।

অনেকে বিজ্ঞাপনকে 'মুদ্রিত বিক্রয়কার্য' বলেন। এর কারণ হল একজন বিক্রয়-কর্মী যেমন ক্রেতাকে তার পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে, আলাপব্যবহারে মুগ্ধ করে তার কাছে পণ্য বিক্রয়ে সফল হয়, তেমনি মুদ্রিত প্রচার বা বিজ্ঞাপন একসঙ্গে হাজার হাজার ক্রেতার দৃষ্টি কোন বিশেষ পণ্যের দিকে আকর্ষণ করে, সে সম্পর্কে তাদের কৌতূহল জাগিয়ে তাদের সম্ভাব্য খরিদ্দারে পরিণত করে। সুতরাং আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদনের জগতে যেমন শ্রমিকরা যন্ত্রের সাহায্যে হাজার হাজার একক পণ্য মুহূর্তের মধ্যে উৎপাদন করছে, তেমনি উৎপাদক বা বিক্রেতারা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে অল্প সময়ে হাজার হাজার খরিদ্দার সৃষ্টি করছে। বৃহদায়তনে উৎপাদনের পাশাপাশি এবং তাতে সহায়তা করার জন্য বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বৃহদায়তনে পণ্য বিক্রয়ের প্রচেষ্টা চলেছে।

প্রপাগান্ডা[3] হল পক্ষপাতদুষ্ট অথবা একদেশদর্শী প্রচার। এর অর্থ হল কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে আংশিক সত্যের ঘোষণা। কোন বিষয়ের শুধু আংশিক সত্য জনসাধারণকে অবহিত করা বা বাস্তব ভিত্তিহীন কোন কিছুর বিজ্ঞপ্তি বোঝায়। এতে সত্য গোপন করা হয় এবং জনসাধারণকে কোন কিছু সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। প্রচারের ভিত্তি হল বাস্তব সত্য, প্রপাগান্ডার ভিত্তি হল আংশিক সত্য বা অসত্য। নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়ার জন্য বিভিন্ন দল পরস্পর সম্পর্কে যে প্রচার চালায়, তা প্রপাগান্ডা বা একদেশদর্শী প্রচার ছাড়া কিছুই নয়।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ঃ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনদাতার পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করা। কিন্তু বিজ্ঞাপনের এই সাধারণ উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য দেখতে পাই : (১) ক্রেতাদের কাছে কোন নূতন পণ্যের অস্তিত্ব ঘোষণা ও চাহিদা সৃষ্টি করা; (২) চলতি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা; (৩) চলতি পণ্যের বর্তমান

1. Printed publicity. 2. Advertisement. 3. Propaganda.

চাহিদা বজায় রাখা; এবং (৪) কোন পণ্য বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হলেও পরে তা পাওয়া যাবে সেকথা ক্রেতাদের জানানো এবং ততদিন ক্রেতাদের মনে পণ্যটির কথা জানিয়ে রাখা।

এই উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য বাণিজ্য ও ব্যবসায় জগতে বিজ্ঞাপনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। তবে এ ছাড়া, সরকারী এবং ব্যক্তিগত প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রেও কোন নির্দিষ্ট অভাব পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যেমন, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মখালির বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন কর্মপ্রার্থীদের বিজ্ঞাপন, ঠিকাদার আহ্বানের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি। অনেক সময় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের চালু পণ্যের 'নকল' সম্পর্কে ক্রেতাদের সতর্ক করার জন্য বিজ্ঞাপনের সাহায্য গ্রহণ করে। কিংবা কার্যালয় স্থানান্তরিত হলে বা কোন কর্মচারী কারবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে, বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তা সকলকে জানায়। এ ছাড়া আরও শত সহস্র বিষয়ে সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় বিষয় জানানোর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে।

বিজ্ঞাপনের তাৎপর্য বা গুরুত্ব : ক. অর্থনীতিক গুরুত্ব[4] : (১) বিজ্ঞাপন নূতন চাহিদা, নূতন বাজার, নূতন ক্রেতা সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতার বাজারে বিজ্ঞাপনের শক্তিশালী হাতিয়ারের সাহায্যে সর্বদাই নূতন নূতন পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা যায় বলে শিল্পের উদ্যোক্তারা নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ পায়। অর্থাৎ দেশের শিল্পসম্প্রসারণের পথে বিজ্ঞাপনের যথেষ্ট অবদান আছে। (২) এর সাহায্যে চলতি পণ্যের চাহিদা, বিক্রয়ের পরিমাণ, বাজার সম্প্রসারণ করা যায়। সাধারণত বিক্রয়কর্মীদের চেষ্টায় পণ্যের বিক্রয় হয় ও বাড়ে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত সামর্থ্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞাপন বিক্রয়কর্মীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতে যথেষ্ট শক্তি ও বেগ সঞ্চার করে। সুতরাং এর দরুন সামগ্রিক বিক্রয়ের ও মুনাফার পরিমাণ বাড়ে। (৩) বিজ্ঞাপনের দ্বারা চাহিদা বৃদ্ধির দরুন উৎপাদনও বাড়ে এবং তার ফলে উৎপাদক ক্রমেই বেশী পরিমাণে বৃহদায়তনের ব্যয়সংকোচ ভোগ করে ও তার মুনাফা বাড়ে। (৪) প্রতিযোগিতার বাজারে বৃহদায়তন উৎপাদনের দরুন যতই ব্যয়সংকোচ বাড়ে, উৎপাদক ততই দাম কমাতে পারে। সুতরাং ক্রেতারাও অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য খরিদের সুবিধা ভোগ করে। (৫) বিজ্ঞাপনের দ্বারা উৎপাদক ও বিক্রেতারা সরাসরি ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে বলে পণ্য বিক্রয়ের জন্য মধ্যস্থ কারবারীদের উপর তাদের নির্ভরতা কমে যায়। তাতে কারবারের স্থায়িত্ব বাড়ে। অন্য দিকে বেশী বিক্রয়কর্মীও রাখতে হয় না। ফলে বিক্রয় খরচ কমে। (৬) প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন, বাজারের বিভিন্ন যোগানদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে শুধু বজায় রাখে না, বাড়ায়ও। ফলে প্রতিযোগী কারবারীরা দ্রব্যের মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকে।

খ. সামাজিক গুরুত্ব[5] : (১) বিজ্ঞাপনের সাহায্যে নূতন নূতন আধুনিক পণ্যের প্রচারের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ক্রেতারা তা ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলে ধীরে ধীরে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে থাকে। (২) বিজ্ঞাপিত নূতন নূতন আধুনিক দ্রব্যসামগ্রী যাতে ভোগ করা যায়, সে জন্য সীমাবদ্ধ আয়ের ক্রেতারা ঐ সব দ্রব্য কেনার সামর্থ্য অর্জনের জন্য বেশি পরিশ্রমের দ্বারা বেশি উপার্জনের চেষ্টা করে। ফলে একদিকে তাদের ব্যক্তিগত আয় বাড়ে অন্যদিকে দেশের মোট উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয় বাড়ে। (৩) বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞাপন দেয় বলে, তাদের ব্যয়ের অধিকাংশই বিজ্ঞাপন থেকে বহন করা হয় এবং তার ফলে ক্রেতারা অল্প মূল্যে ঐ সব পত্র-পত্রিকা কিনতে পারে। এইভাবে বিজ্ঞাপন সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নতিতেও সাহায্য করে। (৪) বিজ্ঞাপন সুন্দর ও সুরুচিসম্পন্ন নকশা, ছাঁদ ও আকারের

---

4. Economic importance. 5. Social importance.

নানাবিধ পণ্যের প্রতি ক্রেতার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে ঐ সব দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে তার দ্বারা ক্রেতার রুচি উন্নত করে তোলে।

বিজ্ঞাপন-ব্যয় কি অপ্রয়োজনীয় এবং অপচয়? : বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে অভিযোগ : (১) সুচতুর বিজ্ঞাপনের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতারা প্রতারিত হয়। জিনিসটি কেনার পরে বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত গুণাবলীর লেশমাত্র পণ্যের মধ্যে দেখা যায় না। (২) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনের খরচ অপচয়ে পরিণত হয়। সীমাবদ্ধ বাজারে কয়েকজন প্রতিযোগী বিক্রেতা পরস্পরের খরিদ্দার ভাঙিয়ে নিজের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য ক্রমেই বিজ্ঞাপনের জন্য বেশী ব্যয় করতে থাকে। তাতে বিজ্ঞাপনের মোট ব্যয় বাড়ে, অথচ পণ্যের মোট উৎপাদন ও বিক্রয় যেমন ছিল তেমনি থাকে। (৩) প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিক্রেতারা ক্রমেই বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ বাড়াতে থাকে। বিজ্ঞাপনের ব্যয় শেষ পর্যন্ত পণ্যমূল্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে ক্রেতাদের কাছ থেকে তা আদায় করা হয়। ফলে অনাবশ্যকভাবে পণ্যের দাম বাড়ে ও ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৪) আধুনিক নানা প্রকার সূক্ষ্ম বিজ্ঞাপন কৌশলের দ্বারা ক্রেতাদের স্বাধীন মনোবৃত্তি ও বিচারবুদ্ধিকে অচ্ছন্ন করে তাদের বিজ্ঞাপনদাতার ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়। (৫) কোন বিশেষ মার্কাযুক্ত পণ্যের বিজ্ঞাপনে প্রচুর ব্যয়ের দ্বারা বিজ্ঞাপনদাতার একচেটিয়া বাজার সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

বিজ্ঞাপনের পক্ষে যুক্তি : উপরোক্ত অভিযোগগুলি সাধারণত ক্রেতাদের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এই অভিযোগগুলি সর্বাংশে সত্য নয়। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব ও অবদান সম্বন্ধে আগে যা বলা হয়েছে, তার সাথে নিম্নোক্ত বক্তব্য যোগ করা যায়।

(১) অসাধু ও চতুর ব্যবসায়ীদের অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রেতাদের সাথে যে প্রতারণা করা হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তির কার্যকলাপের জন্য সব ব্যবসায়ীকে দায়ী করা উচিত নয় অথবা সকল বিজ্ঞাপনকেই ঐ পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তবে, এ জাতীয় বিজ্ঞাপনের দিন শেষ হয়ে আসছে। আধুনিক কালের বিজ্ঞাপন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ আধুনিক বিজ্ঞাপনদাতারা এ সম্পর্কে সচেতন যে, অল্প কিছু ব্যক্তিকে বেশী দিনের জন্য প্রতারিত করা যায় এবং বেশী সংখ্যক ব্যক্তিকে অল্প কিছু দিনের জন্য প্রতারিত করা চলে, কিন্তু বেশী ব্যক্তিকে বেশী দিনের জন্য প্রতারিত করা সম্ভব নয়। (২) বিজ্ঞাপনের দ্বারা শুধু খরিদ্দার হস্তান্তর হয় বলে বিজ্ঞাপন ব্যয়কে অপচয় বলে যারা মনে করে তাদের ধারণা ভ্রান্ত। কারণ বাস্তব জগতের কোন বাজারই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবর্তনশীল জগতে বাজার, ক্রেতা, চাহিদা, পছন্দ, রুচি, ক্রয়-ক্ষমতা, উৎপাদন পদ্ধতি, পণ্য ও তার উৎকর্ষের সর্বদা পরিবর্তন ঘটছে। অতএব সদা পরিবর্তনশীল পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন-ব্যয়ের দ্বারা শুধুই খরিদ্দার হস্তান্তর হয় না। তার দ্বারা নূতন চাহিদা ও নূতন খরিদ্দার সৃষ্ট হয়ে সকলেরই বিক্রয় বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। (৩) বিজ্ঞাপন-ব্যয়ের জন্য পণ্যের দাম বাড়ে বলে যে সমালোচনা করা হয়, তাও সত্য নয়। কারণ প্রথমত, বিজ্ঞাপনের দরুন বিক্রয় বাড়লে বৃহদায়তন উৎপাদনের দরুন ব্যয়সংকোচ হয়। তাতে প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার পক্ষে মূল্য কমান সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনের সাহায্য ছাড়া বিক্রয় হয় এমন অনেক পণ্যের দাম বেড়ে থাকে। তৃতীয়ত, হিসাব করে দেখা গেছে যে, বিজ্ঞাপনের দরুন ব্যয়, মূল্যের মাত্র শতকরা ১ ভাগের বেশী হয় না। আর শেষ কথা এই যে, যে কোন ব্যয়ের দরুন বিক্রেতা তার ইচ্ছামত দাম বাড়াতে পারে না। কোন অতিরিক্ত ব্যয়ের কতটুকু অংশ বিক্রেতা মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা ক্রেতার উপর চাপিয়ে দিতে পারবে, তা নির্ভর করে প্রধানত পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর, বিক্রেতার ইচ্ছার উপর নয়। (৪) ক্রেতাদের মনের উপর বিজ্ঞাপনের প্রভাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ

করা হয়, তাতে একদিকে বিজ্ঞাপনের প্রভাবকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অন্য দিকে ক্রেতার বুদ্ধিবৃত্তিকে অযথা ছোট করা হয়েছে। (৫) বিজ্ঞাপনের দ্বারা একচেটিয়া কারবার সৃষ্টির যে অভিযোগ করা হয়, সে সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, শুধু বিজ্ঞাপনের দ্বারা একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি করা অসম্ভব। বরং প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন, বাজারের প্রতিযোগিতাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তোলে।

উপসংহার ঃ বস্তুত পক্ষে, আধুনিক সমাজে বিজ্ঞাপনের প্রভাব ও অবদান অপরিমেয়। বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিক্রয়ের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিজ্ঞাপন অপরিহার্য সঙ্গী। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-বিজ্ঞাপন পদ্ধতি বাস্তবানুযায়ী. তথ্যমূলক ও শিক্ষামূলক! ব্যবসায় ক্ষেত্রে 'ক্রেতার নিজের দায়িত্বে ক্রয় করার'[6] পুরাতন নীতির স্থলে আজ নূতন নীতি প্রচলিত হয়েছে। এই নীতি হল, 'দায়িত্ব বিক্রেতার'[7]। সুতরাং বিজ্ঞাপনের সাহায্যে নিজ নিজ পণ্যাদির গুণাবলী প্রতিযোগী বিক্রেতারা ক্রেতার কাছে উপস্থিত করে। ফলে ক্রেতা সহজেই কোনটি তার প্রয়োজনীয় তা স্থির করতে পারে। শুধু তাই নয় বিজ্ঞাপনদাতার আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চারুশিল্প ও কারুকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প জগতে প্রযুক্ত হয়ে নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীকে সুরুচি ও সুষমামণ্ডিত করে, সাধারণ ক্রেতার গদ্যময় জীবন শিল্প ও সৌন্দর্যের যাদুস্পর্শে সরস ও মধুর করে তুলছে। জীবনযাত্রাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করছে।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ঃ সমস্ত বিজ্ঞাপনের পিছনে একই মূল লক্ষ্য থাকে—বিক্রয় বৃদ্ধি, মুনাফা বৃদ্ধি। কিন্তু যে কোন পণ্য বা সেবাকর্ম সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দিতে গেলে বিজ্ঞাপনদাতা দুই প্রকারের উদ্দেশ্যের যে কোন একটি অনুসরণ করতে পারে ঃ (১) ক্রেতাকে অবিলম্বে অর্থাৎ বর্তমানে কিনতে উদ্বুদ্ধ করা; (২) ক্রেতা যাতে ভবিষ্যতে তা কেনে. সেজন্য ধীরে ধীরে তার মনে নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবাকর্ম সম্পর্কে অনুকূল ধারণা সৃষ্টি করা।

বিজ্ঞাপনের নীতি (ADVERTISEMENT POLICY)

বর্তমান বিক্রয় ও ভবিষ্যৎ বিক্রয় এই দুই প্রকারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের পন্থা আলাদা হয়।

ক. আশু কার্যকারিতার বিজ্ঞাপন[8] ঃ যেখানে অবিলম্বে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বিজ্ঞাপন রচিত হয়। যথা—(১) **কৌতূহল**[9] ঃ বিজ্ঞাপনের মধ্যে এমন ভাষা ও চিত্র ব্যবহৃত হয়, যা সম্ভাব্য ক্রেতার মনে কৌতূহল সৃষ্টির দ্বারা নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবাকর্ম সম্পর্কে দ্রুত আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই জাতীয় বিজ্ঞাপনের সমগ্র অংশটি একসঙ্গে প্রকাশ ও প্রচার না করে ধাপে ধাপে এক একটি অংশ প্রকাশিত হয়ে ক্রমশ ক্রেতার কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়াতে থাকে। অনেক সময় দৈনিক সংবাদপত্রে দীর্ঘ কলম ব্যাপী বা তার অংশ বিশেষ স্থান ভাড়া করে খালি রাখা হয় এবং তাতে অন্য কিছু না ছেপে শুধু 'এই কলমটি[10] লক্ষ্য করুন' এই অনুরোধ প্রকাশিত হয়। কয়েকদিন পরে তাতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করা হয়। (২) **আবেদন**[11] ঃ অনেক পণ্য যথা, ঔষধ, মনোহারী দ্রব্য, চা, বিস্কুট, জামা-কাপড়, জুতা, সিগারেট ইত্যাদির বেলায় সোজাসুজিভাবে ক্রেতাদের নিকট নির্দিষ্ট মার্কাযুক্ত বা প্রতিষ্ঠানের পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের আবেদন করা হয়। যেমন, 'টসের চা কিনুন', অথবা 'এবার পূজায় বাটার জুতা' প্রভৃতি আবেদনযুক্ত বিজ্ঞাপন আমরা সর্বদাই দেখি। (৩) **আতঙ্ক**[12] ঃ আগ্নেয়াস্ত্র, তালা, সিন্দুক, ঔষধ, কোলাপ্সিবল গেট, জীবাণুনাশক

6. 'Caveat emptor'. ,
7. 'Caveat vendor'.
8. Advertisement for present action.
9. Inquisitiveness.
10. Column.
11. Appeal.
12. Panic or Alarm.

সাবান, অগ্নিনির্বাপক দ্রব্য, বীমা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পাঠকের মনে একটি কাল্পনিক আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাকে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রয় বা সেবা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। 'আপনার ঠান্ডা লাগতে পারে—ভিকস ব্যবহার করুন' অথবা 'আপনার নিরাপত্তা বিপন্ন' ইত্যাদি জাতীয় বিজ্ঞাপন এর দৃষ্টান্ত। অতি আধুনিক বিজ্ঞাপনের বেলায় এই পদ্ধতি বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। (৪) **ইঙ্গিত বা চিন্তা সঞ্চার**[১৩] **:** কখনও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত পাঠককে তার সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া বা তার মনে চিন্তা সঞ্চার করা হয়। স্বভাবতই ইঙ্গিতে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ব্যবহার বা বিশেষ ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ করার প্রয়োজনীতা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ টনিকজাতীয় ঔষধের, দাঁত চুল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

খ. ভবিষ্যৎ কার্যকারিতার বিজ্ঞাপন[১৪] **:** এই ক্ষেত্রে আরও সূক্ষ্মভাবে এবং দীর্ঘ-কালীন দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এই জাতীয় বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হল ক্রেতা যেন ধীরে ধীরে পণ্যটির প্রতি আকৃষ্ট হয়[১৫] এবং শেষে সেই আকর্ষণ চাহিদাতে রূপান্তরিত হয়।

এই জাতীয় বিজ্ঞাপন রচনায় নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করা হয় : (১) **সম্পাদকীয় সমর্থন**[১৬] **:** অনেক সময় বিজ্ঞাপনদাতারা প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদককে অনুরোধ করে এবং সাধারণত অর্থব্যয় করে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় স্থান ভাড়া করে ও বিশেষ বিশেষ পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম সম্বন্ধে রচনা প্রকাশ করে। (২) **পরোক্ষ আবেদন**[১৭] **:** ক্রেতাদের প্রায়শই ক্যালেন্ডার, প্যাড, ডায়েরী, পেন্সিল, ছুরি ইত্যাদি জিনিস উপহার দিয়ে বিক্রেতারা তাদের কাছে পরোক্ষ আবেদন জানায়। এ বিষয়ে কুপনপ্রথা পরোক্ষ আবেদনে একটি উল্লেখযোগ্য সহায়ক। (৩) **শিক্ষামূলক বিজ্ঞাপন**[১৮] **:** অনেক সময় মোটরগাড়ি, রেডিও, সেলাইকল, ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের দ্বারা পুরাতন সংস্করণের তুলনায় নূতন সংস্করণে কি কি উন্নতি সাধন করা হয়েছে ও তার সুবিধাগুলি কি তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর পিছনে উদ্দেশ্য থাকে ক্রেতাকে নূতন সংস্করণের প্রতি আকৃষ্ট করা। (৪) **পরোক্ষে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ**[১৯] **:** অনেক সময় রেডক্রস, বন্যাত্রাণ সাহায্য তহবিল, যক্ষ্মা-নিবারণী সাহায্য তহবিল, সাহায্যানুষ্ঠান প্রভৃতির বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকার ব্যয় অনেক ব্যবসায়ী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান বহন করে বিজ্ঞাপনটির এক কোণে তার ব্যয় বহনকারী হিসাবে নিজেদের নাম উল্লেখ করে। এতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম-ভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রতি ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বিজ্ঞাপন অভিযানের পরিকল্পনা (ADVERTISEMENT CAMPAIGN PLAN)

বিজ্ঞাপনের দ্বারা সর্বাধিক সুবিধা লাভ করতে হলে সুচিন্তিত পরিকল্পনা সহ সুনির্দিষ্ট পন্থায় ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের এই পদ্ধতি বিজ্ঞাপন অভিযান নামে পরিচিত।

বিজ্ঞাপন অভিযানের পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হয়। বিজ্ঞাপন অভিযানকে ক্লেপনার তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : (১) আঞ্চলিক অভিযান[২০]। (২) শ্রেণীবদ্ধ অভিযান[২১]। (৩) জাতীয় অভিযান[২২]।

১. আঞ্চলিক অভিযান : সমগ্র বাজারকে প্রথমে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে একের

13. Suggestion. 14. Advertisement for future action.
15. Consumers' acceptance. 16. Editorial support.
17. Indirect appeal. 18. Educational advertisement.
19. Drawing customer's attention indirectly. 20. Zone Campaign.
21. Cream or Classified Advertisement Campaign.
22. National Campaign.

পর এক অংশে, ব্যাপক ও শক্তিশালীভাবে বিজ্ঞাপন অভিযান চালানো হয়। এইরূপে সমগ্র বাজারে বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রচারকার্য ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, সারা ভারতকে রাজ্য হিসাবে কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ, পরে আসাম, বিহার ইত্যাদি রাজ্যে ক্রমে ক্রমে অভিযান শুরু করা যেতে পারে।

২. **শ্রেণীবদ্ধ অভিযান :** এই জাতীয় অভিযানে, ক্রয়ের সম্ভাবনা অনুযায়ী বাজারের ক্রেতাদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে, প্রথমে যাদের পক্ষে পণ্যটি কেনার সম্ভাবনা সর্বাধিক, তাদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন অভিযান চালানো হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে পরবর্তী শ্রেণীর ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করে অবশেষে সমগ্র বাজারে প্রচারকার্য শেষ করা হয়। এই ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলকে অভিযানের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার না করে ক্রয়ের সম্ভাবনা অনুসারে ক্রেতাদের শ্রেণীবিভাগকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান একটি "ডেট স্ট্যাম্প" তৈরি করলে প্রথমে তা বিক্রয়ের জন্য সমস্ত সরকারী ও সওদাগরী বড় বড় অফিসের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করবে। কারণ এরাই এই জাতীয় জিনিস বেশী পরিমাণে ব্যবহার করে। পরে সাধারণ ক্রেতাদের কাছে ঐ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অভিযান চালানো যেতে পারে।

৩. **জাতীয় অভিযান :** সমগ্র বাজারে একসঙ্গে ব্যাপক বিজ্ঞাপন অভিযানের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ও শ্রেণীবদ্ধ অভিযানের যুক্ত প্রয়োগকে জাতীয় অভিযান বলে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য আঞ্চলিক অভিযানের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সারা দেশের সমস্ত ক্রেতার কাছে একই সঙ্গে পৌঁছানোর জন্য সাধারণত জাতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞাপন অভিযান চালাতে হলে পাঁচটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় :— (১) পণ্যটির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য; (২) কারবারের পরিচালনার দক্ষতা ও লোকবল; (৩) আর্থিক সামর্থ্য (৪) চাহিদা বৃদ্ধি পেলে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির কি পরিমাণ সুযোগ সুবিধা আছে, এবং (৫) উপযুক্ত বিজ্ঞাপনমাধ্যম ('মিডিয়া')।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম (MEDIA OF ADVERTISEMENT)

যার সাহায্যে বিজ্ঞাপনটি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, তাকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম বলে। এই মাধ্যমগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায় :

(১) **সংবাদপত্র**[২৩] : ইংরেজী ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র। (২) **সাময়িকী**[২৪] : বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিকী পত্রিকা। (৩) **ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়সংক্রান্ত পত্রিকা**[২৫] : বিভিন্ন শিল্পভিত্তিক বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার সংক্রান্ত ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কিত পত্র ও পত্রিকা। (৪) **ডাক মারফত প্রত্যক্ষ আবেদন**[২৬] : প্রচারপত্র[২৭], পণ্য বিবরণী বা তালিকাবহি[২৮], ক্ষুদ্রাকার মুদ্রিত পত্র বা ইস্তাহার[২৯], পুস্তিকা[৩০] ইত্যাদি। (৫) **বাইরের বিজ্ঞাপন**[৩১] : ট্রাম, বাস ও রেল স্টেশনের এবং জনাকীর্ণ পথের পার্শ্ববর্তী গৃহ অথবা প্রাচীরগাত্রে প্রদর্শিত প্রাচীরপত্র, শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চলের কেন্দ্রে, উচ্চস্থানে প্রদর্শিত বৃহদাকার বিজ্ঞাপন[৩২] প্রভৃতি। (৬) **বাতায়ন সজ্জা**[৩৩] : ক্রেতাকে আকৃষ্ট করবার জন্য নানাভাবে দোকানে পণ্যের সুসজ্জিত প্রদর্শনী। (৭) **নমুনা**[৩৪] : পণ্যের সাথে পরিচিত করে আগ্রহ সৃষ্টির

---

23. Newspapers. 24. Periodicals. 25. Special periodicals.
26. Direct Mail. 27. Circular letter. 28. Catalogue.
29. Leaflet or handbill. 30. Booklet. 31. Outdoor advertisement.
32. Hoarding. 33. Window dressing. 34. Sampling.

উদ্দেশ্যে ক্রেতার মধ্যে পণ্যের নমুনা বণ্টন। (৮) **রেডিও এবং টেলিভিসন**[35] **:** স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয়ভাবে ক্রেতাদের মধ্যে পণ্য প্রচারের জন্য রেডিও এবং টেলিভিসনের ব্যবহার। (৯) **অন্যান্য**[36] **:** সিনেমা স্লাইড, ল্যান্টার্ন লেক্‌চার, বৃক্ষগাত্রে আটকান টিনের উপর লিখিত বিজ্ঞাপন। স্টোরকার্ড, ডেটকার্ড, দেয়ালপঞ্জী, ডায়েরী, ব্লটার, প্রদর্শনী, মেলা, শিল্প ও পণ্য সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র চলচ্চিত্র, 'নিওন সাইন' প্রভৃতি।

১. সংবাদপত্র : এর **সুবিধা** এই যে, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রে বিজ্ঞাপন আধুনিক কালে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর দ্বারা পণ্যের অতি দ্রুত বহুল প্রচার করা যায়। দেশের সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই সংবাদপত্র পাঠ করে। সেজন্য সর্বজনব্যবহৃত পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য সংবাদপত্র হল উপযুক্ত বাহন। আপাতদৃষ্টিতে এটা ব্যয়বহুল মনে হলেও, এর সাহায্যে যত বেশীসংখ্যক ব্যক্তির নিকট পণ্যের বার্তা পেঁছান যায়, এরূপ আর কোন মাধ্যমের দ্বারা সম্ভব হয় না। কিন্তু এর **অসুবিধা** এই যে, বেশি ব্যয়ের জন্য সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে বিজ্ঞাপন দিতে হয় বলে বিস্তারিতভাবে পণ্যের বিবরণ দেওয়া যায় না। তাছাড়া, কর্মব্যস্ত পাঠকের মনে এর প্রভাব স্বল্পকালস্থায়ী। এইজন্য বারবার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

২. সাময়িকী : সুবিধা : সাময়িক পত্র হল পাঠকের অবসর বিনোদনের সহায়ক। সুতরাং এতে বিজ্ঞাপন দিলে তা বেশী পরিমাণে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এতে বেশী জায়গা পাওয়া সম্ভব বলে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে পণ্য বিবরণী দেওয়া চলে। অতএব দৈনিক পত্র অপেক্ষা পাঠকের মনে সাময়িক পত্রবাহিত বিজ্ঞাপন অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। কিন্তু এর **অসুবিধা** এই যে, সাধারণত সাময়িক পত্রগুলির পাঠক-গোষ্ঠী সীমাবদ্ধ। উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় সাময়িক পত্র থাকে। এদের অধিকাংশই সাহিত্য-পত্র। ফলে এদের মাধ্যমে সব পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায় না। এবং এদের মূল্যও অপেক্ষাকৃত বেশী বলে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তা পাঠ করে। অতএব অল্প সংখ্যক ব্যক্তির কাছে এরা পণ্যবার্তা পেঁছাতে সক্ষম।

৩. ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয় সম্পর্কিত বিশেষ পত্রিকা : একশ্রেণীর সাময়িক পত্র দেখা যায়, তারা শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। যথা—মোটর শিল্প পত্রিকা, কার্পাস শিল্প পত্রিকা, লৌহ-ইস্পাত পত্রিকা, সমাজ ও বিজ্ঞান ইত্যাদি। এই জাতীয় বিশেষত্ব-সম্পন্ন পত্রিকা, নিজ নিজ বিষয় সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিজ্ঞাপনের পক্ষে প্রশস্ত। এদের পাঠকগোষ্ঠী ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে আগ্রহশীল হওয়ায়, বিস্তৃত বিজ্ঞাপনের দ্বারা পণ্যটির প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা ও তাতে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। অতএব এটি বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যসাধনে বিশেষভাবে কার্যকর হয়। তবে সাধারণত কারবারীরাই এই সকল পত্রিকার গ্রাহক হওয়ায়, এদের মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করা চলে, কিন্তু সাধারণ ক্রেতাদের কাছে প্রচার করা যায় না।

৪. ডাক মারফত প্রত্যক্ষ আবেদন : সংবাদপত্র ও সাময়িকী মারফত যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় তাদের আবেদন সামগ্রিক ও সাধারণ; ব্যক্তিগত নয়। ক্রেতার কাছে অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত আবেদনের জন্য বিক্রেতারা একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করে। টেলিফোন ডাইরেক্টরী ও ব্যবসায় ডাইরেক্টরী থেকে সম্ভাব্য ক্রেতাদের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন-সংবলিত মুদ্রিত প্রচারপত্র, সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য-রূপে মুদ্রিত পণ্যবিবরণী, সুমুদ্রিত পুস্তিকা প্রভৃতি ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়। ঐ সব পাঠ করে ক্রেতা তার পছন্দমত অর্ডার দেয়। কিন্তু এর অসুবিধা এই যে, এই পদ্ধতি

35. Radio and Television. 36. Miscellaneous.

অধিকতর ব্যয়বহুল ও যাদের কাছে এই সব প্রচারপত্র ও পুস্তিকা পাঠান হয়, তাদের সকলেই যে বিজ্ঞাপিত পণ্য কিনবে তার নিশ্চয়তা থাকে না।

৫. বাইরের বিজ্ঞাপন[৩৭] **:** নিত্যব্যবহার্য ও বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিজ্ঞাপন প্রচারের আর একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম হল প্রাচীরপত্র (পোস্টার) ও বিজ্ঞাপন-ফলক (হোর্ডিং)। শহরের সর্বত্র প্রাচীর ও বাড়ির গায়ে, স্তম্ভে, রেল স্টেশনের গায়ে, জনাকীর্ণ পথিপার্শ্বে লাগানো সুমুদ্রিক প্রাচীরপত্রের সাহায্যে অতি অল্পকালের মধ্যেই পণ্যের বিজ্ঞাপনে শত সহস্র দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব। আবার বড় বড় শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চলে ও প্রধান প্রধান পথের ধারে উচ্চ অট্টালিকার উপরে, বহুদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে লোহার কাঠামোতে টিন বা লোহার চাদরে সুন্দর করে আঁকা বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। গ্ল্যাক্সো, সিজারস্ সিগারেট, গোদরেজের সাবান, গণেশ মার্কা তৈল, উষা সেলাইকল ও ফ্যান প্রভৃতির এই জাতীয় বিজ্ঞাপন উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীরপত্রের দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ ক্ষমতা সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের এই পদ্ধতির **অসুবিধা** এই যে, এটি অনেকে ছিঁড়ে ফেলে বা অনেক সময় একটি পণ্যের প্রাচীরপত্রের উপর অপর পণ্যের প্রাচীরপত্র লাগিয়ে আগেরটিকে নষ্ট করে ফেলা হয়। সুতরাং এর কার্যকারিতা অল্পকাল স্থায়ী। তুলনায় বিজ্ঞাপনফলকগুলি বেশী কার্যকর। প্রতিদিন যাতায়াতকালে অসংখ্য পথিকের দৃষ্টিগোচর হয়ে এদের বক্তব্য ধীরে ধীরে তাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করে ও অবশেষে তাদের ক্রেতাতে রূপান্তরিত করে। এর প্রাথমিক ব্যয় বেশী হলেও শেষ পর্যন্ত বিক্রয় বেড়ে গিয়ে এর ব্যয়ভার কমে।

৬. বাতায়ন সজ্জা : অনেক সময় বিভিন্ন পণ্যের, বিশেষত নূতন উদ্ভাবিত ও সদ্য প্রচলিত পণ্যের প্রতি ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য খুচরা বিক্রয়ের দোকানে ঐ সকল পণ্যকে নানা উপায়ে মনোহর সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত করে ক্রেতাদের কাছে উপস্থিত করা হয়। একে বাতায়ন সজ্জা বলে। অনেক সময় আবার জনাকীর্ণ পথের পাশে দোকানে বা দোকানের এক অংশে পণ্যসামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়। এই জাতীয় পণ্যসজ্জিত ঘরগুলি প্রদর্শনী কক্ষ বা শোরুম নামে পরিচিত। মোটর, সেলাইকল, আসবাবপত্র প্রভৃতির "শোরুম" হামেশাই আমাদের চোখে পড়ে। এদের আবেদন স্থানীয় খরিদ্দারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৭. নমুনা : অনেক সময় কোন পণ্যকে জনপ্রিয় করার জন্য, সাধারণত ক্ষুদ্রাকারে বা অল্প পরিমাণে তা বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে, জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ঔষধ ব্যবসায়ে এই পদ্ধতি সবিশেষ প্রচলিত।

৮. রেডিও এবং টেলিভিশন : ব্যাপক ব্যবহারের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের প্রচারের জন্য, আধুনিককালে রেডিও ও টেলিভিশনের সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে। এদের আবেদন শুধু আঞ্চলিক ও জাতীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত হয়। বেতারে 'বিবিধ ভারতী বিজ্ঞাপন কার্যক্রম' এবং 'রেডিও সিলোন' থেকে নানাবিধ ভোগ্যপণ্য প্রচারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে এদের যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। এটি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতি।

৯. অন্যান্য : উপরোক্ত মাধ্যমগুলি ছাড়া আরও বিভিন্ন মাধ্যম মারফত ক্রেতার নিকট পণ্যবার্তা পৌঁছান হয়ে থাকে। যেমন, (ক) সুদৃশ্য সুমুদ্রিক ক্যালেণ্ডার, সুশোভন ডায়েরী, দৈনন্দিন ব্যবহার্য সুন্দর ব্লটার, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ মাধ্যম পণ্য ও উৎপাদক এবং বিক্রেতার নাম ক্রেতাদের ঘরে ঘরে শুধু পৌঁছে দেয় না, পরন্তু প্রতিদিন তাকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাতে পণ্যবিক্রয় বৃদ্ধির সহায়তা হয়। কিন্তু

37. Outdoor Advertisement.

এরা ব্যয়বহুল এবং সর্বদাই ঐগুলি যে সম্ভাব্য ক্রেতার নিকটই পেঁছায় তা নয়। প্যান-আমেরিকান এয়ারওয়েজ-এর সুদৃশ্য দেয়ালপঞ্জী এমন ব্যক্তির গৃহে শোভা পেতে পারে, যার আদৌ জীবনে কোনদিন বিমানপথ ব্যবহারের সম্ভাবনা নাই। অতএব এদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত দেওয়া সম্ভব নয়। (খ) এ ছাড়া 'ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা বক্তৃতাসহযোগে পণ্যের ছবির প্রদর্শনী ক্রেতাদের মধ্যে পণ্যবার্তা প্রচারের একটি পুরাতন পন্থা। আধুনিক স্বল্প দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট চলচ্চিত্র এর উন্নত সংস্করণ। বিভিন্ন সিনেমা হলে, মূল চিত্রের সাথে প্রদর্শিত এই সব বিশেষ বিশেষ শিল্প ও পণ্য-সংক্রান্ত ছোট ছোট চলচ্চিত্র অল্প সময়ের জন্য দর্শকদের একাগ্র মনোযোগ আকর্ষণের দ্বারা তাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করে থাকে। আধুনিক কালে এটি বিশেষ প্রসারলাভ করেছে। ব্যয়বহুল হলেও এর আবেদন ব্যাপকতর। (গ) গাছের গায়ে ছোট ছোট টিনের টুকরার উপর লিখিত বিজ্ঞাপন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণের একটি পুরাতন পদ্ধতি। বর্তমানকালে এ ছাড়াও, বিভিন্ন দোকানে 'স্টোরকার্ড' প্রভৃতির মাধ্যমে পণ্য বিশেষ যে স্থানে পাওয়া যায় তা ক্রেতাকে স্মরণ করে দেওয়া হয়। (ঘ) মাঝে মাঝে পণ্য প্রদর্শনী, মেলা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করে বিভিন্ন পণ্যে সুসজ্জিত বিপণি দ্বারা ক্রেতাদের মধ্যে পণ্যের ব্যাপক প্রচারকার্য আধুনিককালে একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। (ঙ) আধুনিক শহরগুলির জনাকীর্ণ স্থানে বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত সুদৃশ্য লিপি, বিদ্যুৎ লিখন ও ছবি দ্বারা ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা প্রায়ই দেখা যায়। (চ) এ ছাড়া, অবস্থাবিশেষে রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি, মোটর গাড়ি, প্রভৃতি থেকে মাইক সহযোগে, গীতবাদ্য সহকারে বিভিন্ন পণ্যের প্রচার ও তার সাথে হ্যাণ্ডবিল বিলি করে পণ্যবার্তা ক্রেতার কাছে পেঁছে দেওয়ার চেষ্টাও একটি সুপরিচিত বিজ্ঞাপন পদ্ধতি। (ছ) ইস্তাহার বা হ্যাণ্ড-বিল অবশ্য বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম। এর ব্যয় অল্প। যে কোন জাতীয় পণ্য ও সেবার বার্তা মুদ্রিত প্রচারপত্রের দ্বারা ব্যাপকভাবে স্থানীয় প্রচারকার্য করা যেতে পারে। এতে বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ ও গুণাগুণের উল্লেখ করা যায়। সাধারণত, অল্প মজুরিতে বিতরণকারী নিযুক্ত করে জনাকীর্ণ শহর, বাজারের কেন্দ্র, রেলস্টেশন, ছোট অফিস, আদালত প্রভৃতি স্থানে এগুলি বিলি করা হয়। শহরের কর্ম-ব্যস্ত মানুষের উপর এর বিশেষ প্রভাব নেই। কেউ পড়ে, কেউ পড়ে না। শহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে এর কার্যকারিতা বেশী।

মাধ্যম নির্বাচন (SELECTION OF MEDIA)

বিজ্ঞাপনের বহুবিচিত্র মাধ্যম থাকায়, সঠিক মাধ্যম নির্বাচন সহজ নয়। কিন্তু উপযুক্ত মাধ্যমের উপরই বিজ্ঞাপন অভিযানের সাফল্য নির্ভর করে বলে অত্যান্ত সতর্কতার সাথে তা নির্বাচন করা বিশেষ প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত মাধ্যম বেছে নিতে গিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হয়ঃ

১. পণ্যের প্রকৃতি[৩৮] ঃ মাধ্যম নির্বাচন করতে গিয়ে প্রথমেই পণ্যের গুণাগুণ বিচার করা প্রয়োজন। পণ্যটি কোন্ ধরনের, তার বৈশিষ্ট্য কি, তা সেলাইকলের মত দীর্ঘকাল ব্যবহার্য ধরনের কিংবা মাখনের মত অল্পকাল স্থায়ী ও পচনশীল; সরিষার তেলের মত দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অথবা রেশমবস্ত্র কিংবা টেরিলিনের মত বিলাসদ্রব্য—এই সব বিষয় বিচার করে তার বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত মাধ্যম স্থির করতে হয়।

২. বাজারের বিস্তৃতি[৩৯] ঃ পণ্যের বাজারের বিস্তৃতি হল আরেকটি প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয়। পণ্যের বাজার স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ অথবা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত কিংবা জাতীয় ক্ষেত্রে প্রসারিত অথবা আন্তর্জাতিক, তার উপর উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচন অবশ্যই নির্ভর করে।

38. Nature of the Commodities. 39. Extent of the market.

৩. **ক্রেতাদের প্রকৃতি**[40] : বিচার্য তৃতীয় বিষয় হল, খরিদ্দারদের প্রকৃতি। পণ্যটির ব্যবহার সার্বজনীন অথবা শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিনা তার উপরও বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন নির্ভর করে।

৪. **ক্রেতাদের প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য**[41] : পণ্যের সম্ভাব্য খরিদ্দারদের অভ্যাস, রুচি, পছন্দ, সংস্কৃতি ও জীবনধারণের মান ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে আজকাল হ্যাণ্ডবিল পছন্দ করে না। এইভাবে বিজ্ঞাপিত পণ্যের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়। অথচ ঐ পণ্য সম্পর্কে প্রচারপত্র (সারকুলার লেটার) পাঠালে তাঁরা গ্রহণ করে বা বিখ্যাত দৈনিকপত্রে তার বিজ্ঞাপন দিলে পাঠ করে।

৫. **বিজ্ঞাপনের পন্থা**[42] : বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের আগে তার উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষভাবে আশু চাহিদা সৃষ্টি অথবা পরোক্ষভাবে ভবিষ্যৎ চাহিদা সৃষ্টি, তা স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিজ্ঞাপন পন্থা স্থির হবে এবং তার উপর প্রয়োজনীয় মাধ্যম নির্বাচন নির্ভর করবে। প্রত্যক্ষ পন্থা নিলে কৌতূহল সৃষ্টি, আবেদন, আতঙ্ক সৃষ্টি অথবা ইঙ্গিত ইত্যাদি উপায় গ্রহণ করতে হবে। আবার পরোক্ষ পন্থা গ্রহণ করলে সম্পাদকীয় সমর্থন, পরোক্ষ আবেদন ইত্যাদির সাহায্য নিতে হবে ও অনুরূপ মাধ্যম নির্বাচন করতে হবে।

৬. **আবেদনের বিস্তৃতি**[43] : বিভিন্ন মাধ্যমের আবেদনের বিস্তৃতিও পরিমাপ করতে হয়। তা বিচারের দ্বারা উপযুক্ত মাধ্যম স্থির করার কাজ সহজ হয়। ব্যাপক চাহিদার পণ্যের জন্য ব্যাপক প্রচারযুক্ত দৈনিক সংবাদপত্রের নির্বাচন প্রয়োজন। আবার আঞ্চলিক বা স্থানীয় চাহিদার পণ্যের জন্য আঞ্চলিক বা স্থানীয় সংবাদপত্র কিংবা প্রাচীর-পত্রই যথেষ্ট হতে পারে।

৭. **আবেদনের স্থায়িত্ব**[44] : বিচার করতে হয় কোন্ জাতীয় মাধ্যমের প্রভাব পাঠকের বা দর্শকের মনে কতখানি পরিমাণে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। বিজ্ঞাপনদাতার দিক থেকে স্বভাবতই ক্রেতার মনে যে মাধ্যম যত দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম তা তত বেশী বাঞ্ছনীয়।

৮. **বিজ্ঞাপন ব্যয়**[45] : সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনদাতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ফলা-ফলের তুলনায় যেন সর্বনিম্ন ব্যয়ে বিজ্ঞাপন অভিযান চালান যায়। তা না হলে তার মূল লক্ষ্য মুনাফা বৃদ্ধি—পূরণ হবে না; বিজ্ঞাপন অভিযানও তা হলে সফল হবে না।

৯. **বিজ্ঞাপন প্রতিলিপি**[46] : যার দ্বারা বিজ্ঞাপনদাতার ভাবধারা বার্তার আকারে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করা হয় তাকে প্রতিলিপি বা 'কপি' বলা হয়। আধুনিক বিজ্ঞাপনের পিছনে বিজ্ঞাপনদাতার যে উদ্দেশ্য থাকে তা হল মূলত নিজের পণ্য সম্পর্কে জন-সাধারণের মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করা। সংক্ষেপে চারটি শব্দে এই মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করা যায়—Look, Like, Learn, Buy, 'দেখুন, পছন্দ করুন, জানুন, কিনুন'। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি বা ছকটি এমনভাবে রচনা করতে হয় যেন,—(১) তা প্রথমে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে; (২) ক্রেতার মনে কৌতূহল জাগাতে পারে; (৩) জাগ্রত কৌতূহলকে মনে স্থায়ী করতে পারে; (৪) তার মনে পণ্যটির প্রয়োজনীয়তা বোধ বা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে পারে; এবং (৫) তাকে ক্রয়ে উৎসাহিত করে। সুতরাং উত্তম বিজ্ঞাপন প্রতিলিপির[47] নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অপরিহার্য :

---

40. Nature of customers.
41. Trends, habits, tastes, and living standards of customers.
42. Advertisement Policy. 43. Extent of Appeal. 44. Duration.
45. Cost of Advertisement. 46. Copy. 47. Good Copy.

(১) তা মনোযোগ আকর্ষণ করবে[48]; (২) তা আগ্রহ সৃষ্টি করবে[49]। (৩) তা দ্রব্যটি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগাবে[50]। (৪) তা পাঠককে সক্রিয় হতে আবেদন করবে[51];

সংক্ষেপে—**Attention, Interest, Desire, Action** অথবা **মনোযোগ, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়া**—এই চারটি গুণ হল শ্রেষ্ঠ প্রতিলিপির বৈশিষ্ট্য।

বিজ্ঞাপনের উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিলিপি রচনাকালে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করা অবশ্য প্রয়োজনঃ (১) **সারল্য**[52]ঃ বিজ্ঞাপন প্রতিলিপির সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হল সারল্য। প্রতিলিপিটি এরূপভাবে রচনা করতে হবে যেন সহজবোধ্য স্বল্পতম শব্দে সর্বাধিক ভাব প্রকাশ করে। (২) **সৌন্দর্য**[53] ঃ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ক্রেতাকে আকর্ষণ করা, তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া নয়। সুতরাং বিজ্ঞাপন প্রতিলিপিটি যথাসম্ভব সুন্দররূপে অঙ্কিত বা লিখিত ও সুশোভন বর্ণচ্ছটায় সুসজ্জিত হওয়া প্রয়োজন। (৩) **আবেদন**[54] ঃ ক্রেতা অনুসারে পণ্যটির বিজ্ঞাপনের আবেদন রচিত হওয়া প্রয়োজন। সর্ব-সাধারণের ব্যবহারযোগ্য পণ্য হলে তার আবেদন সাধারণ প্রকৃতির হবে। আবার শিশুর খাদ্য বা রোগীর পথ্য কিংবা খেলার সামগ্রীর মত শ্রেণীবিশেষের ব্যবহার্য দ্রব্য হলে, বিজ্ঞাপনের আবেদনটি মায়েদের বা ডাক্তার বা রোগীদের অথবা খেলোয়াড়দের প্রতি লক্ষ্য করে রচনা করতে হয়। (৪) **ব্যয়**[55] ঃ এটা অবশ্যই স্বাভাবিক যে, ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্যান্য কাজের মতই বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপিও রচনা করতে হয়। যে সব পণ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আছে তার বেলায় বিজ্ঞাপনের জন্য খুব বেশী ব্যয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের প্রতিলিপির জন্য বেশী ব্যয় করা চলে না। তাতে বিক্রয় খরচ অনাবশ্যকরূপে বাড়ে। ঔষধের মত দ্রব্যের বেলায় তাদের প্রাথমিক ব্যয়ের অধিকাংশই বিজ্ঞাপন প্রভৃতির জন্য ঘটে থাকে। সুতরাং যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিলিপি রচনা করতে হয়। তবে পণ্য বিশেষে এর তারতম্য হয়ে থাকে। (৫) **মাধ্যম**[56] ঃ প্রতিলিপি রচনার সময় কোন বিশেষ মাধ্যমে তা প্রচারিত হবে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। মাধ্যম অনুযায়ী প্রতিলিপির ধরনধারণের রদবদল হতে পারে। (৬) **উপযুক্ত সময়ে বারংবার প্রকাশনা**[57] ঃ প্রতিলিপি প্রকাশের উপযুক্ত নির্দিষ্ট সময় স্থির করতে হয়। পূজার সময় ঘন ঘন দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হয়। বৎসরের অন্য সময়ে হয়ত মাঝে মাঝে প্রকাশ করলেই যথেষ্ট হতে পারে। সময় অনুসারে প্রতিলিপির ভাষা, আবেদন, সাজসজ্জা প্রভৃতির রদবদল করতে হয়।

বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা (LAYOUT)

বিজ্ঞাপন প্রতিলিপির লিখিত অংশ, ছবি, ট্রেড মার্ক-এর ব্লক প্রভৃতির যথোপযুক্ত সাজসজ্জাকে বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা বলে। এর উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞাপনটি ছাপার কাজে প্রেসকে নির্দেশ দেওয়া। তা না হলে প্রেসের পক্ষে সঠিকভাবে বিজ্ঞাপনটি ছাপানো সম্ভব-পর নয় এবং তাতে বারবার পরিবর্তন ও সংশোধন করতে গিয়ে অযথা সময়, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হয়।

বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জার জন্য যে সব বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, তা হল—(ক) বিজ্ঞাপনের আয়তন ও আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা; (খ) শিরোনামাতে ব্যবহারযোগ্য শব্দ ও বাক্য এবং বিশেষ বিশেষ ধ্বনি[58]; (গ) পশ্চাৎপট[59]; (ঘ) ব্যবহারযোগ্য ছবি বা ব্লক; এবং (ঙ) বিজ্ঞাপনের আয়তন ও আকারের সাথে শিরোনামা, ব্লক ও পশ্চাৎপটের সুসামঞ্জস্য।

48. It must draw attention. 49. It must create interest.
50. It must arouse desire to possess it.
51. It must urge the reader to action. 52. Simplicity 53. Art.
54. Appeal. 55. Expense. 56. Medium.
57. Timely repetition. 58. Slogan. 59. Background.

এগুলির প্রত্যেকটি এমনভাবে নির্বাচন করতে হয় যে, যেন সবগুলি মিলে একটি সামগ্রিক সৌকর্যসম্পন্ন বস্তুতে পরিণত হয়ে সহজেই পাঠক বা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও চিত্ত জয় করতে পারে।

একটি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা করতে বসে উপরোক্ত আঙ্গিকগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধানে ও সযত্নে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞাপনের আয়তন যত বড় হয়, ততই ভাল, কিন্তু আয়তন যত বড় হবে ততই খরচও বেশী হবে। সুতরাং খরচের দিকে লক্ষ্য রেখে আয়তন সীমাবদ্ধ করতে হয়।
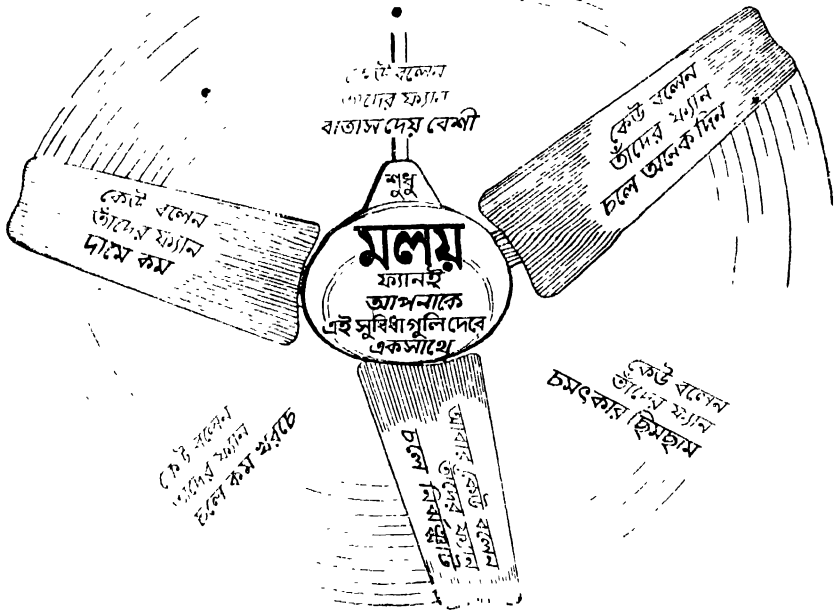
এবং যথাসম্ভব স্বল্পায়তনের মধ্যেই বিজ্ঞাপনটি সাজাতে হয়। আয়তনের পর প্রশ্ন ওঠে আকারের। বিজ্ঞাপনটি চতুষ্কোণ কিংবা আয়তক্ষেত্রাকার অথবা ত্রিকোণ কি গোলাকৃতি হবে, তা শিল্পীর সাথে পরামর্শ করে স্থির করতে হবে। শিল্পীর সাথে আরও পরামর্শ করতে হয় যে, রেখাচাতুর্যে বা অন্য কোন প্রকারে বিজ্ঞাপনের মধ্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ছাড়াও, তাতে গভীরতা[60] ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে কিনা এবং তাতে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ কতখানি সফল হবে। তার পর স্থির করতে হয়, বিজ্ঞাপনের শিরোনামা কি হবে এবং তাতে কোন্ কোন্ শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হলে পাঠকের দৃষ্টি সম্মোহিত করা যাবে। অনেক ব্যবসায়ী একই পণ্যের নানান বিজ্ঞাপনে বারবার একটি মাত্র শিরোনামা দিনের পর দিন ব্যবহার করে পাঠকের মনে তাদের পণ্যের সাথে কতকগুলি শব্দের অপরিহার্য সান্নিধ্য সৃষ্টি করে। "Better Buy Britannia"—এই জাতীয় শিরোনামার একটি উদাহরণ। এর পর বিজ্ঞাপনের পশ্চাৎপট। সাধারণ বিজ্ঞাপনের সাদা ও কালো এই দুই বর্ণের ব্যবহার হয়। অক্ষর ও ছবি ইত্যাদি কালো হলে তা ফুটিয়ে তোলার জন্য পশ্চাৎপট সাদা রাখা হয়। আবার কালো পশ্চাৎপটে সাদা অক্ষর ও ছবিতেও বিজ্ঞাপন ফুটিয়ে তোলা

60. Depth.

যায়। আজকাল দুই বর্ণের পরিবর্তে বিজ্ঞাপনে বহুবর্ণ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তখন পশ্চাৎপটের জন্য এমন বর্ণ বাছাই করতে হয় যে অন্যান্য ব্যবহৃত বর্ণগুলি তাতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এর পর বিজ্ঞাপনে কোন ব্লক ব্যবহৃত হবে কিনা এবং হলে, তা কি ধরনের হবে, তা স্থির করতে হয়। এই সব ব্লকের জন্য কোন ফটো অথবা কোন আঁকা ছবি ব্যবহৃত হতে পারে। পরিশেষে এদের প্রত্যেকটি বাছাই করতে গিয়ে শুধু পৃথকভাবে সেগুলির কথা চিন্তা করলেই চলে না। প্রত্যেকটি অঙ্গের নির্বাচন এমনভাবে করতে হয় যেন তা একে অপরের সাথে সম্পূর্ণরূপে খাপ খায় ও সকলে মিলে একটি নয়নমনোহর শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত হয়ে বিজ্ঞাপনদাতার মূল উদ্দেশ্য সাধনে সার্থক হয়ে ওঠে।

আধুনিক বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানসমূহ (MODERN ADVERTISING AGENCIES)

আধুনিককালে পণ্যের বাজার এত ব্যাপক, ক্রেতা, পাঠক ও দর্শকের রুচি এত বিভিন্ন এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমের বৈচিত্র্য এত বেড়েছে যে, বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ আর আগের মত সহজ নয়। বিজ্ঞাপন কার্যকর করার জন্য পাঠকের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে, পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী, বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত মাধ্যম, স্থান, প্রতিলিপি ও সময় স্থির করতে হয়। অতএব বিজ্ঞাপনের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আধুনিক কালে আর বিজ্ঞাপনদাতার নিজের পক্ষে বিজ্ঞাপন অভিযান চালানো সম্ভব নয়। এইজন্য অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের জন্য আলাদা বিভাগ খোলা হয় ও একজন বিজ্ঞাপন-ম্যানেজারকে তার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই কারণে বর্তমান কালে এক জাতীয় বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়েছে; এরা বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জন করে বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করে। এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী নামে এরা পরিচিত।

এই বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ীরা বা এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীগুলি একদিকে পত্রপত্রিকার প্রকাশক ও অন্যদিকে বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করে। একদিকে বিজ্ঞাপনের জন্য পত্রপত্রিকায় নির্ধারিত স্থানগুলি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হবে বলে প্রকাশকদের এরা সুনিশ্চয়তা দেয়; অন্যদিকে, বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরূপে এরা বিজ্ঞাপন-দাতাদের সেবা করে থাকে।

বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা **এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীগুলির কাজ** হলঃ (১) পণ্যবিক্রয়বৃদ্ধির অন্যান্য প্রচেষ্টার সাথে মিল রেখে বিজ্ঞাপনী কর্মসূচী তৈরি করা; (২) কর্মসূচী অনুযায়ী বিজ্ঞাপনগুলি প্রস্তুত করা; (৩) উপযুক্ত মাধ্যম-গুলির মারফৎ বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করা ও তার ফলাফল অনুধাবন করা; এবং (৪) পরীক্ষামূলকভাবে প্রচার অভিযান চালানো, মোড়ক ও লেবেলের ডিজাইন সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া প্রভৃতি।

এই সব কাজের জন্য এরা সাধারণত বিজ্ঞাপনদাতার কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক নেয় না। পারিশ্রমিক বাবদ এরা বিজ্ঞাপন-মাধ্যমের মালিকদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্যের শতকরা ১০ থেকে ১৫ শতাংশের মত কমিশন নিয়ে থাকে। তাতে বিজ্ঞাপন মাধ্যমের মালিকদেরও সুবিধা হয়। তারা সুপরিচিত বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের উপর তাদের মাধ্যমগুলি ভাড়া দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য এরা অতিরিক্ত কাজের জন্য নির্দিষ্ট হারে বিজ্ঞাপনদাতার কাছ থেকে পারিশ্রমিকও নিয়ে থাকে।

এদের নিজস্ব বিভিন্ন বহু শিল্পী ও বিজ্ঞাপন রচয়িতা থাকে। তাদের সাহায্যে এরা পরিপাটিরূপে বিজ্ঞাপন রচনা ও অঙ্গসজ্জা প্রস্তুত করে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের

পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য এদের বিভিন্ন বিভাগ থাকে ও ঐ সব বিভাগ বিভিন্ন অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয়।

অনেক সময় এরা নিজেরাও নানা প্রকারের বিজ্ঞাপন মাধ্যম, যথা বিজ্ঞাপন ফলক, সিনেমা হলে বিজ্ঞাপনের অধিকার, পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার কিনে বা লীজ নিয়ে তা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে ভাড়া দেয়। আধুনিক বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানগুলি এই সমস্ত কাজ ছাড়াও বিজ্ঞাপন ও বাজার সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা চালায় ও তার ফলাফলের দ্বারা মক্কেলদের বিজ্ঞাপনকে আরও কার্যকর করে তোলে।

প্রেস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ীদের কয়েকটি সংস্থা যথা, দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এ্যাডভারটাইসারস, দি এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীস এ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া, সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন যথা, দি ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড-ইস্টার্ণ নিউজপেপারর্স সোসাইটি, দি ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ নিউজপেপারস এ্যাসো-সিয়েশন এবং মুদ্রাকরদের সংগঠন ফেডারেশন অব মাস্টার প্রিন্টারসদের নিয়ে **দি এ্যাডভারটাইজিং কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া** গঠিত হয়েছে। এর কাজ হলঃ (১) বিজ্ঞাপন ব্যবসায় থেকে দুর্নীতিমূলক ও সমাজবিরোধী বিজ্ঞাপন দূর করা; (২) বিজ্ঞাপনের নূতন মাধ্যম অনুসন্ধান করা; (৩) বিজ্ঞাপন-কলা সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা; এবং (৪) দেশে কার্যকর বিজ্ঞাপন সুনিশ্চিত করার জন্য বাজার সম্পর্কে গবেষণা চালান।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন (SCIENTIFIC ADVERTISEMENT)

সকল ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের লক্ষ্য হল স্বল্পতম ব্যয়ে সর্বাধিকতম ফল লাভ করা। বিজ্ঞাপন ক্ষেত্রেও এই কথাটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। যে বিজ্ঞাপনে ব্যয়ের তুলনায় বিক্রয় যথেষ্ট বাড়ে না, তা শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ের পক্ষে লাভজনক নয়। এই কারণে বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন নামে অধিকতর উন্নত বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন পদ্ধতিতে প্রথমে ক্রেতাদের মনস্তত্ত্ব, বাজারের চাহিদা এবং প্রবণতা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে বিশ্লেষিত বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা যথাযথভাবে সাজিয়ে তা থেকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শেষে ঐ সব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজ্ঞাপন অভিযান পরিকল্পনা প্রস্তুত করে, অভিযান পরিচালনা দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নির্ণয় করা হয়। সর্বশেষে যে সব ভুলত্রুটি ধরা পড়ে তা সংশোধন করে চূড়ান্ত বিজ্ঞাপন অভিযান পরিকল্পনা স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হয়।

এই ব্যবস্থার সরাসরি ক্রেতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র বিজ্ঞাপন অভিযান, তার ভাব ও ভাষা স্থির করা হয় বলে, এর দ্বারা উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয় ও মধ্যস্থ কারবারীদের উপর উৎপাদনকারীর নির্ভরশীলতা কমে যায়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রেতার মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করে পণ্যের বিক্রয় সুনিশ্চিত করা হয়।

এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক ভাবে বাজার ও ক্রেতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা প্রভৃতির জন্য বেশী ব্যয় সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা সুনিশ্চিত সর্বাধিক ফল প্রদান করে বলে এর দ্বারা প্রকৃত ব্যয়সংকোচ ঘটে।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন পদ্ধতিতে তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যথা, ক. সূত্রানু-সন্ধান[৬১]; খ. অনুবর্তন[৬২]; এবং গ. বাজার সংক্রান্ত গবেষণা[৬৩]।

ক. সূত্রানুসন্ধান ঃ বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত

---

61. Keying. 62. Follow-up. 63. Market Research.

বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা পরিমাপ করা প্রয়োজন। এইজন্য চার প্রকার বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়—(১) একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ঠিকানাযুক্ত বিজ্ঞাপন বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়। এর পর তাদের কোন্‌টিতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কতজন পাঠক সাড়া দিয়েছে তার হিসাব করে যার বিজ্ঞাপনে সর্বাধিক সাড়া পাওয়া গেছে, শুধু সেটি অব্যাহত রেখে বাকি কাগজে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয়। (২) একাদিক্রমে বিভিন্ন কাগজে পর পর বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের প্রত্যেকের আবেদনে পাঠকের কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া যায়, তার হিসাব করে অপেক্ষাকৃত বেশী কার্যকর কাগজের বিজ্ঞাপন চালু রেখে অন্যান্য কাগজের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয়। (৩) অনেক সময় একসঙ্গে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সাথে খালি ফরম্‌ প্রকাশ করে পাঠককে তা পূরণ করে পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। এইরূপে কোন্‌ কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কতগুলি ফরম পূরণ করে ক্রেতারা পাঠিয়েছে, তার হিসাব করে ঐ সব কাগজের তুলনামূলক কার্যকারিতা স্থির করা হয়। (৪) অনেক সময় বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পাঠককে অনুরোধ করা হয় যেন, তিনি তাতে আকৃষ্ট হয়ে পণ্যের অর্ডার দেওয়ার সময়, যে কাগজে তিনি ঐ বিজ্ঞাপন দেখেছেন, তার নামোল্লেখ করেন। এর দ্বারাও কোন্‌ কাগজের বিজ্ঞাপন কতজন পাঠককে আকৃষ্ট করেছে তা জানা যায়।

এই পদ্ধতিকে সূত্রানুসন্ধান বলে। উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচনের জন্য এই ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রদ।

খ. অনুবর্তন ঃ নানা বিজ্ঞাপনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে অনেক পাঠকই পণ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করে চিঠি দেয়। সাধারণ বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের উত্তর পাঠিয়েই ক্ষান্ত হয়। তার পর কি ঘটল, তার খেয়াল আর রাখে না। পাঠককে ক্রেতায় পরিণত করতে যত্ন নেয় না। এইজন্য বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন পদ্ধতিতে, পাঠকদের কাছ থেকে অনুসন্ধান এলে একটি নির্দিষ্ট খাতায় অনুসন্ধানকারীর নাম, ধাম ও জ্ঞাতব্য বিষয়সহ লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন্‌ তারিখে তাকে উত্তর পাঠান হল তা লিখে রেখে, সমগ্র বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। পাঠকের কাছ থেকে আর কোন সাড়া না পাওয়া গেলে মাঝে মাঝে তার কাছে পত্র পাঠান হতে থাকে এবং তাও ঐ খাতায় লিখে রাখা হয়। এইরূপে বারবার অনুরুদ্ধ হতে হতে অনেক অনুসন্ধানকারীই অবশেষে পণ্যের ক্রেতায় পরিণত হয়ে যায়। এই পদ্ধতিকে অনুবর্তন বা ('ফলো আপ') বলে।

গ. বাজার সংক্রান্ত গবেষণা ঃ আধুনিক তীব্র বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতার দিনে পণ্যের বিজ্ঞাপন কিভাবে দেওয়া হবে, কোন্‌ কোন্‌ মাধ্যম ব্যবহৃত হবে, বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি কিরূপ হবে, বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা ও বিন্যাসই বা কোন্‌ প্রকারের হবে এবং তাতে ক্রেতাকে আকর্ষণের জন্য কোন্‌ শিরোনামা থাকবে, এ সব স্থির করার জন্য বিজ্ঞাপনদাতারা প্রথমেই বাজার সংক্রান্ত গবেষণা চালায়। বাজার সংক্রান্ত গবেষণার উদ্দেশ্য হলঃ (১) ক্রেতা কি চায়; (২) ক্রেতা যা চায়, তা কী পরিমাণ চায়; (৩) চাহিদার সম্ভাব্য কতটা অংশ ক্রেতার গবেষণা পরিচালনাকারীর নিকট থেকে কিনতে পারে, এবং (৪) পণ্যটির নূতন ক্রেতা বা বাজার সৃষ্টির সুযোগ ও সম্ভাবনা কতখানি বর্তমান প্রভৃতি অনুসন্ধান করা।

এইভাবে বাজার সংক্রান্ত গবেষণাদ্বারা ক্রেতাদের সঠিক মনোভাব ও পণ্যটির বিক্রয় বৃদ্ধির সুযোগ সম্ভাবনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে ঐ সব সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সঠিক বিজ্ঞাপন অভিযান পরিচালনা করা হলে, তবেই বিজ্ঞাপনদাতারা সর্বাধিক ফল লাভ করতে পারে। এই কারণে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন পদ্ধতিতে অধুনা বাজার সংক্রান্ত গবেষণার গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে।

বিজ্ঞাপনদাতা অর্থাৎ পণ্যের উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান নিজেই এই বাজার সংক্রান্ত গবেষণার কাজ পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের উপর এর ভার দেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের উদ্যোগে এই গবেষণা পরিচালনা করে।

বাজার সংক্রান্ত গবেষণা দুইভাগে বিভক্ত—(১) ক্রেতা সংক্রান্ত গবেষণা[৬৪] ও (২) ব্যবসায় বা বিক্রয় ব্যবস্থা বা খুচরা বিক্রেতা সংক্রান্ত গবেষণা[৬৫]। এই গবেষণা আবার দুইভাবে পরিচালনা করা হয়। যথা—(১) ডাকযোগে প্রশ্নাবলী[৬৬] সংবলিত ফরম পাঠিয়ে প্রাপককে তা পূরণ করে ফেরত পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। (২) অনুসন্ধানকারী[৬৭] পাঠিয়ে নির্বাচিত ব্যক্তিদের[৬৮] কাছ থেকে, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা দ্বারা প্রশ্নাবলীর অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে, জ্ঞাতব্য তথ্য অর্থাৎ তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়।

১. ক্রেতা সংক্রান্ত গবেষণা ঃ ক্রেতা সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ক্রেতাদের মতামত সংগ্রহ করা যেতে পারে। যথা—

(ক) আপনি কোন্ কোন্ জাতীয় পণ্য (যথা, পানীয়, খাদ্য, বা অন্যান্য জাতীয়) ব্যবহার করেন? (খ) আপনি কোন্ কোন্ মার্কা বা নামে পরিচিত দ্রব্যগুলি বেশী পছন্দ করেন এবং কেন? (গ) আপনি ঐ জাতীয় পণ্যের অপরাপর যে যে মার্কার দ্রব্য ব্যবহার করেন না, সেগুলি কি এবং কেন ঐগুলি ব্যবহার করেন না? (ঘ) আপনি কোন বিশেষ মার্কার পণ্য (অর্থাৎ গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্যটি) ব্যবহার করেন কিনা এবং করলে তার কারণ কি? (ঙ) আপনি উক্ত পণ্যটি কোন্ কার্যে বা কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন? (চ) সে জন্য আপনি প্রতি সপ্তাহে বা মাসে কত ব্যয় করেন? (ছ) আপনার মাসিক আয় কত? (জ) পণ্যটির বিশেষ কোন্ গুণটি আপনাকে আকৃষ্ট করেছে?—ইত্যাদি।

এই সব প্রশ্নের উত্তর থেকে গবেষণাকারী পণ্যটির প্রতি ক্রেতার আকর্ষণের বা জনপ্রিয়তার মূল কারণ ধরতে সক্ষম হয় এবং সেটি বিজ্ঞাপনের শিরোনামা হিসাবে ব্যবহার করে আরও ক্রেতা আকর্ষণের চেষ্টা করে থাকে।

এই প্রশ্নাবলীর উত্তর সংগ্রহের জন্য কাদের কাছে যেতে হবে তা সযত্নে স্থির করতে হয়। এইজন্য ক্রেতা সাধারণের মধ্য থেকে লোক বাছাই করতে হয়। এদের নমুনা বলে। এদের মতামতকে ক্রেতাদের প্রতিনিধিত্বমূলক মতামত বলে মূল্য দেওয়া হয়। এদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বুদ্ধিমান, আলাপী ও অত্যন্ত ভদ্র কর্মী প্রয়োজন। ক্রেতাদের সাথে আলাপ পরিচয় করে এবং তাদের কোনরূপ অসন্তুষ্ট বা ক্ষুণ্ণ না করে ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর সংগ্রহ করতে হয়। অনেক সময় এই সব কর্মীদের এইজন্য বিশেষভাবে শিক্ষাদান করাও হয়ে থাকে।

২. ব্যবসায়ী সংক্রান্ত গবেষণা ঃ শুধু ক্রেতার মতামত জানলেই হয় না, পণ্যটির ক্রয়-বিক্রয়ে নিযুক্ত পাইকারী ও খুচরা কারবারীদের মতামত ও মনোভাব জানা দরকার। তাদের কোন পরামর্শ থাকলে তা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কারণ তাদের সাহায্যেই পণ্যটিকে বাজারে ছাড়া হয়। সুতরাং তাদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে সর্বাধিক বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য 'ব্যবসায়ী গবেষণা'ও পরিচালনা করা ও তার দ্বারা লব্ধ তথ্য ও জ্ঞানের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠন করা প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্য-সংক্রান্ত যে প্রশ্ন করতে হবে, তা ভিন্ন ধরনের। যথা—কোন্ মার্কার পণ্য ব্যবসায়ীদের জনপ্রিয়, তাদের বিক্রয়ের পরিমাণ কত, কোন্ কোন্

---

64. Consumer Research.
65. Trades or Dealer Research.
66. Postal Questionaires.
67. Field Investigator.
68. Selected persons.

পদ্ধতিতে পণ্যগুলি সাধারণত ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাদের মধ্যে কোন বিশেষ পদ্ধতিটি ব্যবসায়ীরা বেশী পছন্দ করে, কোন্ কোন্ শ্রেণীর ক্রেতারা পণ্যটি ক্রয় করে, তাদের পুরুষ কত, নারী কত, উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কত, নিম্নতর শ্রেণীর ব্যক্তিই বা কিরূপ, তারা সাধারণত কোন্ বয়সের ব্যক্তি, ক্রেতারা পণ্যের কিরূপ আকারের এবং সাজসজ্জাযুক্ত মোড়ক পছন্দ করে, বৎসরের কোন্ সময়ে তা সর্বাধিক বিক্রয় হয়, সারা বৎসরই বিক্রয় চলে কিনা, ঐ পণ্যের প্রতিযোগী পণ্যোৎপাদনকারীরা কত কমিশন দেয় এবং দোকানদারদের ঘর সাজাবার জন্য কোন প্রদর্শনী দ্রব্য যথা. ছবি, পণ্য অনুকৃতি[৬৯] বা বোর্ড ইত্যাদি দেয় কি না, দিলে ঐগুলি কিরূপ এবং ব্যবসায়ীর নিজের এ সম্পর্কে কোন পরামর্শ আছে কিনা ইত্যাদি অনেক প্রকার প্রশ্নই প্রশ্নাবলীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এই সব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানকারী কর্মীদের দ্বারা সংগ্রহ করা যায় অথবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সব বিক্রয়কর্মীদের দ্বারাই ঐগুলি সংগৃহীত হতে পারে।

ক্রেতাদের ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এই সব প্রশ্নের উত্তর থেকে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয় তা বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়। ঐ পরিসংখ্যানের সাহায্যে গবেষণার সিদ্ধান্ত বা ফলাফল পাওয়া যায়। ইহার আলোকে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা করা হলে তবেই তা সুফলপ্রদ হয়।

৩. **বিজ্ঞাপন মাধ্যম সংক্রান্ত গবেষণা ঃ** উপরোক্ত দুই প্রকার গবেষণা ছাড়াও বাজার গবেষণার আরও একটি অঙ্গ আছে। তা হল বিজ্ঞাপনের মাধ্যম সম্পর্কে গবেষণা. বর্তমান কালে বিজ্ঞাপনের বহু মাধ্যম রয়েছে এবং কোন একটি বিশেষ মাধ্যম (যথা সংবাদপত্র) বহু রকমের হতে পারে। তাদের কোন্‌টিতে বিজ্ঞাপন দিলে সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকর হবে তা আগেই বিশদভাবে অনুসন্ধান করা হল বিজ্ঞাপন মাধ্যম সংক্রান্ত গবেষণার কাজ। এটি বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন, সংবাদ-পত্রের বেলায় কোন্ সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র পণ্য বিশেষের বিজ্ঞাপনের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী, তা জানার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হয়—পাঠকরা কোন্ কাগজটি বেশী পছন্দ করে, তাদের পত্রিকা ও সাময়িকী পাঠের অভ্যাস কিরূপ, পণ্যানু-যায়ী পাঠকদের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর প্রতি বিজ্ঞাপনের আবেদন থাকা উচিত, পত্র ও পত্রিকাগুলির প্রচার কিরূপ. তাদের প্রকৃত পাঠক কারা, পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে আনুমানিক শতকরা কতভাগ ব্যক্তিকে বিজ্ঞাপনের দ্বারা পণ্যটির প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব ইত্যাদি এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরলাভের পর তথ্যাদি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিশেষ মাধ্যম বা বিশেষ বিশেষ পত্রিকা নির্বাচন করে, বিজ্ঞাপন পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

---

69. Cartons.

২২

বিক্রয়বিদ্যা বা বিক্রয়িকতা
SALESMANSHIP

বিক্রয়ের গুরুত্ব

আধুনিক মানুষের চাহিদার বৈচিত্র্য বাড়ছে বলে অভাবপূরণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংখ্যা কল্পনাতীতরূপে বেড়ে গেছে। এই কারণে উৎপাদিত পণ্যের বৈচিত্র্যও[1] বেড়েছে। আধুনিক বাজার ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে, জাতীয় সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিণত[2] হয়েছে। দেশে দেশে বিস্তৃত এই সব বাজারের ক্রেতারা সকলে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে রয়েছে, বিভিন্ন তাদের সংস্কৃতি ও রুচি, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন তাদের জীবনযাত্রা, আয় ও চাহিদা[3]। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ক্রমেই বাড়ছে, দূরবর্তী বাজারগুলিতে পণ্য পাঠানোর পরিবহণ ব্যয়ও কম নয়। এই সব কারণে পণ্য-বিক্রয়ের কাজ ক্রমেই বেশী জটিল হয়ে উঠছে এবং তা আধুনিক কারবারগুলির কাছে কঠিন সমস্যা উপস্থিত করেছে। তাই বিক্রয়ব্যবস্থার গুরুত্বও বর্তমানে এত বেড়েছে যে কার্যকর বিক্রয়ব্যবস্থাকে[4] আধুনিক কারবারের দুটি স্তম্ভের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। (অন্য স্তম্ভটি হল দক্ষতাসম্পন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা[5])।

১. বিক্রয় হল একটি অর্থনীতিক প্রক্রিয়া[6]। বাস্তবের বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা[7] বর্তমান। সুতরাং তাতে পণ্য বিক্রয়ের জন্য নানা পন্থা অনুসরণ করতে হয়। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ক্রেতাকে পণ্যের অস্তিত্ব জানাতে হয়। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হয় ও এইভাবে সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রকৃত ক্রেতায় পরিণত করতে হয়। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রয়সংক্রান্ত এই সব কাজে যথেষ্ট অর্থব্যয় অপরিহার্য। এজন্য পণ্যোৎপাদনের ব্যয়[8] ছাড়াও পণ্য বিক্রয়জনিত ব্যয়[9] করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই বিক্রয়-ব্যয় এমন কি পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা বেশি হতে পারে। এক্ষেত্রে বিক্রয় প্রচেষ্টার সাফল্য ব্যয়-সংকোচের উপর বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। যে বিক্রেতা যত অল্প ব্যয়ে বিক্রয় করতে পারে তার পক্ষে তত অল্প দামে পণ্য বিক্রয় ও ক্রেতা আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। তার বিক্রয় ও মুনাফা তত বাড়ে। সুতরাং পণ্য বিক্রয়ের ব্যয়সংকোচ কার্যকর বিক্রয় ব্যবস্থার একটি প্রধান ভিত্তি।

২. বিক্রয়ের কাজটি একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াও বটে[10]। বিক্রয় ব্যবস্থা কখনই যান্ত্রিক হতে পারে না। ক্রেতার মনের উপর বিক্রেতার প্রভাব বিস্তার বিক্রয়ের সাফল্য নির্ধারণ করে। যে কোন একটি নির্দিষ্ট অভাব পূরণের জন্য প্রত্যেক ক্রেতার সামনে একাধিক উৎপাদনকারীর তৈরী, একাধিক অনুরূপ দ্রব্য থাকে। তাদের গুণাগুণ এবং দরদাম বিশেষ পৃথক নয়। এই অবস্থায় প্রতিযোগী বিক্রেতাদের মধ্যে যে ক্রেতাকে বেশী পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারবে সেই বিক্রয়ে সফল হবে।

1 Diversification of products. 2. Expansion of the markets.
3. Different groups of buyers with different habits, culture and traditions etc.
4. Effective selling. 5. Efficient production. 6. Economic process.
7. Imperfect competition. 8. Production cost.
9. Selling cost. 10. Psychological process.

৩. বিক্রয় হল যাবতীয় কারবারী কার্যকলাপের শেষ পরিণতি। সেই হিসাবে সর্বপ্রকার কারবারী কার্যকলাপের এটি হল সর্বশেষ প্রক্রিয়া।

বিক্রয়বিদ্যা (SALESMANSHIP)

বিক্রয়বিদ্যা বলতে বিক্রয়-কলা[11] বোঝায়। শুধু পণ্যসামগ্রী বা বস্তুজাত দ্রব্যের হস্তান্তর বা বিনিময় বোঝায় না বা শুধুমাত্র বস্তুগত এবং অ-বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ও বোঝায় না। বিক্রয় শব্দটির গভীর অর্থ হল অপরকে কোন বিষয়ে বা বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাস করানো, বা কোন চিন্তাধারা বা ধারণা অথবা কল্পনা কিংবা পরিকল্পনা অপরের দ্বারা গ্রহণযোগ্য করে তোলা বা গ্রহণ করানো। অর্থাৎ, কোন একটি বিশেষ দ্রব্য বা কর্মপন্থার উপযোগিতা তার সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের কাছে ব্যাখ্যা করে তাকে, প্রবক্তার স্বমতে আনার কাজকেই বিক্রয়ের কাজ বলা যেতে পারে। সুতরাং পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় কথাটির আসল অর্থ হল সেটি যে সম্ভাব্য ক্রেতার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, বিক্রেতার এই ধারণা সম্পর্কে সম্ভাব্য ক্রেতার স্বীকৃতি আদায় করা; সম্ভাব্য ক্রেতা, বিক্রেতার এই মত সম্পূর্ণ স্বীকার করলেই বিক্রয় সম্পন্ন হল। পণ্যের হস্তান্তর শুধু ঐ স্বীকৃতির বাহ্যরূপ মাত্র। গারফীল্ড ব্লেক বলেছেন **পণ্যের প্রতি সম্ভাব্য ক্রেতার আস্থা অর্জনের দ্বারা তাকে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করাই হল বিক্রয়বিদ্যা।**

বিক্রয়বিদ্যার প্রয়োগক্ষেত্র বহুব্যাপ্ত। উৎপাদনকারী থেকে পাইকারী ক্রেতা, এক পাইকারী ব্যবসায়ী থেকে অপর পাইকারী ব্যবসায়ী, পাইকারী ব্যবসায়ী থেকে খুচরা কারবারী এবং খুচরা কারবারী থেকে ভোগকারী পর্যন্ত প্রতি পর্যায়েই পণ্যের হস্তান্তর ঘটে এবং সেজন্য বিক্রয়প্রণালীর প্রতি বিন্দুতেই বিক্রয়বিদ্যার প্রয়োগ ঘটে।

শুধু তাই নয়। বিক্রয়কর্মী মারফৎ বিক্রেতা নিজ পণ্যের গুণাগুণ ও তার উপযোগিতা সম্বন্ধে ক্রেতাকে স্বমতে আনার প্রচেষ্টার দ্বারা অর্থাৎ বিক্রয়বিদ্যার প্রয়োগের দ্বারা পণ্যের প্রচারও যথেষ্ট পরিমাণে করে থাকে। সেজন্য বলা হয় যে, বিক্রয়বিদ্যা হল ব্যক্তিগত প্রচারকার্য[12]। আবার, বিক্রেতা পণ্যের যে বিজ্ঞাপন অভিযান পরিচালনা করে তাও তার গুণাগুণ সম্বন্ধে ক্রেতার মনে বিশ্বাস সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এজন্য বিজ্ঞাপনকে 'মুদ্রিত বিক্রয়বিদ্যা' বলে। এই কারণে বিক্রয়বিদ্যা এবং বিজ্ঞাপন পরস্পরের পরিপূরক বলে গণ্য করা হয়।

বিক্রয়বিদ্যার মৌলিক বিষয় (FUNDAMENTALS OF SALESMANSHIP)

বিক্রয়বিদ্যা অথবা 'সেলস্ম্যানসিপ' বলতে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, লিখিত ও অলিখিত ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ যাবতীয় প্রচেষ্টা—যে সব কাজের দ্বারা বিক্রেতা খরিদ্দারকে স্বমতে আনার চেষ্টা বা সম্ভাব্য ক্রেতাকে বাস্তব ক্রেতায় পরিণত করে, সেসব সমুদয় কাজকেই বোঝায়।

আধুনিক কালে কারবারের সাফল্য সুদক্ষ বিক্রয় ব্যবস্থার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। এজন্য সমস্ত বিক্রেতার পক্ষে যে তিনটি বিষয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হল--১. সুষ্ঠু বিক্রয় নীতি[13]; ২. উপযুক্ত বিক্রয় কার্যক্রম[14] এবং ৩. সুদক্ষ বিক্রয় সংগঠন[15]।

১. **বিক্রয়নীতি :** কারবার কর্তৃক অনুসরণের জন্য বিক্রয় সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট ভাবী পরিকল্পনাই হল বিক্রয়নীতি। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ও বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে এটি রচিত এবং বাজার সংক্রান্ত গবেষণার দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে থাকে। এই নীতি একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য রচিত হয় এবং প্রয়োজন হলে মধ্যে মধ্যে তার পরিবর্তন করাতে হয়। কারবারের পণ্য বিক্রয়ে আকাঙ্ক্ষিত সাফল্যের জন্য এটি অপরিহার্য।

---

11. Art of selling. 12. Personal publicity. 13. Sales Policy.
14. Sales programme. 15. Sales organisation.

২. **বিক্রয় কার্যক্রম ও পদ্ধতি :** গৃহীত বিক্রয়নীতি কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত একটি বিক্রয় কার্যক্রম প্রস্তুত এবং সে অনুসারে সুনির্দিষ্ট বিক্রয় পদ্ধতি স্থির করতে হয়। বাজার অর্থাৎ খরিদ্দারদের শ্রেণীবিভাগ, ভৌগোলিক আয়তন অনুযায়ী সমগ্র বাজারকে কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করা[১৬], পরিমাণগতভাবে বিক্রয়ের সামগ্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সে জন্য নির্দিষ্ট সময় স্থির করা ইত্যাদি বিক্রয় কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বিক্রয়ের লক্ষ্য, পণ্যের প্রকৃতি, বাজারের অবস্থিতি, খরিদ্দারগণের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা ইত্যাদি অনুসারে কার্যক্রমটি সফল করার জন্য বিক্রয়ের উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। এ জন্য উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য বিক্রয় কর্মচারী নিয়োগ, উপযোগী বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবস্থা গ্রহণ, পণ্যের নমুনা প্রস্তুতকরণ, পণ্য তালিকাবই প্রস্তুত করা, পণ্যের প্রশংসা সংবলিত খরিদ্দারদের প্রশংসাপত্র মুদ্রণ ও প্রচার, প্রদর্শনী ও মেলাতে পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রভৃতি প্রয়োজন।

৩. **বিক্রয় সংগঠন :** গৃহীত বিক্রয় কার্যক্রম ও বিক্রয় পদ্ধতি কার্যকর এবং তার সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য একটি উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন বিক্রয় সংগঠন প্রয়োজন। এটিই কারবারের বিক্রয় বিভাগ[১৭]। এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী বা সেলস্ ম্যানেজার, তার অধীন একাধিক বিক্রয় কর্মচারীর সহায়তায় বিক্রয়ের কার্যক্রমকে বাস্তবে রূপায়িত করে থাকে। সেলস্ ম্যানেজারকে সাহায্য করার জন্য একদল অফিস কর্মচারীও থাকে।

সেলস্ ম্যানেজারের কর্মদক্ষতার উপর বিক্রয় বিভাগের সাফল্য প্রধানত নির্ভর করে। কারণ, বিক্রয়নীতি ও কার্যক্রম তার সাহায্যেই প্রণয়ন করতে হয় এবং উপযুক্ত বিক্রয়কারী কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের শিক্ষার[১৮] ভারও তারই উপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং এরূপ গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, উপযুক্ত শিক্ষা, উদ্যোগ এবং তৎপরতা ইত্যাদি গুণাবলী অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বিক্রয় কর্মচারীদের শ্রেণীবিভাগ

বিক্রয় কর্মচারীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

১. **বস্তুগত দ্রব্য বিক্রয়কর্মী[১৯] :** রেডিও, মোটরগাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুগত দ্রব্য বিক্রয়কারী কর্মচারীরা।

২. **অ-বস্তুগত দ্রব্য বা সেবাকর্ম বিক্রয়কর্মী[২০] :** বীমা প্রতিনিধি, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফেকেট বিক্রয় প্রতিনিধি, বিনিয়োগ সংগ্রাহক[২১] প্রভৃতি শ্রেণীর বিক্রয়কর্মী।

এছাড়া বিক্রয়কর্মীদের আর একটি পরিচিত শ্রেণীবিভাগ আছে :

১. **খুচরাকারবারীর বিক্রয় কর্মচারী[২২] :** বিক্রয়কর্মীদের মধ্যে এরা সাধারণ মানুষের কাছে সর্বাধিক পরিচিত। সমস্ত খুচরা দোকানেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিদিন সাধারণ খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে এসে, তাদের কাছে নানা প্রকার ভোগ্যপণ্য বিক্রয় করাই এদের কাজ।

২. **পাইকারী কারবারীর বিক্রয় কর্মচারী[২৩] :** বিভিন্ন দ্রব্যের পাইকারী বিক্রেতা কর্তৃক নিযুক্ত বিক্রয় কর্মচারীরা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে পণ্যের ফরমাশ সংগ্রহ করে থাকে।

৩. **উৎপাদনকারীর বিক্রয় প্রতিনিধি[২৪] :** যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, ঔষধ ইত্যাদি নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য উৎপাদনকারীরা বিক্রয় কর্মচারী নিয়োগ

16. Area of operation. 17. Sales Department. 18. Training.
19. Salesman of tangible material goods.
20. Salesman of non-tangible goods. 21. Investment procurer.
22. Retailer's salesman. 23. Wholesaler's salesman.
24. Manufacturer's Representative.

করে। তারা পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে পণ্যের নমুনা ইত্যাদি সহ পণ্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে তার উপযোগিতা বুঝিয়ে কিনতে রাজী করায়।

৪. **প্রত্যক্ষ বিক্রয় কর্মচারী**[25] **:** যে সব মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী, যথা, নানাবিধ জটিল যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সর্বদা স্থায়ী বাজার নাই, যাদের মাঝে মধ্যে বিক্রয় ঘটে, সে সব ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীরা ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ঐগুলির বিশদব্যাখ্যা ও বর্ণনার জন্য কারিগরিবিশেষজ্ঞ বিক্রয় কর্মচারী পাঠিয়ে থাকে। বিমান ব্যবসায়, কল-কারখানার বিরাট যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এদের দেখা যায়।

৫. **অ-বস্তুগত দ্রব্য, অর্থাৎ সেবা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কর্মচারী**[26] **:** বীমা, পরিবহণ, অর্থ লগ্নী ও বিনিয়োগকারী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত বিক্রয় কর্মচারীরা সাধারণ মানুষের কাছে এমন জিনিস বিক্রয় করে, যা ধরা ছোঁয়া যায় না: সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীর সেবা বা উপযোগ বলা যায়। যথা—নিরাপত্তা (বীমা), সুবিধা (পরিবহণ), আয়ের সম্ভাবনা ও সুযোগ (বিনিয়োগ, সেভিংস সার্টিফিকেট) ইত্যাদি। এরা সেবা বিক্রয়কর্মী নামে পরিচিত।

যাবতীয় বিক্রয়কর্মীদের আবার কাজের গুণগত বিচারে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যারা **প্রচলিত** বস্তুগত এবং অ-বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ে নিযুক্ত, তাদের 'সারভিস সেলসম্যান' এবং যারা **নতুন** বস্তু ও অ-বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ে অর্থাৎ সেগুলির চাহিদা সৃষ্টিতে নিযুক্ত, তাদের 'ক্রিয়েটিভ সেলসম্যান' বলে।

বিক্রয় কর্মচারী বাছাই (SELECTION OF SALESMEN)

উপযুক্ত বিক্রয় কর্মচারী মনোনয়ন, সুদক্ষ কারিগর নির্বাচন অপেক্ষাও কঠিন। কারণ সুদক্ষ কারিগরের দক্ষতা পরীক্ষা করার সুনিশ্চিত ও ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থা আছে। তার কাজের ফলাফল বস্তুগত বলে তা নির্দিষ্ট মানের বিচারে যাচাই করা যায়। কিন্তু বিক্রয় কর্মচারীদের গুণাবলীর অধিকাংশই মানসিক তো বটেই, তা ছাড়া, আশু তাদের ফলাফল পাওয়া যায় না অথবা তা বস্তুগত নয়।

প্রধানত, সাক্ষাৎকারের দ্বারাই বিক্রয় কর্মচারীর যোগ্যতা ও গুণাবলী যাচাই করার চেষ্টা করা হয়। মৌখিক আলাপ ছাড়া, লিখিত এবং হাতে-কলমে পরীক্ষার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। এই সব সাক্ষাৎকার একাধিকবার, একাধিক ব্যক্তির দ্বারা লওয়া হয় এবং সেগুলির পৃথক পৃথক ফলাফল একত্রিত করে তুলনামূলক বিচারে প্রার্থীর সামগ্রিক মূল্য নির্ধারণও করা হয়ে থাকে। এইভাবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিক্রয়কর্মী মনোনয়ন করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোনীত সব কর্মীর মধ্যে একই প্রকার গুণাবলী পাওয়া যায় না এবং তারা কারবার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় গুণাবলীর নির্দিষ্ট মানসম্পন্নও হয় না। ব্যক্তিগত গুণাবলীর পার্থক্য সত্ত্বেও সমস্ত বিক্রয় কর্মচারী যাতে নির্দিষ্ট মানের প্রয়োজনীয় গুণাবলী আয়ত্ত করতে পারে, সেজন্য প্রত্যেক আধুনিক কারবারেই বিক্রয় কর্মীদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকে।

দক্ষ বিক্রয় কর্মচারীর গুণাবলী (QUALITIES OF A GOOD SALESMAN)

সকল শ্রেণীর বিক্রয়কর্মীর মধ্যেই যে সাধারণ গুণাবলী অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হয়, তা হলঃ

১. **সুদর্শন**[27]**ঃ** সুশ্রী, আকর্ষণীয় চেহারা বিক্রয় কর্মচারীর প্রাথমিক প্রয়োজনীয় গুণ। কারণ বিক্রয়িকের সুদর্শন আকৃতি ক্রেতার মনের অগোচরে একটি অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। সুন্দর আকৃতির সহিত মানানসই ফিট্‌ফাট্ পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস ইত্যাদির সমন্বয়ে বিক্রয় কর্মচারীর চেহারা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

25. Direct salesman. 26. Salesman of sellers of services.
27. Good appearance.

২. **সুন্দর স্বাস্থ্য ও সু-অভ্যাস**[28] : বিক্রয় কর্মীদের কার্যক্ষেত্র অফিসের বাইরে। সুতরাং তাদের সর্বদাই ঘোরাফেরা করতে হয়, নানান শহর, প্রদেশ, অঞ্চল, এমন কি বিভিন্ন দেশ-দেশান্তর পর্যন্ত তাদের অনবরত ভ্রমণ করতে হয়। এই কঠিন পরিশ্রম ও অনিয়ম সহ্য করার মত দৃঢ় স্বাস্থ্য না থাকলে চলে না। স্বাস্থ্যের সাথে দৈনন্দিন জীবনযাপনের কতকগুলি সু-অভ্যাস থাকাও বিশেষ প্রয়োজন। অগোছালো স্বভাব নিয়ে বিক্রয়কর্মীর কর্তব্য পালন করা যায় না অথবা, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর অভ্যাসের বশবর্তী হলে বেশি দিন সন্তোষজনকরূপে কাজ করা যায় না।

৩. **মার্জিত স্বভাব এবং আদবকায়দা**[29] : প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে তাদের নানান শ্রেণীর খরিদ্দারদের সংস্পর্শে আসতে হয়। তাদের খুশি করতে হলে বিক্রয় কর্মচারীদের মার্জিত স্বভাব ও যথোপযুক্ত আদবকায়দা প্রয়োজন। প্রাথমিক আলাপে ক্রেতাকে প্রভাবিত করার জন্য এটি অতি প্রয়োজনীয়।

৪. **মিশুক স্বভাব**[30] : বিভিন্ন স্থানে ও পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতাদের সাথে বিক্রয় কর্মচারীকে মিশতে হয়। এজন্য তাদের সদালাপী, মিষ্টভাষী, সমাজ ও সঙ্গপ্রিয় হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। অক্লেশে অপরিচিত পরিবেশে অপরিচিত ব্যক্তি বর্গের সাথে না মিশতে পারলে, তাদের প্রভাবিত করা এবং তাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা যায় না।

৫. **বুদ্ধিমত্তা**[31] : মেলামেশার দ্বারা বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তাকে সম্ভাব্য ক্রেতার স্বভাব চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে। কোন্ ভাবে অগ্রসর হলে তা ফলপ্রদ হবে, কোন্ কথার দ্বারা সম্ভাব্য ক্রেতা প্রভাবিত হবে, ইত্যাদি সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য বিক্রয়-কর্মীর সবিশেষ বুদ্ধিমত্তা থাকা প্রয়োজন। এজন্য তৎপরতা[32] এবং রসবোধও[33] প্রয়োজন।

৬. **অধ্যবসায়**[34] : বিক্রয় কর্মচারীকে অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহ নাছোড়বান্দ হয়ে লেগে থাকতে হয় ও অধ্যবসায় দ্বারা সম্ভাব্য ক্রেতার মন জয় করতে হয়।

৭. **ব্যক্তিত্ব**[35] : ব্যক্তিত্ব এমন একটি গুণ যা বিরল অথচ যা সর্বক্ষেত্রেই মানুষকে আকর্ষণ করে। পণ্য বিক্রয় ক্ষেত্রেও বিক্রয়িকের ব্যক্তিত্ব এজন্য আরও বেশি গুরুত্ব-পূর্ণ। বিনয়, সদালাপ, ভদ্র ব্যবহার, যুক্তিদ্বারা নিজ মত প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা, দৃঢ়তা, ধৈর্য ইত্যাদির সমাবেশে অপরের অজ্ঞাতে তার মনে নিজের স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের যে ক্ষমতা, এক কথায় তাকেই ব্যক্তিত্ব বলা হয়। বিক্রয়কর্মী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না হলে পণ্য সম্পর্কে তার বক্তব্য সম্ভাব্য ক্রেতার মনে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তিত্ব না থাকলে বিক্রয় কর্মচারীরূপে সফল হওয়া যায় না।

৮. **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা**[36] : আধুনিক কালে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা, উৎকৃষ্ট বিক্রয় কর্মচারীর পক্ষে অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়। এখানে শিক্ষা বলতে, বিক্রয় কর্মচারীর কর্তব্য সংক্রান্ত শিক্ষা এবং পণ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান—এই দুইটি বিষয়ই বোঝায়। পরিশেষে, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিক্রয় কর্মচারীকে নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এজন্য যে, অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে সে যে-কোন নূতন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বেশি পারদর্শী হয়।

বিক্রয় কর্মচারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা : শুধু কতকগুলি প্রয়োজনীয় অন্তর্নিহিত মানসিক গুণ থাকলেই সফল হওয়া যায় না। বিক্রয়কর্মী সাফল্যের প্রয়োজনীয় সকল গুণ সঙ্গে নিয়ে জন্মায় না। স্বাভাবিক গুণাবলীর সাথে শিক্ষালব্ধ গুণ সংযুক্ত

---

28. Good health and habit. 29. Politeness and manners.
30. Sociability. 31. Intelligence. 32. Smartness.
33. Sense of humour. 34. Persistence. 35. Personality.
36. Education and Experience.

হলে, তবেই সফল বিক্রয়কর্মী হওয়া যায়। এজন্য বিক্রয় কর্মচারীদের শিক্ষার প্রয়োজনকে ছোট করে দেখা যায় না। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টা পরাস্ত করে খরিদ্দার সংগ্রহের সাফল্যের জন্য ক্ষেত্রোপযোগী বিক্রয় কর্মচারীদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে উঠছে। বাজার সংক্রান্ত গবেষণা ও অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করে এই সমস্ত শিক্ষার বিষয় ও ধারা স্থির হয়ে থাকে। পুরাতন ও অভিজ্ঞ বিক্রয় কর্মচারীদের জন্যও মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালব্যাপী শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনশীল বাজারের অবস্থা ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যকৌশল প্রভৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। পণ্য, বাজার ও খরিদ্দার অনুযায়ী শিক্ষার পদ্ধতির তারতম্য হয়ে থাকে।

তবে কারবার যে প্রকারেরই হোক না কেন, সর্বত্রই বিক্রয় কর্মচারীদের তত্ত্বগত শিক্ষার[৩৭] প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেজন্য তার ব্যবস্থাও থাকে। বড় বড় কারবারের বিক্রয় বিভাগের উদ্যোগে এই শিক্ষাপ্রদান ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এজন্য বিক্রয় বিভাগ সংশ্লিষ্ট বাজার গবেষণা শাখার[৩৮] সাথে একটি শিক্ষা শাখাও[৩৯] থাকে। সাধারণত সেলস্ ম্যানেজার স্বয়ং ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আধুনিক কালে আবার বিভিন্ন বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রয় কর্মচারীশিক্ষা ব্যবস্থা[৪০] পরিচালিত হয়. এই সব প্রতিষ্ঠান বিক্রয় বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সংগঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কর্মচারীরা এদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। পত্র মারফত শিক্ষার ব্যবস্থাও[৪১] আছে। কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরীণ বিক্রয় কর্মচারীশিক্ষা ব্যবস্থায় আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষার[৪২] বন্দোবস্তও থাকে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি[৪৩], বাণিজ্য ও ব্যবসায়ী সংঘগুলিও অনেক সময় এরূপ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে।

কিন্তু বিক্রয়বিদ্যার তত্ত্বগত দিক অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিক্ষানবিস বিক্রয় কর্মচারীদের পুরাতন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ বিক্রয় কর্মচারীদের সাথে বাজারে পাঠানো হয়। সেখানে কার্যক্ষেত্রে কিভাবে সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে আলাপ করতে হয়, কি করে তার সাথে পরিচয় স্থাপনের পর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়. কোন্ কথাটি কিভাবে বলে তার মনে গভীর ছাপ ফেলা যায়, কিভাবে প্রতিকূল ক্রেতাকে অনুকূলে আনতে হয় ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলি হাতে কলমে শিক্ষানবিসরা পুরাতন অভিজ্ঞ বিক্রয় কর্মচারীর সঙ্গে থেকে শিক্ষা লাভ করে।

পরিশেষে, সকল প্রতিষ্ঠানেই মধ্যে মধ্যে বিক্রয় কর্মচারীদের সভা ও সম্মেলন ইত্যাদি আহ্বান করে বাজার ও বিক্রয়নীতি ও গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি, তার ত্রুটি ও সাফল্য, বিক্রয় কর্মচারীদের প্রত্যেকের কাজের হিসাব প্রভৃতির আলোচনা করা হয়। এই সকল সভা এবং সম্মেলনও তাদের শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ (SALES CONTROL)

নির্দিষ্ট কালের জন্য কারবারের বিক্রয়লক্ষ্য[৪৪] নির্ধারণ, তা পরিপূরণের জন্য উপযুক্ত বিক্রয় নীতি[৪৫] ও বিক্রয়-কার্যক্রম[৪৬] প্রণয়ন, বিক্রয়পদ্ধতিসমূহ[৪৭] নির্বাচন ও বিক্রয় বিভাগের সমগ্র শক্তি ও সম্পদের[৪৮] যথাযথ প্রয়োগ এবং ফলাফল বিচার ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কার্যক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলির উপযুক্ত সমাধানের চেষ্টা—সংক্ষেপে বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বলতে এই সব কার্যাবলী বোঝায়। বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছাড়া কারবারের পক্ষে কখনই বিক্রয়ের আকাঙ্ক্ষিত সাফল্যলাভ করা যায় না বলে

37. Theoretical training. 38. Marketing Research Section.
39. Training Section. 40. Salesmanship Training Course.
41. Correspondence Course. 42. Part-time course.
43. Local authorities. 44. Sales Target. 45. Sales Policy.
46. Sales Programme. 47. Sales methods.
48. Sales forces and resources.

সমস্ত আধুনিক কারবারেই এর উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এটি কারবারের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং কারবারের ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।

১. বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ হল বিক্রয়লক্ষ্যের একটি আধুনিক হিসাব[49] প্রস্তুত করা। বিক্রয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সেলস্ ম্যানেজারের উপর এর ভার ন্যস্ত থাকে। এটি প্রণয়নের পর বিক্রয়ের নীতি ও কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয় এবং ঐগুলি কার্যকর করার জন্য বিক্রয় কর্মচারীদের বিভিন্ন অঞ্চলে[50] ও বিভিন্ন শ্রেণীর খরিদ্দারগণের কাছে বিক্রয়ের ভার দিয়ে তাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট বিক্রয়ের পরিমাণ বা 'কোটা' স্থির করে দেওয়া হয়। সমগ্র বিক্রয়-কার্যক্রমটি যাতে সর্বনিম্ন ব্যয়ে সম্পন্ন হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

২. অতঃপর সমগ্র বিক্রয়ের বন্দোবস্তের সাথে সংগতি রেখে প্রচার ও বিজ্ঞাপন অভিযান পরিকল্পনা প্রস্তুত ও কার্যকর করা হয়। এতে সহায়তা করার জন্য পণ্যের নমুনা প্রস্তুত করা, পণ্যতালিকা প্রণয়ন করা, বিভিন্ন মেলায় ও প্রদর্শনীতে পণ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রভৃতি করা হয়।

৩. এর পর নির্দিষ্টকাল পর পর বিক্রয় কর্মচারীদের কাছ থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ, বাজার গবেষণা ও অনুসন্ধান পরিচালনা, বিক্রয় কর্মচারীদের সভা ও সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ঐ সব রিপোর্ট ও সভা-সম্মেলনে আলোচনার মাধ্যমে কি কি সমস্যা দেখা দিচ্ছে, ক্রেতারা কিভাবে পণ্যটিকে গ্রহণ করছে, কিরূপ পরিমাণে পণ্যটি বিক্রয় হচ্ছে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের সম্ভাবনা কতটা রয়েছে, ইত্যাদির আলোচনা হয়। এর দ্বারা সমস্যা ও ত্রুটিগুলি দূর করার চেষ্টা, বিক্রয়লক্ষ্য, নীতি ও কার্যক্রমের এবং বিক্রয় পদ্ধতির ও ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংশোধন ইত্যাদি করা হয়। সুদক্ষ বিক্রয় কর্মচারীরা যারা নিজ নিজ বিক্রয়লক্ষ্য পূরণ অথবা অতিক্রম করেছে, তাদের উৎসাহদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়, যারা বিক্রয়ে পশ্চাৎপদ সেই তাদের পরিবর্তন ও প্রয়োজন হলে অল্পসময়ের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। এইরূপে বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

49. Sales estimate. 50. Territory.

২৩

পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজার
COMMODITY MARKETS

বাজারের সংজ্ঞা[1] : কারবারী জগতে বাজার বলতে যে কোন পণ্যের সম্ভাব্য ক্রেতা ও বিক্রেতার অবস্থিতিকেই বোঝায়। আধুনিক বাজার শুধু ক্রয় ও বিক্রয়ের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে। পণ্যের উপস্থিতি, ক্রেতা ও বিক্রেতার সাক্ষাৎ ইত্যাদি কোন কিছুই আর প্রয়োজন হয় না। এজন্য ভারতের কুটির শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে ব্রেজিলের অধিবাসীরা সম্মত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেজিলে ভারতের কুটির শিল্পের বাজার সৃষ্টি হয়ে যায়। এইরূপে কারবারী বাজার দেশ-কাল অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিণত হয়েছে।

পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজার[2] কাকে বলে : নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত এবং নির্দিষ্ট সংস্থা কর্তৃক সংগঠিত ও পরিচালিত যে বাজারে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় চলে তাকে পণ্যের সংগঠিত বাজার[3] বলে। এই সব বাজারে শুধু পাইকারী ক্রয়-বিক্রয় চললেও তা নিছক পাইকারী বাজার[5] নয়। এই সব বাজারে প্রধানত কৃষিজাত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য[4] যথা, ধান, গম, পাট, কফি, চা ইত্যাদি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হলেও, পাটজাত দ্রব্যাদি, সুতা, লাক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের শিল্পজাত অর্ধোৎপাদিত[6] পণ্যের এবং স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির মূল্যবান ধাতুপিণ্ডের[7] ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। এই বাজার দু'রকমের হয় : (১) কতকগুলি বাজারে বিভিন্ন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়। এদের সাধারণ বাজার[8] বলে। (২) কতকগুলি বাজারে শুধু একজাতীয় পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় চলে। এদের বিশিষ্ট বাজার[9] বলে। যেমন, কলকাতার পাট ও চায়ের বাজার, বোম্বাইয়ের তুলার বাজার ইত্যাদি।

এই বাজারে লেনদেনের প্রকৃতি : সাধারণত পণ্যের সংগঠিত বাজারে ভবিষ্যতে সরবরাহের[10] ও মূল্য প্রদানের শর্তে আগাম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি[11] সম্পাদিত হলেও এখানে সঙ্গে সঙ্গে পণ্য সরবরাহ[12] ও মূল্য প্রদানের চুক্তিতে নগদ ক্রয়-বিক্রয়[13]ও চলে।

পণ্যের এই জাতীয় সংগঠিত পাইকারী বাজারসংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারী দেশে, তার ব্যবহারকারী দেশে, উৎপাদন ও ব্যবহারকারী দেশে, অথবা তার পুনঃরপ্তানি দেশে স্থাপিত হতে পারে। লণ্ডনের চা এবং ডাণ্ডির পাটের বাজার পুনঃরপ্তানি দেশে অবস্থিত পণ্যের সংগঠিত বাজারের দৃষ্টান্ত।

ভারতে এরকম শতাধিক বাজার বর্তমান, এবং অধিকাংশই পাঞ্জাবে অবস্থিত। উত্তর প্রদেশে এইরূপ ৩৯টি বাজার আছে। এছাড়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যে এই জাতীয় বাজার আছে। যুক্তরাজ্যে এইরূপ ৬টি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭টি বৃহৎ বাজার আছে।

---

1. Definition of market. 2. Commodity Market.
3. Organised market. 4. Agricultural commodities.
5. Produce Exchange or Commodity Market.
6. Semi-manufactured. 7. Bullion. 8. General Market.
9. Specialised Market. 10. Forward Delivery.
11. Forward Contract. 12. Ready delivery. 13. Spot dealings.

পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজারের সংগঠন

সাধারণত পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজারগুলি কোম্পানী হিসাবে গঠিত হয়। একটি পরিচালকমণ্ডলীর উপর তার পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে। বেচাকেনার শৃঙ্খলা স্থাপন ও সহায়তা করার জন্য পরিচালকমণ্ডলী কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিধিনিয়ম রচনা করে। সে অনুসারে এই সংস্থার যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালিত হয়। একটি নির্দিষ্ট স্থানে তার কার্যালয় স্থাপিত হয় এবং বেচাকেনার সম্পাদনের জন্য একটি খুব বড় হলঘর থাকে। সেখানে নিয়মিতভাবে তার সভ্যরা বেচাকেনা করে। সভ্যরা ছাড়া আর কেউ সেখানে যেতে অথবা বেচাকেনায় অংশ নিতে পারে না। তবে এসম্পর্কে সর্বত্র কঠোরতা অবলম্বন করা হয় না।

এর সভ্যদের ক্রেতা, বিক্রেতা এবং দালাল[14] এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

এই বাজারে পণ্য অথবা নমুনা দেখিয়ে সাধারণত বেচাকেনা করা হয় না। তবে কোথাও কোথাও যে নমুনা একেবারেই দেখানো হয় না, তা নয়। এজন্য বিক্রয়যোগ্য হতে হলে, পণ্যটি নির্ধারিত মান অনুযায়ী উৎপাদিত[15] এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ বা বর্গীকৃত[16] হওয়া দরকার। সাধারণত পণ্যের সুপরিচিত বিশেষ শ্রেণী বা বর্গ[17] অনুযায়ী বেচাকেনা চলে। সুতরাং এই জাতীয় বাজারে বেচাকেনার জন্য পণ্যের এই গুণাবলী থাকা দরকার: (১) পণ্যের ব্যাপক চাহিদা[18], (২) নির্দিষ্ট মান-বিশিষ্ট উৎপাদন[19], (৩) পণ্য শ্রেণীবদ্ধ বা বর্গীকরণ[20] (৪) নমুনা প্রস্তুতকরণ[21] এবং (৫) পণ্যের স্থায়িত্ব[22]।

এই বাজারে সমস্ত বেচাকেনা দালালদের মারফত ঘটে (এমনকি ক্রেতা ও বিক্রেতার উপস্থিতি সত্ত্বেও)। স্বভাবতই চুক্তিগুলি দালালের চুক্তি[23] হয় এবং তাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম উল্লেখ করতে হয়।

নগদ কারবারের[24] ব্যবস্থা থাকলেও এই বাজারের অধিকাংশ আগাম কারবার[25] চলে। প্রায় সব বেচাকেনাই আগাম চুক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় ও নির্দিষ্ট সময় শেষে পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিশোধ করা হয়। আগাম চুক্তির আধিক্যের জন্য এই জাতীয় প্রত্যেক বাজারেই একটি করে নিকাশ-ঘর[26] থাকে। সেখানে এই চুক্তিগুলির নিষ্পত্তি[27] করা হয়। আগাম চুক্তিগুলিতে ক্রেতাকে জামিন বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে হয়। তাকে জামিনের টাকা[28] বলে।

বেচাকেনার চুক্তিতে পণ্যের গুণাগুণ, পর্যায়, সরবরাহের সময়, দর ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়।

এই জাতীয় বাজারে সভ্যদের সুবিধার জন্য পাঠাগার ও পাঠঘর[29] প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। সভ্যদের অবগতির জন্য কারবার সংক্রান্ত নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে ইস্তাহার[30] প্রকাশ করা হয়। তা ছাড়া সভ্যদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি সালিসী কমিটির[31] ব্যবস্থাও থাকে।

পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজারের গুরুত্ব: (১) এই বাজারে সদাসর্বদাই উৎপাদকরা পণ্য বিক্রয়ের, ক্রেতারা ক্রয়ের এবং ঋণদাতারা বেচাকেনায় ঋণদানের সুযোগ পায়[32]। তাতে বেচাকেনা ও লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। (২) এই বাজারে চালানি কারবারের দ্বারা[33] কেনা-বেচা হয় বলে বিবিধ

---

14. Brokers. 15. Standardised. 16. Graded. 17. Grade.
18. Wide demand. 19. Standardisation. 20. Grading.
21. Sampling. 22. Durability. 23. Broker's Contract.
24. Spot dealings. 25. Dealings in future. 26. Clearing house.
27. Settlement. 28. Margin money.
29. Library and reading room. 30. Bulletin. 31. Arbitration.
32. Continuity of market. 33. Arbitrage.

পণ্যের স্থানগত মূল্যপার্থক্য ও আত্মরক্ষার্থ চুক্তি দ্বারা[34] কালগত মূল্যপার্থক্য এবং তার ওঠানামা দূর হয়ে দামের স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে এক বাজারে আগাম কেনা ও অন্য আরেকটি বাজারে আগাম বিক্রি[35] এতে বিশেষ সহায়তা করে। (৩) আত্মরক্ষার্থে চুক্তি দ্বারা দামের ভবিষ্যতে পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি দূর করা যায় বলে এই বাজার ভবিষ্যৎ ঝুঁকির নিরাপত্তা[36] প্রদান করে। (৪) প্রকৃত উৎপাদনকারীদের বিক্রয় সম্পর্কিত যাবতীয় ঝুঁকি এর মারফত এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীর অর্থাৎ ফট্‌কা কারবারীদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। তারা নিজেরা বাজারের পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তা বহন করে প্রকৃত উৎপাদনকারীদের রক্ষা করে। (৫) আগাম চুক্তির দ্বারা লাভজনক দরে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সময়ে, প্রয়োজনীয় পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় ও সরবরাহের নিশ্চয়তা লাভ করা যায় বলে, যন্ত্রশিল্পজাত বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদনকারীরা (চটকল মালিক, বস্ত্রকল মালিক ইত্যাদি) উৎপাদন আরম্ভ করার অনেক আগে ফরমাশ নিতে পারে। এবং একের পর এক ফরমাশমত পণ্য উৎপাদন করে ধারাবাহিকভাবে কারখানা চালু রাখতে পারে। এইরূপে পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজার উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ও লাভজনকভাবে উৎপাদন করতে দেশের যন্ত্রশিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য করে। (৬) পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজারগুলি কৃষিজাত ফসলের উৎপাদকদের সদাসর্বদা চড়া দামে পণ্যবিক্রয়ের সুবিধা দেয়, মূল্যের স্থিরতা এনে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয় এবং ভবিষ্যতে কোন্ পণ্যের উৎপাদন কতটা পরিমাণে কমবেশী করা লাভজনক, তার ইঙ্গিত দেয়। (৭) পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজার প্রবর্তনের ফলে দ্রব্যের উৎপাদন, মান নির্ধারণ, পর্যায়করণ প্রভৃতি প্রচলিত হয়। (৮) দেশের কৃষি এবং যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদকদের, পণ্যবিক্রয়ের সুনিশ্চয়তা ও তৎসংক্রান্ত ঝুঁকি কমিয়ে, বিবিধ পণ্যের নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন সরবরাহ বৃদ্ধি, পণ্যের বণ্টনে উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও ভোগকারীদের ভোগবৃদ্ধি দ্বারা জাতীয় অর্থনীতির পুষ্টি সাধন ও জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধিতে সবিশেষ সহায়তা করে।

ফট্‌কা বাজার বা আগাম লেনদেনের বাজার (FUTURES MARKET)

যে বাজারে ভবিষ্যতে পণ্যসরবরাহ ও মূল্য প্রদানের শর্তে বর্তমানে বেচা-কেনার চুক্তি হয় তাকে ফট্‌কা বাজার বা আগাম লেনদেনের বাজার[37] বলে। এই বাজারে কখনও চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য প্রদান ও পণ্য সরবরাহ করা হয় না।

সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ সংখ্যক সভ্য নিয়ে এই জাতীয় বাজার গঠিত হয় এবং যে সব কারণ থাকলে পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজার গঠিত হয়, এই বাজারগুলিও সে সব কারণ বর্তমান থাকলে স্থাপিত হয়ে থাকে।

ফট্‌কা বাজারগুলি সাধারণত প্রাথমিক উৎপন্নের[38] বেচা-কেনার জন্য গঠিত হলেও যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের বেচা-কেনা (যথা, চট ও অন্যান্য পাটজাত দ্রব্যসমূহ) যে এখানে হয় না, তা নয়। সাধারণ পণ্যের সংগঠিত প্রধান প্রধান পাইকারী বাজারগুলির[39] সাথে সংশ্লিষ্ট, অথচ পৃথকভাবে কার্যরত একটি করে ফট্‌কা বাজার থাকে।

ফট্‌কা বাজারের সব সদস্য একশ্রেণীর, তারা সকলেই দালাল। এই বাজারে কেউই নিজের জন্য বেচা-কেনা করে না, অর্থাৎ কেউ প্রকৃত ক্রেতা বা বিক্রেতা নয়। পণ্যের নির্দিষ্ট দু-একটি শ্রেণী[40] নিয়ে বেচা-কেনা চলে এবং একটি ন্যূনতম পরিমাণের নিচে বেচাকেনা হয় না। নির্দিষ্ট সময় শেষে সমস্ত বেচা-কেনার চুক্তির নিষ্পত্তি

---

34. Hedging. 35. Future's purchase and sale.
36. Insurance against future price fluctuations.
37. Futures Market. 38. Primary Goods. 39. Produce Exchange.
40. Grade.

করতে হয় এবং বৎসরের মধ্যে কয়েকবার এরূপ নিষ্পত্তির সময় নির্দিষ্ট থাকে। তখন চুক্তি অনুযায়ী লেনদেন মিটিয়ে দিতে হয়। কখনও কখনও তার জের টানতে[41] দেওয়া হয়। এই বাজারের আসল উদ্দেশ্য হল আত্মরক্ষার চুক্তির[42] সুযোগ দেওয়া। চুক্তিগুলি দু'রকম ভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে। প্রথমত, পণ্য সরবরাহ এবং মূল্য প্রদান দ্বারা। দ্বিতীয়ত, একপক্ষ কর্তৃক অপরপক্ষকে চুক্তি দর ও বাজার দরের পার্থক্য প্রদানের দ্বারা।

ফট্‌কা কাকে বলে (WHAT IS SPECULATION ?)

পরিকল্পনাহীন অর্থনীতিক ব্যবস্থায় ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হয় না। এজন্য সর্বদাই প্রকৃত চাহিদার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন হয় বেশি নয় কম হয়। যোগান ও চাহিদার তারতম্যের ফলে সর্বদাই মূল্যের ওঠানামা ঘটে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের পণ্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে মুনাফা উপার্জন করার জন্য একদল ব্যবসায়ী সর্বদাই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নিযুক্ত থাকে। এদের ফট্‌কা কারবারী এবং তাদের কাজটাকে ফট্‌কা কারবার বলে। এরা বর্তমান বাজারদরের তুলনায় ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দর সম্বন্ধে অনুমানের উপর ভিত্তি করে কারবার করে। বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে সম্ভাব্য দর বাড়বে মনে করলে এরা ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য বর্তমানে কেনে ও ভবিষ্যতে দর কমবে মনে করলে, ভবিষ্যতে কেনার জন্য বর্তমানে বিক্রয় করে। এইরূপে এরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই দুই পৃথক কালের বাজারের কালগত ব্যবধান অতিক্রম করে তাদের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করে।

অর্থনীতিক তাৎপর্য বা গুরুত্ব ঃ ফট্‌কা কারবার গভীর অর্থনীতিক তাৎপর্য গুরুত্ব সম্পন্ন এবং নানাভাবে সমাজের অর্থনীতিক কার্যকলাপের সহায়তা করে-- (১) ফট্‌কা কারবার বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে পণ্য বিশেষের যথোপযুক্ত বণ্টনের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করে। যে পণ্যটির বর্তমান উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশী হয়েছে এবং সেজন্য তার বর্তমান দর অত্যন্ত পড়ে গেছে ফট্‌কা কারবারীরা তৎক্ষণাৎ তা কিনে নিয়ে ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য মজুদ করে। ফলে বর্তমানের অতিরিক্ত যোগান ভবিষ্যতের বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। তা যদি না হত তাহলে বর্তমান বাজারে অত্যন্ত কম দামের দরুন, পণ্যটির বর্তমান বিক্রয় ও ভোগ অত্যন্ত বেড়ে গিয়ে সমগ্র যোগান নিঃশেষিত হয়ে যেত এবং ভবিষ্যতে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ত। তা ছাড়া কম দামে বিক্রি করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে উৎপাদনকারীরাও ভবিষ্যতে তাদের উৎপাদন কমিয়ে দিত। ফলে ভবিষ্যতে পণ্যটির সরবরাহ অত্যন্ত কমে গিয়ে ক্রেতাদের অসুবিধা হত কিন্তু ফট্‌কা কারবারের দরুন তা হতে পারে না। তার কাজের ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের যথাযথ বণ্টন ঘটে। (২) ফট্‌কা কারবারী বর্তমানের অতিরিক্ত যোগান থেকে আংশিকভাবে ভবিষ্যতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য মজুদ করে বলে বর্তমান বাজারে পণ্যটির বিক্রয়যোগ্য সরবরাহ কমে যাওয়ায়, তার দাম বেশি কমতে পারে না। তেমনি বর্তমান মজুদ থেকে ভবিষ্যতের বাজারে পণ্য বিক্রয় হওয়ায় ভবিষ্যতের পণ্য যোগান বাড়ে বলে তখন দাম বেশি বাড়তে পারেও না। এইভাবে ফট্‌কা কারবারের দরুন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাজারে পণ্যমূল্যের সমতা ও স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩) ফট্‌কা কারবারের সাহায্যে যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনকারীরা দুইভাবে উপকৃত হয়। একদিকে তারা কাঁচামাল কেনার আগাম চুক্তি[43] করে সুবিধাজনক দরে কাঁচামালের প্রয়োজনীয় যোগান সুনিশ্চিত করে। তাতে তাদের কাঁচামালের দরুন উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির আশঙ্কা দূর হয়। অন্যদিকে পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পণ্যের আগাম ফরমাশ পাওয়ায়, তারা পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চয়তা লাভ করে।

41. Carried over. 42. Hedging. 43. Forward Contract.

(৪) স্টকমার্কেট বা-শেয়ার বাজারে যে ফট্‌কা বেচাকেনায় দর থাকে তার দ্বারা বিনিয়োগ ইচ্ছুক ব্যক্তিরা প্রভাবিত হয়। ঐ দর দেখে তারা কোন্‌ শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করবে তা স্থির করে। এইভাবে শেয়ার বাজারের ফট্‌কা কারবার সঠিক দিকে পুঁজির গতিনির্দেশ করে। (৫) কৃষিজাত পণ্যসামগ্রীর পাইকারী বাজারের যে ফট্‌কা দর থাকে তা দেখে কৃষিজাত পণ্যোৎপাদনকারীরা তাদের ভবিষ্যৎ উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে। এইভাবে কৃষিজাত পণ্যের ফট্‌কা কারবার কৃষকদের লাভজনক উৎপাদনের পথ নির্দেশ করে।

সমালোচনা: সাম্প্রতিকালে ফট্‌কা কারবার ও কারবারীদের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা অত্যন্ত মুখর হয়ে উঠেছে। বিরুদ্ধবাদীদের মতে, মধ্যস্থ কারবারী হিসাবে ফট্‌কা কারবারীদের অবস্থিতির দরুন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, অহেতুক সরবরাহ ও যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি এবং তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পণ্য ও সিকিউরিটি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি ও তাতে সমাজের ক্ষতি হয়। এজন্য তারা এদের সমাজের পরগাছা বলে মনে করে।

এই সমালোচনা অনভিজ্ঞ এবং স্বার্থান্বেষী ফট্‌কা কারবারীদের সম্পর্কেই সম্পূর্ণত প্রযোজ্য। কারণ, তারা সরবরাহ, চাহিদা ও বাজারের অবস্থা সম্পর্কে হয় যথাযথ সংবাদ রাখে না, নয়ত ঐগুলির ইচ্ছাপূর্বক বিকৃতি সাধন করে থাকে। তাদের ফট্‌কা কারবার বিকৃত ও ধ্বংসমূলক ফট্‌কা কারবার[44] এবং তা সমাজে নানা প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু ফট্‌কা কারবারীদের সমর্থকদের মতে, প্রকৃত গঠনমূলক ফট্‌কা কারবারের[45] কারবারীরা পণ্যের উৎপাদন, যোগান, চাহিদা, মূল্য ও বাজার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়ায়, ফট্‌কা কারবারের প্রকৃত অর্থনীতিক সুবিধাগুলি ভোগ করতে সাহায্য করে। সেজন্য তাদের কাজ সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং সে কারণে তাদের মুনাফা অর্জনের অধিকার রয়েছে।

বৈধ এবং অবৈধ ফট্‌কা বা জুয়াখেলা*

বাজার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচক্ষণ অনুমানের উপর নির্ভর করে, মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্য দ্রব্যের যে সব বেচা-কেনায় অংশ গ্রহণ করে, তাই হল বৈধ ফট্‌কা। তা বিভিন্ন ভাবে সমাজের উপকার করে।

আর, বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরা ভবিষ্যৎ মুনাফার অন্ধলালসায় যে সব বেচা-কেনা করে, তাকে অবৈধ ফট্‌কা বলে। অনেক সময়, এরা শুধু ভবিষ্যতে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির উপর বাজী ধরে এবং পণ্যের প্রকৃত বেচা-কেনার দিকে তাদের লক্ষ্য থাকে না। এটা প্রকৃতপক্ষে জুয়াখেলা[46] ছাড়া আর কিছুই নয়। এও অবৈধ ফট্‌কার অন্যতম রূপবিশেষ। এদের কার্যকলাপের দ্বারা অহেতুক পণ্য যোগান ও চাহিদার বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং সেজন্য দামের স্থিরতার পরিবর্তে অস্বাভাবিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় ফট্‌কা সমাজবিরোধী কাজ।

ফট্‌কা কার্যকলাপ (SPECULATIVE DEALINGS)

১. **পণ্যচালানী কারবার**[47] **:** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কম দরের বাজার থেকে কিনে বেশি দরের বাজারে বিক্রির জন্য পণ্য চালান দেওয়ার কাজকে পণ্যচালানী কারবার বলে। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাজারগুলির দামের পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে এই কারবার চলে। অর্থাৎ স্থানগত মূল্য পার্থক্যের ফলে পণ্যচালানী কারবারের উদ্ভব হয়।

২. **আত্মরক্ষার্থ ফট্‌কা**[48] **:** ফট্‌কা বাজারে পণ্য বেচাকেনায় কোন আগাম চুক্তি সম্পাদনের সময় তার দরুন সম্ভাব্য ক্ষতি[49] এড়ানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে একটি

---

44. Destructive speculation. 45. Constructive speculation.
*Legitimate and illegitimate speculation or gambling.
46. Gambling. 47. Arbitrage. 48. Hedging. 49. Possible loss.

চুক্তি করা হয়। অর্থাৎ প্রথমটি পণ্যকেনার চুক্তি হলে, [illegible] এবং প্রথমটি পণ্য বিক্রির চুক্তি হলে, দ্বিতীয়টি পণ্যকেনার চুক্তি হয়ে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চুক্তিটিকে আত্মরক্ষার্থ ফট্‌কা চুক্তি বলে। এসম্পর্কে উল্লেখনীয় যে, প্রথম চুক্তিটি সাধারণত প্রকৃত কেনার কিংবা বিক্রির চুক্তি হলেও দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য তা নয়। প্রথম চুক্তির লক্ষ্য মূল্য প্রদান এবং দ্রব্য হস্তান্তর। কিন্তু দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা শুধু চুক্তি-দর ও বাজার দরের পার্থক্যটুকুর[50] লেনদেন ঘটে। এই ধরনের চুক্তির সময় একই দরে পরস্পর বিপরীত দুটি চুক্তি করা হয়। যে দরে পাট কেনার চুক্তি হল, সেই দরেই আবার পাট বিক্রিরও আর একটি চুক্তি করা হয়। ফলে প্রথম চুক্তির দরুন ক্ষতি হলে, তা দ্বিতীয় চুক্তির লাভের দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। আর একটি কথা, সব আত্মরক্ষার্থ ফট্‌কাই আগাম কারবার[51] কিন্তু সব আগাম কারবার আত্মরক্ষার্থ ফট্‌কা নয়।

৩. **নগদ ক্রয়-বিক্রয়[52] :** যে সব বেচাকেনার চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্পন্ন হয়, সেগুলিকে নগদ ক্রয়বিক্রয় বলে। এ ক্ষেত্রে ক্রয় ও বিক্রয় চুক্তির সাথে সাথেই দাম পরিশোধ ও পণ্য সরবরাহ নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। সে সব ক্ষেত্রে বিক্রেতার কাছে পণ্যটি মজুত রয়েছে অথবা অবিলম্বে তা বিক্রেতার হাতে আসার সম্ভাবনা আছে, এবং দাম মিটিয়ে দেওয়ার সংগতি ক্রেতার আছে কিংবা তার উপযুক্ত আর্থিক সংগতির সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে নগদ ক্রয়-বিক্রয় চলে।

৪. **আগাম ক্রয়-বিক্রয়[53] :** ভবিষ্যতে পণ্যটি পাওয়ার জন্য[54] বর্তমানে কেনার চুক্তি অথবা ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহের জন্য[55] বর্তমানে বিক্রির চুক্তিকে আগাম ক্রয়-বিক্রয় বলে। এই সব ক্ষেত্রে চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সব নগদে দাম দেওয়া ও পণ্য সরবরাহ করে চুক্তি নিষ্পন্ন হয় না। বেচাকেনার চুক্তিটি বর্তমানে সম্পাদিত ও ভবিষ্যতে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। কারণ চুক্তি সম্পাদনের সময় হয়তো পণ্যের অস্তিত্ব এবং ক্রেতার সম্পূর্ণ দাম দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং বলা যায় যে, আগাম ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হল বর্তমানে অস্তিত্বহীন পণ্যের বিক্রেতার সাথে বর্তমানে সব সঙ্গতিহীন ক্রেতার চুক্তি। এইসব চুক্তি ভবিষ্যতে দু'রকম ভাবে নিষ্পন্ন হতে পারে। প্রথমত উপরের বর্ণনা মত, ভবিষ্যতে ক্রেতা দাম দিয়ে এবং বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করে তা নিষ্পন্ন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে চুক্তিবদ্ধ দর ও সেইসময়ের বাজার দরের পার্থক্যটুকু একপক্ষ অপর পক্ষকে প্রদানের দ্বারা[56] তা নিষ্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, সাধারণত কৃষি-জাত পণ্যের সংগঠিত বাজার[57] এবং নির্ধারিত মান অনুযায়ী উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের[58] ক্ষেত্রেই আগাম ক্রয়-বিক্রয় চলে। আগাম ক্রয়-বিক্রয়ের সাহায্যে যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদকগণ কাঁচামালের দরের ওঠানামার ঝুঁকি থেকে রেহাই পায়।

বিভিন্ন প্রকারের ফট্‌কা কারবারী (TYPES OF SPECULATORS)

'বুল বা তেজীওয়ালা[59] : ভবিষ্যতে দাম বাড়বে অনুমান করে, ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রির দ্বারা মুনাফা অর্জনের জন্য যে ফট্‌কা কারবারী বর্তমানে কেনে অথবা কেনার চুক্তি করে তাকে তেজীওয়ালা বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব কারবারীদের কাছে পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে গোপনে মজুদ থাকে। ঐগুলি চড়া দামে বিক্রির জন্য তারা বাজার দর বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ঐ পণ্য (দ্রব্যসামগ্রী ও শেয়ার প্রভৃতি) আরও কেনার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে থাকে। ফলে বাজারে সাড়া পড়ে যায় এবং ধীরে ধীরে দর বাড়তে থাকে। অবশেষে দর পছন্দমত চড়লে তারা দ্রব্যগুলি বিক্রি করে দিয়ে প্রচুর

---

50. Price differences. 51. Futures. 52. Spot dealings.
53. Dealings in future. 54. For taking of delivery.
55. For giving delivery. 56. 'by payment of price differences'.
57. Organised markets. 58. Standardised goods. 59. Bull.

পরেজনাকে মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং তেজীওয়ালাদের কাজের (অর্থাৎ ক্রয়ের) ফলে দাম বাড়ে। এই জাতীয় কারবার শেয়ার বাজারেই বেশি দেখা গেলেও পণ্যের সংগঠিত বাজারেও বিরল নয়।

'বিয়ার' বা মন্দীওয়ালা[60] **:** তেজীওয়ালাদের বিপরীত কারবারীদের মন্দীওয়ালা বলে। এরা ভবিষ্যতে দাম কমবে অনুমান করে, ভবিষ্যতে অল্প দামে কিনে মুনাফা অর্জনের জন্য বর্তমানে বিক্রি অথবা বিক্রির চুক্তি করে। ধরা যাক, শেয়ার বাজারে কোন বিশেষ শ্রেণীর শেয়ারের দর দুই মাস পরে কমে ৫ টাকা হবে অনুমান করে কোন ফট্‌কা কারবারী তার বর্তমান দর ৮ টাকায় বিক্রির জন্য ২ মাসের আগাম চুক্তি করল। দুই মাস পরে দর যদি সত্যই তার অনুমান মত কমে ৫ টাকা হয়, তখন সে সহজেই বাজার থেকে ঐ দরে শেয়ারগুলি নগদ কিনে চুক্তিবদ্ধ দর ৮ টাকার বিক্রি করে শেয়ার প্রতি ৩ টাকা মুনাফা অর্জন করবে।

'স্ট্যাগ' বা অধিকমূল্য শিকারী[61] **:** নতুন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর শেয়ারের ভবিষ্যৎ দাম তার বিলিকৃত মূল্য অপেক্ষা[62] বেশী হবে অনুমান করে ভবিষ্যতে তা চড়া দামে বিক্রি ক'রে মুনাফা অর্জনের জন্য যে সব ফটকা কারবারী তা কেনার জন্য আবেদন করে তাদের অধিমূল্য শিকারী বলে।

'লেম ডাক' বা খেলাপী মন্দীওয়ালা[63] **:** ভবিষ্যতে বাজার থেকে স্বল্পতর মূল্যে খরিদ করে যোগান দেবে আশা করে বিক্রয়ের আগাম চুক্তিবদ্ধ মন্দীওয়ালা যখন নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে বাজারে পণ্যটির কোন বিক্রেতা না থাকায় তা সংগ্রহ করে বিক্রয় চুক্তি পালন করতে অসমর্থ হয় এবং ক্রেতার সাথেও এসম্পর্কে কোন আপসরফায় উপনীত হতে পারে না তাকে খেলাপী মন্দীওয়ালা বলে।

পণ্যের কয়েকটি সংগঠিত পাইকারী বাজার (SOME COMMODITY MARKETS)

১ **কলকাতার চায়ের বাজার**[64] **:** কলকাতার চায়ের বাজার ভারতে পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান। মিশন রো-তে অবস্থিত টি ব্রোকারস এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত একটি ঘরে চায়ের পাইকারী নিলাম করা হয়। প্রতি সোমবারে রপ্তানির[65] জন্য এবং প্রতি মঙ্গলবারে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের[66] জন্য নিলাম হয়ে থাকে।

আসাম ও দার্জিলিং থেকে নদী ও রেলপথে খিদিরপুরে চায়ের চালান আসে। চায়ের চালান খিদিরপুর বন্দরে এলে পোর্ট কমিশনারের অধীনে একটি গুদামে প্রথমে তা রাখা হয়। তাকে 'টি ট্রানসিট শেড'[67] বলে। রামাবলরী কোম্পানী এর রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত। দালালরা সেখানে গিয়ে চায়ের আস্বাদ নিয়ে তা বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করে এবং সেগুলির দার্জিলিং, বি ও পি ও পি ইত্যাদি নামকরণ ও নমুনা এবং তালিকা প্রস্তুত করে নিলামের তারিখসহ চায়ের রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ীদের কাছে পাঠায়। নিলামের দিন যারা সর্বোচ্চ দর দিতে রাজী হয় তাদের নিকট ঐগুলি বিক্রি করা হয়। এক একটি লটে[68] চায়ের পেটিগুলি বিক্রয় হয় এবং লটের সর্বনিম্ন পেটির যে সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে তার কমে বিক্রয় হয় না।

চায়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকলে নিলাম বিক্রয়ের ছয়দিনের মধ্যে তা জানাতে হয় এবং ১০ দিনের মধ্যে দাম পরিশোধ করতে হয়। অন্যথায় ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ঐ ১০ দিনের সময়কে 'প্রম্পট ডে'[69] বলে

60 Bear. 61. Stag 62 Issue price 63. Lame Duck
64 The Calcutta Tea Market. 65 Export auction
66 Internal sales 67 Tea Transit Shed 68 'in lots'
69 'Prompt day'.

এই ১০ দিন পর্যন্ত বিক্রীত চা, বিক্রেতার দায়িত্বে তার গুদামে সংরক্ষিত থাকে। এই সময় পার হয়ে গেলে আর ঐ চা সম্পর্কে বিক্রেতার কোন দায়িত্ব থাকে না।

দালালরা যথাসময়ে ক্রেতার কাছ থেকে দাম আদায় করে নিজেদের দস্তুরি কেটে নিয়ে বাদ বাকি টাকা বিক্রেতাকে পাঠায়।

কলকাতার মতো কেরালা রাজ্যের কোচীন বন্দরেও একটি চায়ের বাজার স্থাপিত হয়েছে।

জে. টমাস এ্যান্ড কোং, এ. ডি. ফিগিস এ্যান্ড কোং, ক্যারিট মোরান এ্যান্ড কোং, ডবলিউ এস ক্রেসওয়েল এ্যান্ড কোং, টি ব্রোকারস লিঃ (ইন্ডিয়া), সুধীর চ্যাটার্জি লিঃ প্রভৃতি কলকাতার চায়ের দালালদের মধ্যে প্রধান।

২. লন্ডনের চায়ের বাজার[70] : মিন্সিং লেন-এ অবস্থিত লন্ডনের চায়ের পাইকারী বাজার পৃথিবীতে বৃহত্তম। ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকে এখানে চা আমদানি হয়। চায়ের চালান লন্ডনে উপস্থিত হলে তা গুদামজাত করে, আমদানিকারীরা চায়ের দালালদের সংবাদ দেয়। দালালরা এসে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চায়ের আস্বাদ পরীক্ষা করিয়ে তার পর্যায়করণ, নমুনা প্রস্তুতকরণ, নামকরণ প্রভৃতি সম্পাদনের পর চায়ের তালিকা প্রস্তুত করিয়ে নিলামের তারিখসহ রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ীদের কাছে পাঠায়।

নির্দিষ্ট তারিখমত চায়ের নিলামে রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ীরা উপস্থিত হয় এবং সর্বোচ্চ দর ডেকে তাদের কাছে লটে চা বিক্রি করা হয়। লটের সর্বনিম্ন পেটির সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। যে কোন বাইরের ক্রেতাও এই নিলাম থেকে চা কিনতে পারে, তবে তাকে নিম্নতম নির্দিষ্ট পরিমাণ মত কিনতে হয়। এই বাজারে এক এক দেশের চা সপ্তাহের এক একটি নির্দিষ্ট দিনে নিলাম করা হয়। ভারতীয় চা সোমবার ও বুধবার সিংহলের চা মঙ্গলবার এবং কখনও কখনও বৃহস্পতিবার, ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অন্যান্য দেশের চা বৃহস্পতিবারে বিক্রয় হয়। নিলামের হাতুড়ির শেষ ঘা পড়ার সংগে সংগে বিক্রয়কারী দালাল একটি চিঠাতে[71] চায়ের বিবরণ ও ক্রেতার নাম লিখে ঐ চায়ের মালিকের কাছে পাঠায়। একে চুক্তি চিঠা[72] বলে। বিক্রয়কারী দালাল, ক্রয়কারী দালালের কাছে আর একটি চিঠাতে বিক্রীত চায়ের পরিমাণে, দর ইত্যাদি লিখে পাঠায়। একে ওজন চিঠা[73] বলে। বিক্রয় চুক্তির সংগে সংগে ক্রেতাকে হন্দর প্রতি ১ পাউন্ড হারে টাকা অগ্রিম জমা দিতে হয় এবং বাকী টাকা ৪ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। অর্থাৎ লন্ডন চায়ের বাজারের 'প্রম্প্ট্ ডে'[74] হল ৪ মাস। এই সময়ের মধ্যে চা না নিলে তার গুদাম ভাড়া ক্রেতাকে দিতে হয় এবং তার দেওয়া অগ্রিম টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের নিষ্পত্তির জন্য ফিলপট লেন-এ একটি কেন্দ্রীয় চা নিকাশ ঘর[75] আছে।

৩. বোম্বাইয়ের তুলার বাজার[76] : বোম্বাইয়ে, তুলার সংগঠিত পাইকারী বাজারে তুলা বিক্রয় হওয়ার আগে, প্রস্তুতি হিসাবে, কৃষকদের কাছ থেকে তুলা কিনে বীজ ছাড়িয়ে[77] নির্দিষ্ট ওজনে গাঁট বাঁধতে হয়। কাঁচা তুলার ফসল ওঠার আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকরা মহাজনদের কাছ থেকে দাদন[78] নিতে বাধ্য হয় বলে, তাদের কাছে স্বল্প-মূল্যে তুলা বিক্রি করে দেয়। যে ক্ষেত্রে তা হয় না, সেখানে তারা সরাসরি আড়তিয়া বা আড়তদারদের মারফত পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছে তুলা বিক্রি করে। আড়তদাররা সে জন্য দস্তুরি পায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার তুলার বীজ ছাড়ানোর কলের মালিকরা

---

70. The London Tea Market. 71. 'note'. 72. Contract note.
73. Weight note. 74. Prompt day.
75. Central Tea Clearing House.
76. The Bombay Cotton Market. 77. Ginning. 78. Advance.

সরাসরিভাবে চাষীদের সাথে তুলা কেনার আগাম চুক্তি[৭৯] সম্পাদন করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, পাইকারী ব্যবসায়ীরা তুলা কিনে বীজ ছাড়ানোর কলের মালিকদের সাহায্যে বীজ ছাড়িয়ে গাঁট বেঁধে নেয়। এই সব গাঁটের নির্দিষ্ট ওজন থাকে। এর পর ঐ তুলার পাইকারী বেচা-কেনা বোম্বাইয়ের তুলার সংগঠিত পাইকারী বাজার (যা ইস্ট ইণ্ডিয়া কটন এ্যাসোসিয়েশন লিঃ নামে পরিচিত) মারফত সম্পন্ন হয়।

১৯২১ সালে তুলার সংগঠিত পাইকারী বাজার হিসাবে কাজ করার জন্য বোম্বাইয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কটন এ্যাসোসিয়েশন লিঃ গঠিত হয়। এর সভ্যসংখ্যা ৭৬৫; বাইশ জন সভ্য নিয়ে এর পরিচালকমণ্ডলী গঠিত। এ ছাড়া, বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি সাব-কমিটি আছে।

এ্যাসোসিয়েশনের বাড়িতে, নির্দিষ্ট ঘরে তুলার বেচাকেনা চলে। এর সভ্যরা ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—১. অরিজিন্যাল মেম্বার; ২. নিউ মেম্বার; ৩. স্পেশাল অথরিটি মেম্বার; ৪. নিউ অথরিটি মেম্বার; ৫. অরিজিনাল অথরিটি মেম্বার এবং ৬. অনারারী মেম্বার। এদের মধ্যে ৩নং এবং ৫নং শ্রেণীর সভ্য ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর সভ্যরা, ক্রেতা অর্থাৎ মিলমালিক ও রপ্তানিকারী, বিক্রেতা অর্থাৎ আমদানিকারী, কমিশন এজেন্ট ও পাইকারী ব্যবসায়ী এবং দালাল, এই তিন ভাগে বিভক্ত।

এই বাজারে নগদ কারবার[৮০] ও আগাম কারবার[৮১], দুই-ই চলে। এখানে আগাম বেচাকেনাগুলির প্রায় সবই আত্মরক্ষার্থ ফট্‌কা বা হেজিং। আগাম চুক্তিগুলি চুক্তি দর ও বাজার দরের পার্থক্য প্রদান দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিগুলি পণ্য সরবরাহ ও মূল্য প্রদান দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ফেব্রুয়ারী, মে ও আগস্ট মাস হল তুলা সরবরাহের সময়। এবং মাসের ২৫ তারিখের মধ্যেই তা সরবরাহ করতে হয়।

এই বাজারে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি খুবই অদ্ভুত। বেচাকেনার ঘরে উপস্থিত বিক্রেতা সপ্তমে গলা চড়িয়ে আঙুল দিয়ে সংখ্যা নির্দেশ করে সামনের দিকে আঙুল হেলিয়ে 'লেও' 'লেও'[৮২] বলে চীৎকার করতে থাকে। অনুরূপভাবে ক্রেতারাও আঙুল দিয়ে ক্রয়ের পরিমাণ নির্দেশ করে পিছনের দিকে আঙুল হেলিয়ে "দেও" 'দেও'[৮৩] বলে চীৎকার করে থাকে। এই সমবেত কোলাহল সত্ত্বেও তারা পরস্পরের কথা ও ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝে নেয়। এইভাবে প্রথমে মৌখিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরের দিন ক্রেতা ও বিক্রেতা লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। জামিন হিসাবে প্রত্যেককেই নির্ধারিত পরিমাণ টাকা এ্যাসোসিয়েশনের কাছে জমা রাখতে হয়।

বেচাকেনার চুক্তিগুলি সরাসরি ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে বা তাদের দালালদের মারফত সম্পাদিত হয়।

দামের অত্যধিক ওঠানামা বন্ধ করার জন্য প্রত্যেক দিন নানা রকমের তুলার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দর এ্যাসোসিয়েশন বেঁধে দেয়।

এ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব নিয়ম ছাড়াও, সব লেনদেনই[৮৪] ১৯৪৭ সালের আগাম লেনদেন আইন[৮৫] দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

অন্যান্য সংগঠিত পাইকারী বাজার : উপরোক্ত বাজারগুলি ছাড়াও উত্তর (হাপুর ও কানপুর), তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে খাদ্য-শস্য, মশলা, চিনি, তৈলবীজ, তুলা প্রভৃতির বৃহৎ সংগঠিত পাইকারী বাজার আছে।

ভারতে সংগঠিত পাইকারী বাজারের নিয়ন্ত্রণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে ১৯৪৬ সালে আগাম কারবারের নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এসেনসিয়াল সাপ্লাইজ (টেমপোরারি পাওয়ারস) এ্যাক্ট পাশ হয়। ১৯৫২

79. Forward Contract.
80. Spot transactions.
81. Forward Contracts or Futures.
82. 'offer'.
83. 'accept'.
84. Future dealings.
85. Forward Dealings Act.

সালে কৃষি ও অকৃষিজাত নানা পণ্যের আগাম কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার ফরোয়ার্ড কন্ট্রাক্টস (রেগুলেশন) এ্যাক্ট পাশ করেন। ১৯৫৭ সালে তা সংশোধিত হয়। ১৯৫৩ সালে আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে একটি ফরোয়ার্ড মারকেটস কমিশন গঠিত হয়। বোম্বাইয়ে এর হেড অফিস অবস্থিত।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

১৭ পণ্যবণ্টন প্রণালী

1. What is a Multiple Shop? Discuss its advantages and disadvantages to consumers and manufacturers [C.U. 1963, 1970, 1974]
[বহু-শাখা বিপণি কাকে বলে? ভোগকারী ও উৎপাদনকারীদের কাছে তার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কি?] উঃ ৩১২-১৫ পৃঃ
2. A tendency is noticeable among many large manufacturing organisations to establish their own retail selling units. what are their advantages? [C.U. 1973]
[বহু উৎপাদনকারী সংস্থার নিজস্ব খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ কি?] উঃ ৩১২-১৫ পৃঃ
3. Of late the Departmental Stores are becoming popular in India What are the reasons and how such stores should be organised? [C U 1958, '60, '65]
[সম্প্রতি ভারতে বিভাগীয় বিপণিগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর কারণ কি এবং কিরূপভাবে এই প্রকার বিপণিগুলি সংগঠিত হওয়া উচিত উঃ ৩১৫-১৭ পৃঃ
4. Discuss the difference in the organisational structure of 'Chain Stores', 'Multiple Shop' and 'Departmental Stores' [C U 1966]
['বিপণিমালা', 'বহু শাখা বিপণি' এবং 'বিভাগীয় বিপণি'-এর সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।] উঃ ৩১২-১৯ পৃঃ
5. Explain the functions of Commission Agents, Sole Agents and Brokers Do you think they may be eliminated? Give reasons for your answer [C U 1968]
[কমিশন এজেন্ট, সোল এজেন্ট ও দালালগণের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। তুমি কি মনে কর যে এদের উচ্ছেদ করা যেতে পারে? তোমার উত্তরের যুক্তিগুলি দেখাও।]
উঃ ২৯৭-৯৯, ৩২৭-২৮ পৃঃ
6. What are the different types of business intermediaries functioning between producers and consumers? State their respective roles [C U Hons 1968]
[উৎপাদক ও ভোগকারিগণের মধ্যে কি কি বিভিন্ন প্রকারের মধ্যস্থ কারবারীরা কাজে নিযুক্ত রয়েছে? তাদের নিজ নিজ ভূমিকার পরিচয় দাও।]
উঃ ২৯৭-৯৯, ৩২৭-২৮ পৃঃ
7. Discuss the advantages and disadvantages of a Departmental Stores [C U 1969]
[বিভাগীয় বিপণির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।] উঃ ৩১৫-১৭ পৃঃ
8. What is meant by a Departmental Stores? Discuss its advantages and organisation [C U 1972]
[বিভাগীয় বিপণি কাকে বলে? এর সুবিধা ও সংগঠন আলোচনা কর।]
উঃ ৩১৫-১৭ পৃঃ
9. Explain the different methods of distribution of commodities in modern business. [C U 1971]
[আধুনিক কারবারে পণ্য বণ্টনের বিবিধ পদ্ধতিগুলি কি কি?]
উঃ ২৯৯-৩০১ পৃঃ

১৮ গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা

1. What is a Bonded Warehouse? Discuss its advantages [C.U. 1960]
['শুল্কাধীন গুদাম' কাকে বলে? ইহার সুবিধাগুলি আলোচনা কর।] উঃ ৩৩০ পৃঃ

2. Enumerate the functions of warehousing and discuss the present state of organisation of warehouses in India. [C.U. 1965]
[গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার কার্যাবলী উল্লেখ কর এবং ভারতে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার বর্তমান সাংগঠনিক পরিস্থিতি আলোচনা কর।] উঃ ৩২৯-৩২ পৃঃ

3. Discuss the organisation and functions of any Bonded warehouse. [C.U. 1973]
[যে কোনও শুল্কাধীন মালগুদামের সংগঠন ও কাজগুলি আলোচনা কর।] উঃ ৩৩০ পৃঃ

১৯ ব্যবসায়ে ব্যবহৃত শব্দাদি ও দলিলপত্র

1. Write short notes on :
(a) Excise Duty; (b) Del credre Agent; (c) Revenue Duty; (d) Ad valorem Duty; (e) Mate's Receipt; (f) Protective Export Duty; (g) Documentary Bills; (h) Bill of Lading.
[নিম্নোক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর : (ক) আবগারী বা অন্তঃশুল্ক; (খ) ঝুঁকিবাহক পণ্য প্রাপক; (গ) আয় শুল্ক; (ঘ) মূল্যানুসার শুল্ক; (ঙ) মেট রসিদ; (চ) সংরক্ষক রপ্তানি শুল্ক; (ছ) দলিলীহুণ্ডি; (জ) বহনপত্র বা চালানি রসিদ।] উঃ ৩৩০-৪২ পৃঃ

২০ বৈদেশিক ব্যবসায়

1. Describe the functions of the State Trading Corporation (S.T.C.). [B.U. 1963]
[রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের কার্যাবলী আলোচনা কর।] উঃ ৩৬০-৬১ পৃঃ

2. Outline the procedure to be observed for exporting goods and securing payment from abroad by an Indian exporter. [B.U. 1965]
[পণ্য রপ্তানি এবং দাম আদায়ের জন্য ভারতীয় রপ্তানিকারীকে যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তার বর্ণনা দাও।] উঃ ৩৪৮-৫১ পৃঃ

3. What formalities an importer in India is required to observe upto the stage of clearance of the imported goods from the port? [C. U. 1966]
[বন্দর থেকে আমদানিকৃত পণ্য খালাস করা পর্যন্ত কি কি আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলী ভারতস্থ আমদানিকারীকে পালন করতে হয়?] উঃ ৩৫৪-৫৬ পৃঃ

4. What are the reasons for adoption in our country of the policy of import control? If a businessman wants to import some goods what steps should be taken by him to obtain an import licence? [C.U. Hons. 1968]
[আমাদের দেশে আমদানি নিয়ন্ত্রণের নীতি গৃহীত হওয়ার কারণ কি? যদি কোনও কারবারী কোনও দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করতে চায় তবে আমদানি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করার জন্য তাকে কি করতে হবে?] উঃ ৩৪৫-৪৬, ৩৫৪ পৃঃ

5. Explain the utility of (a) Export Promotion Councils and (b) Export Credit Guarantee Insurance. [C. U. 1970]
[(ক) রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ এবং (খ) রপ্তানি ঋণ গ্যারান্টি বীমার উপকারিতা ব্যাখ্যা কর।] উঃ ৩৫৮-৬০ পৃঃ

6. Explain the role of (a) Export Houses, and (b) Export Promotion Councils in fostering Indian Exports. [C.U. 1974]
[(ক) একসপোর্ট হাউস, এবং একসপোর্ট প্রমোশন কাউনসিলগুলি ভারতের রপ্তানি প্রসারে যে ভূমিকা পালন করছে তা ব্যাখ্যা কর।] উঃ ৩৫৮-৬০ পৃঃ

7. Describe the procedure for clearing a consignment of imported machinery through Customs and Port authorities. [C.U. 1972]
[শুল্ক ও বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমদানি-করা যন্ত্রপাতির চালান খালাস করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।] উঃ ৩৫৫-৫৬ পৃঃ

8. Enumarate the procedures for exporting a consignment of sugar from India to Ceylon. [C.U. 1973]
[ভারত থেকে শ্রীলঙ্কার চিনি রপ্তানির পদ্ধতি বর্ণনা কর।] উঃ ৩৪৮-৫২ পৃঃ

২১ প্রচার ও বিজ্ঞাপন

1. What are the important points which the copy of an advertisement should contain in order to be effective? [B. U. 1963]
[কার্যকর হতে হলে বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপিতে কি কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকা উচিত?]
উঃ ৩৭২-৭৩ পৃঃ

2. A new manufacturer of chocolates wants to introduce his products in a competitive market. How should he organise his sales campaign? [C.U. Hons. 1965]
[চকোলেটের জনৈক নূতন উৎপাদক একটি প্রতিযোগিতার বাজারে তার দ্রব্যটি পরিচিত করাতে চায়। এজন্য বিক্রয় অভিযানটি তার কি ভাবে সংগঠিত করা উচিত?]
উঃ ৩৬৭-৭০ পৃঃ

3. Write a short note on Advertisement media [C.U. 1967]
[বিজ্ঞাপনের মাধ্যম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ।] উঃ ৩৭১-৭৩ পৃঃ

4. Do you think advertisement creates new customers and retains old ones? What is meant by "Scientific Advertisement?" [C.U. 1965]
[তুমি কি মনে কর, বিজ্ঞাপন নূতন খরিদ্দার সৃষ্টি করে ও পুরনো খরিদ্দার ধরে রাখে? বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন বলতে কি বোঝায়?] উঃ ৩৬৪-৬৫, ৩৭৬-৭৯ পৃঃ

5 Write short note on: Advertising Agency. [C.U. 1970, '74]
[বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী বা এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ।]
উঃ ৩৭৫-৭৬ পৃঃ

২২ বিক্রয়বিদ্যা

1. What are the fundamentals of salesmanship?
[বিক্রয়বিদ্যার মৌলিক বিষয়গুলি কি?] উঃ ৩৮১-৮২ পৃঃ

2. What in your opinion, are the essential qualities of an effective and successful salesman? [C.U. 1968]
[তোমার মতে, কার্যদক্ষ ও সফল বিক্রয় কর্মচারীর অত্যাবশ্যক গুণগুলি কি?]
উঃ ৩৮৩-৮৫ পৃঃ

২৩ সংগঠিত পণ্যের বাজার

1. Discuss the services which a "Produce Exchange" renders to trade and industry. [C.U. 1961, '65]
[সংগঠিত পণ্যের বাজার ব্যবসায় ও শিল্পের যে সেবা করে তা আলোচনা কর।]
উঃ ৩৮৮-৮৯ পৃঃ

2. Explain the working of a Produce Exchange [C.U. 1964]
[একটি সংগঠিত পণ্যের বাজারের কাজের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।] উঃ ৩৮৭-৮৮ পৃঃ

3. Discuss the services rendered by 'future markets'. Also state the steps to be taken for preventing these markets from becoming places for gambling. [C.U. Hons. 1968]
['আগাম বাজারগুলির দ্বারা সম্পাদিত সেবাকার্যের আলোচনা কর। এইসব বাজার যাতে জুয়াখেলার জায়গায় পরিণত না হতে পারে, সেজন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা উল্লেখ কর।] উঃ ৩৯০-৯১ পৃঃ

4. Discuss the organisation and functions of any organised commodity market. [C.U. 1970]
[যে কোনও একটি সংগঠিত পণ্যের বাজারের সংগঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।]
উঃ ৩৯৩-৯৪ পৃঃ

অষ্টম খণ্ড

কারবারের অর্থসংস্থান
BUSINESS FINANCE

অধ্যায়

২৪

দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থান
LONG TERM FINANCING

পুঁজির বাজার
CAPITAL MARKET

কারবারের অর্থ সংস্থানের প্রকারভেদ[1] ঃ কারবারের তিন প্রকারের অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হয়।

(১) **দীর্ঘ মেয়াদী**[2]—কারবারের স্থির পুঁজি[3], অর্থাৎ জমি, বাড়ি, কারখানা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি স্থায়ী সম্পত্তি খরিদ করে কারবার স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থের সংস্থান দরকার। এই টাকা দীর্ঘকাল (সাধারণত ১০ বৎসর বা তার বেশিকাল) ধরে কারবারে খাটে এবং এর দ্বারা কারবারের আয় উপার্জন ক্ষমতা সৃষ্টি হয় ও বাড়ে। (২) **স্বল্প মেয়াদী**[4]—কারবারের চলতি বা কার্যকর পুঁজি[5] অর্থাৎ কাঁচামাল কেনা, বেতন ও মজুরি দেওয়া, জ্বালানী ও বিদ্যুৎখরচ, তৈরি পণ্য বিক্রয়ের অপেক্ষায় হাতে মজুদ রাখা, ধারে পণ্য বিক্রি, দৈনন্দিন চলতি খরচ ইত্যাদির জন্য অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হয়। সাধারণত এর মেয়াদ হল অনধিক ৯০ দিন বা বড় জোর এক বৎসর। (৩) **মাঝারি মেয়াদী**[6]—এক থেকে দশ বৎসরকালকে মাঝারি মেয়াদীকাল বলে গণ্য করা হয়। এই সময়ের জন্যও নানা কারণে কারবারে অর্থ লগ্নীর প্রয়োজন দেখা দেয়।

অর্থ সংস্থানের বাজার[7] ঃ যেসব বাজার থেকে কারবারের প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করা হয় তাদের এক কথায় অর্থসংস্থানের বাজার বলে। অর্থসংস্থানের বাজারটি আসলে ৪/৫টি বাজারের সমষ্টি—(১) **পুঁজির বাজার**[8] ঃ এই বাজারের কাজ হল কারবারের মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থান করা। (২) **লগ্নীপত্রের বাজার**[9] ঃ লগ্নীপত্রের বাজার হল শেয়ার বাজার বা স্টক একসচেঞ্জ। এটি কিন্তু নতুন পুঁজি সরবরাহের বাজার নয়। এর কাজ হল বর্তমান (বা পুরনো) শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বন্ড ইত্যাদির মালিকানা হস্তান্তর অর্থাৎ বেচাকেনার বাজার। এটি পুঁজির বাজার না হলেও, পুঁজির বাজারের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গী। এই বাজারটি না থাকলে লগ্নীপত্রগুলির দ্রুত নগদ টাকায় পরিণত করার অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্যতা বজায় থাকত না। (৩) **টাকার বাজার**[10] ঃ এই বাজারের কাজ হল স্বল্পমেয়াদী অর্থ সরবরাহ করা। (৪) **বাট্টার বাজার বা ডিসকাউন্ট মারকেট**[11] ঃ কার্যত এটি টাকার বাজারেরই একটি অংশ, তবে অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই বাজারের কাজ হল বাণিজ্যিক হুন্ডি ভাঙিয়ে অর্থাৎ বাট্টা করে হুন্ডী বাট্টা ব্যবসায়ীদের ও হুন্ডীর দালালদের অর্থ সরবরাহ করা। (৫) **বিদেশী মুদ্রার বাজার**[12] ঃ এই বাজারের কাজ হল বিদেশী মুদ্রার বেচাকেনার মারফৎ চাহিদাকারীদের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা সরবরাহ করা।

---

1. Types of financing. 2. Long term financing. 3. Fixed capital.
4. Short term financing. 5. Working capital. 6. Medium term.
7. Financial Market. 8. Capital Market. 9. Securities Market.
10. Money market. 11. Discount Market.
12. Foreign Exchange Market.

পুঁজির বাজার : দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির চাহিদাকারী অর্থাৎ বিনিয়োগকারী ও যোগানদার অর্থাৎ সঞ্চয়কারীদের নিয়ে পুঁজির বাজারটি গঠিত। এই বাজার একদিকে সূত্র থেকে সঞ্চয় আকর্ষণ ও সংগ্রহ করে এবং অন্যদিকে উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থিত শিল্প কারবার ও সরকারকে তা সরবরাহ করে। সঞ্চয় আসে মূলত ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানগত সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে এবং তা সংগ্রহ করে সেভিংস ব্যাঙ্ক, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সোসাইটি, ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট, ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও বিশেষ অর্থসংস্থানকারী করপোরেশন, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি। আবার যারা দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগ করে, তাদের মধ্যেও এরা আছে।

পুঁজির কাঠামো[১৩] : পুঁজির কাঠামো কথাটি কোম্পানীরূপে গঠিত কারবারী সংস্থার পুঁজির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। একমালিকী, অংশীদারী ইত্যাদি অন্যান্য মালিকানা-রূপের কারবারের পুঁজির সম্পর্কে এ কথাটি ব্যবহার করা হয় না।

"কাঠামো" শব্দটির দ্বারা যেমন তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে তা বোঝায় তেমনি সেটি কিভাবে ও কি মালমশলায় তৈরী হবে তাও বোঝায়। এই অর্থ থেকে, পুঁজির কাঠামো, কথাটির ক্ষেত্রেও, তা দিয়ে দুটি জিনিসই বোঝায়। একটি হল তার পরিমাণগত দিক, অর্থাৎ পুঁজির মোট পরিমাণটি কি হবে তা বোঝায়; অন্যটি হল তার গুণগত দিক, অর্থাৎ সে পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহের জন্য কোম্পানীর ইকুয়িটি ও প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বা অন্য কোনও লগ্নীপত্র, কোন্‌টি কিংবা কোন্ কোন্‌টি ব্যবহার করা হবে তাও বোঝায়। এই অর্থে পুঁজিব কাঠামো এবং পুঁজিকরণ[১৪] বা ক্যাপিটালাইজেশন কথা দুটি একই। এজন্য হাজব্যান্ড ও ডকারে[১৫] বলেছেন, পুঁজি-করণ বলতে : "পুঁজির কাঠামোর গঠন বা চরিত্র এবং পরিমাণ উভয়ই বোঝায়।" আসলে পুঁজিব পরিমাণ ও পুঁজির কাঠামোর গঠন উভয়ে পরস্পবের পরিপূরক ও পবস্পর নির্ভরশীল।

অতি-পুঁজিকরণ[১৬] : অতি পুঁজিকবণ বললে কোম্পানীর পুঁজি প্রয়োজনেব তুলনায় অতিরিক্ত হযে পড়েছে বোঝায় না। বরং যে কোম্পানীর অতি-পুঁজিকরণ ঘটেছে তাব পুঁজিব পবিমাণ স্বল্প হওযাব সম্ভাবনাই থাকে যথেষ্ট।

কোনও কোম্পানীতে অতি-পুঁজিকরণ ঘটেছে কিনা তা বিচার করা যায় দুটি দিক থেকে– (১) তার আয়, এবং (২) তার সম্পত্তিব খরিদ দাম বা মূল্য থেকে।

আযের দিক থেকে বিচাবে, শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতিব ন্যায্য আয় অর্থাৎ লভ্যাংশ ও সুদের ন্যায্য হার যা হওয়া উচিত সে হারে লভ্যাংশ ও সুদ প্রভৃতি দিতে হলে কোম্পানীর আয় যা হওয়া দরকার তার চেযে আয় যদি অনেক কম হয়, তাহলে কোম্পানীটির অতি-পুঁজিকরণ ঘটেছে বলে গণ্য কবা হয়। গিলবার্টেব মতে, কোনও কোম্পানী একটানা ধারাবাহিকভাবে যদি তার লগ্নীপত্রেব উপর প্রচলিত হারে আয় উপার্জন করতে অক্ষম হয় তাহলে তার অতি-পুঁজিকরণ ঘটেছে, বুঝতে হবে। আর সম্পত্তির মূল্যের বা খরিদদামের দিক থেকে বিচাবে, যদি এমন দেখা যায় যে, কোম্পানীর বিলিকৃত শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি লগ্নীপত্রের মূল্যের তুলনায় তার সম্পত্তির মূল্য কম, তাহলে কোম্পানীর অতি-পুঁজিকরণ ঘটেছে বলে বুঝতে হবে।

স্বল্প-পুঁজিকরণ[১৭] : স্বল্প-পুঁজিকরণ হল অতি-পুঁজিকরণের বিপরীত। কোনও কোম্পানীর স্বল্প-পুঁজিকরণ ঘটেছে কিনা তার বিচারের দুটি উপায় আছে। একটি আয়ের দিক থেকে, অপরটি সম্পত্তির দাম অথবা খরিদ দরের থেকে। আয়ের বিচারে,

---

13. Capital Structure. 14. Capitalisation.
15. W. H. Husband & J. C. Dockeray, Modern Corporation Finance.
16. Over-capitalisation. 17. Under-capitalisation.

যদি দেখা যায় যে, অন্যান্য তুলনামূলক বিনিয়োগ থেকে যে হারে শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের উপর আয় হয় অর্থাৎ যে হারে লভ্যাংশ ও সুদ পাওয়া যাচ্ছে, সে তুলনায় বেশ বেশি হারে লভ্যাংশ ও সুদ দেবার মত অনেক বেশি আয় কোম্পানীর হয়েছে, তাহলে কোম্পানীর স্বল্প পুঁজিকরণ ঘটেছে বলে বুঝতে হবে। তেমনি, আবার সম্পত্তির মূল্য বিচারে যদি দেখা যায় যে কোম্পানীর শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি লগ্নীপত্রের মূল্যের তুলনায় তার সম্পত্তির মূল্য বেশি, তাহলে স্বল্প-পুঁজিকরণ ঘটেছে বলে গণ্য করা হয়।

অতি-পুঁজিকরণ ঘটলে কোম্পানীর লগ্নীপত্রের বাজার দর কমবে ও ঘোষিত মূল্যের কম দামে বিক্রি হবে। স্বল্প-পুঁজিকরণ ঘটলে লগ্নীপত্রের বাজার দর বাড়বে ও ঘোষিত মূল্যের বেশী দামে বিক্রি হবে। দুইয়েরই আরও নানা কুফল দেখা দেয়।

পুঁজির কাঠামোর গঠন[১৮] **:** আয়ের সম্ভাবনা অনুসারে কোম্পানীর পুঁজির কাঠামো গঠনটি এমন হওয়া উচিত, তাতে প্রেফারেন্স শেয়ার, ইকুয়িটি শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের অনুপাতটি এমন হওয়া দরকার যেন, তা একদিকে নিরাপদ এবং অন্যদিকে ব্যয় সংকোচকমূলক হয়। অবস্থা অনুযায়ী সে অনুপাতটি এক এক কোম্পানীর ক্ষেত্রে এক এক রকমের হতে পারে। তবে এ বিষয়ে সাধারণ কথাটি এই : (১) যদি, কোম্পানীর আয় যথেষ্ট এবং তার স্থিরতার আশা থাকে এবং তার ডিবেঞ্চার বিক্রি করাই উচিত। কারণ, ওই আয় মোটামুটি যথেষ্ট এবং স্থির থাকলে তার পক্ষে সুদ বাবদ স্থির খরচ মিটিয়ে দেওয়া কঠিন হবে না। (২) গড়পড়তা আয় খানিকটা অনিশ্চিত ধরনের হলেও যদি তা মোটামুটি ভাল হয়, তাহলে প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করা যেতে পারে কারণ সাধারণত, কোনও বছর লভ্যাংশ কম হওয়ার দরুন এই জাতীয় শেয়ারের লভ্যাংশ এক বছর দেওয়ার অসুবিধা হলে, পরের বছরের আয় থেকে তা মিটিয়ে দেওয়া যায়। (৩) আর আয়ের যদি নিশ্চয়তা না থাকে তা হলে ইকুয়িটি শেয়ার বিক্রি করাই প্রশস্ত। (এ সম্পর্কে ১১৪ পৃষ্ঠায় পুঁজি বিন্যাসের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

দীর্ঘমেয়াদী অর্থ সংস্থানকারী (বা বিনিয়োগকারী) সংস্থাসমূহ
LONG TERM FINANCING (OR INVESTMENT) AGENCIES

১. ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট[১৯] **:** এরা সাধারণত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী রূপে গঠিত হয়। এরা অসংখ্য ছোট বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ এমনভাবে বেছে বেছে বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় বিনিয়োগ করে যাতে—(ক) বিনিয়োগ নানা ধরনের হয়; (খ) বিনিয়োজিত অর্থ নিরাপদ থাকে; এবং (গ) বিনিয়োগ থেকে সুনিশ্চিত আয় হয়। যে সব সংস্থায় এরা টাকা খাটায় সেখানে লগ্নী বা বিনিয়োগ করতে গিয়ে এরা তাদের শেয়ার প্রভৃতির মালিক হয়ে পড়ে কিন্তু সেই মালিকানার জোরে ওই সব সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করা এদের উদ্দেশ্য থাকে না। এদের উদ্দেশ্য থাকে শুধু নিরাপদ ও আকর্ষণীয় লগ্নীপত্রে বিনিয়োজিত অর্থ থেকে আয় উপার্জন করা।

সুবিধা : (১) কোন্ জাতীয় লগ্নীপত্রে কিংবা কোন্ শিল্পসংস্থায় লগ্নী করলে তা লাভজনক ও নিরাপদ হবে, সাধারণ ছোট ছোট বিনিয়োগকারীদের তা জানা থাকে না। ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টগুলি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। সুতরাং ছোট বিনিয়োগকারীরা এদের মারফৎ বিনিয়োগ করে উপকৃত হয়। (২) এদের মারফৎ বিনিয়োগে ঝুঁকি কম বলে এদের দ্বারা সঞ্চয়কারীরা সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয়। (৩) সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র সঞ্চয় এরা সংগ্রহ করে শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশের শিল্পায়নে ও শিল্প প্রসারে সাহায্য করে।

অসুবিধা : (১) এরা আসলে নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর প্রতিই বেশী মনোযোগ দেয়। দেশের শিল্প প্রসার এদের কাছে বড়ো হয়ে ওঠে না। (২) সাধারণত পুরনো

18. Composition of Capital structure. 19. Investment Trusts.

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোম্পানীগুলিই এদের দ্বারা উপকৃত হয়। নতুন কোম্পানীগুলি এদের সাহায্য বিশেষ পায় না।

প্রকার ভেদ : ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট দু'রকমের : (১) ফিক্সড ট্রাস্ট বা ইউনিট ট্রাস্ট; এবং (২) ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী বা ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট।

২. **ফিক্সট ট্রাস্ট বা ইউনিট ট্রাস্ট**[20] : এরা একটি নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত লগ্নীপত্রে টাকা খাটায়। সে লগ্নীপত্রগুলি থাকে ট্রাস্টির বা ট্রাস্টিদের হাতে। সাধারণত কোনও ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানী ট্রাস্টিরূপে নিযুক্ত হয়। লগ্নীপত্রের তালিকাটি পরিবর্তন করার অধিকার ট্রাস্টির থাকে না। যেসব লগ্নীপত্র খরিদ করা হয় তা একটি "ইউনিট" বলে গণ্য করা হয়। ট্রাস্ট ওই "ইউনিট"কে কতকগুলি "সাব-ইউনিট"-এ ভাগ করে সেগুলি জনসাধারণের কাছে বিক্রি করে। আসলে তা হল "ট্রাস্ট সারটিফিকেট"। লগ্নীপত্রগুলির খরিদ দামের সাথে ট্রাস্ট পরিচালনার খরচ ও সংগঠকদের মুনাফা যোগ করে সাব-ইউনিটগুলির বিক্রয়-মূল্য ধার্য হয়। যারা ওই সাব-ইউনিট কেনে তারা ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা 'বেনিফিশিয়ারি' বলে গণ্য হয়। ট্রাস্টিরা লগ্নীপত্রগুলির লভ্যাংশ ও সুদ প্রভৃতি আদায় করে তা সাব-ইউনিট (অর্থাৎ ট্রাস্ট সারটিফিকেটগুলির ক্রেতাদের মধ্যে তাদের কেনা সাব-ইউনিটগুলির অনুপাতে বাঁটোয়ারা করে দেয়। এই সাব-ইউনিটগুলি বিক্রি করার কোনও বাজার নেই বলে, সাব-ইউনিটের মালিকরা তা বিক্রি করতে চাইলে ট্রাস্টের কাছেই বিক্রি করতে হয়।

সুবিধা : (১) কোন্ কোন্ লগ্নীপত্রে তাদের টাকা লগ্নী করা হবে বা হচ্ছে লগ্নীকারীরা বা বিনিয়োগকারীরা তা জানতে পারে। (২) লগ্নীপত্রের তালিকা পরিবর্তন করা যায় না বলে কারচুপির সুযোগ থাকে না। (৩) সাব-ইউনিটের দাম কম বলে সামান্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগকারীরাও তা কিনে লাভজনকভাবে টাকা খাটাতে পারে। (৪) সাধারণত ট্রাস্টিরূপে খ্যাতিসম্পন্ন ব্যাংক বা বীমা কোম্পানীর কাছেই লগ্নীপত্রগুলি গচ্ছিত থাকে বলে তা নিরাপদে থাকে। (৫) আপৎকালে প্রয়োজন হলে যেসব কোম্পানী শেয়ার ডিবেঞ্চারে ট্রাস্টের টাকা লগ্নী থাকে তাদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর ট্রাস্ট তার নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে।

অসুবিধা : (১) তালিকাভুক্ত লগ্নীপত্রগুলির বেশী সংখ্যক লগ্নীপত্রে টাকা লগ্নী করা যায় না। সুতরাং লগ্নীটি সীমাবদ্ধ থাকে। (২) নির্দিষ্ট লগ্নীপত্রে লগ্নী করা হয় বলে অনেক সময় লোকসান এমনকি পুঁজি পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। (৩) ট্রাস্ট পরিচালনার যে খরচ ("লোডিং চারজ") ধরে সাব-ইউনিটের দাম ধার্য করা হয় তা অনেক সময় খুব বেশী হয়ে পড়তে পারে। (৪) সাব-ইউনিটগুলি বিক্রি করার কোনও বাজার নেই। (৫) লগ্নীপত্রের গোটা আয়ই সাব-ইউনিটগুলির মালিকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয় বলে কোনও সঞ্চয় তহবিল বা রিজার্ভ ফান্ড থাকে না।

৩. **ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট বা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী :** এরা সংগৃহীত টাকা লগ্নী করার জন্য যে লগ্নীপত্র তালিকা তৈরি করে তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপকদেব দেওয়া হয়। একারণে এই ধরনের ট্রাস্ট-কে "নমনীয়" বা "**ফ্লেক্সিবল ট্রাস্ট**"-ও বলে। এরা সদস্যদের আয় স্থিতিশীল করার জন্য সঞ্চয় তহবিল বা রিজার্ভ ফান্ড সৃষ্টি করে। কোনও বছর আয় কম হলে ওই তহবিল থেকে টাকা নিয়ে সদস্যদের আয় আগের আগের বৎসরের মতই একরূপ রাখে। ট্রাস্টের আয় কোনও বৎসর বেশী হলে বাড়তি আয়টুকু সঞ্চয় তহবিলে জমা রাখে। লগ্নীপত্রের তালিকা এরা বদলাতে পারে বলে এদের পরিচালনায় বেশী সতর্কতা ও দক্ষতা প্রয়োজন হয়।

সুবিধা : (১) ইউনিট বা ফিক্সড ট্রাস্টের তুলনায় এরা অনেক বেশী নানা ধরনের

---

20. Fixed Trust or Unit Trust.

লগ্নীপত্রে টাকা খাটাতে পারে। এদের লগ্নী নীতি অনেক বেশী নমনীয়। তাই এদের আয় বেশী হয় এবং সদস্যরা স্থিতিশীল আয় ভোগ করে। (২) ট্রাস্টের মুনাফার একটি অংশও লগ্নী করা হয়। ফলে তা থেকেও আয় হয় এবং ট্রাস্টের মোট আয় এজন্য বাড়ে বলে সদস্যদের আয়ও বাড়ে। (৩) প্রয়োজন অনুযায়ী লগ্নীপত্রের অদলবদল করে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনার দ্বারা ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট বা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী-গুলি নিরাপদ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। (৪) এরা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-কারীদের সঞ্চয়ে ও সঞ্চিত অর্থ শিল্প লগ্নীপত্রে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়।

অসুবিধা : এদের একমাত্র অসুবিধা হল, অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ এবং ফটকাবাজ পরিচালকদের হাতে পড়লে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং তা সদস্যদের উপকারের পরিবর্তে তাদের শোষণের কলে পরিণত হয়।

৪. **ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক[21] বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক[22]** : শিল্প সংস্থাগুলিতে নানা-রূপ লগ্নীপত্রে দীর্ঘমেয়াদী লগ্নী করে আয় উপার্জনের উদ্দেশ্যে যৌথ মূলধনী কোম্পানীরূপে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক গঠিত হয়। নিজেদের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রি করে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে নানা মেয়াদের আমানত জমা নিয়ে সংগৃহীত অর্থ এরা শিল্পসংস্থার লগ্নীপত্রে লগ্নী ও বিনিয়োগ করে। এরা—(১) নবগঠিত শিল্পসংস্থার শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কিনে সরাসরি স্থির পুঁজির সংস্থান করে; (২) শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রির দায়গ্রাহক হিসাবে কাজ করে এরা শিল্প সংস্থাগুলির পুঁজি সংগ্রহে সাহায্য করে; (৩) পুরনো শিল্প সংস্থাগুলির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কিনে এবং মর্টগেজী ঋণ দিয়ে তাদের সাহায্য করে। এই কাজগুলি করতে গিয়ে শিল্প সংস্থাগুলির সাথে এদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জন্মে এবং খরিদ-করা শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতির বলে এরা খাতক শিল্প সংস্থাগুলির পরিচালক পর্ষদে ডিরেক্টার রূপে স্থান নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও অন্যান্য অগ্রসর দেশে শিল্পোন্নয়নে এদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

বিল্ডিং সোসাইটি[23] : কিছু যৌথ মূলধনী কোম্পানী জমি কিনে, তাতে পথঘাট, জল ও আলোর ব্যবস্থা করে, জমির উন্নয়ন করে তা ছোট ছোট প্লটে বিক্রি করে; আবার জমিতে নিজেরা বাড়ি তৈরি করে তা কিস্তিবন্দী মূল্য প্রদানের শর্তেও বিক্রি করে। নানা দেশেই এ ধরনের বিল্ডিং সোসাইটি দেখা যায়। শিল্প প্রসারের সাথে সাথে নতুন নতুন অঞ্চলে শহর নগর স্থাপনের ফলে যে গৃহ সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধানে এরা যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। তা ছাড়া নির্মাণ শিল্প হিসাবে মোট শিল্পগত কার্যকলাপ প্রসারেও এদের ভূমিকা রয়েছে। লগ্নীকারীদের কাছে এরা দীর্ঘ-মেয়াদে, যুক্তিসংগত মুনাফায় ও নিরাপদে লগ্নীর সুবিধা এনে দেয়।

ভারতে বিনিয়োগকারী সংস্থাসমূহ (INVESTMENT AGENCIES IN INDIA)

১. **ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট** : এদেশে ভূতপূর্ব ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি তাদের অধীন কোম্পানীগুলির প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট স্থাপন করেছিল। ১৯৫৯ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৫৯৫টি এবং তাদের আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩৭·৭ কোটি টাকা। এদের অধিকাংশই ম্যানেজিং ট্রাস্ট অথবা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী রূপে যৌথ মূলধনী কোম্পানীর আকারে স্থাপিত হয়েছিল। তবে এদের অধিকাংশেরই সম্বল ছিল অল্প। এদের অর্ধেকেরও বেশির আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ছিল ১ লাখ টাকার কম। মাত্র ৫টির আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকার বেশি। বড় বড় শিল্প গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট বা কোম্পানী রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র দুটি ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট বা কোম্পানী বিদেশী ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট-

---

21. Investment Banks. 22. Industrial Banks. 23. Building Society.

গুলির মত কাজ করে। একটি হল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, অন্যটি হল ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া। এটি টাটাদের দ্বারা স্থাপিত। কিন্তু এই ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট বা কোম্পানীগুলির কার্যকলাপ সন্তোষজনক না হওয়ায়, ভারত সরকার ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া স্থাপন করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল ছোট ছোট বিনিয়োগকারীদের শিল্পে বিনিয়োগ করতে সাহায্য করা।

২. ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া ঃ ১৯৬৩ সালের ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া আইন অনুযায়ী ১৯৬৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগকারী সংস্থারূপে স্থাপিত হয়। ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই থেকে ইউনিট বিক্রি করা আরম্ভ করে। এর মোট আদায়ীকৃত পুঁজি ৫ কোটি টাকার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিয়েছে ২·৫ কোটি টাকা, জীবনবীমা করপোরেশন ও স্টেট ব্যাঙ্ক দিয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা করে, সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থ সংস্থাগুলি মিলে দিয়েছে ১ কোটি টাকা।

উদ্দেশ্য ঃ পুঁজির ন্যূনতম ঝুঁকিতে ও যুক্তিসঙ্গত আয়ে শিল্পে নানা ধরনের কোম্পানীর লগ্নীপত্রে বিনিয়োগের সুবিধা দিয়ে ছোট সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ে এবং বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়াই হল এর মূল উদ্দেশ্য।

কাজ ঃ ইউনিট বিক্রি করে যে টাকা সংগৃহীত হয় তা বহুসংখ্যক কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে লগ্নী করা হয়। এই লগ্নী থেকে যে আয় হয় তা থেকে ট্রাস্টের খরচ খরচা বাদ দিয়ে যা থাকে তা ইউনিটহোল্ডারদের মধ্যে বিলি করা হয়। ইউনিট ট্রাস্ট নিজের জন্য কোনও মুনাফা রাখে না বা নিজের মুনাফা উপার্জনের জন্য কাজ করে না। একটি ট্রাস্টি বোর্ড-এর উপর ইউনিট ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনার ভার রয়েছে।

বিনিয়োগের পলিসি[২৪] **ঃ** দুটি বিষয়ের বিবেচনার দ্বারা ইউনিট ট্রাস্টের বিনিয়োগ-পলিসি পরিচালিত হচ্ছে—(ক) পুঁজি, অর্থাৎ বিনিয়োগ যেন নিরাপদ থাকে; এবং (খ) বিনিয়োগ থেকে যেন যুক্তিসঙ্গত আয় হয় ও বিনিয়োজিত পুঁজি যেন বাড়ে। এই কারণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইউনিট ট্রাস্টের পলিসি হল—(১) ট্রাস্টের মোট বিনিয়োগের শতকরা ৫ ভাগের বেশী কোনও একটি কোম্পানীর লগ্নীপত্রে বিনিয়োগ করা হবে না, কিংবা কোনও কোম্পানীর লগ্নীপত্রে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ওই কোম্পানীর মোট লগ্নীপত্রের মূল্যের শতকরা ১০ ভাগের বেশী হবে না; (২) নতুন শিল্প সংস্থার প্রথম লগ্নীপত্রগুলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ট্রাস্টের মোট বিনিয়োগযোগ্য টাকার শতকরা ৫ ভাগের বেশি হবে না; (৩) নানা রকমের লগ্নীপত্রে এমনভাবে টাকা লগ্নী করতে হবে যেন ট্রাস্টের গড়পড়তা আয় শতকরা ৬ টাকার বেশি হয়।

এই লক্ষ্যগুলি লাভে ইউনিট ট্রাস্ট সফল হয়েছে বলা যায়।

স্কীম ও প্ল্যান ঃ ইউনিট ট্রাস্টের দুটি ইউনিট বিক্রির স্কীম চালু রয়েছে। একটি হল ১৯৬৪ সালের ইউনিট স্কীম, অন্যটি হল ১৯৭১ সালের ইউনিট স্কীম। এছাড়া আরও যেসব প্ল্যান চালু রয়েছে তাহল, ১৯৬৬ সালের রি-ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান, ১৯৬৯ সালের ভলান্টারি সেভিংস প্ল্যান, এবং ১৯৭০ সালের চিলড্রেন্স গিফট প্ল্যান। **১৯৬৪ সালের ইউনিট স্কীমটির বৈশিষ্ট্য** হল—(১) একটি ইউনিটের ঘোষিত মূল্য হল ১০ টাকা এবং তা ১০, ২০, ৩০ ইত্যাদি দশের গুণিতকে বিক্রি করা হয়। (২) বিনিয়োগের কোন ঊর্ধ্বসীমা নেই। (৩) নির্দিষ্ট দামে প্রতিদিন ইউনিট বিক্রি করা হয়। (৪) প্রতিদিন নির্দিষ্ট দামে ইউনিটগুলি ট্রাস্টের কাছে বিক্রি করা যায়। ১৯৬৪ সালের ১লা নভেম্বর থেকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। (৫) ইউনিট-হোল্ডাররা ইউনিট থেকে ৩০০০ টাকা আয় পর্যন্ত আয়-কর রেহাই পায়। **১৯৭১ সালের ইউনিট স্কীম** এর বৈশিষ্ট্য হল—(১) ইউনিট কেনার সাথে জীবনবীমার ব্যবস্থা

24. Investment Policy.

আছে। (২) দশ বছরের মেয়াদে ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা ও সর্বাধিক ১২ হাজার টাকার নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী ৬ মাস অন্তর টাকা জমা দিতে হয়। (৩) সে টাকা থেকে জীবনবীমা করপোরেশনকে প্রিমিয়াম বাবদ একটি অংশ দিয়ে বাকি টাকায় ইউনিট কেনা হয়। (৪) ইউনিটের লভ্যাংশ দিয়ে আরও ইউনিট কেনা হয়। (৫) দশ বছর পূর্ণ হলে পুরো টাকা নগদ অথবা মোট ইউনিটগুলির মূল্যের একটি সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। (৬) এর আগে মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীরা যতগুলি ইউনিট কেনা হয়েছে তা পায়, তাছাড়া, ট্রাস্টের কাছে যত টাকা জমা পড়েছে ও যত টাকা জমা দেওয়ার লক্ষ্য স্থির হয়েছিল, এই দুটির পার্থক্যটা জীবনবীমা করপোরেশন থেকে পায়। (৭) এই বিষয়ে আয়-করের সুবিধাও পাওয়া যায়।

কাজের বিবরণ: ১৯৭২ সালের জুন মাসে ইউনিট ট্রাস্টের অষ্টম বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সে বৎসর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১১৯·২০ কোটি টাকায় পৌঁছায়। এর মধ্যে ৪৪·৬১ কোটি টাকা (৩৭·৪%) সাধারণ শেয়ারে, ১৩·৮৯ কোটি টাকা (১১·৭%) প্রেফারেন্স শেয়ারে, ৪১·৮৯ কোটি টাকা (৩৫·১%) ডিবেঞ্চারে এবং ১৮·৮৪ কোটি টাকা (১৫·৮%) অন্যান্য লগ্নীপত্রে লগ্নী করা ছিল। সে বৎসর মোট ইউনিট বিক্রির পরিমাণ ছিল ১৫·০৮ কোটি টাকা এবং সে বৎসর পর্যন্ত মোট ইউনিট বিক্রির পরিমাণ হয় ১০৪·৭২ কোটি টাকা। ট্রাস্টের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৯·২৬ কোটি টাকা।

মূল্যায়ন: (ক) সমালোচনা—(১) ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট বেচা-কেনার কেন্দ্রগুলি এখনও বোম্বাই, কলকাতা, আমেদাবাদ ও মাদ্রাজ এই ক'টি মাত্র বড় শহরে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। (২) এর খরচের অনুপাত (১২%) অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। (৩) আয়ের শতকরা ৯০ ভাগই ইউনিটহোল্ডারদের মধ্যে বিলি করা হয় বলে মুনাফা থেকে বিনিয়োগ করার মত টাকা বিশেষ থাকে না। (৪) পুঁজি যতটুকু বাড়ে তার সুবিধাটুকু বিনিয়োগকারীরা পায় না। কারণ তা বিলি করা হয় না (৫) বিনিয়োগকারীরা শেয়ারহোল্ডারদের মত কোন অধিকার ভোগ করে না। তারা ট্রাস্টের বাৎসরিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারে না। (৬) ইউনিটের দাম কমান হলে তা বেশী বিক্রি হতে পারে।

(খ) কৃতিত্ব—(১) ইউনিট ট্রাস্ট মাঝারি আয়ের ছোট বিনিয়োগকারীদের লাভজনকভাবে সঞ্চয় লগ্নীর সুযোগ করে দিয়েছে। (২) বিনিয়োগ সম্পর্কে যারা বিশেষ খোঁজ খবর রাখে না তেমন বিনিয়োগকারীদের নিরাপদে, সুনিশ্চিত যুক্তিসঙ্গত আয়ে পুঁজি খাটানোর সুবিধা, পুঁজি বৃদ্ধির সুবিধা, দরকার মতো টাকা তুলে নেবার ও আয়কর রেহাইয়ের সুবিধা দিয়েছে। (৩) নানারকম স্কীমে টাকা খাটানোর সুযোগ দিয়েছে, এমনকি ১৯৭১-এর স্কীমে জীবনবীমার বাড়তি সুযোগও দিয়েছে। (৪) পরিকল্পনার প্রয়োজনে যে সব শিল্পের সম্প্রসারণ দরকার তাদের লগ্নীপত্রে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে তাদের পুঁজি সরবরাহের আংশিক ব্যবস্থা করেছে। (৫) কোম্পানীর লগ্নীপত্র বিক্রি দায়গ্রাহকের কাজ করে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করছে।

(গ) মন্তব্য—সুতরাং নানা ত্রুটি এবং অভিযোগ সত্ত্বেও, ইউনিট ট্রাস্ট যে সাফল্যের সাথে কাজ করছে এবং দেশে একটি দীর্ঘকালের অভাব পূর্ণ করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

৩. জীবনবীমা করপোরেশন, সাধারণ বীমা করপোরেশন ও কর্মচারী রাজ্য বীমা করপোরেশন: বীমার প্রিমিয়াম রূপে বীমা কোম্পানীগুলির হাতে বিপুল পরিমাণ টাকার তহবিল সৃষ্টি হয়। এই তহবিলের টাকা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করার পক্ষে সুবিধাজনক। এই কারণে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের পুঁজির বাজারের

গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানকারী বলে গণ্য হয়। ১৯৭২-এর মার্চ মাসে জীবনবীমা করপোরেশনের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১,৯৫২·৬৬ কোটি টাকা। জীবনবীমা তহবিলের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী লগ্নীপত্রে বিনিয়োগ করতে হলেও, শতকরা ৩৫ ভাগ অনুমোদিত লগ্নীপত্রে লগ্নী করা যায়। সমবায় ও শিল্প কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার, স্থাবর সম্পত্তি, স্থাবর সম্পত্তির মর্টগেজ প্রভৃতি হল অনুমোদনযোগ্য লগ্নীর ক্ষেত্র। জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্প-লগ্নী ক্ষেত্রে তার বিনিয়োগও বেড়েছে। সরাসরি লগ্নী ছাড়াও, জীবনবীমা করপোরেশন বেসরকারী কোম্পানীর লগ্নীপত্র বিক্রির দায়গ্রাহকের কাজ করেও যথেষ্ট সাহায্য করছে।

জীবনবীমা করপোরেশন ছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বীমা করপোরেশন[২৫] এবং কর্মচারী রাজ্যবীমা করপোরেশন[২৬]ও বেসরকারী কোম্পানীগুলির লগ্নীপত্রে লগ্নী করছে।

৪. **প্রভিডেন্ট ফান্ড সোসাইটিসমূহ** ঃ ভারতে প্রভিডেন্ট ফান্ডগুলি তিন রকমের—(১) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফান্ড; (২) কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীমের অধীন নানান শিল্পের বিধিবদ্ধ প্রভিডেণ্ট ফান্ড; এবং (৩) অন্যান্য সংস্থার বেসরকারী প্রভিডেণ্ট ফান্ড। এদের মধ্যে বেসরকারী প্রভিডেণ্ট ফান্ডগুলির তহবিলের একটি অংশ শিল্পে লগ্নীর জন্য পাওয়া যায়। এর পরিমাণ নেহাৎ কম নয়।

৫. **শিল্পব্যাংক[২৭] ও বিশেষ অর্থ ও উন্নয়ন করপোরেশনসমূহ[২৮]** ঃ পশ্চিমী ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন ও বিকাশে শিল্প ব্যাংকগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও লগ্নীদ্বারা বিশেষ সাহায্য করেছে। ভারতে বর্তমান শতকের গোড়ায় দু'একটি এজাতীয় শিল্প ব্যাংক স্থাপিত হলেও তা উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে ও অন্যান্য কারণে অচিরে ব্যর্থ হয়। অথচ—(১) শিল্পের প্রয়োজনীয় দেশীপুঁজির যোগান সামান্য হওয়ায়; (২) পুঁজির বাজার সঠিকভাবে সংগঠিত না থাকায়, (৩) পুঁজি গঠনের হার অতি অল্প হওয়ায়; (৪) উদ্যোক্তার অভাব থাকায়; (৫) শিল্প সম্পর্কে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মনোভাব সহায়ক না হওয়ায়; (৬) শিল্পগুলির আধুনিকীকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য বিরাট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন; এবং (৭) ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বিকাশের জন্য পুঁজির প্রয়োজনে এদেশে দীর্ঘকাল ধরেই শিল্প ব্যাংক জাতীয় বিশেষ ধরনের অর্থ ও উন্নয়ন করপোরেশন স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। অবশেষে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিল্প বিকাশে সাহায্য করার জন্য প্রথমে ১৯৪৮ সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন (আই এফ সি), এবং তারপর ক্রমান্বয়ে স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশনগুলি (এস এফ সি-জ), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন (আই সি আই সি), ন্যাশন্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এন আই ডি সি), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আই ডি বি), ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশন করপোরেশন (আই আর সি) এবং ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (ইউ টি আই) স্থাপিত হয়। ইউনিট ট্রাস্টের আলোচনা আগেই করা হয়েছে। এখানে অন্যান্য নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির আলোচনা করা হল। এই সংস্থাগুলিকে মেয়াদী-ঋণদাতা সংস্থাও[২৯] বলা হয়।

---

25. General Insurance Corporation of India.
26. Employees' State Insurance Corporation.
27. Industrial Banks.
28. Special Financial and Development Corporations.
29. Term Lending Institutions.

১. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন*

উদ্দেশ্য : বেসরকারী শিল্পগুলিকে মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে সংসদে আইন পাশ করে (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন এ্যাক্ট) এটি স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে আইনটির সংশোধন করে এর কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করা হয় ও ১৯৬০ সালে একে বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনে তাতে অর্থ-লগ্নী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ও সমবায় সমিতি—এই দু'রকম সংস্থায় ঋণ দেয়। দ্রব্য উৎপাদনে, প্রক্রিয়াজাতকরণে, জাহাজীকারবারে, খনিজ-শিল্পে, হোটেল পরিচালনায়, বিদ্যুৎ অথবা অন্যান্য শক্তি উৎপাদনে এবং পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান এর কাছ থেকে ঋণ পেতে পারে। এখন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীরূপে গঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাও এর কাছ থেকে ঋণ পেতে পারে।

সম্বল : এর সম্বলের মধ্যে রয়েছে আদায়ীকৃত পুঁজি, ঋণপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ, সঞ্চয় লব্ধ অর্থ এবং ভারত সরকার, বিশ্বব্যাংক ও রিজার্ভ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ। আমানত গ্রহণ করেও সংস্থাটি সম্বল বাড়াতে পারে, তবে এখন পর্যন্ত তা করা হয়নি।

আর্থিক সহায়তা : আই এফ সি নিম্নলিখিত ভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য করে : (১) **ঋণপ্রদান :** অনধিক ২৫ বৎসরের মেয়াদে সম্পত্তির জামিনে অথবা ডিবেঞ্চার কিনে ঋণ দিতে পারে। (২) **ডিবেঞ্চার ও শেয়ার ক্রয় :** ১৯৬০ সালে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনতে ও যে প্রতিষ্ঠানকে ডিবেঞ্চার কিনে অথবা সম্পত্তির জামিনে ঋণ দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন হলে ঐ ঋণকে ঋণপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার পুঁজিতে রূপান্তরিত করার অধিকার করপোরেশনকে দেওয়া হয়েছে। (৩) **দায়গ্রহণ**** আই এফ সি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার স্টক বন্ড বা ডিবেঞ্চার বিক্রির দায় গ্রহণ করে। এই কাজ করতে গিয়ে নিজে কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনতে বাধ্য হলে অনধিক ৭ বৎসরের মধ্যে তা বিক্রি করে দিতে হবে। (৪) **নিশ্চয়তাদান**[৩০] : সর্বসাধারণের কাছে বিক্রয়যোগ্য ঋণপত্রের জামিনে অনধিক ২৫ বৎসরের মেয়াদে সংগৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়ে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তাও আই এফ সি দিতে পারে। তা ছাড়া বিদেশীদের কাছ থেকে ধারে যন্ত্রপাতি আমদানি করা হলে তার মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে আই এফ সি আমদানিকারীর হয়ে বিক্রেতাকে নিশ্চয়তা দিতে পারে। (৫) **প্রতিনিধিরূপে কাজ :** কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্ব ব্যাংক ঋণ দিলে সে ক্ষেত্রে আই এফ সি তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

এইভাবে আই এফ সি একাধারে শিল্প ব্যাংক ও শিল্প মর্টগেজ ব্যাংক রূপে এবং সেই সাথে লগ্নীপত্র বিলিকারক সংস্থা বা 'ইস্যু হাউজ', দায়গ্রাহক ও ঋণদাতারূপে কাজ করছে।

কার্যকলাপ : প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৩-র মার্চ মাস পর্যন্ত আই এফ সি মোট ৪৩০·২৭ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। এই ঋণের অধিকাংশ নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও বাকি অংশ পুরাতন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি রদবদল, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হয়েছে। ঋণপ্রাপ্ত শিল্পগুলির মধ্যে চিনি, তুলাবস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট, কাগজ, ইঞ্জিনীয়ারিং ও কাঁচ-শিল্প প্রধান।

কাজের মূল্যায়ন : বড় ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলির দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ সংস্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে পরিণত হলেও, আই এফ সি-র বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর

---

* Industrial Finance Corporation (IFC). ** Underwriting.
30. Guaranteeing.

অভিযোগ করা হয়েছে : (১) বাজার থেকে ঋণের সংস্থান করতে যাদের অসুবিধা আছে তেমন নব স্থাপিত সংস্থাগুলিকে সাহায্য না করে আই এফ সি সুপ্রতিষ্ঠ পুরনো ও স্বচ্ছল সংস্থাকেই বেশি সাহায্য করেছে। (২) মূল ও বুনিয়াদী অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্য শিল্পকে বেশি সাহায্য না দিয়ে ভোগ্যপণ্যশিল্পকেই বেশি সাহায্য করেছে। (৩) পশ্চাৎপদ অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নে বিশেষ সাহায্য করেনি। (৪) পরিকল্পনার বহির্ভূত শিল্প-গুলিকে সাহায্য দিয়েছে। (৫) ২৫ বৎসরের মেয়াদে ঋণ দিতে পারলেও, ১২ বৎসরের মেয়াদেই বেশী ঋণ দিয়েছে। অল্প দু'একটি ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের মেয়াদে সাহায্য করেছে। (৬) দায়গ্রাহকের কাজ এবং শেয়ার পুঁজি সরবরাহে কাজে অবহেলা করেছে। (৭) ঋণ দিতে গিয়ে স্বজনপোষণ ও পরিচিতদের খাতির করেছে। (৮) মুষ্টিমেয় শিল্পগোষ্ঠীর হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে সাহায্য করেছে।

১৯৬৪ সালে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আই এফ সি তার অধীন সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে আই এফ সি-র নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে আই ডি বি আই-এর হাতে এসেছে। এখন কাজের দ্বারা আই এফ সি-কে উপরোক্ত অভিযোগগুলি দূর করতে হবে।

২. ন্যাশন্যাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড[31]

১৯৫৪ সালে এটি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান রূপে স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য হল তুলাবস্ত্র শিল্প ও চটকল শিল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণের জন্য এবং মেশিন টুল শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ ঋণ (স্পেশ্যাল লোন) সরবরাহ করা। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এন আই ডি সি ২৭·৭১ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং ঐ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৮·৭৯ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর আর কোন নূতন ঋণের দরখাস্ত নেয়নি।

কাজের মূল্যায়ন : এনআইডিসির কাজের তুলনায় আর্থিক সম্বল অতি সামান্য। ফলে সংস্থাটি আশানুরূপ কাজ করতে পারেনি। ইদানীং তার পাওনা আদায়েও বাকি পড়ছে : এই অবস্থার উন্নতি প্রয়োজন।

৩. ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড[32]

ভারত সরকারের সমর্থনে, বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে, মার্কিন সরকারের সম্মতিতে এবং মার্কিন, বৃটিশ ও ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতায় ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে ২৫ কোটি টাকার অনুমোদিত পুঁজি নিয়ে এটি ভারতীয় কোম্পানী আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়। এর আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ৫ কোটি টাকা।

উদ্দেশ্য : ভারতের বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে ঋণদানের উদ্দেশ্যে এটি স্থাপিত হয়েছে। এর কাজ হল : (১) শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সম্প্রসারণ ও তাদের যন্ত্রপাতির আধুনিকী-করণের জন্য ঋণদান; (২) শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেশী ও বিদেশী বেসরকারী পুঁজির অংশ গ্রহণে উৎসাহদান এবং (৩) শিল্পবিনিয়োগক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানাকে উৎসাহিত করা ও পুঁজির বাজারের সম্প্রসারণ। এজন্য এন আই ডি সি (১) দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদী অর্থসংস্থানের জন্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনে সাধারণ পুঁজি সরবরাহ করছে: (২) শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রির দায়গ্রহণ করছে; (৩) অন্যান্য সূত্র থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ সংগৃহীত ঋণের জন্য নিশ্চয়তা দিচ্ছে; (৪) বিনিয়োগের আবর্তন

31. The National Industrial Development Corporation Ltd. (NIDC).
32. The Industrial Credit and Investment Corporation Ltd. (ICIC).

দ্বারা পুনর্বিনিয়োগের জন্য অর্থের সংস্থান করছে; এবং (৫) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবস্থাপনাগত কারিগরি ও প্রশাসনিক বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্য দিচ্ছে।

কাজের হিসাব ঃ স্থাপনাকাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আই সি আই সি মোট ৩৮৬·১১ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে ও ২৬৭·১৯ কোটি টাকার ঋণ বিলি করেছে। এর মধ্যে অধিকাংশই নূতন কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে।

সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পগুলির মধ্যে আছে কাগজ, রাসায়নিক, ঔষধ, ইঞ্জিনীয়ারিং, চিনি, রবার, বস্ত্র, সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক দ্রব্য, জাহাজ ইত্যাদি শিল্প।

কাজের মূল্যায়ন ঃ আই সি আই সি শিল্পগুলিকে যে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে তা পরিমাণের দিক থেকে অল্প হলেও তাৎপর্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী মুদ্রায় ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আই সি আই সি এদেশে পথিকৃৎস্বরূপ। এটি এখন শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায়গ্রহণকারীরূপে ভারতে অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ নূতন শিল্প স্থাপনেও উৎসাহ দিচ্ছে।

৪. ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক[33]

উদ্দেশ্য ঃ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ১৯৬৪ সালে সংসদের একটি আইন দ্বারা দেশের সর্বোচ্চ দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদী অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীন সংস্থা রূপে গঠিত হয়েছে। নানা সংস্থার সম্বল একত্রিত করে বৃহৎ আয়তনের শিল্প ও কারবারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশে সাহায্য করা এবং বিবিধ মেয়াদী অর্থসংস্থানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে কাজকর্মের মধ্যে সংযোজনা প্রতিষ্ঠা করাই এর উদ্দেশ্য। এর কার্যক্ষেত্র ও কাজকর্মের মধ্যে প্রয়োজনীয় নমনীয়তার ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মূল শিল্পে ও নানান প্রকল্পের নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এটি উৎসাহ দেয়।

সম্বল ঃ (১) শেয়ার পুঁজি, (২) ডিবেঞ্চার, (৩) সাধারণের কাছ থেকে গৃহীত আমানত জমা, (৪) বিদেশী ঋণ, (৫) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ এবং (৬) কেন্দ্রীয় সরকারের টাকার সৃষ্ট ডেভেলপমেন্ট এসিসট্যান্ট ফাণ্ড থেকে সাহায্য এই হল আই ডি বি আই-এর সম্বলের সূত্র।

কাজ ঃ (১) ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক আই এফ সি, এস এফ সি ও অন্যান্য মেয়াদী অর্থসংস্থান শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনে সরাসরি পুঁজি যোগায় এবং এইভাবে ওই সংস্থাগুলির সম্বল বাড়ায়। (২) শিল্প সংস্থায় ঋণ দিতে পারে, তাদের ডিবেঞ্চার কিনতে পারে এবং প্রয়োজন হলে ওই ঋণ ও ডিবেঞ্চার ওই খাতক সংস্থার শেয়ার পুঁজিতে পরিণত করতে পারে। (৩) শিল্প সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রির দায়গ্রাহকের কাজ করতে পারে। (৪) শিল্প সংস্থাগুলি অন্যত্র থেকে ঋণ যোগাড় করলে তা পরিশোধের নিশ্চয়তা দিতে পারে। (৫) আই এফ সি, এস এফ সি, বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলি শিল্প সংস্থাকে বা রপ্তানিকারীদের যে ঋণ দিয়েছে। ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ছয়মাস থেকে দশ বৎসরের মেয়াদে তাদের সে ঋণের পুনঃসংস্থান করে। (৬) শিল্প সংস্থাগুলির স্বল্প মেয়াদী অর্থ সংস্থানও ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক করতে পারে। (৭) পুরণো শিল্প সংস্থান সম্প্রসারণ ও নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রশাসনিক পরামর্শ ও সাহায্য দেয়। (৮) শিল্প ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা এবং নিজের কাজের প্রয়োজনে নূতন অধীন সংস্থাস্থাপন ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নূতন কোনও দায়িত্ব দিলে তা পালন করতে পারে।

33. Industrial Development Bank of India (IDBI).

কাজের হিসাব : ১৯৭৩-এর ৩১শে মে পর্যন্ত ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (গ্যারান্টি বাদে) ৭৪৩·৫৫ কোটি টাকার সাহায্য মঞ্জুর করেছে এবং মে-র মধ্যে ৫৪০ কোটি টাকা বিলি করা হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে ১৪টি রাজ্যে ও ৩টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষা করেছে।

মূল্যায়ন : ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক যে উচ্চ আশা নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল, কাজের দ্বারা তার অনেকটা সফল হয়েছে বলা যায়। অবাধে কাজ করার সুবিধার জন্য অনেক বিধিনিয়মের কঠোরতা থেকে একে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দিনের পর দিন এর কাজের পরিধি বাড়ছে। এই কারণে আবার ইদানীং এর ভবিষ্যত কর্মদক্ষতা সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ পর্যন্ত তার সম্বলের অভাব হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে তা যথেষ্ট হবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের উৎপত্তি হয়েছে। একই ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত এন আই ডি সি-কে এখনও ব্যাঙ্ক থেকে আলাদা করে রাখা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের অভিমত এন আই ডি সি-কে অবিলম্বে আই ডি বি আই-এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৫. স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশনসমূহ[৩৪]

উদ্দেশ্য : যে সব ছোট ও মাঝারি শিল্প-কারবারী সংস্থা আই এফ সি-র এক্তিয়ারের বাইরে পড়েছে তাদের দীর্ঘমেয়াদী অর্থ সংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার-গুলিকে নিজের অধীনে মেয়াদী অর্থ সংস্থা স্থাপনের ক্ষমতা দিয়ে ১৯৫১ সালে সংসদে স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশন আইন পাশ করা হয়েছে।

কাজ : এরা—(১) শিল্প সংস্থাকে ২০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় ঋণ ও অগ্রিম দিতে পারে এবং তাদের ডিবেঞ্চার কিনতে পারে। (২) ২০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় যে সব ঋণ শিল্প সংস্থাগুলি অন্যত্র থেকে যোগাড় করবে, তা পরিশোধে নিশ্চয়তা দিতে পারে। (৩) শিল্প সংস্থার স্টক, শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার বিক্রির দায়গ্রাহকের কাজ করতে পারে।

সম্বল : (১) শেয়ার পুঁজি, (২) নিজেদের বন্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রি, (৩) জন-সাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ, (৪) শর্তাধীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ—এইগুলি হল স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশনগুলির সম্বলের সূত্র।

কাজের হিসাব : বর্তমানে ১৮টি স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশন রয়েছে। এরা প্রতি বৎসর যে ঋণ দিচ্ছে তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯৭২-৭৩ সালে এরা মোট ৭৭·৮ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ১৯৭৩-এর মার্চ মাসে খাতকদের কাছে এদের মোট বকেয়া পাওনা ছিল ১৮৪·২ কোটি টাকা।

মূল্যায়ন : (ক) সমালোচনা—(১) এরা শিল্প সংস্থাগুলিকে সাহায্য দিচ্ছে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। (২) সাহায্য মঞ্জুর করতে এরা অত্যন্ত দেরী করে। (৩) বহু দরখাস্ত এরা নাকচ করেছে। (৪) দায়গ্রাহকরূপে এদের কাজ সন্তোষজনক নয়। (খ) এদের অসুবিধা হিসাবে বলা হয়েছে—(১) ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাবপত্র ঠিকমত থাকে না বলে কাকে কতটা ঋণ দেওয়া উচিত তা হিসাব করা কঠিন হয়ে পড়ে। (২) তাদের জামিনযোগ্য সম্পত্তি বিশেষ নেই। (৩) তথ্যের ও হিসাবপত্রের অভাবে তাদের ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুমান করাও কঠিন। (৪) ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালিক বা উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত প্রাধান্যই বেশি বলে, সে ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর করাব অসুবিধা হয়। (৫) ঋণপ্রার্থীরা বিশ্বাস করে এদের সমস্ত তথ্য জানায় না। (৬) এদের

---

34. State Financial Corporations (SFCs).

আর্থিক সম্বলও প্রয়োজনের তুলনায় কম। ১৯৭২ সালে স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশন আইনটি সংশোধন করা হয়েছে। এর দ্বারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দুর্বল সংস্থাগুলিকে পুঁজি সরবরাহে এদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এদের দুর্বলতাগুলি দূর করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন সময়ে ওয়ারকিং গ্রুপ গঠন করেছিল। করপোরেশনগুলির কাজের উন্নতির জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ কতকগুলি সুপারিশ করেছে। ১৯৭১ সালে করপোরেশনগুলির সম্মেলনেও কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংশোধিত আইনে তার অনেকগুলি গৃহীত হয়েছে।

৬. ন্যাশন্যাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন লিমিটেড[৩৫]

১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত পুঁজি নিয়ে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী রূপে এটি গঠিত হয়েছে। এর সমস্ত শেয়ারই সরকার কিনেছে।

উদ্দেশ্য ঃ বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন কার্যক্রমের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা; ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির দ্বারা বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি উৎপাদন; ক্ষুদ্র শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা ইত্যাদি করপোরেশনের উদ্দেশ্য।

সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে করপোরেশন ঐগুলি সরবরাহের সাব-কন্ট্রাক্ট ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিতরণ করে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ে সাহায্য করে। বৃহদায়তন শিল্পের বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদনের বন্দোবস্ত করে। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানাগুলির সুবিধার জন্য করপোরেশন সচল মেরামতি কারখানা, সচল পণ্য প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছে। ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনের মান নির্ধারণ ও তাদের বাজার, নকশা প্রভৃতি সম্পর্কে কারিগরি পরামর্শ দেয়। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিস্তিবন্দী মূল্যপ্রদান শর্তে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বন্দোবস্ত করে দেয়। প্রয়োজনবোধে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানেব শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙ্ক ও লগ্নী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করলে ঋণদাতাকে ঋণশোধের নিশ্চয়তা দেয়। করপোরেশনের সাহায্যে ইদানীংকালে বহু নূতন ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হয়েছে এবং ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পজাত নানাবিধ দ্রব্যে করপোরেশন ইউরোপীয় দেশগুলির আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের পুঁজির বাজার ঃ নূতন ধাঁচ
CAPITAL MARKET IN INDIA : EMERGING PATTERN

ভারতের পুঁজির বাজারের আগের অবস্থা ঃ স্বাধীনতা লাভের আগে, এমনকি প্রথম পরিকল্পনার সময়েও ভারতের পুঁজির বাজার ছিল সম্বল ও সংগঠনের দিক থেকে অতি দুর্বল। (১) বাজারটি ছিল স্বল্পপরিসরের একটি আধুনিক বাজার এবং দেশীয় মহাজন সাহুকার প্রভৃতিদের নিয়ে গঠিত একটি দেশীয় বাজার। এই দুই ভাগে বিভক্ত। (২) শিল্প পুঁজি আসত বিদেশ, প্রধানত বৃটেন থেকে। (৩) শিল্পসংস্থাগুলির পরিচালক ম্যানেজিং এজেন্টরাই যতটুকু পারত মেয়াদী ঋণ যোগাত। (৪) শিল্পসংস্থাগুলি প্রধানত অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ নিজস্ব সূত্রের উপরই নির্ভর করত। (৫) শেয়ার বাজার ছিল সীমাবদ্ধ। (৬) ব্যাঙ্কগুলি শিল্পে সংস্থায় ঋণ দিত না। (৭) নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য কিংবা পুরনো প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের জন্য অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য ছিল দুষ্প্রাপ্য। ফলে শিল্প প্রসার দীর্ঘকাল এদেশে সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল।

35. National Small Industries Corporation Private Ltd. (NSIC).

বর্তমান পুঁজির বাজারের বৈশিষ্ট্য ঃ কিন্তু সম্প্রতিকালে পুঁজির বাজারের এই চেহারার সবিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। এক নূতন, সুগঠিত সহায় সম্বলশালী সুদক্ষ পুঁজির বাজার ভারতে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে এই নূতন পুঁজির বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ (১) সরকারের উদ্যোগে নব স্থাপিত মেয়াদী অর্থ সংস্থা, যথা, আই এফ সি, আই সি আই সি, আই ডি বি আই, ইউ টি আই, এস এফ সি প্রভৃতির দৌলতে পুঁজির বাজার এই প্রথম সুগঠিত ও সহায় সম্বলশালী হয়ে উঠেছে। (২) ব্যাঙ্ক-গুলিও এখন সরকারের উদ্যোগে ও নির্দেশে শিল্পের মেয়াদী ঋণদানে নানাভাবে অংশ গ্রহণ করছে। (৩) শিল্প সংস্থার লগ্নীপত্র সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। (৪) লগ্নীপত্রের বৈচিত্র্য এবং পরিমাণ ও শেয়ার বাজারের লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে। (৫) সর্বোচ্চ মেয়াদী অর্থসংস্থা রূপে আই ডি বি আই স্থাপিত হওয়ার ফলে এমনকি মন্দার সময়েও বাজারে অর্থ সাহায্যের অভাব হয় না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর এল কে ঝার হিসাবে, প্রথম পরিকল্পনার শুরু থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে ১৮ বৎসরে নবস্থাপিত মেয়াদী অর্থ সংস্থাগুলি শিল্পোন্নয়নে প্রায় হাজার কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য করেছে। ১৯৬১-৬৯ সালের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি শিল্পকে যে সাহায্য দিয়েছে তার পরিমাণ ৬৬৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০০০ কোটি টাকা হয়েছে।

এই উন্নতির ফলে, এদেশে শিল্পের দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদী অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে—(১) মুনাফার হার দিয়ে শিল্প বিকাশ আর আবদ্ধ থাকছে না। নানান সূত্র থেকে মেয়াদী অর্থ সাহায্য পাওয়ার ফলে শিল্প বিকাশের গতিবেগ অত্যন্ত বেড়েছে। (২) পুঁজির বাজারের প্রসার ঘটায় এবং তাতে বিশেষ করে জীবনবীমা করপোরেশন ও ইউ টি আই সাহায্য করায়। শিল্প কোম্পানীগুলির মালিকানা এখন আর কয়েকটি মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাতে আবদ্ধ নেই। নূতন উদ্যোক্তা দেখা দিয়েছে। (৩) শিল্পের অর্থসংস্থানের ব্যবস্থাটি এখন অনেক বেশি সম্প্রসারণশীল ও নমনীয় হয়েছে।

পুঁজির বাজারের এই পরিবর্তনটাই ধরা পড়েছে নিচের হিসাবে ঃ—

সূত্র	প্রথম পরিকল্পনাকাল	১৯৬৭-৬৮
ক. অভ্যন্তরীণ সূত্র	... ৬২·০	৫০·৪
(১) অবচয় অবচিতি	... ২৯·০	৩৫·০
(২) রিজার্ভ ও উদ্বৃত্ত	... ৩৩·০	১৫·৪
খ. বাইরের সূত্র	... ৩৮·০	৪৯·৬
(১) নূতন পুঁজি	... ৭·০	৪·২
(২) ঋণ	... ২০·৪	৩৩·৮
ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ	... ৬·০	১৭·৭
(৩) অন্যান্য	... ১০·৬	১১·৬

শেয়ার বাজার
STOCK EXCHANGE

শেয়ার বাজার কাকে বলে ঃ যে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মিতভাবে, নির্ধারিত বিধিমত, বিভিন্ন পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার, স্টক ও ডিবেঞ্চার এবং সরকারী, আধা-সরকারী ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের (যথা, পোর্ট ট্রাস্ট) ঋণপত্র বেচাকেনা

করা হয়, তাকে স্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজার বলে। সাধারণত এই বাজারে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের এবং কোন্ কোন্ জাতীয় শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার ও অন্যান্য ঋণপত্রের বেচা-কেনা হবে, তার নির্দিষ্ট তালিকা থাকে। তার বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ঋণ-পত্র প্রভৃতি লেনদেন চলে না। এই বাজারের তালিকাভুক্ত সদস্যরা ছাড়া আর কেউ এই বেচাকেনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

স্টক এক্সচেঞ্জ ঐচ্ছিক ভিত্তিতে, সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট যৌথমূলধনী কারবাররূপে গঠিত হয়। সদস্যদের শেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতি বেচা-কেনার সুবিধা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠান নিজে কোন বেচা-কেনা, লেনদেন করে না। স্টক এক্সচেঞ্জ হল সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রকার সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের সংগঠিত বাজার।

শেয়ার বাজারের অর্থনীতিক গুরুত্ব : ১. যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার ও ঋণপত্রাদি বেচা-কেনার ব্যবস্থা করে দিয়ে, শেয়ার বাজার দেশের শিল্পায়নে প্রত্যক্ষ সাহায্য করে। (২) শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতি এই বাজারে যে কোন সময়ে বিক্রয় করে নগদ টাকায় পরিণত করা যায় বলে শেয়ার বাজার দেশবাসীকে সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়ে শিল্পে বিনিয়োগের জন্য পুঁজির অব্যাহত যোগান সুনিশ্চিত করে। (৩) এই বাজারের দরুন শেয়ার ঋণপত্র প্রভৃতি লগ্নীপত্রগুলির নগদ টাকায় রূপান্তর যোগ্যতা বজায় থাকায়, ঋণপ্রার্থীরা ঋণসংগ্রহের সুবিধা পায়। (৪) ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির লগ্নীপত্রগুলির সহজ বিক্রয় যোগ্যতার জন্য তা জামিন রেখে বিনা-দ্বিধায় ঋণ দিতে পারে। এজন্য শেয়ার বাজারগুলি তাদের লগ্নীর সুবিধা ও আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। (৫) এই বাজারের সাহায্যে বিনা বাধায় একপ্রকার লগ্নীপত্র বিক্রয় করে অন্য প্রকার লগ্নীপত্রে টাকা খাটানো চলে বলে, দেশের অভ্যন্তরে ও এমন কি বিভিন্ন দেশের মধ্যে, শেয়ার বাজারের সাহায্যে পুঁজির সচলতা বাড়ে। সকল প্রতিষ্ঠানে ও বাঞ্ছিত ক্ষেত্রে পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে। (৬) শেয়ার বাজারগুলিতে যে দরে বিভিন্ন প্রকার লগ্নীপত্রের বেচা-কেনা হয়, তা নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তা দেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাধারণত তাদের কৃতকার্যতার আভাস পাওয়া যায়। এ ছাড়া, সাধারণভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর লগ্নীপত্রের দরের অবস্থা দেখে দেশের শিল্পগুলির অর্থনীতিক অবস্থা ও শেয়ার বাজারের যাবতীয় লগ্নীপত্রের দরের অবস্থা থেকে, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক পরিস্থিতি অনুমান করা যায়। বিনিয়োগে ইচ্ছুক ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরা এই সব বিষয় পর্যালোচনা করে কোন্ শিল্পের অন্তর্গত কোন্ প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটিতে অর্থ-বিনিয়োগ করবে, তা স্থির করতে পারে। (৭) সরকারী, আধাসরকারী এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান (যথা, কলকাতা কর্পোরেশন, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি)-গুলিকে উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহে সাহায্য করে শেয়ার বাজার যথেষ্ট উপকার করে।

দেশবিদেশের যাবতীয় প্রধান প্রধান শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহণ প্রভৃতি কারবার যৌথ-মূলধনী ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। শেয়ার বাজারগুলিতে তাদের লগ্নীপত্রগুলির সর্বদা বেচা-কেনা মারফত, তাদের মালিকানার হস্তান্তর ঘটে। প্রবল সঙ্গতিশীল প্রতিদ্বন্দ্বীরা এই বাজারের মারফত সর্বদাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করার জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে পরস্পরের সাথে সংগ্রামে মত্ত থাকে। এজন্য শেয়ার বাজারগুলি আধুনিক অর্থনীতিক ও রাজনীতিক শক্তিসমূহের স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত।

শেয়ার বাজারের স্টক ও সিকিউরিটির মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ[৩৬] **:** অন্য যে কোন

36. Causes of fluctuations in the prices of stocks and securities.

পণ্যমূল্যের মত শেয়ার বাজারে পণ্য, অর্থাৎ লগ্নীপত্রের দামও মূলত তার চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং তার পরিবর্তনে লগ্নীপত্রের দাম পরিবর্তিত হয়। কিন্তু, অন্যান্য পণ্যমূল্য অপেক্ষা লগ্নীপত্রের দাম অনেক দ্রুত, ঘন ঘন ও বেশি পরিবর্তিত হয়। এতটা আর অন্য কোন বাজারেই দেখা যায় না। এর কারণ :

১. লভ্যাংশের পরিবর্তন : কোম্পানী উচ্চতর হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করলে অথবা সে সম্ভাবনা থাকলে, তার শেয়ারের চাহিদা ও সেজন্য তার দাম বাড়ে। ঘোষিত লভ্যাংশ কম হলে কিংবা সে আশঙ্কা থাকলে শেয়ারের চাহিদা ও তার দাম পড়ে যায়।

২. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার ও বাজারের সুদের হার : বাজারের সুদের হার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের সাথে শেয়ার বাজারের দামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সুদের হার বাড়লে, উচ্চ সুদে ঋণ দেওয়া বেশি লাভজনক বলে, শেয়ারের বাজারের লগ্নীকারীরা হাতে যে সব লগ্নীপত্র থাকে তা তাড়াতাড়ি বিক্রি করে নগদ টাকা সরাসরি ঋণ দেবে। ফলে, শেয়ার বাজারে লগ্নীপত্রের চাহিদা কমে ও যোগান বেড়ে গিয়ে তাদের দাম কমতে থাকবে। আর সুদের হার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার কম হলে, এর বিপরীত ঘটবে।

৩. ফট্‌কাবাজী : শেয়ার বাজারে প্রায়ই শেয়ারকারবারীদের মধ্যে অত্যধিক ফট্‌কা কারবারের ঝোঁক দেখা যায়। তেজীওয়ালাদের[37] কার্যকলাপের দরুন, বিশেষত যে ক্ষেত্রে তারা কোনও লগ্নীপত্র কোণঠাসা[38] করতে সমর্থ হয়, শেয়ারের দাম দ্রুত এবং অত্যধিক বাড়ে। তেমনি বাজারে মন্দীওয়ালাদের প্রাধান্যের দরুন লগ্নীপত্রের দাম দ্রুত পড়তে থাকে।

৪. বিনিয়োগকারী কারবারগুলির কার্যকলাপ : বীমা কোম্পানী অর্থ বিনিয়োগ-কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রভৃতি বিবিধ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হল তাদের সঞ্চিত বা মজুদ তহবিল থেকে শেয়ার বাজারের বিভিন্ন প্রকারের লগ্নীপত্রে টাকা লগ্নী করা। এই উদ্দেশ্যে তারা যখন লক্ষ লক্ষ টাকার লগ্নীপত্র কেনে তখন লগ্নীপত্রের দাম বাড়ে। যখন তারা লগ্নীপত্র বিক্রি করে দেয় তখন লগ্নীপত্রের দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ ও মুদ্রা-সংক্রান্ত নীতি : দেশের ঋণ ও মুদ্রার সরবরাহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি লগ্নীপত্রের দামকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণসংকোচ ও 'দুর্লভ অর্থ'[39] নীতি গ্রহণ করলে, দেশে টাকার যোগানে টান দেখা দেয়। তাতে সুদের হার বাড়ে। যারা ঋণ নিয়ে লগ্নীপত্রে টাকা লগ্নী করেছে, তাদের উপর ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ে। সুতরাং তারা লগ্নীপত্র বিক্রি করে টাকা ফেরত দিতে থাকে অথচ টাকার অভাবে লগ্নীপত্রের নূতন ক্রেতা বিশেষ দেখা যায় না। ফলে লগ্নীপত্রের দাম পড়ে যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ সম্প্রসারণ ও 'সুলভ অর্থ'[40] নীতি গ্রহণ করলে এর বিপরীত ঘটে।

৬. বাণিজ্য চক্র : ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অপরিহার্যভাবে কিছুদিন পরপর ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্পে চক্রাকারে চড়তি ও পড়তির বাজার[41] দেখা দেয়। চড়তির বাজারে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, জাতীয় আয়, মোট ব্যয়, মূল্যস্তর ইত্যাদি বাড়ে ও পড়তির বাজারে তা কমে। এইজন্য চড়তির বাজারে লগ্নীপত্রের দর বাড়ে ও পড়তির বাজারে তা কমে যায়।

37. Bulls. 38. Ring or corner. 39. Dear money.
40. Cheap money. 41. Trade Cycle.

৭. জাতীয় আয় ও সঞ্চয় ঃ সাধারণভাবে বলা যায় যে, মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়লে জনসাধারণের সঞ্চয়ও বাড়বে। তখন ঐ বর্ধিত সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ ও লগ্নী করে তারা অতিরিক্ত আয় উপার্জনের চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে অনেকে লগ্নীপত্রে টাকা লগ্নী করতে চাইলে লগ্নীপত্রের চাহিদা ও দাম বাড়বে। আর জাতীয় আয় ও সঞ্চয় কম হলে, এর বিপরীত ঘটবে।

৮. মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন ঃ দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে, জনসাধারণ এবং বিশেষত কারবারীদের হাতে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে টাকা এসে পড়ে। মুদ্রাস্ফীতির দরুন মূল্যস্তর বাড়ে বলে, কারবারীদের মুনাফা ও কোম্পানীগুলির লভ্যাংশ বাড়ে। তাতে লগ্নীপত্রগুলির দাম স্বভাবতই বেড়ে যায়। জনসাধারণের হাতে অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ বাড়ে বলে, ব্যাঙ্কের আমানত বাড়ে। আমানত বৃদ্ধির দরুন ব্যাংকগুলি সুদের হার কমায়। তাতে শেয়ার বাজারের কারবারীরা অল্প সুদে যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা ঋণ নিয়ে লগ্নীপত্রে খাটাতে আরম্ভ করে। ফলে তাদের চাহিদা ও দাম অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। মুদ্রা সংকোচনের সময় এর বিপরীত ঘটে।

৯. অন্যান্য কারণ ঃ উপরোক্ত অর্থনীতিক কারণগুলি ছাড়া আরও অনেক কারণে সবরকমের লগ্নীপত্রের দামের স্তরের অথবা বিশেষ বিশেষ শ্রেণী অথবা কোম্পানীর লগ্নীপত্রের দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে। দেশে রাজনীতিক সংকট, মন্ত্রিসভার পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় নীতি পরিবর্তন, আমদানি-রপ্তানির নীতি পরিবর্তন, ধর্মঘট, যুদ্ধ, নানারকমের প্রবল গুজব, গৃহযুদ্ধ, নির্বাচন, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ইত্যাদি অসংখ্য কারণে যে কোন সময়ে শেয়ার বাজারে লগ্নীপত্রের দামের উঠতি ও পড়তি দেখা যায়। এই বাজারের মত স্পর্শকাতর বাজার আর নেই।

শেয়ার বাজারে লেনদেনের পদ্ধতি ঃ শেয়ার বাজার হল লগ্নীপত্র বা সিকিউরিটি বেচা-কেনার সংগঠিত বাজার। যৌথমূলধনী কারবার হিসাবে সদস্যদের দ্বারা তা গঠিত হলেও তা নিজে শেয়ার কারবারে অংশ গ্রহণ করে না। সদস্যদের বেচা-কেনার জন্য, তা স্থানের ব্যবস্থা ও লেনদেনের নিয়মাবলী স্থির করে দেয়। তাদের কার্যকলাপে সাহায্য ও তা নিয়ন্ত্রণ করে।

এই বাজারে সদস্যরা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ ও বেচাকেনায় প্রত্যক্ষ অংশ নিতে পারে না। সদস্যরা দুই শ্রেণীর হতে পারে। একদল হল সিকিউরিটি কারবারী[৪২] বা 'জবার'। এরা নিজেদের মুনাফার জন্য কারবার করে ও সেজন্য স্বনামে চুক্তি করে। অপর দল হল দালাল[৪৩]। এরা অন্যের হয়ে, সিকিউরিটি বেচাকেনা করে এবং পারিশ্রমিক হিসাবে দস্তুরি পায়।

সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে অথবা অংশীদারী গঠন করে বেচাকেনা চালাতে পারে। একজন 'জবার' আরেকজন 'জবার'-এর সাথে এবং একজন দালাল আরেকজন দালালের সাথে অংশীদারী কারবার গঠন করতে পারে। কিন্তু একজন 'জবার' কখনও একজন দালালের সাথে অংশীদারী কারবার গঠন করতে পারে না।

দালালরা সর্বদাই বাইরের কোন ক্রেতা বা বিক্রেতার হয়ে, বাজারের অভ্যন্তরে শেয়ার কেনে অথবা বেচে। কিন্তু সিকিউরিটি কারবারীরা সর্বদাই নিজের জন্য বাজারের অভ্যন্তরে সিকিউরিটি বেচাকেনা করে। যখন কোন দালাল বাইরের কোন খরিদ্দারের দ্বারা কোন সিকিউরিটি কিনতে আদিষ্ট হয়, তখন সে কোন 'জবারের' কাছে ওই সিকিউরিটির নামোল্লেখ করে। কিন্তু তা সে কিনবে, না বেচবে, তা জানায় না। 'জবার' তখন একসঙ্গে দুটি দর উল্লেখ করে। একটি কেনার দর, তা কিঞ্চিৎ কম ও অপরটি বিক্রির দর, তা কিঞ্চিৎ বেশি। উল্লিখিত দর পছন্দ হলে, দালাল তখন

42. Jobbers. 43. Brokers.

জবারের সাথে চুক্তি করে। ঐ চুক্তিতে দালাল প্রকৃত ক্রেতার নাম প্রকাশ করে। অনেক সময় এক দালাল অন্য দালালের সাথে কেনা অথবা বেচার চুক্তি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতা, কারও নাম থাকে না। এই জাতীয় চুক্তিকে মুখ্যব্যক্তির চুক্তি[44] বলে। কোন কারবারীর সাথে কোন দালালের চুক্তি হলে, চুক্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা, উভয়ের নাম থাকে। সে চুক্তিকে দালালের চুক্তি[45] বলে।

এই ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিগুলি নগদ কারবারের চুক্তি[46] হতে পারে। কিংবা তা আগাম চুক্তি[47]ও হতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চুক্তিগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তে[48] একপক্ষ কর্তৃক অপরপক্ষকে চুক্তি-দর ও বাজার দরের পার্থক্য প্রদানের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অনেক ক্ষেত্রে শেয়ার, স্টক বা ডিবেঞ্চারের লেনদেনও হতে পারে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শেয়ার বাজার (SOME IMPORTANT STOCK EXCHANGES)

১. কলকাতা শেয়ার বাজার[49] ঃ কলকাতা শেয়ার বাজার, ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ও বড় শেয়ার বাজার। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কলকাতায় বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঋণপত্রাদির বেচাকেনা চলত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিকিউরিটিগুলি ছাড়াও নবগঠিত বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার, স্টক প্রভৃতির বেচাকেনা আরম্ভ হয়। ১৯০৮ সালে শেয়ার কারবারীরা সমিতি গঠন করে নিউ চীনা বাজার স্ট্রীটে (পরে রয়াল এক্সচেঞ্জ নামে পরিচিত) এর কার্যালয় স্থানান্তর করে। প্রথম মহাযুদ্ধে শেয়ার বাজারের সমৃদ্ধি ঘটে। ১৯২৩ সালে ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত ভবনে শেয়ার বাজার স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৫ সালে শেয়ার কারবারীদের এই সমিতি একটি লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়।

সংগঠন ঃ নিবন্ধনভুক্ত এই নূতন কোম্পানীর নামকরণ করা হল 'ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড'। এর মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। তা ১০০০ টাকা মূল্যের ৩ শত শেয়ারে বিভক্ত ছিল। পরে ঐ শেয়ারের এক একটিকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়। সুতরাং বর্তমানে তা ২৫০ টাকার ১২০০ শেয়ারে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে বিলিকৃত শেয়ারের সংখ্যা হল ১১১৬।

পরিচালনা ঃ এর শেয়ার খরিদ করে সদস্য হতে হয়। শেয়ার খরিদের জন্য শেয়ারের নির্ধারিত মূল্য ছাড়াও প্রবেশ মূল্য[50] বাবদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়। শেয়ার বাজারে সদস্যরা ছাড়াও তাদের নিযুক্ত এজেন্টরা প্রবেশ করতে পারে। তবে এজেন্ট পিছু পাঁচ শত টাকা প্রবেশ মূল্য দিতে হয়। প্রত্যেক সদস্য ও এজেন্টকে বার্ষিক ৪ টাকা হারে চাঁদা দিতে হয়। এর সদস্যরা দুই শ্রেণীর। যথা, (ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য[51]। এরা লিমিটেড কোম্পানীর আকারে শেয়ার বাজারের পুনর্গঠনের আগে থেকেই শেয়ার বাজারে অংশগ্রহণ করত। (খ) সাধারণ সদস্য[52]। এরা পরবর্তীকালে কলকাতা শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠানের শেয়ার খরিদ করে সদস্যপদ লাভ করেছে। কেউ এর সদস্য হতে চাইলে দুজন পুরাতন সভ্যের অনুমোদনসহ তার নাম শেয়ার বাজারের কার্যকরী সমিতির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। কার্যকরী সমিতির সদস্যরা আবেদনকারীর আর্থিক সঙ্গতি ব্যবসায়, চরিত্র ইত্যাদি বিবেচনা করে আবেদন মঞ্জুর করলে সভ্যপদ লাভ করা যায়।

১৯ জন সদস্য নিয়ে এর কার্যকরী সমিতি গঠিত। তাদের মধ্যে ৩ জন ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়। কার্যকরী সমিতির মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতি বৎসর এসোসিয়েশনের একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এসোসিয়েশনের সভাপতি পদাধিকারবলে কার্যকরী সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে

---

44 Principal's Contract. 45. Broker's Contract.
46. Spot Contract. 47. Forward Contract. 48. Periodically.
49. The Calcutta Stock Exchange. 50. Admission fee.
51. Founder member. 52. Ordinary member.

কাজ করেন । তা ছাড়া বিভিন্ন কাজে সহায়তার জন্য কতকগুলি কমিটি বা উপ-সমিতি আছে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ও সদস্যদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী সমিতি উপ-বিধি[৫৩] ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করে। সদস্যদের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হলে, বিবদমান একটি পক্ষ ১৬ টাকা জমা দিয়ে তা মীমাংসার জন্য কার্যকরী সমিতির কাছে আবেদন জানালে সমিতি মীমাংসার ব্যবস্থা করে।

কার্যপদ্ধতি ঃ কলকাতা শেয়ার বাজারের অধিকাংশ বেচাকেনাই, নগদ কারবারের[৫৪] ভিত্তিতে চলে। তবে ভবিষ্যৎ সরবরাহের[৫৫] ভিত্তিতে আগাম কারবার যে একেবারেই হয় না, তা নয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাজারে ঐচ্ছিক লেনদেন[৫৬] (অর্থাৎ ভবিষ্যতে সিকিউরিটির প্রকৃত হস্তান্তর হবে কিংবা ইচ্ছা করলে, চুক্তি মূল্য ও বাজার দরের পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে চুক্তি নিষ্পন্ন করা, এই দুটির কোন একটি পদ্ধতি গ্রহণের অধিকার লাভের চুক্তি) চালাবার অনুমতি দেওয়া হয় না। কলকাতা শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) এর সদস্যরা সকলেই দালাল শ্রেণীভুক্ত। দস্তুরির জন্য অপরের হয়ে বেচাকেনা করে। (২) সুতরাং এই বাজারের সব চুক্তিই হল 'মুখ্য ব্যক্তির চুক্তি'[৫৭]। বাজারের বাইরে শেয়ার বেচাকেনায় ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সাথে দালালরা চুক্তিবদ্ধ হয়। পরে তারা বাজারের অভ্যন্তরে পরস্পরের সাথে ঐ শেয়ারগুলি বেচাকেনার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। (৩) অতএব যে কোন শেয়ার বেচাকেনায় এই বাজারে সাধারণত তিনটি করে চুক্তি হয়। বাইরের ক্রেতা ও বিক্রেতার সাথে পৃথকভাবে দুই দালালের দুটি চুক্তি এবং বাজারের অভ্যন্তরে তাদের উভয়ের মধ্যে চুক্তি। ভিতরের ও বাইরের চুক্তি-দর স্বভাবতই ভিন্ন হয় এবং বাইরের প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে বাজারের ভিতরে কোন্ দরে শেয়ারগুলি কেনা বা বেচা হয়েছে তা জানার কোন উপায় থাকে না। সেজন্য কলকাতার শেয়ার বাজারের প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না। বাজারের অভ্যন্তরে শেয়ারের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি হওয়া মাত্র যে দরে চুক্তি হয়, তা ক্রয়-বিক্রয় ঘরের দেওয়ালে বোর্ডে লিখে দেওয়া হয়। এই দরই স্টক এক্সচেঞ্জের সরকারী মূল্য তালিকায় মুদ্রিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের পরের দিন দাম মেটানো ও শেয়ার হস্তান্তরের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় নিষ্পন্ন হয়। নগদ ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া অন্যান্য চুক্তিতে (অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সরবরাহের[৫৮] ক্ষেত্রে) চুক্তির ১৫ দিনের মধ্যে দাম শোধ ও শেয়ার হস্তান্তর করতে হয়। এই জাতীয় চুক্তি মত মূল্য প্রদান ও শেয়ার হস্তান্তর, নিকাশঘর[৫৯] মারফত ঘটে। চুক্তি মত কাজ করা না হলে তার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ[৬০] কার্যকরী সমিতির কাছে ১৬ টাকা জমা দিয়ে নালিশ জানায়। সমিতি তখন নোটিশ দিয়ে ৭ দিনের মধ্যে ওই চুক্তি কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ অমান্য করলে ক্ষতিগ্রস্তপক্ষকে, চুক্তি নাকচ করার অথবা বাজার থেকে ঐ চুক্তির বিষয়মত শেয়ার প্রভৃতি ক্রয় বা বিক্রয় করার এবং তাতে কোন ক্ষতি হলে তা চুক্তি খেলাপকারী পক্ষের[৬১] কাছ থেকে আদায় করার অধিকার দেওয়া হয়। কলকাতা শেয়ার বাজারের নিয়মাবলীতে নগদ কারবারের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অনুসৃত হয় না। সেজন্য এখানে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ফটকা-বাজী চলে। তা ছাড়া, দরের পার্থক্য প্রদানের দ্বারা লেনদেন নিষ্পন্ন করার ব্যবস্থার দরুন, এই বাজারের লেনদেনের আতিশয্য[৬২] ঘটে।

২. বোম্বাই শেয়ার বাজার[৬৩] ঃ ১৮৬৩-৬৪ সাল থেকে বোম্বাইয়ে নবগঠিত কোম্পানীগুলির শেয়ার ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঋণপত্র প্রভৃতি বেচাকেনার উল্লেখ

53. Bye-laws. 54. Cash delivery. 55. Forward delivery.
56 Option dealings. 57. Principal's contract. 58. Forward delivery.
59. Clearing House. 60. 'the aggrieved party'.
61. 'the defaulting party'. 62. 'over trading'.
63. The Bombay Stock Exchange.

পাওয়া যায়। তখন একটি খোলা জায়গায় ঐ বেচাকেনা চলত। সেই সময় আমেরিকার গৃহযুদ্ধের জন্য ইউরোপের বাজারে ভারতীয় তুলার চাহিদা ও দর অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাতে ভারতে তুলার বাজারে অত্যধিক ফট্‌কা কারবার শুরু হয়। তা বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারকে উৎসাহিত করে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে অনেক নূতন নূতন ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান যৌথমূলধনী ভিত্তিতে গঠিত হতে থাকে এবং তার ফলে বোম্বাই শেয়ার বাজারের সিকিউরিটি বেচাকেনার পরিমাণ বাড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারতে লিমিটেড কোম্পানীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে বোম্বাই সহ ভারতের অন্যান্য শেয়ার বাজারগুলি পুষ্টি লাভ করে।

সংগঠন ঃ প্রথমে বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজার নেটিভ শেয়ার এণ্ড স্টক ব্রোকারস্‌ এসোসিয়েশন[৬৪] নামে সংগঠিত হয়েছিল। তখন ভারতীয় ছাড়া আর কেউ তার সভ্য হতে পারত না। বর্তমানে এর নাম ইণ্ডিয়ান শেয়ার এণ্ড স্টক ব্রোকারস্‌ এসোসিয়েশন[৬৫]। এখন যে কেউ এর সভ্য হতে পারে। কলকাতা শেয়ার বাজার সংগঠনের মত বোম্বাই শেয়ার বাজার কিন্তু যৌথমূলধনী কারবারের আকারে সংগঠিত নয়। এটি একটি ঐচ্ছিক[৬৬] প্রতিষ্ঠান। ১৯২৫ সাল থেকে এটি বোম্বাই আইনসভা কর্তৃক প্রণীত বোম্বাই সিকিউরিটি চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন[৬৭] দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এর সদস্যসংখ্যা ৪৫১। তারা বেচাকেনার কাজে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কেরানীদের সাহায্য নেয়। প্রত্যেক সদস্য ও কেরানীকে বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা ও দাতব্য হিসাবে ১ টাকা অর্থাৎ মোট ৬ টাকা করে দিতে হয়। শেয়ার বাজার সংগঠনের লেনদেন কার্যে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক সদস্যদের ফেরত-যোগ্য জামিন[৬৮] বাবদ নগদে বা অনুমোদিত সিকিউরিটিতে ২০,০০০ টাকা জমা রাখতে হয়।

পরিচালনা ঃ বোম্বাই শেয়ার বাজার সংগঠনটি ১৬ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিচালক পর্ষৎ-এর দ্বারা পরিচালিত হয়। পর্ষৎ তার সভাপতি, সহ-সভাপতি ও অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করে। প্রত্যেক সপ্তাহে পরিচালক পর্ষদের সভা বসে। তার সিদ্ধান্তগুলি সদস্যদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। কোন সদস্য তা না মানলে শেয়ার বাজারের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত হবে।

পর্ষৎকে সাহায্য করার জন্য সালিশী স্ট্যাণ্ডিং কমিটি[৬৯], তালিকা-প্রণয়ন স্ট্যাণ্ডিং কমিটি[৭০] ও খেলাপকারী সভ্যগণ সম্পর্কিত স্ট্যাণ্ডিং কমিটি[৭১] আছে।

কার্যপদ্ধতি ঃ বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজার মূলত আগাম কারবারের বাজার। তবে এখানে নগদ লেনদেনও হয়। নগদ লেনদেনগুলি ৭ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নিয়ম থাকলেও, পরিচালক পর্ষদের সভাপতি তার সময় ১৫ দিন পর্যন্ত বাড়াতে পারেন। আগাম কারবারের বেলায় সাধারণত নিষ্পত্তির জন্য ১ মাস সময় নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি দিন ধরে তার জের টানা হয়। এ জন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। একে 'বদ্‌লা' বলে এবং এই জাতীয় লেনদেনকে 'বদ্‌লা কারবার' বলা হয়। সভ্যগণের সুবিধার জন্য বোম্বাই শেয়ার বাজারে 'নিকাশ ঘর' ব্যবস্থা আছে। এর মারফত মূল্য প্রদান ও সিকিউরিটি হস্তান্তর দ্বারা লেনদেনগুলির নিষ্পত্তি করা হয়। নগদ কারবার ছাড়াও বিশেষত আগাম লেনদেনগুলির সবই এই নিকাশ ঘর মারফত নিষ্পত্তি করা হয়। এর মারফত যে সব সিকিউরিটির লেনদেন চলতে

---

64. Native Share and Stock Brokers' Association.
65. Indian Share and Stock Broker's Association.
66. Voluntary. 67. Bombay Securities Contracts Control Act.
68. Refundable deposit. 69. Arbitration Standing Committee.
70. Listing Standing Committee. 71. Defaulters' Standing Committee.

কমিটি', 'রুলস এ্যান্ড ডিসপিউটস্ কমিটি', 'কোটেশন কমিটি', 'অফিসিয়াল লিস্টস এ্যান্ড পাবলিকেশনস কমিটি' প্রভৃতি কয়েকটি উপ-সমিতি আছে।

কার্যপদ্ধতি: লন্ডন শেয়ার বাজারের সদস্যরা দুই শ্রেণীর। জবার বা শেয়ার কারবারী এবং ব্রোকার বা দালাল। জবাররা নিজেদের জন্য সিকিউরিটি বেচাকেনা করে। দালালরা প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের তরফে বেচাকেনা করে। লন্ডন বাজারের জবাররা সকলে, সকল শ্রেণীর সিকিউরিটি বেচাকেনা করে না। কিন্তু দালালরা সকলেই সকল শ্রেণীর সিকিউরিটির বেচাকেনা করে।

ক্রেতা ও বিক্রেতাদের নির্দেশমত সিকিউরিটি বেচাকেনার জন্য দালালরা শেয়ার বাজারে জবারদের কাছে সিকিউরিটির দর জানতে চায়। জবাররা একসঙ্গে তার খরিদ ও বিক্রয় দর[78] উল্লেখ করে। কারণ দালালরা লগ্নীপত্র কিনবে না বেচবে তা কখনও প্রকাশ করে না। দরকষাকষি করে অবশেষে দর সাব্যস্ত হলে, দালাল প্রকৃত ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নাম প্রকাশ করে। তখন উভয়ের মধ্যে চুক্তি হয়। ঐ চুক্তিতে প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম থাকে ও তাকে দালালের চুক্তি বলে। এই বেচাকেনায় দালালরা দস্তুরি পায় ও অবস্থানুযায়ী জবারদের মুনাফা কিংবা লোকসান হয়।

লন্ডন শেয়ার বাজারে নগদ এবং বাকী দুরকম লেনদেনই চলে। নগদ ছাড়া অন্য সব লেনদেনই নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিষ্পত্তি করা হয়। কনসোল ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় সিকিউরিটিগুলির বাকী কারবারে লেনদেন মেটানোর জন্য সাধারণত ১৪ দিন ও কনসোলের লেনদেনের জন্য এক মাস সময় দেওয়া হয়।

লেনদেন মেটাতে অর্থাৎ দায় নিষ্পত্তির জন্য ৪ দিন লাগে। প্রথম দিনকে 'কন্ট্যাঙ্গো' বা 'মেকিং আপ ডে'[79] বলে। এই দিনটিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা অবিলম্বে লেনদেন নিষ্পত্তি হবে না, তা স্থগিত থাকবে তা স্থির করে। ক্রেতা ও বিক্রেতা যে কেউ, লেনদেন স্থগিত রাখার অনুরোধ জানাতে পারে। লেনদেন স্থগিত রাখলে তার জের নিষ্পত্তির পরবর্তী নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত টানা হয়। একে জের টানা[80] বলে। উপযুক্ত সঙ্গতির অভাবে এজন্য ক্রেতা বিক্রেতাকে যে সুদ দেয় তাকে কন্ট্যাঙ্গো বলে। একে **ব্যাজ** বলা যায়। আর সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি সরবরাহের অক্ষমতা ইত্যাদির দরুন বিক্রেতা লেনদেন স্থগিত রাখতে ইচ্ছুক হলে, ক্রেতাকে সেজন্য যে সুদ দেয় তাকে **হরজানা**[81] বলে। কন্ট্যাঙ্গোর পরবর্তী দিন অর্থাৎ লেনদেন নিষ্পত্তির দ্বিতীয় দিনটিকে 'টিকেট" বা 'নেম ডে'[82] বলে। সে দিন দালাল, ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম, মোট মূল্যের পরিমাণ, সিকিউরিটির পূর্ণ বিবরণ ইত্যাদি সংবলিত একটি টিকিট জবারকে দেয়। তৃতীয় দিনটিকে 'ইন্টারমিডিয়েট ডে'[83] বলে। ঐদিন লেনদেনের যাবতীয় দলিলপত্রাদি সম্পূর্ণ করা হয়। শেষ বা চতুর্থ দিনটিকে নিষ্পত্তির দিন[84] বলে। ঐদিন দাম শোধ ও সিকিউরিটি সরবরাহ দ্বারা লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয় অথবা 'কন্ট্যাঙ্গো" দিনটিতে লেনদেন স্থগিত রাখার চুক্তি হয়ে থাকলে, ফের পরবর্তী লেনদেন নিষ্পত্তির নির্দিষ্ট সময় (১৪ দিন পর) পর্যন্ত জের টানা হয়।

লন্ডন শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে জেরটানা কারবার[85] নিরুৎসাহিত করা হয়। ব্যাজ এবং হরজানা এই উদ্দেশ্যেই প্রচলিত হয়। ফলে সিকিউরিটির ব্যাপক ফট্‌কাবাজী এবং সিকিউরিটি মূল্যের অবাধ ওঠানামা হতে পারে না।

---

78. 'double barrelled price.' 79. 'Contango day' or Making up day.
80. 'Carry over'. 81. Backwardation. 82. 'Ticket day' or 'Name day'.
83. 'Intermediate day'. 84. 'Settlement day'.
85. Carry over transactions.

শেয়ার বাজারে ব্যবহৃত নানা শব্দ (TERMS USED IN STOCK EXCHANGES)

'ওয়াশ সেলস্' বা ভুয়া বেচাকেনা[৮৬]: কোন ফট্কা কারবারী যখন সিকিউরিটির উপযুক্ত দর না পেয়ে লাভে বিক্রি করতে অক্ষম হলে সে, সংগোপনে দালাল মারফত নিজেই নিজের সাথে, চড়া দরে লোক দেখানো বেচাকেনা শুরু করে। তাতে বাজারে সকলের দৃষ্টি ঐ লগ্নীপত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং প্রকৃত কারসাজী গুপ্ত থাকায়, তার চড়া দরে বেচাকেনা খাঁটি মনে করে অন্যেরাও তা কিনতে আরম্ভ করে। ফলে ঐ সিকিউরিটির বাজার দর শেষ পর্যন্ত বাড়ে। তখন সুবিধামত ঐ ফট্কা কারবারী নিজের সিকিউরিটিগুলি বাজারে বিক্রয় করে দেয়। একেই ভুয়া বেচাকেনা বলে।

'ম্যাচ অর্ডার' বা কারসাজী ফরমাশ[৮৭]: •শেয়ার বাজারে যে সিকিউরিটি সাধারণত বিশেষ বেচাকেনা হয় না, রাতারাতি তার বাজার সৃষ্টি করার জন্য কারবারীরা তা বেচাকেনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দালাল নিয়োগ করে ও বেচাকেনার দর ঠিক করে দেয়। এই দালালরা সমানে বেচাকেনা চালায় ও তার ফলে ওই লগ্নীপত্রটিকে বাজারের অন্যতম চালু ও প্রধান লগ্নীপত্র বলে মনে হয়। এইভাবে লগ্নীপত্রের ভুয়া ফরমাশ সৃষ্টিকে কারসাজী ফরমাশ বলে।

'কন্ট্যাঙ্গো' বা ব্যাজ[৮৮]: লণ্ডন শেয়ার বাজারে বাকীতে লেনদেনগুলি সাধারণত ১৪ দিন অন্তর নিষ্পত্তি হয়। নিষ্পত্তির জন্য ৪ দিন লাগে। প্রথম দিনকে 'কন্ট্যাঙ্গে ডে' বা 'মেকিং আপ ডে' বলে। সেদিন ক্রেতা ও বিক্রেতা অবিলম্বে মূল্য প্রদান ও সিকিউরিটি সরবরাহ দ্বারা লেনদেন নিষ্পত্তি করবে, না তা ১৪ দিন পরে পরবর্তী লেনদেন নিষ্পত্তির সময় পর্যন্ত তা স্থগিত রাখবে তা স্থির করে। পুরো দাম মেটাতে না পেরে ক্রেতা নিষ্পত্তি স্থগিত রাখতে চাইলে বিক্রেতাকে সে যে অতিরিক্ত টাকা দেয়, তাকে ব্যাজ বা কন্ট্যাঙ্গো বলে।

'ব্যাকওয়ার্ডেশন' বা হরজানা[৮৯]: লণ্ডন শেয়ার বাজারে সাধারণত ১৪ দিন পর পর বাকী লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়। লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য ৪ দিন সময় লাগে। প্রথম দিনটি হল "মেকিং আপ ডে" বা "কণ্ট্যাঙ্গো ডে"। সে দিন ক্রেতা ও বিক্রেতা লেনদেন অবিলম্বে নিষ্পত্তি হবে, না লেনদেনের পরবর্তী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে তা স্থির করে। বিক্রেতার অনুরোধে লেনদেন স্থগিত রাখা হলে, বিক্রেতা ক্রেতাকে সেজন্য যে অতিরিক্ত টাকা দেয়, তাকে হরজানা বলে।

'রেমিশিয়ের' বা 'উপ-দালাল'[৯০]: বোম্বাই শেয়ার বাজারের সদস্যরা নিজেরাই দালাল-কারবারী[৯১]। তারা সিকিউরিটি বেচাকেনার ফরমাশ সংগ্রহের জন্য দস্তুরি দিয়ে এজেন্ট নিযুক্ত করে। এদের উপ-দালাল বলে।

'অপ্শন্ ডিলিংস' বা ঐচ্ছিক লেনদেন[৯২]: শেয়ার বাজার ও পণ্যের সংগঠিত পাইকারী বাজারে এক ধরনের ফট্কা কারবার চলে, তাকে ঐচ্ছিক লেনদেন বলে। এতে জবারের সাথে ফট্কা কারবারীর ক্রয় অথবা বিক্রয়ের চুক্তি হয়। জবারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট দরে কেনার আগাম চুক্তি হলে শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তে বাজার দর উল্টো হলে ক্রেতা অর্থাৎ ফট্কা কারবারী ইচ্ছা করলে তা নাও কিনতে পারে। তেমনি বিক্রয়ের চুক্তিতে শর্ত থাকে যে, বাজার দর উল্টো হলে বিক্রেতা বেচতে অস্বীকার করতে পারে। জবারের সাথে চুক্তিতে ফট্কা কারবারীর ইচ্ছামত কিনতে অস্বীকারের শর্তকে 'কল অপ্শন্'[৯৩] এবং বিক্রয় করতে অস্বীকারের শর্তকে 'পুট অপ্শন্'[৯৪] বলে। এই শর্ত সহ চুক্তির জন্য, চুক্তি সম্পাদনকালে ফট্কা কারবারীকে জবারের কাছে শেয়ারের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ অথবা শেয়ার প্রতি নির্দিষ্ট টাকা জমা রাখতে হয়, তাকে

---

86. Wash Sales. 87. Match Order. 88. Contango.
89. Backwardation. 90. Remisier. 91. Broker-dealer.
92. Option dealings. 93. Call option. 94. Put option.

প্রিমিয়াম বলে। ঐ টাকা আর ফেরত পাওয়া যায় না, এবং এই জাতীয় কারবারে ওইটুকুই হল জবারের লাভ। অনেক সময় একত্রে দ্বিমুখী 'কল ও পুট অপ্শন্'-এর চুক্তিও করা যায়। তাকে 'কল এন্ড পুট অপ্শন্ বা ডবল অপ্শন্' বলে। এজন্য দ্বিগুণ হারে জবারকে প্রিমিয়াম দিতে হয়।

শেয়ার বাজারের নিকাশ ঘর (STOCK EXCHANGE CLEARING HOUSE)

বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ, ভারতের এই তিনটি শেয়ার বাজারে, সদস্যদের সুবিধার জন্য ব্যাংক জগতের মতই একটি করে নিকাশ ঘর আছে। লন্ডন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে এরূপ প্রতিষ্ঠান বহুদিন থেকেই আছে।

শেয়ার বাজার কর্তৃপক্ষ এই নিকাশ ঘর নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যে সব সিকিউরিটির লেনদেনের নিষ্পত্তি এর মারফত হবে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। একে নিকাশী তালিকা[৯৫] বলে। তালিকাভুক্ত সমস্ত সিকিউরিটির নগদ এবং আগাম কারবারের লেনদেনের কাজ নিকাশ ঘরের মারফত নিষ্পত্তি হয়।

নিকাশ ঘর মারফত যে সব শেয়ার প্রভৃতির হস্তান্তর ঘটে, সেগুলির যথার্থতা সম্পর্কে কিন্তু নিকাশ ঘরের কোন দায়িত্ব থাকে না। তা শুধু আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এটি সদস্যদের ক্রয়-বিক্রয় এবং তাদের পারস্পরিক দায় প্রভৃতির যথাযথ হিসাব রেখে তা নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। এইভাবে শেয়ার বাজারের নিকাশ ঘর দ্রুত লেনদেন নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে শেয়ার কারবারীদের প্রভূত উপকার করে।

শেয়ার বাজারের সরকারী তালিকা বা লগ্নীপত্রের তালিকা-ভুক্তিকরণের গুরুত্ব

STOCK EXCHANGE OFFICIAL LIST OR LISTING OF SECURITIES : IMPORTANCE

কোন শেয়ার বাজারেই সব কোম্পানীর শেয়ার বেচাকেনা হয় না। একমাত্র তার তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির বেচাকেনা হয়। শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত হলে কোম্পানীর শেয়ারের বিস্তৃত বাজার সৃষ্টি হয়, তা নগদ অর্থে পরিণত হওয়ার সুবিধা বাড়ে। তাতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাড়ে ও তার সিকিউরিটির প্রতি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এজন্য সব কোম্পানীই নিজের সিকিউরিটিগুলি শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত করতে চায়। তালিকাভুক্ত করার জন্য আবেদন করতে হয় এবং প্রত্যেক শেয়ার বাজার তার তালিকাভুক্তির জন্য কতকগুলি নিয়মকানুন ও শর্ত আরোপ করে। যারা ঐ সব শর্ত ও নিয়মাদি পালন করেছে, তাদের শেয়ার প্রভৃতি শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত হয়ে থাকে। এই সব তালিকাভুক্ত শেয়ারের ভালমন্দের জন্য অবশ্য শেয়ার বাজার কর্তৃপক্ষের কোন দায় নেই।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত শেয়ার বাজারের বাজার দর (MARKET QUOTATION)

সব দৈনিক সংবাদপত্রেই শেয়ারবাজারে যে সব শেয়ার ও অন্যান্য লগ্নীপত্রের বা সিকিউরিটির[৯৬] বেচাকেনা হয়, তার বিবরণ প্রকাশিত হয়। নিচে তা কিছু কিছু উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা হল।

স্টেটস্ম্যান, ৩০ জুন, ১৯৬৪ থেকে

১. কলিকাতা শেয়ারবাজার

ক. কোম্পানীর শেয়ার

1. Birla Jute— Opening, 32., Closing 32·06.
2. Howrah Jute— Opening, 15·62., Closing 15·50.
3. Dunlop Rubber— Opening, 34·25., Closing 34·12.
4. Hindusthan Motor—Opening, 18·44., Closing 18·41.

উপরে প্রথম কলমে কোম্পানীর নাম রয়েছে। এদের শেয়ারের দাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলমে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কলমে 'ওপেনিং' কথাটির দ্বারা **বাজার আরম্ভের**

95. Clearing list. 96. Securities.

সময় যে দর ছিল তা বোঝান হচ্ছে; আর 'ক্লোজিং' কথাটির দ্বারা বাজার বন্ধ হওয়ার সময়ের দর বোঝান হচ্ছে। বিড়লা জুট মিলের শেয়ারের বাজার আরম্ভের দর ছিল ৩২ টাকা ও বাজার বন্ধ হওয়ার সময়ের দর ছিল ৩২·০৬ টা.। হাওড়া জুট মিল, ডানলপ রবার কোম্পানী ও হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানীগুলির শেয়ারের বাজার আরম্ভের দর ছিল যথাক্রমে ১৫·৬২ টা., ৩৪·২৫ টা. ও ১৮·৪৪ টা. এবং বাজার বন্ধ হওয়ার সময় দর ছিল যথাক্রমে ১৫·৫০ টা., ৩৪·১২ টা. ও ১৮·৪১ টা.।

খ. সরকারী ঋণপত্র

1. 3% (1986)—63·77 s. l.
2. 3% (1970-75)—90·40 s. l.
3. 4% (1969)—100 s. l.

উপরে নানারূপ সরকারী ঋণপত্রের দর দেওয়া হয়েছে। প্রথমে হল শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ প্রদেয় ঋণপত্র। বন্ধনীর মধ্যে ১৯৮৬ দ্বারা ঐ ঋণপত্রের টাকা সরকার ১৯৮৬ সালে পরিশোধ করবেন বোঝান হচ্ছে। এই ঋণপত্রের দর ছিল ৬৩·৭৭ টা. পাশে এস. এল. কথাটির দ্বারা 'স্মল লট' বা 'ছোট লট' বোঝাচ্ছে। সাধারণত, একসঙ্গে বা এককেবারে কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার বা ঋণপত্র, যেমন, ১০০টি বিক্রয় হওয়ার কথা থাকলে অথচ প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে কম সংখ্যক শেয়ার একযোগে বিক্রয় হলে (যেমন, ৫০টি করে) এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য এস. এল. কথাটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ উপরে ১৯৮৬, ১৯৭০-৭৫ ও ১৯৬৯ সালে পরিশোধ্য সরকারী ঋণপত্রগুলি সেদিন বাজারে নির্ধারিত সংখ্যা অপেক্ষা একযোগে অল্প সংখ্যায় বিক্রি হয়েছে ও ঐ সব অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বিক্রীত ঋণপত্রগুলির বাজার দর ছিল যথাক্রমে ৬৩·৭৭ টা., ৯০·৪০ টাকা. ও ১০০ টাকা।

শেয়ার বাজার ও পণ্যের বাজারের তুলনা

শেয়ার বাজার — **সাদৃশ্য** — **পণ্যের বাজার**

১. দুটি বাজারই সুসংগঠিত এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

২. দুই বাজারেই কেবল সদস্য ও দালালরা বেচাকেনায় যোগ দিতে পারে।

৩. দুই বাজারেই পাইকারী হারে বেচাকেনা চলে।

৪. দুই বাজারই সুনির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত।

৫. দুই বাজারেই সঙ্গে সঙ্গে লেনদেনের নিষ্পত্তি হয় না।

পার্থক্য

শেয়ার বাজার	পণ্যের বাজার
১. শেয়ার বাজারে কেবল নানারূপ লগ্নী-পত্র যথা, কোম্পানীর শেয়ার স্টক, ডিবেঞ্চার, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি বেচাকেনা হয়।	১. পণ্যের বাজারে কেবল নানারূপ কৃষিজাত দ্রব্য এবং খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২. শেয়ার বাজার পুঁজির বাজারের অংশ বিশেষ।	২. পণ্যের বাজার প্রধানত শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের (যথা, টিন, রবার) ও ভোগ্যপণ্যের (যেমন—চা, কফি, গম) বাজার।

পার্থক্য

শেয়ার বাজার	পণ্যের বাজার
৩. বিভিন্ন শ্রেণীর যাবতীয় লগ্নীপত্র একই শেয়ার বাজারে বেচাকেনা হয়। এজন্য কোন দেশেই একই অঞ্চলে একাধিক শেয়ার বাজার থাকে না, এবং সমগ্র দেশের যাবতীয় অঞ্চলের মোট শেয়ার বাজারের সংখ্যা বেশী হয় না।	৩. একই পণ্যের বাজারে যেমন বিবিধ কৃষিজাত, খনিজ ও শিল্পজাত পণ্যের বেচাকেনা ঘটতে পারে, তেমনি আবার পৃথক পৃথক পণ্যের জন্য পৃথক পৃথক বাজারও থাকতে পারে। এ কারণে, যে কোনও দেশে শেয়ার বাজারের তুলনায় পণ্যের বাজারের সংখ্যা বেশী হয়।
৪. শেয়ার বাজারে যে সব লগ্নীপত্রের বেচাকেনা হয়, তাদের কোন বর্গীকরণ বা নমুনা প্রস্তুতকরণের প্রশ্ন ওঠে না। সাধারণত তাদের নাম উল্লেখ করে তাদের বেচাকেনা হয়। কোন কোন লগ্নীপত্রের সাংকেতিক নাম ব্যবহৃত হয়।	৪. পণ্যের বাজারে যে সব পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাদের বর্গীকরণ ও নমুনাপ্রস্তুত-করণ আবশ্যিক। তা না হলে পণ্য এই বাজারে বিক্রয়যোগ্য হয় না। তাদের নমুনা দেখিয়ে বা বর্গের ও নমুনার উল্লেখ দ্বারা বেচাকেনা চলে।
৫. যে লগ্নীপত্রের বর্তমানে অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ, যা বিদ্যমান নয়, তা শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয় না।	৫. শুধু বর্তমান অস্তিত্বসম্পন্ন বা বিদ্যমান পণ্য নয়, যা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে সেরকম পণ্যও এই বাজারে অগ্রিম বেচাকেনা হয়।
৬. শেয়ার বাজারের লেনদেনের বস্তু অর্থাৎ, লগ্নীপত্রের উপর তাদের একটি মূল্য মুদ্রিত থাকে (face value)।	৬. বলা বাহুল্য, পণ্যের বাজারে লেনদেনের বস্তুগুলি এরকম যে, তাদের ক্ষেত্রে এরূপ কোন মুদ্রিত মূল্য থাকা সম্ভব নয়।
৭. শেয়ার বাজারের সাথে দেশের শিল্পের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।	৭. পণ্যের বাজারের সাথে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ।
৮. শেয়ার বাজার সঞ্চয় ও বিনিয়োগকারীদের দিক্‌নির্দেশক।	৮. পণ্যের বাজার কৃষক এবং খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদকদের পথ-নির্দেশক।

শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রণ
REGULATION AND CONTROL OF STOCK EXCHANGE

পৃথিবীর সর্বত্রই শেয়ার বাজারে অল্পবিস্তর ফট্‌কাবাজী চলে। কিন্তু ভারতের শেয়ার বাজারগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এ জন্য যে দুর্নাম অর্জন করেছিল, তেমন খুব অল্পই দেখা যায়। বদ্‌লা ব্যবস্থা, আগাম কারবার, দরের পার্থক্য প্রদান দ্বারা লেনদেনের নিষ্পত্তি করা, মার্জিন ব্যবস্থা ইত্যাদি সুযোগের চূড়ান্ত অপব্যবহার করে ভারতের শেয়ার বাজারের দালাল-কারবারীরা শেয়ার বাজারগুলিকে ফট্‌কাবাজীর স্বর্গে পরিণত করে। এমনি রাতারাতি ফট্‌কা কারবারের দ্বারা অকল্পনীয় লাভের মোহে অনেক ব্যাংকও এতে লিপ্ত হয়। অল্পকাল পরেই যুদ্ধোত্তর কালে একের পর এক ব্যাংক অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ফেল পড়তে থাকে। যুদ্ধকালীন মুদ্রা ও মুনাফা স্ফীতির অবসানে যুদ্ধোত্তর যুগে সংকট দেখা দেয় ও শেয়ার বাজারেও তার প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে পড়ে। এই অবস্থায় ভারত সরকার শেয়ার বাজারে ফট্‌কা কারবার বন্ধ করার জন্য ডাঃ পি. জে. টমাসকে অনুসন্ধান ও উপযুক্ত ব্যবস্থা সুপারিশের জন্য নিয়োগ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে রিপোর্ট পেশ করেন।

১৯৫৬ সালে সিকিউরিটি চুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইন নামে একটি আইন পাশ হয়। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তা বলবৎ হয়।

১৯৫৬ সালের সিকিউরিটি চুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইন[97] : আইনটির প্রধান প্রধান ধারাগুলি হল : (১) প্রত্যেক শেয়ার বাজারকে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। এই অনুমোদন লাভের জন্য শেয়ার বাজারকে নিয়মাবলী, উপবিধি প্রভৃতি সহ একটি দরখাস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাখিল করতে হবে। (২) এই আইনের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে শেয়ার বাজারগুলির যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও এমনকি পরিচালক সমিতি ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে সরকার শেয়ার বাজারের উপবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন করতে পারবেন। (৩) অনুমোদিত বাজারগুলি নিজেদের কার্যকলাপ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মাবলী ও উপবিধি প্রণয়ন করতে পারে কিন্তু তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। (৪) ব্যবসা-বাণিজ্যের অথবা জনসাধারণের স্বার্থে, সরকার যে কোন সময় যে কোন বাজার সম্পর্কে প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করতে পারেন। (৫) 'ঐচ্ছিক লেনদেন' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (৬) শেয়ার বাজারের বহির্ভূত যাবতীয় শেয়ার কারবারীদের সরকার থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। (৭) নগদ বা আগাম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কেবলমাত্র অনুমোদিত শেয়ার বাজারের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অথবা তাদের মাধ্যমেই ঘটবে। (৮) অনুমোদিত শেয়ার বাজারের সদস্য ছাড়া আর কারও মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের সরাসরি চুক্তি হতে পারবে না। (৯) কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মনে করলে যে কোন শেয়ার বা সিকিউরিটি সংক্রান্ত লেনদেনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন। (১০) কেন্দ্রীয় সরকার শেয়ার বাজারগুলিকে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীগুলির শেয়ার তাদের তালিকাভুক্ত করতে বাধ্য করতে পারেন। (১১) প্রত্যেক শেয়ার বাজার সংগঠনকে তার হিসাব, চিঠিপত্রাদি, মেমোরান্ডাম প্রভৃতি অন্তত ৫ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে এইগুলি সরকার কর্তৃক পরীক্ষিত হতে পারে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময় মত প্রত্যেক শেয়ার বাজারকে সরকারের কাছে রিটার্ণ দাখিল করতে হবে। (১২) শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণের এই আইন ভঙ্গকারী যে কোন ব্যক্তি ১ বৎসর কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই ভোগ করবে।

১৯৫৯ সালে ভারত সরকার উপরোক্ত আইনটি বলবৎ করার ভার দিয়ে একটি **'ডাইরেকটরেট অব স্টক একসচেঞ্জেস্'** স্থাপন করেছেন। এর সদর দপ্তর বোম্বাইয়ে। দিল্লি ও কলকাতায় একটি করে শাখা অফিস আছে। এর কাজ হল : (১) শেয়ার বাজারগুলির দৈনন্দিন কাজের উপর নজর রাখা। (২) আইনে যে লেনদেনগুলি অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে তা বন্ধ করা। (৩) শেয়ার তালিকাভুক্তি নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালন করা হয়েছে কিনা দেখা। (৪) অনুমোদিত শেয়ার বাজার বহির্ভূত সিকিউরিটি কারবারীদের লাইসেন্স দেওয়া।

---

97. Securities Contract (Regulation) Act, 1956.

২৫

স্বল্পমেয়াদী অর্থসংস্থান
SHORT TERM FINANCING

টাকার বাজার
MONEY MARKET

টাকার বাজার[1]ঃ স্বল্প মেয়াদে ঋণপ্রদানযোগ্য পুঁজির ভান্ডারকে চলতি কথায় টাকার বাজার বলে। এর কাজ হল কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় স্বল্প-মেয়াদী ঋণের সংস্থান করা।

টাকার বাজার ও পুঁজির বাজারঃ তুলনা ঃ টাকার বাজার ও পুঁজির বাজারের পার্থক হল, প্রথমটি স্বল্পমেয়াদী ঋণের আর দ্বিতীয়টি দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সংস্থান করে।

সাধারণত কাঁচামাল সংগ্রহ, মজুরি প্রদান, কাঁচামাল থেকে আরম্ভ করে উৎপন্ন পণ্য ক্রেতার কাছে বিক্রয়ের মধ্যবর্তী বিভিন্ন অবস্থায় ও স্তরে, পণ্য উৎপাদনের বিবিধ প্রক্রিয়াগুলিকে সচল রাখার এবং তৈরী পণ্য বিক্রয়ের জন্য ও সরকারের সাময়িক অর্থের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করাই হল টাকার বাজারের কাজ। টাকার বাজার কারবার ও সরকারের প্রয়োজনীয় চলতি অর্থের সংস্থান করে। পুঁজির বাজার হল কারবারের ও সরকারের প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের ক্ষেত্র। তবে, পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এরা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কারণ এক বাজারের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া সহজেই অপর বাজারে প্রভাব বিস্তার করে।

টাকার বাজারের হিতকর কাজ ঃ যে সব হিতকর কাজের দরুন কারবারী জগতে টাকার বাজারের যথেষ্ট উপযোগিতা ও গুরুত্ব রয়েছে তা হলঃ (১) বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান এই বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণে টাকা লগ্নী করার সুযোগ পায়। (২) লাভজনকভাবে টাকা খাটানোর সুযোগ থাকায়, টাকার বাজার দেশ-বাসীকে সঞ্চয়ে উৎসাহ দেয় ও সমাজের সঞ্চয়কে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক খাতে পরিচালিত করে। (৩) সরকারকে সহজ স্বল্পমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। (৪) কারবারের চলতি পুঁজি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে উৎপাদন অক্ষুণ্ণ রাখে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়ে পণ্যসামগ্রীর সচলতা অব্যাহত রাখে। (৫) পুঁজির বাজারের লেনদেনগুলিকে সাহায্য করে ও তা অব্যাহত রাখে। (৬) সুগঠিত টাকার বাজার সর্বদাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণনিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে।

সুতরাং টাকার বাজার ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্প যাবতীয় কারবারী কার্যকলাপের সূচনা, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে অপরিহার্য।

টাকার বাজারের সদস্য ঃ স্বল্পমেয়াদী ঋণের যোগানদার ও চাহিদাকারী, এই দু'পক্ষ নিয়ে হল টাকার বাজার। তবে এরা সকলেই যে আলাদা তা নয়। এর অনেক সদস্যই একইসঙ্গে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহণকারী। টাকার বাজারের এই সদস্যরা হল প্রধানত ঃ (১) কেন্দ্রীয় ব্যাংক; (২) বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ; (৩) লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, যথা বীমা কোম্পানী, সেভিংস ব্যাংক ইত্যাদি; (৪) মহাজন, পোদ্দার, সাহুকার প্রভৃতি লগ্নীকারীরা।

ঋণদাতা বা লগ্নীকারীদের তুলনায়, এই বাজারের ঋণগ্রহণকারীরা অনেক বেশী ও

---

1. Money Market.

বিভিন্ন প্রকারের হওয়ায় তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন। তবে এদের মধ্যে ইংলণ্ডে, বিল-দালাল[2], বিল-বাট্টাকারবারী প্রতিষ্ঠান[3], হুন্ডি-স্বীকৃতির কারবারী প্রতিষ্ঠান[4] এবং সরকারী ও বেসরকারী সিকিউরিটি কারবারীদের দেখা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টাকার বাজারে শেয়ারের দালাল, সিকিউরিটি কারবারীরা, কমার্শিয়াল পেপার কারবারীরা ও বিলকারবারীরা[5] হল প্রধান ঋণগ্রহণকারী।

ভারতের টাকার বাজার: (১) রিজার্ভ ব্যাংক, (২) স্টেট ব্যাংক, (৩) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি, (৪) বিদেশী (বাণিজ্যিক) ব্যাংকগুলি, (৫) সমবায় ব্যাংকগুলি, (৬) বিল বাজার, (৭) মহাজন, সাহুকার, পোদ্দার ইত্যাদি দেশীয় ব্যাংকাররা, (৮) কারবারী সংস্থাগুলিতে যারা সরাসরি মেয়াদী আমানত জমা রাখে সেই লগ্নীকারীদের নিয়ে ভারতের টাকার বাজারটি গঠিত।

১. রিজার্ভ ব্যাংক: ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকরূপে রিজার্ভ ব্যাংকের মূল কাজ হল দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্যে টাকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্য[6] স্থির রাখার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক নগদ টাকা[7] ও ঋণ[8] নিয়ন্ত্রণ করে। রিজার্ভ ব্যাংক একদিকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহকারী রূপে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মারফৎ টাকার বাজারে সংকটকালে ঋণের যোগান দেয় ও প্রয়োজনে সে ঋণ সংকোচন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে টাকার বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজনে নিজে ট্রেজারী বিল বিক্রি করে ঋণ সংগ্রহ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণের শেষ আশ্রয় বলে রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ঋণ দান নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে—(১) সরকারী সিকিউরিটি বা লগ্নীপত্রের জামীনে, (২) বিল বাজার স্কীম মারফৎ রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে বিল বাট্টা করে, এবং (৩) রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে ট্রেজারী বিল বাট্টা করে—ঋণ নেয়।

রিজার্ভ ব্যাংক ও টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত ও এর উদ্যোগে ভারতের আধুনিক সংগঠিত টাকার বাজারের বিস্তার ও দেশীয় টাকার বাজারের সংকোচন ঘটেছে। এর কারণ হল: (১) ১৯৪৮ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ দ্বারা ব্যাংকটি রাষ্ট্রায়ত্ত হলে ব্যাংক-ব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংকের মারফত সরকারের হস্তক্ষেপ সম্ভব। ফলে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিপত্তি বেড়েছে। (২) ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির লাইসেন্স দেওয়া থেকে আরম্ভ করে তাদের নীতি নির্ধারণ, কার্যাবলী তদারক, কাগজপত্র পরীক্ষা শাখাস্থাপন, স্থান পরিবর্তন এমন কি একীকরণ ও কারবার গুটান পর্যন্ত—রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। আইনটির সংশোধনগুলির দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা ব্যাংকগুলির অভ্যন্তরীণ পরিচালনা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। ফলে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অনেকাংশে ত্রুটিমুক্ত ও শক্তিশালী হয়ে টাকার বাজারকে সুস্থ করেছে। (৩) ১৯৫২ সালে বিলবাজার কর্মসূচী গ্রহণের পর থেকে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। দেশে বাণিজ্যিক ঋণের প্রসার ঘটছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের উপর বেশি করে নির্ভর করছে। (৪) ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ফলে রিজার্ভ ব্যাংকের পুরাতন ক্ষমতাশীল প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্তর্ধান ও তার সহায়ক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটায় টাকার বাজারে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রভাব আরও

---

2. Bill Brokers.
3. Discount Houses.
4. Acceptance Houses.
5. Dealers in Acceptances.
6. External value.
7. Currency.
8. Credit.

বেড়েছে। (৫) ১৯৫১ সাল থেকে ব্যাঙ্করেটের ব্যবহার, বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ প্রভৃতি ভারতের টাকার বাজার ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯৫৬ সালে জমার অনুপাত পরিবর্তনের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের হাত আরও শক্তিশালী করেছে। (৬) রিজার্ভ ব্যাংকের স্থিতিস্থাপক ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি সফলভাবে ব্যাংকঋণ ও টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে রিজার্ভ ব্যাংককে টাকার বাজারের সর্বময় নেতার পদে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। (৭) সম্প্রতি দেশের ১৪টি সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকের জাতীয়করণের দরুন এখন রিজার্ভ ব্যাংক দেশের টাকার বাজার ও ব্যাঙ্কিং জগতে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লাভ করেছে।

২. স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: প্রাক্তন ইম্পিরিয়েল ব্যাংক ও ৭টি দেশীয় রাজ্যের ব্যাংক-কে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকরূপে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়েছে। এর কাজ হলঃ (১) বাণিজ্যিক ব্যাংকরূপে কাজের পরিধি বাড়ান; (২) গ্রামাঞ্চলে শাখা বিস্তার করে দেশে ব্যাংক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা; (৩) গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহ করা; (৪) গ্রামাঞ্চলে কৃষি ঋণদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা; (৫) ক্ষুদ্র শিল্পে মেয়াদী ঋণের সংস্থান করা; (৬) যেখানে রিজার্ভ ব্যাংকের কার্যালয় নেই সেখানে তার প্রতিনিধিরূপে কাজ করা। এবং (৭) টাকা স্থানান্তরের সুবিধা দেওয়া।

স্টেট ব্যাংক ও তার সহযোগী ৭টি ব্যাংক কারবারী সংস্থাগুলির স্বল্পমেয়াদী ঋণের সংস্থান করার সাথে সাথে দেশে অভূতপূর্ব পরিমাণে শাখা বিস্তার করে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছে। ১৯৭৪-এর জুন মাসে স্টেট ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ছিল ৩,০৭২টি এবং তার ৭টি সহযোগী ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল ১,৬৪২টি। ১৯৭৩-এর জুন মাসে এদের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৪২·২১ কোটি টাকা ও প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩৪·৫৩ কোটি টাকা।

শিল্পে, বিশেষত ক্ষুদ্র শিল্পে স্টেট ব্যাংক যাতে মেয়াদী ঋণ ('টারম লোন') ও স্থাবর সম্পত্তির জামীনে ঋণ দিতে পারে সে উদ্দেশ্যে স্টেট ব্যাংক আইন সংশোধন করা হয়েছে। ফলে স্টেট ব্যাংক এখন সর্বাধিক ১০ বৎসরের মেয়াদে পর্যন্ত কারবারী সংস্থাকে ঋণ দিতে পারে। আগে ৬ মাসের বেশি মেয়াদে ঋণ দিতে পারত না। ভাড়া-ক্রয় কারবারেও স্টেট ব্যাংক এখন ঋণ দিচ্ছে।

সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যাতে কৃষির প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহে আরো বেশী সক্ষম হয় সেজন্য স্টেট ব্যাংক তাদের গ্রামাঞ্চলে টাকা স্থানান্তরের ও বেশি করে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। নিজেও নানাভাবে কৃষি ঋণের নানা স্কীমে যোগ দিচ্ছে।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ: ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত। এরা দুই শ্রেণীর। যথা, তফসিলভুক্ত ব্যাংক ও তফসিল বহির্ভূত ব্যাংক। প্রথমোক্ত ব্যাংকগুলির আদায়ীকৃত পুঁজি ও সঞ্চিত তহবিলের মোট পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা এবং তদূর্ধ্ব। এরা রিজার্ভ ব্যাংকের 'এ-তফসিল' ভুক্ত বলে এদের তফসিলভুক্ত ব্যাংক বলা হয়। দ্বিতীয়োক্ত ব্যাংকগুলির আদায়ীকৃত পুঁজি ও সঞ্চিত তহবিলের মোট পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম। তফসিলভুক্ত ব্যাংকগুলি আয়তনে স্বভাবতই বড়।

সব বাণিজ্যিক ব্যাংকই চলতি ও মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে এবং আমানত-কারীদের, সাধারণ ব্যবসায়ী, বণিক ও অন্যান্য কারবারীদের স্বল্প মেয়াদে ঋণ দেয়। বর্তমানে এরা দেশের শিল্প ও কৃষি ঋণ সম্প্রসারণ ও রপ্তানি ঋণ প্রসার ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান অংশ নিচ্ছে।

আমানত গ্রহণ ও ঋণদান, এই দুটি মুখ্য কাজ ছাড়াও, এরা আমানতকারীদের নানা

প্রকারে সেবা করে। আমানতকারীদের নির্দেশমত সিকিউরিটি বেচাকেনা, বাড়িভাড়া প্রদান বা সংগ্রহ, সিকিউরিটি সমূহের লভ্যাংশ ও সুদ সংগ্রহ, টাকা-পয়সা স্থানান্তর, অন্য ব্যাঙ্ক বা অন্য স্থান থেকে চেকের টাকা আদায়, বীমার প্রিমিয়াম প্রদান ইত্যাদি কাজ করে। তা ছাড়া, এরা নিরাপদে মূল্যবান সামগ্রী ও দলিলপত্রাদি গচ্ছিত রাখে এবং ট্রাস্টি ও এক্সিকিউটার হিসাবেও কাজ করে। ভারতের টাকার বাজারের এরাই প্রধান সদস্য।

১৯৬৯ সালে ৫০ কোটি টাকার বেশি আমানত বিশিষ্ট ১৪টি সর্ববৃহৎ ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। এই ব্যাংকগুলির মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ভারতের তফসিলভুক্ত ব্যাংকগুলির সর্বমোট আমানতের শতকরা ৭২ ভাগ। এর ফলে দেশের টাকার বাজার ও ব্যাংক জগতে সরকারের প্রায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রিজার্ভ ব্যাংকের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে।

১৯৭৪ সালের জুন মাসে দেশে ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ছিল ৯,০১৭টি ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ছিল ৩,১৯৫টি। ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট আমানত ছিল ১৯৭৩-এর জুন মাসে ৬৮৩·৭৩ কোটি টাকা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মোট আমানত ছিল ১৮২·৮৭ কোটি টাকা।

৪. **বিনিময় ব্যাংকসমূহ**[9] : ভারতে কর্মরত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মধ্যে বিনিময় ব্যাংক নামে পরিচিত কিছু বিদেশী ব্যাংক আছে। আগে এরা প্রধানত আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ের অর্থসংস্থান করত বলে ঐ নামকরণ হয়েছিল। বর্তমানে, অনেক ভারতীয় ব্যাঙ্ক আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানে অংশ গ্রহণ করছে। আবার এই সব তথাকথিত বিনিময় ব্যাংকগুলিও দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে ও শিল্পে ঋণদান করছে।

৫. **সমবায় ব্যাংকসমূহ**[10] : ভারতে সমবায় ব্যাংক ও কৃষি এবং অ-কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতি আছে। কোন কোন প্রাথমিক সমবায় ব্যাংক, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি ছাড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলি কৃষিকার্যে ঋণের সংস্থান করে। সারা ভারত গ্রাম্য ঋণ জরিপ পরিচালনা-কারী কমিটির পরামর্শমত ভারত সরকার গ্রাম্য ঋণের যে পুনর্গঠন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে সমবায় ব্যাংকসমূহ শক্তিশালী ও তাদের কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে।

৬. **বিল বাজার*** : পশ্চিমী দেশগুলিতে বাণিজ্যিক হুণ্ডি টাকার বাজারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঋণপত্র রূপে কাজ করে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাকিতে লেনদেনের ফলে বিপুল পরিমাণে নির্দিষ্ট মেয়াদের বাণিজ্যিক হুণ্ডির উৎপত্তি হয়। সেগুলি হুণ্ডিদাতারা বা ধারকরা মেয়াদ শেষের আগে ব্যাংকের কাছে বাট্টা বা বিক্রি করে কারবারের প্রয়োজনে টাকার যোগাড় করে। লগ্নীপত্র হিসাবে ব্যাংকগুলি প্রভূত পরিমাণে হুণ্ডি কিনে তাদের লগ্নীযোগ্য টাকা খাটায় এবং বাট্টা হিসাবে আয় উপার্জন করে। নিজেদের টাকার দরকার হলে ব্যাংকগুলি সে হুণ্ডিগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে পুনর্বাট্টা বা বিক্রি করে দিয়ে টাকার যোগাড় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব সময় হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করার জন্য তৈরী থাকে বলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কারবারীদের কাছ থেকে হুণ্ডি কিনতে বা বাট্টা করতে দ্বিধা করে না। এইভাবে বাণিজ্যিক হুণ্ডির কারবার টাকার বাজারের মধ্যে একটা আলাদা বাজার হিসাবে সে সব দেশে সৃষ্টি হয়েছে এবং বাণিজ্যিক হুণ্ডি স্বল্প মেয়াদী ঋণের একটা প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ফলে ব্যবসায়ী, বণিক ও শিল্পপতিরাও এতে উপকৃত হয়েছে।

9. Exchange Banks. 10. Cooperative Banks. * Bill Market.

কিন্তু ভারতে—(১) ব্যবসা বাণিজ্যে পশ্চিমী ধরনের বাণিজ্যিক হুন্ডির উৎপত্তি না হওয়ায়; (২) দেশী যে হুন্ডি এখানে দেশীয় ব্যাঙ্কারদের ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে তা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায়; (৩) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক হুন্ডি পুনর্বাট্টা করত না বলে,—ব্যাঙ্কগুলিও বাণিজ্যিক হুন্ডি বাট্টা করে কারবারীদের ঋণ দিত না। তাই এদেশে বিল বাজার বা বাণিজ্যিক হুন্ডির বাজারও গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে এদেশের টাকার বাজারটি একারণেও, সুগঠিত হতে পারেনি।

এই ত্রুটি দূর করার জন্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল বাজার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে বিল বাজার স্কীম প্রবর্তন করে। তবে ওই স্কীমটিকে সঠিক অর্থে বাণিজ্যিক হুন্ডির পুনর্বাট্টার পরিকল্পনা বলা যায় না। কারণ, নিয়ম ছিল, ব্যাঙ্কগুলি তাদের মক্কেলদের ৯০ দিনের মেয়াদী বাণিজ্যিক হুন্ডির ভিত্তিতে নিজেদের প্রমিসরি নোট তৈরি করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে নিয়ে এলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তা বাট্টা করবে। কাজেই ব্যবস্থাটা ছিল আসলে ব্যাঙ্কের দরকারে টাকা ধার দেবার বন্দোবস্ত। ১৯৬৩ সালে রপ্তানি বাণিজ্যিক হুন্ডি বিল বাজারের ওই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অবশেষে ১৯৭০-৭১ সালে বিল বাজারের পুরনো স্কীমটার সংশোধন করে, এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, সরকারের কাছে, সরকারী কোম্পানিগুলির কাছে ও আধা-সরকারী সংস্থাগুলির কাছে যে মাল বিক্রি করা হবে, কারবারীরা তার উপর বাণিজ্যিক হুন্ডি তৈরি করে ব্যাঙ্কের কাছে বাট্টা করার পর ব্যাঙ্কগুলি তা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে নিয়ে এলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তা পুনর্বাট্টা করবে। এর ফলে, আংশিকভাবে প্রকৃতই বিল পুনর্বাট্টা করার ব্যবস্থা সহ বিল বাজার এতদিনে চালু হল বলা যায়।

এখন পুনর্বাট্টার উপযোগী বিলের ন্যূনতম টাকার পরিমাণ কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে (আগে ছিল ১০ হাজার টাকা) এবং আরো ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, ব্যাঙ্কগুলি মোট দশ লাখ টাকার পরিমাণ পর্যন্ত বিল নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ওই বিলগুলির একটি তালিকা পেশ করলেই, তার ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বিলগুলি পুনর্বাট্টা করবে। এই সব সুবিধা দেবার ফলে এখন বিল পুনর্বাট্টার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৭৪-এর জুন মাস পর্যন্ত এক বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৭৪ কোটি টাকার বাণিজ্যিক হুন্ডি পুনর্বাট্টা করেছে। এটি হল আগের বৎসরের তুলনায় ২৫৯ কোটি টাকার বৃদ্ধি। তার আগের বৎসর পুনর্বাট্টার পরিমাণ তার আগের বৎসরের তুলনায় বেড়েছিল মাত্র ৪ কোটি টাকার মত। সুতরাং বিল বাজারটির জনপ্রিয়তা বাড়ছে বলা যায়।

বিলবাজার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে,—(ক) ব্যাঙ্কগুলি এখন বাণিজ্যিক হুন্ডি বাট্টা করায় ঋণগ্রহণকারী, অর্থাৎ কারবারীরা যে সুবিধা পাচ্ছে তা হল—(১) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ পাওয়া যায় এবং ক্যাশক্রেডিট ব্যবস্থার মত যখন তখন তা ব্যাঙ্ক ফেরত চাইতে পারে না; (২) বাট্টা বাদে বিলের পুরো টাকাই ঋণ পাওয়া যায় এবং সেজন্য কোল্যাটের‍্যাল বা সমমূল্যের জামিন লাগে না; (৩) বাজারেরও অবস্থা ও কারবারে দরকার মতো বিল বাট্টার পরিমাণ কমানো বাড়ানো যায়; এবং (৪) অন্যান্য ধরনের ব্যাঙ্ক ঋণের চেয়ে এর উপর সুদের হার কম। (খ) **ব্যাঙ্কগুলির সুবিধা হল এই যে,**—(১) মেয়াদ শেষে বিলের টাকা পাওয়া যায় বলে ব্যাঙ্ক টাকা আদায় সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে; (২) মাল বন্ধক রেখে ঋণ দেবার ঝামেলা নেই; (৩) নিজেদের দরকারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওই বিলগুলি পুনর্বাট্টা করে নিজেরা টাকা যোগাড় করতে পারে; (৪) বিল বাট্টা করা তাদের টাকা লাভজনকভাবে লগ্নী করার একটা উপায়; এবং (৫) মেয়াদ অনুযায়ী তারা বিভিন্ন বিলে এমনভাবে

টাকা লগ্নী করতে পারে যাতে তাদের মুনাফা এবং হাতে প্রয়োজনমত নগদ টাকা রাখা, এই দু'দিকই বজায় থাকে।

৭. দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ[৮] ঃ অতীত ঔপনিবেশিক ভারতে বৈদেশিক শাসনের দরুন যথাযথ শিল্প বিকাশ না ঘটায়, পুঁজির বাজার এবং টাকার বাজারও সুসংগঠিত হতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান শতকের প্রথম দশকের শেষ ভাগ থেকে ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিকাশ শুরু হয়। পরে ধীরে ধীরে আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় গড়ে উঠতে থাকলেও, সঙ্গতি ও অন্যান্য পরিপূরক অংশের অভাবে, ভারতে আধুনিক টাকার বাজার বিকশিত হতে পারে নি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণদানকারী হিসাবে শ্রেষ্ঠী, পোদ্দার, সাহুকার, মহাজন, স্রফ প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্য যুগের ইউরোপের ব্যাঙ্কারদের মত এরা প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী এবং ঋণদানকারী, উভয় রূপেই পরিচিত ছিল। অনেকে অবশ্য শুধু ঋণ দেবার কাজই করত। এরা এখনও ভারতের নানা দ্রব্যের উৎপাদন ও আদানপ্রদানে, ঋণের সংস্থান করছে। আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সাথে এদের কাজের সামঞ্জস্য না ঘটায়, এবং এদের ব্যবসায় প্রধানত পারিবারিক ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ায় এবং নিজেদের কাজে গোপনীয়তা রক্ষা এবং রক্ষণশীল মনোভাবের দরুন, আজ পর্যন্ত এরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলছে বলে আধুনিক টাকার বাজারের সাথে এরা মিশে না গিয়ে আলাদা থেকে গেছে।

ভারতের টাকার বাজারের লগ্নীপত্র ঃ ট্রেজারী বিল, স্বল্পমেয়াদী সরকারী ঋণ-পত্র বেসরকারী কোম্পানীর শেয়ার, স্টক ও ডিবেঞ্চার ও মেয়াদী কৃষিবিল ইত্যাদি, বাণিজ্যিক হুণ্ডি ইত্যাদি লগ্নীপত্রের ভিত্তিতে এদেশের টাকার বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের লেনদেন চলে।

ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য ঃ স্বাধীনতা লাভের পর নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সংস্থা স্থাপনের ফলে বর্তমানে টাকার বাজারের উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। যোগাযোগ ও টাকা স্থানান্তরের সুবিধা বৃদ্ধির ফলে টাকার বাজারের ব্যাপ্তি ঘটেছে। এর ফলে সুদের হারের আঞ্চলিক পার্থক্য কমেছে। টাকার বাজারের চাহিদা, যোগান ও লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে। টাকার বাজারের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টাকার বাজারের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছে। বিদেশী সুসংগঠিত টাকার বাজারগুলির মত এখন এখানে 'ইস্যু হাউজ', 'ডিসকাউন্ট হাউজ' ইত্যাদি টাকার বাজারের বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক অংশগুলি স্থাপিত হওয়ায় বাজারটি সুসংগঠিত হয়ে উঠছে' বিল বাজার সৃষ্টির ফলে টাকার বাজারে লগ্নীপত্রের একটি বড় অভাব দূর হয়েছে।

ডিপজিট ইনস্যুরেন্স করপোরেশন ঃ ব্যাঙ্কের ছোট ছোট আমানতকারীদের রক্ষা করার জন্য ১৯৬২ সালে ডিপজিট ইনস্যুরেন্স করপোরেশন বা আমানত বীমা করপোরেশন স্থাপিত হয়েছে। দেশের প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং রাজ্যগুলির ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটি উপযুক্ত সমবায় ব্যাঙ্ক, এই করপোরেশনের কাছে বীমাকৃত ব্যাঙ্ক বলে নিবন্ধভুক্ত হয়েছে। ১৯৭২-এর জুন মাসে এরকম বীমাকৃত বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮১ ও ৩৯১। প্রত্যেক আমানত-কারীর মোট ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আমানত এর দ্বারা বীমা করা হয়েছে। বীমাকৃত ব্যাঙ্কগুলি তাদের মোট আমানতের উপর বৎসরে শতকরা ০·০৪ ভাগ হারে বীমার প্রিমিয়াম দেয়।

---

8. Indigenous Bankers.

ঋণ ও হস্তান্তরযোগ্য দলিল
CREDIT & NEGOTIABLE INSTRUMENTS

'ক্রেডিট' বা ঋণ কাকে বলে ঃ ইংরেজী 'ক্রেডিট' কথাটার একটা মূল অর্থ হল আস্থা বা বিশ্বাস। ব্যাংক জগতে বা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ঋণের যে আদান-প্রদান চলে তার ভিত্তিও হল ওই 'আস্থা'—ভবিষ্যতে খাতক ঋণ পরিশোধ করবে বলে মহাজনের আস্থা। ভবিষ্যতে খাতকের পরিশোধক্ষমতার উপর আস্থা রেখে, ঋণ-দাতা খাতককে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহার করতে দেয় তাই হল 'ঋণ' বা 'ক্রেডিট'। সুতরাং **আর্থিক ক্ষেত্রে, ঋণ হল ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে বর্তমানে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লাভের সুবিধা।**

বাণিজ্যিক জগতে ঋণ হল, ভবিষ্যতে দাম পরিশোধের শর্তে বর্তমানে খরিদ করার সুবিধা। এখানে বিক্রেতা হল মহাজন বা ঋণদাতা, আর ক্রেতা হল খাতক। এখানেও, ক্রেতা ভবিষ্যতে দাম পরিশোধ করবে বলে বিক্রেতার মনে আস্থা থাকে বলেই ক্রেতাকে সে এই সুবিধা দেয়। কি বাণিজ্যিক ঋণ, কি আর্থিক ঋণ, দুই ক্ষেত্রেই, ভবিষ্যতে ক্রেতার পরিশোধ-ক্ষমতাই সে ঋণ পাবে কিনা, এবং পেলে, কতটা পাবে, তা ঠিক করে দেয়

ঋণের গুরুত্ব ঃ ব্যবসাজগতে, ঋণের ব্যবস্থাটা বেচাকেনার প্রক্রিয়াটাকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার বিরাট মাত্রায় কারবার পরিচালনা ঋণের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব হত। স্বল্পমেয়াদী ঋণের ইমারতই বিপুল ও জটিল আধুনিক ব্যবসা জগতকে চালু রেখেছে। পণ্য উৎপাদক ও কারখানার মালিক থেকে শুরু করে শেষতম পর্যায়ের খরিদ্দার পর্যন্ত এর বিরাট জালটি বিস্তৃত রয়েছে। তুলনামূলক ভাবে খুচরা কারবারে নগদ বেচাকেনার পরিমাণ বেশি হলেও ধারে বেচাকেনা যে চলে না, তা নয়। কিন্তু খুচরা কারবারীর সাথে পাইকারী কারবারীর, কিংবা পাইকারী কারবারীর সাথে পণ্যোৎপাদনকারীর এবং আমদানিকারীর সাথে রপ্তানিকারীর লেনদেনে ঋণ বা ক্রেডিটের ব্যবহারটাই প্রধান ভূমিকা নেয়। কারবারী জগতে ক্রেডিটের একটি উৎস কারবারীরা নিজে, কিন্তু আরেকটি এবং প্রধান উৎস হল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি।

কারবারী ঋণের প্রকারভেদ[9] ঃ (১) ব্যাংকঋণ[10], (২) বাণিজ্যিক ঋণ[11], (৩) ভোগকারী-ঋণ[12], এবং (৪) হস্তান্তর যোগ্য দলিল-ভিত্তিক বা বাণিজ্যিক লগ্নীপত্র ভিত্তিক ঋণ[13]—কারবারী ঋণ মোটামুটি এই চার রকমের।

১. ব্যাংক ঋণ ঃ নিজ পুঁজি, আমানত জমা, পরস্পরের কাছ থেকে ঋণ ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সংগৃহীত ঋণ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির যে লগ্নীযোগ্য তহবিল সৃষ্টি হয় তার একটি অংশ ব্যাংক ঋণের আকারে কারবারী সংস্থাগুলির কাছে যায় কারবারীরা একে অপরকে বেচাকেনায় যে বাণিজ্যিক ঋণ দেয় (অর্থাৎ ধারে বিক্রি করে) তা কারবারী ঋণের একটা অতি বড় অংশ হলেও, তার পিছনেও থাকে এই ব্যাংক ঋণের একটা অংশ।

কারবারের প্রয়োজনীয় স্বল্পমেয়াদী ঋণের সংস্থান ব্যাংকগুলি প্রধানত দুইভাবে করে ঃ (১) 'লোন', 'ওভারড্রাফট' ও 'ক্যাশ ক্রেডিট' মারফৎ সরাসরি ঋণ বা 'এ্যাডভান্স' দিয়ে; (২) বাণিজ্যিক হুন্ডি, দেশী হুন্ডি, প্রভৃতি 'কমার্শিয়াল পেপার' বাট্টা করে।

ব্যাঙ্ক ঋণগুলি দু'রকমের হয় ঃ (১) 'সিকিওরড ক্রেডিট'[14], অর্থাৎ ঋণের সমান মূল্যের পণ্যসামগ্রী, পণ্য সামগ্রীর মালিকানার দলিল (যথা, বিল অব লেডিং, ডক-ওয়ারেন্ট, রেল রসিদ বা আর/আর ইত্যাদি), শিল্প সংস্থার ও সরকারী লগ্নীপত্র সোনা রূপো ও স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতির বস্তুগত জামিনে[15] ঋণ অর্থাৎ তা বন্ধক[16] কিংবা দায়বন্ধ[17] রেখে। এদের 'কোল্যাটেরাল সিকিউরিটি'[18] বা সম-মূল্যের বস্তুগত

9. Forms of business credit. 10. Bank credit.
11. Trade credit or open-account credit. 12. Consumer credit.
13. Negotiable instruments or commercial paper based credit.
14. Secured credit. 15. Tangible securities. 16. Pledged.
17. Hypothecated. 18. Collateral security.

জামিন বলে। (২) 'আনসিকিওরড ক্রেডিট' বা সমমূল্যের জামিন-বিহীন ঋণ। বাণিজ্যিক হুণ্ডি, দেশী হুণ্ডি, প্রমিসরি নোট ইত্যাদি কমার্শিয়াল পেপার-এর বাট্টা করে ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ দেয় তা হল এই শ্রেণীর। এদের ক্ষেত্রে শুধু খাতকের কথার উপর ভিত্তি করে ঋণ দেওয়া হয় বলে এই জাতীয় ঋণকে 'আনসিকিওরড ক্রেডিট' বলে গণ্য করা হয়। এদেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি প্রথম শ্রেণীর ঋণই বেশি দেয়।

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে হলে, ঋণপ্রার্থীকে প্রথমে ব্যাঙ্কের সাথে কথাবার্তা বলে শর্ত ঠিক করে ঋণের সর্বোচ্চ সীমাটা স্থির করতে হয়। একে 'লাইন অব ক্রেডিট'[১৯] বলে। ঋণপ্রার্থীর প্রতিষ্ঠানের দায়বিহীন চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের অনুপাত[২০] দিয়ে নির্ধারিত হয়। সাধারণত 'লাইন অব ক্রেডিট' বা ঋণের এই সর্বোচ্চ নির্ধারিত মাত্রার প্রায় ২০ শতাংশ টাকা খাতককে ব্যাঙ্কের কাছে আমানত রূপে রাখতে হয়। এটাই রীতি

(১) **ওভারড্রাফট বা রোক ঋণ** হল ব্যাঙ্ক থেকে সাময়িকভাবে সংগৃহীত ঋণ। এই পদ্ধতিতে খাতককে তার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট থেকে জমার বেশি নির্ধারিত পরিমাণে টাকা তুলতে দেওয়া হয়। সাধারণত 'কোল্যাটের্যাল' সিকিউরিটির জামিনে ব্যাঙ্ক এই জাতীয় ঋণ দেয়। এভাবে জমার অতিরিক্ত যে টাকা তোলা হয় তার উপর সুদ দিতে হয়। (২) **'লোন'**-এর ক্ষেত্রে যত টাকা তাকে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া স্থির করে, খাতকের নামে ঋণদাতা ব্যাঙ্কে সেই টাকার 'লোন এ্যাকাউণ্ট' খোলা হয়। এই এ্যাকাউন্টের সবটা টাকা ব্যাঙ্কের খাতায় খাতকের চলতি বা কারেন্ট এ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করে, দরকার মত খাতককে তা তুলতে দেওয়া হয়। এই ঋণও কোল্যাটের্যাল সিকিউরিটির জামিনে দেওয়া হয় এবং খাতককে যত টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, তার সবটা সে তুলে নিক আর না নিক, পুরো ঋণের অঙ্কের উপর তাকে সুদ দিতে হয়। (৩) **'ক্যাশ ক্রেডিট'**-এর ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক খাতককে ঋণ স্বরূপ একটি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণ পর্যন্ত টাকা তুলতে অনুমতি দেয়। খাতক দরকার মত তা তোলে এবং যত টাকা সে এভাবে নিয়েছে তার উপর সে সুদ দেয়। যত টাকার ঋণ তাকে মঞ্জুর করা হয়েছে তার উপর সুদ দিতে হয় না। এই ঋণও 'কোল্যাটের্যাল' সিকিউরিটির জামিনে দেওয়া হয়। এটি ব্যাঙ্ক ঋণের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। (৪) হুণ্ডি প্রভৃতি 'কমার্শিয়াল পেপার' বাট্টা করে ব্যাঙ্ক যে ঋণ দেয়, আসলে সেটা হল ওই সব 'কমার্শিয়াল পেপার'-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ওইগুলির 'অঙ্কিত মূল্য' বা 'ফেস ভ্যালু'-র চেয়ে কম দামে ব্যাঙ্ক কর্তৃক তা কিনে নেওয়া। 'অঙ্কিত মূল্য' অর্থাৎ মেয়াদ শেষে যে টাকা পাওয়া যাবে ও বর্তমান দাম অর্থাৎ ব্যাঙ্ক এখন যে দামে তা কিনল, এই দুয়ের পার্থক্যটা হল 'বাট্টা', যা হল ব্যাঙ্কের লাভ। এদেশে 'বিল বাজার' চালু হওয়ার আগে এই পদ্ধতিতে বিশেষ ঋণ ব্যাঙ্কগুলি দিত না।

'টারম লোন'[২১] বা মেয়াদী ঋণ : এদেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ৩ থেকে ৭ বৎসরের মেয়াদে শিল্প সংস্থাগুলিকে যে মাঝারি মেয়াদে ঋণ দিচ্ছে তাকে (মাঝারি) মেয়াদী ঋণ বা 'টারম লোন' বলে। ১৯৫৮ সালে রি-ফিন্যান্স করপোরেশন স্থাপিত হওয়ার পর ব্যাঙ্কগুলি এই ধরনের ঋণ দিতে উৎসাহিত হয়। কারণ ব্যাঙ্কগুলি এই জাতীয় ঋণ যতটা দিত, রি-ফিন্যান্স করপোরেশনের কাছ থেকে পরে তারা ততটা টাকা ফিরে পেত। এই হল 'রি-ফিন্যান্সিং' বা যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার পুনঃ সংস্থাপন। পরে রি-ফিন্যান্সিং করপোরেশনটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় এখন ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির 'টারম লোন'এর 'রি-ফিন্যান্সিং' বা পুনঃসংস্থান করছে। এই ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কগুলির স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না বলে তারা 'টারম-লেনডিং'-এ উৎসাহিত হচ্ছে।

এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার আগে থেকেই অবশ্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে পাওয়া স্বল্প মেয়াদী ঋণকে ব্যাঙ্ক ও কারবারী সংস্থাগুলি একটি বিশেষ কৌশলে

---

19. Line of credit.
20. Ratio of free current assets to current liabilities. 21. Term loans.

মাঝারি মেয়াদের ঋণে পরিবর্তিত করে এসেছে। সেটি হল একটি ওভারড্রাফ্‌ট্‌ বা ক্যাশ ক্রেডিট-এর মত স্বল্পমেয়াদী ঋণকে পরিশোধ করে তার ছেদ না টেনে, বারবার তার নবীকরণ[22] বা 'রিনিউয়্যাল' করে কিংবা মেয়াদ বাড়িয়ে[23] দিয়ে ঋণটিকে মাঝারি ঋণে পরিণত করার কৌশল। তবে এটার মধ্যে খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকে। কখন ব্যাঙ্ক এতে রাজী হবে, কখন হবে না, তা বলা যায় না। ফলে খাতক অসুবিধায় পড়ে। বর্তমানে যে 'টারম লোন' ব্যবস্থা চালু হয়েছে তাতে এ অসুবিধা দূর হয়েছে।

২. **'ট্রেড ক্রেডিট' বা বাণিজ্যিক ঋণ ('ওপেন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট')** ঃ কারবারের প্রয়োজনীয় স্বল্প মেয়াদী ঋণের একটি বড় উৎস হল 'ট্রেড ক্রেডিট' বা বাণিজ্যিক ঋণ। সাধারণত বিক্রেতা (উৎপাদনকারী বা পাইকারী ব্যবসায়ী) ও ক্রেতার (পাইকারী ব্যবসায়ী বা খুচরা ব্যবসায়ী) মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ৩০ থেকে ৯০ দিনের মেয়াদে মাল বেচাকেনা হয়। ঐ সময়ের মধ্যে ক্রেতা মালের দাম শোধ করে দেয়। এজন্য আলাদা করে সুদ নেওয়া হয় না। বিক্রেতা মালের দাম সামান্য বাড়িয়ে সেটা পুষিয়ে নেয়। এর সুবিধা হল,—(১) এর দ্বারা কারবারীরা বিক্রি ও খরিদ্দার বাড়াতে পারে; (২) বাজারের তীব্র প্রতিযোগিতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে; এবং (৩) নগদ টাকা লেনদেনের অসুবিধা এড়াতে পারে। তবে, এজন্য বেশি চলতি পুঁজি দরকার হয় এবং মাঝে মাঝে ধারে বিক্রির পাওনা টাকা আদায় না হওয়ার দরুন লোকসানের ঝুঁকি থাকে। তাই সব কারবারীর পক্ষে এই জাতীয় ঋণ দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

৩. **'কনজিউমার ক্রেডিট' বা ভোগকারী ঋণ** ঃ বেশি দামের ও দীর্ঘকাল স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের বিক্রি বাড়ানোর জন্য ভোগকারীদের কাছে কতকগুলি কিস্তিতে দাম শোধের শর্তে তা বিক্রি করা হয়। এই জাতীয় ঋণকে ভোগকারী-ঋণ বলে। ব্যবসায়ীরা সাধারণত উৎপাদকদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক ঋণ (ট্রেড ক্রেডিট) নিয়ে অর্থাৎ বাকিতে ওই জিনিসগুলি কিনে এনে ও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিয়ে এইভাবে কিস্তিবন্দী দাম শোধের শর্তে তা ভোগকারীদের কাছে বিক্রি করে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য ১৭শ অধ্যায় (পণ্য বণ্টন প্রণালী) দ্রষ্টব্য।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল[24] ঃ যে দলিলের উল্টো পিঠে সই[25] করে এবং তা অন্যের কাছে অর্পণ করে[26] মালিক তা অপরের কাছে হস্তান্তর[27] করতে পারে, তাকে হস্তান্তর-যোগ্য দলিল বলে। এটি হল, একটি নির্দিষ্ট তারিখে, কিংবা তা উপস্থিত করে দাবি করা মাত্র অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় পরে, কোনও একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দেশ মত কিংবা দলিলটির বাহককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবার জন্য কারও লিখিত প্রতিশ্রুতি অথবা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কারও নির্দেশ। বিল বা বাণিজ্যিক হুন্ডি[28], প্রমিসরি নোট[29] ও চেক[30] হল এর দৃষ্টান্ত। এই দলিল-গুলিকে বাণিজ্যিক লগ্নীপত্র বা কমারশিয়াল পেপার-ও বলে।

বিধিবদ্ধ সরকারী নিয়ম এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই দলিলগুলি তৈরী ও হস্তান্তর করতে হয় এবং তাহলে প্রচলিত নিয়ম রীতি অনুসারে তা অবাধে একের কাছ থেকে অন্যের হাতে হস্তান্তর হয়ে থাকে।

হস্তান্তরযোগ্য দলিলগুলি নানাভাবে কারবারী লেনদেনে সাহায্য করে ঃ (১) দ্রব্য-সামগ্রীর বেচাকেনায় টাকার পরিবর্তে[31] এইগুলি ব্যবহার করা হয়। ফলে নগদ টাকার প্রয়োজন কমে; (২) লেনদেনের পরিমাণ বাড়ে; এবং (৩) এদের দ্বারা দ্রুত দেনাপাওনার নিষ্পত্তি করা যায়।

১. **বাণিজ্যিক হুন্ডি** ঃ "বাণিজ্যিক হুন্ডি হল হুন্ডিকার[32] দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কিংবা ওই ব্যক্তির আদেশমত কিংবা হুন্ডির বাহককে দাবি করা মাত্র অথবা নির্দিষ্ট কাল পরে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার জন্য একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির

22. Renewal. 23. Extension. 24. Negotiable Instruments.
25. Endorsement. 26. Delivery. 27. Transfer. 28. Bill of Exchange.
29. Promissory Note. 30. Cheque. 31. Substitute. 32. Drawer.

উপর শর্তহীন লিখিত আদেশ।" ভারতীয় হস্তান্তরযোগ্য দলিল অনুযায়ী বাণিজ্যিক হুণ্ডির এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে **বাণিজ্যিক হুণ্ডির** যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় তা হল: (১) বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে তিনটি পক্ষ থাকে (ক) হুণ্ডিকার অর্থাৎ হুণ্ডিটি তৈরি করে; ধারে মাল বিক্রি করেছে বলে সে হল পাওনাদার[৩৩]। (খ) যার উপর টাকা দেবার আদেশটি অর্থাৎ যাকে উদ্দেশ্য করে আদেশটি দেওয়া হয়েছে সে হল হুণ্ডি গ্রাহক[৩৪]: বাকিতে মাল কিনেছে বলে সে হল দেনাদার[৩৫]; এবং (গ) যাকে বা যার আদেশ মত টাকাটা দিতে বলা হয়েছে, সে হল প্রাপক[৩৬]। (২) এটি অবশ্যই লিখিত আদেশ হবে। (৩) আদেশটি শর্তহীন হতে হবে। (৪) এতে আদেশদাতা বা হুণ্ডিকারের সই থাকবে। (৫) আদেশটি যার উপর দেওয়া হয়েছে তাকে যেন নির্ণয় করা যায়। (৬) এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবার আদেশ হওয়া চাই। (৭) চাওয়া মাত্র বা নির্দিষ্ট কাল পরে টাকাটা দিতে হবে। (৮) যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাকে বা বাহককে টাকাটা দিতে হবে। দেনদার অর্থাৎ হুণ্ডি গ্রাহক এটি গ্রহণ বা স্বীকার করলে এটি সম্পূর্ণ হয়।

বাণিজ্যিক হুণ্ডির সুবিধা হল: (১) এটি ঋণের প্রত্যক্ষ এবং সন্দেহাতীত প্রমাণ পত্র। (২) বাণিজ্যিক হুণ্ডি করবারীদের মধ্যে (পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) বাকীতে বেচাকেনার সুযোগ দিয়ে ঋণের সম্প্রসারণে সাহায্য করে। (৩) মেয়াদ পার হওয়ার আগেই প্রয়োজন হলে, হুণ্ডিকার এটা বাট্টা করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে বলে, এটা নগদ টাকার সামিল বলে গণ্য হয়। (৪) হুণ্ডিকার পাওনাদারকে নগদ টাকা না দিয়ে তার কাছে যে হুণ্ডি আছে তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এইভাবে একই হুণ্ডি, একের পর এক দেনদার ও পাওনাদারের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়ে, বিনা নগদে দেনাপাওনার নিষ্পত্তি করতে পারে। (৫) শুধু অভ্যন্তরীণ নয়, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়েও বাণিজ্যিক হুণ্ডির যথেষ্ট ব্যবহার হয়। তা আন্তর্জাতিক পণ্যের লেনদেন ও টাকার বাজারকে খুবই সাহায্য করে। (৬) এর দ্বারা, বিনা নগদে ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পণ্যের অধিকার পায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে পণ্য বিক্রি করে দাম শোধ করার সুযোগ পায়। (৭) উপযোজক হুণ্ডির[৩৭] সাহায্যে ব্যবসায়ীরা স্বল্প সময়ের জন্য ঋণের সংস্থান করতে পারে।

হুণ্ডির শ্রেণীবিভাগ: বাণিজ্যিক হুণ্ডি দুরকমের: **অভ্যন্তরীণ হুণ্ডি**[৩৮] ও **বৈদেশিক হুণ্ডি**[৩৯]। যে হুণ্ডির হুণ্ডিকার, গ্রাহক ও প্রাপক একই দেশের অধিবাসী এবং ওই দেশের মধ্যে যার টাকা দিতে হবে, তা হল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক হুণ্ডি। যে হুণ্ডির হুণ্ডিকার, গ্রাহক ও প্রাপক এক দেশের অধিবাসী নয়, এবং যার দ্বারা একাধিক দেশের মধ্যে টাকার লেনদেন ঘটে, তা হল বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডি।

বিভিন্ন প্রকারের হুণ্ডি: (ক) দলিলী হুণ্ডি[৪০]: যে হুণ্ডির সাথে পণ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল যথা, জাহাজের বহনপত্র বা পণ্য চালানী রসিদ[৪১], চালান, বীমাপত্র প্রভৃতি সংযুক্ত থাকে তাকে দলিলী দায়বিল বা হুণ্ডি বলে। **(খ) উপযোজক হুণ্ডি**[৪২]: অর্থের প্রয়োজনে দুজন ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে, একে অপরের উপর হুণ্ডি কাটে ও তার বাট্টা করে কারবারের প্রয়োজনে টাকা যোগাড় করে। পরে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তা পরিশোধ করে দেয়। এজাতীয় হুণ্ডিকে উপযোজক হুণ্ডি বলে। দুজনে মিলে একটি হুণ্ডির দ্বারা টাকা যোগাড় করে চুক্তিমত তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করতে পারে; অথবা, উভয়ে পরস্পরের উপর দুটি এরূপ হুণ্ডি কাটতে পারে। এ হুণ্ডির পিছনে পণ্যের কোন প্রকৃত লেনদেন থাকে না। **(গ) সাদা হুণ্ডি**[৪৩]: যে সব বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডির সাথে কোন দলিল সংযুক্ত থাকে না, তাই সাদা হুণ্ডি নামে পরিচিত।

---

33. Creditor. 34. Drawee. 35. Debtor. 36. Payee.
37. Accommodation Bill. 38. Inland Bill of Exchange.
39. Foreign Bill of Exchange. 40. Documentary Bill.
41. Bill of Lading. 42. Accommodation Bill. 43. Clean Bill.

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক হুণ্ডির নমুনা

২. চেক ঃ

"চেক হল দাবি করা মাত্র টাকা দেবার জন্য কোনও ব্যাঙ্কের উপর কাটা বাণিজ্যিক হুণ্ডি"। এই হল ভারতীয় হস্তান্তরযোগ্য আইনে চেকের সংজ্ঞা। চেকের সংজ্ঞা হিসেবে

STAMP

No. 4395
Rs 5000·00

Calcutta, July 27, 1961

One month after date pay H. Ray or order the sum of Rupees five thousand (Rs. 5000·00) only for value received.

To
M/s Sen & Co.
Mahatma Gandhi Road.
Kanpur

Accepted
Sen & Co.
3.7.61

P. Chowdhury

এটি যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। তাই বলা যেতে পারে, ব্যাঙ্কের কাছে দাবি অর্থাৎ উপস্থিত করা মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উল্লিখিত ব্যক্তিকে বা তার নির্দেশ মত কিংবা বাহককে দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের মক্কেল বা আমানতকারী কোনও ব্যাঙ্কের উপর যে শর্তহীন লিখিত আদেশ দেয়, তাই হল চেক।

চেকের বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ (১) এটি একটি লিখিত আদেশ। (২) আদেশটি শর্তহীন। (৩) ব্যাঙ্কের মক্কেল বা আমানতকারী হল চেকদাতা। (৪) আদেশটি দেওয়া হয় ব্যাঙ্ক-কে: ব্যাঙ্ক হল চেক গ্রহীতা। (৫) আদেশটি হল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবার। (৬) টাকাটা দাবি করা মাত্র দিতে হয়। (৭) টাকাটা দিতে হয় চেকে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাকে বা তার আদেশমত, কিংবা বাহককে। চেক সাধারণত তিন প্রকারের হয়। যথা, সাধারণ বা বাহক চেক[44], উল্লিখিত ব্যক্তি অথবা তার আদিষ্ট চেক[45] এবং আড়ি চেক[46]।

বেয়ারার চেক অথবা বাহক চেক ঃ যে চেকের টাকা বাহককে বা ধারককে দেওয়ার আদেশ থাকে তা হল বাহক চেক। একে ওপেন চেক বা খোলা চেক[47]ও বলে।

আদেশবহ চেক ঃ যে চেকের টাকা উল্লিখিত ব্যক্তি অথবা তার নির্দেশিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেহকে দেওয়া যায় না, তা হল আদেশবহ চেক বা অর্ডার চেক।

44. Cheque payable to a bearer.
45. Cheque payable to order.
46. Crossed cheque.
47. Open cheque.

ক্রসড্ চেক অথবা আড়ি চেক : যে চেকের টাকা ব্যাঙ্কের কাউন্টারে নগদে, হাতে হাতে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র কোন ব্যাঙ্কের মারফত তার টাকা দেওয়ার আদেশ
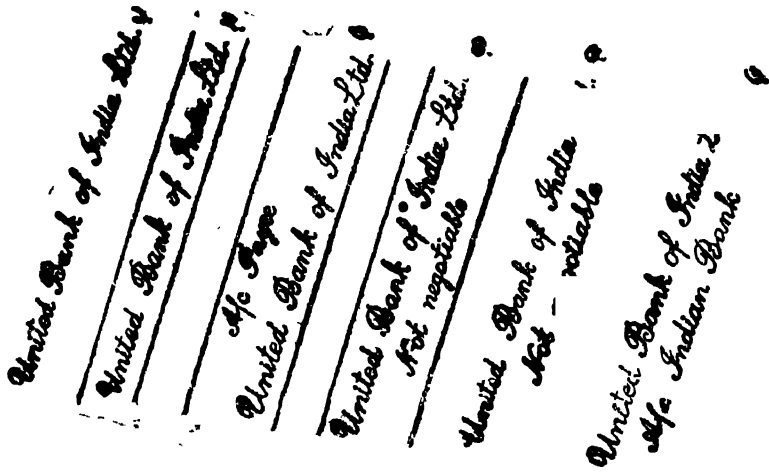
থাকে, তা হল ক্রসড্ চেক বা আড়ি চেক। এই জাতীয় চেকের উপর ভাবে দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে দেওয়া হয় বলে একে ক্রসড্ চেক বা আড়ি চেক বলে।

স্টেল চেক বা বাসি চেক[৪৮] **:** সেভিংস ও ক্যারেন্ট একাউন্টের চেক যথাক্রমে ছয়মাস ও তিনমাস বৈধ থাকে। যে চেকের তারিখ ঐ সময়রেখা পার হয়ে গেছে তা হল বাসি চেক।

ভবিষ্যদেয় চেক[৪৯] **:** যে চেক বর্তমান তারিখে লিখিত হলেও, তাতে কোন একটি পরবর্তী তারিখ উল্লিখিত হয়, তা হল ভবিষ্যদেয় চেক। ঐ তারিখের আগে এই চেক ভাঙান যায় না।

ফেরতা চেক[৫০] **:** উল্লিখিত তারিখ, টাকার পরিমাণ, আমানতকারীর সই ইত্যাদিতে কোন ভুল থাকলে অথবা ব্যাঙ্কের আমানকারীর হিসাবে, চেকের টাকা প্রদানের উপযুক্ত টাকা না থাকলে ব্যাঙ্ক ঐ চেক ফেরত দেয়। একে ফেরতা চেক বলে।

ক্রসিং বা আড়ি চিহ্ন দেওয়া : ক্রসড্ চেক-এ দু'রকমের ক্রসিং-এর ব্যবস্থা আছে। একটি হল সাধারণ ক্রসিং। চেকের উপরে মাত্র আড়াআড়িভাবে টানা দুটি সামান্তরাল রেখা থাকলে, তাকে সাধারণ ক্রসিং বলে। এ চেক প্রাপকের অথবা তার উল্লিখিত কোন ব্যাঙ্ক মারফত ভাঙাতে হয়। অপর শ্রেণীর ক্রসিংকে স্পেশ্যাল ক্রসিং বা বিশেষ ক্রসিং বলা হয়; এরূপ ক্রসড্ চেক-এর টাকা উল্লিখিত ব্যাঙ্ক মারফত এবং উল্লিখিত প্রাপক ছাড়া আর কোনরূপে এবং অন্য কাহাকেও প্রদেয় নয়। উপরে সাধারণ ও বিশেষ ক্রসিং-এর নমুনা দেখান হল।

হস্তান্তরযোগ্য নয়[৫১] **:** সাধারণ অথবা বিশেষ ক্রসড্ চেকে অনেক সময়ে এই দুটি শব্দ লেখা হয়। এর দ্বারা কিন্তু চেকের হস্তান্তরযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয় না। আইন-সংগত ধারক-ই চেকের অধিকারী হয়। কিন্তু এই দুটি শব্দসংযুক্ত চেকের ধারক, আইনসংগতভাবে তা পেলেও, যদি ঐ চেকদাতার স্বত্বে ত্রুটি[৫২] থাকে বা বে-আইনীভাবে চেকদাতা সে চেকের অধিকারী হয়ে থাকে, তা হলে আইনানুযায়ী, ঐ চেকে ধারকের কোন বৈধস্বত্ব নেই বলে গণ্য করা হয়। এই জাতীয় চেকের ধারক যাতে এটি নেবার আগে দাতার আইনসংগত অধিকার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়, সেজন্য হুঁশিয়ার করা ও ধারকের বৈধস্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই এই শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়।

---

48. Stale cheque. 49. Post dated cheque.
50. Dishonoured or Returned cheque. 51. Not negotiable crossing.
52. Defective title of the transferer.

এন্‌ডোর্সমেন্ট বা স্বত্বান্তকরণ : চেক, হুন্ডি প্রভৃতির কোন ধারক তার উল্টো-পিঠে অপর কোন প্রাপককে ওই টাকা দেওয়ার জন্য সই করে নির্দেশ দিলে তাকে স্বত্বান্তরকরণ বলে। স্বত্বান্তরকরণ নানা প্রকারের হতে পারে, এখানে তার মধ্যে তিনটির উল্লেখ করা হল। (ক) **জেনারেল এন্‌ডোর্সমেন্ট বা সাধারণ স্বত্বান্তরকরণ :** এতে স্বত্বান্তরকারী, অর্থাৎ ধারক শুধু উল্টোপিঠে সই করে। (খ) **স্পেশ্যাল এন্‌ডোর্সমেন্ট বা বিশেষ স্বত্বান্তরকরণ :** এতে স্বত্বান্তরকারী[53] প্রাপকের নাম উল্লেখ করে এবং তার নির্দেশ মত টাকা দেওয়ার লিখিত আদেশ দেয়। (গ) **রেস্ট্রিক্‌টিভ এনডোর্সমেন্ট বা সীমায়িত স্বত্বান্তরকরণ :** এই জাতীয় স্বত্বান্তরকরণের ক্ষেত্রে, স্বত্বান্তরকারীর উল্লিখিত প্রাপক ছাড়া আর কারও কাছে চেক বা হুন্ডির স্বত্বান্তর বৈধ বলে গণ্য হয় না।

যে চেক বা হুন্ডির স্বত্বান্তর করে তাকে স্বত্বান্তরকারী এবং যাকে স্বত্বান্তর করা হয়, তাকে স্বত্বগ্রহীতা[54] বলে।

৩. **প্রমিসরি নোট বা হ্যান্ডনোট অথবা প্রত্যর্থ পত্র :** হ্যান্ডনোট হল কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত, উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে, বা দাবিকরামাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার জন্য শর্তহীন অঙ্গীকারপত্র। নিচে এর নমুনা দেওয়া হল।

Rs. 1000.00 P.

Stamp

Bombay, June 15, 2961

Three months after date I promise to day Mr. X or order the sum of Rupees One thousand for value received.

Y

চেক ও প্রমিসরি নোটের পার্থক্য : (১) চেকদাতা, চেক গ্রাহক এবং প্রাপক, চেক-এ এই তিন পক্ষ থাকতে পারে। কিন্তু হ্যান্ডনোটে হ্যান্ডনোটদাতা[55] অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা এবং মহাজন[56] বা ঋণদাতা এই দুই পক্ষ থাকে। (২) চেক হল ব্যাঙ্কের উপর (অর্থাৎ ঋণ-গ্রহীতার উপর) আমানতকারীর (অর্থাৎ ঋণদাতার) লিখিত আদেশ। কিন্তু হ্যান্ডনোট হল ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে লিখিত, ঋণপরিশোধের লিখিত প্রতিশ্রুতি। (৩) চেকের টাকা দাবিকরামাত্র দেয়। কিন্তু হ্যান্ডনোটে দাবিকরামাত্র টাকা দেওয়া হবে একথা লেখা না থাকলে সাধারণত তা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে দেওয়া হয়।

চেক ও বাণিজ্যিক হুন্ডির মধ্যে পার্থক্য : (১) দুটিই শর্তহীন আদেশপত্র। কিন্তু চেক হল আমানতকারী কর্তৃক কোন ব্যাঙ্কের উপর আদেশ, আর বাণিজ্যিক হুন্ডি হল, পাওনাদার-কারবারী কর্তৃক দেনদার-কারবারীর উপর আদেশ। (২) চেকের ক্ষেত্রে দেনদারের (অর্থাৎ ব্যাঙ্কের) কোন স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাণিজ্যিক হুন্ডির বেলায় হুন্ডি গ্রাহকের (অর্থাৎ দেনদারের) স্বীকৃতি দরকার। (৩) চেকে কোন স্ট্যাম্প লাগে না। কিন্তু উপযুক্ত স্ট্যাম্প না লাগানো থাকলে, বাণিজ্যিক হুন্ডি হস্তান্তরযোগ্য দলিলে পরিণত হয় না। (৪) চেক ফেরত দিলে[57] ব্যাঙ্কের পক্ষে ফেরত নোটিস বাধ্যতামূলক। বাণিজ্যিক হুন্ডি ফেরত হলে, এরকম কোন নোটিস লাগে না। (৫) চেকের বাট্টা হয় না, কিন্তু বাট্টার সুবিধা বাণিজ্যিক হুন্ডির একটি প্রধান আকর্ষণ। (৬) বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুন্ডি ৩/৪ প্রস্থ প্রস্তুত করা হয় কিন্তু চেক মাত্র এক প্রস্থই হয়। (৭) নির্দিষ্ট সময়মত বাণিজ্যিক হুন্ডি উপস্থিত না করা হলে, হুন্ডিগ্রাহক তার টাকা দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু চেকের বেলায় এ কথা খাটে না। (৮) চেকের টাকা দাবিকরা-

53. Endorser. 54. Endorsee.
55. Maker. 56. Creditor. 57. Dishonour.

মাত্র দিতে হয়; কিন্তু বাণিজ্যিক হুণ্ডি-র টাকা দাবিকরামাত্র প্রদেয় অথবা মেয়াদী, দুরকমই হতে পারে।

বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও হ্যাণ্ডনোট বা প্রমিসরি নোটের পার্থক্য : (১) বাণিজ্যিক হুণ্ডি হল পাওনাদার কর্তৃক দেনদারের উপর লিখিত আদেশ; কিন্তু হ্যাণ্ডনোট হল পাওনাদারের কাছে লেখা দেনদারের প্রতিশ্রুতি। (২) বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে হুণ্ডিকার, গ্রাহক এবং প্রাপক এই তিন পক্ষ থাকে; কিন্তু হ্যাণ্ডনোটে অঙ্গীকারকারী অর্থাৎ দেনদার ও অঙ্গীকার-প্রাপক, অর্থাৎ পাওনাদার, এই দুই পক্ষ থাকে। (৩) বাণিজ্যিক হুণ্ডির স্বীকৃতি[৫৮] প্রয়োজন, কিন্তু হ্যাণ্ডনোটে কোন স্বীকৃতি লাগে না। (৪) বাণিজ্যিক হুণ্ডির ফেরত হলে নিয়মানুযায়ী আপত্তি জানানো আবশ্যক; কিন্তু হ্যাণ্ডনোটে এরূপ কোন প্রয়োজন নেই। (৫) একাধিক ব্যক্তি বাণিজ্যিক হুণ্ডিগ্রাহক[৫৯] হলে, তারা যৌথভাবে সেজন্য দায়বদ্ধ থাকে; কিন্তু একাধিক ব্যক্তি হ্যাণ্ডনোটের অঙ্গীকারকারী হলে তারা সেজন্য যৌথ এবং ব্যক্তিগত, দুরকমভাবেই দায়বদ্ধ হয়।

নোটিং (নিকরাই) : বাণিজ্যিক হুণ্ডি ফেরত[৬০] হলে, নিয়ম আছে যে, তার ধারক হুণ্ডিটি একজন নির্দিষ্ট সরকারী কর্মচারীর কাছে নিয়ে গিয়ে ঘটনাটি তার দ্বারা লিপিবদ্ধ করাবেন। এই কাজকে নিকরাই এবং তার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে লেখা প্রমাণক[৬১] বলে। হুণ্ডি ফেরত হলে তার গ্রাহকের[৬২] আইনমাফিক আপত্তি[৬৩] জানাবার প্রস্তুতির কাজ হিসাবে নোটিং-এর প্রয়োজন আছে; এজন্য নোটারী পাবলিক বা লেখা প্রমাণককে নির্দিষ্ট দর্শনী দিতে হয়। একে নিকরাই খরচা বলে। এটা প্রথমে হুণ্ডির ধারক দিলেও, পরে হুণ্ডির গ্রাহকের কাছ থেকে তা আদায় করা হয়।

ব্যাংকারদের নিকাশঘর (BANKERS' CLEARING HOUSE)

প্রতিদিন প্রত্যেকটি ব্যাংকে তার আমানতকারীদের কাছ থেকে অন্যান্য ব্যাংকের উপর কাটা চেক জমা পড়ে। এই চেকগুলি আমানতকারীরা তাদের দেনদারদের কাছ থেকে পেয়েছে এবং চেকের টাকা আদায়ের জন্য আমানতকারীরা ব্যাংকে নিজেদের এ্যাকাউন্টে জমা দেয়। ফলে প্রতিদিন ব্যাংকগুলির কাছে পরস্পরের উপর কাটা লক্ষ লক্ষ টাকার চেক জমা পড়ে এবং পরস্পরের কাছ থেকে সেসব চেকের টাকা আদায় করতে হয়। এ কাজটা সহজে নিষ্পন্ন করার জন্য প্রতিদিন কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি প্রভৃতি বড় বড় শহরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত ব্যাংকের প্রতিনিধিরা পরস্পরের উপর কাটা চেকগুলি এবং ওই চেকের তালিকা ও মোট টাকার অঙ্কের হিসাব নিয়ে হাজির হয়। তারপর পরস্পরের দেনা পাওনার হিসেব করে যার নীট দেনা দাঁড়ায় সে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাংকের উপর চেক কেটে দেনা শোধ করে। পাওনাদার ব্যাংক তখন ঐ চেকটি রিজার্ভ ব্যাংক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তার আমানতী হিসাবে জমা দেয়। এই স্থানটিকে ব্যাংকারদের নিকাশঘর বলে। কলকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বড় শহরে রিজার্ভ ব্যাংক নিকাশঘর পরিচালনা করে।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

২৪ দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থান

1. **What services may the Stock Exchanges render towards the economic development of a country? Give a brief outline of the organisational set-up of the Calcutta Stock Exchange. [C. U. 1964]**
   [কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে শেয়ার বাজার কিরূপে সাহায্য করতে পারে?] কলকাতা শেয়ার বাজারের সাংগঠনিক ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]
   উঃ ৪১৪-১৫, ৪১৮-১৯ পৃঃ
2. **What part a Stock Exchange plays in financing of business? How does an Exchange operate? [C. U. 1965]**
   [কারবারের অর্থসংস্থানে শেয়ার বাজারের ভূমিকা কি? শেয়ার বাজার কিভাবে কাজ করে?]
   উঃ ৪১৪-১৫, ৪১৭-১৮ পৃঃ

---

58. Acceptance. 59. Acceptor. 60. Dishonoured.
61. Notary Public. 62. Acceptor. 63. Protest.

3. What is an Investment Trust? Outline the functions of the Unit Trust of India recently established by the Government of India. [C. U. 1964]
[ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট কাকে বলে? ভারত সরকার দ্বারা সম্প্রতি স্থাপিত ভারতের ইউনিট ট্রাস্টের কার্যাবলীর পরিচয় দাও।] উঃ ৪০৩-৪, ৪০৬-৭ পৃঃ
4. What do you understand by the Capital Market of a country? Give a brief account of the composition of the capital market in India. [B. U. 1965]
[কোনও দেশের পুঁজির বাজার বলতে তুমি কি বোঝ? ভারতে পুঁজির বাজারের গঠনের পরিচয় দাও।] উঃ ৪০১-২, ৪১৩-১৪ পৃঃ
5. Discuss the role played by stock-exchanges towards economic development. [C. U. 1966]
[অর্থনৈতিক উন্নতিতে শেয়ার বাজারের ভূমিকা আলোচনা কর।] উঃ ৪১৪-১৫ পৃঃ
6. Write short notes on: (a) Contango; (b) Backwardation; (c) Bulls and Bears; (d) Arbitrage; (e) Futures Markets; (f) Investment Trust.
[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ—(ক) কন্ট্যাঙ্গো; (খ) ব্যাকওয়ার্ডেশন বা হরজানা; (গ) তেজী ও মন্দীওয়ালা; (ঘ) আর্বিট্রেজ বা পণ্য চালানী কারবার; (ঙ) আগাম লেনদেনের বাজার; (চ) ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট।] উঃ পরিশিষ্ট দেখ।
7. Describe the functions of the Calcutta Stock Exchange. [C. U. 1969]
[কলকাতা শেয়ার বাজারের কার্যাবলী বর্ণনা কর।] উঃ ৪১৮-১৯ পৃঃ
8. What is the part played by a Stock Exchange in the economic development of a country? Describe the organisation of any stock exchange in India. [C. U. 1971]
[দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা কী? ভারতের যে কোনও একটি স্টক এক্সচেঞ্জের সংগঠন বর্ণনা কর।] উঃ ৪১৪-১৫, ৪১৮-১৯ পৃঃ
9. Discuss the Organisation of any Indian Stock Exchange. [C. U. 1974]
[যে কোনও একটি ভারতীয় স্টক এক্সচেঞ্জের সংগঠন আলোচনা কর।]
উঃ ৪১৮-১৯ পৃঃ
10. Write short notes on:
(a) Stock Exchange. [C. U. 1973]
(b) Unit Trust. [C. U. 1970]
[(ক) স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ। (খ) ইউনিট ট্রাস্ট সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।] উঃ ৪১৪-১৫, ৪০৪, ৪০৬-৭ পৃঃ
11. "Capital market has substantially changed in recent years in India." Explain. [C. U. 1970]
["ভারতে সম্প্রতি কয়েক বৎসরে পুঁজির বাজারে সর্বশেষ পরিবর্তন ঘটেছে।" ব্যাখ্যা কর।]
উঃ ৪১৩-১৪ পৃঃ
12. In what respects are the Stock Exchanges useful to investors, companies and society? Analyse the economic functions discharged by a stock Exchange. [C.U. B.Com. Hons. 1974]
[কোন্ কোন্ বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের কাছে, কোম্পানীগুলির কাছে ও সমাজের কাছে স্টক এক্সচেঞ্জগুলি কাজে লাগে? স্টক এক্সচেঞ্জের অর্থনৈতিক কাজগুলি বিশ্লেষণ কর।]
উঃ ৪১৪-১৫ পৃঃ

২৫ স্বল্পমেয়াদী অর্থসংস্থান

1. "Commercial Banks are necessary for the development of a country's trade." Discuss. [C. U 1965]
["একটি দেশের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের প্রয়োজন আছে।"—আলোচনা কর।] উঃ ৪৩০-৩১, ৪৩৪-৩৬ পৃঃ
2. Write short note on: Money Market. [C.U. 1966 '72]
[টাকার বাজার সম্পর্কে টীকা লিখ।] উঃ ৪২৮-২৯ পৃঃ
3. Explain the functions of the Commercial Banks in helping trade and industry. How such a Bank raises its funds? [C. U. Hons. 1968]
[ব্যবসায় ও শিল্পে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা কর। এরকম একটি ব্যাঙ্ক কিভাবে উহার অর্থ সংগ্রহ করে?] উঃ ৪৩৪-৩৬ পৃঃ

নবম খণ্ড বীমা
INSURANCE

অধ্যায়

২৬

ঝুঁকি ও বীমা—জীবন বীমা
RISK & INSURANCE—LIFE INSURANCE

বীমার প্রকৃতি[1] : কারবারের সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বদাই নানারকমের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এ হল কারবারের ঝুঁকি। কারখানাতে আগুন লাগতে পারে, গুদামে চুরি হতে পারে কোনও কর্মচারী তহবিল তছরূপ করতে পারে আমদানী বা রপ্তানি পণ্য মাঝপথে জাহাজডুবিতে নষ্ট হতে পারে। ক্ষতির এই সম্ভাবনা থেকে ঝুঁকি থেকে কারবারে অনিশ্চয়তার উৎপত্তি হয়। এই অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি দূর করার জন্য বীমার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আশঙ্কিত বিপদ ঘটলে ও আর্থিক ক্ষতি হলে বীমাকারী[2] বীমাগ্রহীতার ঐ ক্ষতিপূরণ করে। এইভাবে বীমার সাহায্যে কারবারের সম্ভাব্য ক্ষতি দূর করা সম্ভব হয়। এজন্যই কারবারী জগতে বীমা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তবে একথা মনে রাখতে হবে বীমা দ্বারা কিন্তু ঝুঁকি বা ক্ষতির সম্ভাবনা বন্ধ করা যায় না। বীমা করার পরও তা থাকে। তবে বীমার দ্বারা অনিশ্চিত ক্ষতির সুনিশ্চিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যায়।

আশংকিত ক্ষতি হলে বীমাকারী বীমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা দেয় তা সে বীমাগ্রহীতাদের কাছ থেকে প্রিমিয়াম বা চাঁদা হিসাবে সংগৃহীত টাকা থেকেই দেয়। অসংখ্য বীমাগ্রহীতাদের কাছ থেকে বীমাকারী প্রিমিয়াম আদায় করে একটি বিপুল আর্থিক তহবিল সৃষ্টি করে। যারা বীমা গ্রহণ করে তাদের সকলেরই বিপদ ঘটে ও আর্থিক ক্ষতি হয় তা নয়। যাদের ক্ষতি হয় শুধু তারাই ক্ষতিপূরণ পায়। সুতরাং ক্ষতিগ্রস্তের সমগ্র ক্ষতি নিজেরা বহন না করে সমস্ত বীমাগ্রহীতারা একত্রে ঐ ক্ষতি বহন করে। এবং প্রত্যেক বীমাগ্রহীতাই সামান্য প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সম্ভাব্য ক্ষতির দরুণ ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা পায়। এজন্য বলা হয় যে বীমার দ্বারা একের কারবারী ঝুঁকি বহুর মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে।[3] এই হল বীমার মূল প্রকৃতি।

বীমার প্রকারভেদ : বীমা মূলতঃ তিন রকমের : (১) জীবন বীমা[4]। (২) সাধারণ বা সম্পত্তি বীমা[5]। (৩) সামাজিক বীমা[6]।

জীবন বীমার দ্বারা মানুষ নিজের ও পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। সাধারণ বা সম্পত্তি বীমা বলতে নৌবীমা অগ্নিবীমা অপহরণ বীমা মোটর দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি বোঝায় এবং এদের দ্বারা মানুষ সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। সামাজিক বীমা বলতে কর্মহীনতা কার্যকালে দুর্ঘটনা বৃদ্ধ বয়সের উপার্জনে অক্ষমতা অসুস্থতা ইত্যাদির আর্থিক প্রতিকারের বীমা বোঝায়।

বীমার গুরুত্ব : (১) পণ্যের উৎপাদন এবং বণ্টন অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় অত্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়। এই সব অনিশ্চয়তার ফলে কারবারীর লোকসান ও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা সর্বদাই রয়েছে। এই হল কারবারী ঝুঁকি। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিক ব্যবস্থায় প্রতিনিয়তই নানান ঝুঁকি উৎপত্তি হচ্ছে। যে উপায়ের দ্বারা এইসব ঝুঁকির অনেকগুলি দূর করা কিম্বা অন্ততঃ হ্রাস করা সম্ভব

1 Nature of Insurance 2 Insurer
3 'Insurance is the spreading of business risk' 4 Life Insurance
5 General or Property Insurance 6 Social Insurance

হয়, বীমা হল তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। (২) বীমার দ্বারা কারবারী ঝুঁকি হ্রাসের ফলে কারবারের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বাড়ে এবং সম্প্রসারণ সম্ভব হয়। (৩) জীবন বীমা মানুষের পারিবারিক জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা আনে, সামাজিক বীমা শ্রমিক কর্মীদের কাজের ও আয়ের নিশ্চয়তা দেয়। (৪) বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজে মানুষের সঞ্চয় সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তি ও কারবারী সংস্থাগুলির সে সঞ্চয় বীমা সংস্থাগুলির মারফৎ একত্রিত হয়ে একটি বিপুল সঞ্চয় তহবিলের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বীমা সমাজে সঞ্চয়ে উৎসাহ দেয়, বাড়ায়; (৫) বীমা সংস্থার মারফৎ সমাজের সংগৃহীত সঞ্চয় লাভজনকভাবে উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগ করা হয়। সুতরাং বীমা সমাজের পুঁজি গঠনের কাজেও সাহায্য করে। (৬) বীমা ব্যবস্থা নিজে একটি আলাদা লাভজনক কারবারে পরিণত হয়েছে। কারবারী সংস্থা রূপে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে।

সুতরাং ব্যক্তি, পরিবার, কারবার ও সমাজ বীমার দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। ব্যক্তি ও সমাজজীবন এবং কারবারে বীমা ব্যবস্থা নিরাপত্তা এনে দিয়ে পণ্যের ও সেবার উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগে নিরবচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আধুনিক জগতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বীমাযোগ্য ঝুঁকি[৭] : বীমা হল ঝুঁকি গ্রহণের কারবার। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, বীমার দ্বারা যে কোনও রকমের ঝুঁকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যে কোনও একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকির বীমা করা যাবে কিনা তা নির্ভর করে এই পাঁচটি বিষয়ের উপর : (১) কারবারের সাধারণ কাজকর্মের ধরনধারণ থেকেই ঝুঁকিটির উৎপত্তি হওয়া চাই, তা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হলে বীমা যোগ্য হবে না। (২) ঝুঁকিটি এমন হওয়া চাই যে তা বহু ক্ষেত্রেই বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে, তা না হলে সামান্য খরচে তা বহুজনের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হবে না। (৩) ঝুঁকির মোট আর্থিক বোঝাটা মোটামুটি ন্যায্যভাবে পরিমাপযোগ্য হওয়া চাই। (৪) যে পক্ষ ঝুঁকিটি বীমা করতে চায়, তার ওই ঝুঁকিটি পরিহার করার বিষয়ে প্রকৃত স্বার্থ বা আগ্রহের কারণ থাকা চাই এবং তা নগণ্য হলে চলবে না। এবং (৫) ঝুঁকিটা কখন ঘটবে তাব সময়টা সম্পর্কে কিংবা ঝুঁকিটা আদৌ দেখা দেবে কিনা তা নিয়ে খানিকটা অনিশ্চয়তা[৮] চাই।

বীমার মূল নীতি[৯] : জীবনবীমা কিংবা নৌবীমা, অগ্নিবীমা, দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতি নানা ধরনের কারবারী বীমাই হোক, সমস্ত বীমারই ভিত্তি হিসাবে কতকগুলি মূলনীতি রয়েছে, দেখতে পাওয়া যায়। তা হল : (১) **চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস**[১০]—(ক) কাকে বলে—সমস্ত বীমা চুক্তিই চূড়ান্ত বিশ্বাস-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এর উপর বীমা চুক্তির বৈধতা নির্ভর করে। চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের অর্থ হল, বীমা চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষরা একে অন্যের কাছে অকপটে বীমার বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্ত তথ্য প্রকাশ করবে এবং তা প্রকাশ করতে তারা আইনত বাধ্য। (খ) অকপটে তথ্য প্রকাশের দায় বীমা গ্রহীতার বীমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বীমা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য জানা আছে ধরে নেওয়া হয় বলে, সমস্ত তথ্য অকপটে প্রকাশের দায়টা তার উপরই থাকে। তা প্রকাশ করা না হলে, বীমাকারীর পক্ষে সঠিকভাবে ঝুঁকির পরিমাপ করা ও প্রিমিয়াম স্থির করা সম্ভব নয়। (গ) অকপটে যাবতীয় সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশিত না হলে, বা যদি দেখা যায় যে, বীমাগ্রহীতা[১১] বীমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনও গুরুত্বপূর্ণ

---

7. Insurable Risks. 8. Uncertainty.
9. Basic Principles of Insurance.
10. "uberrimae fidei"—utmost good faith. 11. The Party insured.

তথ্য গোপন করেছিল, তাহলে, বীমার চুক্তিটি আইনত বলবৎ করা যাবে না, এবং তা নাকচ[12] বা বাতিল হয়ে যাবে।

(২) **বীমাযোগ্য স্বার্থ**[13]—(ক) বীমাযোগ্য স্বার্থ কাকে বলে—বীমা চুক্তিতে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা চাই। যা বীমা করা হবে বীমার সে বিষয় বস্তুটির হানি বা তা নষ্ট হলে বীমাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতি বা আর্থিক দায় সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, ওই বিষয়বস্তুটিতে বীমাকারীর বীমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে বলে গণ্য করা হয়। (খ) বীমাকে গ্রহণ করতে পারে—বীমার বিষয়বস্তুতে যার বীমা-যোগ্য স্বার্থ রয়েছে একমাত্র সে-ই তার বীমা গ্রহণ করতে পারে। এই হল আইনের কথা। (গ) জীবনবীমার ক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থ—জীবনবীমার ক্ষেত্রে নিজের জীবনের উপরে বা পরিবারের অন্যান্যের জীবনের উপরে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে বলে গণ্য করা হয়। কারণ তার বা তাদের মৃত্যুতে বীমাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। (ঘ) অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে—বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার যে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মালিকানা রয়েছে তা থেকেই বীমার বিষয়বস্তুতে তার বীমাযোগ্য স্বার্থের উৎপত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। কারণ বীমার বিষয়বস্তুর কোনও ক্ষতি হলে তার আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। (ঙ) জীবনবীমার ক্ষেত্রে বীমাপত্র গ্রহণ করার সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ বর্তমান থাকা চাই। অগ্নি বীমার ক্ষেত্রে বীমা চুক্তি করার সময় অর্থাৎ বীমাপত্র গ্রহণ করার সময় এবং ক্ষতি হওয়ার সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ বর্তমান থাকা চাই। অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে, ক্ষতি হওয়ার সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ বর্তমান থাকা চাই। (চ) বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বীমার চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

(৩) **ক্ষতিপূরণ**[14]—(ক) জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য, অর্থাৎ কারবারী বীমাগুলি হল ক্ষতিপূরণের চুক্তি[15]। বীমাগ্রহীতার প্রকৃত ক্ষতি যতটুকু হবে বীমাকারী[16] তা পূরণ করবে এই বীমাকারীর এই অঙ্গীকার হল কারবারী বীমাগুলির ভিত্তি. (খ) জীবনবীমার চুক্তি হল নিশ্চয়তা দানের চুক্তি[17]। এ চুক্তিতে বীমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বা নির্দিষ্ট সময়ান্তে একটি পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। জীবনবীমা চুক্তি ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। কারণ কোনও ব্যক্তির জীবনের আর্থিক মূল্য কখনও পরিমাপ করা যায় না। (গ) কারবারী বীমা ক্ষতিপূরণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, ক্ষতি হলে বীমা গ্রহীতা প্রকৃত ক্ষতি যতটুকু হবে, তার বেশি ক্ষতি-পূরণ পাওয়ার অধিকারী নয়। বেশি টাকার বীমাপত্র নিলেও কিংবা সম্পত্তির মূল্য বেশি করে দেখিয়ে বীমাপত্র নিলেও নয়।

(৪) **ডবল বীমা**[18]—(ক) কাকে বলে—একই বিষয়বস্তু একাধিক বীমাকারীর কাছে বীমা করাকে ডবল বীমা বলে। (খ) জীবনবীমার ক্ষেত্রে একই কিংবা একাধিক বীমা-কারীর কাছে একই ব্যক্তির যতগুলি ইচ্ছা জীবনবীমা করা যায়। কিন্তু কারবারী বীমা ক্ষতিপূরণের নীতির উপর স্থাপিত বলে কারবারী বীমার ক্ষেত্রে, তা চলে না। বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য যা তার বেশি পরিমাণে বীমা করা বীমাগ্রহীতার উচিত নয়। একাধিক বীমাকারীর কাছে একই বিষয়বস্তুর বীমা করালেও নয়। (গ) এরকম ডবল বীমা করা হলে, এবং তার ফলে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য যা, তার বেশি পরিমাণ বীমা হয়ে গেলে, অর্থাৎ অতি বীমা[19] হলে বীমাগ্রহীতা হয় বীমাকারীদের কাছ থেকে প্রকৃত ক্ষতির আনুপাতিক ক্ষতিপূরণ দাবি করবে, নয়তো, যে কোনও একজন বীমা-কারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। (ঘ) যে বীমাকারী সে ক্ষতিপূরণ দেবে

12. Void. 13. Insurable interest. 14. Indemnity.
15. Contract of Indemnity. 16. The Insurer.
17. Contract of assurance or guarantee. 18. Double Insurance.
19. Over-insurance.

সে অন্যান্য বীমাকারীর কাছ থেকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণের জন্য আনুপাতিক হারে টাকা পাবে। (৬) তবে ডবলবীমা আর পুনর্বীমা[20] কিন্তু এক নয়। বীমাকারী সংস্থাগুলি বেশি পরিমাণ বীমার দায় নিয়ে ফেললে, তার বোঝা কমানোর জন্য একে অপরের কাছে নিজের ঝুঁকির খানিকটা বীমা করিয়ে নিয়ে ঝুঁকির হস্তান্তর করে। এই হল পুনর্বীমা। বীমাকারীদের মধ্যে এই রীতি খুবই প্রচলিত।

(৫) **উত্তমর্ণের প্রতিস্থাপনা**[21]—কারবারী বীমার ক্ষেত্রে ডবলবীমা বা অতি-বীমার দরুন যাতে প্রকৃত ক্ষতির বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হয় সে জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বীমাকারী সংস্থাগুলি 'উত্তমর্ণের প্রতিস্থাপনা' নামক একটি নীতির সুবিধা পায়। ডবল বীমা বা অতি-বীমার দরুন কোনও বীমাগ্রহীতা বীমাকারীর কাছ থেকে প্রকৃত ক্ষতির বেশি টাকা আদায় করে নিলে, ওই অতিরিক্ত টাকাটা আদায় করার জন্য এই নীতির বলে তৃতীয়পক্ষের বিরুদ্ধে বীমাগ্রহীতার যাবতীয় অধিকার ও স্বার্থ[22] বীমাকারীর উপর বর্তায়। অর্থাৎ তৃতীয় কোনও পক্ষের কাছে বীমাগ্রহীতার কোনও টাকা পাওনা থাকলে বীমাগ্রহীতার স্থলে বীমাকারী সে টাকার অধিকারী বা পাওনাদার বলে গণ্য হয়।

জীবনবীমা : জীবনবীমা হল এমন একটি চুক্তি যে চুক্তি অনুযায়ী একপক্ষ নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দিলে তার মৃত্যুর পর তার আইনসংগত উত্তরাধিকারীকে বা মনোনীত ব্যক্তিকে কিংবা নির্দিষ্ট সময় শেষে তাকেই চুক্তি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অপরপক্ষ আবদ্ধ থাকে। প্রথম পক্ষ হল বীমাগ্রহীতা এবং দ্বিতীয় পক্ষ হল বীমাকারী।

জীবনবীমার সুবিধা : (১) জীবনবীমা হল পরিবারের আয় উপার্জনকারীর অকালমৃত্যুতে পরিবারের আর্থিক সংকট ত্রাণের এবং পোষ্যবর্গ ও উত্তরাধিকারীর ভবিষ্যত সংস্থানের উপায়। (২) কারবারের ক্ষেত্রে কর্মীদের জীবনবীমার ব্যবস্থার দ্বারা তাদের পরিবারবর্গের ভবিষ্যত সংস্থানের উপায় করা হলে নিয়োগকর্তার প্রতি কর্মীদের আনুগত্য বাড়ে। (৩) বীমাপত্রের জামিনে ঋণ পাওয়া যায়। (৪) বীমার টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যায়। (৫) বীমার মারফৎ বীমাগ্রহীতারা সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। (৬) বীমার দ্বারা উত্তরাধিকার করের[23] টাকার সংস্থান করা যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনবীমা পত্র : জীবনবীমা পরিকল্পনা[24] বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তবে তা মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা আজীবন বীমা পরিকল্পনা[25] এবং মেয়াদী বীমা পরিকল্পনা[26]। সে অনুযায়ী বীমাপত্রও আজীবন এবং মেয়াদী এই দুই প্রকারের হয়।

১ আজীবন বীমাপত্র[27] : আজীবন বীমা পরিকল্পনার মূল নিয়ম হল বীমাগ্রহীতাকে আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিতে হয় এবং তার মৃত্যুর পর বীমার টাকা পাওয়া যায়। অবশ্য তার আগে মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীরা বীমার টাকা পায়।

আর এক প্রকারের আজীবন বীমা পরিকল্পনা আছে তাতে বীমাগ্রহণকারী তার ইচ্ছামত নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম দেয়। বীমার টাকা অবশ্য তার মৃত্যুর পরে ছাড়া পাওয়া যায় না। একে নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তির আজীবন বীমাপত্র[28] বলে।

২ মেয়াদী বীমাপত্র[29] : এতে বীমাগ্রহণকারীকে তার ইচ্ছামত নির্দিষ্ট বৎসর পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হলে বীমার সম্পূর্ণ টাকা

20 Re-insurance 21 Subrogation 22 Rights and interests
23 Inheritance Tax 24 Life Insurance Plan 25 Whole life Plan
26 Endowment Plan 27 Whole life Policy
28 Whole life limited Payment Policy
29. Endowment Assurance Policy

উত্তরাধিকারীরা পায়। বীমাগ্রহণকারী জীবিত থাকলে, প্রিমিয়াম দেবার নির্দিষ্টকাল পার হলে, বীমার টাকা পায়।

আজীবন ও মেয়াদী জীবনবীমা পত্রের পার্থক্য ঃ (১) আজীবন বীমার সাধারণত আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিতে হয়। অবশ্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তির আজীবন বীমাপত্রে ইচ্ছামত নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম দেওয়া যায়। কিন্তু মেয়াদী বীমার বীমাকারী তার ইচ্ছামত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রিমিয়াম দেয়। (২) আজীবন বীমায় বীমাকারী তার জীবিতকালে কখনই বীমার টাকা পায় না। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা পায়। কিন্তু মেয়াদী বীমায় নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বীমাকারীর মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীরা বীমার টাকা পায়। অন্যথায় বীমাকারী মেয়াদ অন্তে নিজেই টাকা ভোগ করতে পারে। (৩) আজীবন বীমাপত্রের উদ্দেশ্য বীমাকারীকে আর্থিক সাহায্য করা নয়, বীমাকারীর অভাবে তার পরিবারবর্গের আর্থিক সহায়তা করা। মেয়াদী জীবনবীমা পত্রের দ্বারা বীমাকারী এবং/অথবা তার পরিবারবর্গের, উভয়ের প্রয়োজনই সিদ্ধ হতে পারে। (৪) আজীবন বীমার প্রিমিয়ামের হার কম। মেয়াদী বীমায় প্রিমিয়ামের হার কিছুটা বেশি।

৩. **দুর্ঘটনায় দ্বিগুণ টাকা প্রাপ্তির সুবিধাযুক্ত বীমাপত্র**[30] ঃ জীবনবীমা পত্রের সাধারণ প্রিমিয়ামের সাথে প্রতি হাজারে বার্ষিক ১·৫০ টাকা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিলে, বীমাগ্রহীতার কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে, বীমাকৃত টাকার দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু দাঙ্গা, যুদ্ধ, শিকার, বাধা অতিক্রমকারী ঘোড়দৌড় ও বীমাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্দিষ্ট বিমান কোম্পানীর বিমানে না গিয়ে অন্য কোম্পানীর বিমানে ভ্রমণ ইত্যাদিতে দুর্ঘটনার দরুন মৃত্যু হলে এই সুবিধা পাওয়া যায় না।

৪. **সর্বার্থসাধক বীমাপত্র**[31] ঃ এই জাতীয় বীমাপত্রে, বীমাগ্রহীতা নির্দিষ্টকাল, নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের পরিবর্তে, মেয়াদ অন্তে তার জীবিতকালে, একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি[32] পায়। তার আগে তার মৃত্যু হলে, পরিবারবর্গ একটি নির্দিষ্ট থোকে[33] টাকা এবং মৃত্যুর দিন থেকে বীমার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, নির্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি পাবে। এ ছাড়া তার পুত্র-কন্যার (২১ বৎসর বয়স পর্যন্ত) শিক্ষার ব্যয়ও, বীমা কোম্পানী বহন করবে। তবে সে জন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিতে হয়।

৫. **যৌথ মেয়াদী জীবনবীমা পত্র**[34] ঃ দুইজন অংশীদার অথবা উপার্জনকারী স্বামী ও স্ত্রীর, পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকায় তারা যৌথ মেয়াদী জীবনবীমা পত্র নিতে পারে। মেয়াদের আগে এক পক্ষের মৃত্যু হলে, অপরপক্ষ বীমার টাকা পাবে। কিন্তু উভয়পক্ষই বেঁচে থাকলে, মেয়াদ অন্তে উভয়ে বীমার টাকা পাবে।

আজীবন এবং মেয়াদী দুরকম বীমাপত্রই মুনাফাসহ কিংবা মুনাফা ছাড়া হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে বীমার টাকার সাথে বীমাকোম্পানীর মুনাফার অংশবিশেষ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধু বীমাকৃত টাকা পাওয়া যায়।

৬. **জনতা বীমাপত্র**[35] ঃ কলকারখানার শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের মত দরিদ্রশ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য ১৯৫৭ সালে ভারতের জীবনবীমা করপোরেশন জনতা বীমাপত্র নামে এক প্রকার নূতন বীমাপত্রের প্রচলন করেছে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ (ক) ৩৫ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বীমাগ্রহীতাদের কোন স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না; (খ) বীমাগ্রহীতাদের সর্বোচ্চ বয়স ৪৫ এবং বীমার মেয়াদ পূর্তিকালের সর্বোচ্চ বয়স ৬০; (গ) বীমাকৃত টাকার পরিমাণ কমপক্ষে ২৫০ টাকা; (ঘ) মেয়াদ পূর্তিকালের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৬০ বৎসরের মধ্যে ১০, ১৫, ২০ বা ২৫ বৎসরের মেয়াদী বীমা

30. Double Accident Benefit Policy. 31. Multipurpose Policy.
32. Annuity. 33. Lump.
34. Joint Life Endowment Policy. 35. Janata Policy.

হতে পারে এবং মেয়াদী জীবনবীমা ছাড়া অন্য কোন প্রকার বীমা গৃহীত হবে না; (ঙ) বীমাগ্রহীতাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে নগদ টাকায় বা ডাকটিকিটে প্রিমিয়াম আদায়ের ব্যবস্থা।

জীবনবীমা পত্রের প্রধান প্রধান ধারা
(PRINCIPAL CLAUSES IN THE LIFE POLICY

১. বয়সের প্রমাণ[৩৬] : বীমাপত্র গ্রহণ করার সময় সার্টিফিকেট, ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সার্টিফিকেট, কোষ্ঠী বা ঠিকুজি, খৃষ্টান হলে দীক্ষার সার্টিফিকেট, অথবা বার্থ সার্টিফিকেট দাখিল করতে হয়। প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণের জন্য তা দরকার। বীমার প্রস্তাবে উল্লিখিত বয়সের সাথে প্রমাণপত্রে উল্লিখিত বয়সের পার্থক্যের জন্য, শতকরা ৬ টাকা সুদসহ অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিতে হয়। বয়স প্রমাণিত না থাকলে, বীমার টাকার দাবি মিটানো হয় না।

২. বাজেয়াপ্তকরণ[৩৭] : বীমা প্রস্তাবে কোন সত্য গোপন করা অথবা অসত্য বিবরণ দেওয়া হলে, কিংবা শর্ত পালিত না হলে তা বাজেয়াপ্ত ও বীমাচুক্তি বাতিল হয়।

৩. বাজেয়াপ্তকরণ রদের ধারা[৩৮] : দুই বৎসর ঠিকমত প্রিমিয়াম দেওয়ার পর যদি বীমাকারী আর প্রিমিয়াম না দিয়ে থাকে তবে, বর্তমানে বাজেয়াপ্তকরণ রদের ধারা অনুযায়ী, বীমাপত্র আর সম্পূর্ণ বাতিল হতে পারে না। এক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সময় পরে, বীমাকৃত টাকা এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অনুপাতে, বীমাগ্রহীতা অথবা তার উত্তরাধিকারীরা প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অংশ পায়। অবশ্য, প্রদত্ত প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১০০০ টাকার বীমা হলে অন্যূন ৫০ টাকা ও তার অতিরিক্ত হলে ১০০ টাকা হওয়া দরকার।

৪. প্রত্যর্পণ মূল্য[৩৯] : কমপক্ষে দুই বৎসর কাল অথবা বীমার নির্দিষ্ট কালের একদশমাংশ কাল, প্রিমিয়াম দেওয়া হয়ে থাকলে, যদি তা এক বৎসরের প্রিমিয়ামের বেশি হয়, তবে বীমাপত্রের প্রত্যর্পণ মূল্য পাওয়া যায়। এই প্রত্যর্পণ মূল্য প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম ও অতিরিক্ত অন্যান্য কারণজনিত প্রিমিয়াম বাদে অর্থের বকেয়া অংশের ৩০ শতাংশ হয়ে থাকে। মুনাফাসহ বীমাপত্র হলে, অবশ্য উক্ত শতাংশ হিসাব করার সময় মুনাফার পরিমাণ হিসাবে ধরা হয়।

৫. স্বত্বনিয়োগ ও মনোনয়ন[৪০] : বীমাচুক্তি সম্পাদনাকালে বা তার পরবর্তীকালে, বীমাপত্রের স্বত্বনিয়োগ অথবা মনোনয়ন করা যায়। ঋণ পরিশোধে, মূল্য বিনিময়ে অথবা স্নেহপ্রীতির বন্ধনের দরুন, বীমাগ্রহীতা বীমাপত্রের স্বত্বান্তর ও স্বত্বনিয়োগ করতে পারে বা তার বীমার টাকার প্রাপক হিসাবে কাউকে মনোনীত করতে পারে। স্বত্বান্তর করলে তা আর বাতিল করা যায় না। কিন্তু মনোনয়ন ইচ্ছামত বাতিল করা যায়। এ সব ক্ষেত্রে পৃথক ফরমে অথবা বীমাপত্রের উল্টো পিঠে সই করে স্বত্বান্তর অথবা মনোনয়ন করা যায়। কিন্তু তা বীমাকোম্পানীকে জানাতে ও তার কাছে রেজিস্ট্রি করতে হয়। ত নাহলে আইনত অসিদ্ধ বলে গণ্য হয়।

৬. ঋণ[৪১] : বীমাগ্রহীতার প্রয়োজন হলে, বীমাপত্র জামিন রেখে বীমা কোম্পানীর কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে। এক্ষেত্রে বীমাপত্রের প্রত্যর্পণ মূল্যের[৪২] ৯০ শতাংশ শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ প্রদানের শর্তে, বীমা কোম্পানী ঋণ মঞ্জুর করে।

কিভাবে জীবনবীমা করতে হয় HOW TO TAKE A LIFE POLICY)

নিজের নিকট আত্মীয় স্বজনের অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির জীবনে যারই বীমা-যোগ্য স্বার্থ আছে, এরূপ যে কোন ব্যক্তিই জীবনবীমা করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উপার্জনকারী ব্যক্তি নিজের বা স্বামী স্ত্রীর অথবা স্ত্রী স্বামীর কিংবা পাওনাদার

36. Proof of Age. 37. Forfeiture Clause.
38. Non-forfeiture Clause. 39. Surrender value.
40. Assignment and Nomination. 41. Loan. 42. Surrender value.

দেনাদারের জীবনবীমা (এক্ষেত্রে পাওনা টাকার পরিমাণ পর্যন্ত) করতে পারে। জীবন-বীমা করতে হলে পর পর নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হয় :

১. **বীমাপ্রতিনিধি বা বীমার দালালের সাথে সাক্ষাৎকার** হল প্রথম পদক্ষেপ। বীমা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি বীমার দালালের সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের প্রয়োজন বুঝিয়ে বললে, বীমার দালাল তাকে **একটি** প্রস্তাবের ফরম[৪৩] দেবেন। তাতে বীমাগ্রহণের প্রস্তাবকারীর নাম, বয়স, পেশা, আয়, ঠিকানা, বীমার অর্থের পরিমাণ, কোন্ প্রকার বীমা তিনি গ্রহণ করতে চান, কিরূপ কিস্তিতে প্রিমিয়াম দিতে চান ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ প্রশ্নাবলী থাকে। প্রশ্নগুলির উত্তরে বীমার প্রস্তাবকারী যথাসম্ভব তার জ্ঞান বুদ্ধিমত সত্য ও প্রকৃত তথ্যগুলিই ফরমে লিখবেন। যদি তিনি কোন সত্য গোপন করে যান, তবে পরে বীমাপত্রটি বাতিল হয়ে যেতে পারে।

২. **বীমাপ্রতিষ্ঠানের কাছে বীমার দালালের রিপোর্ট** হল দ্বিতীয় ধাপ। বীমা-প্রস্তাবের ফরমটি পূরণ করে প্রস্তাবকারী বীমার দালালের কাছে দিলে, তিনি বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট তার নিজের রিপোর্ট দেবেন। এই রিপোর্টে বীমার দালালের প্রধান বক্তব্য থাকে বীমার প্রস্তাবকারীর আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে।

৩. **স্বাস্থ্য পরীক্ষা**[৪৪] হল তৃতীয় ধাপ। বীমার দালালের কাছ থেকে বীমার প্রস্তাব ও রিপোর্ট পাওয়ার পর বীমা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ডাক্তার প্রস্তাবকারীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডেকে পাঠান এবং পরে নির্ধারিত ফরমে ওই স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজের রিপোর্ট বীমা প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়ে দেন।

৪. **প্রথম প্রিমিয়াম**[৪৫] হল শেষ ধাপ। বীমার দালালের কাছ থেকে বীমার প্রস্তাব ও দালালের রিপোর্ট এবং ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়ার পর বীমাপ্রতিষ্ঠান ওই প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হলে, প্রস্তাবকারীকে উক্ত মর্মে সংবাদ জানিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথম প্রিমিয়াম জমা দিতে অনুরোধ করে। তা জমা দেওয়ার সাথে সাথে বীমা প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবকারীর জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করে ও বীমাচুক্তি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়।

বীমাপত্রের দাবি মেটানোর পদ্ধতি
METHOD OF SETTLEMENT OF CLAIMS

যার জীবনবীমা করা হয়েছে তার অর্থাৎ বীমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে কিংবা বীমাপত্রের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলে বীমার টাকা দাবি করা হয়। বীমাপত্র দেওয়ার সময় কিংবা বীমাটি চালু থাকা কালে বীমাগ্রহীতাকে তার অকাল মৃত্যুতে যে টাকা পাবে তার নাম উল্লেখ করতে বা মনোনীত করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। বীমাগ্রহীতা অবশ্য স্বত্বনিয়োগ করে স্বত্বনিয়োগীর কাছে বীমাপত্রের সমস্ত অধিকার হস্তান্তর করতে পারেন।

বীমা গ্রহীতার মৃত্যু হলে,—(১) মৃত্যুর প্রমাণ, (২) বয়সের প্রমাণ (যদি আগে তা দাখিল করা না হয়ে থাকে) এবং (৩) বীমার টাকার উপর দাবিদারের অধিকারের প্রমাণ—বীমা কোম্পানীর কাছে দাখিল করতে হয়। প্রমাণগুলি যাচাই করে সন্তুষ্ট হলে বীমার টাকা দাবিদারকে মিটিয়ে দেওয়া হয়।

আর বীমার মেয়াদ যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে বীমা কোম্পানী থেকে বীমাগ্রহীতাকে আগেই সময় থাকতে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র তৈরি করে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। যাতে মেয়াদ শেষের দিনেই বীমার টাকা পাওয়া যায়।

ভারতে জীবনবীমার কারবার : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে জীবনবীমা কারবারের সূত্রপাত ঘটে। ইংরেজ কারবারীরাই এদেশে এই জাতীয় কারবার প্রথম

---

43. Proposal Form. 44. Medical Examination.
45. First Premium.

আরম্ভ করে। তবে, অল্পকালের মধ্যেই ভারতীয়রাও এক্ষেত্রে প্রবেশ করতে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। স্বল্পকালের মধ্যেই এর দ্রুত অগ্রগতির দরুন ১৯১২ সালে ভারত সরকার এই কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য বীমা আইন পাস করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বীমা কোম্পানীগুলির অধিকাংশ ছিল বিদেশী।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে জীবনবীমা কারবারের প্রসার ঘটতে থাকে। বীমা কোম্পানীর সংখ্যা, বীমার পরিমাণ প্রভৃতি বাড়তে থাকে। এদের পরিচালকদের অধিকাংশেরই এই কারবার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় এবং তাদের মধ্যে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী থাকায়, কোম্পানীগুলির লগ্নীর ক্ষেত্রে নানা প্রকার দোষ-ত্রুটি দেখা দিতে থাকে। এই অবস্থায় ১৯৩৮ সালে বীমা কোম্পানীর কার্যাবলীর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ, বিশেষত তাদের লগ্নীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য, ভারত সরকার আরেকটি বীমা আইন পাস করেন। বীমা কোম্পানীগুলির কার্যকলাপ তদারকের জন্য, ভারত সরকার একটি বীমা বিভাগ স্থাপন করে, একজন বীমা সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিয়োগ করেন। ফলে, জীবনবীমা কোম্পানীগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়ে ও জীবনবীমা কারবারের উন্নতি ঘটে।

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ভারতে জীবনবীমা কারবারের প্রথম যুগ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই সময়ে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্রকৃত উন্নতির যুগ আরম্ভ হয় ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ কাল থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যুগে অন্যান্য কারবারের মত জীবনবীমার কারবারেরও অভূতপূর্ব দ্রুত উন্নতি ঘটে।

কিন্তু সাধারণভাবে বীমা কারবারের অগ্রগতি সত্ত্বেও, বীমা কোম্পানীগুলির সামগ্রিক কার্যকলাপ খুব সন্তোষজনক ছিল না। অবশেষে, বীমা কারবারের গুরুত্ব এবং সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১৯৫৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী ভারত সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে, ভারতের সমস্ত দেশী ও বিদেশী জীবনবীমা কারবারের পরি-চালন ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। এর অল্পকাল পরেই ১৯৫৬ সালে জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন পাস হয়। তার পরেই ১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, ভারতের জীবনবীমা করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত ভারতীয় বীমা কোম্পানীর জীবনবীমা কারবার ও বিদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ভারতস্থ জীবনবীমা কারবার করপোরেশন নিজের হাতে নেয়। করপোরেশন ২৪৩টি বীমা কোম্পানীর ব্যবসায় এবং তাদের ৪১১ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি অধিকার করে। সেই সময় ওই কোম্পানীগুলির কাছে মোট বীমার পরিমাণ ছিল ১,২৫০ কোটি টাকার বেশি।

ভারতের জীবনবীমা কারবারের জাতীয়করণের উদ্দেশ্য ঃ ১৯৫৬ সালে, ভারতে জীবনবীমার জাতীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। যথা—

১. বেসরকারী জীবনবীমা কোম্পানীগুলির অব্যবস্থা ও অসাধুতার প্রতিকার ঃ ১৯৩৮ সালে প্রণীত জীবনবীমা আইনের উদ্দেশ্য ছিল বীমা কোম্পানীগুলির লগ্নী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু কোম্পানীগুলির হিসাব বই ইত্যাদি পরীক্ষা করার কোন ক্ষমতা বীমা কোম্পানীসমূহের সুপারিন্টেন্ডেন্টের ছিল না। ফলে, বহু ভারতীয় কোম্পানীতে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয়, অপব্যবহার, তহবিল তছরূপ, বাজে লগ্নী প্রভৃতি ঘটতে থাকে এবং বীমাগ্রহীতাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে থাকে। এর আশু প্রতিকার অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল।

২. জীবনবীমা কারবার মারফত ভারতব্যাপী স্বল্প সঞ্চয়ীদের সঞ্চয় সংগ্রহ দ্বারা অর্থ-নীতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা ঃ পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণের পর থেকে, বিশেষত, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের অগ্রাধিকার স্থির হওয়ায়, বিনিয়োগের

জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। জীবনবীমার জাতীয়করণ দ্বারা, দেশের স্বল্পসঞ্চয়ীদের প্রদত্ত প্রিমিয়াম থেকে যে বিরাট বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গঠিত হয়, তা সহজেই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। জীবনবীমা জাতীয়করণের পিছনে এই উদ্দেশ্যটিও ছিল।

৩. জাতীয় নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ বৃদ্ধি ঃ জীবনবীমার জাতীয়করণ দ্বারা দেশে বীমাগ্রহীতাদের বীমার নিরাপত্তা বৃদ্ধি, প্রিমিয়ামের হার হ্রাসের দ্বারা বীমাগ্রহীতাদের ব্যয় হ্রাস, মোট বীমার পরিমাণ বৃদ্ধি, বীমা কারবারের একীকরণ দ্বারা পরিচালন ব্যয় হ্রাস, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি, নানাবিধভাবে জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা, জীবনবীমার জাতীয়করণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতের জীবনবীমা করপোরেশন
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

এটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। ১৯৫৬ সালের ভারতীয় জীবনবীমা করপোরেশন আইনের দ্বারা ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে, ভারতীয় জীবনবীমা করপোরেশন একটি আইন সৃষ্ট বিধিবদ্ধ সংস্থা[46] রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে এই সংস্থা ভারতে পূর্বতন জীবনবীমা কোম্পানীগুলির সমগ্র ব্যবসায়, সম্পত্তি ও দায় গ্রহণ করে। এর মোট পুঁজির পরিমাণ ৫ কোটি টাকা এবং তার সমস্তই ভারত সরকার দিয়েছেন। একচেটিয়া অধিকারবলে সমগ্র ভারতে জীবনবীমা কারবার পরিচালনা ছাড়াও এল আই সি কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রে, যথা, বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা, মরিসাস, এডেন মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং ফিজিদ্বীপপুঞ্জে জীবনবীমা কারবার পরিচালনা করে।

জীবনবীমা কারবারের সাথে, এল আই সি সংশ্লিষ্ট তিনটি প্রতিষ্ঠানের (যথা, দি এশিয়াটিক গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি ফায়ার এন্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ, মাদ্রাজ, ন্যাশনাল ফায়ার এন্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ, কলিকাতা ও ওরিয়েন্টাল ফায়ার এন্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ, বোম্বাই) মাধ্যমে অগ্নি, নৌ এবং অন্যান্য জাতীয় বীমা কারবারও পরিচালনা করে।

করপোরেশনের পরিচালনার ভার একজন চেয়ারম্যান সহ মোট ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিচালক পর্ষৎ-এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। এর কার্যকরী পরিষদ অনধিক পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত। আইনের দ্বারা করপোরেশনকে দুইজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এরা সর্বক্ষণের কর্মী। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে করপোরেশন সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

আইন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থেকে ভারতীয় জনসমাজের শ্রেষ্ঠ স্বার্থে জীবনবীমার পরিচালনা এবং প্রসার এবং এই উদ্দেশ্যে পুনর্বীমা, লগ্নী, সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয় এবং ঋণ প্রদান ও সংগ্রহ ইত্যাদি যাবতীয় কার্যাদি পরিচালনা করা করপোরেশনের কাজের অন্তর্গত। সমস্ত কাজে করপোরেশন যথাসম্ভব পরিমাণে কারবারী নীতিগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

বোম্বাইয়ে অবস্থিত কেন্দ্রীয় অফিস করপোরেশনের নীতিসংক্রান্ত বিষয় এবং অর্থলগ্নীর বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও নির্দেশ দেয়। সমগ্র সংগঠনের তদারকীও তার অন্যতম দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে, প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একটি করে আঞ্চলিক অফিস স্থাপিত হয়েছে। নিজ নিজ এলাকায় করপোরেশনের কার্যকলাপের পরিচালনা করাই এদের কাজ। প্রত্যেক আঞ্চলিক অফিসের ভারপ্রাপ্ত একজন করে আঞ্চলিক কর্মকর্তা

46. Statutory Corporation.

আছেন। এ ছাড়া বিদেশের কারবার পরিচালনার জন্য আর একটি আঞ্চলিক অফিস আছে।

ব্যবস্থাপনার দক্ষতার জন্য প্রত্যেক অঞ্চলকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করে একটি করে বিভাগীয় অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগীয় অফিস এক একজন বিভাগীয় কর্মকর্তার দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের অধীনে কতকগুলি শাখা অফিস আছে। তাদের প্রত্যেকটির জন্য ভারপ্রাপ্ত একজন করে শাখা কর্মকর্তা আছে। প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বল্পোন্নত স্থানীয় এলাকার জন্য একটি করে উপশাখা-অফিস খোলা হয়। এইগুলি শাখা কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

অর্থলগ্নীর কাজে পরামর্শ প্রদানের জন্য এল আই সি-র একটি বিনিয়োগ কমিটি আছে। তার সদস্যসংখ্যা অনধিক সাতজন। এদের মধ্যে অন্তত তিনজন করপোরেশনের সদস্য এবং বাকী সদস্যরা অর্থ ও লগ্নীসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ।

করপোরেশনের টাকা সাধারণত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এবং অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটি, বিদেশী সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটিতে, যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে, বন্ধকী সম্পত্তিতে এবং গৃহাদি স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতিতে লগ্নী করা হয়। এই সব বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্রে নানা মেয়াদে লগ্নীর দ্বারা উপার্জিত লাভ করপোরেশনের আয়ের প্রধান সূত্র।

নিচে জীবনবীমা করপোরেশনের অগ্রগতির বিবরণ দেওয়া হল।

মোট বীমা

বৎসর	বীমাপত্রের সংখ্যা		বীমার পরিমাণ ও বোনাস		মোট বীমা ও বোনাসের পরিমাণ
	ভারতে	বিদেশে	ভারতে	বিদেশে	
			কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
১৯৫৭	৫৪·১৮ লক্ষ	২·৬৫ লক্ষ	১,৩৭৪	৯৯	১,৪৭৩
১৯৬৯ (মার্চ)	১৩৩·৪৪ লক্ষ	১·০৮ লক্ষ	৫,৫৫১	১২০	৫,৬৭১
১৯৭২	১৫৭·১১ লক্ষ	০·৮৮ লক্ষ	৮,০৮২	১২০	৮,২০২

২৭

নৌ-বীমা
MARIN INSURANCE

নৌবীমার সংজ্ঞা ঃ নৌবীমা হল এমন একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি যার দ্বারা চুক্তির এক পক্ষ অপর পক্ষকে জাহাজ, জাহাজের মাসুল কিংবা জাহাজে অবস্থিত পণ্যের সমুদ্র যাত্রাকালে কিংবা উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষয়ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

নৌবীমার গুরুত্ব ঃ (১) কোনও দেশই সর্ববিষয়ে স্বনির্ভর হতে পারে না বলে অন্যান্য দেশের সাথে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ না নিয়ে পারে না। তা করতে হলে সবচেয়ে কম খরচে পণ্য পরিবহণের উপায় হল সামুদ্রিক বা নৌ পরিবহণ। কিন্তু তার বিপদ বা ঝুঁকি অনেক। জাহাজ ডুবি, জাহাজে অগ্নিকান্ড, চড়ায় জাহাজ আটক, ঝড়, জল, আগুনে পণ্যের ক্ষতি ও আরও নানা ক্ষতির আশংকা থাকে। তাতে জাহাজের মালিকের ক্ষতি, পণ্যের মালিকের ক্ষতি, জাহাজের মালিকের মাসুলের ক্ষতি হতে পারে। নৌবীমার দ্বারা এইসব ঝুঁকি বীমাকারীর কাছে হস্তান্তর করা যায় ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা যায়। তাতে আমদানি ও রপ্তানিকারীরা, জাহাজের মালিকরা ও মাসুলের অধিকারীরা, সকলেই রক্ষা পায়। নৌবীমা ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এত বিস্তার লাভ করতে পারত না। (২) নৌবীমা না থাকলে সামুদ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক নৌবহরও দেশে দেশে গড়ে উঠতে পারত না। (৩) নৌবীমার ফলে দেশে দেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্পও বিকশিত হয়েছে। (৪) তাছাড়া বাণিজ্যিক নৌবহরগুলি দেশের অন্যতম প্রধান কর্মসংস্থান উৎসেও পরিণত হয়েছে।

নৌ-বীমার বিষয়বস্তু (SUBJECTS OF MARINE INSURANCE)

(১) জলযান, অর্থাৎ জাহাজ, (২) মাসুল এবং (৩) জাহাজে বোঝাই পণ্য—এই তিনটি হল নৌবীমার বিষয়বস্তু। যাতায়াতকালে বিভিন্ন প্রকারের সামুদ্রিক বিপদের ফলে, জাহাজটির আংশিক ক্ষতি অথবা সামগ্রিক বিনষ্টির ঝুঁকি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অর্থাৎ ঐ সব বিপদ আপদের দরুন ক্ষতি হলে তা পূরণের জন্য জাহাজের মালিক জাহাজটি সামুদ্রিক বীমা গ্রহণ করতে পারে। একে 'হাল ইনস্যুরেন্স'[1] বা জাহাজী-বীমা বলে।

সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে বোঝাই পণ্যদ্রব্যও আংশিক বা সামগ্রিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে এবং তার মাসুলবাবদ জাহাজের মালিকের অথবা জাহাজ ভাড়াকারীর আয় নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। সেজন্য মাসুলেরও বীমা করা হয়। একে মাসুল বীমা[2] বলে। জাহাজের মালিক অথবা জাহাজটি ভাড়া নিয়ে ব্যবসায়ীদের পণ্য পরিবহণে জাহাজটি যে ব্যবহার করছে, সে এই মাসুল বীমা গ্রহণ করে।

পরিবহণকালে দুর্ঘটনায় জাহাজে বোঝাই পণ্যসামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হলে ঐ ক্ষতি-পূরণের জন্য, পণ্যের মালিকরা তাদের পণ্যের বীমা গ্রহণ করে। একে পণ্য বীমা[3] বলে।

1. Hull Insurance. 2. Freight Insurance. 3. Cargo Insurance.

সামুদ্রিক বিপদ[4] ঃ সামুদ্রিক বিপদগুলিকে প্রথমে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিপদ। ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঢেউ, জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষ, জাহাজের সাথে জলমগ্ন পর্বতের সংঘর্ষ, মগ্ন চড়ায় জাহাজের আটকে যাওয়া, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপদের দৃষ্টান্ত। অপ্রাকৃতিক বিপদগুলিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) জাহাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপজনিত ক্ষতি, এবং (২) জাহাজ-বহির্ভূত ব্যক্তিগণের কার্যকলাপজনিত ক্ষতি। জাহাজের কাপ্তেন ও খালাসীদের অসাধু কার্যকলাপজনিত ক্ষতি প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। জলদস্যুর আক্রমণ, শত্রুপক্ষের আক্রমণ, বন্দরে চুরি ইত্যাদি কারণজনিত ক্ষতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

নৌবীমার গৌণ শর্ত (WARRANTY)

সমস্ত চুক্তিই কতকগুলি শর্তের[5] উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব শর্তের কতকগুলি প্রধান বা মুখ্য শর্ত[6] এবং কতকগুলি অপ্রধান বা গৌণ শর্ত[7]। সাধারণ চুক্তিতে মুখ্য শর্তগুলি উল্লেখ করা থাকে এবং তা পালিত না হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। গৌণ শর্তগুলি সাধারণত উহ্য[8] থাকে, তবে তা আবার উল্লিখিত[9] হতেও পারে। কিন্তু ঐগুলি পালন করা না হলে সে চুক্তি বাতিল হয় না। তবে, ক্ষতিগ্রস্তপক্ষ সে জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। অর্থাৎ মুখ্য শর্তগুলি চুক্তির নিয়ন্ত্রণকারী শর্ত, কিন্তু গৌণ শর্ত তা নয়।

কিন্তু নৌ-বীমা ক্ষেত্রে গৌণ শর্তগুলি উহ্য থাকলেও, সেগুলি চুক্তির নিয়ন্ত্রক শর্ত অর্থাৎ মুখ্য শর্ত বলে গণ্য হয় এবং তা পালিত না হলে সমগ্র বীমা চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়।

নৌ-বীমায় অনুল্লিখিত গৌণ শর্তাদি ঃ নৌ-বীমাতে নিম্নলিখিত গৌণ শর্তগুলি বীমা চুক্তির পক্ষে অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়।

১. জাহাজের সমুদ্রে চলাচলযোগ্যতা[10] ঃ জাহাজটির সমুদ্রে চলাচলের সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে, বীমাগ্রহীতা[11]র এই আশ্বাস প্রদানের শর্তে বীমাকারী[12] বীমা চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়। জাহাজের সামুদ্রিক যোগ্যতা বলতে, তাতে যথোপযোগী লোক-লস্কর, প্রয়োজনীয় অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আছে এবং সীমাতিরিক্ত পণ্য বোঝাই হয় নি ইত্যাদি বোঝায়।

২. জাহাজের সাধারণ গতিপথ থেকে ভ্রষ্ট না হওয়া[13] ঃ যে সমস্ত বীমা চুক্তি জাহাজের নির্দিষ্ট গতিপথের ভিত্তিতে[14] সম্পাদিত হয় (অর্থাৎ এক বন্দর থেকে অন্য বন্দর পর্যন্ত), সে ক্ষেত্রে জাহাজটি সাধারণ গতিপথ থেকে ভ্রষ্ট হবে না, একথা উহ্য থাকে। তবে, কতকগুলি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হলেও, তাতে চুক্তি অসিদ্ধ হয় না। যথা, খালাসীদের বিদ্রোহ, প্রতিকূল আবহাওয়া, জীবনরক্ষার কারণে খালাসী ও খাদ্য পানীয় এবং জ্বালানি প্রভৃতির আকস্মিক অভাবের দরুন এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জাহাজটি যদি সাধারণ গতিপথ ছেড়ে ভিন্ন পথে যায় তাহলে চুক্তি অসিদ্ধ হবে না।

৩. যাত্রার বৈধতা[15] ঃ ধরে নেওয়া হয় যে, জাহাজটি বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত কাজে সমুদ্রযাত্রা করছে। শুল্ক ফাঁকি, নিষিদ্ধ দ্রব্য পরিবহণ, নির্বিবন্ধ বাণিজ্য অথবা চোরাই চালান প্রভৃতি কোনও অবৈধ উদ্দেশ্য তার নাই।

এই সব অনুল্লেখিত শর্তগুলি এবং বীমাপত্রে উল্লেখিত শর্তসহ নৌ-বাণিজ্যের প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা প্রভৃতি সবই নৌবীমার ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়।

---

4. Perils of the Sea. 5. Stipulations. 6. Condition. 7. Warranty.
8. Implied. 9. Expressed. 10. Sea worthiness clause.
11. Insured. 12. Insurer. 13. Non-deviation clause.
14. Voyage Policy. 15. Legality of the voyage.

বিভিন্ন শ্রেণীর নৌ-বীমা ঃ নৌবীমায় বীমাগ্রহীতার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের নৌ-বীমাপত্র প্রচলিত আছে। নিচে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. 'ভয়েজ পলিসি' বা নির্দিষ্ট গতিপথে যাত্রার বীমাপত্র[১৬] ঃ যে বীমাপত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট গতিপথে যাওয়ার সময় জাহাজ বা পণ্যের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের দায় গ্রহণ করা হয়, তাকে 'ভয়েজ পলিসি' বলে।

২. 'টাইম পলিসি' বা নির্দিষ্ট সময়ের যাত্রার বীমাপত্র[১৭] ঃ এই জাতীয় বীমাপত্রের দ্বারা ৬ মাস থেকে ১ বৎসর পর্যন্ত, যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, জাহাজ ও পণ্যের ক্ষতিপূরণের দায় গ্রহণ করা হয়।

৩. 'মিক্সড্ পলিসি' বা মিশ্র বীমাপত্র[১৮] ঃ এই জাতীয় বীমাপত্র নির্দিষ্ট গতিপথে যাত্রা এবং নির্দিষ্ট সময়ের যাত্রার বীমাপত্র, এই দুটির সংমিশ্রণ মাত্র। এতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, নির্দিষ্ট গতিপথে গমনকারী জাহাজ ও পণ্যের ক্ষতিপূরণের দায় গ্রহণ করা হয়।

৪. মূল্য উল্লেখিত বীমাপত্র বা 'ভ্যালুড পলিসি'[১৯] ঃ যে বীমাপত্রে বীমার বিষয়-বস্তুর মূল্য উল্লেখ করা থাকে, তাকে 'ভ্যালুড পলিসি' বলে।

৫. 'ওপেন' বা 'আনভ্যালুড পলিসি' অথবা খোলা বীমাপত্র[২০] ঃ এই জাতীয় বীমাপত্রে বীমার বিষয়বস্তুর মূল্য উল্লেখ করা হয় না।

৬. 'ফ্লোটিং পলিসি'[২১] ঃ এই প্রকারের বীমাপত্র জাহাজের জন্যই প্রচলিত। যে জাহাজী কারবারগুলির একাধিক জাহাজ সর্বদাই বিভিন্ন গতিপথে যাতায়াত করছে, তারা সাধারণত একবারে একটি মোটা অঙ্কের বীমাপত্র গ্রহণ করে। পরে, ঐ অঙ্কের মধ্যে, বিভিন্ন পথে যাত্রাকারী তাদের বিভিন্ন জাহাজগুলির কোনটির জন্য কত টাকার ঝুঁকি নির্দিষ্ট হবে তা বীমাকারী প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয়। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাহাজগুলির জন্য বারবার বীমাপত্র নেবার নিত্য নৈমিত্তিক ঝামেলা পোহাতে হয় না।

৭. 'কম্পোজিট পলিসি'[২২] ঃ নৌ-বীমায় সাধারণত বৃহৎ অঙ্কের বীমাপত্রের ক্ষেত্রে একাধিক বীমাকারী প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে দায় গ্রহণ করে। যেমন, তিনটি বীমাকারী প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে যথাক্রমে ৫০ লক্ষ টাকা, ৩০ লক্ষ টাকা ও ২০ লক্ষ টাকার মোট ১ কোটি টাকার বীমার দায় একত্রে গ্রহণ করতে পারে। এই জাতীয় বীমাপত্রই কম্পোজিট পলিসি নামে পরিচিত।

৮. 'পোর্ট রিস্ক পলিসি' বা বন্দর ঝুঁকি বীমাপত্র[২৩] ঃ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে বন্দরে থাকাকালীন জাহাজ বা পণ্যের কোনরূপ ক্ষতি পূরণের দায় যে বীমাপত্রের দ্বারা গৃহীত হয়, তাকে 'পোর্ট রিস্ক পলিসি' বলে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় বীমাপত্রের দ্বারা সমুদ্রে যাতায়াত রত পণ্য বা জাহাজের ক্ষতিপূরণের দায় গ্রহণ করা হয় না।

নৌ-বীমাকার্যে ক্ষতির প্রকারভেদ
TYPES OF LOSS IN MARINE INSURANCE

নৌ-বীমায় বীমার বিষয়বস্তুর ক্ষতি,—(১) সামগ্রিক এবং (২) আংশিক এই দুই রকমের হতে পারে।

১. সামগ্রিক ক্ষতি[২৪] ঃ যখন বীমার বিষয়বস্তু এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, তা আর পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা থাকে না, তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলে। সামগ্রিক ক্ষতি আবার দু রকমের হতে পারে।—(ক) প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি[২৫] ও (খ) উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি[২৬]।

---

16. Voyage Policy. 17. Time Policy. 18. Mixed Policy.
19. Valued Policy. 20. Open or Uuvalued Policy.
21. Floating Policy. 22. Composite Policy. 23. Port Risk Policy.
24. Total loss. 25. Actual total loss. 26. Constructive total loss.

(ক) প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি : বীমার বিষয়বস্তু যখন সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা বিকৃত হয় এবং তা আর উদ্ধারের উপায় থাকে না, তাকে প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলে যেমন, সমুদ্রে পণ্য সমেত কোন জাহাজ ডুবে গেলে, জাহাজটির এবং জাহাজটির পণ্য পুনরুদ্ধারের আর কোন আশা থাকে না। এই ক্ষতিকে প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলে।

(খ) উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি : যখন বীমার বিষয়বস্তু এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হলেও তার খরচ উদ্ধারযোগ্য বস্তুর দামের চেয়ে বেশী হয়ে পড়ে, তাকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলে। যেমন, উপকূলের নিকট-বর্তী মগ্নশৈলের সাথে সংঘর্ষের ফলে নিমজ্জিত জাহাজের উদ্ধার সম্ভব হলেও, যদি তার খরচ, উদ্ধারকৃত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, তবে ঐ ক্ষতিকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলা যায়।

২. আংশিক ক্ষতি[২৭] **:** যখন বীমাকৃত জাহাজ অথবা পণ্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তাকে আংশিক ক্ষতি বলে। আংশিক ক্ষতি দুরকমের : সাধারণ আংশিক ক্ষতি[২৮] এবং বিশেষ আংশিক ক্ষতি[২৯]।

(ক) সাধারণ আংশিক ক্ষতি : পণ্য, মাসুল ও জাহাজের মালিক প্রভৃতি সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে ইচ্ছাকৃত ক্ষতি ঘটানো হয়, তাকে সাধারণ আংশিক ক্ষতি বলে। এই ক্ষতি করার উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থের নিরাপত্তা রক্ষা করা। যেমন, ঝড়ঝঞ্ঝায় বিপদগ্রস্ত জাহাজকে ভারমুক্ত[৩০] করার জন্য জাহাজের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। এতে পণ্য-মালিকের যে ক্ষতি হয়, তা জাহাজের মূল্য, মাসুল ও পণ্যমূল্যের আনুপাতিক হারে তিন পক্ষের মধ্যে বণ্টন করা হয়। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষরা বীমাকারীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পায়।

(খ) বিশেষ আংশিক ক্ষতি : আকস্মিক কোন ঘটনা দ্বারা জাহাজ বা পণ্যের ক্ষতি হলে, তাকে বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলে। এবং এই প্রকারের ক্ষতি কেবলমাত্র স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষকেই বহন করতে হয়। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নৌ-বীমাপত্র নিয়ে থাকলে, বীমাকারীর কাছ থেকে সে জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারেন।

এটা সাধারণ আংশিক ক্ষতির ন্যায় ইচ্ছাকৃত নয়। এই ক্ষতি সাধনের দ্বারা কারও স্বার্থ রক্ষা পায় না; সেজন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ ছাড়া অপর কোন পক্ষ ক্ষতির অংশ বহন করে না।

সাধারণ আংশিক ক্ষতির বণ্টন (SHARING OF GENERAL AVERAGE LOSS)

পণ্যবাহী একটি জাহাজ যাত্রাপথে গভীর সমুদ্রের মধ্যে প্রবল ঝড়-তুফানে পড়ল। জাহাজটিকে রক্ষা করার জন্য নিরুপায় হয়ে জাহাজের কাপ্তেন বা অধ্যক্ষ পণ্যের কিছু অংশ সমুদ্রে ফেলে দিল। তাতে জাহাজ, মাসুল ও বাকী পণ্যদ্রব্য রক্ষা পেল। এক্ষেত্রে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পণ্যের ক্ষতি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই, অর্থাৎ জাহাজের মালিক, মাসুলের অধিকারী ও পণ্যের মালিককে আনুপাতিকভাবে বহন করতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরা যাক যে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পণ্যের মূল্য=১০,০০০ টাকা।

এই ১০,০০০ টাকার ক্ষতি জাহাজের মালিক, মাসুলের অধিকারী এবং পণ্যের মালিক, এই তিন পক্ষের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করা হবে। এ সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জাহাজের মালিকই মাসুলের অধিকারী হলেও, নৌ-বীমার সাধারণ আংশিক ক্ষতির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বণ্টন করার সময় জাহাজের মালিক ও মাসুলের অধিকারী এরা দুটি আলাদা পক্ষ বলে ধরা হয়।

যদি জাহাজের মূল্য ১,০০,০০০ টাকা, মোট পণ্যের মূল্য ৬০,০০০ টাকা ও মাসুলের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা হয়, তা হলে, তাদের মোট মূল্য হয়, ২,০০,০০০ টাকা।

---

27. Average Loss. 28. General Average Loss.
29. Particular Average Loss. 30. Lighten.

(১) অতএব জাহাজের মালিকের বহনযোগ্য ক্ষতির পরিমাণ

$$= \frac{১,০০,০০০ \text{ টাকা}}{২,০০,০০০ \text{ টাকা}} \times ১০,০০০ \text{ টাকা} = ৫,০০০ \text{ টাকা।}$$

(২) পণ্যমালিকের ক্ষতির অংশ

$$= \frac{৬০,০০০ \text{ টাকা}}{২,০০,০০০ \text{ টাকা}} \times ১০,০০০ \text{ টাকা} = ৩,০০০ \text{ টাকা।}$$

(৩) এবং মাসুলের অধিকারীর ক্ষতি বহনের পরিমাণ

$$= \frac{৪০,০০০ \text{ টাকা}}{২,০০,০০০ \text{ টাকা}} \times ১০,০০০ \text{ টাকা} = ২,০০০ \text{ টাকা।}$$

এইরূপে মোট ক্ষতি ১০,০০০ টাকার, জাহাজের মালিক, পণ্যের মালিক ও মাসুলের অধিকারী যথাক্রমে, ৫,০০০ টাকা ৩,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা বহন করবে।

বিশেষ আংশিক ক্ষতি নিরূপণের পদ্ধতি

METHOD OF DETERMINATION OF PARTICULAR AVERAGE LOSS

এস. এস. ইণ্ডিয়া নামক জাহাজে কলিকাতা বন্দর থেকে টোকিও বন্দরে ১,০০০ গাঁইট কাঁচা তুলা পাঠানোর সময় ২০০ গাঁইট তুলা সমুদ্রের জল লেগে আংশিকভাবে বিনষ্ট হল। প্রতি গাঁইট তুলার মূল্য ১০০ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত গাঁইটগুলি জাপানের বাজারে প্রতি গাঁইট ৫০ টাকা দরে এবং ভাল গাঁইটগুলি গাঁইট প্রতি ১২৫ টাকা দরে বিক্রয় হল। এক্ষেত্রে পণ্যমালিক বীমাকারীর কাছ থেকে নিম্নলিখিত হিসাবে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে ঃ

পণ্যের বীমাকৃত মূল্য[31]—

১০০ টাকা দরে ১,০০০ গাঁইটের মূল্য=	১,০০,০০০ টাকা
টোকিও বন্দরে উপনীত ১,০০০ গাঁইটের মধ্যে ২০০ গাঁইট ক্ষতিগ্রস্ত তুলার বীমাকৃত মূল্য[32]—	২০,০০০ টাকা।
উক্ত ২০০ গাঁইট তুলা অক্ষত অবস্থায় টোকিওতে পৌঁছালে, তার বিক্রয়লব্ধ মূল্য হত—	২৫,০০০ টাকা।
ঐ গাঁইটগুলির প্রকৃত বিক্রয়লব্ধ মূল্য[33]—	১০,০০০ টাকা।
২৫,০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যে ক্ষতির পরিমাণ —	১৫,০০০ টাকা।

সুতরাং ঐ ২০০ গাঁইট তুলার বীমাকৃত মূল্যের ক্ষতির পরিমাণ

$$\frac{১৫,০০০ \text{ টাকা}}{২৫,০০০ \text{ টাকা}} \times ২০,০০০ \text{ টাকা} = ১২,০০০ \text{ টাকা।}$$

অতিরিক্ত খরচ[34]—

বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ক্ষতি পরিমাপের ব্যয়	৫০০ টাকা	
গুদাম খরচ—	৫০০ টাকা	
বিবিধ খরচ—	২৫০ টাকা	=১,২৫০ টাকা।

অতএব ক্ষতিপূরণ বাবদ বীমাকারীর নিকট বীমাগ্রহীতার দাবির পরিমাণ =১৩,২৫০ টাকা।

---

31. Insured value. 32. Insured value of the damaged goods.
33. Actual value realised. 34. Extra charges.

লয়েড্স্ বা লয়েডসের দায়গ্রাহকগণ
LLOYD'S OR LLOYD'S UNDERWRITERS

নৌ-বীমার দায়গ্রহণের কাজে নিযুক্ত, সমিতিবদ্ধ একদল দায়গ্রাহক ও অন্যান্য ব্যক্তি-বর্গ, 'লয়েড্স্ আন্ডার রাইটার্স' অথবা সংক্ষেপে লয়েড্স্ নামে পরিচিত। এই সংগঠনটির ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। বিগত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে কফির প্রচলন আরম্ভ হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই তা অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয়ে পরিণত হয়। ঐ সময়ে লণ্ডনের টাওয়ার স্ট্রীটে মিঃ লয়েড নামে এক ব্যক্তির কফিখানা তৎকালীন লণ্ডন বন্দরের বণিক ও নাবিকদের বিখ্যাত আড্ডাস্থল হয়ে ওঠে। মিঃ লয়েড খরিদ্দারগণের সুবিধার্থে দেশবিদেশে যাতায়াতকারী জাহাজের সংবাদ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। শীঘ্রই দেশবিদেশে ঐরূপ জাহাজের সংবাদ সংগ্রাহক নিযুক্ত হয় এবং ডাক ও তার ব্যবস্থাবিহীন সেই যুগে সাংকেতিক ইঙ্গিত মারফত দূরদূরান্ত থেকে সংবাদ সংগৃহীত ও কফিখানার খরিদ্দারদের কাছে পরিবেশিত হতে থাকে। এই সুবিধার জন্য ধীরে ধীরে লয়েডের কফিখানা নৌ-বীমার দায়গ্রাহকদের কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এই দায়গ্রাহকরা লয়েডসের দায়গ্রাহক হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। জাহাজ সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্যাদি ১৬৯৬ সাল থেকে নিয়মিতভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। একে 'লয়েড্স্ নিউজ'[৩৫] বলা হত। পরে নাম পরিবর্তন করে 'লয়েড্স্ লিস্ট'[৩৬] রাখা হয়।

১৭৭১ সালে নৌ-বীমার দায়গ্রাহক ও দালালরা একত্রিত হয়ে 'লয়েডসের দায়-গ্রাহকগণের সমিতি'[৩৭] নামে একটি সমিতি গঠন করে। ১০০ বৎসর পর ১৮৭১ সালে তা পার্লামেন্টের একটি আইনের দ্বারা 'করপোরেশন অব লয়েড্স্'[৩৮] নামে পুনর্গঠিত ও বিধিবদ্ধ হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য দুটি—সদস্যদের স্বার্থসাধন ও জাহাজ-সংক্রান্ত নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ ও সদস্যদের মধ্যে তা বণ্টন। সদস্যরা প্রবেশমূল্য ও বার্ষিক চাঁদা দেয়। সদস্যরা দুই শ্রেণীর : (ক) দায়গ্রাহক এবং (খ) দালাল। সমিতি হিসাবে এই সমিতি কোন দায়গ্রহণ করে না। এর সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে দায়গ্রহণ করে। সমিতির সদস্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং তারা যাতে নিজ নিজ দায় মেটাতে অক্ষমতার দরুন প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট না করে সেজন্য সদস্যপদ দেবার সময় তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জামিন বাবদ নেওয়া হয়। এর বর্তমান কার্যালয় লণ্ডনের লীডেনহল স্ট্রীটে অবস্থিত। এর কার্যাবলী সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি সত্যই তুলনাহীন।

লয়েডসের বৃটিশ ও বিদেশী জাহাজী রেজিস্টার[৩৯] : নৌ-বীমার দায়গ্রহণের কাজে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জাহাজ ও তাদের অবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান সবিশেষ প্রয়োজন। এইজন্য, লয়েডসের একটি সংস্থা থেকে গত ১৭৫ বৎসর ধরে ইংলণ্ডসহ পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশে নির্মিত জাহাজের বিস্তৃত বিবরণ প্রতি বৎসর প্রকাশিত হচ্ছে। ৭২ জন সম্পাদকের সহযোগিতায় প্রস্তুত এই বিবরণীর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ হাজারের বেশী এবং ওজন প্রায় ১০ সের। এই বাৎসরিক বিবরণীতে থাকে : (১) যাবতীয় জাহাজের নির্মাণ স্থান ও তারিখ; (২) যে সকল উপাদানে ঐগুলি নির্মিত; (৩) তাদের আয়তন এবং পরিবহণ ক্ষমতা; এবং (৪) জাহাজের গুণাগুণ ও শ্রেণী।

35. Lloyd's News. 36. Lloyd's List
37. Association of Lloyd's Undrewriters.
38. The Corporation of Lloyds.
39. Lloyd's Register of British and Foreign Shipping.

নৌ-বীমাপত্র গ্রহণের পদ্ধতি

THE PROCEDURE OF TAKING OUT A MARINE INSURANCE POLICY

নৌ-বীমাপত্র কিভাবে নিতে হয় তা আলোচনা করার আগে মনে রাখতে হবে যে, তা দুরকমের হতে পারে : (ক) কোম্পানীর বীমাপত্র[৪০] এবং (খ) লয়েডসের বীমাপত্র[৪১]।

কোম্পানীর বীমাপত্র গ্রহণের পদ্ধতি খুবই সহজ। বিভিন্ন নৌ-বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের বীমার প্রিমিয়াম ও অন্যান্য শর্তাবলী মুদ্রিত আকারে পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। তাদের নিযুক্ত বীমার দালালও থাকে। বীমাগ্রহণেচ্ছু যে কোন ব্যবসায়ী সরাসরি ঐ সব কোম্পানীর সাথে সংযোগ স্থাপন করে যথানিয়মে কোম্পানীর প্রকাশিত শর্ত-সংবলিত চুক্তি সম্পাদন করে বীমাপত্র গ্রহণ করতে পারে। এতে দর কষাকষি করার কোন সুযোগ নেই।

লয়েডসের বীমাপত্র গ্রহণের পদ্ধতি ভিন্ন। এই বীমাপত্র সম্পাদনের উদ্যোগ থাকে লয়েডসের দালালদের হাতে। দালালরা বীমাগ্রহণেচ্ছু ব্যবসায়ীর কাছে বীমার প্রস্তাব করে ও প্রিমিয়ামের হার উল্লেখ করে। তা নিয়ে বীমাগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি ও দালালের মধ্যে যথেষ্ট দর কষাকষি চলে। কোম্পানীর তুলনায় লয়েডসের বীমার আর একটি সুবিধাও আছে। তা হল লয়েডসের দায়গ্রাহকরা ব্যক্তিগতভাবে দায় গ্রহণ করে বলে তাদের দায়-গ্রহণের কাজের কোন নির্দিষ্ট বিষয় নেই। সুতরাং তারা বিভিন্ন প্রকারের দায় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ তাদের দায় গ্রহণের বিষয় সুনির্দিষ্ট। দর কষাকষির পর ব্যবসায়ীর সাথে রফা হলে, দালাল তখন একটি কাগজে (চিঠা) পণ্যপরিবহণকারী জাহাজের নাম, গন্তব্যপথ, নির্দিষ্ট সময়, পণ্যের মূল্য, বীমার প্রকৃতি ও যত টাকার বীমা হবে সেসব লিখে লয়েড প্রতিষ্ঠানে দায়গ্রাহকদের নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে ঐ চিঠাটি দেখিয়ে বিভিন্ন দায়গ্রাহকের কাছে দায় গ্রহণের অনুরোধ করে। যারা সম্মত হয়, তারা চিঠাটিতে নাম সই করে পাশে কত টাকার দায় গ্রহণে সে ইচ্ছুক তা লিখে দেয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দায়গ্রাহকের সম্মতি নিয়ে যখন প্রস্তাবিত বীমার অঙ্ক পূরণ হয়, তখন দালাল যথাবিহিত বীমাপত্রের ফরম পূরণ করে ও আবার তাতে, পূর্বোক্ত হাতচিঠাতে স্বাক্ষরকারী দায়গ্রাহকদের সই সংগ্রহ করে। তাতেও কোন্ দায়গ্রাহক কত টাকার দায় গ্রহণ করবে তার উল্লেখ করা হয়। এরপর দালাল মোট বীমার উপর প্রিমিয়াম হিসাব করে বীমাপত্র গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির কাছে দেয় প্রিমিয়াম-এর জন্য একটি দেনা চিঠা[৪২] পাঠায়। বীমা গ্রহণকারী সাধারণত বীমার বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্যের ১০ শতাংশ বেশী মূল্যের বীমা করে। এর উদ্দেশ্য হল ভাড়া প্রভৃতি অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ এর অন্তর্ভুক্ত করা। দালাল প্রিমিয়ামের ৫ শতাংশ নিজের জন্য রাখে ও বীমাগ্রহীতা[৪৩] প্রিমিয়ামের বাকী ৯৫ শতাংশের ১০ শতাংশ ছাড়[৪৪] পায়। বকেয়া সমস্ত অংশ দায়গ্রাহকরা প্রিমিয়াম বাবদ পায়। প্রিমিয়ামের টাকা আদায় হলে, দালাল বীমাপত্রটি যথানিয়মে বীমাগ্রহীতার কাছে পাঠায়।

নৌ-বীমাপত্রের প্রধান প্রধান ধারা

PRINCIPAL CLAUSES IN MARINE INSURANCE POLICY

নৌ-বীমাপত্রের প্রধান ধারাগুলি নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল :

১. জাহাজের নাম, বিবরণ এবং যেখানে পণ্যের বীমা গ্রহণ করা হয় সেখানে, বীমাকারীর সম্মতি ছাড়া জাহাজ পরিবর্তন নিষিদ্ধ[৪৫]।

২. বীমাকারী কোম্পানী বা লয়েড্‌স বীমাপত্র হলে দায়গ্রাহকদের নাম[৪৬]।

---

40. Company's Policy. 41. Lloyd's Policy. 42. Debit Note.
43. Insured. 44. Commission. 45. Name of the vessel.
46. Name of the Insurer.

৩. বীমাগ্রহীতার নাম[৪৭]।

৪. সমুদ্রযাত্রার বিবরণ[৪৮] ঃ যদি বীমাপত্রে শুধু "অমুক বন্দর হইতে......"[৪৯] এই কথাটির উল্লেখ থাকে, তবে জাহাজ রওনা হওয়ার পর থেকে বীমার সময় শুরু হয়। আর যদি "অমুক বন্দরে ও তথা হইতে......"[৫০], এরকম উল্লেখ থাকে, তবে জাহাজ বন্দরে থাকাকালীন অবস্থা থেকে বীমার সময় শুরু হয়।

৫. বীমাপত্রে "হারাইয়াছে বা হারায় নাই"[৫১] এই ধারাটি সংযুক্ত হলে, কোন কারণে বিলম্ববশত, পণ্য-জাহাজ রওনা হওয়ার পর বীমা সম্পাদিত হলে এবং পথে, এমন কি বীমা সম্পাদনের আগেই বীমাগ্রহীতার অজ্ঞাতসারে বিনষ্ট হলেও, বীমাগ্রহীতা ক্ষতি-পূরণ পাওয়ার অধিকারী হয়।

৬. বীমার কার্যকাল শুরু এবং মেয়াদ[৫২] ঃ এই ধারায় কখন থেকে বীমা কার্যকর হবে এবং তার মেয়াদ কতদিন তার উল্লেখ থাকে।

৭. বীমার মেয়াদ বৃদ্ধি ঃ টাইম পলিসির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে জাহাজ গন্তব্যস্থলে না পেঁৗছলে দায়গ্রাহকদের কাছে আগেই উপযুক্ত নোটিস দিয়ে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম জমা দিলে ঐ বীমাপত্রের মেয়াদ আপনা থেকেই বর্ধিত হয়।

৮ সামুদ্রিক বিপদ[৫৪] ঃ এই ধারাতে কোন্ কোন্ সামুদ্রিক বিপদের জন্য বীমা করা হয়েছে তার উল্লেখ থাকে। যথা, সাধারণ সামুদ্রিক বিপদ-আপদ, ঝড়ঝঞ্ঝা, অগ্নি-কান্ড, সংঘর্ষ, চুরি, জলদস্যুতা প্রভৃতি ছাড়াও, জাহাজের কর্মচারীদের দ্বারা মালিকের ক্ষতিসাধনের জন্য জাহাজ থেকে পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ[৫৫] (ব্যারাট্রি) এবং নিরাপত্তার জন্য জাহাজ হাল্কা করার জন্য ইচ্ছা করে জাহাজের পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ[৫৬] (জেটিসন) ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

৯. মকদ্দমা ও প্রচেষ্টা[৫৭] ঃ এই ধারার বলে বীমার বিষয়বস্তুর নিরাপত্তা, উদ্ধার এবং রক্ষার[৫৮] জন্য বীমাগ্রহীতা মামলা-মকদ্দমা বা চেষ্টাজনিত যাবতীয় খরচখরচা বীমা-কারীর কাছ থেকে আদায় করতে পারে।

১০. স্পর্শ কবা ও অবস্থান করা[৫৯] ঃ এই ধারার বলে, সাধারণত গতিপথে জাহাজ যে সব বন্দরে, যতদিনের জন্য থামে, সেই মতই ঐ পথে জাহাজটি ওইসব বন্দরগুলিতে যাবে ও অপেক্ষা করবে। জরুরী অবস্থা ছাড়া এর কোন ব্যতিক্রম করা চলে না।

১১. দুর্ঘটনায় পতিত সামগ্রী বক্ষার চেষ্টা ও ব্যয়[৬০] ঃ এই ধারার বলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমাকারী বা বীমাগ্রহীতা, বীমার বিষয়বস্তু বক্ষার জন্য চেষ্টা ও খরচ করলে, তাতে তাদের অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় না।

১২. অপরাপর জাহাজের সহিত সংঘর্ষে[৬১] ঃ এই ধারা জাহাজের বীমার ক্ষেত্রে থাকে। এর দ্বারা, বীমাকৃত জাহাজটির সাথে অন্য কোন জাহাজের সংঘর্ষ ঘটার দরুন, দোষী জাহাজের মালিক মকদ্দমা খরচসহ যে ক্ষতিপূরণ দেয়, তার একাংশ বীমাকারীর কাছ থেকে আদায় করা হয়।

১৩. বিশেষ আংশিক ক্ষতি মুক্ত[৬২] ঃ বীমাপত্রে এই ধারা সাধারণত চাল, লবণ, মাছ প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে সন্নিবিষ্ট হয়। এই ধারার বলে, ঐ সব জিনিসের আংশিক ক্ষতি হলে, বীমাকারী তা পূরণ করে না।

---

47. Name of the Insurance. 48. Description of the voyage.
49. "From...." 50. At and from. ..' 51. Lost or not lost clause
52. Commencement and duration of the Risk clause.
53. Continuation clause. 54. Perils of the Sea clause.
55. Barratry. 56. Jettison. 57. Sue and Labour clause.
58. 'safeguard' recovery and defence. 59. Touch and Stay clause.
60. Waiver clause. 61. Running Down clause (R.D.C.).
62. Free of Particular Average (F.P.A.).

১৪. বিশেষ আংশিক ক্ষতিসহ[63]: এই ধারাটি পূর্বোক্ত ধারার বিপরীত। এর বলে, বীমাকৃত পণ্যের আংশিক ক্ষতি হলে তা পূরণের জন্য বীমাকারী দায়ী থাকে।

১৫. সকল আংশিক ক্ষতির দায়মুক্ত[64]: বীমাপত্রে এই ধারা থাকলে, বীমাকারী বিশেষ আংশিক ক্ষতি বা সাধারণ আংশিক ক্ষতির জন্য দায়ী হয় না। শুধু সামগ্রিক ক্ষতি[65] ঘটলেই, তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়।

১৬. বিদেশে সাধারণ আংশিক ক্ষতির মীমাংসা[66]: বিদেশে সাধারণ আংশিক ক্ষতির মীমাংসা কি ভাবে করতে হবে, এই ধারায় সে সম্পর্কে নির্দেশ থাকে।

১৭. শত্রুকবলিত হওয়ার দায়হীন[67]: এই ধারা মতে পণ্য বা জাহাজের বীমার বিষয়বস্তু শত্রুর কবলিত হওয়ার জন্য ক্ষতি হলে, বীমাকারী তা পূরণ করার জন্য দায়ী থাকে না। সেজন্য আলাদা যুদ্ধ ঝুঁকি বীমাপত্র নিতে হয়।

নৌ-বীমায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ

A FEW TERMS USED IN MARINE INSURANCE

'বট্মরি' বা জাহাজ বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ[68]: গন্তব্য পথের মাঝে কোন বন্দরে জাহাজের মেরামতের জন্য নিরুপায় হলে, জাহাজ বন্ধক রেখে ঋণ নেবার উপযুক্ত ক্ষমতা জাহাজের অধ্যক্ষের থাকে। পরবর্তী বন্দরে পেঁছে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে হয় এবং তা না হওয়া পর্যন্ত জাহাজের উপর ঋণদাতার অগ্রাধিকার থাকে। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দরুন আর এরূপ ঋণের প্রয়োজন বিশেষ হয় না। এই জাতীয় ঋণপত্রকে **'বটমরি বন্ড'** বা জাহাজবন্ধকী ঋণপত্র বলে।

পণ্যবন্ধক[69]: এটি 'বটমরি'র অনুরূপ। তবে এতে শুধু পণ্যবন্ধক রাখা হয়। এর চুক্তিপত্রকে 'রেসপন্ডেনসিয়া' বা পণ্যবন্ধক পত্র বলে।

'জেটিসন' বা বিপৎকালে জাহাজস্থিত পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ[70]: সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ঝঞ্ঝা, চড়ায় আটক প্রভৃতি বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য জাহাজকে হাল্কা করার উদ্দেশ্যে জাহাজস্থিত পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকে 'জেটিসন' বলে।

'ব্যারাট্রি' বা কাপ্তেন ও নাবিকগণ কর্তৃক জাহাজের মালিককে প্রতারণা[71]: জাহাজের কাপ্তেন ও নাবিকরা প্রতারণা করে জাহাজস্থিত পণ্যাদি চুরি, বিনষ্ট প্রভৃতির দ্বারা জাহাজের মালিককে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত করে। একে 'ব্যারাট্রি' বলে।

আশু কারণ[72]: বীমার বিষয়বস্তু একাধিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব। নৌ-বীমার ক্ষতিপূরণ দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে, ঐ সব কারণের মধ্যে কোন্‌টি গৌণ কারণ এবং কোন্‌টি আশু কারণ তা বিচার করে, আশু কারণটির দরুন ক্ষতির ঝুঁকি বীমা করা থাকলে, তবেই বীমাকারী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। নৌ-বীমাতে এই আশু কারণের নীতিটি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা হয়। ধরা যাক, কোন জাহাজ ধাক্কা লেগে পথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মেরামতের জন্য কোন বন্দরে উপস্থিত হল। সেখানে মেরামতের জন্য পণ্যগুলি জাহাজ থেকে নামিয়ে রাখা হল। তখন ঐ কিছু দ্রব্য চুরি হল বা ইঁদুরে নষ্ট করল। এ জাতীয় ঝুঁকির কথা বীমাপত্রে উল্লেখ না থাকলে বীমাকারী সে জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়।

63. With Particular Average (W.P.A.).
64. Free of All Average (F.A.A.).
65. Total loss. 66 Foreign General Average (F.G.A.).
67. Free of Capture and Seiuzre (F.C.S.). 68. Bottomry.
69. Respondentia. 70. Jetison. 71. Barratry. 72. Cause Proxima.

'সাবরোগেশন' তত্ত্ব বা প্রতিকল্প উত্তমর্ণের নীতি[73] **:** নৌ-বীমায় এটি একটি সুবিখ্যাত নীতি। এই নীতি অনুসারে বীমাকারী, বীমাগ্রহীতার সামগ্রিক ক্ষতি[74] পূরণ করলে, তৃতীয় পক্ষের[75] বিরুদ্ধে বীমাগ্রহীতার যাবতীয় অধিকার ও বিশেষ সুবিধা[76] এবং তা থেকে উদ্ভূত লাভ, বীমাকারীর উপর বর্তায়।

দৃষ্টান্ত : ক জাহাজটি নিজ দোষে **খ** জাহাজের সাথে সংঘর্ষে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল। এই নীতি অনুসারে **ক**-এর বীমাকারী, তার মালিককে সামগ্রিক ক্ষতিপূরণ দিলে সে ক জাহাজের মালিক অর্থাৎ বীমাগ্রহীতার অধিকার লাভ করবে এবং সেই হিসাবে **খ** জাহাজের মালিকের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে।

নৌ-বীমা পত্রের স্বত্বনিয়োগ[77] **:** নৌ-বীমায় স্বত্বনিয়োগে বিশেষ কোন জটিলতা নেই। শুধু বীমাপত্রের উল্টোপিঠে সই করে অথবা বীমাপত্রটি শুধু হস্তান্তরের দ্বারাই স্বত্বনিয়োগ করা যায়। তবে জাহাজ বীমা ক্ষেত্রে[78] স্বত্বনিয়োগ বিষয়ে বীমাকারীর সম্মতির প্রয়োজন হয়; এবং সাধারণভাবে স্বত্বনিয়োগের সময়, বীমার বিষয়-বস্তুতে বীমাগ্রহীতা অর্থাৎ স্বত্বনিয়োগকারীর বীমাযোগ্য স্বার্থ[79] থাকা দরকার

73. Doctrine of Subrogation. 74. Total loss. 75. Third party.
76. Privileges. 77. Assignment of Marine Insurance Policy.
78. Hull Insurance. 79. Insurable Interest.

২৮

অগ্নি ও অন্যান্য বীমা
FIRE AND OTHER KINDS OF INSURANCE

অগ্নিবীমা : নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রদানের শর্তে, নির্দিষ্ট মূল্যের দ্রব্য, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আগুনে বা আগুন থেকে উদ্ভূত কারণে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি হয় তাকেই অগ্নিবীমা বলে।

অগ্নিবীমার গুরুত্ব : (১) বহু শিল্পে ও ব্যবসায়ে কাঁচামাল ও পণ্যগুলি অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হয়ে থাকে। যাতে সহজে তাতে আগুন ধরতে না পারে সে দিকে যত্ন নেওয়া হলেও, আকস্মিক দুর্ঘটনায় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। তাছাড়া, বৈদ্যুতিক তাব ও যন্ত্রপাতির ত্রুটিতেও অনেক সময় কারখানা, গুদাম ও অফিসে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। তাতে পণ্য, পুঁজি ও জীবন পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। বিপদ ও ক্ষয়ক্ষতির এই ঝুঁকি অগ্নিবীমার সাহায্যে সহজেই বীমাকারীর কাছে কারবারীরা হস্তান্তর করে আত্মরক্ষা করতে পারে। (২) অগ্নিবীমা করলে কারবারীরা অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে সে জন্য কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণে বাধ্য হয়। কোনও অবহেলা চলে না। কারণ অগ্নিবীমার এটি একটি প্রধান শর্ত। (৩) অগ্নিবীমার দ্বারা ক্ষতিপূরণ পেয়ে কারবারীরা তা থেকে তাদের নষ্ট হওয়া পুঁজির আংশিক সংস্থান করতে পারে। মুনাফার ক্ষতির আংশিক ক্ষতিপূরণও এর দ্বারা সম্ভব হয়। এই কারণে কারবারীদের মধ্যে অগ্নিবীমা একটি অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

অগ্নিবীমার বীমাকারীর প্রকারভেদ

অগ্নিবীমা ক্ষেত্রে দু রকমের বীমাকারী দেখা যায় : ট্যারিফ অফিসেস[1] এবং নন-ট্যারিফ অফিসেস[2]।

১. ট্যারিফ অফিসেস : এরা হল সাধারণত কোম্পানীরূপে সংগঠিত বীমাকারী। এরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমানোর জন্য একটি সংঘ গঠন করে প্রিমিয়ামের হার ও অন্যান্য শর্তাবলী চুক্তিদ্বারা নির্দিষ্ট করে নেয় এবং সমস্ত সদস্য তা মেনে চলে। এই বীমাকারীদের ট্যারিফ অফিসেস বলে।

২. নন-ট্যারিফ অফিসেস : কোন প্রকার সংঘভুক্ত নয়, অগ্নিবীমা কাজে নিযুক্ত এরূপ বীমাকারী ও দায়গ্রাহকরা নিজেদের সুবিধা ও ইচ্ছামত হারে প্রিমিয়াম লাভেব শর্তে অগ্নিবীমা চুক্তি সম্পাদন করে। এরা বীমাকারী সংঘের বহির্ভূত হওয়ায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত অল্প হারে প্রিমিয়াম-এর চুক্তিতে সম্মত হয়। এদের নন-ট্যারিফ অফিসেস বলে।

অগ্নিবীমাপত্রের প্রকারভেদ : ১. 'ভ্যালুড পলিসি' বা নির্ধারিত মূল্য বীমাপত্র[3] : এই প্রকারের বীমাপত্রে, বীমাচুক্তি সম্পাদনের আগে বীমার বিষয়বস্তুর মূল্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে এবং সামগ্রিক ক্ষতি ঘটলে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে ঐ নির্ধারিত মূল্য

---
1. Tariff Offices. 2. Non-Tariff Offices. 3. Valued Policy.

ক্ষতিপূরণ দেয়। সাধারণত দুষ্প্রাপ্য, প্রাচীন স্মৃতিজড়িত দ্রব্যসামগ্রীর বেলায় এই-রূপ বীমাপত্র লওয়া হয়।

২. **বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট বীমাপত্র**[৪] : এই ধরনের বীমাপত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের কথা উল্লেখ থাকে এবং বীমার বিষয়বস্তুর পূর্ণমূল্য বীমা করা হোক বা না হোক, তার কোন ক্ষতি হলে বীমাকারী ঐ উল্লিখিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে।

৩. **আংশিক ক্ষতিপূরণ বীমাপত্র**[৫] : অগ্নিবীমাপত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আংশিক ক্ষতিপূরণ ধারা নামে একটি ধারা থাকে। এই ধারাসংযুক্ত বীমাপত্রকে আংশিক ক্ষতিপূরণ বীমাপত্র বা এভারেজ পালিসি বলে। এই প্রকার বীমাপত্রে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে, বীমাগ্রহীতা বীমাকারীর কাছ থেকে বীমার বিষয়বস্তুর বীমাকৃত ও প্রকৃত মূল্যের অনুপাতে, প্রকৃত ক্ষতির অংশ ক্ষতিপূরণ বাবদ পায়। নিচে উদাহরণ দিয়ে তা দেখান হল :

বীমার বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য	=	১০,০০০ টাকা
তার বীমাকৃত মূল্য	=	১,০০০ টাকা
প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ	=	৫০০ টাকা

∴ বীমাগ্রহীতা বীমাকারীর নিকট

থেকে যে ক্ষতিপূরণ পাবে তা হল— $\frac{\text{১০০০ টাকা}}{\text{১০,০০০ টাকা}} \times \text{৫০০ টাকা} = \text{৫০ টাকা}$

বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার জন্যই বীমাপত্রে 'গড়পড়তা ধারা' বা 'এভারেজ ক্লজ' সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে।

৪. **সামঞ্জস্যক্ষম বীমাপত্র**[৬] : এই জাতীয় বীমাপত্রে বীমাগ্রহীতা অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, পণ্যের চলতি মজুদের[৭] একটি আনুমানিক পরিমাণের জন্য বীমাপত্র গ্রহণ করে ও সেজন্য প্রতি মাসে প্রিমিয়াম দিতে থাকে। প্রতি মাসের শেষে বীমাগ্রহীতা, বীমাকারীর কাছে পণ্যের প্রকৃত চলতি মজুদের[৮] হিসাব দাখিল করতে থাকে। বৎসরের শেষে প্রকৃত চলতি মজুদের গড় বের করে তদনুযায়ী প্রকৃত প্রিমিয়াম হিসাব করা হয় এবং প্রদত্ত প্রিমিয়াম তার কম হলে বকেয়া টাকা বীমাগ্রহীতার কাছ থেকে বীমাকারী আদায় করে, বেশি হলে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ পরের বৎসরের অগ্রিম প্রিমিয়াম বাবদ জমা করে নেওয়া হয়।

৫. **মুনাফার ক্ষতিপূরণ**[৯] : অগ্নিদুর্ঘটনার কারবারের দ্রব্য বিনষ্ট হওয়া ছাড়াও তার দরুন সাময়িকভাবে কারবার বন্ধ হলে, কারবারীর মুনাফা নষ্ট হয়। অগ্নিবীমার দ্বারা বিনষ্ট দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ ছাড়াও, বিশেষ ধরনের অগ্নিবীমা পত্রের সাহায্যে ঐরূপ মুনাফা নষ্ট হওয়ার ক্ষতি পূরণ করা যায়। এই জাতীয় অগ্নিবীমাপত্রকে মুনাফার ক্ষতিপূরণ বলে।

৬. **দ্রব্য প্রতিস্থাপন বীমাপত্র**[১০] : অগ্নিবীমাপত্রে 'প্রতিস্থাপক ধারা' সন্নিবিষ্ট থাকলে, ক্ষতি হলে, বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বিনষ্ট দ্রব্যটির বদলে ঐরকম একটি নতুন দ্রব্য দিতে পারে। এই জাতীয় বীমাপত্র দ্রব্য প্রতিস্থাপন বীমাপত্র নামে পরিচিত।

৭. **'ফ্লোটিং' বীমাপত্র**[১১] : যে সব কারবারের সর্বদাই মজুদ পণ্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে কিংবা যাদের পণ্যদ্রব্য একাধিক কেন্দ্রে বিক্ষিপ্তভাবে মজুদ থাকে, তারা এই ধরনের বীমা-

4. Special or Specific Policy. 5. Average Policy.
6. Adjustable Policy. 7 Stock-in-trade. 8. Actual stock-in-trade.
9. Loss of Profit Policy. 10. Reinstatement Policy.
11. Floating Policy.

পত্র গ্রহণ করে। এই প্রকার বীমাপত্রের ক্ষেত্রে একটি গড়পড়তা হার নির্ধারণ করে তদনুযায়ী প্রিমিয়াম আদায় করা হয়।

৮. **সর্বাধিক ঘোষিত মূল্যের বীমাপত্র**[12]**:** এই প্রকার বীমাপত্রে একটি সর্বাধিক বীমাকৃত মূল্যের উল্লেখ থাকে। কিন্তু বীমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট সময় শেষে তার প্রকৃত ঝুঁকির পরিমাণ ঘোষণা করার বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। বীমাগ্রহীতা ঐ ঘোষিত মূল্যের উপর প্রিমিয়াম দেয়।

অগ্নিবীমায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ
SOME TERMS USED IN FIRE INSURANCE

উত্তমর্ণের প্রতিস্থাপনা[13] **:** অগ্নিবীমায় বীমাকারী বীমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ-ভাবে মিটিয়ে দিলে, ঐ ক্ষতির জন্য দায়ী তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে বীমাগ্রহীতার যাবতীয় অধিকার ও সুবিধা, বীমাকারীর উপর বর্তায়। অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্য আদায়কারী পাওনাদার হিসাবে, বীমাগ্রহীতার স্থান বীমাকারী নেয়।

প্রথম প্রিমিয়াম জমা-রসিদ বা 'কভার নোট'[14] **:** অগ্নিবীমাপত্রে প্রথম প্রিমিয়াম জমা দিলে যে রসিদ পাওয়া যায়, তাকে 'কভার নোট' বলে। বীমাপত্র সম্পাদিত হয়ে যথা-বিহিতরূপে বীমাগ্রহীতার কাছে যতদিন না পৌঁছায়, ততদিন পর্যন্ত কভার নোটটিই প্রকৃত বীমাপত্রের বিকল্প হিসাবে গণ্য হয় এবং ইতিমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে গেলে, বীমাপত্রের স্থলে ঐ দলিলটিই প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্বত্বনিয়োগ[15] **:** স্বতন্ত্র দলিল সম্পাদন দ্বারা কিংবা বীমাপত্রের উল্টোপিঠে সই করে, এই দুরকমভাবেই অগ্নিবীমাপত্রের স্বত্বনিয়োগ করা যায়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তাতে বীমাকারীর পূর্ব সম্মতি প্রয়োজন।

ক্ষতিপূরণ দাবি ও মীমাংসার পদ্ধতি
PROCEDURE OF CLAIM AND SETTLEMENT

বীমাকৃত বিষয়বস্তু অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হলে, বীমাগ্রহীতা অনতিবিলম্বে বীমা-কারীকে সংবাদ দেবেন। দুর্ঘটনার কতদিনের মধ্যে সংবাদ জানাতে ও ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করতে হবে বীমাপত্রে তা উল্লেখ করা থাকে। সাধারণত ১৫ দিনের মধ্যে বাজারদর অনুযায়ী সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করে বীমাকারীর কাছে দাবি জানাতে হয়। আংশিক ক্ষতি হলে, তার পরিমাণ এবং বিনষ্ট বস্তু থেকে উদ্ধারযোগ্য মূল্য বীমাগ্রহীতা কর্তৃক বীমাকারীকে জানাতে হয়। বাড়ি বা অন্যান্য বিষয় যা মেরামতের দ্বারা ক্ষতিপূরণ সম্ভব, সে ক্ষেত্রে মেরামতের সম্ভাব্য খরচ উল্লেখ করা প্রয়োজন। বীমাগ্রহীতাকে তার ক্ষতিপূরণ দাবির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য, আদালতে শপথ নিতে[16] হতে পারে।

ইতোমধ্যে বীমাকারীর প্রতিনিধি সরেজমীন তদন্তে উপস্থিত হয় এবং তার কাজে বীমাগ্রহীতাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করতে হয়। অগ্নিবীমার দাবি মেটানোর কাজটি বিশেষ জটিলতাপূর্ণ বলে, সে জন্য বীমাকারী একজন মূল্য নিরূপক[17] নিয়োগ করে থাকে। ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা উপস্থিত হলে, বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতা উভয়ে একজন করিয়া সালিশ[18] নিয়োগ করে। তারা একমত না হলে বীমাকারী তাদের একজন আম্পায়ার বা মধ্যস্থ[19] নিয়োগ করে।

প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের পর, ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হয়। বীমাপত্রে প্রতিস্থাপন ধারা[20] সন্নিবিষ্ট থাকলে, বীমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বিনষ্ট দ্রব্যের অনুরূপ একটি নূতন দ্রব্য দিয়ে মীমাংসা করতে পারে।

---

12. Declaration Policy. 13. Subrogation. 14. Cover Note.
15. Assignment. 16. Affidavit. 17. Assessor.
18. Arbitrator. 19. Umpire. 20. Reinstatement Clause.

অন্যান্য প্রকারের বীমা

OTHER TYPES OF INSURANCE

১. মোটর গাড়ি বীমা[21] **ঃ** মোটর গাড়ি গ্যারেজে বা পথের পাশে অপেক্ষমাণ থাকাকালীন, তা বা তার অংশবিশেষ চুরি হলে মোটরের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চলমান অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলেও মোটরটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই সব বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি, বীমা কোম্পানী প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বহন করতে পারে। একে মোটর গাড়ি বীমা বলে।

দ্বিতীয়ত, মোটরের মালিক, মোটর চলাকালীন আরেকটি গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করলে বা পথিককে আহত বা নিহত করলে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আইনত দায়ী হয়। অনেক সময় বিত্তশালী ব্যক্তিকে চাপা দিলে বা মূল্যবান দ্রব্যের ক্ষতি করলে, মালিকের যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষমতার অভাব ঘটতে পারে। তাতে জনসাধারণের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে উপরোক্ত ঝুঁকি বহনের জন্যও বীমা-চুক্তি করা হয়ে থাকে। ১৯৪৮ সালের পর সরকার এটিকে বাধ্যতামূলক করেছেন। একে তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি বীমা[22] বলে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় প্রকার ঝুঁকি, যথাযোগ্য প্রিমিয়ামের পরিবর্তে একই বীমাপত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একে সামগ্রিক বীমাপত্র[23] বলে।

২. অপহরণ বীমা[24] **ঃ** কারবারী প্রতিষ্ঠানের মজুদ মূল্যবান দ্রব্য অপহরণজনিত ক্ষতির ঝুঁকি দূর করার জন্য অপহরণ বীমা গ্রহণ করা যায়। প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাকারীরা এই ঝুঁকি বহন করে।

গৃহস্থ বাড়িতেও ছিঁচকে চুরি, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি দ্বারা স্বর্ণালঙ্কার, জহরত, ঘড়ি, ঝরনা কলম ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য অপহরণজনিত ঝুঁকি, বীমা কোম্পানী প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বহন করতে চুক্তিবদ্ধ হয়। ভারতে এই প্রকারের বীমা প্রচলিত হয়েছে। তবে, কেবল মর্যাদাসম্পন্ন, বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই প্রকার বীমার প্রস্তাব, বীমা কোম্পানীগুলি গ্রহণ করে। এটি অপহরণ বীমা নামে পরিচিত।

৩. সততা বীমা[25] **ঃ** কারবারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের হেপাজতে অনেক পরিমাণে নগদ অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি থাকে। এবং কোন কোন কর্মচারীর অসাধুতা, যথা, তহবিল তছরূপ, পণ্য অপসারণ প্রভৃতির দরুন কারবারের সমূহ ক্ষতি ঘটতে পারে। কর্মচারীদের অসাধুতাজনিত ঝুঁকির দায় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মালিকরা উপযুক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমা কোম্পানীর দ্বারা এই ঝুঁকি বহন করাতে পারে। এটি সততা বীমা নামে পরিচিত।

অনেক কারবারে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নগদ জামিন হিসাবে লওয়া হয়। ক্যাশিয়ার তা দিতে অপরাগ হলে, কখনও কখনও বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যের 'ফাইডেলিটি বণ্ড' লওয়া হয়। এর বেলায়, নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমা কোম্পানী, ওই কর্মচারীর দোষে মালিকের ক্ষতি হলে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত আর্থিক ক্ষতির দায় বহন করে। এই জাতীয় বীমার ক্ষেত্রে মালিককে কর্মচারীদের কাজে যথোচিত সতর্কতা গ্রহণ করতে হয়, তা না হলে বীমা প্রস্তাব গৃহীত এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না।

৪. দুর্ঘটনা বীমা[26] **ঃ** কোন ব্যক্তি বা বস্তু, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত, বীমা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিময়ে বীমা চুক্তি করা যেতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটলে, তবেই ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়।

---

21. Motor Car Insurance.
22. Third Party Risk Insurance.
23. Comprehensive Policy.
24. Burglary and Larceny Insurance.
25. Fidelity Insurance.
26. Accident Insurance.

৫. নিয়োগকারী বা মালিকের দায় বীমা[২৭] ঃ কর্মচারীদের অবহেলাজনিত কারণে কারবারের মালিকের কোন দায়ের উদ্ভব এবং তজ্জন্য ক্ষতির ঝুঁকি থাকলে, প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তা বহনের জন্য বীমা প্রতিষ্ঠানের সাথে বীমা চুক্তি করা যায়। সাধারণত কনট্রাক্টর অথবা অডিটর বা হিসাবপরীক্ষকগণের ক্ষেত্রে এরূপ বীমাপত্র লওয়া হয়। অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে মালিককে কর্মচারীদের কাজের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে এই বীমা গ্রহণ করা হয়।

৬. বিমানভ্রমণ বীমা[২৮] ঃ বিমানের যাত্রী বা কর্মচারীরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিমানে ভ্রমণকালীন দুর্ঘটনা ঘটলে তাদের প্রাণ হানির আশঙ্কা থাকে। এবং এর ফলে তাদের পরিবারবর্গের সমূহ আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এজন্য প্রিমিয়ামের পরিবর্তে বীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তি দ্বারা বিমানভ্রমণ ঝুঁকির বীমা করা যেতে পারে।

৭. শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ ঝুঁকি বীমা[২৯] ঃ কর্মরত অবস্থায় শ্রমিক কর্মচারীর দুর্ঘটনায় পড়লে ও সে কারণে আহত বা নিহত হলে মালিক যে ক্ষতিপূরণ দেয়, তার জন্য বীমা কোম্পানীর সাথে প্রিমিয়ামের পরিবর্তে বীমা চুক্তি সম্পাদন করা যায়।

---

27. Employers' Liability Insurance.
28. Aviation Risk Insurance.
29. Workmen's Compensation Risk Insurance.

২৯

সামাজিক বীমা
SOCIAL INSURANCE

কর্মচারী রাজ্যবীমা করপোরেশন
EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION (E.S.I.C.)

উদ্দেশ্য ঃ অসুস্থতা, অক্ষমতা, মাতৃত্ব, বার্ধক্য ও মৃত্যু—এই পাঁচটি আপৎকালীন অবস্থায় উপার্জনহীনতার দরুন পুরুষ ও নারী শ্রমিক কর্মীরা এবং তাঁদের পরিবারবর্গ যে আর্থিক সংকটে পড়ে, তার উপযুক্ত প্রতিরোধের উপায়, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নামে পরিচিত। একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই এর ভার গ্রহণ করা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড়াও অনেক অগ্রসর পশ্চিমী দেশ যথা সুইডেন, ইংলন্ড প্রভৃতিতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

তবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও মিশ্র অর্থনীতিতে সর্বাঙ্গীণ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের অসুবিধা থাকায়, সীমাবদ্ধভাবে এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ, এইরূপ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয়।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে সংসদের কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন পাশ করে একটি বিধিবদ্ধ করপোরেশন রূপে কর্মচারী রাজ্যবীমা করপোরেশন স্থাপিত হয়েছে।

সংগঠন ঃ রাজ্য পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী এর সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এর সহ-সভাপতি। পদাধিকারবলে সদস্যরা ছাড়া অন্যান্য সদস্যদের কার্য-কাল ৪ বৎসর।

করপোরেশনের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে। এর মধ্যে কর্মচারী ও মালিকদের যথাক্রমে ২ জন করিয়া প্রতিনিধি আছেন।

চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়ে করপোরেশনকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ২১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা পরিষদ[২] আছে। তাতে ৩ জন করে শ্রমিক-কর্মচারী ও মালিকদের প্রতিনিধি আছে।

করপোরেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অধীনে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর ও দিল্লীতে একটি করে, পাঁচটি আঞ্চলিক কার্যালয় আছে। প্রত্যেক আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে প্রধান প্রধান শিল্পনগরে ও শ্রমিক অঞ্চলে স্থাপিত কতকগুলি স্থানীয় কার্যালয় আছে।

করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হলেন একজন ডাইরেক্টর জেনারেল। একজন বীমাকমিশনার, একজন চিকিৎসা-সংক্রান্ত কমিশনার, একজন চীফ একাউন্টস অফিসার ও একজন একচুয়ারী—এই চারজন মুখ্য কর্মী ডাইরেক্টর জেনারেলকে সাহায্য করেন।

কার্যাবলী ঃ করপোরেশন শ্রমিককর্মীদের জন্য পাঁচ রকমের সুবিধা দেয় ঃ

1. Social Security measures.
2. Medical Benefit Council.

১. চিকিৎসার সুবিধা[3] **:** অসুস্থতায়, কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত এবং প্রসবের আগে ও পরে বিনামূল্যে চিকিৎসকের পরামর্শ, ঔষধপত্র এবং গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় চিকিৎসা, গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা প্রভৃতি। প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ ও তাদের অধীনে চিকিৎসার ব্যবস্থা।

২. অক্ষমতায় সুবিধা[4] **:** কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার দরুন কর্মক্ষমতা সাময়িক-ভাবে নষ্ট হলে, চিকিৎসার সুবিধা ছাড়াও অন্তত ৭ দিনের জন্য অক্ষম হলে ওই সময়ের পূর্ণ মজুরির প্রায় অর্ধেক আর্থিক সাহায্য। স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মজুরির প্রায় অর্ধেক হারে আজীবন অবসর ভাতা অর্থাৎ পেনসন।

৩. পোষ্যদের জন্য সুবিধা[5] **:** কর্মরত অবস্থায় আহত হয়ে কারও মৃত্যু হলে তার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের বা তাদের অবর্তমানে অন্যান্য পোষ্যদের মৃতের স্বাভাবিক মজুরির অর্ধেক হারে ভাতা।

৪. অসুস্থতায় সুবিধা[6] **:** যে চাঁদা দিয়েছে, এমন শ্রমিক কর্মচারীকে অসুস্থ অবস্থায়, একটানা ৩৬৫ দিনের মধ্যে অনধিক ৫৬ দিনের জন্য গড়পড়তা দৈনিক মজুরির অর্ধেক হারে নগদ আর্থিক সাহায্য। এই বীমা পরিকল্পনায় যোগদানের ৭ থেকে ৯ মাস পরেই এরূপ আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়। ওই ৫৬ দিনের পরে কাজে যোগদানে অক্ষমতা হেতু আরও ১৮ সপ্তাহের জন্য স্বল্পতর হারে আর্থিক সাহায্য।

৫. মাতৃত্বকালীন সুবিধা[7] **:** প্রসবের আগে ও পরে ৬ সপ্তাহ করে, মোট ১২ সপ্তাহের জন্য প্রসূতিকে দৈনিক ৭৫ পয়সা অথবা অসুস্থতাকালীন নগদ সাহায্যের হারে, (অর্থাৎ দৈনিক গড়পড়তা মজুরির অর্ধেক) এই দুইয়ের মধ্যে যেটি বেশী, সেই হারে নগদ অর্থসাহায্য।

তহবিল : এই বীমা পরিকল্পনার অন্তর্গত ব্যয়ের জন্য একটি কর্মচারী রাষ্ট্রবীমা তহবিল[8] আছে। এটি মুখ্যত শ্রমিককর্মচারী ও নিয়োগকর্তাদের চাঁদা দ্বারা গঠিত। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য, দান ও উপহার বাবদ টাকাও এই তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া, করপোরেশনের প্রথম পাঁচ বৎসরের পরিচালনা ব্যয়ের ⅔ অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেছেন।

এই তহবিলে শ্রমিকদের চাঁদা তাদের গড়পড়তা আয়ের ২ শতাংশের সামান্য বেশী ধার্য হয়েছে। নিয়োগকর্তা বা মালিকগণের চাঁদা, যে সকল অঞ্চলে এই বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেখানে তাদের শ্রমিক কর্মীদের মজুরির ১½ শতাংশ ও যেখানে এটি বাধ্যতামূলক নয়, সেখানে ¾ শতাংশ হারে ধার্য হয়েছে। পরে সর্বত্র মালিকদের দেয় চাঁদার একই হার নির্দিষ্ট হবে।

করপোরেশনের অগ্রগতি : ১৯৪৮ সালে কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা আইন পাস এবং ১৯৫১ সালে তা সংশোধিত হয়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এটি চালু হয়।

২০ জন অথবা তার বেশী সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগকারী এবং শক্তি-ব্যবহারকারী সব কারখানাই এই আইনের এক্তিয়ারভুক্ত। ঐ সব কারখানায় নিযুক্ত ৪০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন উপার্জনকারী সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারী এই আইনের সুবিধা ভোগ করার অধিকারী।

১৯৭৩-এর মার্চ মাসে দেশে ই এস আই হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ৫৩টি। তাদের শয্যার সংখ্যা ছিল ৭,৮৬৩টি, নানা হাসপাতালে ই এস আই বিভাগ ছিল ২৪টি ও তাদের শয্যা সংখ্যা ছিল ৪৪২টি। এছাড়া ই এস আই ডিসপেনসারি ছিল ৭৩৬টি।

3. Medical Benefit.
4. Disablement Benefit.
5. Dependent's Benefit.
6. Sickness Benefit.
7. Maternity Benefit.
8. Employees' State Insurance Fund.

২৬ ঝুঁকি ও বীমা—জীবনবীমা

1. Describe endowment policies in life insurance. Suggest measures to make them more attractive in India. [B. U. 1962]
   [জীবনবীমায় মেয়াদী বীমাপত্র বর্ণনা কর। ভারতে একে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দাও।] উঃ ৪৪৮-৪৯ পৃঃ
2. 'Whole life' and 'Endowment Policies', both with and without profit, are issued by the Life Insurance Corporation. Discuss their respective advantages. List the main clauses of a life insurance policy. [C. U. 1964]
   [মুনাফাসহ এবং ব্যতীত 'আজীবন' এবং 'মেয়াদী বীমাপত্র', উভয় প্রকার বীমাপত্রই জীবনবীমা কর্পোরেশন বিলি করে। এদের সুবিধাগুলি অালোচনা কর। জীবন বীমাপত্রের প্রধান ধারাগুলি উল্লেখ কর।] উঃ ৪৪৮-৫০ পৃঃ

২৭ নৌবীমা

1. State and explain the various implied warranties in a marine policy. [B. U. 1961]
   [নৌবীমা পত্রের বিভিন্ন অনুল্লিখিত গৌণ শর্তের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর।] উঃ ৪৫৬-৫৭ পৃঃ
2. Write notes on General and Particular Average clauses in a Marine Insurance Policy. [C. U. 1964, B. U. 1965]
   [নৌবীমা পত্রের সাধারণ আংশিক ও বিশেষ আংশিক ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ধারাগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] উঃ ৪৫৭-৫৯ পৃঃ
3. Discuss the objects of 'Marine Insurance' and comment on the main clauses of a marine insurance policy. [C. U. 1964]
   [নৌবীমার উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা কর এবং নৌবীমার প্রধান ধারাগুলি সম্পর্কে মন্তব্য কর।] উঃ ৪৫৫, ৪৬১-৬৩ পৃঃ
4. State the different types of marine insurance policy. Enumerate the main clauses which are found in such a policy. [B. U. 1965]
   [বিভিন্ন প্রকার নৌবীমা পত্রের উল্লেখ কর। এরূপ বীমাপত্রের প্রধান ধারাগুলি উল্লেখ কর।] উঃ ৪৫৭, ৪৬১-৬৩ পৃঃ
5. Discuss the main clauses of a Marine Insurance Policy. [C. U. 1968]
   [নৌবীমা পত্রের প্রধান ধারাগুলি আলোচনা কর।] উঃ ৪৬১-৬৩ পৃঃ

২৮ অগ্নি ও অন্যান্য বীমা

1. Discuss the procedure of claim and settlement of a Fire Insurance Policy.
   [অগ্নিবীমার ক্ষতিপূরণ দাবি ও মীমাংসার পদ্ধতি আলোচনা কর।] উঃ ৪৬৭ পৃঃ
2. Write a short note on :
   (1) Accident Insurance. [C. U. 1973]
   (2) L. I. C. [C.U. 1969]
   (3) Insuring risks of business. [C. U. Hons. 1970]
   [(১) দুর্ঘটনা বীমা; (২) এল আই সি; (৩) কারবারের ঝুঁকি বীমা করা—এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ।] উঃ ৪৬৮, ৪৫৩-৫৪, ৪৪৫-৪৬ পৃঃ
3. Discuss the importance of Fire and Marine Insurance in business. What is meant by General Average ? [C. U. 1971]
   [অগ্নি ও নৌবীমার গুরুত্ব বিচার কর। জেনারেল এ্যাভারেজ বা সাধারণ আংশিক ক্ষতি বলতে কি বোঝায় ?] উঃ ৪৬৫, ৪৫৫, ৪৫৮-৫৯, ৪৬৬ পৃঃ

২৯ সামাজিক বীমা

1. Discuss the various types of benefits available to working men under Employees' State Insurance.
   [কর্মচারী রাজ্যবীমার অধীনে শ্রমিক কর্মচারীরা যে সকল বিবিধ সুবিধা ভোগ করে তা বর্ণনা কর।] উঃ ৪৭০-৭১ পৃঃ

দশম খণ্ড কারবারের সহায়ক সংস্থাসমূহ
AGENCIES IN AID OF BUSINESS

অধ্যায়

৩০

কারবারের অগ্রগতির সহায়ক রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

STATE & INSTITUTIONS FOR THE FURTHERANCE OF BUSINESS

সকল ধনতন্ত্রী দেশেই শিল্প, ব্যবসায় এবং বাণিজ্যের অগ্রগতির সহায়তার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সংঘ, সমিতি, সংস্থা, সংসদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উন্নতিতে সাহায্য করাই তাদের উদ্দেশ্য। এদের মধ্যে বেসরকারী এবং সরকারী ও অর্ধসরকারী, নানাবিধ সংগঠনই আছে। ভারতে অবস্থিত এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে এবং কারবারের অগ্রগতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে নিচে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

বেসরকারী সংগঠনসমূহ
(PRIVATE AGENCIES)

১. বণিকসভা[১] ঃ শিল্পে, ব্যবসায় এবং বাণিজ্যে নিযুক্ত কারবারীদের দ্বারা স্বেচ্ছা-মূলক মিলনের ভিত্তিতে গঠিত অ-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সকল দেশেই দেখা যায়। এরা বণিকসভা নামে পরিচিত। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা, ব্যাঙ্কার, একাউন্ট্যান্ট ও অডিটার প্রভৃতি সকলেই এর সভ্য হতে পারে।

আগে বণিকসভাগুলি সাধারণত অ-রেজিস্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত হত। কিন্তু বর্তমানে সর্বত্রই এইগুলি যৌথ-কারবারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানীসমূহের নিবন্ধক কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে গঠিত হচ্ছে। তবে এদের নামের সঙ্গে 'লিমিটেড' কথাটি থাকে না।

স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয়, নানা ভিত্তিতেই বণিকসভা, ব্যবসায়ী সমিতি ইত্যাদি গঠিত হতে পারে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত বণিকসভাগুলি অনেক সময় আবার জাতীয় ভিত্তিতে বৃহত্তর সভা গঠন করে। যেমন, ভারতে এরূপ দুইটি প্রধান সর্বভারতীয় বণিকসভা হল—দি এসোসিয়েটেড চেম্বারস অব কমার্স ও দি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স এ্যাণ্ড ইনডাস্ট্রিস।

ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্পসমূহের গতি পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের মূল সমস্যা-গুলির সমাধানের দ্বারা তাদের সামগ্রিক উন্নতি ও বিস্তারে কার্যকরী সহায়তা প্রদান করাই এদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত কাজগুলির দ্বারা এরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করে কারবারী জগতকে বিশেষভাবে উপকৃত করে ঃ (১) ব্যবসায়ী, বণিক ও শিল্পপতিদের সুবিধার জন্য দেশের ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্প সম্বন্ধে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য, সংবাদ ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে এরা পত্র, পুস্তিকা মাধ্যমে ও রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করে। (২) বাণিজ্য, ব্যবসায় ও শিল্পবিষয়ক পাঠাগার পরিচালনা করে। (৩) সদস্যদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ আপসে মেটানোর জন্য সালিসী[২] করে। (৪) ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, কর, বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে। (৫) সভ্যদের ট্রেড মার্ক ও পেটেন্ট

1. Chamber of Commerce. 2. Arbitration.

সংক্রান্ত অধিকার রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকে। (৬) ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট মানের সঠিক ওজন ও মাপ[3] যাতে সর্বত্র ব্যবহৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখে। (৭) বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিবহণ, ভাড়া, বীমা, আনুষ্ঠানিক বিধিসমূহ[4] সম্পর্কে সদস্যদের প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করে; রপ্তানি দ্রব্যের প্রভবলেখ প্রদান করে এবং অনেক সময় সভ্যগণের উপর প্রদত্ত বাণিজ্যিক বিলের স্বীকৃতি হিসাবে তা সই করে। (৮) আধুনিক-কালে ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক ও শিল্প সংগঠনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য এরা এই সব বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পরিচালনা করে। লন্ডন চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাদান, পরীক্ষা পরিচালনা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত-গণের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

এইরূপে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির বন্ধু ও নেতা হিসাবে বণিকসভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

২. ব্যবসায়ী সমিতিসমূহ[5] **:** একই ব্যবসায় ও শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা সমস্বার্থে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষা এবং কারবারের সম্প্রসারণ, বাধা-বিঘ্ন অপসারণ ও উন্নতির জন্য সমিতিবদ্ধ হয়। ব্যবসায়ীদের মত উৎপাদকরাও এই ধরনের সমিতি গঠন করে। এই দুরকম সমিতিই ব্যবসায়ী সমিতি নামে পরিচিত।

ভারতে বনস্পতি উৎপাদক সমিতি, তৈলকল সমিতি, ভারতীয় বিস্কুট উৎপাদক সমিতি, ভারতীয় সাবান উৎপাদক সমিতি, মাস্টার প্রিন্টার্স এসোসিয়েশন, টাটা বার ডিলার্স এসোসিয়েশন, জুট বেইলার্স এসোসিয়েশন প্রভৃতি এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

৩. প্রদর্শনীসমূহ[6] **:** বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদকরা নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি সম্ভাব্য দেশী ও বিদেশী ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকে। এটি কারবারী জগতের একটি সুপরিচিত পদ্ধতি। কৃষি এবং শিল্পজাত বিবিধ দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য ও পুঁজি দ্রব্যের নির্মাতারা তাদের পণ্যের পরিচিত ও কারবারী ক্রেতা আকর্ষণের জন্য স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, নানারূপ প্রদর্শনীর আয়োজনই করে থাকে।

এই সব প্রদর্শনীর অধিকাংশ বেসরকারী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণের দ্বারা আয়োজিত হলেও, অধুনা নানাদেশে সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত এইরূপ প্রদর্শনীর সংখ্যা বাড়ছে। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর মোটর গাড়ি ও বিমান নির্মাতাগণের দ্বারা আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে বিবিধ পণ্যের প্রচার এবং তাদের ভবিষ্যৎ বাজার সৃষ্টি। পণ্যাদির আশু বিক্রয় তাদের উদ্দেশ্য নয়। রকমারী অথবা নির্দিষ্ট শ্রেণীর, উভয় প্রকার পণ্যের প্রদর্শনীই আয়োজিত হতে পারে।

৪. মেলা[7] **:** মেলাগুলিকে বিবিধ পণ্যের সুসজ্জিত সাময়িক বাজার বলা যায়। ধর্মীয় অথবা ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র মেলার সূত্রপাত হয়েছিল। এই সব মেলায় আগত মানুষের কাছে বিক্রয়ের জন্য পণ্যের স্বল্প-কালস্থায়ী বাজার সৃষ্টি হয়। অধুনা ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও শুধুমাত্র বিভিন্ন দ্রব্যের প্রচার, প্রদর্শনী ও সরাসরি বিক্রয়ের জন্য কৃষি, শিল্প প্রভৃতি নানা প্রকার মেলা সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সংগঠিত হয়ে থাকে। ভারতে ইদানীং দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আয়োজিত শিল্প ও কৃষি প্রভৃতি মেলার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য। জার্মানীর লিপজিগ মেলা, সোভিয়েত রাশিয়ার নিঝ্নি নোভগোরড্-এর মেলা, ইংলণ্ডের এডিনবরা মেলা প্রভৃতি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক শিল্প মেলার উদাহরণ।

---

3. Weight & measures. 4. Formalities.
5. Trade Associations. 6. Exhibitions. 7. Fairs.

৫. ব্যবসায় প্রতিনিধিদল[8] **:** **পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশস্থ উৎপাদনকারীরা** বিদেশী সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন দেশে ব্যবসায় প্রতিনিধিদল পাঠায়। তারা বিদেশে গিয়ে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার দ্বারা সেখানে পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ সম্ভাবনা অনুসন্ধান করে এবং সম্ভবক্ষেত্রে পণ্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও মেলাতে এই প্রকারের ব্যবসায় প্রতিনিধিদল গিয়ে সেখানে প্রদর্শিত পণ্যাদি দেখে পছন্দ হলে, সুবিধাজনক দরে বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। এই সব ব্যবসায় প্রতিনিধিদল সরকারী ও বেসরকারী, দুরকম উদ্যোগেই সংগঠিত ও প্রেরিত হতে পারে।

•

ভারতের সরকারী ও অর্ধ-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ
PUBLIC AND SEMI-PUBLIC INSTITUTIONS IN INDIA

১. মন্ত্রিদপ্তর ও অধিকারসমূহ[9] **:** বর্তমানে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে জাতীয় অর্থনীতিক কার্যকলাপের সহায়তার জন্য শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায় ও কৃষি-সংক্রান্ত পৃথক মন্ত্রিদপ্তর ও অধিকার[10] আছে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অধীনে পৃথক মন্ত্রিদপ্তর থাকে। মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত নীতি কার্যকর করার জন্য তার অধীনে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রিদপ্তর[11] এবং তার অধীন একটি বাণিজ্য ও শিল্পাধিকার[12] আছে। প্রতি রাজ্যেও অনুরূপভাবে রাজ্য বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রী, মন্ত্রীদপ্তর এবং অধিকার আছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এবং শিল্প দপ্তরের কাজ হল বাণিজ্য ও শিল্পের নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নতি সাধনে সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণ, বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি। প্রতি রাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রিদপ্তর ও অধিকারের নীতি ও কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভারতে এই সব মন্ত্রিদপ্তর ও অধিকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, মিশ্র অর্থনীতি ও অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে যাবতীয় বৃহদায়তন, নাতিবৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সুশৃঙ্খল বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. জাতীয় গবেষণাগারসমূহ[13] **:** বিভিন্ন দেশে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সহায়তার জন্য সরকার কর্তৃক নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। নূতন কাঁচামাল ও দ্রব্য উদ্ভাবন, পরিচিত দ্রব্য ও উৎপাদনের নূতন ব্যবহার, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে, নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা পরিচালনা করাই এই সকল জাতীয় গবেষণাগারের উদ্দেশ্য। একমাত্র উদার সরকারী সাহায্য ছাড়া এদের বিরাট ব্যয় বহন করা সম্ভব নয় বলে অধিকাংশ দেশেই এরা সরকার কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

ভারতে এই প্রকার জাতীয় গবেষণাগারের সংখ্যা পঁচিশ। এদের মধ্যে কয়েকটির নাম দেওয়া গেল।

জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগার[14] **:** এটি ১৯৫০ সালে পুনাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। রসায়ন সম্বন্ধে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা পরিচালনা করাই এর উদ্দেশ্য।

জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার[15] **:** ১৯৫০ সালে নয়াদিল্লীতে স্থাপিত এই গবেষণা—

8. Trade Delegations. 9. Ministries and Directorates.
10. Directorates. 11. Ministry of Commerce & Industries.
12. Directorate of Commerce & Industries.
13. National Laboratories.
14. National Chemical Laboratory.
15. National Physical Laboratory.

-গারের উদ্দেশ্য হল, পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা পরিচালনা করা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের নির্ধারিত মান বজায় রাখা।

কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণা সংস্থা[16] ঃ ১৯৫০ সালে, বিহারের অন্তর্গত জিয়াল-গোরাতে স্থাপিত এই গবেষণাগারটির উদ্দেশ্য হল কঠিন, তরল ও বায়বীয়, সকল প্রকার জ্বালানী সম্পর্কে গবেষণা এবং এর অধীন ছয়টি জরিপ-কেন্দ্রের সাহায্যে ভারতীয় কয়লার রাসায়নিক ও পদার্থগত জরিপ পরিচালনা করা।

কেন্দ্রীয় কাঁচ ও মৃৎশিল্প বিষয়ক গবেষণা সংস্থা[17] ঃ কলকাতার উপকণ্ঠে যাদব-পুরে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গবেষণাগারটির প্রধান কাজ হল কাঁচ ও মৃৎশিল্প, চীনামাটি, তাপপ্রতিরোধক পদার্থ এবং এনামেল সম্পর্কে গবেষণাকার্য ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালনা করা।

কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণা সংস্থা[18] ঃ ১৯৫০ সালে মহীশূরে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ হল খাদ্য প্রস্তুত প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণ, খাদ্য ইঞ্জিনীয়ারিং ও বিভিন্ন ফল সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা পরিচালনা করা।

কেন্দ্রীয় খনি গবেষণা কেন্দ্র[19] ঃ বিহারের অন্তর্গত ধানবাদে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে খনন পদ্ধতি, নিরাপত্তা এবং খনিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

কেন্দ্রীয় যান্ত্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা সংস্থা[20] ঃ দুর্গাপুরে অবস্থিত এই গবেষণা-গারটিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগঠন[21] ঃ নয়াদিল্লীতে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ হল শিক্ষা, গবেষণা ও শিল্পবিষয়ক বিবিধ দেশীয় ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও তাদের উন্নতি সাধন করা।

৩. **ভারতীয় মানক সংস্থা**[22] ঃ বৃহদায়তন উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও রপ্তানি কারবারের সম্প্রসারণের জন্য নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আধুনিক কালে সর্বাগ্রে কৃষিজাত কাঁচামাল, বিবিধ পণ্য ও যন্ত্র, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন মান ও উৎকর্ষ নির্ধারণ এবং তার পর ঐ নির্ধারিত মান অনুযায়ী উৎপাদন সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে অর্ধসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতীয় মানক সংস্থা ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি বিভিন্ন দ্রব্যের ও তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপাদন মান নির্ধারণ এবং নির্ধারিত মান অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যের শ্রেণীবদ্ধকরণ কার্যে নিযুক্ত রয়েছে। নির্ধারিত মান অনুযায়ী উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য এই সংস্থা প্রত্যয়নপত্র[23] প্রদান করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যে তার নামাঙ্কিত ছাপ[24] ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

৪. **কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক সংবাদ সংগ্রহ ও পরিসংখ্যান বিভাগ**[25] ঃ ভারতের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় এবং অভ্যন্তরীণ শিল্পজাত দ্রব্য, কৃষিজ ও অন্যান্য নানাবিধ কাঁচামালের উৎপাদন-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রকাশ, কৃষিজাত দ্রব্যের ভবিষ্যৎ উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ ও আভাস প্রদান ইত্যাদি নানাবিধ কার্যভার বহনের জন্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের অধীনে, কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক সংবাদ সংগ্রহ ও পরিসংখ্যান বিভাগ আছে. এর কার্যালয় কলকাতায় অবস্থিত।

16. Central Fuel Research Institute.
17. Central Glass & Ceramic Research Institute.
18. Central Food Technology Research Institute.
19. Central Mining Research Station.
20. Central Mechanical Engineering Research Institute.
21. Central Scientific Instruments Organisation.
22. Indian Standards Institute. 23. Certificate. 24. Seal.
25. Department of Commercial Intelligence & Statistics.

৫. বিপণন পর্ষৎসমূহ[২৬] **:** ভারতের কৃষিজাত এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি, বিক্রয় বৃদ্ধি, উৎপাদনের উন্নতি ও সম্প্রসারণ এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের সাধারণ উন্নয়নের পরামর্শ প্রদান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পর্ষৎ ইদানীং-কালে স্থাপিত হয়েছে। এদের অনেকগুলি নির্দিষ্ট আইনদ্বারা গঠিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সরকার মনোনীত, সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের নিয়ে এরা গঠিত। নিচে এদের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

কেন্দ্রীয় চা পর্ষৎ[২৭] **:** ১৯৫৩ সালের চা-আইন অনুযায়ী এটি গঠিত এবং ওই আইন বলবৎ করার ভারপ্রাপ্ত। ভারত ও ভারতের বাইরে চায়ের বিক্রয় বৃদ্ধি ও বাজার সৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এটি কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এবং শিল্পদপ্তরের অধীন প্রতিষ্ঠান। চায়ের উৎপাদন-উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং চায়ের দালালদের লাইসেন্স প্রদান এর অন্যতম কাজ।

কেন্দ্রীয় কফি পর্ষৎ[২৮] **:** এটিও একটি আইনসৃষ্ট সংস্থা। ভারতের কফিশিল্পের উন্নতি এবং কফি বাজারের সম্প্রসারণ এর প্রধান উদ্দেশ্য। এটিও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এবং শিল্পদপ্তরের অধীন প্রতিষ্ঠান।

ভারতীয় নারিকেলকাতা পর্ষৎ[২৯] **:** নির্দিষ্ট আইনদ্বারা স্থাপিত ও বিধিবদ্ধ এই সংস্থাটি নারিকেল-ছোবড়ার আঁশ থেকে বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন শিল্পের উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত। ১৯৫৩ সালের কয়ার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাক্ট অনুসারে ১৯৫৪ সালে কেরালা রাজ্যের এর্নাকুলামে এটি স্থাপিত হয়েছে।

নিখিল ভারত হস্তশিল্প পর্ষৎ[৩০] **:** ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পর্ষৎটি ১৯৫৭ সালে পুনর্গঠিত হয়। ভারতের বিবিধ হস্তশিল্পের উন্নয়ন এবং তাদের উপজাত বিবিধ পণ্যের বিপণনে সহায়তা করার জন্য পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি গঠিত হয়েছে।

ভারতীয় রবার পর্ষৎ[৩১] **:** এটিও একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। ভারতের রবার শিল্পের উন্নয়ন এর লক্ষ্য।

কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষৎ[৩২] **:** ১৯৫৯ সালে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের রেশমের চাষ এবং রেশম বয়নশিল্পের উন্নয়নের ভার এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত পর্ষৎ[৩৩] **:** এটি ১৯৫৮ সালে পুনর্গঠিত হয়েছে। ভারতের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের এবং তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধিতে পরামর্শ ও সহায়তার জন্য এটি স্থাপিত হয়েছে।

৬. রপ্তানি উন্নয়ন পর্ষৎসমূহ[৩৪] **:** ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের উদ্বৃত্তে শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার যে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন পর্ষদগুলি প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। রপ্তানিকারী প্রত্যেক শিল্পের রপ্তানি বেড়ে যাতে আরও বেশী পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জিত হয়, সেজন্য প্রত্যেক রপ্তানি শিল্পের জন্য এক একটি রপ্তানি পর্ষৎ গঠিত হয়েছে। এদের প্রধান কাজ হল সংশ্লিষ্ট শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধির বাধা অপসারণ, বৈদেশিক বাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক বাজার সৃষ্টি ও তা সম্প্রসারণের জন্য পরামর্শ প্রদান।

৭. বাণিজ্যিক দূতালয়[৩৫] **:** বিদেশে দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি ও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য এবং দেশীয় রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নতির

26. Markcting Boards.
27. Central Tea Board.
28. The Coffee Board.
29. Indian Coir Board.
30. All India Handicrafts Board.
31. Indian Rubber Board.
32. The Central Silk Board.
33. All India Handloom Board.
34. Export Promotion Councils.
35. Consulates.

জন্য সমস্ত রাষ্ট্রই ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে বাণিজ্যিক দূত পাঠায়। এরা কিছুটা পরিমাণে রাষ্ট্রদূতের কাজও করে। এরা যে রাষ্ট্রে নিযুক্ত হয়, তার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক তথ্য সংগ্রহ করে নিজ রাষ্ট্রে পাঠায়। এই সমস্ত তথ্য থেকে দেশীয় আমদানি ও রপ্তানিকারীরা বিশেষ উপকৃত হয়।

৮. বিক্রয় কেন্দ্র[৩৬] : ভারতের প্রধান প্রধান শহরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রচার ও বিক্রয়ে সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষিত বহু বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সাধারণত, বড় বড় শহরের প্রধান পথের উপর, শহরের কেন্দ্রস্থলে, জনবহুল অঞ্চলে, যানবাহন কেন্দ্রে এদের স্থাপন করা হয়। বিদেশেও এই-রূপ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। কলকাতা কাশ্মীর সরকারের সেলস এম্পোরিয়াম মাদ্রাজ হ্যাণ্ডলুম এম্পোরিয়াম, ও রাজ্য সরকারের সেল্স্ এম্পোরিয়াম প্রভৃতি এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

৯. প্রদর্শশালা[৩৭] : প্রধানত শিল্প বাণিজ্যিক ও বিবিধ লোকশিক্ষা বিষয়ে প্রচার ও তাদের চর্চায় উৎসাহদানের জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে প্রদর্শশালা স্থাপিত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত প্রদর্শশালা বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর স্থায়ী প্রদর্শনী বলে দেশীয় ও বিদেশীয় আগ্রহী ব্যক্তিদের আকর্ষণস্থলে পরিণত হয়। কলকাতার বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড টেকনলজিক্যাল মিউজিয়াম এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ভারতের বাইরে ভারতীয় পণ্যের বাণিজ্যিক প্রচারের বিধিব্যবস্থার জন্য ভারত সরকার একটি ডাইরেকটরেট অব এগজিবিশনস স্থাপন করেছেন।

১০. ক্ষুদ্র শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান[৩৮] : ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে কারিগরি সাহায্য দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প সম্প্রসারণ সেবা[৩৯] নামে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। এর অংশ হিসাবে দিল্লীসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ১৬টি ক্ষুদ্র শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান ও তাদের ৫টি শাখা প্রতিষ্ঠান এবং ৬১টি সম্প্রসারণ/উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এরা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারিগরি এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সহায়তা দেয়।

১১. ব্যবসায় পর্ষৎ[৪০] : ব্যবসায় ও শিল্পের সাথে পরামর্শ করে সর্বদা রপ্তানি উন্নয়ন সম্পর্কিত বিচার-বিবেচনার জন্য ১৯৬২ সালের মে মাসে ভারত সরকার একটি ব্যবসায় পর্ষৎ স্থাপন করেছেন। ভারতের মধ্যে ও বাইরে সু-ব্যবসায় রীতি, অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল স্থাপন, রপ্তানিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা, শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস প্রভৃতি সম্পর্কে এই পর্ষৎ কতকগুলি উপসমিতি স্থাপন করেছে।

১২. রপ্তানি তদারকি পরামর্শদাতা পরিষদ[৪১] : রপ্তানিপণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য একটি কার্যক্রম প্রণয়ন করার জন্য এই পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত হয়েছে।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

৩০ ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং শিল্পের অগ্রগতির সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ

1. What steps have been taken by Central and State Governments in India for furtherance of industry, trade and commerce? (A general idea is wanted.) [C. U. Hons. 1965]
   [ভারতে শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অগ্রগতিতে সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার সমূহে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? (একটি মোটামুটি ধারণা চাওয়া হয়েছে।)]
   উঃ ৪৭৫-৮০ পৃঃ
2. Write a short note on : Chamber of Commerce. [C .U. 1965]
   [বণিকসভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] উঃ ৪৭৫-৭৬ পৃঃ

---

36. Sales Emporium. 37. Museum.
38. Small Industries Service Institutes.
39. Industrial Extension Service.
40. Board of Trade. 41. Export Inspection Advisory Council.

পরিশিষ্ট

বাণিজ্যিক শব্দকোষ—পরিভাষা

Ab initio—শুরু থেকে।

Above Par (or At a premium)—"অধি হার", লিখিত মূল্যোর্ধে : স্টক বা শেয়ার যখন নির্দিষ্ট লিখিত মূল্যের বেশী মূল্যে বিক্রয় হয় তখন ঐ মূল্যকে "অধি হার" বলে।

Acceptance—স্বীকৃত হুণ্ডি : হুণ্ডি গ্রাহক বাণিজ্যিক হুণ্ডির অর্থ প্রদানের দায় মেনে নিয়ে তা সই করে ফেরৎ দিলে সে হুণ্ডিকে "স্বীকৃত হুণ্ডি" বলে।

Account Payee (or A/c Payee only) : এই শব্দ দুটি চেকের উপর লেখা থাকলে কেবল চেকে উল্লেখিত ব্যক্তিই কোন ব্যাংকের মারফত ঐ চেক ভাঙাতে পারে।

Account Sales (A/s)—এটি হল পণ্য প্রাপক কর্তৃক প্রেরিত পণ্যপ্রেরকের নিকট একটি বিবৃতি। এই বিবৃতিতে পণ্য বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থের পরিমাণ থেকে বিক্রয় বাবদ যাবতীয় খরচ ও পণ্য প্রাপকের দস্তুরী বাদ দিয়ে পণ্য প্রেরকের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ দেখানো হয়।

Active Partner—সক্রিয় বা উদ্যোগী অংশীদার : অংশীদারী কারবারের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের সক্রিয় বা উদ্যোগী অংশীদার বলে।

Ad velorem—মূল্যানুযায়ী : কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর গুণাগুণ বা পরিমাণ বিচার না করে মূল্য অনুযায়ী শুল্ক ধার্য হয়ে থাকে। তাকে মূল্যভিত্তিক শুল্ক বলে।

Affidavit—শপথ-পত্র বা হলফনামা : আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করান তার সামনে শপথ করে যে লিখিত বিবৃতি দেওয়া হয় তাকে শপথনামা বলে।

Agenda—সভার কর্মসূচী : সভায় আলোচ্য বিষয়সূচীর প্রকৃতি ও ক্রমিক ধারা অনুসারে সভায় আলোচ্য বিষয়বস্তুর যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাকে সভার কার্যসূচী বলে।

Agent—এজেন্ট বা প্রতিনিধি : কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হয়ে কাজ করার জন্য নিযুক্ত হলে তাকে প্রতিনিধি বলে। নিয়োগকারীকে বলে মুখ্য ব্যক্তি।

Annual Return—বার্ষিক বিবরণী : শেয়ার পুঁজি নিয়ে গঠিত এবং কোম্পানী আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ প্রত্যেকটি কোম্পানীকে প্রতি বৎসর কোম্পানী নিবন্ধকের কাছে এই বিবরণী অবশ্যই দাখিল করতে হয়। কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তী চতুর্দশতম দিনে যারা কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার ছিল এবং বিগত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী দাখিলের পর যারা কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার পদ ত্যাগ করেছে, তাদের নামের দুইটি আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে তার সাথে পুঁজি ও শেয়ারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করতে হয়। তাতে ক. কোম্পানীর শেয়ার পুঁজির পরিমাণ ও তাতে কতগুলি শেয়ারে বিভক্ত খ. কোম্পানীর কার্যারম্ভের পর থেকে বার্ষিক বিবরণী দাখিলের সময় পর্যন্ত কতগুলি শেয়ার বিক্রয় হয়েছে, গ. তলবী অর্থ কি পরিমাণ পাওয়া গেছে; ঘ. বকেয়া তলবী অর্থের পরিমাণ; ঙ. শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের কমিশন দেওয়া হলে তার মোট পরিমাণ; চ. শেয়ার বিক্রয়ে কোন ডিসকাউন্ট দেওয়া হলে অথবা তার যে অংশ অবলিখিত (written off) হয় তার পরিমাণ; ছ. গত বার্ষিক বিবরণী দাখিলের পর এ পর্যন্ত ডিবেঞ্চার বিক্রয়ে যে ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ; জ. যে পরিমাণ শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা; ঝ. যে সংখ্যক শেয়ার বাবদ শেয়ার ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়নি; ঞ. গত বার্ষিক বিবরণী দাখিলের পর এ পর্যন্ত যে সংখ্যক শেয়ার ওয়ারেন্ট বিলি করা হয়েছে ও যে সংখ্যক শেয়ার ওয়ারেন্ট শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানীর কাছে ফেরৎ দিয়েছে; ট. প্রতিটি শেয়ার ওয়ারেন্টের উল্লিখিত শেয়ারের সংখ্যা; ঠ. পরিচালকদের কোম্পানীর কর্মসচিবের, সেক্রেটারীজ এণ্ড ট্রেজারার্স ও ম্যানেজিং এজেন্টের সম্পর্কিত তালিকাবহিতে তাদের সম্পর্কে লিপিবদ্ধ তথ্যাদি; ড. নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধনযোগ্য কোম্পানীর সম্পত্তি বন্ধ, প্রভার (charge) প্রভৃতি বাবদ মোট দেনা। তা ছাড়া নগদে পূর্ণ বা আংশিক মূল্য নিয়ে কত শেয়ার বিক্রি হয়েছে ও নগদ ছাড়া অন্যভাবেই বা পূর্ণ বা আংশিক মূল্য নিয়ে কত শেয়ার বিক্রি হয়েছে তার পরিমাণও এই বিবরণীতে উল্লেখ করতে হয়। নির্ধারিত ফরমে ও কোম্পানীর পরিচালকদের ও কর্মসচিবের স্বাক্ষর এবং নির্ধারিত স্ট্যাম্প দিয়ে এই বিবরণী দাখিল করা হয়।

Annuity—বার্ষিক বৃত্তি : বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদান বা প্রাপ্তিকে বার্ষিক বৃত্তি বলে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে এই শব্দটি প্রধানত ব্যবহৃত হয়। বার্ষিক বৃত্তি নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের বা আজীবন হতে পারে।

সমস্ত রাষ্ট্রই ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে বাণিজ্যিক দূত পাঠায়। এরা কিছুটা পরিমাণে রাষ্ট্রদূতের কাজও করে। এরা যে রাষ্ট্রে নিযুক্ত হয়, তার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক তথ্য সংগ্রহ করে নিজ রাষ্ট্রে পাঠায়। এই সমস্ত তথ্য থেকে দেশীয় আমদানি ও রপ্তানিকারীরা বিশেষ উপকৃত হয়।

৮. বিক্রয় কেন্দ্র[৩৬] ঃ ভারতের প্রধান প্রধান শহরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রচার ও বিক্রয়ে সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষিত বহু বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সাধারণত, বড় বড় শহরের প্রধান পথের উপর, শহরের কেন্দ্রস্থলে, জনবহুল অঞ্চলে, যানবাহন কেন্দ্রে এদের স্থাপন করা হয়। বিদেশেও এই-রূপ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। কলকাতা কাশ্মীর সরকারের সেলস এম্পোরিয়াম মাদ্রাজ হ্যান্ডলুম এম্পোরিয়াম, ও রাজ্য সরকারের সেল্‌স্‌ এম্পোরিয়াম প্রভৃতি এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

৯. প্রদর্শশালা[৩৭] ঃ প্রধানত শিল্প বাণিজ্যিক ও বিবিধ লোকশিক্ষা বিষয়ে প্রচার ও তাদের চর্চায় উৎসাহদানের জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে প্রদর্শশালা স্থাপিত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত প্রদর্শশালা বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর স্থায়ী প্রদর্শনী বলে দেশীয় ও বিদেশীয় আগ্রহী ব্যক্তিদের আকর্ষণস্থলে পরিণত হয়। কলকাতার বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড টেকনলজিক্যাল মিউজিয়াম এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ভারতের বাইরে ভারতীয় পণ্যের বাণিজ্যিক প্রচারের বিধিব্যবস্থার জন্য ভারত সরকার একটি ডাইরেকটরেট অব এগজিবিশনস স্থাপন করেছেন।

১০. ক্ষুদ্র শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান[৩৮] ঃ ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে কারিগরি সাহায্য দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প সম্প্রসারণ সেবা[৩৯] নামে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। এর অংশ হিসাবে দিল্লীসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ১৬টি ক্ষুদ্র শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান ও তাদের ৫টি শাখা প্রতিষ্ঠান এবং ৬১টি সম্প্রসারণ/উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এরা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারিগরি এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সহায়তা দেয়।

১১. ব্যবসায় পর্ষৎ[৪০] ঃ ব্যবসায় ও শিল্পের সাথে পরামর্শ করে সর্বদা রপ্তানি উন্নয়ন সম্পর্কিত বিচার-বিবেচনার জন্য ১৯৬২ সালের মে মাসে ভারত সরকার একটি ব্যবসায় পর্ষৎ স্থাপন করেছেন। ভারতের মধ্যে ও বাইরে সু-ব্যবসায় রীতি, অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল স্থাপন, রপ্তানিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা, শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস প্রভৃতি সম্পর্কে এই পর্ষৎ কতকগুলি উপসমিতি স্থাপন করেছে।

১২. রপ্তানি তদারকি পরামর্শদাতা পরিষদ[৪১] ঃ রপ্তানিপণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য একটি কার্যক্রম প্রণয়ন করার জন্য এই পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত হয়েছে।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

৩০ ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং শিল্পের অগ্রগতির সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ

1. What steps have been taken by Central and State Governments in India for furtherance of industry, trade and commerce? (A general idea is wanted.) [C. U. Hons. 1965]
   [ভারতে শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অগ্রগতিতে সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার সমূহে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? (একটি মোটামুটি ধারণা চাওয়া হয়েছে।)]
   উঃ ৪৭৫-৮০ পৃঃ
2. Write a short note on : Chamber of Commerce. [C .U. 1965]
   [বণিকসভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] উঃ ৪৭৫-৭৬ পৃঃ

---

36. Sales Emporium. 37. Museum.
38. Small Industries Service Institutes.
39. Industrial Extension Service.
40. Board of Trade. 41. Export Inspection Advisory Council.

বাণিজ্যিক শব্দকোষ—পরিভাষা

Ab initio—শুরু থেকে।

Above Par (or At a premium)—"অধি হার", লিখিত মূল্যোর্ধ্বে : স্টক বা শেয়ার যখন নির্দিষ্ট লিখিত মূল্যের বেশী মূল্যে বিক্রয় হয় তখন ঐ মূল্যকে "অধি হার" বলে।

Acceptance—স্বীকৃত হুণ্ডি : হুণ্ডি গ্রাহক বাণিজ্যিক হুণ্ডির অর্থ প্রদানের দায় মেনে নিয়ে তা সই করে ফেরৎ দিলে সে হুণ্ডিকে "স্বীকৃত হুণ্ডি" বলে।

Account Payee (or A/c Payee only) • এই শব্দ দুটি চেকের উপর লেখা থাকলে কেবল চেকে উল্লেখিত ব্যক্তিই কোন ব্যাংকের মারফত ঐ চেক ভাঙাতে পারে।

Account Sales (A/s)—এটি হল পণ্য প্রাপক কর্তৃক প্রেরিত পণ্যপ্রেরকের নিকট একটি বিবৃতি। এই বিবৃতিতে পণ্য বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থের পরিমাণ থেকে বিক্রয় বাবদ যাবতীয় খরচ ও পণ্য প্রাপকের দস্তুরী বাদ দিয়ে পণ্য প্রেরকের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ দেখানো হয়।

Active Partner—সক্রিয় বা উদ্যোগী অংশীদার : অংশীদারী কারবারের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের সক্রিয় বা উদ্যোগী অংশীদার বলে।

Ad velorem—মূল্যানুযায়ী : কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর গুণাগুণ বা পরিমাণ বিচার না করে মূল্য অনুযায়ী শুল্কে ধার্য হয়ে থাকে। তাকে মূল্যভিত্তিক শুল্ক বলে।

Affidavit—শপথ-পত্র বা হলফনামা : আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করান তার সামনে শপথ করে যে লিখিত বিবৃতি দেওয়া হয় তাকে শপথনামা বলে।

Agenda—সভার কর্মসূচী : সভায় আলোচ্য বিষয়সূচীর প্রকৃতি ও ক্রমিক ধারা অনুসারী সভায় আলোচ্য বিষয়বস্তুর যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাকে সভার কার্যসূচী বলে।

Agent—এজেন্ট বা প্রতিনিধি : কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হয়ে কাজ করার জন্য নিযুক্ত হলে তাকে প্রতিনিধি বলে। নিয়োগকারীকে বলে মুখ্য ব্যক্তি।

Annual Return—বার্ষিক বিবরণী : শেয়ার পুঁজি নিয়ে গঠিত এবং কোম্পানী আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ প্রত্যেকটি কোম্পানীকে প্রতি বৎসর কোম্পানী নিবন্ধকের কাছে এই বিবরণী অবশ্যই দাখিল করতে হয়। কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তী চতুর্দশতম দিনে যারা কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার ছিল এবং বিগত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী দাখিলের পর যারা কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার পদ ত্যাগ করেছে, তাদের নামের দুইটি আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে তার সাথে পুঁজি ও শেয়ারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করতে হয়। তাতে ক. কোম্পানীর শেয়ার পুঁজির পরিমাণ ও তাতে কতগুলি শেয়ারে বিভক্ত খ. কোম্পানীর কার্যারম্ভের পর থেকে বার্ষিক বিবরণী দাখিলের সময় পর্যন্ত কতগুলি শেয়ার বিক্রয় হয়েছে, গ. তলবী অর্থ কি পরিমাণ পাওয়া গেছে; ঘ. বকেয়া তলবী অর্থের পরিমাণ; ঙ. শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের কমিশন দেওয়া হলে তার মোট পরিমাণ; চ. শেয়ার বিক্রয়ে কোন ডিসকাউন্ট দেওয়া হলে অথবা তার যে অংশ অবলিখিত (written off) হয় তার পরিমাণ; ছ. গত বার্ষিক বিবরণী দাখিলের পর এ পর্যন্ত ডিবেঞ্চার বিক্রয়ে যে ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ; জ. যে পরিমাণ শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা; ঝ. যে সংখ্যক শেয়ার বাবদ শেয়ার ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়নি; ঞ. গত বার্ষিক বিবরণী দাখিলের পর এ পর্যন্ত যে সংখ্যক শেয়ার ওয়ারেন্ট বিলি করা হয়েছে ও যে সংখ্যক শেয়ার ওয়ারেন্ট শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানীর কাছে ফেরৎ দিয়েছে; ট. প্রতিটি শেয়ার ওয়ারেন্টের উল্লিখিত শেয়ারের সংখ্যা; ঠ. পরিচালকদের কোম্পানীর কর্মসচিবের, সেক্রেটারীজ এণ্ড ট্রেজারার্স ও ম্যানেজিং এজেন্টের সম্পর্কিত তালিকাবহিতে তাদের সম্পর্কে লিপিবদ্ধ তথ্যাদি; ড. নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধনযোগ্য কোম্পানীর সম্পত্তি বন্ধ, প্রভার (charge) প্রভৃতি বাবদ মোট দেনা। তা ছাড়া নগদে পূর্ণ বা আংশিক মূল্য নিয়ে কত শেয়ার বিক্রি হয়েছে ও নগদ ছাড়া অন্যভাবেই বা পূর্ণ বা আংশিক মূল্য নিয়ে কত শেয়ার বিক্রি হয়েছে তার পরিমাণও এই বিবরণীতে উল্লেখ করতে হয়। নির্ধারিত ফরমে ও কোম্পানীর পরিচালকদের ও কর্মসচিবের স্বাক্ষর এবং নির্ধারিত স্ট্যাম্প দিয়ে এই বিবরণী দাখিল করা হয়।

Annuity—বার্ষিক বৃত্তি : বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদান বা প্রাপ্তিকে বার্ষিক বৃত্তি বলে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে এই শব্দটি প্রধানত ব্যবহৃত হয়। বার্ষিক বৃত্তি নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের বা আজীবন হতে পারে।

Appraiser—মূল্য-নিরূপক : যে অনুমতি-পত্র বা লাইসেন্স দ্বারা দ্রব্যসামগ্রীর বা সম্পত্তির মূল্য নির্ণয়ের অধিকার পায় তাকে মূল্য-নিরূপক বলে। মূল্য-নিরূপক দ্বারা মূল্যায়ন করাকে মূল্য-নিরূপণ বলে।

Arbitrage—পণ্যচালানী কারবার : মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কম দরের বাজার থেকে কিনে বেশী দরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্য চালান দেওয়ার কাজকে "পণ্যচালানী কারবার" বলে।

Arbitration—সালিসী : বাদী ও বিবাদী পক্ষ কর্তৃক মনোনীত এক বা একাধিক নিরপেক্ষ ব্যক্তির দ্বারা ঝগড়া বা কলহের বিচার করার কাজকে সালিসী বলে।

Articles of Association—পরিমেল নিয়মাবলী : কোম্পানীর দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী যে দলিলে লেখা হয় তাকে আর্টিকল্‌স্ অব এসোসিয়েশন বা পরিমেল নিয়মাবলী বলে।

Articles of Partnership (or Partnership deed)—অংশীদারীর চুক্তিপত্র : অংশীদারদের চুক্তির শর্তাদি এবং অংশীদারী কারবারের নিয়মাবলী যে দলিলে লেখা থাকে তাকে অংশীদারীর চুক্তিপত্র বলে।

Assignment—স্বত্বনিয়োগ : কোন অধিকার বা সম্পত্তির স্বত্বান্তরকে স্বত্বনিয়োগ বলা হয়। যে দলিলের দ্বারা স্বত্বান্তর করা হয়। সেটিও স্বত্বনিয়োগ নামে পরিচিত।

Attorney Power of—আমমোক্তারনামা : যে আনুষ্ঠানিক দলিলের দ্বারা কোন ব্যক্তি তার পক্ষে ও তার হয়ে অপর কোন ব্যক্তিকে কাজ করার ক্ষমতা দেয় তাকে আমমোক্তারনামা বলে।

Audit—নিরীক্ষা : লাভ ক্ষতি হিসাবে ও ব্যালান্স শীটে প্রদর্শিত কারবারের অবস্থা ও কার্যকলাপের ফলাফলের সত্যাসত্য নির্ণয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট ভাউচার বা প্রমাণকের সাহায্যে হিসাব বহিসমূহের সূক্ষ্ম এবং সমালোচনা-মূলক সমীক্ষাকে নিরীক্ষা বা হিসাব পরীক্ষা বলে।

B

Balance of Trade—বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত : এই কথাটির দ্বারা আমদানি ও রপ্তানির আর্থিক মূল্যের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। রপ্তানি দ্রব্যের আর্থিক মূল্য আমদানি দ্রব্য অপেক্ষা বেশী হলে অনুকূল উদ্বৃত্ত বাণিজ্য বলে; আমদানি দ্রব্যের মূল্য বেশী হলে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বাণিজ্য বলে।

Balance Sheet—উদ্বৃত্ত পত্র : নির্দিষ্ট সময়ের শেষ দিনে কারবারের প্রকৃত ও সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য সম্পত্তি ও দায়গুলির যে বিবরণ পত্র প্রস্তুত করা হয় তাকে উদ্বৃত্ত পত্র বা ব্যালান্স শীট বলে।

Bank Rate—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার : কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার বলে।

Barter—বস্তুবিনিময় : মুদ্রা প্রচলনের আগে বস্তুর সাথে বস্তুর বিনিময় হত। এই ধরনের বিনিময়কে বস্তু বিনিময় বলে।

Bear—মন্দীওয়ালা : ফট্‌কা কারবারী যখন ভবিষ্যতে মূল্য কমবে ভেবে ভবিষ্যতে কম দামে কিনে মুনাফা অর্জনের জন্য বর্তমানে বিক্রয় বা বিক্রয়ের চুক্তি করে তাকে মন্দীওয়ালা বলে।

Better the Bill, lower the rate—যত ভাল হুণ্ডি তত অল্প সুদ : যে সব বাণিজ্যিক হুণ্ডি বাট্টা করা হয়, তাদের বাট্টার হার হুণ্ডি অনুযায়ী কম বেশী হয়। যে হুণ্ডির হুণ্ডি-স্বীকারীর বাজারে যত বেশী সুনাম থাকে ঐ হুণ্ডি তত বেশী ভাল বলে গণ্য করা হয়। সে হুণ্ডির বাট্টার হার তত কম হয়।

Bill of Exchange—বাণিজ্যিক হুণ্ডি : হুণ্ডি হল, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশ-মত, কিংবা তার বাহককে, একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবার জন্য, একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর শর্ত-হীন লিখিত আদেশপত্র।

Bill Book—বিল বা হুণ্ডি বই : যে সব বিল বা হুণ্ডির পরিবর্তে টাকা পাওয়া যাবে বা যে সব হুণ্ডির টাকা শোধ করতে হবে—তার বিবরণ যে খাতাটিতে লেখা হয় তাকে হুণ্ডি বা বিল বই বলে। প্রাপ্য বিলের এবং দেয় বিলের জন্য আলাদা বই রাখা হয়।

Bill of Lading—বহনপত্র : জাহাজে প্রেরিত পণ্যের জন্য জাহাজ কর্তৃপক্ষ পণ্যের মালিককে যে রসিদ দেয় তাকে "চালানী রসিদ" বলে। এই দলিলটি প্রেরিত পণ্যের মালিকানার প্রমাণ এবং পণ্যের আইনসঙ্গত অধিকারের প্রামাণ্য দলিল। এতে জাহাজের নাম, পণ্যের বিবরণ ও মাশুল ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

Bill Register—বিল বই : যে খাতায় যাবতীয় প্রাপ্ত ও আদায়যোগ্য বা প্রদত্ত ও পরিশোধ্য বিলের সম্পূর্ণ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে বিল বই বলে।

Bills for goods supplied—সরবরাহকৃত পণ্যের বিল : সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য বিক্রেতা ওই পণ্যের মূল্য সহ ক্রেতার কাছে যে পূর্ণ বিবরণ পেশ করে তাকে সরবরাহকৃত পণ্যের বিল বলে।

Bona-fide—সদুদ্দেশ্য : যে উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রতারণা বা জুয়াচুরির অভিপ্রায় নেই তাকে সদুদ্দেশ্য বলে গণ্য করা হয়।

Bond—খত বা বন্ধকপত্র : এটি একটি দলিল। এই দলিল দ্বারা কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন শর্তে টাকা দেওয়ার দায়ে নিজেকে আবদ্ধ করে।

Bonus—বোনাস : এটি একটি বিশেষ ভাতা (অ্যালাউয়্যান্স), অধিহার (প্রিমিয়াম) অথবা উপহার (গিফ্‌ট)।

১. অনেক সময় যথেষ্ট লাভ হলে কোম্পানী শেয়ার-হোল্ডারদের সাধারণ লভ্যাংশ ছাড়াও অতিরিক্ত নগদ টাকা বোনাস রূপে দেয়। সেটা অতিরিক্ত লভ্যাংশ স্বরূপ। কিন্তু যাতে এইরূপ অতিরিক্ত লভ্যাংশ ভবিষ্যতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গণ্য না হয় সেজন্য একে বোনাস নাম দেওয়া হয়। কোন কোন সময় নগদ টাকায় বোনাস না দিয়ে সে বাবদ শেয়ারহোল্ডারদের নূতন শেয়ার দেওয়া হয়। তাকে বোনাস শেয়ার বলে।

২. মেয়াদীজীবনবীমা পত্রে প্রায়ই বীমাগ্রহীতাকে বীমা কোম্পানী বোনাস দেয়। বীমা কোম্পানীর যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা হয়েছে দেখা গেলে তার অংশ বিশেষ বীমাগ্রহীতাদের মধ্যে হাজার করা (যেমন প্রতি হাজার টাকার বীমার উপর ১০ টাকা কি ২০ টাকা) হিসাবে বণ্টন করা হয়। ওই টাকা বীমা গ্রহীতাদের বীমার টাকার সাথে যুক্ত হয়। বীমার মেয়াদ পূর্ণ হলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদসহ ওই বোনাস বীমার প্রাপ্য টাকার সাথে একত্রে বীমাগ্রহীতাকে দেওয়া হয়।

৩. বর্তমান কালে শিল্প ও অন্যান্য কারবারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে, কারবারের বাৎসরিক মুনাফার অনুপাতে, ঐ মুনাফা থেকে কর্মচারী ও শ্রমিকদের বোনাস হিসাবে নগদ টাকা দেওয়ার প্রথা দেখা যায়। বোনাস দেওয়ার নানা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সেগুলির উদ্দেশ্য হল এরূপভাবে বোনাস দেওয়া যাতে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে। কোথাও তার পরিমাণ মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, আবার কোথাও মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্মতির দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়। অনেক সময় তা মালিক ও শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে পড়ে।

Bonded Warehouse—শুল্কাধীন গুদাম : আমদানিকৃত পণ্যের দেয় শুল্ক না দিয়ে, পণ্য খালাসের সময় শুল্ক দেওয়া হবে এই শর্তে সরকারী অনুমতি প্রাপ্ত বা লাইসেন্স প্রাপ্ত যে গুদামে পণ্য মজুত রাখা হয় তাকে শুল্কাধীন গুদাম বলে।

Boom—তেজী বাজার বা গরম বাজার : ক্রয়-বিক্রয়ের আকস্মিক বৃদ্ধি এবং তার ফলে সকল পণ্যের ও অন্যান্য জিনিসের চাহিদা বেড়ে গেলে সে বাজারকে তেজী বা গরম বাজার বলে।

Bottomry Bond—জাহাজ-বন্ধকপত্র : গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর আগে জাহাজ মেরামত অপরিহার্য হয়ে পড়লে তার অধ্যক্ষ জাহাজ বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করে যে খত বা ঋণপত্র লিখে দেয় তাকে জাহাজ বন্ধকপত্র বলে।

Bought and sold notes—ক্রয়-বিক্রয় চিঠা : শেয়ারবাজারের দালাল কোন শেয়ার বা স্টক কেনা-বেচার কাজ করে মুখ্য ব্যক্তির (অর্থাৎ যার হয়ে বেচাকেনা করে) কাছে ওই লেন-দেনের বিবরণ লিখে পাঠায়। এই লিপিবদ্ধ বিবরণটিকে ক্রয়-বিক্রয় চিঠা বলে।

Bounty—রাজবৃত্তি : উন্নয়নকল্পে বা বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিল্প বিশেষকে, তার উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী যে সরকারী অর্থ সাহায্য করা হয় তাকে রাজবৃত্তি বলে।

Broker—দালাল : অপরের হয়ে যে ব্যক্তি দস্তুরীর বিনিময়ে পণ্য বা শেয়ার বা স্টক কেনা-বেচা করে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটায় তাকে দালাল বলে। সে পারিশ্রমিক বাবদ যে দস্তুরী (কমিশন) পায় তাকে 'দালালী' বলে।

Bull—তেজিওয়ালা : ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে অনুমান করে ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রয়ের দ্বারা মুনাফা অর্জনের জন্য যে ফট্‌কা কারবারী বর্তমানে ক্রয় অথবা ক্রয়ের চুক্তি করে তাকে তেজীওয়ালা বলে।

Building Society—গৃহনির্মাণ সমিতি : এই প্রকার সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে যে তহবিল গঠন করা হয়, তা থেকে তাদের জমি, বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় ও নির্মাণের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। যে সম্পত্তি এইরূপে খরিদ করা হয় তাকে ঐ ঋণের জামিন বলে গণ্য করা হয়।

C

Cablegram—সমুদ্রগর্ভপথে তারবার্তা বা বিদেশী তারবার্তা : বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সমুদ্র-গর্ভপথে তারবার্তা বা বিদেশে প্রেরিত তার বার্তাকে সমুদ্রগর্ভপথে তারবার্তা বা বিদেশী তারবার্তা বলে।

Call—তলব, তলবী অর্থ : কোম্পানীর শেয়ার পুঁজির কিস্তি বাবদ যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে তলব করা হয় তাকে তলবী অর্থ বলে।

Call Money—স্বল্পমেয়াদী ঋণ : অল্পসময়ের নোটিশে ফেরতযোগ্য যে ঋণ ব্যাঙ্কার ও অন্যান্য লগ্নীকারীরা হুণ্ডির বাট্টাকারীদের দেয় তাকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ বলে। অনেক সময় কল মানি বলতে তলবী অর্থও বোঝায়।

Cash Book—নগদান বা ক্যাশ বই : যে খাতায় চেক ও নগদ টাকার আয় ও ব্যয়ের বা লেনদেনের হিসাব লেখা হয় তাকে ক্যাশ বই বলে।

Cash Credit—নগদ ঋণ : ব্যক্তিগত জামিনে অথবা অপর কোনও ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে নিশ্চয়তা দিলে ব্যাঙ্ক যে ঋণ দেয় তাকে নগদ ঋণ বলে।

Cash-in-transit Insurance—অর্থবহনকালীন বীমা : কোনও কোম্পানীর এক শাখা অফিস থেকে অপর শাখা অফিসে কিংবা শাখা অফিস থেকে কেন্দ্রীয় অফিসে অথবা, কেন্দ্রীয় অফিস থেকে শাখা অফিসে, অথবা অফিস, দোকান বা কার্যস্থল থেকে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার জন্য কিংবা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনার সময়, অর্থাৎ একস্থান থেকে অপর স্থানে টাকা আনা বা নেওয়ার সময় পথের মধ্যে তা চুরি বা রাহাজানি হতে পারে। এই বিপদ বা ঝুঁকি দূর করার জন্য টাকার বহনকালীন বীমা করা যায়।

Certificate of Incorporation—কোম্পানীর নিবন্ধন-পত্র : কোম্পানী নিবন্ধনের আবেদন করলে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে আইন নির্দিষ্ট সব শর্ত পালন করা হয়েছে তা হলে নিবন্ধক নিবন্ধনের যে দলিলটি দেন তাকে নিবন্ধন-পত্র বলে। এটি পেলে কোম্পানী নিবন্ধনোত্তর সুবিধাগুলি ভোগ করে।

Certificate of Commencement—কার্যারম্ভের অনুমতি-পত্র : নূতন কোম্পানী নিবন্ধনের পরবর্তী শর্তাবলী পূরণ করে কাজকর্ম আরম্ভ করার জন্য নিবন্ধকের অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদন করলে তিনি যে অনুমতিপত্র দেন তাকে কার্যারম্ভের অনুমতি-পত্র বলে। পাবলিক কোম্পানী এটি না পেলে কাজ আরম্ভ করতে পারে না।

Certificate of Origin—প্রভবলেখ : আমদানিকারক দেশে শুল্ক সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা লাভের জন্য রপ্তানী-দ্রব্যের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে আমদানীকারক দেশ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রপ্তানিকারক দেশে অবস্থিত, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে ঘোষণাপত্র রপ্তানিকারীপ্রেরিত পণ্যের সাথে পাঠিয়ে দেয় তাকে প্রভবলেখ বলে।

Chamber of Commerce—বণিক সভা : শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, ব্যাঙ্কারগণ, একাউন্ট্যান্ট ও অডিটর প্রভৃতি শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের কর্তৃক স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে গঠিত প্রতিষ্ঠানকে বণিক সভা বলে।

Charter Party—চার্টার পার্টি বা নৌ-ভাটক সনদ : যে লিখিত চুক্তির দ্বারা জাহাজের মালিক মাশুলের বিনিময়ে পণ্য বহনের উদ্দেশ্যে একখানি সম্পূর্ণ জাহাজ বা জাহাজের অধিকাংশ একটি নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রার জন্য বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পণ্য প্রেরকের কাছে ইজারা বা ভাড়া দেয়, তাকে চার্টার পার্টি বা নৌ-ভাটক সনদ বলে যে দলিল মারফত এই চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকেও চার্টার পার্টি বলে।

Cheque—চেক : ব্যাঙ্কের কাউন্টারে উপস্থিত করা মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা, উল্লেখিত প্রাপক অথবা তার আদেশবাহী অথবা বাহককে দেওয়ার জন্য আমানতকারী তার ব্যাঙ্কের উপর যে লিখিত আদেশ দেয়, তাকেই চেক বলে।

Circular Cheque—সার্কুলার চেক : ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলি অপর দেশে অবস্থিত তাদের প্রতিনিধি মারফত যে চেক বিক্রয় করে তাকে সার্কুলার চেক বলে।

Clearing House—নিকাশ ঘর : কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য যে সংগঠন স্থাপন করে তাকে নিকাশ ঘর বলে। যেমন, ব্যাঙ্ক, শেয়ারবাজার বা পণ্য বিনিময় বাজার কর্তৃক স্থাপিত নিকাশ ঘর।

Collateral Security—আনুষঙ্গিক জামিন : এর দ্বারা অপ্রধান (সেকেণ্ডারী) বা পরোক্ষ (ইনডাইরেকট) জামিন বোঝায়। সাধারণত কোনও ঋণের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানাসূচক দলিল জামিন স্বরূপ রাখাকে আনুষঙ্গিক জামিন বলে। এর ফলে খাতক ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে, আদালতের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয় না, জামিন স্বরূপ ঐ মালিকানার দলিল বিক্রয় করে ঋণের টাকা উদ্ধার করা যায়। মাল খালাসের ফরমাশ (ডেলিভারী অরডার), সরকারী বা বেসরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।

Collective Bargaining—যৌথ দর কষাকষি : মালিকদের ও শ্রমিকদের মধ্যে সরাসরি আলাপ আলোচনা ও দর কষাকষির দ্বারা মজুরি ও কাজের শর্তাদি স্থির করার ব্যবস্থাকে যৌথ দর কষাকষি বলে।

Consul—বাণিজ্য দূত : কোনও দেশের সরকার বিদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখার ও বৃদ্ধি করার জন্য বিদেশে যে সরকারী কর্মচারীকে পাঠায় তাকে বাণিজ্য দূত বলে। যে দেশে তাকে পাঠানো হয়, বাণিজ্য দূত সেখানে গিয়ে থাকে ও ঐ দেশে নিজ দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করে ও সে দেশের সাথে নিজ দেশের বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

Consular Invoice—বাণিজ্য দূতের প্রত্যায়িত চালান : আমদানিকৃত পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক ধার্যের জন্য রপ্তানিকারী দেশে অবস্থিত স্বদেশের বাণিজ্য দূত কর্তৃক প্রত্যায়িত চালানকে বাণিজ্য দূতের প্রত্যায়িত চালান বলে।

Contango—ব্যাজ : বাকি শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূল্য প্রদানে অক্ষমতার দরুন ক্রেতা নিষ্পত্তি স্থগিত রাখতে চাইলে, ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে যে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়, তাকে ব্যাজ বা 'কনট্যাঙ্গো' বলে।

Copy Right—লেখস্বত্ব : পুস্তক প্রভৃতি জাতীয় কোনও কিছু রচনা প্রকাশ, মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ বা তার সবিশেষ অংশের পুনর্মুদ্রণ, তার অভিনয় বা প্রকাশ্য চিত্র বা চলচ্চিত্র প্রদর্শন, গান গাওয়া,

বক্তৃতা দান প্রভৃতির একমাত্র অধিকার বোঝায়। সাধারণত রচনাকারীর জীবনকাল ও তার মৃত্যু-কাল থেকে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত, ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে তার নেগেটিভ প্রস্তুতের সময় থেকে পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত লেখস্বত্বের মেয়াদকাল নির্ধারিত হয়েছে।

Caveat Emptor—ক্রেতা সাবধান : ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আইনের সাধারণ নির্দেশ এই যে নিজের মাল বুঝে নেবার দায় ক্রেতার। তাতে ভুল হলে সেজন্য বিক্রেতা দায়ী হবে না। এটি 'ক্রেতা-সাবধান' নীতি নামে পরিচিত।

Credit Note—পাওনা চিঠা : চালানে (Invoice) বর্ণিত হিসাবে ভুল বশত, মূল্য কম করে ধার্য ও আদায় হয়ে থাকলে বিক্রেতা পরে ঐ অতিরিক্ত অর্থের একটি বিবরণ ক্রেতার নিকট পাঠায়। ইহাই পাওনা চিঠা বা ক্রেডিট নোট।

Cost-Insurance-Freight (C.I.F.)—খরচ-বীমা-মাশুল : এর দ্বারা উৎপাদন খরচ বা খরিদ দর, বীমা খরচ ও মাশুল যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, পণ্যের এরূপ দাম বোঝায়।

Cum Dividend—লভ্যাংশ সহ : যে সব বিক্রয় যোগ্য শেয়ারের উপর লভ্যাংশ পাওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে এবং সেরূপ শেয়ারের ক্রেতা শেয়ারটি কিনলে অল্প সময়ের মধ্যে ঐ লভ্যাংশেরও মালিক হবে, শেয়ার-বাজারে ঐ প্রকার শেয়ারের বিক্রয় মূল্যের পাশে c. div. (=Cum dividend) অর্থাৎ 'লভ্যাংশ সহ' কথাটি লিখিত থাকে।

Countervailing Duty—পাল্টা বা বিপরীত শুল্ক : দেশীয় পণ্য অপর কোন দেশে রপ্তানি করা হলে, এবং সেখানে তার উপর আমদানি শুল্ক বসান হলে তার পাল্টা বা প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা হিসাবে ঐ দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর যে আমদানি শুল্ক বসান হয় তাকে পাল্টা বা বিপরীত শুল্ক বলে। আগে, কোন আমদানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য হলে এবং ঐরূপ দেশীয় পণ্যের উপরও আবগারী শুল্ক বসান হলে, ওই আবগারী শুল্ককে পাল্টা বা বিপরীত শুল্ক বলা হত।

Custom Duty—বহিঃশুল্ক : দেশীয় পণ্য রপ্তানির সময় ও বিদেশী পণ্য আমদানির সময় বন্দরে যে কর দিতে হয় তাকে বহিঃশুল্ক বলে। এটি দুই প্রকারের, যথা, রপ্তানি ও আমদানি শুল্ক।

D

Debenture—ডিবেঞ্চার : এর দুইটি অর্থ প্রথমত, এর দ্বারা শুল্ক ফেরত অনুজ্ঞাপত্র বোঝায়। কোনও কোনও দ্রব্যের রপ্তানিকারক রপ্তানিকৃত দ্রব্যের উপর প্রদত্ত শুল্ক ফেরত পায়। সেক্ষেত্রে শুল্ক বিভাগ থেকে রপ্তানি-কারীকে এজন্য যে প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়, তাকে ডিবেঞ্চার বলে। দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা ঋণপত্র বোঝায়। এতে ঋণের উপর প্রদেয় সুদ প্রদানের এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে আসল টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি মুদ্রিত থাকে।

Decentralisation—বিকেন্দ্রীকরণ : কোনও কিছু, যেমন শিল্পসমূহ কোনও শিল্পের অন্তর্গত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কিংবা সরকারী অফিসসমূহ, কিংবা কোনও কারখানার বা অফিসের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যাপক বণ্টন বোঝাতে 'বিকেন্দ্রী-করণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। একস্থানে বিবিধ শিল্পের বা এক শিল্পের অন্তর্গত সকল বা অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সমাবেশকে যেমন কেন্দ্রীকরণ বলে, তেমনি নানা স্থানে তাদের বিক্ষিপ্ত অবস্থানকে বিকেন্দ্রী-করণ বলে। সেরূপ একই শহরে বা শহরের একই অঞ্চলে সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলির অবস্থানকে যেমন তাদের কেন্দ্রী-করণ বলে, তেমনি বিভিন্ন শহরে কিংবা শহরের বিভিন্ন স্থানে তাদের বিক্ষিপ্তকরণকে বিকেন্দ্রী-করণ বলা হয়। সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ হল কেন্দ্রীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া। সেরূপ ব্যবস্থা-পনা সংগঠনেও কর্তব্য, ক্ষমতা ও দায়িত্বগুলি একজনের বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে তাকে কেন্দ্রীকরণ বলে, আর বিভিন্ন পর্যায়ে বহু সংখ্যক নির্বাহী কর্মচারীর হাতে তার বণ্টন ঘটলে তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে।

Delcredere Agent—ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি : পণ্য চালানী কারবারে যে প্রতিনিধি (এজেন্ট) নিজ দায়িত্বে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করে কিংবা বাকিতে ক্রয়কারীর পক্ষ হয়ে পণ্য চালানকারীর, অর্থাৎ মুখ্য ব্যক্তির কাছে জামিন থাকে, তাকে ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি বলে। এজন্য সে অতিরিক্ত দস্তুরী পায়। তাকে ঝুঁকি-বহন দস্তুরী (ডেলক্রেডার কমিশন) বলে।

Demand Draft (D/D)—চাহিদা মাত্র মূল্য প্রদেয় হুণ্ডি : যে বাণিজ্যিক হুণ্ডির টাকা দেনদারের বা তার প্রতিনিধির কাছে উপস্থিত করা মাত্র পাওয়া যায় তাকে চাহিদা মাত্র মূল্য-প্রদেয় হুণ্ডি বলে। এই প্রকার হুণ্ডিতে দেন-দারের স্বীকৃতিজ্ঞাপক স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

Documentary Bill—দলিলী হুণ্ডি : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে রপ্তানিকারী পণ্য মূল্য আদায়ের জন্য বহনপত্র বা চালানি রসিদ (বিল অব লেডিং), চালান (ইনভয়েস), প্রভবলেখ (সার্টি-ফিকেট অব অরিজিন), বাণিজ্য দূত প্রত্যয়িত চালান (কনস্যুলার ইনভয়েস), বীমাপত্র ও জাহাজী দলিলাদি, একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডি,

যা হুণ্ডি তৈরি করে ব্যাঙ্কের মারফত আমদানিকারীর কাছে পাঠায়। দলিলী হুণ্ডি দুই প্রকারের। যথা, স্বীকার সাপেক্ষ (ডি/এ) এবং পরিশোধ সাপেক্ষ (ডি/পি)। প্রথম ক্ষেত্রে হুণ্ডিতে সই করলে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হুণ্ডির টাকা দিলে আমদানিকারীর কাছে হুণ্ডি সহ দলিলগুলি দেওয়া হয়। তখন আমদানিকারী ঐ পণ্যের উপর অধিকার লাভ করে।

Earnest Money—বায়না : পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মৌখিক চুক্তিতে প্রতিশ্রুত-বিক্রেতাকে দায়বদ্ধ করার জন্য ভাবী ক্রেতা তাকে মূল্যের অংশস্বরূপ কিছু টাকা অগ্রিম দেয়। তাকে বায়না বলে।

Embargo—জাহাজ নির্গমন নিষেধাজ্ঞা বা বৈদেশিক বাণিজ্যনিষেধাজ্ঞা : সাধারণত যুদ্ধকালে যুদ্ধরত দেশগুলি কতকগুলি বন্দরের মধ্যে বাণিজ্যের উপর অথবা দেশস্থ কোনও বন্দর থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহাজ নির্গমনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। তাকে জাহাজ নির্গমন নিষেধাজ্ঞা বা বৈদেশিক বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা বলে।

Employees' Attendance Register—কর্মচারী-উপস্থিতি বই : যে খাতায় প্রত্যহ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের উপস্থিতি ও উপস্থিতির সময় লেখা হয় তাকে কর্মচারী-উপস্থিতি বই বলে।

Endorsement—স্বত্বান্তরকরণ : যখন কোনও হস্তান্তরযোগ্য দলিলের (যেমন, চেক, বাণিজ্যিক হুণ্ডি প্রভৃতি) প্রস্তুতকারক বা স্বত্বাধিকারী, প্রস্তুতকারক হিসাবে ছাড়া অন্য কোনও পক্ষরূপে, ওই দলিল হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে দলিলের উল্টোপিঠে বা উপরে বা দলিল সংলগ্ন কোনও আলাদা কাগজে সই করে অথবা ঐ একই উদ্দেশ্যে এবং হস্তান্তরযোগ্য দলিলে পরিণত করা হবে এই অভিপ্রায়ে কোনও স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে সই করে, তখন তাকে স্বত্বান্তরকরণ বলে। এর দ্বারা দলিলের স্বত্ব হস্তান্তর করা বোঝায়।

Exchange Bank—বিনিময় ব্যাঙ্ক : ভারতে যে সব ব্যাঙ্ক প্রধানত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় কার্যে ও বিদেশী বাণিজ্যিক হুণ্ডির ক্রয়-বিক্রয়ে অংশগ্রহণ করে তাদের বিনিময় ব্যাঙ্ক বলে। আগে এদের প্রায় সকলেই বিদেশী ব্যাঙ্ক ছিল। বর্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিও এই কাজ করছে। এই সব ব্যাঙ্ক আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ীদের প্রধান সহায়ক।

Ex-Dividend—বিনা-লভ্যাংশ : কোন শেয়ারের উপর লভ্যাংশ পাওয়ার সময় আসন্ন হলে, অথচ ঐ আসন্ন প্রাপ্য লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকাররহিতভাবে যদি ঐ শেয়ার বিক্রয়যোগ্য হয়, তবে শেয়ার বাজারে বিক্রয়যোগ্য ঐরূপ শেয়ারের মূল্যের পাশে ex-div. (ex-dividend) অর্থাৎ বিনা-লভ্যাংশ কথাটি উল্লেখিত থাকে।

Ex-warehouse—গুদাম থেকে : এটি বিক্রয় ও বিক্রয় মূল্যের একটি শর্ত। এই কথাটি কোনও দ্রব্যের বিজ্ঞাপিত মূল্যের পাশে লেখা থাকলে, ঐ দরে বিক্রেতার গুদাম থেকে দ্রব্যটির সরবরাহ পাওয়া যাবে এবং তারপর তা নিজ স্থানে নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় খরচ ক্রেতাকে বহন করতে হবে বোঝায়।

F

Free Trade—অবাধ বাণিজ্য : বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিনা বাধায় ও বিনা শুল্কে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালান হয় তাকে 'অবাধ বাণিজ্য' বলে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এই 'অবাধ বাণিজ্য নীতি'র উৎপত্তি হয়।

Free Alongside ship—জাহাজের পাশে সরবরাহ : আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে, দ্রব্যের মূল্যের পাশে এ কথাটি লেখা থাকলে, বিক্রেতা জাহাজ পর্যন্ত নিজ খরচে দ্রব্যটি পৌঁছে দেবে বোঝায়। তারপর দ্রব্যটি জাহাজে বোঝাই থেকে বাকি অন্যান্য সব খরচ ক্রেতাকে বহন করতে হবে বোঝায়।

Forward Market—আগাম বাজার : যে বাজারে ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহ ও মূল্য প্রদানের শর্তে বর্তমানে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হয় তাকে আগাম বাজার বলে।

Gratuity—কর্মাবসানে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে এককালীন প্রাপ্য বা প্রাপ্ত অর্থ : কর্মাবসানে কিংবা অবসরগ্রহণে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর আর্থিক কষ্ট কিছুটা লাঘবের জন্য অনেক সরকারী ও বেসরকারী কাজে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, তাকে একটি নির্দিষ্ট হিসাবমত (যেমন যত বৎসরের চাকুরী তত মাসের মূল্য বেতন) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়। এটি গ্রাচুইটি নামে পরিচিত।

H

Hire-Purchase—কিস্তিবন্দী শর্তে ক্রয় : নির্ধারিত সাপ্তাহিক বা মাসিক সংখ্যক কিস্তিতে ক্রেতা দাম শোধ করবে, এই শর্তে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি দ্বারা বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যটি অর্পণ করলে তাকে কিস্তিবন্দী শর্তে ক্রয় বলে। সম্পূর্ণ মূল্য না দেওয়া পর্যন্ত ক্রেতা কিস্তি বাবদ যে অর্থ দেয় তা পণ্যের ভাড়া রূপে গণ্য হয়। সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হলে তবে ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত

অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের মালিক বলে গণ্য হয়। অবশ্য ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের আগেও মূল্য পরিশোধ করে পণ্যের মালিক হতে পারে। আর ক্রেতা যদি কয়েকটি কিস্তি দিয়ে বাকি কিস্তি শোধ করতে না পারে, তবে পণ্যটি বিক্রেতা ফেরৎ নিয়ে যাবে এবং ক্রেতা কিস্তি বাবদ যে টাকা দিয়েছে তা উক্ত পণ্য ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীরূপে ক্রেতার দেয় বলে গণ্য হয়। সুতরাং ঐ টাকা ক্রেতা আর ফেরৎ পায় না।

I

Indian Standards Institute (I.S.I.)—ভারতীয় মানক সংস্থা : ভারতে উৎপন্ন বিবিধ দ্রব্যের মান নির্ধারণ ও তদনুযায়ী তাদের শ্রেণী-বন্ধ করার জন্য ভারতে ভারতীয় মানক সংস্থা ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। এর দ্বারা নির্ধারিত মান অনুযায়ী উৎপাদিত দ্রব্যে এর নামাঙ্কিত ছাপ ব্যবহার করার অনুমতি এই প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদকদের দেয়। তাতে ক্রেতারা দ্রব্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারে।

Industrial Bank—শিল্প ব্যাঙ্ক : যে সব ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদের আমানত গ্রহণ ও দীর্ঘ-মেয়াদে বিভিন্ন শিল্পকে তাদের স্থির পুঁজির সংস্থানের জন্য ঋণ দেয় তাদের শিল্প ব্যাঙ্ক বলে। ভারতে সম্প্রতি এরকম কয়েকটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে।

Insurable Interest—বীমাযোগ্য স্বার্থ : বীমা করার যোগ্য বিষয়বস্তুর হানি বা বিনষ্টের দরুন কারও আর্থিক ক্ষতি ঘটলে বা আর্থিক দায় উদ্ভূত হওয়ার আশংকা থাকলে, ঐ বিষয় বস্তুতে ওই ব্যক্তির বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে বলে গণ্য করা হয়।

Interim Dividend—অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ : কোম্পানীর আর্টিকলসে বা পরিমেল নিয়মা-বলীতে এ বিষয়ে নির্দেশ থাকলে কোম্পানীর মুনাফার পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হওয়ার আগেই পরিচালকমণ্ডলী শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশনের আগেই লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারে। একে অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ বলে।

Investment Trust—বিনিয়োগ ন্যাস : শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্টক, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কিনে তা থেকে লভ্যাংশ ও সুদ উপার্জন করার জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ ন্যাস বলে। এরা শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির যোগান দেয়।

Inventory—মজুদ দ্রব্য তালিকা : এটি হল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা মজুদ দ্রব্যের তালিকা।

Invoice—চালান : পণ্যের পরিমাণ, দর মোট মূল্য, মূল্য প্রদানের শর্ত প্রভৃতি সংবলিত যে বিবরণী বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পাঠায় তাকে চালান বলে।

I.O.U.—ঋণ স্বীকৃতিপত্র : এর সম্পূর্ণ কথাটি হল I owe you—অর্থাৎ আমি আপনার কাছে ঋণী। অনেক সময় খাতক ঋণদাতাকে একটি কাগজে এই কথাটি লিখে দেয়। এটি হল ঋণের স্বীকৃতিজ্ঞাপক লিখিত বিবৃতি।

J

Jettision—জাহাজস্থিত পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ : সমুদ্রবক্ষে ঝড়ঝঞ্ঝা, চড়ায় আটক প্রভৃতি বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য জাহাজকে হাল্কা করার উদ্দেশ্যে জাহাজস্থিত পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার নিয়ম আছে। একে 'জেটিশন' বলে।

Journal—জার্নাল বা জাবেদা : যে হিসাব বইতে লেনদেনগুলির প্রথম হিসাব দৈনিক লেখা হয়, লেনদেনগুলিকে তারিখ ও ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে লেখা হয়, প্রত্যেকটি লেন-দেনকে ডেবিট ও ক্রেডিট দুটি দিকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রত্যেকটি লেনদেনের সাথে একটি বিবরণ লেখা হয়, তাকে জার্নাল বা জাবেদা বলে।

L

Ledger—লেজার বা খতিয়ান : জার্নাল বা জাবেদা-তে লেখা লেনদেনগুলিকে স্থানান্তরিত করে যে হিসাবের খাতায় ওইগুলির শেষ বা পাকা হিসাব লেখা হয় তাকেই লেজার বা খতিয়ান বলে। এতে লেনদেনগুলির শ্রেণীবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত হিসাব থাকে।

Letter of Credit—প্রত্যয়নপত্র : কোনও ব্যাঙ্কার অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনও স্থানে অবস্থিত তার প্রতিনিধির প্রতি লিখিত, অপর কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আদেশকে প্রত্যয়নপত্র বলে।

Lien—পূর্বস্বত্ব : কোনও দাবির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির দ্রব্যাদি নিজ দখলে রাখার অধিকারকে 'লিয়েন' বা পূর্বস্বত্ব বলে।

M

Market Price—বাজার দর : এর দ্বারা বাজারের বর্তমান দর বোঝায়।

Minute Book—মিনিট বই : যে খাতায় কোন কোম্পানী বা সমিতির সভার কার্যধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা হয় তাকে মিনিট বই বলে।

Mortgage—বন্ধক : অগ্রিম প্রদত্ত বা ঋণস্বরূপ প্রদেয় কোনও অর্থ, বা কোনও বিদ্যমান কিংবা ভবিষ্যৎ ঋণ, অথবা যা থেকে আর্থিক দায়ের উদ্ভব হতে পারে এরূপ কোনও কাজের জামিন বা সুনিশ্চয়তা লাভের জন্য, কোনও নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তিতে স্বার্থ দায়বদ্ধ রাখার কাজকে

বন্ধক বলে। অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ কিংবা কোনও দায় সম্পাদনার কাজ সুনিশ্চিত করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি তার জামিন স্বরূপ ব্যবহৃত হলে ঐ লেনদেনকে বন্ধক বলা যায়।

N

Negotiable Instrument—নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা আর্থিক মূল্যসম্পন্ন যে দলিল হাতে হাতে প্রদান করে হস্তান্তর করা যায়, তাকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলে। ভারতীয় আইনে কেবল হুণ্ডি, বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও চেক-ই হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলে গণ্য হয়।

O

Open Door Policy—মুক্ত দ্বার নীতি : কোন দেশের একচেটিয়া কারবারী সঙ্ঘগুলির কর্তৃত্ব বা বিশেষ অধিকার নাকচ করে সকল দেশের সাথে সমান শর্তে বাণিজ্য করার নীতি।

P

Patent—পেটেন্ট : কোনও শিল্প সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের বা পদ্ধতির উদ্ভাবককে তার উদ্ভাবিত বিষয়টি নির্দিষ্ট কালের জন্য ব্যবহারের একমাত্র অধিকার সরকার থেকে দেওয়া হয়। একে পেটেন্ট বলে।

Payment Voucher—প্রদত্ত অর্থ প্রমাণক : নির্দিষ্ট ফরমে মুদ্রিত, প্রদত্ত অর্থের প্রমাণপত্রকে প্রদত্ত অর্থ প্রমাণক বলে।

Pension—অবসরভাতা : কর্মজীবনের শেষে অবসর গ্রহণের পর প্রতিমাসে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ভূতপূর্ব নিয়োগকর্তা কর্তৃক তার চাকুরিকালীন শেষ বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ (অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি) প্রদানকে অবসরভাতা বলে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী যতদিন বাঁচে, ততদিন তা পায়। সাধারণত সরকারী কর্মচারীরা বা রেলপথ প্রভৃতির ন্যায় রাষ্ট্রীয় কারবারের কর্মচরীরা এই সুবিধা ভোগ করে।

Premium—প্রিমিয়াম : এই শব্দটি বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ক. রাজবৃত্তি (বাউন্টি) অর্থাৎ, উৎপাদনকারীদের উৎসাহিত করার জন্য যে অর্থ সরকার তাদের দেয় তাকেও অনেক সময় প্রিমিয়াম বলে। খ. কোনও ঋণের সুদ ছাড়াও অতিরিক্ত অথবা সুদের পরিবর্তে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে প্রিমিয়াম বলে। গ. বীমার বাবদ বার্ষিক, অর্ধ-বার্ষিক বা ত্রৈমাসিক চাঁদা বাবদ প্রদেয় অর্থকে প্রিমিয়াম বলে। ঘ. কোন শেয়ার বা স্টকের ঘোষিত বা মুদ্রিত মূল্য অপেক্ষা তার বাজার দর বেশী হলে তাকে প্রিমিয়াম বা অধিমূল্য বলে।

Pro-forma—অনুরূপ ছক : এর দ্বারা সাধারণত কোন নির্দিষ্ট আইন বা কারবারী রীতি অনুসারে কোনও নির্দিষ্ট ছক বা আদর্শমত রচিত কোনও কিছু বোঝায়। যেমন প্রো-ফরমা ইনভয়েস।

Prospectus—বিবরণপত্র : মূলধন সংগ্রহের জন্য কোম্পানীর তার উদ্দেশ্য এবং তার কারবার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত যে দলিল মারফত জনসাধারণের কাছে তার শেয়ার অথবা ঋণপত্র ক্রয়ের আবেদন করতে আহ্বান জানায় তাকে বিবরণপত্র বলে।

Provident Fund—ভবিষ্যনিধি : কর্মকাল শেষে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তার পরিবার বর্গের অথবা তার আগেই তার মৃত্যু হলে তার পোষ্যবর্গের যাতে আর্থিক অনটন কিছুটা লাঘব হয় সে উদ্দেশ্যে একটি বহু প্রচলিত ব্যবস্থা হল ভবিষ্যনিধি। এতে কর্মকালে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে কর্মচারীদের বেতন থেকে নিয়োগ কর্তা বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ যেমন ৬¼% বা ৮⅓% কেটে রাখে ও নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে তার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে মোট অর্থ কর্মচারীদের নামে ব্যাঙ্কে পৃথক হিসাবে জমা হতে থাকে ও তাতে ব্যাঙ্কের সুদও জমা হতে থাকে। কোন কর্মচারীর মৃত্যু হলে বা কেউ অবসরগ্রহণ করলে তার প্রাপ্য অর্থ সুদসহ ঐ হিসাব থেকে তুলে দিয়ে দেওয়া হয়।

Proxy—প্রক্সি বা বদলী ব্যক্তি : এর দ্বারা অপরের স্থলে বা পক্ষে, তার কাজ যে করে তাকে বোঝায়। যেমন কোম্পানীর আইনে, যে কোনও ব্যক্তি, এমন কি যে কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার নয় এরূপ ব্যক্তিও, কোনও শেয়ার-হোল্ডার কর্তৃক আদিষ্ট ও উপযুক্ত রূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ঐ শেয়ারহোল্ডারের পরিবর্তে তার স্থলে এবং তার হয়ে কোম্পানীর সাধারণ সভায় যোগদান করতে ও ওই শেয়ারহাল্ডারের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এরূপ ব্যক্তিকে প্রক্সি বা বদলী ব্যক্তি বলে।

Private Sector—বেসরকারী ক্ষেত্র বা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, মালিকানা ও পরিচালনার অধীন যাবতীয় ব্যবসায়িক বাণিজ্যিক শিল্পীয় কারবারকে এককথায় বেসরকারী ক্ষেত্র বা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র বলে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এটি হল মূল ভিত্তি এবং খাঁটি ধনতন্ত্রে সব কারবারই এই ক্ষেত্রের অধীন থাকে। এর অন্তর্গত কারবারগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন। মিশ্র অর্থনীতিতেও এর অস্তিত্ব এবং প্রাধান্য বজায় থাকে।

Public Sector—সরকারী বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র অথবা সরকারী বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র। সরকারী বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, মালিকানা ও পরিচালনার অধীন যাবতীয় ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক ও শিল্পীয় কারবার নিয়ে এটি গঠিত। অবাধ ধনতন্ত্রের কুফলগুলি দূর বা দমন করার জন্য আধুনিক

কালে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশেই কমবেশি পরিমাণে এই ক্ষেত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে। ধনতান্ত্রিক অথচ পরিকল্পিত ও মিশ্র অর্থনীতিতে এটি ক্রমশঃই গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করছে ও ইহার বিস্তার ঘটছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমস্ত কারবারই এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত। এর উদ্দেশ্য শুধু মুনাফা উপার্জন নয়, জাতীয় কল্যাণ সাধনও বটে। ভারতের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করার নীতি ভারত সরকার অনুসরণ করছে।

Q

Quotation—মূল্যজ্ঞাপন বা জ্ঞাপিত মূল্য : পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিক্রেতা যে দর ও শর্তাবলী উল্লেখ করে তাকেই জ্ঞাপিত মূল্য বা কোটেশন বলে।

R

Receipt Voucher—প্রমাণক রসিদ : নির্দিষ্ট ফরমে মুদ্রিত, কোনও প্রাপ্ত অর্থের স্বীকৃতি যাতে লিপিবন্ধ থাকে তাকে প্রমাণক রসিদ বলে।

Respondentia Bond—পণ্য বন্ধকপত্র : গন্তব্য পথের মধ্যবর্তী কোনও বন্দরে জাহাজ মেরামতের প্রয়োজনে, নিরুপায় হয়ে পণ্য বন্ধক রেখে ঋণ নেবার ক্ষমতা জাহাজের অধ্যক্ষের থাকে। এই ঋণের চুক্তিপত্রকে পণ্য বন্ধকপত্র বলে।

Retiring a bill—বাণিজ্যিক হুণ্ডি প্রত্যাহার : কোনও বাণিজ্যিক হুণ্ডির মেয়াদ পূর্তির আগেই তার একপক্ষ কর্তৃক হুণ্ডিটি মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখাকে কিংবা সঙ্গে সঙ্গে তা নাকচ করাকে হুণ্ডিটির প্রত্যাহার বলে।

S

Service Record—চাকুরির বিবরণ বা দলিল : সাধারণত স্থায়ী চাকুরিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের প্রত্যেকের সম্পর্কে একটি পৃথক খাতায় বিবরণ লিখে রাখা হয়। তাতে কর্মচারীর গুরুতর দোষ-ত্রুটি ও গুণাবলী প্রভৃতি লেখা থাকে। এর ভিত্তিতে তার পদোন্নতির বিষয় স্থির হয়ে থাকে।

Ship's Manifest—জাহাজী বিবরণ : পণ্যবাহী জাহাজ গন্তব্য বন্দরে এসে হাজির হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের অধ্যক্ষ শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে নির্ধারিত বিষয়সমূহ সংবলিত একটি বিবরণী পেশ করে। তাকে জাহাজী বিবরণ বলে। এটি দাখিল করার আগে জাহাজে অবস্থিত কোন পণ্যের মোড়ক খোলা যায় না কিংবা জাহাজ থেকে কোনও পণ্য নামানো যায় না। জাহাজের নাম, যে বন্দরে তা রেজিস্ট্রি করা হয়েছে, জাহাজ কোন্ দেশের, অধ্যক্ষের নাম, কোন্ বন্দর থেকে তা এসেছে, লস্করের ও যাত্রীদের সংখ্যা, মোড়কের সংখ্যা ও বিবরণ জাহাজের অধ্যক্ষ ও লস্করদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রীর তালিকা প্রভৃতি এই জাহাজী বিবরণে উল্লেখ করতে হয়।

Ship's Protest—জাহাজী ঘোষণা : জাহাজের কোনও ক্ষতি বা পণ্যের কোনও হানি হলে নোটারি পাবলিকের সামনে তার কারণ সম্পর্কে জাহাজের অধ্যক্ষ যে শপথবন্ধ ঘোষণা করে তাকে জাহাজী ঘোষণা বলে।

Stale Cheque—গতমেয়াদ চেক : চেকে উল্লেখিত তারিখের পর একটা ন্যায়সঙ্গত কালের মধ্যে (যেমন, সাধারণত ছয় মাস) যদি তা ব্যাঙ্কে দাখিল করা না হয়, তবে তাকে গতমেয়াদ চেক বলে।

Stock Register—স্টক রেজিস্টার বা মজুদ-পণ্য বই : এই খাতায় মজুদ পণ্যের শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে।

Surrender Value—বীমার প্রত্যর্পণ মূল্য : বীমাগ্রহীতা কোনও সময় বীমার প্রিমিয়াম দিতে না পারলে বাকি প্রিমিয়াম না দেওয়ার জন্য বীমাপত্র বাতিল হয় না। বীমাপত্রটি ফেরৎ দিলে বীমার আংশিক মূল্য বীমাগ্রহীতাকে দেওয়া হয়। তাকে বীমার প্রত্যর্পণ মূল্য বলে।

Syndicate—সিণ্ডিকেট : একটি বা একাদিক্রমে কতকগুলি বাণিজ্যিক লেনদেন পরিচালনার উদ্দেশ্যে কয়েক জন বা কয়েকটি কারবারী সংস্থা দলবদ্ধ হলে তাকে সিণ্ডিকেট বলে।

Tare—কড়তা : প্রেরিত পণ্যের মোড়ক প্রভৃতির যে ওজন তাকে কড়তা বলে।

Tariff—শুল্ক, শুল্কের তালিকা, শুল্ক প্রদেয় দ্রব্যের তালিকা : এই শব্দটির দ্বারা আমদানি বা রপ্তানি শুল্ক, শুল্কের তালিকা অথবা শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত এরূপ একটি তালিকা বোঝায় যাতে শুল্ক প্রদেয় বিবিধ দ্রব্য, সেগুলির প্রত্যেকটির উপর দেয় শুল্কের হার, বিনা-শুল্কের দ্রব্য, যে সব দ্রব্যের আমদানি বা রপ্তানি নিষিদ্ধ ও যে সব দ্রব্যের উপর শুল্ক ফেরত বা রাজবৃত্তি দেওয়া হবে তার উল্লেখ থাকে।

Telegraphic Transfer (T/T)—তারবার্তা মারফত হস্তান্তর : এক ব্যাঙ্ক থেকে অপর ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কের এক শাখা থেকে অপর শাখায় তারবার্তা মারফত এক ব্যক্তির আমানতি হিসাবে খরচ লেখার (ডেবিট) ও অপর এক ব্যক্তির আমানতি হিসাবে জমা লেখার (ক্রেডিট) নির্দেশ দিয়ে তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের হস্তান্তরের ব্যবস্থাকে তারবার্তা মারফত হস্তান্তর বলে।

Telegraphic Money Order—টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডার : অতি দ্রুত একস্থান থেকে অন্যত্র টাকা পাঠাতে হলে, প্রেরণ-স্থানের পোস্ট অফিসে টাকা জমা দিলে, ঐ পোস্ট অফিস থেকে গন্তব্য স্থানের পোস্ট অফিসে তারবার্তা মারফত প্রাপককে ঐ টাকা প্রদানের নির্দেশ পাঠান হয়। একে টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডার বলে।

Trade Mark—পণ্যচিহ্ন : সাধারণত যন্ত্রশিল্প-জাত দ্রব্যাদিতে উৎপাদনকারীর পরিচয় স্বরূপ এবং অন্যান্য উৎপাদকদের বা বিক্রেতাদের অনুরূপ দ্রব্য থেকে পৃথক করার জন্য পণ্যের মোড়কে বিশেষ চিহ্ন বা ছাপ মুদ্রিত করা হয়। একে পণ্যচিহ্ন বলে। এটি সাধারণত সরকারের সংশিলষ্ট দপ্তরে রেজিস্ট্রি করা হয়। একের পণ্যচিহ্ন অপর কর্তৃক ব্যবহার অবৈধ।

Tax Holiday—করমকুব কাল : অনেক সময় (বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশে) বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের অর্থাৎ বেসরকারী ক্ষেত্রকে নূতন নূতন শিল্প স্থাপনে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করার জন্য সরকার এই সুবিধা দেয় যে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের পর হতে নির্দিষ্ট কালের জন্য তাদের আয়কর প্রভৃতি দিতে হবে না। এতে নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর করভার লাঘব হয় ও তাদের খরচ কমে। এই সুবিধা দেশী বিদেশী সব বিনিয়োগকারীদেরই দেওয়া যেতে পারে। ভারতে বর্তমানে এই ধরনের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

U

Under writer—দায়গ্রাহক : কোম্পানীর শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বাজারে বিক্রয় করার জন্য এক শ্রেণীর দালাল ভারগ্রহণ করে। এদের সাথে কোম্পানীর চুক্তি থাকে যে, যদি কোনও শেয়ার ডিবেঞ্চার অবিক্রীত থেকে যায়, তবে তা ঐ দালাল নিজে কিনে নেবে। এদের দায়গ্রাহক বলে।

Ultra Vires—ক্ষমতা বহির্ভূত, অবৈধ : কোন কিছু (যথা কোনও কাজ) কোনও ব্যক্তি বা বিধিবন্ধ প্রতিষ্ঠানের (যথা কোনও কোম্পানীর বৈধ ক্ষমতার বহির্ভূত হলে, তাকে ক্ষমতা বহির্ভূত বলে।

CALCUTTA UNIVERSITY

1975

1. Discuss the social responsibilities of business.
[ব্যবসা-বাণিজ্যের সামাজিক দায়িত্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।] উঃ ৭-৮ পৃঃ
2. Explain the importance of 'Organisation' and 'Delegation' in business.
[ব্যবসায়ে 'সংগঠন' ও 'দায়িত্ব অর্পণ'-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।]
উঃ ১৫-১৬, ১৯ পৃঃ
3. Enumerate the principal functions of the Board of Directors of a company.
[কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর প্রধান কার্যাবলী বর্ণনা কর।]
উঃ ১২০-২১ পৃঃ
4. Discuss the methods of issue of capital by a public limited company.
[কোন সার্বজনিক যৌথ কোম্পানী কর্তৃক মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর।] উঃ ১১৫-১৮ পৃঃ
5. What is meant by 'Scientific Management'? Discuss its principal characteristics.
['বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝায়? এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বলতে কি বোঝায়?] উঃ ২৩১, ২৩২-৩৭ পৃঃ
6. Explain the need for departmentalisation in a factory. Enumerate its features.
[কোন কারখানায় বিভাগীয়করণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। এর বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত কর।] উঃ ২০৪-৭ পৃঃ
7. Discuss the organisation and advantages of a Departmental Stores.
[বিভাগীয় বিপণির সংগঠন ও সুবিধাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]
উঃ ৩১৬-১৭ পৃঃ
8. What are the characteristics of an organised commodity market? Discuss its organisation.
[কোন সংগঠিত পণ্যবাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? এর সংগঠন আলোচনা কর।]
উঃ ৩৮৭-৮৮ পৃঃ
9. Discuss the importance of fire and marine insurance in business. What is meant by General Average?
[ব্যবসায়ে অগ্নিবীমা ও নৌবীমার গুরুত্ব আলোচনা কর। General Average বলতে কি বোঝায়?] উঃ ৪৫৫, ৪৬৫, ৪৫৮-৫৯ পৃঃ
10. Write short notes on *any four* of the following :
[নিম্নলিখিত **যে-কোনও চারিটির** বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :
(*a*) Partnership as a form of business organisation.
(ক) ব্যবসায় সংগঠনে অংশীদারী কারবার। উঃ ৩৭-৩৯, ৪৬-৪৭ পৃঃ
(*b*) Business Intermediary.
(খ) মধ্য-ব্যবসায়ী। উঃ ২৯৭-৯৯ পৃঃ
(*c*) Incentive Wages.
(গ) প্রয়োজক মজুরী। উঃ ২৮৩-৮৭ পৃঃ
(*d*) Unit Trust.
(ঘ) ইউনিট ট্রাস্ট। উঃ ৪০৪ পৃঃ
(*e*) Commercial Broadcasting.
(ঙ) বাণিজ্যিক বেতার প্রচার। উঃ ৩৭০ পৃঃ
(*f*) Trade Commissioner.
(চ) বাণিজ্য মহাধ্যক্ষ।] উঃ ৪৭৯-৮০ পৃঃ